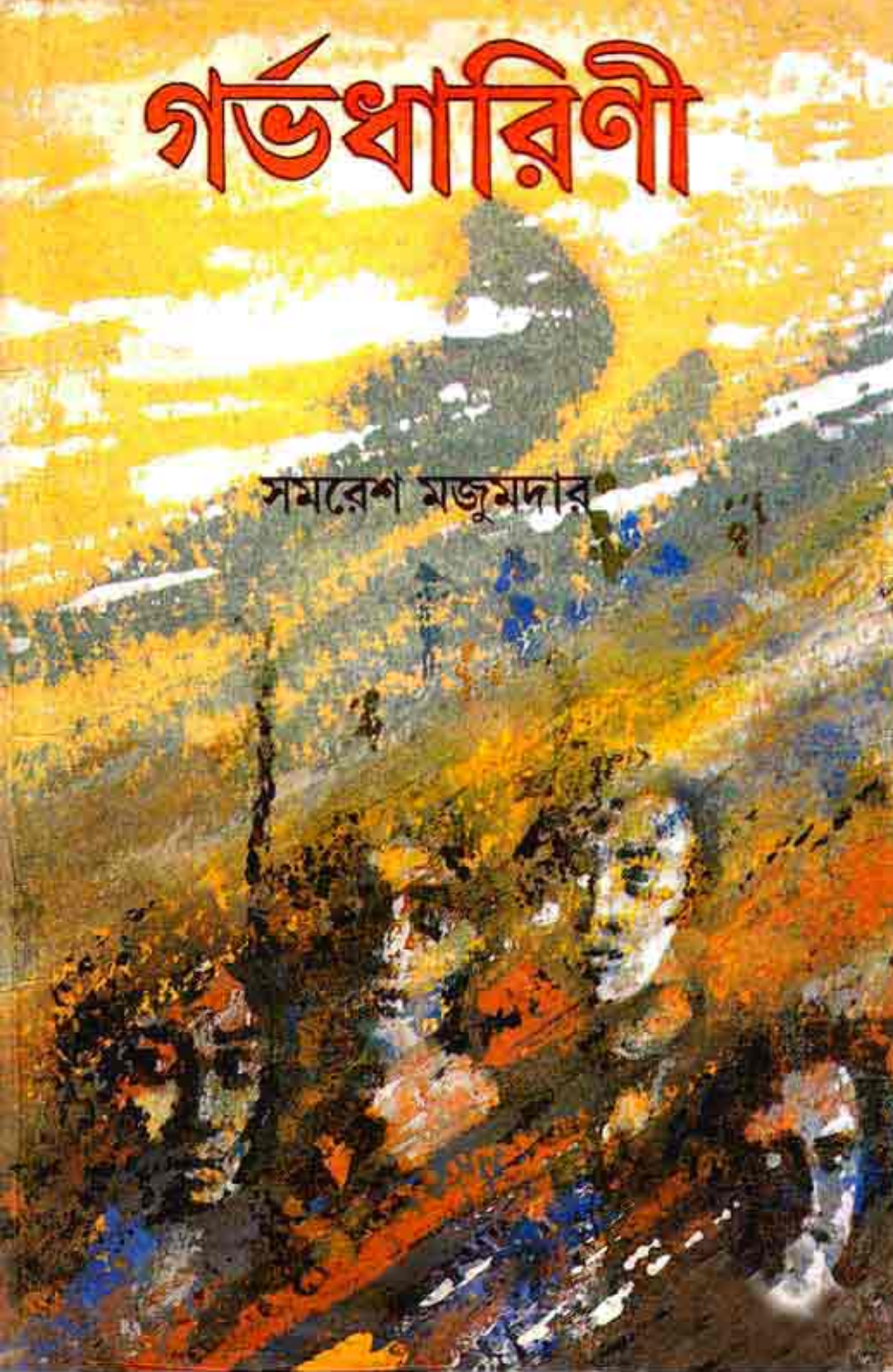


গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার



টেলিফোনটা বাজছিল। মুখ তুলে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল জয়িতা। এগারটা দশ। অবশ্যই এই ফোনটা ওর জন্যে নয়। ওর বন্ধুরা কেউ এই সময়ে ফোন করবে না। যদি কোন বিপদ আপদ হয় তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু বিপদ আপদের আশু সম্ভাবনা তো ছিল না। অতএব এই ফোনটি সীতা রায়ের। যদিও সীতা রায় এখনও বাড়ীতে নেই, কখন ফিরবেন তাঁরই জানেন না এবং তার ওপর আজ যখন শনিবারের রাত তখন ওই টেলিফোন নিয়ে মাথা ব্যথা করার কোন মানে হয় না। অবশ্য করার তালানোর মত শব্দটা বেজে যাচ্ছে। যে করছে তার খেঁখি আছে। না ধরিয়ে ছাড়বে না। এই বাড়িতে দুটো কাজের লোক আছে। একজন দৈনিক আর একজনের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে আছে। কাজকর্ম ঠিকঠাক করে কিন্তু কানে শুনতে পায় না। সীতা রায়ের অবশ্য শ্রীহরিকে ওই কারণেই পছন্দ। বাড়ির কথা বাড়ির বাইরে যাবে না। কিন্তু মুশকিলটা হল টেলিফোনের আওয়াজটা শ্রীহরিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। খানিক আগে ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়ে তিনি চলে গেছেন নিজের ঘরে। অতএব উঠতে হল জয়িতাকে। লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। স্পোর্টস গেঞ্জি আর জিনসের টাইট প্যান্টে ওকে আরও রোগা দেখায় কিন্তু শাড়িটারির চেয়ে এই পোশাকই ভাল লাগে জয়িতার।

রিসিভারটা অত্যন্ত সহজে কানে তুলে জয়িতা বলল, 'হ্যালো!'

একটু থিতনো ওপাশে, তারপর হাসির মাড় লাগানো কড়কড়ে শব্দ বাজল, 'উঃ, কি ঘুম বাবা, এগারটা বাজতে না বাজতেই যদি প্রেসিডেন্সির মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে কি করে চলবে! রিসিভার ধরে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল।' জয়িতার চোখ ছোট হল। সে কেটে কেটে উচ্চারণ করল, 'ঠিক কত নম্বর চাইছেন?'

'আঃ কাম অন বেবি! তুমি তো জয়িতা, রামানন্দের মেয়ে?'

'হ্যাঁ। তাই বলা হয়ে থাকে আমাকে।'

'বলা হয়ে থাকে?' হাসির ডুবড়ি আকাশ ছুল এবার, 'পাবাস! শুনেছিলাম তুমি নাকি খুব স্মার্ট, শাড়ি ব্লাউজ পড়ো না, বাট আই হ্যান্ড নেভার সিন ইউ অ্যারান্ড। রামানন্দ একটু আগে বলেছিল তুমি খুব রোগা, খুব?'

জয়িতা বাঁ দিকে তাকাল। সেখানে বেলজিয়ামের আয়নায় তাকে দেখা যাচ্ছে। পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চির একটা দাঁড়ি। নো বাঁক, মাংসের বাড়তি চমক কোথাও নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তার কোন রোগ নেই। ভাল হজম হয়, চমৎকার ঘুম হয়, এবং মেয়ে বলেই সারামাসের চারদিনের

যন্ত্রণাটা নিয়ম মেনেই ঘটে যায়। সে প্রেসিডেন্সিতে শতকরা চুরাশি নম্বর পেয়ে চুকেছিল। তার কোন শারীরিক অসুবিধে নেই। অথচ এই মহিলা মাঝরাতে তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন সে খুব রোগি কিনা। হুইজ সী?

প্রশ্নটা করা মাত্রই মহিলা জবাব দিলেন না। বললেন, 'আসলে ব্যাপার কি জানো, আমার মনে হল তুমি এখন একা আছ। আমি জানি একজন কবিরাজকে। তার গুণুধ খেয়ে অনেকেই মোটা হয়েছে। মেয়েদের মোটা না হলে ভাল দেখায়, বল?'

'আর ইউ ড্রাক?'

'ওমা, আমার কথা শুনে তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি! না ভাই, আমি ড্রিক করি না, তবে খেতে চাইলে খাওয়াই। আসলে তোমার ওপর আমার প্লেহ, আই মিন, এক ধরনের অ্যাটাচমেন্ট এসে গেছে বলতে পারো। জয়িতা, তোমাকে আরও বড় হতে হবে। আরও বড়। মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। তুমি জে. ই. দিনে না কেন?'

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল। ইটস ইনটনারেবল। সে শীতল গলায় প্রশ্ন করল, 'লুক, আমি আপনাকে চিনি না জানি না। আপনার কাছে অনাবশ্যক উপদেশ শুনতে আমি রাজী নই। এবং এখন রাত অনেক হয়েছে।'

'রাত কত হল তোমার বাবা বাড়িতে ফেরেন জয়িতা?'

'আই ডোন্ট নো। আই অ্যাম নট কনসারন্ড।'

'তাই তো এই ফোন। তোমাকে আমার খু-উ-ব নেগলেকটেড চাইল্ড বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে আরও ওপরে উঠতে হবে। তোমার বাবার চেয়েও বড় হতে হবে। তুমি কি এখন পড়াশুনা করছিলে জয়িতা?'

'কিন্তু আমি জানতে চাই আপনি কে?'

'দ্যাখো, কোন কোন সম্পর্ক জন্ম থেকেই তৈরি হয়, কোনটা পরে আসে। আমি তোমার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পর্কিত। এখন আমি তোমাকে নিজের মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না! তোমার সম্পর্কে আমার মাদারলি ফিলিংস এসে গেছে।'

'কিন্তু কেন? কি জন্যে? আমাকে কি আপনি দেখেছেন?'

'নো। তবে শুনেছি তোমার কথা। আর এখন তো আমার সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। তোমার কোন প্রবুম থাকলে আমাকে বলতে পার।'

'আপনি এখনও পরিচয় দিচ্ছেন না। যদিও আপনাকে আমার ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। অ্যাট লিস্ট আপনার গলার স্বর খুব ভাল। সম্পর্কটা কি?'

'মান্নের সঙ্গে মেয়ের যা সম্পর্ক। ইন ফ্যাক্ট আমি সীতার চেয়ে ভাল মা হব।'

'মা! ভগবান! আপনার কি মাথা খারাপ! আমার বাবা এখনও ডিভোর্সী

নন এবং কখনও হবেন কিনা সন্দেহ আছে। আর ইউ ম্যাড ?’

‘নট অ্যাট অল। তাহলে তোমাকে বলি। আমি আর রামানন্দ প্লেপট টুগেদার। একটু আগে ও উঠে গেছে আমার বিছানা থেকে। আমি এসব কথা তোমাকে বলতে চাইনি কিন্তু তুমি বাধ্য করলে। ওর জামায় আমি একটা দাগ রেখে দিয়েছি ফর ইণ্ডর ইনফর্মেশন। এখন ব্যাপারটা হল, আমি ব্যাপারটাকে কেবল আনন্দ উপভোগ হিসেবে দেখছি না। ওর সব কিছু আমাকে ইন্সপায়ার্ড করেছে। তা থেকেই তোমার সম্পর্কে আমার মাদারলি ফিলিংস এসেছে। বুঝতে পেরেছ ?’ কথাগুলো শেষ করে আবার সেই কড়কড়ে হাসি জুড়লেন মহিলা।

‘ডিসগাস্টিং।’ চিৎকার করে উঠল জয়িতা, ‘যতক্ষণ আপনি আপনার নাম না বলছেন ততক্ষণই আমার—। ওয়েল, এসব কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই!’

‘আমি মিসেস দত্ত। প্রিন্সিলা দত্ত। গুড নাইট।’

লাইনটা কেটে গেল। এখন রিসিভারে আবার ডায়াল টোন ফিরে এসেছে। একটানা শব্দটা যে কানে বাজছে প্রথমে খেয়াল করেনি জয়িতা। সে নিজের অজান্তেই হেঁট কামড়াল। তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘরে ফিরে এল।

প্রিন্সিলা দত্ত। এই নাম সে জীবনে শোনেনি। হয়তো বাবার লেটেষ্ট। কিন্তু মহিলা যেই হোন না কেন কথা বলতে জানেন। লেটেষ্ট কায়দায় ব্যাকমেল করা। অথচ ব্যাকমেল বলে আপাত মনে হবে না। চেয়ারে বসে দুটো পা টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিল সে। মাঝারি দামের সিগারেট। বেশ কড়া। বছর দুয়েক হল সে সিগারেট খাচ্ছে। ওর বন্ধুরাও এই সিগারেটই পছন্দ করে। অবশ্য আনন্দ সিগারেট খায় না। কোন নেশাটেশার মধ্যে নেই। রিয়েল সিরিয়াস গাই। নরেন্দ্রপুরের ছেলেদের মধ্যে একটা গুডি গুডি ভাব থাকে। আনন্দটা সেটাকে ভিত্তি করে আরও এগিয়েছে। সব কিছু খুব সিরিয়াসলি ভাবে। কিন্তু বোর করে না। সুদীপ বা কল্যাণ ঠিক আছে। সুদীপটা ক্যালকাটা ব্যেস থেকে বেরিয়েছে। বড্ড বেশী কথা বলে। কয়েকবার পাউডার অ্যাটম্পট্ করে বলেছে কেন যে ওরা এসব খায়। ধূৎ। অনেস্ট কনফেশন। ওকে বুঝতে অসুবিধা হয়নি জয়িতার। মুশকিলটা কল্যাণকে নিয়ে। ও পড়তো স্কটিশ স্কুলে। একদম মধ্যবিত্ত বলে যারা নিজেদের সান্ত্বনা দেয় তাদের একটা পরিবার থেকে। আদন্দও মধ্যবিত্ত কিন্তু কল্যাণের মত উল্টোপাল্টা মানসিকতার ছেলে নয়। কল্যাণ কোন ব্যাপারে দারুণ স্মার্ট কথা বলল, আবার পরক্ষণেই এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক ধারণা আঁকড়ে ধরল যে ওকে খুব বিরক্তিকর বলে মনে হয় তখন। কিন্তু সব মিলিয়ে এই তিনজনেই জয়িতার বন্ধু। আনন্দ হোস্টেলে থাকে। কল্যাণের বাড়িতে ফোন নেই। সুদীপের আছে। কিন্তু এখন সুদীপ

বোধ হয় বাড়িতে ফেরেনি। ওদের দমদমে ঘাওয়ার কথা সন্ধ্যা সাতটায়। আনন্দ আর সুদীপের। পাটির ডিসিশন জানতে যাবে ওরা।

তবু জন্মিতার মনে হল সুদীপকে একটা ফোন করলে হয়। যতই সে ব্যাপারটার গুরুত্ব না দিক, মনের মধ্যে নোংরা লাগার মত একটা অনুভূতি পাক খাচ্ছে। মহিলা স্পষ্ট বললেন আমি তোমার বাবার সঙ্গে যুমিয়েছি! এরকম কেউ বলতে পারে? অবশ্য সেটা যদি সত্যিই হয় তাহলে এখন জন্মিতার কিছু আসে যায় না। পুরো ব্যাপারটা সীতা রায়ের। রামানন্দ রায় এবং সীতা রায়ের। জন্মসূত্রে ওরা অবশ্য বাবা-মা। পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর সম্পর্ক। রামানন্দ রায়ের বয়স পঞ্চাশ। হ্যাণ্ডসাম, স্টিল হ্যাণ্ডসাম, টল, চুলে কলপ দেয় প্রতি রবিবার, মুখে ভাঁজ পড়েনি। ড্রিংকসের জন্যে চোখের তলায় সামান্য ব্যাগ তৈরী হয়েছে এবং পেটে ঈষৎ চবি। তবে স্মার্টনেসের জন্যে সেগুলো তেমন নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পান। দাঁত তুলতে রাজী নন। সেই সময় ওয়াটারলু সিট্টের বারীন রায় ওঁর ভগবান।

রামানন্দ রায় চাকরি করতেন মাঝারি ফার্মে। খুব ছেলেবেলায় জন্মিতা নিজেদের দেখেছে শোভাবাজারের বারোয়ারি বাড়িতে। তারপর ভবানীপুরে এখন বালিগঞ্জ পার্ক রোডের ছয় তলার বারোশ ফ্লোরার ফিটের ফ্ল্যাটে। এর ফাঁকে রামানন্দ রায় তিনটে চাকরি ছেড়েছেন এবং এখন যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে পৌঁছানোর জন্যে কলকাতার এনিটি সম্প্রদায় সমানে দৌড়ে যাচ্ছে। ইদানীং বাবার সঙ্গে খুব কম দেখা হয় জন্মিতার। রবিবারের সকালে সীতার কেটে ফিরে এসে মিনিট দশেক হয়তো বা। পড়াশুনার খবর নিতেন আগে। এখন নেন না। সামনে বসে দু'একটা বই তুলে পাতা ওল্টান। জন্মিতার মনে হয় ওই সময় রামানন্দ রায়ের মনে এক ধরনের পাপবোধ কাজ করে। নাহলে বারংবার জিজ্ঞাসা করতেন না, 'এন্টরিথিং অল রাইট?' প্রশ্নটা মূদ্রা-দোষের পর্যায়ে চলে গেছে।

সীতা রায় অবশ্য এসবের ধার ধারেন না। তিনি ঘুম থেকে ওঠেন বেলায়। উঠে লেবু চা খান। ততক্ষণে মাসাজ করার মেয়েটা এসে যায়। আগে দরজা বন্ধ থাকতো, এখন খোলাই থাকে। শরীরের সর্বত্র দলাইমলাই করে মেয়েটা মাসে আটশো টাকা পায়। তারপর একটা স্যুপ গোছের কিছু খেয়ে সীতা রায় গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে যান পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে। ওখানে শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া, মেদরুদ্ধি রোধের বিলি ব্যবস্থা করে দেয় একটা নামকরা প্রতিষ্ঠান। সীতা রায় সেখান থেকে ফেরেন দুটো নাগাদ। তখন তাঁর খাদ্য বয়েলড ভেজিটেবল, ডিম এবং চবি ছাড়া সেদ্ধ মাংস। অবশ্য এর মধ্যে একবার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন নিয়ম করে। জন্মিতা তখন হয়তো স্নান সেরে তৈরি হচ্ছে কলেজে ঘাওয়ার জন্যে, সীতা রায় ঘরে ঢুকে কান নাচাবেন, 'ও ঈশ্বর! এটা ভদ্রলোকের ঘর না ডাস্টবিন। একটু কেয়ার নিতে পার না কেন? কোন মানুষ এত অগোছালো থাকতে পারে ভাবতে পারি না। তুমি যে কি করে আমার পেটে

এসেছিলে তাই ভেবে পাই না।*

ঠাণ্ডা গলায় জন্মিতা জবাব দেয়, ‘বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পার।’

‘ননসেন্স! তোমার কথা বার্তা খুব রাফ হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা।’

‘কেন?’

‘হোয়াট উইল বি ইউর ফিউচার! অনেক মেয়ের চেহারা ভাল থাকে না কিন্তু একটা চেঁচা থাকে সেটাকে ভালো দেখানোর। ইনফ্যান্ট তোমার বয়সে সাজগোজ করলে যে কোন ছেলে ইনভলভড হতে বাধ্য! তোমাকে এতবার বলছি ক্লাবে এসো, পার্টিগুলো অ্যাটেণ্ড করো, দেয়ার আর লট অব ফ্লেশ বয়েস—একবার বিয়ে হয়ে গেলে নো প্রব্লম। অথচ তুমি কোন কথাই শুনতে চাও না। এই সেদিন চোপরা বলছিল, মিসেস রায়, আপনি যখন এমন সুন্দরী তখন আপনার মেয়ে নিশ্চয়ই অসামান্য রূপসী হবে। আমি আর কি বলব, চৌক গিললাম।’ সীতা রায়ের শরীরে এখন হালকা সবুজ হাউস কোট।

‘কি করব বল, আমার চেহারার ওপর তো আমার হাত নেই।’

‘সেকথা আমি বলিনি। আমি যখন শোভাবাজারে থাকতাম তখন কি চেহারা ছিল আমার? এখন আমার দিকে তাকালে কোন ছেলে চোখ ফেরাতে পারে না। আমি তৈরি করেছি এইটে, ঈশ্বর দেয়নি! তুমি পড়া-শুনায় ভাল তার মানে এই নয় ছেলেরা তোমার জন্যে ছুটে আসবে।’

‘মা ছেলেদের ব্যাপারে আমার কোন আকর্ষণ নেই। সত্যি কথা বলতে কি পড়াশুনা করতেও আমার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে করছে না।’

‘তার মানে? তুমি কি করতে চাও?’

‘সেইটেই ভাবছি। যখন করব তখন জানতে পারবে। শুধু আপাতত আমায় নিয়ে তোমরা ভেব না। রোজ রোজ এক কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। ফোন বাজছে। মনে হচ্ছে তোমার ফোন! জন্মিতা কথা শেষ করা মাত্র সীতা রায় ঘাড়ি দেখলেন। তারপর দ্রুত পাল্লে বেরিয়ে গেলেন টেলিফোন ধরতে। জন্মিতা মায়ের দিকে তাকাল। শী ইজ অ্যারাউণ্ড ফরটি টু। শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলোর কৃতিত্ব বটে। যৌবন শরীরের ফুলদানিতে চমৎকার সাজিয়ে রাখে। ইদানীং মা চুল ইন্ড্রি করাচ্ছে। আগে কাঁধ অবধি নামিয়েছিল। এখন সেটা কোমরে। ইন্ড্রিটা বাড়িতেই করা হয়। চওড়া টেবিলের ওপর কম্বল বিছিয়ে মা মোড়া নিয়ে পাশে বসে চুলগুলো ছড়িয়ে দেয় কম্বলে। সেগুলোকে টান টান করে বিছিয়ে তার ওপর সার্টিনের কাপড় ঢেকে কন্ট্রোলড টেম্পারেচারে ইন্ড্রি চালানো হয় ওপর থেকে ডগা পর্যন্ত। জন্মিতা মাঝে মাঝেই ভেবেছে ইন্ড্রিটা যদি মাথায় ঠেকে যেত তাহলে কি রকম হত ব্যাপারটা। কিন্তু কখনই সেটা হয়নি। যে মেয়েটি এই কাজটি করে তার পটুত্ব অসাধারণ। এর ফলে পালিশ করা চুল কোমর অবধি নিয়ে

মা যখন সন্ধ্যাবেলায় বের হয় তখন সেখান থেকে একটা জেল্লা ছিটকোয়।
মাগ্নের গায়ে রঙ আগে বেশ চাপা ছিল। কী মন্ত্রে যে সেটা গমের মত হল
কে জানে। সরু কোমরের অনেকটা খোলা থাকায় সেটা মুক্ত হাতের সঙ্গে
চমৎকার মানিয়ে যায়। সীতা রায় লম্বা।

জন্মিতা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই মাকে দেখতে পেল। রিভলভিং
চেয়ারে বসে মা কথা বলছে রিসিভার কানে ঠেকিয়ে। অন্যের এই রকম
বাক্যালাপ শোনা উচিত নয় কিন্তু সীতা রায়ের ভঙ্গী দেখে জন্মিতা চলে
আসতে পারল না। মোল বছরের নিকি খুকীর মত ভঙ্গী করছে সীতা রায়,
'ওঃ নো! ম্লু আর রিয়েল নটি। কত বয়স হল জানো? এখন কি সে
ফিগার আছে? বেশ, দেখি তুমিই বল! মাপার জন্যে গায়ে হাত দিতে
হয় না, পুরুষদের চোখ জহরীর মত। উঁহ হল না। আই অ্যাম থার্টী
সিন্স টোয়েন্টি ফাইভ থার্টী সেভেন। দ্যাখো না ভাই, টোয়েন্টি ফাইভটাকে
কিছুতেই টোয়েন্টি থ্রি করতে পারছি না। ইউ লাইক ইউট! নটি বয়!
না বাবা, আমি আর একটু কমাতে চাই। চোপরার কথা বলো না। লোকটার
কোন টেস্ট নেই। মিসেস গুপ্তার কোমর থার্টী টু র মিচে হবে না।
তার সঙ্গে তুই নাচছিস। খবরদার, তোমাকে যেন ওই ধুমসিটার সঙ্গে
না দেখি। ইউ নো, আমি খুব অহংকারী। গুপ্তার মত ইজিগি অ্যাভেলবল
নই। রামানন্দ আছে, ভালই আছে। হু কেয়ার্স! এক কালে শুনতাম
টিন এজার্সদের নিয়ে ঘুরত, এখন দত্ত মেয়েটা কোথেকে আমদানি
হয়েছে! তাই? ওর স্বামীর শনেছি বিরাট এক্সপোর্টের কারবার। মেয়েটা
সান্যালের? তোমাদের এই রোমিও সান্যাল বেশ আছে। বিয়েথা করিনি,
একে ওকে বাচ্চা দিয়ে যাচ্ছে! না বাবা, আমার কাছে ঘেঁষতে এসেছিল।
বাট আই ডোগ জাইক আনম্যারেড গাইস। প্যানপেনে প্রেমের রিস্ক নেই
আমি। এই বয়সে বিয়েথা করতে বলবে--ওরে বাব্বা। বয়স বলব না?
ঠিক আছে বাবা, দুধ তো শিশুদের জন্যে কিন্তু ক্ষীর ডিজিসিয়াস—সকলের
সহ্য হয় না। হি হি হি। সন্ধ্যায় ক্লাবে এসো। কোথাও হারিয়ে যাওয়া
যাবে। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, প্রমিস।' সীতা রায়কে রিসিভার নামিয়ে রাখতে
দেখেও দরজা ছেড়ে মড়ল না জন্মিতা। উৎকুল সীতা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।
তারপর মেয়ের দিকে নজর পড়তেই বললেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?'
জন্মিতা সেই একই ভঙ্গীতে বলল, 'তোমাকে দেখছিলাম।'
কাঁধ নাচালেন সীতা রায়, 'এমন বিরক্ত করে না এরা, সুন্দরী হবার এই
জ্বালা। চিতায় উঠেও প্রশংসা শুনতে হয়। বাই দ্য ওয়ে, তোমার টাকার
দরকার?'

'না।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নেবাল জন্মিতা। আজকাল সে সীতা রায়ের সামনেই

সিগারেট খায়। প্রথম প্রথম সংকোচ লাগত। বিদ্রোহ করার ভংগীতে সেটা শুরু করেছিল। কোন প্রতিবাদ না আসায় এখন অভ্যাसे এসে গেছে। শুধু রামানন্দ রায় এক কার্টন নিজের সিগারেট মেয়ের টেবিলে রেখে বলেছিলেন, 'সিগারেট খেতে হলে এইটে খেও। সস্তা সিগারেটে শরীরে ক্ষতি হয়।'।

জয়িতা দুটো প্যাকেট পাশাপাশি রেখে বলেছিল, 'আমারটায় লেখা আছে সিগারেট স্কেমাকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ আর তোমারটায় সার্জেন জেনারেল উপদেশ দিয়েছেন। একই ব্যাপার। আমার এইটেই ভাল লাগে।'।

'তুমি কি আমার কিছু গ্রহণ করবে না বলে ঠিক করেছ?'।

'তুমি কি দিচ্ছ তার ওপর আমার গ্রহণ করা নির্ভর করছে তাই না বাবা?'

'তুমি ইদানীং খুব অবাধ্য হয়ে যাচ্ছ জয়ী। আই ডোন্ট লাইক দিস!'

'ডু ইউ?'

রামানন্দ রায় সিগারেটের কার্টন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'যা হচ্ছে তাই কর। আই নো ইউ আর টেকিং অ্যাডভানটেজ!'

আজ রাত্রে কথাটা নতুন করে মনে পড়ল জয়িতার। ওরা বলে এটা ফাস্ট লাইফ। এই জীবন যাপন করতে না পারলে ওদের সমাজে অচল হয়ে যেতে হবে। কে কতটা আধুনিক হতে পারছে তার প্রমাণ দিতে হবে কে কতটা নিচে নামতে পারছে তার মধ্যে দিয়ে। জয়িতা নিজেও জানে না সে কেন এই জীবনটাকে গ্রহণ করতে পারল না। সত্যি বলতে কি এই বালীগঞ্জ পার্ক রোডের বনেদী বস্তিতে তার বয়েসী অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা সঙ্কোর পর যে বলগাহীন স্বাধীনতা পায় তা চুটিয়ে ভোগ করে। ঠিক তাদের নিচের ফ্ল্যাটেই জুনরা থাকে। বাবা মা বেরিয়ে যাওয়ার পর ওর বন্ধুরা এসে জড়ো হয়। পাউডার সিগারেটে পুরে বুকভর বাতাস নেয়। স্মি মুনি আসা মিউজিক বাজে। জুন নিজে বলেছে ও সাড়া মাস ট্যাবলেট খায়, কারণ কখন কি যে হয়ে যায়, কে রিস্ক নেবে। ইটস অল ইন দ্য গেম। জুনের বয়স মাত্র পনের। অথচ ওখানে যাওয়ার প্রবৃত্তিটাই কখনও এল না। আনন্দ কিংবা কল্যাণের এই প্রশ্ন উঠে না, সুদীপটা হচ্ছে করলে এই জীবনটা নিতে পারত। কিন্তু সুদীপ স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, 'আই হেট দেম। বিশ্বাস কর আমি ওদের মলমূত্রের চেয়ে বেশী ঘেন্না করি?'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তাহলে আচ্ছিস কেন ওদের সঙ্গে?'

'প্রিটেনশন। নিজেকে ভুলিয়ে রাখা। আফটার অল দুবেলা ভাল মন্দ খেতে পাচ্ছি। আমার মধ্যে যে সুবিধেবাদী শয়তানটা আছে সেইটের জন্যে রয়ে গেছি।'

সুদীপ যে কথাগুলো স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করতে পারে জয়িতা তা পারে না। বস্তুত বন্ধুদের কাছে সে বাড়ির আবহাওয়ার কথা কখনও উচ্চারণ করেনি। ওরা তাকে কখনই মেনে বলে মনে করলে না, আলাদা খাতির দেখায় না, সুদীপ

তো অনেক ছেলেরি স্ল্যাং বলে যায় অনায়াসে এবং সে নিজের ওদের ছেলে বলে সংকুচিত থাকে না। ঠিক চারটে অস্তিত্ব একাকার হয়ে যাওয়া আর কি। ব্যাপারটা কলেজের জন্য মেয়েদের চোখে করকরে ঠেকে। মেয়েদের এই অতিরিক্ত মেয়েলিপনা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না জয়িতা। নিশ্চয় মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা মেয়েগুলো তাদের সব রকম কনজারভেটিভ ধারণা বুক পুষে রেখে এমন ভাবভঙ্গী করে যেন পৃথিবীর সব ছেলেই তাদের দিকে হামলে পড়ছে। হাসি পায় জয়িতার। এরা কেউ সীতা রায় নয়। লাবণ্যের মত জমিত রায়ের সঙ্গে কাঁপা কাঁপা সংলাপ বলার জন্যেই মনে মনে রিহাসাল দেয় সব সময়। জীবনের কোন সমস্যা, দেশের মানুষের কথা ভাবতে ওদের বয়েই গেছে। একটা মনের মতন স্বামী পাওয়ার জন্যে মেয়েদের কেন বড় হতে হবে?

অর্থাৎ এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, কোনটাই জয়িতার ধাতের সঙ্গে মেলে না। আর মুশকিলটা এখানেই। এই মহিলা, কি নাম যেন, ঐন্দ্রিলা দত্ত, মানে সেই এক্সপোর্ট বিজনেসের মালিকের স্ত্রী, কি স্বচ্ছন্দেই না উচ্চারণ করলেন আমি তোমার বাবার সঙ্গে শুয়েছি। এই কথা শোনার পর তার কি করা উচিত!

জয়িতা টেলিফোনের নম্বর ঘোরাল। ওপাশে রিং হচ্ছে। ঘড়িতে এখন সাড়ে এগারটা। এই সময় টেলিফোন করার সময় নয়। ওপাশে রিসিভার উঠল, 'হ্যালো!'

স্বরে বোঝা গেল কাজের লোকজন কেউ। জয়িতা স্বস্তি পেল। সুদীপের বাবা ফোন ধরলে বড় খেজুরে আলাপ করেন। তুমি কেন প্যান্ট পরো, না না প্যান্ট খারাপ নয়, আসলে মেয়েদের প্যান্ট পরলে অনেক অসুবিধে, শাড়িতে তোমাকে ভালই মানাবে। সুদীপকে সে বলেনি কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে একটা টসটসে ভাব থাকে।

'সুদীপ আছে?'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'আমি সুদীপের শাশুড়ী!'

নিঃশব্দে রিসিভার নামিয়ে লোকটা যেন ছুটে গেল ডাকতে ডাকতে। পল্লার স্বর পিছলে যাওয়াতে সেই রকম মনে হল। জয়িতার পেটের ভেতর এতক্ষণে হাসি কুলকুলিয়ে উঠল। শোনামাত্র সুদীপের মুখের অবস্থা কিরকম হবে?

'এই শালা, ইয়াকি মারার একটা লিমিট আছে!' সুদীপের গলায় রাগ স্পষ্ট।

'মাইগু ইওর ল্যাংগুয়েজ। আনন্দ বলেছে—'

'জ্ঞান দিস না। এইবার কার্তিকদা বাড়ি শুদ্ধ প্রচার করবে আমার একটা শাশুড়ী আছে। একেই মরছি নিজের জালায়—'

'গোদের ওপর বিষফোড়া হলে কোন ক্ষতি হয় না। মিটিং-এ কি হল?'

‘গ্রান্টেড। টেলিফোনে বলা যাবে না।’

‘কেন?’

‘সন্দেহজনক ঘটনা ঘটেছে। একজন নাকি এসে খোঁজখবর নিয়েছে আমার সম্পর্কে।’

‘ওকে!’

‘কেন ফোন করলি? কাল তো দেখাই হত?’

‘আই অ্যাম ইন আ প্রব্লেম।’

‘সেকি? তোর ওখানেও কেউ গিয়েছিল নাকি?’

‘না না। এখনও অতটা হিরো হইনি। প্রব্লেমটা আমার বাবাকে নিয়ে।’

‘ডোন্ট বদার। গুলি মার।’

‘তুই বুঝিস না? একটু আগে একজন ভদ্রমহিলা ফোন করে আমাকে খুব জ্ঞান দিলেন। মা মা ভাব দেখালেন। কারণ আজ নাকি তিনি আমার বাবার সঙ্গে শুয়েছেন। জাস্ট ইমাজিন।’

‘বয়স কত?’

‘আঃ, আমি চিনি নাকি যে বয়স বলব।’

‘তুই খুব ডিস্টার্বড?’

‘অফকোর্স।’

‘তুই একটা গাধা। যে যা করছে করুক। তোর কি?’

‘আমার বাবা—।’

‘তোর বাবার দায়িত্ব তোর নয়। তাছাড়া উই মে লিভ হোম এনি ডে এনি টাইম। শোন, তোর বাবা কোথায়?’

‘কেন?’

‘কনগ্রাচুলেশন জানাব। ফোনটা ওঁকে দে। বলব, চালিয়ে যান দাদা। দেশটা আপনারাই খোলতাই করছেন। আপনাদের সংখ্যা যত বাড়ছে তত আমরা বাড়ছি। এইটেই লাভ।’

‘বি সিরিয়াস সুদীপ। আমি একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই আজ রাগে।’

‘কি লাভ? এদেশের কম্যুনিষ্টদের যেমন বিপ্লবের কথা বলে কোন লাভ হবে না তেমনি এইসব সেক্সহান্টার্সদের বিবেক বলে কোন বস্তুকে জাগানো যাবে না। এসব না করলে বেচারারা বেকার হয়ে যাবে। ঘুমিয়ে পড়। কাল দেখা হবে গুড নাইট।’

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল জয়িতা। সুদীপের কথা শুনলে বোধ হয় ভাল হত? যে যা ইচ্ছে করুক, তার কি? কিন্তু মহিলার গলার স্বরটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আবার ডায়াল যোরাল জয়িতা।

রিং হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঘুম জড়ানো গলা শুনতে পেল, ‘হ্যালো।’

‘মিলি আন্টি, তুমি বাড়িতে আছ? আমি জয়িতা।’

‘ও। হ্যাঁ, আমার শরীর খারাপ। অনেকদিন বের হইনি। কি ব্যাপার।’

এত রাত্রে ?

‘আই অ্যাম সরি। আমি খুব ডিস্টার্বড ? আচ্ছা তুমি ঐন্ড্রিলা দত্ত বলে কাউকে চেন ?’

‘মাই গড ? তুই ওকে চিনলি কি করে ?’

‘চিনেছি।’

‘খবরদার ওর সঙ্গে মিশবি না। শী ইজ আ বিচ। তোর বাপ মা তো আমার সঙ্গে কথা বলে না কিন্তু বুঝবে ঠায়ালা। তোর আঙ্কলের সঙ্গে ওই মেয়েটা একদিন দেখা করেছিল অফিসে গিয়ে। কি কথা হয়েছে কে জানে, আমাকে ফোন করে বলে কিনা আপনার স্বামী খুব অ্যাস্রেসিভ, সামলানো দায়। একে ওকে এসব বলে আনন্দ পায়। অবশ্য সত্যি যে একদম থাকে না তা নয়। কেন, তোর বাবার ব্যাপারে কিছু বলেছে বুঝি ?’

‘কিছু না। আচ্ছা রাখছি। শুভ নাইট।’

রিসিভার রেখে আর একটা সিগারেট ধরান জয়িতা। এবার মিনি আন্টি গন্ধ খুঁজছেন। কিছু একটা ঘটনা টেনে বের করতে পারলে বিছানায় গুয়ে গুয়েই কলকাতায় চাউর করবেন কেছা। কিন্তু যেটুকু জানা গেল তাতে ঐন্ড্রিলা সম্পর্কে চট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। আবার সূদীপের কথা মনে পড়ল। এ নিয়ে ভেবে কি লাভ ! না, একমত নয় সে। উত্তরপুরুষের কাছে যদি পূর্বপুরুষ কৈফিয়ত চাইতে পারে তাহলে উত্তরপুরুষেরও অধিকার আছে পূর্বপুরুষকে কার্ত্তগড়ায় দাঁড় করানোর। ইটস্ এনাফ। সীতারায় স্বীকার করুক, সাহস থাকলে বলুক, আধুনিকতা বলতে তারা বোঝে মদের বোতল খোলা এবং সম্পূর্ণ না ভালবেসে, একটুও মনের কাছাকাছি না গিয়ে দেহ উপভোগ করা। সে জেগে থাকবে যতক্ষণ না ওরা ফিরে আসে।

ঘড়িতে এখন বারোটা পাঁচ। এই ফ্লাটে বসে থাকলে কলকাতায় কোথায় কি হচ্ছে বোঝা অসম্ভব। যতক্ষণ না কেউ তোমার দরজার বোতামে হাত না দিচ্ছে ততক্ষণ তুমি জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। জয়িতা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। নিচে হট ট্রাক চলছে। দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজের সঙ্গে পুরুষকণ্ঠে উঁচু গলায় সুরেলা চিৎকার ! অনেকটা দূর এখানে দাঁড়ালে চোখে পড়ে। অন্ধকারের গায়ে টুকটাক আলোর বিন্দু বসানো। এ পাড়া অর্থবানদের, এত রাত্রে তারাই জেগে থাকে যাদের কাছে ঘুম মানেই এক ধরনের মৃত্যু।

বাবা ওই ঐন্ড্রিলা দত্তের সঙ্গে ঘুমিয়েছেন—এই সংবাদে সে বিচলিত হচ্ছে কেন ? উল্টোটাই বা ভাবছে না কেন ? কেউ তো ফোন করে বলতে পারত তোমার মান্নের সঙ্গে একটু-আর্গে ঘুমিয়ে নিলাম। কেউ বলেনি কিন্তু এমনটা যে ঘটছে না কে বলতে পারে ! মা সেদিন কাউকে সান্যাল লোকটা সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। মজার ব্যাপার হল ওই সান্যালকে সবাই চায়। মাও। যতই ফোনে ন্যাকামি করুক মা সান্যালের সঙ্গে মিশলে ও বিয়ে করতে চাইতে পারে, কিন্তু মা জানে সবাই জানে সান্যাল কখনই বিয়ে করবে

না। যে কোন মেয়েকে সান্যাল বলে, ইউ আর ফ্রেণ্ডস অ্যাণ্ড দ্যাটস অল। মিলি আন্টিকে একবার মাকে বলতে শুনেছিল সে। তখন মিলি আন্টির সঙ্গে এবাড়ির সম্পর্ক ভাল ছিল। স্নোজ বিকেলে কেচ্চার আসর বসত। মিলি আন্টি বলেছেন, সান্যাল একটা চীজ। তোমার সঙ্গে শোবে, উপকার করবে কিন্তু সম্পর্ক চাইলে বলবে, ড্রোস্ট এক্সপেক্ট এনিথিং ফ্রম মি। উই আর ফ্রেণ্ড। আর মেয়েগুলোও স্নেহময়, ওকে দেখলেই হামলে ওঠে। তোমার মেয়েটাকে সামলে রেখ। ও মা মেয়ে কাউকে বাদ দেয় না।

এই ইঙ্গিতটাই হল কাল। মিলি আন্টির সঙ্গে মায়ের সম্পর্কে চিড় ধরল। কারণ তখন সান্যাল আঙ্কলের সঙ্গে মায়ের খুব ভাব। বাড়িতে কোন স্পেশ্যাল ডিশ হলেই সান্যাল অঙ্কল আসে। রামানন্দ রায়ই ফোন করে ডেকে আনেন। কিন্তু একথা ঠিক সান্যাল আঙ্কল তার দিকে কোনদিন তাকাইনি। হেসে দু-একবার হা-ই বলেছেন মাত্র। এই সান্যাল আঙ্কল তো দিনদুপুরে এ বাড়িতে আসতেন যখন রামানন্দ রায় বাইরে থাকতেন। সেসময় নিবিড় আলোচনার জন্যে মায়ের দরজা বন্ধ থাকতো। দরজা খুললে সান্যাল আঙ্কল আর দাঁড়াতো না। ব্যাপারটা কেউ তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি বলেই কি তার এমন খারাপ লাগেনি যেমন বাবার ক্ষেত্রে লাগছে। চোখ বন্ধ করল জন্মিতা। বছর বারো আগেও, রামানন্দ রায়কে হাম না খেতে পারলে তার হুম হত না। বাবার গায়ের গন্ধটা যে কি ভাল লাগত। দাঁড়িপাল্লায় দুজনেই সমান। সুদীপের কথা শোনাই উচিত কাজ হবে।

সীতা রায়দের এই পৃথিবীটা অজুত। কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। প্রতিনিয়ত এ ওর নামে কেচ্ছা ছড়াচ্ছে। অথচ প্রত্যহ একসঙ্গে জড় হয়ে মদ না খেলে এদের চলেও না। বিত্তবান মানুসগুলো ভদ্রতার মুখোশ পরে সর্বক্ষণ সুযোগের সন্ধান খাকে কি করে পরস্পর প্রেমহীন শরীরখনন করা যায়। সেখানেই তাদের তৃপ্তি। সেই চাবিবদলের গল্পটা তো এখন প্রত্যেকের জানা। পার্টিতে শুধু স্বামীস্ত্রীদের প্রবেশাধিকার। মদ খেতে খেতে এ ওর স্ত্রীর সঙ্গে যতটা সম্ভব খেজুরে-ঘনিষ্ঠতা করার পর টেবিলের ওপর প্রত্যেকের গাড়ির চাবিগুলো রাখা হয়। এবার স্বামীরা একে একে একটা চাবি তুলে নেন। যার ভাগ্যে যে গাড়ি ওঠে তার মালিকানকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন ভাগ্যবান। এসব তো সে শুনেছে। কিন্তু কখনও আজকের মত উত্তেজনা আসেনি মনে-শরীরে। এ শুধু সরাসরি তার মুখে শব্দগুলো ছুঁড়ে মারা হল বলে? জন্মিতা ধীরে ধীরে মায়ের ঘরে এল। সীতা রায় এক ঘরে বাস করেন না। যদিও মাঝখানে দরজা আছে কিন্তু সেটা বছরের কোন রাত্রে খোলা হয় কে জানে। এখনও বন্ধ। কিছুদিন হল জন্মিতা এই ঘরে আসেনি, রামানন্দের ঘরেও যায়নি।

সীতা রায়ের ঘরে ঢুকলেই মিষ্টি কিন্তু হালকা গন্ধ পাওয়া যায়। আর

ও গন্ধটার মতনই সমস্ত ঘরটি চমৎকার সাজানো। কোথাও বাড়তি নেই, অগোছালোপনা নেই। এই ঘরে বই নেই তবে অজস্র ম্যাগাজিন আছে। দেশি বিদেশি মেয়েদের ম্যাগাজিন যেগুলোতে শরীর সাজানোর নানান প্রক্রিয়া দেওয়া আছে। আয়নার পাশে সীতা রায় দাঁড়িয়ে আছেন। ও ছবির বয়স কত তা টের পাওয়া শিবের অসাধ্য। গত সপ্তাহ কিংবা দশ বৎসর আগের যে কোন সময়ের হতে পারে।

জন্মিতা সীতা রায়ের ম্যাগাজিন তুলে নিল। এটাই লেটেস্ট। বিশ্বসুন্দরীর ছবি ওপরে ছাপা। দু তিনটে পাতা ওলটাতেই একটা ছোট্ট কার্ড পড়ে গেল নিচে। পেজমার্ক করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল ওটাকে। কার্ডটা তুলতেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল জন্মিতার। প্যারাডাইস! এই জামপটার কথাই কদিন থেকে ওদের মধ্যে আলোচনায় এসেছে। আনন্দের কাছ থেকে খবরটা শোনার পর থেকেই সুদীপ টগবগ ফুটছিল। ডাল্লমণ্ডহারবার রোডের ওপর একটা বিশাল চত্বরে গজিয়ে ওঠা প্যারাডাইসকে দেখেও এসেছে ওরা। কিন্তু মায়ের কাছে এই কার্ডও এসে গেছে! চমৎকার! সুদীপের গলা মনে পড়ল। একটু আগেই টেলিফোনে সুদীপ জানিয়েছে, প্র্যাক্টেড। জন্মিতা একবার ভাবল কার্ডটাকে সরিয়ে ফেলবে কিনা। তারপর মনে হল প্যারাডাইসের হৃদিস যদি সীতা রায়ের জানা হয়েই থাকে তাহলে এই কার্ডটা না পেলেও তার চলে যাবে। সীতা রায়কে সে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারবে না।

ঠিক এই সময় বেল বাজল। তীব্র এবং কর্কশ। যত রাত বাড়ে তত শব্দটা ওইরকম হয়ে যায়। জন্মিতা চটপট নিজের ঘরে ফিরে এল। ওদের কাছে চাবি আছে, নিজেরাই দরজা খুলে ভেতরে চলে আসতে পারে তবু বেল বাজবে। এই সময় শ্রীহরিদা উঠবে না এবং সে নিজে দরজা খোলে না। বোধহয় রামানন্দ রায় নিজের উপস্থিতি সোচ্চারে জানাতে চান।

দরজা বন্ধ করে রামানন্দ রায় বললেন, ‘ও ডাল্লিং, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।’

সীতা রায় একবার মেয়ের ঘরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিবিচার গলায় বললেন, ‘সারা সন্ধ্যের ক্রাউড তোমার চেয়ে অনেক অ্যাডভান্সড।’

‘মানে?’

‘ওরা এই কথাটা সন্ধ্য থেকে বলছে, তুমি রাত দুপুরে।’

‘আই সি। বেটার লেট দ্যান নেভার।’

‘থ্যাক্সস।’ সীতা রায় গম্ভীর ভঙ্গীতে নিজের ঘরের দিকে এগোলেন। রামানন্দ একটু টললেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর বললেন, ‘ডাল্লিং গুড নাইট!’

সীতা রায় যেন আরামবোধ করলেন কথাটার। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসি হাসলেন তিনি। তারপর রামানন্দ রায়ের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, ‘এই জন্যেই তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি ঠিক বুঝতে পার কখন আমি ডিস্টার্বড হতে চাই না।’

‘সেম টু ইউ । আই অ্যাম রিয়েলি টায়ার্ড টুনাইট ।’

‘মি টু উ—উ উ । আই লাভ ইউ ডিয়ার ।’

‘মি টু উ—উ । আমরা কি একটা কিস-এর কথা ভাবতে পারি ?’

‘ও নটি, দ্যাটস অল ফর দ্য নাইট, না ? আমি তোমার প্রশংসা করলাম একটু আগে ।’

‘আমিও ।’

এর অধর কপোল স্পর্শ করল কি না-করল দুজনেই তৃপ্ত ভঙ্গীতে দুটো দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন । ঠিক সেই সময় জয়িতা তার দরজায় এসে দাঁড়াল ।

‘তোমাদের একটা ফোন এসেছিল ।’

দুটো মানুষই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন । রামানন্দ রায় বললেন, ‘আঃ, তুমি এখনও জেগে আছ ? না না লেট নাইট করা ঠিক নয় ।’ তাঁর স্বরে জড়তা যাচ্ছিল না ।

সীতা রায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের মানে ? কার ফোন ? কে ফোন করেছিল ?’

‘একজন মহিলা । ভদ্র বলতে বাধছে ।’

‘হোয়াট ! অভদ্র মহিলা আমাকে চাইবে কেন ?’ সীতা রায়ের গলায় উদ্ভা ।

‘কারণ তিনি কিছু সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন ।’

এবার রামানন্দ রায় বললেন, ‘আঃ, কি হেঁস্লামি করছ ? চটপট বল । ঘুম পাচ্ছে ।’

জয়িতা বলল, ‘ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি আমাকে নাকি মেয়ের মত স্নেহ করছেন । এই স্নেহপ্রবণতা তাঁর মনে এসেছে কারণ তিনি ফোন করার একটু আগে তোমার সঙ্গে—’

কথাটা শেষ করতে পারল না জয়িতা । তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল ।

‘ইজ ইট ?’ সীতা রায় স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, ‘হ ইজ শী ?’

রামানন্দ রায়কে হতভম্ব দেখাল, ‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ।’

‘ইউ স্লেপট উইথ মিসেস দত্ত ?’ সীতা রায় চিৎকার করে উঠল ।

‘হ টোল্ড ইউ ?’

‘স’ন্যালা আমাকে বলেছে । তুমি ক্লাব থেকে কেটে পড়ার সময় সান্যাল আমাকে বলেছে । আমি সান্যালকে বিশ্বাস করিনি তখন । ওঃ !’

‘ন্যাকামি করো না । ইউ বিচ ! ইউ হ্যান্ড বিন ডিচ্‌ড বাই সান্যাল ।’

‘নো ! সান্যাল সম্পর্কে কিছু বলার রাইট তোমার নেই ।’

‘বিকজ ইউ লাইক হিম ! হি ইজ—’ আমি জানি না তুমি কার কার সঙ্গে কি কর !’

‘চুপ করো । কি করে সাহস পায় ওই মেয়েছেলেটা বাড়িতে ফোন করার ।’

চমৎকার ! সে আমার মেয়ের মা হয়ে গেল কারণ তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছ !'
'ইউ কান্ট প্লুভ ইউ? ক্যান ইউ? কোন মেয়ে ফোন করে সত্যি কথা বলে না। বাট আই ক্যান প্লুভ ! আমি প্রমাণ করতে পারি তুমি কার কার সঙ্গে হারাও !'

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে ছুটে গেলেন সীতা রামানন্দ রায়ের কাছে, 'প্রমাণ কর। মেয়েরা যদি পাকৈও নামে তাহলে তাদের গায়ে কাদা লাগে না। কারণ তারা তেল মেখে নামে। কিন্তু তুমি—তুমি ইউ ফুন—তোমার শার্টের পেছনে লিপস্টিকের চাপ। দ্যাট হোর তোমার শার্টে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে নিজের র্তোটে।'

এই মুহূর্তে রামানন্দ রায় চুপসে যাওয়া বেলুনের মত হয়ে গেলেন। দৃশ্যটা আর দেখতে পাচ্ছিল না জয়িতা। রামানন্দ মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বললেন, 'জয়ি, বিশ্বাস করো না, শী ডিড ইউ। লিপস্টিকের ছাপ ওর।'

সীতা রায় চিৎকার করলেন, 'নো। জয়ি, হি ইজ আ লায়ার। ডোন্ট বিলিভ হিম।'

জয়িতা দুজনের দিকে তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'এত রাত অবধি কেনো জেগে আছি জানো। আমি তোমাদের একটা কথা জানাতে চাই !'
দুজনেই কোন উত্তর দিল না।

জয়িতা হাসল। তারপর দরজার দুটো পাল্লা বন্ধ করার আগে বরফগলায় উচ্চারণ করল, 'আমি তোমাদের ঘোমা করি।' বন্ধ দরজার এপিঠে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ পর প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

॥ ২ ॥

জয়িতার সঙ্গে কথা বলে সুদীপ ব্যালকনিতে এল।

ওদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা বেশ চওড়া। যেহেতু রাত এখন বেশ তাই লোকজন নেই বললেই চলে। ঠাকুরের পানের দোকানটা অবশ্য খোলা। আশেপাশের বাড়ির রাঁধুনেরা এখন ওখানে আড্ডা মারছে। ও পাশের রকটায় দু'জন দাবা খেলছে রাস্তার আলোয়। এ ছাড়া আর কোন প্রাণের অস্তিত্ব নেই। মাঝে মাঝেই হসহাস গাড়ি ছুটে যচ্ছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। সুদীপ ভাল করে লক্ষ্য করল। না, কোন অপরিচিত মুখ সে দেখতে পেল না। কেউ সন্দেহজনক ভঙ্গীতে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে নেই।

অথচ তার খোঁজে নাকি দুবার লোকটা এসেছিল। কার্তিকদার বর্ণনা মত সে কোন চেনা লোকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছে না। কার্তিকদার বয়স হয়েছে, ওলট-পালট হয়ে যায় সব। কিন্তু দুবারে বলার সময় যে মিলগুলো

পেয়েছে সেরকম কোন মানুষকে চেনে না সুদীপ। তাছাড়া লোকটা এসেছিল তখন যখন বাড়িতে সে ছিল না, বাবাও নয়। দুবারই। অশ্বস্তিটা লেগে আছে শোনার পর থেকেই। আনন্দের হোস্টেলেও একই কাণ্ড ঘটেছে। আনন্দ আজ রাস্তায় হাঁটার সময় বারংবার পেছন ফিরে তাকিয়েছে। তার সম্ভেদ ছিল কেউ বোধহয় অনুসরণ করছে। কিন্তু সুদীপ বলেছিল তারা এমন কোন কাজ করেনি যে এমন কাণ্ড ঘটবে অথচ বাড়িতে এসে কাতিকদার কাছে শোনার পর আনন্দের কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। এত রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই। আনন্দের হোস্টেলে ফোন থাকলেও সুপার এত রাত্রে ডেকে দেবে না। কল্যাণের বাড়িতে টেলিফোন নেই। জন্মিতা তো নিজেই করল। সুদীপ আশংকা করেছিল ওর ওখানেও বোধ হয় কেউ হানা দিয়েছে। জন্মিতার যে সমস্যা সেটা ওর অনেকদিনের দেখা। এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কি দরকার! তবে এটা খুব চমকপ্রদ ঘটনা মানতেই হবে। যে মহিলাটি জন্মিতাকে ফোন করে বলেছেন তিনি আজ ওর বাবার সঙ্গে শুয়েছেন তিনি নমস্যা। ওঁকে দেখতে হচ্ছে হচ্ছে। অবশ্য যদি উদ্রমহিলা হন।

জন্মিতার বাড়ির আবহাওয়াটা তো এখন কলকাতার ওপর মহলে উঠে যাওয়া বা উঠতে চাওয়া পরিবারের। ওখান থেকেই বেরিয়ে এসেছে যখন জন্মিতা তখন ওদের জন্যে এত আপসেট হয় কেন ও মাঝে মাঝেই, কে জানে! একমাত্র ওই একটি ব্যাপার ছাড়া জন্মিতার কোন ব্যাপারে জড়তা নেই। জড়তা? সুদীপ শব্দটা নিয়ে দু'চারবার নাড়াচাড়া করল। জড়তা তার নিজের নেই? অজস্র ব্যাপারে অকারণ আড়ষ্টতা আসে কেন?

সুদীপ নিজের ঘরে ফিরে এল। কীটসব্যাগ নয়, ত্রিপলের একটি লম্বা ঝোলা আছে সুদীপের। দীপু মামা এনে দিয়েছিল জার্মানী থেকে। বেশ মজবুত, দেখতেও খারাপ নয়। এতকাল সেটা পড়ে থাকত চ্যাপ্টা হয়ে। এখন ফেঁপে ফুলে চমৎকার দেখাচ্ছে। বেশ কিছুকাল যাতে স্বচ্ছন্দে থাকা যায় এমন জিনিসপত্র ওতে ভরা হয়ে গেছে। যে কোন সময় নোটিস এলেই বেরিয়ে পড়তে পাড়ে সুদীপ। হাওয়া ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

এই বাড়িটা সুদীপের বাবা অবনী তালুকদারের। হাইকোর্টের নামজাদা উকিল। বিশাল বাড়িটার তিনজন মানুষকে নিয়ে বেশ কয়েকজন ষি চাকর আরাম করে আছে। খাবার টেবিল ছাড়া সুদীপের সাহায্যে ওরা তেমন লাগে না। এই যে আজ একটা লোক দুবার এল, এরা তার নাম ঠিক না জেনে নেওয়ার বুদ্ধিটুকুও ধরে না। সুদীপের অশ্বস্তি কিছুতেই কাটছিল না।

অবনী তালুকদার সুদীপের সঙ্গে কথা বলেন না। মাস ছয়েক হল বাক্যালাপ বন্ধ। সুদীপ আশংকা করেছিল তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হবে কিন্তু অবনী তালুকদার সেটা বলেননি। তবে সমস্ত খরচ-খরচা দেওয়া বন্ধ

করেছিলেন। সুদীপের অবশ্য এখন পর্যন্ত তাকে কিছু আটকাচ্ছে না। খরচ বলতে সিগারেট, বাস ভাড়া, চায়ের দাম আর কলেজের মাইনে। জমানো টাকায় সেটা চলে যাচ্ছে আপাতত। তবে সে নিজে যেমন তেমন অবনী তালুকদারও চেষ্টা করেন যাতে পরস্পরের মুখোমুখি না হন। ওকালতি যাঁরা করেন তাঁরা তো বুদ্ধিমান হবেনই। অবনী তালুকদার তার চেয়ে বেশ বেশী কিছু মাথায় ধরেন। এমন বিষয়াসক্ত মানুষ সুদীপ গল্প উপন্যাসেও পড়েনি। আর সেই আশঙ্কিতে গুদ্রলোক একটার পর একটা একনম্বর-দুনম্বর কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। তেজারতি কারবার তো আছেই, গুদ্রলোকের মনে দয়া-মায়্যা-ভালবাসা বলে কোন বস্তু নেই, ছিল কিনা তাতেও সন্দেহ। তবে কর্তব্যজ্ঞান ছিল। ছয় মাস আগে প্রতিটি সকালে তিনি সুদীপকে প্রশ্ন করতেন, ‘সব ঠিক আছে? আমি চাই তুমি বড় হয়ে আমার প্র্যাকটিশে আসবে। তোমার জন্যে যে সোনার খনি রেখে যাচ্ছি তা কোন বাপ তার ছেলের জন্যে রেখে গেলে ধন্য হতো সেই ছেলে। যাও।’ একদম মালা জপার মত একই শব্দাবলী রোজ আঙড়ে যাওয়া। কথাগুলো শোনার সময় শেষের দিকে হাসি পেত সুদীপের। ছয় মাস আগে সেটা চুকে গেল। চুকিয়ে দিল সুদীপ।

অবনী তালুকদার আর একটি কর্তব্য নিয়মিত করে থাকেন। হাইকোর্টের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পর প্রথমেই চলে যান স্ত্রীর দরজায়। ঘরে ঢোকেন না, যেখানে দাঁড়ান সেখান থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। বেশীর ভাগ দিনই নার্স জবাব দেয়। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান তিনি নিজের ঘরে। হ্যাঁ, স্ত্রীর জন্যে অবনী তালুকদার নার্স রেখেছেন। আন্না রাখলে অনেক কম খরচ হত। প্রত্যেক সপ্তাহে ডাক্তার আসেন। ডাক্তারের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন। স্ত্রীর শরীরের জন্যে পয়সা খরচ করতে কোন দিন কার্পণ্য করেননি। এসবই তাঁর কর্তব্যপালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত হবে।

আজ রাত্রে অবনী তালুকদার ফিরবেন না। খবরটা জেনেছে সুদীপ কাঠিকদার কাছ থেকে। সচরাচর অত্যন্ত লাভজনক মামলা না পেলে কলকাতা ছেড়ে নড়েন না অবনী তালুকদার। আজ নিশ্চয়ই শিকারটা বড় মাপের, না হলে পাটনায় যাবেন কেন? অতএব সেই দিক দিয়ে বাড়িটা খালি। অবনী তালুকদার থাকলেও কোন অস্তিত্ব বোঝা যেত না। বরং ঝি-চাকরদের ওপর হুকুম জারি আছে কেউ যেন গলা তুলে কথা না বলে। সবসময় একটা শান্তি পরিবেশ বাড়িতে পেতে চান অবনী তালুকদার। ঠিক দশটায় সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। সুদীপের অবশ্য ইদানীং তাতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। সদর বন্ধ হয়ে গেলে সুদীপ পেছনের পাঁচিল উপক্কে ভিতরে চলে আসে। কাঠিকদার দরজা খোলাই থাকে। সেইটে দিয়ে দোতলায় উঠে আসতে কোন অসুবিধে নেই। অবনী তালুকদার যে

ব্যাপারটা জানেন না তেমন ভাবার কোন কারণ নেই। এই বাড়ির প্রতিটি ইঁট কাঠ যে কিভাবে আছে সে হিসেব তিনি নিত্য রাখেন।

সুদীপ দোতলার হলঘরে এল। খি চাকররা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে। মাঝে মাঝে সামনে রাস্তায় ছুটে যাওয়া গাড়ির শব্দ ছাড়া এই বাড়ি এখন একদম চুপচাপ।

মায়ের ঘরটা একদম কোণায়। দরজায় এসে দাঁড়াতেই হালকা নীল আলোয় ঘরটাকে দেখতে পেল। মা গুয়ে আছেন খাটে। একটা হালকা চাদর তার গলা পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া। যেহেতু এখন মায়ের শরীর ওপাশফেরানো তাই এখান থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

সুদীপ কল্পে পা এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াল। মায়ের বিছানার ওপাশে একটা লম্বা ডেক চেয়ারে গুয়ে আছেন একজন মহিলা। মাথাটা এক পাশে হেলানো চোখ বন্ধ। কোলের ওপর একটি রপিন সিনেমা পত্রিকা খুলে উপুড় করে রাখা। সেখানে বোম্বের একজন সুন্দরী শরীর আধখোলাকরুমদির হাসছে। সুদীপ বুঝল এই নার্সটি নতুন। বাবার নির্দেশে মায়ের নার্স প্রতি মাসেই বদলে যায়। এ ব্যাপারে অবনী তালুকদারের খিওরি হল, অসুস্থ মানুষের সেবা কেউ দীর্ঘকাল করলে একঘেয়েমি আসতে বাধ্য এবং সেটা এলে সেবায় গাফিলতি দেখা দেবে। অতএব নতুন নতুন নার্স চাই। এই মহিলাটিকে সুদীপ আগে দ্যাখেনি। শেখবার এই ঘরে এসেছিল সে তিনদিন আগে। মা অসুস্থ হওয়ার পর নিত্য দু'বেলা আসতো সে। কিন্তু এখন—! সুদীপ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। নিজের এই পরিবর্তনের পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পায়নি। হয়তো দীর্ঘকালীন অসুস্থতা এক ধরনের বিরক্তি উৎপাদন করে কিংবা প্রতিনিয়ত একই যন্ত্রণার প্রকাশ দেখে দেখে তার গুরুত্ব কমে যায়। আর যে কারণটা সেটা তো ছয় মাস আগেই ঘটেছিল। মা কখনও প্রতিবাদ করতে শেখেননি। তিনি যতই অত্যাচার করুন, স্বামীর সামনে চোখ তুলে রূঢ় কথা বলা ধুঁষ্টতা। মায়ের টিপি ক্যাল দাসসুলভ মনোভাব সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। মায়ের সঙ্গে একসময় এই ব্যাপারে অনেক কথা বলেও সে একটি জবাব পেয়েছে, 'কি হবে, আমার তো যা হবার তা হয়েছে গেছে, মিছি মিছি ওই মানুষটাকে কণ্ট দিয়ে কি হবে! গুরুতেই যখন সব মেনে নিয়েছি—।'

মাকে কখনও শ্রদ্ধা করেনি সুদীপ। মাকে সে ভালবাসত একটা নরম স্নেহপ্রবণ অনুভূতির জন্যে। অসহায় মানুষটি জানেন না তাঁর গভী কি, নিজেকে উজার করে দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়ান, দেওয়াটা ঠিক হলো কিনা, যদি সে রাগ করে! এমন মানুষের প্রতি মায়া জন্মায়, মায়া থেকে ভালোবাসাও আসে কিন্তু শ্রদ্ধা যদি তার সঙ্গে না মেশে তাহলে সেই ভালোবাসা একসময় ফিকে হয়ে যেতে বাধ্য। মায়া আর করুণা কি এক? সুদীপ জানেন না। কিন্তু মায়ের জন্য তার কণ্ট হত। অবনী তালুকদারের

বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে মা কেন এমন কুঁকড়ে থাকবেন। কিন্তু এতো গেল ভেতরের ব্যাপার। মায়ের শরীর নিয়ে প্রাথমিক দুশ্চিন্তা এবং কণ্ঠের সময়টুকু পার হয়ে গেলে সে যখন জেনেছিল আর কখনও সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই তখন থেকেই নিজের অজান্তে মনের রাশ তিলে হতে শুরু করেছিল। তিকঠাক চিকিৎসার নামে তদারকি চলছে, নার্স আছে, ব্যাস। মায়ের যন্ত্রগুলো শরীরের বিভিন্ন উপসর্গগুলো বারংবার একই চেহারা নিয়ে আসছে ফিরে যাচ্ছে। এ থেকে যখন আর কোন পরিব্রাণের আশা নেই তখন অনুভূতির চামড়া একটু একটু করে মোটা হয়ে গেল। একমাত্র মৃত্যু সংবাদ ছাড়া মা আর কোন আলোড়ন তুলতে পারবেন না। এবং সেটাও একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ার মত, সত্যি বড় কণ্ঠ পাচ্ছিল। এভাবে বেঁচে মরে থাকার চাইতে অনেক আগেই চলে গেলে তের বেশী বেঁচে যেত।

অতএব ব্যাপারটা এমনভাবে ভেবেছে সুদীপ। প্রিয়জন, সে যতই প্রিয় হোক না কেন, অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং সে অসুখে জীবনহানির সম্ভাবনা থাকলে তো বটেই, মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিকারের জন্যে। হয়তো শেষ সম্বল ব্যয় করতেও কার্পণ্য করে না। কিন্তু যদি সেই অসুস্থতা দীর্ঘকালীন হয়, যদি কোনদিন সুস্থ হবার সম্ভাবনা না থাকে তখন একসময় দায় বলে মনে হতে বাধ্য। কেউ মুখে বলেন, কেউ ব্যবহারে প্রকাশ করে ফেলেন, কেউ বলেন না বোঝেন না কিন্তু মনে মনে জানেন মুক্তি পেলে ভাল হত।

সুদীপ খাটের এ-পাশে চলে এল। যত দিন যাচ্ছে তত মায়ের শরীরটা ছোট হয়ে আসছে। মুখ বসে গিয়েছে, চোখ কোটরে। কিন্তু চুলগুলো প্রায় একই রকম আছে। হয়তো নিয়মিত স্নান হয় না বা তেল মাখানো সম্ভব হয়নি বলে ফুলে-ফেঁপে একাকার। একটা মানুষের চেহারা পাল্টাতে পাল্টাতেও তো কিছুটা থেকে যায়। সেই থেকে যাওয়া শরীর নিয়ে মা এখন গুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। মাঝে মাঝে শরীরটা কাঁপছে।

‘বসুন।’

সুদীপ চমকে ফিরে তাকাল। মহিলার মুখে একটু বিরত হাসি, হাত বাড়িয়ে ডেক-চেয়ার দেখিয়ে দিলেন তিনি। সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘কেমন আছেন এখন?’

‘আছেন এই পর্যন্ত। সমস্ত শরীরে বেডসোর হয়ে গেছে। কিন্তু পাউডার দিচ্ছি কিন্তু—। আসলে উনি যদি বসতেও পারতেন তাহলে—।’

‘বেডসোর সে তো সেবে গিয়েছিল।’

‘প্রথমবার হয়ে সেরে যায়। কিন্তু আবার হলে সামলানো মুশকিল। সেইটাই হয়েছে। দেখবেন?’ সুদীপ কিছু বলার আগেই মহিলা এগিয়ে গিয়ে মায়ের শরীর থেকে চাদর সরিয়ে নিল খানিকটা। আর চমকে উঠল সুদীপ। হাটুর ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত চাপ চাপ লাল ঘা বীভৎস হয়ে আছে।

মহিলা চাদর নামিয়ে দিলেন। ‘এ-পাশ ফিরিয়ে গুইয়ে রেখেছি কারণ ওদিক-

টায় সামান্য কম। কিন্তু বেশীক্ষণ এভাবে রাখাও যাবে না। ওঁর যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে কি বলব।’

‘ডাক্তারবাবুকে বলেছেন?’

‘আমি আসার পর একবারই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দিনে যিনি থাকেন তিনি বললেন, ডাক্তারবাবু বলেছেন ওষুধ দিতে। বিশেষ কিছু করার নেই। আপনি বসুন না।’ এবার মহিলা আর একটা চেয়ার এনে কাছে রাখলেন। সুদীপ বসল। নার্স মহিলা বোধহয় অনেকক্ষণ কথা না বলে হাঁপিয়ে উঠে-
ছিলেন এবং কথা বেশী বলাই বোধহয় স্বভাব, ‘খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন। এরকম কেস তো আমি আগে দেখেছি। কেউ কেউ বছরের পর বছর কষ্ট পেয়ে পেয়ে তবে যেতে পারেন।’

‘উনি আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন?’

‘হ্যাঁ। তবে স্পষ্ট বলতে পারেন না তো। খনখনে হয়ে গেছে গলার স্বর। আর কথা বলতেও কষ্ট হয়। তবে এর মধ্যে মজার কথাও বলেছেন।’
‘কিরকম?’ সুদীপ অবাক হল।

‘এই তো আজ বিকেলে এলে বললেন, ‘তুমি এলে ভাল লাগে। বেশ দেখতে ভাল তুমি। আমি মনে মনে হেঁসে বাঁচি না। আমাকেও নাকি ভাল দেখতে!’
সুদীপ উদ্ভ্রমহিলার দিকে তাকাল। একটু লাজুক অভিব্যক্তি, চোখে চোখ পড়তে মুখ নামালেন। মধ্য তিরিশে শরীর যথেষ্ট যৌবনবতী। সে বলল,
‘মাকে কি ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে?’

‘হ্যাঁ। না হলে যে ঘুমুতেই পারেন না। এত যন্ত্রণা নিয়ে বিনা ওষুধে কি ঘুমানো যায়?’

‘ও!’ সুদীপ বুঝল এখন এই ঘরে বসে কোন লাভ নেই। নিশ্চয়ই ঘুমের ওষুধের পরিমাণটা বেশ না হলে অমন নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে পারে না কেউ। মানুষের জীবনীশক্তি কখনও কখনও বিস্ময় ছাড়িয়ে যায়। তিনবার সিরিয়াস অ্যাটাক হয়ে গেছে। একসময় ব্রেন কাজ করছিল না, সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল। ম্যাসেজ করে চিকিৎসায় থেকে থেকে শরীরে সামান্য সাড় এল, মুখে আবার কথা ফুটল। কিন্তু প্রেসার নিয়ত এমন কম বেশী হতে লাগল যে চতুর্থ অ্যাটাকের জন্য তৈরি ছিল ওরা। এবং সেটাই শেষবার একথা সবাই জানত। তার বদলে স্লাড ইউরিয়া বাড়ল। যাবতীয় রোগ এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখন সব ছেড়ে শুধু বেডসোর নিয়ে দৃশ্চিন্তা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এক একটা রাত আগে এমন কেটেছে যে ভোর হবার আগেই মা চলে যাবেন বলে মনে হত। অথচ এইভাবে বেঁচে মরে থাকতে হচ্ছে!

সুদীপ উঠল, ‘আপনি থাওয়া-দাওয়া করেছেন?’

‘হ্যাঁ। ফ্রান্সে চা রেখেছি, খাবেন?’

‘না। আপনি বসে থেকে কি করবেন। উনি যখন উঠবেন না তখন শুয়ে

পড়ুন।

‘আমাদের কি গুলে চলে। পেসেন্ট ঘুমের ঘোরে পেছাপ পায়খানা করে ফেলতে পারে। জেগে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।’ মহিলা হাসলেন।

সুদীপ মনে মনে বলল, সে তো দেখতেই পেয়েছি ঘরে চোকার সময়। সে যাওয়ার সময় বলল, ‘ঠিক আছে। কাল সকালে এসে মাগ্নের সঙ্গে কথা বলব।’

মহিলা বললেন, ‘যদি কোন কারণে রাত্রে ঘুম ভাঙে তাহলে খবর দেব?’

কোন জরুরী ব্যাপার নয় তবু সুদীপ না বলতে পারল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুদীপের দৃষ্টি গেল অবনী তালুকদারের ঘরের দিকে। দরজাটি বন্ধ। পর্দা ঝুলছে। দরজায় তালা না দিয়ে কি অবনী তালুকদার পাটনায় যাবেন? বিশ্বাস হয় না। সুদীপ এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা সরাল। তার অনুমানে ভুল হয়নি। পিতৃদেব এত বড় ভুল করবেন না। অভিজ্ঞতা থেকেই তো মানুষ শিক্ষা নেয়।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ? সুদীপের হঠাৎে হাসি ফুটল। অসম্ভব। কোন দিন কি কেউ নেয়? নেওয়ার চেষ্টা করে মাত্র। নিতে গেলে অনেক কাজ পৃথিবীতে কেউ কোনদিন শেষ করতে পারত না। সাতষষ্ঠি থেকে একান্তরে এদেশে যে উদ্যোগের জন্ম এবং মৃত্যু হয়েছিল তা থেকে পাওয়া শিক্ষা থেকে এদেশে কেউ কখনও বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষের চেহারা পাল্টাতে চাইবে না। কিন্তু—

সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল তালাটা ভাঙতে। অবশ্য তালা ভাঙলেই কিছু পাওয়া যাবে? কিছুদিন আগে একদিন সকালে অবনী তালুকদার যখন কোর্টে বেরুবেন, সুদীপ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ, ঠিক তখনই বাড়িটা ঘিরে ফেলেছিল পুলিশের সাহায্যে আয়কর বিভাগের লোকজন। খুব কৌতুক বোধ করছিল সুদীপ যখন আয়কর অফিসার বলেছিলেন বাড়ির সবাইকে একটি ঘরে অপেক্ষা করতে যতক্ষণ অনুসন্ধান শেষ না হয়। সেই সময় তদন্তকারী অফিসার জানতেন না একজনের পক্ষে বিছানা ছেড়ে ওঠাই সম্ভব নয়। অবনী তালুকদার খুব চেষ্টামেচি করেছিলেন। ব্যাপারটা আদালতে তুলবেন বলে হুমকিও দিয়েছিলেন কিন্তু ব্যাপারটা এত নির্দিষ্ট আইনী যে তাঁকে সব হজম করতে হয়েছিল। বাড়ি ঘেরাও হচ্ছে দেখে প্রথমে সুদীপ নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছিল। যদিও ওই সময় সে এমন কিছু করেনি যে তার ওপর পুলিশের নজর পড়বে কিন্তু যোগাযোগ থাকার অভিযোগ তো থাকতেই পারে। একান্তরের অনেক গল্প শোনা এবং পড়া ছিল। চকিতে মনে হলেছিল পেছনের পথ দিয়ে পালাবে কি না। সেই সময় উত্তেজিত হয়ে অবনী তালুকদারকে ছুটে আসতে দেখেছিল সে। কপালে ঘাম জমেছে। মুখের রঙ একেবারে কালো। তাকে দেখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, ‘শোকা আমাকে তুই বাঁচা। সেভ-মি। ইনকামট্যাক্স রেইড করেছে।

এইরকম চেহারায় অবনী তালুকদারকে দেখে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সুদীপ। তবু জিজ্ঞাসা করছিল শক্ত হয়ে, 'আমি কি করব?'

'এই ব্যাগটাকে সরিয়ে ফেল। ওরা যেন টের না পায়। কুইক!'

'কি আছে ওত?'

'যাই থাক, তোমার তাতে কি? ব্যাগটাকে লুকিয়ে রাখ, ওরা চলে গেলে ফেরত চাই।' ছেলের হাতে সেটাকে ধরিয়ে হস্তদত্ত হয়ে ফিরে গেলেন অবনী তালুকদার। নিচে তখন হেঁচ হেঁচ। অবনী তালুকদার অফিসারদের ওপর তড়পাতে গুরু করেছেন। সুদীপ ব্যাগটা খুলতে গিয়েও খুলল না। কিভাবে ব্যাগ পাচার করবে সেটা অবনী বলেননি। পেছনের দরজায় তো পুলিশ থাকতে পারে। সে ব্যাগটাকে তুলে হলঘরের টেবিলের উপর রেখে দিল। এবং তারপরেই অফিসাররা উঠে এলেন। একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

'আমি সুদীপ।'

'অবনী বাবুর ছেলে?'

নীর্বে মাথা নেড়েছিল সুদীপ। এখন হলে কি করত সে জানে না।

অফিসার বললেন, 'আপনাদের বাড়িটা সার্চ করব। মিস্টার তালুকদারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে খুশী হব।' তারপর সহকারীকে বললেন, 'এই ঘরটা তো বেশ ফাঁকা। বাড়ির সবাইকে এখানেই আসতে বলুন। দেখবেন কেউ যেন এই ঘর ছেড়ে না যায়।'

সুদীপ চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর নিচ থেকে ঠাকুর চাকর সমেত অবনী তালুকদার উঠে এলেন, 'দিস ইজ টুমাচ' বাক্যটি উচ্চারণ করতে করতে। দ্বিতীয় অফিসার তাঁকে হুকুম শোনাতেই তিনি সুদীপের পাশের চেয়ারে বসে রুমালে মুখ মুছলেন। খুবই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। কাজের লোকেরা ঘরের অন্য কোণে জড় হয়েছিল চুপচাপ। রুমালটা পকেটে পুরে সামনে তাকাতেই স্থির হয়ে গেলেন এক মুহূর্তে অবনী তালুকদার। তার চোখ একবার ছলে আর একবার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ব্যাগটার মধ্যে ঘুরল। সুদীপ দেখল উনি উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। সমস্ত মুখ মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় চাপা গলায় গর্জন করলেন যেন, 'ওটা ওখানে রেখেছে কেন?'

'রাখার জায়গা পাইনি।' তাঁঁট না নেড়ে শব্দ তিনটে উচ্চারণ করল সুদীপ।

'স্কাউন্ড্রেল! ইউ ওয়ান্ট টু কিল মি। ব্যাগটাকে সরানো। ওঃ ভগবান!'

সুদীপ দেখল অফিসাররা টেবিলটার পাশেই দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিচ্ছেন কিভাবে কাজ গুরু করবেন। ওরা কেউ ব্যাগটার কথা খেয়াল করছেন না। অবনী তালুকদারের চোখের দৃষ্টি আঁঠার মত ব্যাগটার গায়ে লেগে আছে। সুদীপ চাপা গলায় বলল, 'ওইভাবে দেখলে ওরা বুঝতে

পারবে।’

অবনী সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালেন। তারপর বললেন, ‘আমার বৃকে ব্যথা করছে।’

সুদীপ বাবার দিকে তাকাল। তারপর গলা তুলে অফিসারকে খবরটা জানাল। উদ্রলোক দ্রুত ছুটে এলেন, ‘হোয়াটস দ্য ট্রাবল? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?’

হ্যাঁ বলতে গিয়ে না বললেন অবনী, বোঝা গেল। তারপর বললেন, ‘ঠিক আছে।’

অফিসার জানালেন, ‘আপনার মেডিক্যাল হেলথ দরকার হলে বলবেন।’

ওঁরা সরে গেলে অবনী চাপা গলায় বললেন, ‘সোয়াইন!’

সুদীপ নীরবে মাথা নাড়ল, ‘অবশ্যই।’

ধুমুয়ার কাণ্ড চলল। অনুসন্ধানকারীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেল। অবনী তালুকদারের ঘর থেকে সত্তর হাজার টাকার নোট পাওয়া গেল। এবং প্রচুর কাগজপত্র। সুদীপ লক্ষ্য করল অফিসাররা এই মুহূর্তে প্রলম্ব করেছেন না কিছুর। তারা প্রাপ্ত জিনিসগুলোর একটা তালিকা তৈরী করছেন মাত্র। এই সময় অবনী তালুকদার চিৎকার করে উঠলেন, ‘ওহো নো! ওগুলো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনারা সবার সামনে টেনে আনতে পারেন না।’

অফিসার নিলিষ্ট গলায় বললেন, ‘আপনার যেসব ব্যক্তিগত জিনিসের সঙ্গে গোপন সম্পদের কোন যোগাযোগ নেই সেগুলোয় আমরা হাত দিচ্ছি না মিস্টার তালুকদার। কিন্তু খুঁজতে হলে তো এগুলোতে হাত দিতে হবে।’

তিনটে অ্যালবাম পড়ে আছে মাটিতে। একবার তাকিয়ে সুদীপ মাথা নামিয়ে নিল। মেয়েটাকে সে চেনে। এই বাড়িতেই কাজ করত। জন্মদিনের পোশাকে অবনী তালুকদার ওর ছবি কবে তুললেন কে জানে! কিন্তু এই মেয়েটিকে নিয়ে তো কোন গোলমাল হয়নি। যাকে নিয়ে গোলমাল হয়েছিল তারপর এই বাড়িতে আর কোন অল্প বয়সী মেয়েকে কাজে রাখা হয়নি। তার আগে প্রায় প্রতি মাসে একটা করে ঝি আসতো আর যেত। ঘটনাটার কথা মনে পড়তেই শরীর গুলিয়ে উঠল সুদীপের। অবনী তালুকদারের পাশে বসতে প্ররুত্তি হচ্ছিল না।

বাড়িতে এসেই শুনেছিল মা খুব অসুস্থ। পড়ে গিয়ে জান হারিয়েছেন। নাসিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তখন বেশ রাত। অন্তত নাসিং হোমে চোকর অনুমতি পাওয়ার মত সময় নয়। গিয়ে শুনল মাকে আই সি ইউনিটে রাখা হয়েছে। অবনী তালুকদার ভিজিটার্স রুমে বসেছিলেন। সে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই উদ্রলোক মুখ নিচু করেছিলেন। সুদীপ জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘কি হয়েছে মায়ের?’

‘সেরিব্র্যাল। বাহাত্তর ঘন্টা না গেলে বলা যাবে না।’

‘কেন? সেরিব্র্যাল হল কেন?’

খেকে উঠেছিলেন অবনী তালুকদার ওই সময়েও, 'সেরিব্র্যাল হয় কেন জানো না। গো এ্যাণ্ড আস্ক দ্য ডক্টর। অশিক্ষিত!'

সুদীপ হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর সরে এসেছিল। বাবার সঙ্গে তার কোনদিনই ভাবভালবাসা তৈরী হয়নি। একটা সময় পর্যন্ত সে মায়ের সঙ্গেই শুতো। তারপর তাদের তিনজনের তিনটে আলাদা ঘর হয়েছে। মায়ের সঙ্গে বাবারও কথাবার্তা যতটা সম্ভব না হলেই নয়। তাও বাবা প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে মা জবাব দিতেন। সেই রাতে মায়ের সঙ্গে ওরা দেখা করতে দেবে না জানার পর সুদীপ বাড়ি ফিরে এসেছিল। অদ্ভুত একটা কান্না সমস্ত শরীরে পাক খাচ্ছিল সেসময়। জ্ঞান হবার পর ওরকম অনুভূতি তার সেই প্রথম। মায়ের কেন সেরিব্র্যাল হল? মা তো কখনই উত্তেজিত হতেন না। মানুষের ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেলে, দুশ্চিন্তা বেড়ে গেলে, দুশ্চিন্তা থাকলে অথবা উত্তেজনার কারণ ঘটলে এই ব্যাপারটা হয়ে থাকে বলে জেনেছে সে। ওরকম ঠাণ্ডা নিরীহ এবং ব্যক্তিত্বহীনা মহিলার সঙ্গে ব্যাপারটা মিলছে না কিছুতেই।

সেই রাতে বাড়িটাও ছিল খমখমে। দরজা খুলে কাতিকদা মুখে প্রশ্ন করেছিল 'মা কেমন আছেন?'

সুদীপ কাতিকদার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কি হয়েছিল?'

কাতিকদার মাথাটা নিচু হয়েছিল, 'আমি জানি না!'

'তুমি জানো।' কাতিকদা কিছু চেপে যাচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধা হল না সুদীপের।

'না আমি কিছু জানি না।' সামনে থেকে দ্রুত সরে গেল কাতিকদা।

দোতলায় উঠে মায়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরটা খালি। এমন কিছু চোখে পড়ল না যা সন্দেহজনক। বাবার ঘরে ঢুকল সে। এবং সেখানেই মেয়েটিকে দেখতে পেন্নেছিল সে। অবনী তালুকদারের খাটের পাশে মোজায়েক মেঝেতে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দোতলার ফাইফরমাস খাটার জন্যে মেয়েটিকে রাখা হয়েছিল। চেহারায় সৌন্দর্য শব্দটির কোন ছায়া নেই। যৌবনও কখনও কখনও কুৎসিত হয়, এই মেয়েটিকে না দেখলে সে জানত না। ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত। এই বাড়ীর দোতলায় যারা এতকাল কাজ করে গেছে তাদের বয়স ষোল থেকে তিরিশের মধ্যে এবং কেউ দেখতে সামান্য ভালও নয়। এই মেয়েটি তার ঘরে যেত খাঁট দিতে এবং ঘর মুছতে। কোনদিন কথা বলার প্রয়োজন মনে করেনি সে। একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত খারাপ দেখতে মেয়ে এই বাড়িতে আসে কেন মা?' মা উত্তর দেননি। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতেন না।

কি হয়েছিল এই মেয়েটা জানতে পারে। সুদীপ একটু গলা তুলে মেয়েটিকে ডাকল, 'এই, শুনছ? এই যে!'

ডাক শুনে মেয়েটি ধড়মড়িয়ে উঠল। তারপরে বোবা চোখে সুদীপের দিকে তাকাল। এবং তখন সুদীপ দেখল মেয়েটির কালো গায়ে চোখের জলের দাগ শুকিয়ে আছে এখনও। এবং আচম্বিতে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ল সুদীপের পায়ের ওপর, 'আমি কোন দোষ করিনি, আমি-আমি—, আমাকে—, আমার এখন কি হবে?'

হতভম্ব হয়ে পড়েছিল সুদীপ, 'কি হল? কি হয়েছে তোমার?'

মেয়েটি বারংবার কথা বলতে যাচ্ছে কিন্তু কামার দমক তাকে থামিয়ে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'মায়ের কি হয়েছিল?'

'বাবু আমাকে—, মা তখন এসে পড়েছিল।'

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ সুদীপ বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে অবনী তালুকদার বলে উঠেছিলেন, 'এখানে কি হচ্ছে?'

সুদীপ অবশ হয়ে তাকিয়েছিল। তারপরই একটা ক্রোধ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার সমস্ত সত্তায়। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই মেয়েটা যা বলছে তা সত্যি?'

'এই বাড়িতে কোনটে সত্যি কোনটে মিথ্যে তা বিচার করব আমি। নিজের ঘরে যাও।'

'ছিঃ! আপনি এত নোংরা। ইউ কিন্ড মাই মাদার!'

'নো। ডাক্তার বলেছে সে মরবে না। আর আমি নোংরা না ফরসা সে বিচারও আমি করব।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতেও প্রস্তুতি হচ্ছে না। মা মরে গেলে আমি, আমি আপনাকে—।'

'গেট আউট, গেট আউট অফ মাই সাইট।' বীভৎস গলায় চিৎকার করে উঠেছিলেন অবনী তালুকদার। এক ছুটে নিজের ঘরে চলে এসেছিল সুদীপ। বিছানায় উপর হয়ে নিজেকে কি ভীষণ প্রতারণিত বলে মনে হয়েছিল। অবনী তালুকদারের কথাবার্তা ব্যবহার সে পছন্দ করত না। কিন্তু সেটা ছিল এক ধরনের খারাপ লাগা। এখন সমস্ত শরীরে কিলবিলে ঘেন্না। এমন কি মায়ের জন্যে জমে ওঠা উদ্বেগ এবং কষ্টটা মনচাপা পড়ে গেছে। একটা মনের ওপর আর একটা মন। এই দ্বিতীয় মনটা রাগে ঘেন্নায় নিজেকেই হিঁড়তে চাইছে। এক মুহূর্ত নয় এই বাড়ী ছেড়ে এখনই বেরিয়ে যেতে হবে তাকে। অবনী তালুকদারের বাড়িতে সে আর থাকতে পারে না। কোথায় যাবে সে চিন্তা না করেই সুদীপ সুটকেশ নামাল। এবং তখনই তার মনে হল কেন যাবে? সে এখান থেকে চলে গেলে কারও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না, অভিমান করে অথবা ঘেন্নায় এই বাড়ি থেকে চলে গেলে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না কারো ওপর। আর ক্ষতি যদি হয় তো তারই। বরং মাকে ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত তার থাকা উচিত। অবনী তালুকদারের ওপর কোন বিশ্বাস নেই। আর যদি

মা না ফিরে আসে তাহলে সে নিজের হাতে অবনী তালুকদারকে খুন করবে । কোন দয়া মায়্যা ক্ষমা নেই । আর সামনে থেকে প্রতি মুহূর্তে লোকটাকে যদি সে বোঝাতে পারে যেম্মার মাত্রাটা, তার চেয়ে আর স্বস্তি কিসে আছে ? চলে যাওয়াটা তো সেন্টিমেন্টাল হঠকারিতার শামিল । সুদীপ বাড়ী ছাড়েনি । অবনী তালুকদার সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন । তবে মেয়েটা চলে গিয়েছিল । দোতলায় আর কোন কাজের মেয়ে আসেনি । মা ফিরে এলে, যখন নার্সিং হোমে রেখেও কোন কাজ হবে না জানা গেল, তখন বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর নার্স রাখা হল ।

প্রথম প্রথম সুদীপ নজর রেখেছিল । না, অবনী তালুকদার কোনদিনই ওই সব সেবিকাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেননি । এবং তখনই একটা সত্য সে আবিষ্কার করেছিল, অবনী তালুকদার ফর্সা সুন্দরী কিংবা সাধারণ মহিলার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করেন না । সুদীপ নার্সদের সেন্টারে ফোন করে বলেছিলো, ‘পেসেন্ট চাইছেন তাঁকে নার্স করতে যারা আসবেন তাঁরা যেন ফর্সা হয় । সেন্টার যেন সেটা খেয়ালে রাখেন ।’

আয়কর বিভাগের একজন কর্মী অ্যালবামটা তুলে বললেন, ‘কি আগলি !’ তারপর অবনী তালুকদারের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকালেন । এবং অবনী তালুকদারের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি কিছুই শুনছেন না, কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না । এসবে যেন কিছুই যায় আসে না তাঁর । এই সময় একজন অফিসার সুদীপকে ডাকলেন, ‘ওই ঘরে আপনি থাকেন ? আসুন ।’ যেতে যেতে সুদীপ বলল, ‘আমার ঘরে কোন লোকোন সম্পদ নেই ।’

‘তবু আপনি দরজায় দাঁড়ান, আমরা দেখছি ।’

কিছুই পাওয়া গেল না । কিন্তু কিছু লিফলেট, আনন্দর দেওয়া বই হাতে নিয়ে ভদ্রলোক ওর দিকে কয়েকবার তাকালেন । তারপর হেসে বললেন, ‘দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ !’

একটা কড়া জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিল সুদীপ । রাজনীতি নিশ্চয়ই এঁদের আওতায় পড়ে না কিন্তু খবর পৌঁছে দিতে পারেন । কারণ ওই সব কাগজের কিছুটা সরকারের ভাল না লাগারই কথা ।

মায়ের ঘর থেকে কিছুই পাওয়া গেল না । সরু গলায় মা বারংবার প্রশ্ন করছিলেন, ‘কি হয়েছে ? এরা কারা ?’ জড়ানো শব্দগুলো শ্যানখেনে এবং দুর্বোধ্য ।

শেষ পর্যন্ত সব দেখা হয়ে গেলে অফিসার বললেন, ‘মাকে খাট থেকে নামাতে হবে ।’

সঙ্গে সঙ্গে অবনী তালুকদার হস্কার দিলেন, ‘খবরদার ! সেরিব্র্যালকেস । বেডসোর বেরিয়ে গেছে । ওই পেসেন্টকে নড়ালে আবার অ্যাটাক হতে পারে । তাই যদি হয় আমি ছাড়ব না বলে দিচ্ছি !’

অফিসার বললেন, ‘আমরা দুঃখিত । কিন্তু ওঁকে আমরা যত্ন করেই নামিয়ে

দিচ্ছি। ব্যাপারটাকে হয়তো হার্টলেস বলে মনে হচ্ছে বাট ইট্‌স মাই ডিউটি।’

অবনী তালুকদারের কোন আপত্তি টিকলো না। আর সেই সময় সুদীপ আর একটা ব্যাপার আবিষ্কার করল। যে মা সুস্থ অবস্থায় কোনদিন গলা তুলে কথা বলেননি, স্বামীর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রতিবাদ করেননি সেই মা হঠাৎ তারস্বরে চৈঁচাতে লাগলেন। সেই চিৎকার স্বামীর পক্ষ সমর্থন এবং আগন্তুকদের ওপর বিদ্রোহ স্পষ্ট।

আটটা কুড়ি ভরি ওজনের সোনার সাপ পাওয়া গেল তোশকের তলা থেকে। তোষকের ওপরটা বেডসোরের রসে ভিজে আছে, দাগ হয়ে গেছে কিন্তু তার তলায় সোনার সাপগুলো চুপচাপ শুয়ে ছিল। যে নার্সটি মায়ের সেবায় ছিল তার চোখ বিস্ফারিত। আর মা অদ্ভুত স্বরে কাঁদতে লাগলেন যখন সাপগুলোকে তুলে নেওয়া হচ্ছিল।

সমস্ত জিনিসের লিস্ট করে সেইসবুদ হবার পর ওরা চলে গেলে অবনী তালুকদার ছুটে এলেন এই ঘরে। সুদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। টেবিলের ওপর ব্যাগটা তখনও পড়ে আছে। জিনিসটার কথা খেয়ালই ছিল না সুদীপের। আয়কর অফিসাররা সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে দেখছেন। কিন্তু চোখের সামনে টেবিলের ওপর রাখা ব্যাগটার কথা কারো খেয়ালে আসেনি। অবনী তালুকদার ছুটে গিয়েছিলেন ব্যাগটার কাছে। পরমতৃপ্তি ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। সেখানে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলেছিলেন, ‘খ্যাক্স ইউ।’

সুদীপ উঠে এসেছিল একটিও কথা না বলে।

মাঝে মাঝে খুব আফসোস হয়। নিজের হাতে সে ব্যাগটা আয়কর বিভাগের কর্মীদের হাতে তুলে দিতে পারেনি। কিন্তু সে এমন জায়গায় রেখেছিল যেখানে সকলের নজর আগে পড়বে। শেষে তালগোলে নিজেরও খেয়াল ছিল না কিন্তু ব্যাপারটা এমন হবে কে জানতো। কি ছিল ওই ব্যাগটায় তা কোনদিন জানা যাবে না। আজ সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল তানা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ব্যাগটার খোঁজ নিতে।

অবনী তালুকদার সেই ঘটনার পর নরম ব্যবহার করেননি ঠিক কিন্তু বিরক্তও করেননি। তবু এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় যে কোন মুহূর্তই আসতে পারে। তাতে নিশ্চয়ই অবনী তালুকদার তৃপ্ত হবেন। সুদীপ আর একবার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। নিস্তক কলকাতা। গাড়ির সংখ্যাও কম এসেছে। কেউ নেই পথে, রান্নের মতন যে যার বাড়িতে ফিরে গেছে। হঠাৎ সামনের রাস্তাটাকে অতিরিক্ত নির্জন বলে মনে হচ্ছিল তার।

যে কোন নদীর ওপর থেকে কেউ তাকে ডাকছে অথবা ঝরনার শব্দের সঙ্গে পরিচিত কোন কন্ঠ মিশে গেছে এইরকম একটা বোধ হওয়া মাত্র সুদীপের ঘুম ভাঙল। এবং তখনই স্পষ্ট একটি নারীকন্ঠ শোনা গেল। তার নাম নয়, খুব সম্প্রমের সঙ্গে কেউ বলল, ‘শুনছেন, এই যে।’

সুদীপ চোখ মেলতেই নার্স মহিলাটিকে দেখতে পেল। তার এই ঘরে এখন পর্যন্ত কোন মহিলা আসেননি। অতএব ঘোর কাটতে দুটো মুহূর্ত লাগল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। নার্স বললেন, ‘আপনার মা জেগেছেন। আমি আবার ঘুমের ওষুধ দেব। যদি কথা বলতে চান তাহলে আসতে পারেন।’

সুদীপ বিছানা থেকে নেমে ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করল।

সুদীপ ঘরে ঢোকামাত্র শব্দটো কানে বাজল। খনখনে স্বরে মা কাতরাচ্ছেন। এখন তাঁকে চিৎ করে ওইয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ সুদীপ আবিষ্কার করল তার নিজস্ব কোন কথা বলার নেই। মাকে দেখতে এসেছিল আজ, নার্স বলেছিলেন, সেও মাথা নেড়েছিল মাত্র। এখনও ভোর হয়নি। ঘরে আলো জ্বলছে। সুদীপ মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। মায়ের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে মুখ নামিয়ে বেশ জোরে কথা বললেন, ‘আপনার ছেলে এসেছে। দেখুন।’

যন্ত্রণায় কাতর মুখে প্রথমে অন্য কোন অভিব্যক্তি ফুটল না। কিন্তু নার্স কয়েকবার শব্দগুলো উচ্চারণ করার পর মা মুখ তুললেন। নার্স আবার বললেন, ‘ওই দিকে, আপনার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।’

এবার মুখ নামাল। চোখের তারা দুটো ঘুরে ঘুরে সুদীপের মুখের ওপর স্থির হল। কোন শব্দ নেই। একটা অদ্ভুত নিস্তরঙ্গতা চট করে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করল। সুদীপের শরীরে হঠাৎ কাঁপুনি এল। ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি সে পাচ্ছিল না। প্রায় পরিব্রাণের চেষ্ঠায় সুদীপ উচ্চারণ করল, ‘মা!’

একটা শব্দ ছিটকে এল মায়ের মুখ থেকে। অস্পষ্ট উচ্চারণে বিকৃত হল শব্দ, কিছুই বোঝা গেল না। সুদীপ আর একটু এগিয়ে এসে মায়ের পাশে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা ধিনধিনে গন্ধ টের পেল। পচা মাংশের গন্ধ। নার্স বললেন, ‘গায়ে হাত দিবেন না।’

তখনও চোখের দৃষ্টি সরেনি। সুদীপ মুখ নামিয়ে করুণ স্বরে প্রশ্ন করল, ‘খুব কষ্ট হচ্ছে?’

কিছু কথা বলার চেষ্ঠা চলছিল তখন। অথচ শব্দগুলো কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। মায়ের মুখ উত্তেজনায় কাঁপছিল। সুদীপ চেষ্ঠা করছিল কথাগুলোর একটা মানে বুঝে নিতে। শেষপর্যন্ত নার্স বাধা দিলেন, ‘আর ওঁর উত্তেজিত হওয়া উচিত হবে না। আজ সন্ধ্যাবেলায় কথা এত জড়ানো ছিল না। আপনি এবার যান আমি ওষুধ দেব।’

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সুদীপ উঠে দাঁড়াল। তারপর দরজার দিকে এগোতেই মা গোঙাতে লাগলেন। হঠাৎ সে স্থির হয়ে গেল। ওই গোঙানির মধ্যে যে শব্দ দুটো সে শুনতে পেয়েছে তা কি সঠিক? সে ফিরে তাকাতেই মা শান্ত হয়ে গেলেন। ঠোঁট বন্ধ। চোখে আকৃতি। এবং তখনই দুচোখ বেয়ে জল নামল। মনের কথাটা ছেলের কাছে পৌঁছে দিয়ে চোখের জলে

তুপ্ত হওয়া।

সুদীপ এক দৌড়ে ব্যালকনিতে চলে এল। ভোর হচ্ছে। কোলকাতার মাথায় এখনও অন্ধকার সরেনি। অজুত শীতল বাতাস বইছে পৃথিবীতে। এখনও পথে মানুষজন নামেনি। সবে ফরসা হচ্ছে আকাশ। সুদীপ চোখ বন্ধ করল। তার সমস্ত শরীরে আবার কাঁপুনিটা ফিরে এল। কানের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি রক্তবিন্দুতে মিশে গেছে শব্দগুলো, ‘কখন মরব খোকা?’

॥ ৩ ॥

সুদীপকে ছেড়ে দেবার পর আনন্দ কফি হাউসে চুকেছিল।

রাত বাড়লে অল্পবয়সী ছেলেরা যারা প্রেসিডেন্সি বা যুনিভার্সিটিতে পড়ে তারা কফি হাউসে থাকে না। এই সময়টায় বয়স্ক মানুষের ভিড়। হেঁচৈ হয় না। কেমন একটা গস্তীর গস্তীর ভাব। শুধু রাতের আইন-কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রী জমিয়ে আড্ডা মারে এক দিকে। আনন্দ চারপাশে একবার তাকাতেই সুরথদাকে দেখতে পেল। সুরথদা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। সুরথদার সঙ্গে যে দাড়িওয়াল ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁকে আনন্দ চেনে না। সুরথদা ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলায় আনন্দ চেয়ার টানল।

দাড়িওয়াল ভদ্রলোক তখন বলছিলেন, ‘চারধারে আপাত শান্তি শান্তি ভাব কিন্তু এই ব্যাপারটাই আমার কাছে খারাপ লাগছে। খুব খারাপ ব্যাপার।’

সুরথদা বললেন, ‘খারাপ কেন?’

‘আরে ভাই, পাড়ার মাস্তানরা উধাও, কোন পলিটিক্যাল জঙ্গী অ্যাক্টিভিটিস নেই, কলকাতার মানুষ তো ভেবেই নিচ্ছে তারা পরম শান্তিতে বাস করছে। বাট এটা তো সত্যি নয়।’

‘কোনটে সত্যি?’

‘সেদিন মনুমেন্টের তলায় মিটিং হয়ে গেল। অর্গানাইজেশন কাজ শুরু করেছে। আরে আমার বাড়িতেও গোপন লিফলেট দিয়ে গেছে। খুব খিলিং।’

‘খিলিং?’

‘খুব। আমার মশাই একটা হরি আছে। আমি সব দলের মিটিং-এ অ্যাটেণ্ড করি। এদেরটাও করেছিলাম। কিন্তু পাবলিক যখন শান্তিতে মজে আছে তখন এদের কথা কি কানে চুকবে? খুব অশান্তি, চারপাশে ধুন্দু মার কাণ্ড, প্রাণ অতিষ্ঠ হলেই পাবলিক পরিবর্তন চায় মশাই।’ দাড়িওয়াল ভদ্রলোক কফিতে চুমুক দিলেন। তারপর বেয়ারাকে ডেকে একটি কফির দাম মিটিয়ে ওঠে দাঁড়ালেন, ‘শাক, অনেকক্ষণ সময় কাটানো গেল। আপনি একা ছিলেন, আমিও, এখন আপনি দোকা হলেন আমি হাই। নমস্কার।’

ভদ্রলোক চলে গেলে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘উনি কে সুরথদা?’

‘চিনি না। তোমার জন্যে বসেছিলাম উনি এলেন।’ সুরথদা বললেন, ‘তুমি

নিশ্চয়ই ভাবছ আমি কেন উটকো লোকের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলছি ? লোকটা তো পুলিশের কেউ হতে পারে। আমি ইচ্ছে করেই বলছি। আমি যে বুদ্ধিমান নই, রাজনীতি নিয়ে তেমন আগ্রহ নেই, এটা লোকটাকে বোঝানোর দরকার ছিল। যাক, ছেড়ে দাও এসব কথা। তোমার খবর হল। গিয়েছিলে ?

‘হ্যাঁ। কিন্তু এদিকে দুটো কাণ্ড ঘটেছে। আমার হোস্টেলে কেউ এসেছিল খোঁজ-খবর নিতে। আমি কখন ফিরি, কার কার সঙ্গে মিশি এইসব। শ্যাপ.রটা—।’

‘দ্বিতীয়টা ?’

‘আজ মিটিং-এ আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারিনি।’

সুরথদা চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, ‘কফি খাবে ?’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘না।’

সুরথদা কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘অবশ্য খেতে চাইলে খাওয়াতে পারতাম না হয় তো। ওরা কফি হাউজ আজকের মতো বন্ধ করছে। চল বাইরে বেড়িয়ে কথা বলি।’

কলেজ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে সুরথদা বললেন, ‘প্রথমটা নিয়ে ভাবনার কোন কারণ নেই। মে কেউ তোমার খোঁজে আসতে পারে। তোমার দেশের লোকজন খবর নিতে পারেন। তুমি জান না। কিন্তু মিটিং-এ মাথা গরম করার কোন মানে নেই। আমি তোমাকে বলছি বিপদ ডেকে আনবে না। খামোকা মানুষকে সামনাসামনি চটাবে না। মতের ঝামিল হলে চেপে যাবে, পরে নিজের মত করে চাপানো সিদ্ধান্তটা কাজে লাগাবে।’

আনন্দ এক-চোখো ট্রামটাকে ছুটে আসতে দেখলো। ঝড়ের মত শব্দ তুলে ওটা পার হয়ে গেলে সে বলল, ‘কিন্তু আমার সঙ্গে ওঁদের মতের কোন মিল হচ্ছে না। ওঁরা যে পথে চলতে চাইছেন সেটা পথই নয়।’

সুরথদা বললেন, ‘দ্যাখো আনন্দ, পঁচাত্তর পর্যন্ত আমি জেলে ছিলাম। বাঁ চোখটায় কোনদিন দেখতে পাব না। সুতরাং আমি মূল্য দিয়েছি। পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর এই এগারোটা বছর আমার জীবনে খুবই মূল্যবান সময়। এই অভিজ্ঞতার কোন দাম নেই কি ?’

আনন্দ একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল, ‘সুরথদা আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু যেভাবে দলের সবাই ভাবছেন সেটাকে আমার কার্যকরী বলে মনে হচ্ছে না।’

সুরথ হাসলেন, ‘তুমি কি ভাবছ আমি জানি না। তবে তোমার বয়স অল্প। একটা কথা খুব সত্যি জেনো, হঠকারিতা থেকে কোন ফল পাওয়া যায় না। আমরাও পাইনি।’

সুরথদার দিকে তাকাল আনন্দ। উত্তর কলকাতার একটা স্কুলে পড়ান সুরথদা। ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। বিশ্লেষণ করেননি। সে জিজ্ঞাসা করল,

‘আপনি কি মনে করেন ওরা যেভাবে এগুচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত সফল হওয়া যাবে?’

‘আশা করতে দোষ কি?’

‘আমি ভরসা পাচ্ছি না। শুধু বিপক্ষে গালাগাল করলেই সাফল্য পাওয়া যায় না। জনসাধারণকে কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হয় আমরা তাদের উপকার করতে চাই। এটাই না করলে আমরা কখনও তাদের সঙ্গে পারব না।’

সুরথদা আনন্দের কাঁধে হাত রাখলেন, ‘তোমার হোস্টেলে কেউ খোঁজ খবর করতে গিয়েছিল শুনেই তুমি নাভাঁস হচ্ছ অথচ মাসের পর মাস পুলিশের ভয়ে আমরা কি না করেছি। সে সব গল্প তো তুমি জানো। আর শুধু পুলিশ নয় রাজনৈতিক দলের গুপ্তারাও আমাদের পেছনে পাইপগান নিয়ে তাড়া করেছিল। আসলে ব্যাপারটা তো ছেলেখেলা নয়। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে হবে। তুমি কি করতে চাইছ এইটে পরিষ্কার হওয়া দরকার। শুধু আবেগ নয়, রাজনৈতিক শিক্ষা সবার আগে প্রয়োজন। তুমি একটু আগে জনসাধারণকে কাছে পাওয়ার কথা বলছিলে না? তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো একটা দল ঠিক করল পশ্চিমবাংলার মানুষ সুখে নেই, তাদের সুখী করতে হবে। তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে হবে নিরাপত্তা দিতে হবে। প্রতিটি মানুষকে মানুষের মত বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে যে পরিবর্তিত অবস্থার কথা আমরা ভাবি তাই সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু এই দেশে এখনই সমস্ত বিপ্লব সম্ভব নয়। সি-পি-এমের সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং কংগ্রেসের শক্তির বেড়া জাল থেকে বেরিয়ে এসে দেশের মানুষ বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। নকশালারা সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ এই দল নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেও থাকতে চায় না। তখন তারা একটি অভিনব পরিকল্পনা নিল। নির্বাচনের পাঁচ বছর আগে ওরা প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্যে একজন প্রার্থী নির্বাচন করল। তাকে নির্দেশ দেওয়া হল এই পাঁচ বছর সে তার এলাকার মানুষের প্রতিটি সমস্যায় পাশে দাঁড়াবে। নিজের ব্যবহার এবং কাজের মাধ্যমে জনসাধারণের ভালবাসা অর্জন করবে। স্বতঃপ্রসূত হয়ে সে মানুষের সেবায় লাগবে। পাঁচ বছর ধরে ধীরে সে এইভাবে মানুষের আস্থা দখল করবে। তারপর নির্বাচন এলে সে যখন প্রার্থী হয়ে সামনে আসবে তখন মানুষ তাকে ভালবেসেই ভোট দেবে। এই পাঁচ বছরে তারা জেনে যাবেই প্রতিটি বিধান সভা কেন্দ্রে এমননি একটি মানুষ মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। আর সেই মানুষের দল সামগ্রিকভাবে চাইছে দেশের পট পরিবর্তন। এইবার আনন্দ তুমিই বল, নির্বাচনের ফল কি হবে? অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে একটু ক্লান্ত সুরথদা আগ্রহের সঙ্গে তাকালেন।

সুরথদা বললেন, ‘কেন? পাঁচ বছরের সেবায় কোন দাম দেবে না

‘জনসাধারণ?’

আনন্দ বলল, ‘আসলে এখন প্রত্যেক মানুষ একটা অভ্যাসের মধ্যে এসে গিয়েছে। হয় সি-পি-এম নয় কংগ্রেস, ভোট দেবার সময় এই দুটোই ওদের লক্ষ্য হয়। অচেনা কোন দলের প্রার্থী এককভাবে কিছু করছে এবং সেটা যতই ভাল কাজ হোক না কেন ভোট দেবার সময় সেটা বোধহয় তারা ভাবে না।’

সুরথদা বললেন, ‘কথাটা অর্ধসত্য। নোন ডেভিল ইজ মেটার দ্যান আননোন। ঠিক আছে। তবে এদেশের মানুষ নির্বাচনের সময় আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। মিসেস গান্ধিকে যখন হত্যা করা হল তখন কংগ্রেস যদি রাজীব গান্ধীর বদলে প্রণব মুখার্জীকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্বাচন চাইত তাহলে হেরে ভুত হয়ে যেত। আসলে দেশের মানুষ এখনও দেখতে চায় যে দলকে তারা ভোট দিচ্ছে তাদের নেতা কে? তার প্রতি আস্থা রাখা যায় কি না! জ্যোতিবাবু সদ্দিন সি-পি-এমের নেতা থাকবেন তদ্দিন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে না। পাঁচ বছর কাজ করেও ওই দল একটুও আসন পাবে না যদি তাদের নেতা জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন না হন। নকশাল আমোলনে কি প্রকৃত অর্থে কোন নেতা ছিলেন? চারু মজুমদার কিংবা কানু স্যানাল কি জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় নেতা, সেই সময়ে? এখনও ব্যক্তিপূজার মানসিকতা এই দেশ থেকে দূর হয়নি। তাই তুমি যা ভাবছ তা আমাদের সেই হঠকারি ভাবনার রূপান্তর না হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কি হল?’

‘আমরা এ্যাকশনে নামছি।’

‘তুমি সুদীপ কল্যাণ?’

‘আর জয়িতা?’

‘হোয়াই জয়িতা?’

‘ও নিজেই হোগ্য মনে করে। তাছাড়া আমরাও ওকে মেয়ে বলে মনে করি না।’

‘কিন্তু আফটার অল সে মেয়ে।’

‘হতে পারে। কিন্তু তার ব্যবহার এবং আচরণে মেয়েলিপনা নেই।’

‘ব্যাপারটা আর কে কে জানে?’

‘আজকে যে তিনজনের সঙ্গে কথা বলেছি তাঁরা আর আপনি।’

‘যদি ধরা পড়।’

‘পড়বে। অন্তত কাগজে খবরটা বের হবে। চারটে স্তরুণ ছেলেমেয়ে একটা পরিকল্পিত অন্যান্যের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। হয়তো এই ঘটনা আমাদের মত অনেককে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সুরথদা, আমরা পুলিশের গলা কাটতে যাচ্ছি না, মৃতি ভাঙার বোকামিও করব না। আসল কাজ করতে না পারার অক্ষমতায় বোকার মত নকল বিদ্রোহ-বিদ্রোহ ভাব সৃষ্টি করব না। আমরা

সেইসব জাগ্রগায় আঘাত করতে চাই যা মানুষের ভাল ভাবে বেঁচে থাকার পথটাকে আইনের ফাঁকির সুযোগ নিজে নোংরা করে দিতে চাইছে। উই উইল ডু ইট ওয়ান আফটার অ্যানাদার।’ খুব নিলিপ্তের মত কথাগুলো বলল আনন্দ।

সুরথদা কিছুক্ষণ ওর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, ‘ঠিক আছে। আমি সেন্দ্রাল কমিটির সঙ্গে কথা বলব। তোমাদের মত ব্রাইট ছেলেকে আমরা পেয়েছি। স্পষ্টই বলছি আমরা তোমাদের হারাতে চাই না।’

ঠিক এইসময় একটি পুলিশের ভ্যান বউবাজারের দিক দিয়ে ছুটে আসছিল। ভ্যানটা এগিয়ে যেতে থমকে দাঁড়াল। সুরথদা বললেন, ‘একসময় এই বস্তুটিকে দেখলে আমার হৃদকম্প হত। ইনি কি উদ্দেশ্যে এমন আচমকা দাঁড়ালেন?’

ভ্যানটার দিকে তাকিয়ে আনন্দের অস্বস্তি হচ্ছিল। কোন কারণ নেই, তবু। ভ্যানের দরজা খুলে একজন পুলিশ অফিসার নেমেই চিৎকার করলেন, ‘কি রে সুরথ!’

তারপর ট্রাম রাস্তাটা পেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুললেন ভদ্রলোক, ‘কি ব্যাপার, চিনতে পারছিস না?’

‘ও তুই! কি খবর?’ সুরথদাকে ঠিক স্বচ্ছন্দ বলে মনে হল না।

‘চলছে গুরু। পুলিশের চাকরি করলে যেমন চলে আর কি! ওঃ, কতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল। প্রায় পনের বছর, তাই না? রাউণ্ডে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ তোর দিকে নজর পড়ল। মনে হল এ মালকে আমি চিনি। দ্যাখ ভুল করিনি।’

‘না ভুল করিসনি।’

‘সেদিন রাইটার্সে সৌমিত্রর সঙ্গে দেখা হল। আরে ইকনমিক্স পড়ত, মনে নেই? ও শালা এখন সেক্রেটারি হয়ে গেছে। আমাকে চিনতে পেরেও ভাল করে কথা বলল না। মানতেই হবে। আফটার অল আমি একটা সাব-ইন্সপেক্টর। কলেজের বন্ধুরা কেউ কাউকে মনে রাখবে কেন? আমার সঙ্গে কথা বলতে তোর আবার অস্বস্তি হচ্ছে না তো?’ হো হো করে হাসলেন ভদ্রলোক।

‘না না তুই পুলিশের চাকরি করছিস পেটের প্রয়োজনে।’

‘ঠিক তাই। কিন্তু তুই বোধ হয় একটা কথা জানিস না—।’

‘কি ব্যাপার?’

‘সেভেনটি ওয়ানে আমি বউবাজার থানায় ছিলাম। একদিন রাত এগারটায় হকুম এল ডেজারাস নক্সালাইট নেতা লুকিয়ে আছে আমাদের এলাকায়। ইমিডিয়েটলি তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। গাড়ি নিয়ে ছুটলাম। সাফিসিয়েন্ট সেপাই ছিল সঙ্গে। নম্বর মিলিয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম।’

মেশোমশাইকে জিজ্ঞেস করিস আমি পনের মিনিট সময় ফ্লালতু নশ্ট করেছিলাম। উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে মেশোমশাইকে আটকে রেখে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলাম কেন এসেছি। পনের মিনিট পরে যখন অ্যাকশন নিলাম তখন তুই হাওয়া হয়ে গেছিস।’ ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন, ‘ওপরওয়ালা জানলে আমার চাকরি চলে যেত। কিন্তু আমি কি করে কলেজের বন্ধুকে সুযোগ না দিয়ে অ্যারেস্ট করি বল?’

‘ধন্যবাদ।’ সুরথদা যেন ব্যাপারটা আনন্দের সঙ্গে নিলেন না, ‘তুই নিজের হাতে কটা মানুষ মেরেছিস এতকাল?’

‘হিসেব করিনি। কেউ যখন আমাকে খুন করতে চেয়েছে তাকে মেরেই আমাকে বাঁচতে হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বোস কত মানুষকে খুন করেছেন?’

‘মানে?’ আনন্দ প্রশ্ন না করে পারল না।

‘আজাদ হিন্দু ফৌজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুভাস বসু। তাঁরই হুকুমে ফৌজ যুদ্ধ করেছে ব্রিটিশদের সঙ্গে। অতএব প্রতিটি শত্রুর মৃত্যুর পেছনে সুভাষ বসুর নিশ্চয় দায়িত্ব ছিল। সুভাষ বোসকে কি খুনী বলবে?’

সুরথদা বললেন, ‘চমৎকার যুক্তি। তবে তুই যা বললি তাই যদি করে থাকিস তাহলে একটা ধন্যবাদ পাওনা ছিল, দিলাম। অবশ্য তোর জাতভাইরা আমার চোখটাকে নশ্ট করেছে এটাও সত্যি ঘটনা।’

হঠাৎ কথাবার্তা থেমে গেল। আনন্দ বুঝতে পারছিল যে-আবেগ নিয়ে ভদ্রলোক ভ্যান থেকে নেমে এসেছিলেন সেটা এখন উধাও হয়ে গেল। সুররদাথ কাটা কাটা কথাই এই আবহাওয়াটা তৈরী করল। শেষ পর্যন্ত আনন্দই বলল, ‘সুরথদা, আমার দেরি হয়ে গেছে অনেক। আমি কাল সম্ভব হলে আপনার সঙ্গে কথা বলব।’ সুরথদা নীরবে মাথা নাড়লেন।

পা চালাল আনন্দ। কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে মোড় ঘোরার আগে সে পেছনে তাকাল। দূরে দুটো ছায়ামূর্তি এখন কথা বলছে। আর দুটো সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে। সুরথদাও সিগারেট ধরিয়েছেন। এবং তখনই আনন্দ বুঝতে পারল সে ছিল বলেই সুরথদা ওইভাবে কথা বলছিলেন। একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বললে যদি আনন্দ কিছু ভেবে বসে তাই ছাড় ছাড় ভাব দেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ পুরো ব্যাপারটা তেতো হয়ে গেল আনন্দের কাছে। পুলিশ অফিসার একসময় পুরোনো বন্ধুত্বের জন্যে উপকার করেছিলেন সুরথদার। অথচ নিজের ইমেজ বাঁচাবার জন্যে এতক্ষণ অভিনয় করলেন সুরথদা। এখন নিশ্চয়ই তাঁর চেহারা স্বাভাবিক হয়েছে। আনন্দের সুদীপের কথা মনে পড়ল। সুদীপ সুরথদাকে পছন্দ করে না। প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, বহুৎ জালি লোক। আনন্দ গুকে বহুবার এইরকম শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু সুরথদার মাধ্যমেই তো দলের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের। সুদীপ বলে, ‘দ্যাখো ভাই, নকশাল আন্দোলন যারা করেছিলো তারা খুব হিম্মতবাজ, নো ডাউট। কিন্তু এখন তো সব ওই ইমেজ

নিয়েই হিরো হয়ে বসে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে আর ফ্যাট গ্যাদার করছে। জিজ্ঞাসা করলে হিষ্টি ঝাড়বে। আরে তার রেজাল্ট কি হ'ল! যা ছিল তাই রইল, মাঝখান থেকে নাম কিনল।' জয়িতা এর সঙ্গে যোগ করেছিল, 'বাবার ক্লাবে রোজ ড্রিঙ্ক করতে আসেন এক শুদ্রলোক। জেল টেল খেটেছেন, তাত্ত্বিক নকশাল ছিলেন, এখন পাবলিক রিলেশনস অফিসার। সবাই খুব খাতির করে।' সুদীপ মাথা নাড়ে, 'এই মালটাও সেই সুযোগ খুঁজছে।'

সুদীপ কিংবা জয়িতার সঙ্গে একমত নয় আনন্দ। ওরা সব সময় ওইরকম চড়া দৃষ্টিতে সবকিছু দ্যাখে। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে চারপাশে যা দেখেছে তাতেই এই দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হয়েছে। কল্যাণ সেদিক দিয়ে বেশ চুপচাপ। কোন ব্যাপারে চট করে মন্তব্য করে না। শুধু মাঝে মাঝে বলে, কিছু একটা করে। এভাবে ভাল লাগছে না। সুদীপ কিংবা জয়িতার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভাল কিন্তু বোঝাই যায় আনন্দের ওপরেই সে নির্ভরশীল। আজ পর্যন্ত আনন্দ কল্যাণকে তিক বুঝে উঠতে পারল না। ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল নয় এটুকু সে জানে কিন্তু কোনদিন নিজের বাড়িতে ও কাউকে নিয়ে যায়নি।

হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়াল আনন্দ। রাস্তাটায় আলো নেই। গেট বন্ধ। কিছু দিন আগে এই হোস্টেলের একটা ছেলেকে হাদয়ঘটিত ব্যাপারে খুন করা হয়েছে। তারপর থেকে কর্তৃপক্ষ খুব কঠোর হয়েছেন। খবরের কাগজে লেখালেখি এবং পুলিশ তৎপরতায় আনন্দের অবস্থা বেশ করুণ হয়েছিল তখন। কিন্তু এত বড় হোস্টেলের ছাত্রদের ম্যানেজ করা সুপারের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা।

দরজা খোলার দরকার নেই। আনন্দ চিৎকার করে দারোয়ানকে ডাকল। তিনবারের বার সাড়া মিলল, 'কোন হ্যায় জী?'

নিজের নাম বলে খাঁজে পা রেখে কাঠের গেটের ওপর উঠে বসল আনন্দ। তাকে দেখতে পেয়ে দারোয়ান ভীত গলায় বলল, 'আমার নোকরি খতম হয়ে যাবে বাবু।'

ওপাশে একটা মই আছে। দারোয়ান সেটাকে কাছে নিয়ে আসতে চটপট নেমে এল আনন্দ। তারপর বলল, 'আর বেশী দিন জ্বালাবো না, ভয় নেই।'

লম্বা করিডোর দিয়ে নিজের ঘরের সামনে এসে দেখল দরজা বন্ধ। ডুপ্লিকেট চাবি আনন্দের পকেটে আছে। সুরজিৎ এখনও ফেরেনি। এখন হোস্টেল অন্ধকার। হয়তো ডাইনিং রুমে গিয়ে হজ্জত করলে কিছু খাবার পাওয়া গেলেও ঘেতে পারে কিন্তু সেই ইচ্ছে করল না আনন্দের। সুপারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নেই। খাবার চাইতে গেলে নানান প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে। হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল সে। এবং তখনই মনে হল খিদেটা পাচ্ছে। একটা রাত না খেয়ে থাকলে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। তাছাড়া ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি রাতি অনাহারে কাটায়। সুতরাং, ব্যাপারটা কিছুই নয়। চোখ বন্ধ করল সে। কিন্তু

তা সত্ত্বেও ঘুম আসছে না।

হঠাৎ এখন মায়ের কথা মনে পড়ল আনন্দর। মা শব্দটা উচ্চারণ করলে যে চেহারাটা মনে আসে তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। একা একটার পর একটা বাধা ডিঙ্গিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছেন এখনও। আনন্দ যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তে এসেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমার কাছে কোন প্রত্যাশা করি না। বড় হয়েছে, নিজে কি করবে তা নিজেই বিচার করো। কর্মফল তুমিই ভোগ করবে। আমি তোমার খাওয়া থাকা পড়ার খরচ দিতে পারব আগামী ছয় বছর।'

মাকে কখনও আবেগের শিকার হতে দ্যাখেনি সে। বাবা ছিলেন খুব আমুদে মানুষ। কথায় কথায় মন খারাপ করতেন, মন ভাল হতেও সময় লাগত না বেশী। তখন ডায়মন্ডহারবারের বাড়িতে ওরা থাকত না। ওই বাড়ির দায়িত্ব ছিল এক কাকার ওপর। বাবা মাঝে মাঝে যেতেন সেখানে দেখাশোনার জন্যে। তখন বেশ ছোট আনন্দ। নিচু ক্লাসে পড়ে। বাবা চাকরি করতো ভাল। রকমারি খাবার-দাবার হতো রোজ। শনি রবিবার গাড়িতে করে বেড়াবার রেওয়াজ ছিল। ওই বয়সেই আনন্দর মনে হত বাবা মাকে প্রচণ্ড ভালবাসে। তাকে যা বাসে তার চেয়েও বেশী। এবং মা-ও তাই। এটা কি করে পাঁচ বছরের ছেলের বোধে এল তা এখন বুঝতে পারে না আনন্দ। কিন্তু সেই অনুভূতিটার কথা মনে আছে। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছে বাবা আর মা ব্যালকনিতে পাশাপাশি বসে আছে চুপচাপ। ওদের ফ্ল্যাটটা ছিল চারতলায়। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে অনেকটা আকাশ দেখা যেত। সেখানে একটা ছোট বেতের সোফা ছিল। মা বাবা অত রাত্রে প্রায় জড়িয়ে ধরে কেন চুপচাপ বসে থাকত তা আনন্দ তখন বোঝেনি। কিন্তু সেইসময় হিংসে হত। সে জিজ্ঞাসা করত, 'আমি কি তোমাদের সঙ্গে বসতে পারি?'

চমকে উঠে বাবা বলতেন, 'আরে হ্যাঁ, চলে এস।'

আর মা উঠে দাঁড়াতেন, 'না। তোমাকে আসতে হবে না। চল আমি তোমার সঙ্গে শুছি। কাল সকালে স্কুল আছে। এইটুকুনি ছেলে মাঝরাত্রে জেগে বসে থাকবে।'

কেনন একটা স্বপ্নের মত ছিল দিনগুলো। বাবা প্রায়ই ট্র্যারে যেতেন। ফিরতেন যখন কিছু না কিছু আনতেন ওর জন্যে। আর ওর সঙ্গে অজুত সব রসিকতা করতেন যার অর্থ ও বুঝতে পারত না বেশীরভাগ সময়। একদিন গড়ের মাঠের কাছে গাড়ীতে বসে ওর তেপটা পেয়ে গিয়েছিল। জল খেতে চেয়েছিল সে। বাবা একটা রেস্টোরারঁর দিকে গাড়ী ঘুরিয়ে তাকে বলেছিলেন, 'শোন, বড় হয়ে কোন মেয়ের কাছে জল চাইবে না।'

মা বলেছিলেন, 'আঃ কি বলছ?'

সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন?'

বাবা উত্তর দিয়েছিলেন হেসে, 'আনন্দ জল দেও বললেই সে চণ্ডালিকা হয়ে

যাবে।’ এখন কথাগুলো মনে পড়লে লোকটাকে খুব ভাল লাগে তার। নরম নরম মনে হয়। ঘটনাটা তার মনে আছে। বাবা গিয়েছিলেন জামসেদপুরে। তিনদিনের কাজ ছিল। ঠিক একদিন পরে টেলিফোনটা বাজল। তখন টেলিফোন বাজলেই ছুটে যেতে সে। কেউ তোলায় আগেই হ্যালো বলতে বেশ মজা লাগত। হ্যালো বলতেই ওপাশে কেউ ইংরেজীতে প্রশ্ন করল। তদ্বিনে দুটো শব্দ শিখেছিল আনন্দ। ‘হোল্ড অন’ বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে মাকে ডাকতে ছুটেছিল। মা তখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে তোয়ালেতে খোঁপা জড়িয়ে হাউসকোটের বোতাম আটছিলেন, সহজ পায়ে এগিয়ে এসে রিসিভার তুলে কানে দিয়ে বললেন, ‘হেলো!’

উৎসুক হয়ে তাকিয়েছিল আনন্দ। ওর বিশ্বাস ছিল ফোনটা বাবার। অপারেটর লাইন ধরে মাকে দিচ্ছে। ও একবার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু আনন্দ অর্থাৎ হস্পে দেখল মায়ের মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। খরখর করে কাঁপতে লাগলেন মা। রিসিভারটা টেবিলের উপর রেখে থপ করে বসে পড়লেন পাশের চেয়ারে। দুহাতে তাঁর মুখ ঢাকা, শরীর প্রচণ্ড কাঁপছে। আনন্দ কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে রিসিভারটা কানে তুলে যান্ত্রিক শব্দ শুনল। সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে মায়ের দিকে তাকাল সে। মা হঠাৎ এক পাশে চলে পড়লেন। তার চোখ বন্ধ। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। আনন্দ চিৎকার করে মায়ের ওপর বাঁপিয়ে পড়ল। দৃশ্যটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। তাদের ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না। কাজের লোকটাও দেশে গিয়েছিল। মায়ের শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে সে বাঁকাতে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। শেষপর্যন্ত মা চোখ খুললেন। এবং তখন সেই মাকে তার একদম অচেনা মনে হচ্ছিল। দুহাতে তার কাঁধ ধরে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। সে উদ্ভ্রান্তের মত জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘তোমার কি হয়েছে মা?’ মা হেঁট কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর অজ্ঞানত গলায় বলেছিলেন, ‘আমাদের এখনই জামসেদপুর যেতে হবে আনন্দ। তোমার বাবা—।’

‘বাবা যেতে বলেছে?’

‘না। তোমার বাবা নেই। আজ সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি ঘুমের বড়ি খেয়েছেন। কেঁদ না, তুমি কাঁদলে আমি শক্ত হতে পারব না।’

তাকে নিয়ে মা একা গিয়েছিলেন জামসেদপুরে। সেখানে তাদের চেনাশোনা মানুষ কেউ ছিল না। পাগলের মত মা থানাপুলিশ করে শেষপর্যন্ত ওখানকার কয়েকজন বাবার অফিসের লোকের সাহায্যে মৃতদেহ সংকার করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে মা ভীষণ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে কলকাতার বাড়ীতে যেসব আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন তাঁরা নিজের মত বাবার মৃত্যু নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতেন। মা কোনদিন সেই আলোচনায় অংশ নেননি। মাস কয়েক বাদে মা কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে এলেন

ডায়মণ্ডহারবারে। বাবার পৈতৃক বাড়িতে। আনন্দর বাকী স্কুলজীবন কেটেছে ডায়মণ্ডহারবারে। বাবার রেখে যাওয়া টাকার সুদে কোনরকমে চলে গিয়েছে দিনগুলো। নিজেকে একদম পাণ্টে ফেলেছেন মা। গ্রামের স্কুলে এখনও পড়াচ্ছেন। অদ্ভুত কিছু নিয়মের পরিখায় জীবনটাকে প্রবাহিত করেছেন তিনি।

আজও বাবার মৃত্যুটা আনন্দর কাছে রহস্য হয়ে রইল। একটা হাসিখুশী মানুষ, সব ব্যাপারেই থাকে তুষ্ট বলে মনে হত, তিনি কি কারণে গাদা গাদা ঘুমের ওষুধ খেতে যাবেন বাড়ি থেকে অনেক দূরে হোটেল বসে। সেই হোটেল গিয়ে জানা গিয়েছিল, ঘুমুতে যাওয়ার আগে মাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলেন বাবা। অপারেটর কিছুতেই লাইন দিতে পারেনি। কি কথা বলতে চেয়েছিলেন বাবা। বড় হয়ে আনন্দ একদিন সরাসরি মাকে প্রশ্নটা করেছিল। মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'জানি না। এত চেষ্টা করলাম তবু জানলাম না। এখন মনে হয় না জানতে চাওয়াই ভাল। যে পৃথিবী থেকে অবকালে স্বেচ্ছায় চলে যায় সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে সুখী ছিল না। তার দুঃখের কারণটা জানতে চেয়ে এখন আর আমি কি করতে পারি।'

খিদেটা কিছুতেই মরছিল না। আর খিদে না গেলে ঘুমও আসবে না। আনন্দ উঠে বসল। গতবার যখন ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিল তখনই মায়ের সঙ্গে সে সোজা কথা বলে নিয়েছিল। সে যা ভাবে, যা যা করবে বলে পরিকল্পনা করছে তার বিশদ বিবরণ মাকে জানিয়েছে। মা চুপচাপ শুনেছেন, তারপর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বলেছিলেন, 'তুমি নিজে যা ঠিক মনে করবে সেটাই করবে। আমি তোমার পড়াশুনার খরচ দিচ্ছি মানে এই নয় বিনিময়ে তোমার কাছে কিছু আশা করছি। তবে শুধু আমি একটি কথা বলব, সাহস আর হঠকারিতা এক জিনিস নয়।'

কথাটা আনন্দ ভালভাবেই জানে। এই দেশে, এই সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিপ্লব সম্ভব নয়। ঠিক এই মুহূর্তে বিপ্লবের কথা কেউ উচ্চারণও করছে না। চারপাশের বিশ্বের অন্যান্য অবিচারের সঙ্গে মানুষ চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এমন কি সে নিজে যে দলের সঙ্গে যুক্ত তারাও বিপ্লবের কথা বলে না। অথচ ওইরকম একটা বাতাবরণ তৈরী করে নিজেদের জঙ্গী চেহারায়ে দেখতে ভালবাসে।

কানাঘুসো শুনেছিল কিছুদিন আগে থেকেই। এবার ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এল। জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে প্যারাডাইস। কয়েকটা নিরীহ গ্রামবাসীর সামনে বড় পাঁচিল তুলে বিশাল এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। এই এলাকার মধ্যে তৈরী হয়েছে মনোরম উদ্যান। বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা গাছের চারা এখন বড় হয়েছে। ফুল ফুটেছে সারা বছর। সমস্ত বাগানটা যাতায়াতের জন্যে সিমেন্টের সরু পথ যা বিভিন্ন কটেজের গা ঘেঁষে পাক

খেয়েছে। এই কটেজগুলোর অধিকাংশই এয়ারকন্ডিশন। এক রাত্রের জন্যে প্রায় আড়াইশো থেকে চারশো টাকা দক্ষিণা দিতে হয় সেখানে থাকতে হলে। এছাড়া আছে সুইমিং পুল, টেনিস এবং ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা। আর আছে কুঁড়েঘর। যার দেয়াল নেই, মাথার ওপর খড়ের চাল, চারপাশের চারটে খুঁটির ওপর পর্দা গোটানো আছে, ইচ্ছে করলেই দেওয়াল তৈরী করে নেওয়া যায়। কুঁড়েঘরে ফ্যান আছে, আলো আছে, মোটা গদি পাতা নিচে। উদ্বিগ্না শিক্ষিত বেয়ারারা খাবার নিয়ে ঘারামুরি করে দিনরাত সরু প্যাসেজ দিয়ে। খুব শক্তিশালী জেনারেটর চালায় প্যারাডাইস। খাবারের দাম আশেপাশের গ্রামবাসীর কল্পনারও বাইরে। এইরকম একটা স্বর্ণের মত বাগানে প্রবেশ করতে গেলেই টিকিট কাটতে হয় মোটা টাকায়। তাতে শুধু ঘুরে বেড়ানো যায়। থাকা এবং খাওয়ার জন্যে আলাদা দাম দিতে হবে। এক সপ্তাহের বাজারের দাম খুঁইয়ে গ্রামের মানুষ এখানে চোকেনি আজ পর্যন্ত। এই উদ্যান গ্রামের মানুষের কাজে লাগে না। গ্রাম থেকেও উদ্যানের মালিক কোন কিছু সংগ্রহ করে না। এইরকম পাণ্ডব বর্জিত জায়গা, ডাঙ্গমগুহারবারের বাঁক যেখানে অনেক কিলোমিটার দূরে সেখানে রাস্তার পাশে ওই উদ্যান কেন তৈরী হল? এত টাকা খরচ করে কেন আসবে লোকে এখানে থাকতে? প্রশ্নটা গ্রামের মানুষের মনে জেগেছিল। উত্তর পেতে দেরি হয়নি। দিনরাত গাড়ি আসছে। শিক্ষিত প্রহরী দিয়ে ঘেরা এই উদ্যানের গেট খুলে গাড়িগুলো ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। সেখানে কি হচ্ছে গ্রামের মানুষের জানা নেই। তবে বেশীর ভাগ গাড়িতেই মহিলা থাকছেন। কেউ কয়েক ঘন্টা, কেউ গোটা রাত কেউ বা তিনটে দিন কাটিয়ে ফিরে যায় কলকাতায়। প্রথম প্রথম গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দেখত এইসব মানুষদের ঢোকা বা বের হবার সময়। আইনের সাহায্যে তাদের সেখানে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ নিষ্ফল গজরায়, মুখরোচক গল্প তৈরী করে। অতি বড়লোকদের অবৈধ কাজের বাগানবাড়ি ওটা। ছেলেমেয়েদের শাসন করে ওদিকে না যেতে। কিন্তু ব্যাপারটার প্রভাব পড়ছে অল্পবয়সীদের ওপর। অথচ কেউ নেই প্রতিবাদ করার। দুটো রাজনৈতিক দল এখন গ্রামে সক্রিয়। তারা বলেছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাউকে বিরক্ত না করে, শান্তি বিঘ্নিত না করে কেউ যদি স্বাস্থ্যনিবাস চালায় তাহলে প্রতিবাদ করার কোন রাস্তা নেই। প্যারাডাইসের মালিক প্রতি মাসে তিন জায়গায় মোটা টাকা খরচ করে থাকে এটা এখন প্রচারিত। দুটো রাজনৈতিক দল এবং পুলিশের আরও হাজারটা সমস্যা আছে। স্বাস্থ্যনিবাসকে ব্যক্তিচারের উদ্যান ভাবার কোন কারণ তাঁরা খুঁজে পান না। সুদীপকে নিয়ে আনন্দ জায়গাটাকে ভাল করে দেখে এসেছে। কোন রকম ছিদ্র রাখেননি প্যারাডাইসের মালিক। সাধারণত গাড়ী ছাড়া ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। তবে সঙ্গে মেয়ে থাকলে রিকশায় কেউ কেউ ঢুকে গেছে। চোখ

বন্ধ করলেই আনন্দ দেখতে পায় সমস্ত গ্রাম ঘুটুঘুটে অন্ধকার আর প্যারাডাইসে আলোর ঢল নেমেছে।

সুদীপ কল্যাণের সঙ্গে সরাসরি স্পষ্ট কথা হয়ে গেছে। দ্বিধা জয়িতাকে নিয়ে। মেয়েটা কথা বলে কাট কাট। যদিও ওকে কখনও মেয়ে বলে মনে হয় না আনন্দর। কলেজে ঢোকান পর থেকেই চারজনে কখন এক হয়ে গেল টের পায়নি। মেয়ে বলে কোন সহানুভূতি দেখাতে গেলে প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় জয়িতা। অতএব ওকে দলে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আজ পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলে কোন লাভ হল না। ওদের কথার সঙ্গে সুরথদার কোন পার্থক্য নেই। ঠিক এই অবস্থায় চিরদিন থাকলে চারজনেই জয়েন্ট এন্ট্রিস দিয়ে সুখী ভারতীয় নাগরিক হতে পারত। সেই যোগ্যতা তাদের ছিল। কল্যাণ বলে কিছু একটা করো। সুদীপ বলে একটা চেউ তুলে খতম হয়ে যাই ক্ষতি নেই। যদিও রাজনৈতিক শিক্ষা এই উদ্দামতাকে সমর্থন করে না। আনন্দর টেবিলের রাজনীতির বইগুলো কখনই এই কথা বলবে না তবু মনে হচ্ছে খিওরির বাইরে গেলে কেমন হয়। নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী ধাক্কা দিতে পারলে কেউ কেউ হয়তো এগিয়ে আসবে। ভারতবর্ষের মানুষের দুরাবস্থার জন্যে কোন রাজনৈতিক দল বা সরকার দায়ী নয়। দায়ী তারা নিজেরাই। এই অলস কর্মবিমুখ শুধু পেতে-চাওয়া এবং নিজেরটা বোঝার মানুষগুলোকে একাত্তর সাল কোন সাড়া দিতে পারেনি। টুকরো টুকরো ঘটনার মাধ্যমে তারাও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু নিজের কাছে কৈফিয়ত দিতে পারবে। অন্তত তৃপ্ত হতে পারবে।

ঘরে কোন খাবার নেই, কাল সকালের আগে জুটবে না, আনন্দ আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করল।

॥ ৪ ॥

ঘুম থেকে উঠেই কল্যাণের মনে হয়েছিল মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, সমস্ত শরীরে ব্যথা, জ্বরটা বেশ জমিয়ে এসেছে। খাট থেকে নামতে গিয়েই সে টের পেল আজকের দিনটা বাড়িতেই আটকে থাকতে হবে। সে কিছুক্ষণ খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে রইল। এখন কত বেলা বোঝা যাচ্ছে না। এককালে যে টেবিল ক্লকটা সমস্ত জানাতো সেটা দুহাত ছড়িয়ে স্থির হয়ে আছে বছর খানেক। সূজন নেই। যদি এখন আটটা বেজে গিয়ে থাকে তাহলে তার থাকার কথাও নয়।

‘নাহয় প্রথম পনের দিন রান্নাঘরে তিনি ঢুকবেন না, তাই বলে আমার মাথা ধরলেও উনুনে হাত পোড়াতে হবে! কেন যে ছাই এখানে পড়ে আছ তা বুঝি না।’ গলাটা বড়বোঁদির। সঙ্গে সঙ্গে মাক্সের গলায় ঝাঁঝ ফুটল, ‘হিসেবের ডিউটি করতে এসেছেন এই বাড়িতে। সকালে উনুন ধরিয়ে জল চাপিয়েই তিনি ঘরে ঢুকছেন।’

বড়দা চাপা গলায় বলল, ‘আমি কিছু জানি না। সাড়ে নটায় বেরুবো, তার আগে খাবার চাই। মাথা ধরলে যে তুমি সিমপ্যাথি পাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই।’

বাবার গলা শোনা গেল, ‘কি হচ্ছেটা কি! মেজবোমার তো এই পনের দিন রান্না ঘরে চোকাকর কথা নয়। সে উনুন ধরিয়েছে সেই তো অনেক কথা।’

‘তুমি চুপ করো। এক পয়সা দেবার মুরোদ নেই কথা বলতে আস কি সাহসে। মিলেমিশে না থাকতে পারলে এই বাড়ি ছাড়তে হবে বলে দিলাম। মায়ের পায়ের আওয়াজ কানে গেল কল্যাণের। তিনি রান্নাঘরে যাচ্ছেন।

এই বাড়িতে বাবা এসেছিলেন চল্লিশ বছর আগে। দ্বিতীয় মহামুন্দের পর নাকি কলকাতায় খুব সম্ভায় বাড়ি পাওয়া যেত। চারঘরের এই বাড়ির ভাড়া এখনও সত্তর টাকা। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের কাছাকাছি এমন বাড়ির চারখানা ঘরে থাকে কল্যাণ এবং তার ভাই সুজন, বাবা মা, বড়দা বউদি এবং মেজদা মেজবউ। চারটের মধ্যে দুটো ঘর বাসযোগ্য, একটায় কোন মতে থাকা যায়, চতুর্থটায় রান্না হত আগে। মেজদা কাণ্ডটা করে বসার পর থেকে রান্না হয় বারান্দার ঘেরা জায়গাটায়। রান্নাঘরটা একটু মেরামত করে নিয়ে মেজদার ঘর হয়েছে। বাড়িটায় ইঁদুর আছে প্রচুর। মেজদার ঘরেই বেশী যাতায়াত।

কল্যাণ বাবাকে আর কথা বলতে শুনল না। কিন্তু বড়দা বলল, ‘বাবা, মা আমার কাছে সামনের মাসে একশ টাকা বেশী চেয়েছে। আমি ভেবে দেখলাম আমার পক্ষে আর কিছু দেওয়া সম্ভব নয়।’

‘তোমার মাকে বল, আমি কিছু জানি না। সংসার চালান তিনি।’

‘জানেন না তো অন্যের হয়ে ওকালতি করতে আসেন কেন?’ এটা বড় বৌদির গলা।

‘শুধুকা, আমাকে কথা বলতে দাও। কল্যাণ এখনও বাড়িতে আছে।’

‘আছে তো আছে। আমি কি তার খাই না পরি সে ভয় করতে যাব। তুমি কথা বলবে, দেখো আবার মিনমিন করে রাজী হয়ে যেও না।’ বউদি বোধ হয় বারান্দা থেকে নিজের ঘরে চলে গেল। আজ যদি বাড়ীতে থাকতে হয় তো সারাদিন এইসব সংলাপ শুনতে হবে। কল্যাণ উঠল, হাঁটার সময় মাথা ঘুরছিল। কিন্তু সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। তাকে দেখামাত্র সবাই চুপ করে গেল। বড়দা কিছু হয়নি এমন ভান করে রয়েছে। তার পরনে বউদির শাড়ী লুঙ্গির মত পরা। বাবার সামনে বসে মুর্তোয় সিগারেট নিয়ে আছে বড়দা। ওটা সম্প্রতি আরম্ভ করেছে। বাবা ময়লা ধুতি পরে মোড়ায় বসে আছেন। কেউ তাকে কিছু বলল না। সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল সে। এই জায়গাটা সবচেয়ে নোংরা এ-বাড়ির। চৌবাচ্চা পরিষ্কার করা নিয়ে নিয়মিত ঝগড়া হয়। চৌবাচ্চার দিকে তাকালেই কাদা চোখে পড়ে। সুজন সম্প্রতি একদিন কাজটা করে। কল্যাণ আর একদিন।

বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতে কানে এল, ‘তোমার তিন ছেলে যদি কিছু না করে তাহলে আমার কিছু করার নেই। মেজ বিয়ে করেছে সে কত দিচ্ছে ?

‘চারশো।’ বাবা বললেন, ‘তুই যা দিস।’

কল্যাণকে দেখে দাদা কিছু বলল না। সোজা ঘরে চলে এল সে। এই বাড়িতে কোন মানুষ ভদ্রভাবে থাকতে পারে না। বাবার জন্যে কষ্ট হয় কল্যাণের। চিরকাল কেমন বেচারী হয়ে রয়ে গেলেন। চাকরি করতেন সদাগরী অফিসে। মাইনে ছিল সামান্য। অথচ গর্ব ছিল, হয়তো এখনও আছে, তিনি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। বাড়িতে মুরগির মাংস ঢোকেনি আজ পর্যন্ত। অবসর নেবার পর হাতে যা পেয়েছিলেন তা শেষ হয়ে গেছে কোন কালে। একটা চোখে ছানি পড়েছে। চিরকাল মায়ের ছায়ায় আছেন।

বড়দা কত মাইনে পায় কেউ জানে না। খুব শৌখিন হয়ে থাকতে ভালবাসে। বউদিরও সাজগোজের দিকে ঝোঁক। প্রতি শনি-রবি দুটো সিনেমা দেখা চাই। একটা বাচ্চা হয়েছে। বাড়ির কাউকে সেটাকে ধরতে দেন না। চারশো টাকায় যদি দুবেলা খাবার আর চা পাওয়া যায় তো মন্দ কি। আলাদা সংসার করলে এই মজাটা থাকবে না তা দুজনেই ভাল মত জানে। তবু বউদি কথা শোনাতে ছাড়ে না। একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে তিনি ওস্তাদ। এককালে কল্যাণের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা ছিল। এই বাড়ীতে কল্যাণই একমাত্র ভাল ছেলে। ভাল বলতে পড়াশুনায় কখনও আশির নিচে নম্বর পায়নি। কোন প্রাইভেট টিউটর ছাড়াও অত নম্বর যে ছেলে পায় তার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতেই চাইবেন বড় বউদি। কিন্তু মেজদার বিয়ে নিয়ে যে কাণ্ড হয়ে গেল তারপর এখন সবার সঙ্গেই তার সম্পর্ক ছিল প্রায় সাপে নেউলের মত। আশ্চর্য ব্যাপার, মেজবউদি বাড়িতে আসার পর কিছু দিন মা ছিলেন তার দিকে, এখন মেজবউদি তার চক্ষুশূল। সব সময় মা কথা বলেন বড়বউদির পক্ষ নিয়ে।

মেজদা একটু অঙ্কুদ রকমের মানুষ। ও যে কখনও বিয়ে করবে তা কেউ ভাবেনি। প্রেম করার ব্যাপারটা তো বিশ্বাসেই আসেনি প্রথমে। একটু বেহিসাবী খামখেয়ালী, পাগলাটে ধরনের মানুষ হিসাবেই সকলে জানতো ওকে। যেটা মাথায় আসবে তাই করবে। বিবেকানন্দর বই পড়া থাকায় যখন তখন তাঁর বাণী আওড়াতো। পার্ট ওয়ান পর্যন্ত পড়ে ওর মনে হলেছিল লেখাপড়া ওর জন্যে নয়। ব্যবসাপত্তর করলে কেমন হয়? বাবার কাছে টাকা চেয়েছিল। পায়নি। দাদাও দিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত চার বন্ধু এক সঙ্গে ট্রাভেলিং এজেন্সি করেছে। ট্রাভেলিং এজেন্সি বলে বটে তবে ওটা তীর্থ স্পেশ্যাল। মেজদা ওয়াকিং পার্টনার। রাজগীর নালন্দা থেকে হরিদ্বার হাষিকেশ নিয়ে যাত্রা পাঠি যোগাড় করে। কত থাকে কি পায় কেউ জানে না। তবে মাসে চারশো টাকা মায়ের হাতে দিচ্ছে ছমাস। মাসের পঁচিশ দিন তাকে ওই কাজে বাইরে কাটাতে হয়। অর্থাৎ দুজনের

টাকায় একজন খাম্ব। গতমাসে তাকে টাকা বাড়াবার কথা বলান্ন সে সবাইকে শুনিয়া জবাব দিয়েছিল, 'আমি বাড়ির সবচেয়ে খারাপ ঘর নিয়েছি। পুরো টাকা দিয়ে পঁচিশ দিন একজন খাচ্ছি না। এরপর টাকা চাইছ কোন মুখে। এতকাল এইসব কথা বলিনি। এখন বলব। তবে হ্যাঁ, তোমরা আমার বউকে যা ইচ্ছে বলতে পার, আমি তাকে বলে দিয়েছি সে যেন কোন প্রতিবাদ না করে। তোমরা যা বলবে তা রেকর্ড করে রাখবে, আমি এসে শুনবো। কেউ কারো ঘরে ঢোকে না। বড়বউদির ধারণা হয়েছিল মেজর ঘরে বোধ হয় টেপ রেকর্ডার আছে। বড়দা বলেছিল, 'বাইরে বাইরে ঘোরে টানামাল নিয়ে আসতে পারে।' মেজদা চলে যাবার পর মা মেজবউদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যাঁগো, তোমরা আবার কবে টেপ রেকর্ডার কিনলে? এক বাড়ি আছে যখন, তখন দেখাতেও তো পার।'।

মেজবউদি অবাধ হয়ে বলেছিল, 'ওমা, কে বলেছে, আমরা টেপ রেকর্ডার কিনেছি।'।

'কেন, তোমার স্বামী যে বলল সেদিন।'।

'আপনি তো ওকে চেনেন মা। কি বলতে কি বলে।'।

'মিছে কথা বলছ না তো বাপু?'

'আপনি ঘরে এসে দেখুন।'।

তারপর থেকে আবার সোচ্চারে সংলাপ বলা হচ্ছে। মেজবউদির সঙ্গে তেমন কথাবার্তা হয় না কল্যাণের। খাবার দেওয়া নেওয়ার সময় যেটুকু। সুন্দরী তো নয়ই, তবে সুশ্রী বলা যায়। তবে অত্যন্ত রোগা। মেজদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হবে। এই মেয়ে যে কি করে মেজদার প্রেমে পড়ল তা কল্যাণ আজও ভেবে পায়নি। প্রেম করার মতো কোন গুণ মেজদার নেই। মেজদাদের ট্র্যারিং পার্টির সঙ্গে গিয়েছিল মেজবউদির বাবা তাকে নিয়ে। হরিদ্বারে গিয়ে ভদ্রলোক খুব অসুখে পড়েন। দল চলে আসার সময় তাকে রেখে আসতে হচ্ছে বলে মেজদা থেকে গিয়েছিল। একটু সুস্থ হয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন তিনি রিটার্ন করার করতে যাচ্ছেন। স্ত্রী নেই। একটি মেয়েকে নিয়ে চিন্তা। টাকাও নেই যে ওই রোগা মেয়ের বিয়ে দেবেন। মেজদা বলেছিল খাওয়ানোর দায়িত্ব সারাজীবনের জন্যে নিলে তিনি কি মেয়ের বিয়ে তার সঙ্গে দেবেন? মেজদার সেবা পেয়ে ভদ্রলোক এমন কৃতার্থ ছিলেন যে না বলতে পারেননি। আর সাতদিন এক সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে দাদার নাকি বউদিকে ভাল লেগে গিয়েছিল। মেজবউদি হরকে পিসারীর ঘাটে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'বাবার যদি কিছু হয় তাহলে আমার কি হবে?' তখন দাদা নাকি হাত ধরে বলেছিল, 'কেন, আমি আছি। আমাকে তুমি পছন্দ করবে বিনীত?'

মেজবউদি নাকি জবাবে এত মাথা নুইয়েছিল যে চিবুক গিয়ে বুক ঠেকেছিল।

এখনও এই বাড়িতে মেজবউদি ওই একই ভঙ্গীতে কাজ করে যায়। সিনেমা থিয়েটার দূরের কথা, বাপের বাড়িতে যাওয়ার সময় সুযোগ হয় না। সুজনের সঙ্গে মেজবউদির বেশ ভাব। বয়সে সুজন বছর খানেকের ছোট হবে। তাই নিয়ে বড়বউদির খোঁটা শুরু হয়েছে সুজনের অসাক্ষাতে।

সুজন ওদের ছোটভাই। মাধ্যমিক পাশ করতে পারেনি। দুবার চেষ্টা করেছিল। এখন কান ঢাকা চুল, ঘায়ের কাছে ঈষৎ বাবরি, অমিতাভ বচ্চনের মত একটা প্যাটার্ন ওর এবং ওর বন্ধুদের মধ্যে চালু। মাস্তানি করার প্রবণতা আছে কিন্তু পার্টি করে। এ পাড়ার অনেক বেকার ছেলে পার্টি করার দৌলতে চাকরি পেয়েছে। পাসটাস করা থাকলে সুজনও পেয়ে যেত অ্যাডিনে। কিন্তু মাধ্যমিক ফেল করা যোগ্যতা নিয়ে যে চাকরি পাওয়া যায় তা সে করবে না। কিন্তু তার আয় আছে। কোথেকে টাকা পায় কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি কেউ। কল্যাণের ঘরেই সে শোয় যদি রাতে ফেরে। প্রত্যেক মাসে একশ টাকা মায়ের হাতে দিয়ে বলে, 'নিয়ে করলে চারশো দেব নইলে একশ।' প্রায়ই সে কল্যাণকে শোনায়, 'দাদা তুই বিয়ে পাশ কর, তোর চাকরির জন্যে আমি বলে রেখেছি।'

'কাকে বলেছিস?' কৌতুক বোধ করত কল্যাণ।

'অভিরামদাকে। নেস্টট ইলেকশনে পার্টির ক্যাণ্ডিডেট হচ্ছে।'

'কেন, এখন যে এম এল এ আছে সে কোথায় যাবে।'

'বুড্ড হয়ে গেছে বহুত, চেয়ারম্যান বলেছে তরুণদের সুযোগ দেওয়া হবে।'

'তোর কি হবে?'

'আমার লাইন ফিট করা আছে। হাওয়া খারাপ বুঝলে পাল্টি খাবো।'

'পাল্টি খাবি?'

'ইয়েস। ঐ পার্টি থেকে দর দিচ্ছে আমাদের। মোহনবাগান ইন্সটিটিউটের প্লেয়ার ভাঙ্গানোর কথা শুনিসনি? যে মাল দেবে আমরা তার প্লেয়ার।'

কল্যাণ খানিক চুপ করে থেকে বলেছিল, 'আচ্ছা সুজন, তোর কখনও মনে হয়, এই সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার যদি পাল্টি যেত তাহলে কেমন হত?'

'অ্যাই দাদা, মজাকি করিস না। সব শালা বড়দা বড়বউদির মত। ওসব ফালতু ইমোশন কারো নেই। কেউ কিছু পাল্টিবে না। অতবড় নকশালরা হাপিস হয়ে গেল। মাল কামাও জিন্দা রহ। এই হল প্লোগান?'

'প্লোগান?'

'চেচিয়ে বলি না। বন্দে জিন্দাবাদ!'

'সুজন। এই বাড়িটাকে তোর কেমন মনে হয়?'

'চোখ কান বুজে রাত কাটানোর পক্ষে ফাইন জায়গা।'

মায়ের হাতে কল্যাণ দেয় দেড়শ টাকা। প্রত্যেক সকালে তাকে টিউশনি করতে যেতে হয়। দুটি এইট নাইনের মেয়েকে সপ্তাহে ছদিন পড়ালে মাসে

দুশো টাকা পাওয়া যায়। কলেজের খরচ লাগছে না। নাম্বার কি করে ভাল হল কল্যাণ জানে না কিন্তু প্রেসিডেন্সিতে ভরতি হতে মোটেই অসুবিধে হয়নি।

অর্থাৎ হাজার পঞ্চাশ টাকায় মাকে এই সংসার চালাতে হয়। আটজন মানুষ ওই টাকায় খায়। সপ্তাহে একদিন মাছ আসে। কলকাতার বাজার দর এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে তাতে মা কি উপায়ে সে তাদের তিরিশ দিন খারার বেড়ে দিচ্ছেন তা সত্যি গবেষণার বিষয়। ভাত সেদ্ধ আর তরকারি। তাই বা জোটে কিভাবে। বাড়ি ভাড়া, ইলেকট্রিক বিল থেকে আরও দশটা খরচ আছে। এইসব ভাবলে মায়ের জন্যে এক ধরনের কষ্ট হয় কল্যাণের। চিরকাল মহিলা অভাবের সঙ্গে লড়াই করে গেলেন। তবু বাবা চাকরিতে থাকতে তাঁকে সহজ মনে হত। যেন রশিটা ভাল ধরা থাকত। কিন্তু বড়বউদি অন্যান্য করছে দেখে তার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। মা জানেন বড়দাকে চটিয়ে এখন থাকা যাবে না। মেজ ছেলের চাকরি নেই, অর্থাৎ নিয়মিত হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ছোট দুজন চাকরি করে না। এই সময় মাকে সুজনের মতই মনে হয়। যে ক্ষমতায় তার দিকে পাল্লা ঝুলিয়ে থাকা।

এই বাড়ি কল্যাণকে কিছু দেয়নি। শুধু পরিচয় ছাড়া। স্কুল জীবনে তার কখনও মাইনে লাগেনি। বইপত্র পেয়েছে চেয়েচিন্তে বা কখনও স্কুলের অনুগ্রহে। প্রেসিডেন্সিতে পড়ে, এখনও তার ভাল পোশাক বলতে একটা জিনসের প্যান্ট আর হ্যাণ্ডনুমের শার্ট। বেশীর ভাগ সময় পাজামা আর খাদির পাজাবি পরে। ইদানিং সিগারেট খায় মাঝে মধ্যে। কলেজে ঢুকে প্রথম বন্ধুত্ব হয়েছিল আনন্দের সঙ্গে। তারপর সেই সূত্র সুদীপ আর জয়িতা। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার এক ধরনের কমপ্লেক্স কাজ করে। তিন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারার সময় সেটা হয় না। জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষা দেয়নি কল্যাণ। দিয়ে লাভ হত না। যদি মেডিক্যাল কিম্বা এঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পাওয়াও যেত তাহলে সেই খরচ কে টানতো? এখন আরও কয়েক বছর পড়াশুনা করলে অধ্যাপনা কিংবা মাস্টারির ক্ষীণ সুযোগ আছে। আর বি-এটা পাশ করলে বি সি এস দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এসব করে কি হবে। আনন্দ ঠিকই বলে। যেজন্যে গরু পোষে মানুষ, যত্ন করে শিশুকাল থেকে খোল-বিটুলি খাওয়ায়, তেমনি করে আমরা তৈরী হই একটা ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে। সেই মোক্ষলাভ হলেই যদি চাকরি ভিক্ষে পাওয়া যায় তো প্রথমে কাছের আত্মীয়দের উপকার, পরে নিজের সংসার তৈরী করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। এই করতে করতে একদিন বুড়ো হলে মরে যাওয়া। আর এই সময় যত অন্যান্য অবিচার মুখ বুজে সন্নে যাওয়া নইলে নিজের দেওয়াল ভেঙে পড়তে পারে। শুধু স্বার্থপর হওয়ার জন্যে পড়াশুনা করে চাকরি জোটানো। কিংবা এদেশের ছেলেদের

কিছু করার পথ খোলা নেই বলেই পড়াশুনা নামক নিয়মটার মধ্যে আটকে থাকি। কল্যাণ এতদিন কলেজ করে স্পষ্ট বুঝে গেল তেমন কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে সে ফাস্ট ক্লাস পেয়ে যাবে। এবং তারপর সে তো শিক্ষিত মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হবে। কিন্তু সে নিজে জানে তার কিছুই জানা নেই। যে শিক্ষয় নিয়ে সে অনার্স পড়ছে তার কয়েকটা অধ্যায়, বাঁধাধরা প্রশ্ন এবং কিছু বাড়তি নোটস তাকে বৈতরণী সসম্মানে পার করে দেবে। এই শিক্ষার কোন মানে হয়? একটা সুপরিষ্কৃত চালাকির মধ্যে তাদের প্রতি বছর ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আর তারা সেই খাতে ঘোলা জল হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

‘কি হল, কলেজ নেই?’

কল্যাণ আবার বিছানায় ফিরে এসেছিল। মুখ ফিরিয়ে মাকে দেখল। নীচু গলায় বলল, ‘আছে।’

‘কখন গিয়ে উদ্ধার করবে?’

‘যাব না আজকে।’

‘কেন? কিছু হয়েছে নাকি? মুখচোখ ওরকম কেন?’

‘জানি না। হয়েছে কিছু। তোমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে?’

‘অনেকক্ষণ। তোমার জন্যে ভরদুপুরে কেউ চা করতে পারবে না। শোন, তুমি পড়াশুনা করছ বলে আমি কিছু বলতে পারছি না। কলেজে যদি না যেতে ইচ্ছে করে তাহলে চাকরির চেষ্টা করো। সূজন বলছিল ও নাকি ইচ্ছে করলে পার্টিকে বলে চাকরি পাইয়ে দিতে পারে।’

‘বিরক্ত কোর না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।’

‘তোমাদের সঙ্গে কথা বললেই বিরক্ত হও। আমি কি করে সংসার চালাবো বলতে পারো। একজন তো বিয়ে করে আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন কন্যাকুমারিকা।’

‘তুমি খামোকা মেজ বউদির পেছনে লাগছ। অবশ্য এটা তোমাদের ব্যাপার।’

মা যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, ‘আমি কি করছি না করছি তা নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। তুমি নিজেরটা দ্যাখো। মনে হচ্ছে ভরটর বাঁধিয়েছ, ওষুধ আনবো?’

‘দরকার নেই। শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।’

‘ভাত খাবি কি খাবি না?’

‘না।’

চোখ বন্ধ করে কল্যাণ পড়ে রইল অনেকক্ষণ। ঠিক কখন মেজবউদি ঘরে ঢুকেছিল টের পায়নি। নরম গলায় শুনতে পেল, ‘চা।’

শব্দটাকে অমৃত বলে মনে হল। চোখ খুলে সে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি দরকার ছিল?’

‘মা পাঠিয়ে দিলেন।’ মেজবউদি বলে চলে যাচ্ছিলেন।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, ‘মেজদা কবে ফিরবে?’

‘জানি না। কেন?’

‘তোমার উপর যা ঝড় যাচ্ছে তা সামলানো দরকার।’

‘এসব জেনেই তো এসেছি।’ মেজবউদি চলে গেল।

চা খাওয়া শেষ হলে বাবা দরজায় এসে দাঁড়ালেন, ‘জ্বর কত?’

‘দেখিনি। বেশী নয়।’ কল্যাণ উঠে পাঞ্জাবিটা টেনে নিল।

‘শুনলাম কলেজে যাবি না।’

‘হ্যাঁ।’

‘শরীর নিশ্চয়ই খুব খারাপ নইলে কামাই করবি কেন?’

কল্যাণ জবাব না দিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছিল।

‘কোথায় বেরুচ্ছিস?’

‘কাছেই।’

‘কলু, তোকে নিয়ে আমার কত গর্ব। আমার বংশে কেউ ফাস্ট ডিভিসনে স্টার পেয়ে পাস করেনি। কোনরকমে বি-এটা পাশ করে সরকারি পরীক্ষা দিয়ে দিলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদে চাকরি পেয়ে যাবি।’

‘তাতে তোমার কি লাভ হবে?’

‘মানে?’ বাবা যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

‘চাকরি করে তোমাদের হাতে চারশো টাকা ধরিয়ে দেব প্রতি মাসে বড়দা যেমন দেয়। তখন তোমার এই গর্ব বোধটা থাকবে?’

‘তা থাকবে। বলতে পারবো তো চিরকাল আমার সেজ ছেলে স্টার পেয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়তো। তবে কিনা একটা কথা, সন্তান তার আচরণের মাধ্যমেই পিতামাতার স্নেহ অথবা ভয় আদায় করে নেয়। তোমার দুই দাদার সঙ্গে তোমার তো চরিত্রের পার্থক্য থাকবেই। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়।’ ঝাপসা চোখে শীর্ণ বৃদ্ধ দরজায় একটা হাত রেখে যেন খুব গুতু তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন।

‘বাবা, তোমার কারো ওপর রাগ হয় না?’ আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ল কল্যাণ।

‘হয়। নিজের ওপরে হয়। কেন বাবা?’

‘আর কারও ওপরে হয় না? তোমার চারপাশে এত অন্যায় ঘটছে।’

‘হয় না। ভোর রাত থেকে কেরোসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায় অথচ দেখি সুজনের বন্ধুরা লাইনে কন্স্ট্রাল করার নামে বল্যাক করছে সমানে তখনও রাগ হয় না। মনে হয় এই যে দাঁড়িয়ে আছি তাতেও তো সময় কেটে যাচ্ছে। পাশের বাড়ির অনিলবাবু বলছিলেন, আপনার চিন্তা কি। ছেলে প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে, ভাল চাকরি পাবেই। আমি তখন খুশী হই। দ্যাখো সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, এখন আর রাগারাগি করে কি লাভ বল। তোমার কি খুব জ্বর বেড়েছে? মুখ চোখ লাল কেন?’

‘ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।’

‘তোমার মায়ের ওপর অসন্তুষ্ট হনো না। যাকে সব সামলাতে হয় তার মাথা ঠিক থাকে না। মানুষটা কোনদিন আরাম পেল না। আমিও দিতে পারিনি, এরাও পারল না।’

কল্যাণ হজতে চাইল, আমার ওপর এত ভরসা কোর না বাবা। কারণ ই’পুল্লের মত বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না আমার। কিন্তু তার জিত আড়ষ্ট হল। বাবার পাশ কাটিয়ে সে চুপচাপ বেরিয়ে এল বাইরে। কল্যাণের মনে হচ্ছিল এইভাবে কথা বলাটা ঠিক হয়নি। বাবার জন্য কণ্ট হয়, মায়ের জন্যেও, যে মেজবউদি এই সেদিন এল তার জন্যেও। কিন্তু সেসব কণ্ট আলাদা যখন সব মিলিয়ে দেখা যায় তখন আর কণ্টটা থাকে না। বরং তার বদলে একটা ক্রোধ আসে। প্রত্যেককেই স্বার্থপর বলে মনে হয় তখন। এইখানে একটু হোঁচট কেল কল্যাণ। মেজবউদিকে ঠিক স্বার্থপর বলার কোন কারণ এখনও পায়নি। কিন্তু ওই যে সব সহ্য করে এঁটুলির মত এই সংসারে লেগে থাকা—তার মধ্যেও এক ধরনের জেদ কাজ করে যা কল্যাণের মোটেই পছন্দ নয়।

বেশ নোদ উঠেছে। গলি থেকে বেরিয়ে বেশ কণ্ট হচ্ছিল কল্যাণের। চা খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু সেটা যে খুব সাময়িক তা বুঝতে পারেনি। কল্যাণ ধীরে ধীরে হেঁটে মোড়ের মাথায় চলে এল। বন্ধিমদা তখন দোকান খুলে সবে বসেছে। এখনও খন্দের আসেনি। কল্যাণকে দেখে বলল, ‘কি হয়েছে? জ্বর?’

কল্যাণ মাথা নাড়ল, ‘বোধ হয়। কাল রাত্রে ঠিক ছিল। আজ সকালে উঠে দেখি। কিন্তু এটাকে আজই সরিয়ে ফেলতে হবে। কালকের মধ্যে ফিট হতে হবে।’

বন্ধিমদা হাসল, ‘ঠিক আছে। ভেতরে এসে বস। আমি তোমার জ্বরটা দেখি। ডাক্তার না হলেও তোমার জন্যে ডাক্তারি করছি, পুল্লিশ জানলে—’

এই সময় একজন বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন কাউন্টারে, ‘কাল থেকে ছবার বাহি গিয়েছি। একটা ওষুধ দাও তো।’

‘কি ওষুধ দেব?’

‘সে আমি কি জানি? তুমি যা ভাল বোঝ তাই দাও।’

বন্ধিমদা কয়েকটা ট্যাবলেট এগিয়ে দিয়ে কিভাবে খেতে হবে বুঝিয়ে পয়সা নিল। কল্যাণ বলল, ‘তুমি তো ডাক্তারদের বারোটা বাজাবে, দোষ দিলে আমাকেই।’

জ্বর বেশী নয়। এক পয়েন্ট চার। ওষুধ খাইলে বন্ধিমদা বলল, ‘বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাক। দুপুর বিকেল রাত্রে বাকিগুলো খেয়ে নিস।’

কিন্তু কাউন্টারের ভেতরের চেয়ারে বসে থাকতে ভাল লাগছিল কল্যাণের। এখন থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে ওষুধ

কিনতে লোক আসছে। তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ভুলে থাকা যায়।
সে বঙ্কিমদাকে বলল, 'আমি একটু বসি বঙ্কিমদা।'

'বস।' বঙ্কিমদা খন্দের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তখনই মনে পড়ল আজ সকালে টিউশনিতে যাওয়া হল না। বুড়ো খুব
খচবে। কাউকে দিয়ে খবর দেওয়াও সম্ভব নয়। খচুক বুড়ো, অসুখ-বিসুখ
কাউকে নোটস দিয়ে আসে না। কল্যাণ দেখছিল খন্দেরদের। কতরকমের
অসুখ মানুষের হয়। বিচিত্র সব নামের ওষুধ। প্রেসক্রিপসন দেখে
বঙ্কিমদা চটপট বলে দিচ্ছে আছে কি নেই। আধ ঘণ্টা বাদে সে জিজ্ঞাসা
না করে পারল না, 'আচ্ছা বঙ্কিমদা, তুমি কতগুলো ওষুধের নাম জানো?'

একজন ভদ্র মহিলাকে প্যাকেট দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বঙ্কিমদা, 'মানে?'

'যে যা চাইছে ফটাফট দিয়ে মাছ কিংবা নেই বলছ। এত মনে থাকে?'

'অব্যাস বৎস অব্যাস। মাথা নেড়ে বঙ্কিমদা আর এক খন্দেরকে বলল,

'ওষুধটা নেই। তবে একই জিনিস অন্য কোম্পানীর আছে, দেব?'

লোকটি আপত্তি জানিয়ে চলে গেল। বঙ্কিমদা চাপা গলায় বলল, 'ডাক্তারের
কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসবে। ডবল খাটুনি।'

'কেন?'

'আগের ওষুধটা বন্ধ হয়ে গেছে সে-খবর ডাক্তার জানে না।'

'তুমি তো বেশ জানো।'

'আঃ, এ ছোঁড়া তো দেখছি বড্ড জ্বালাচ্ছে!'

'বেশ, বেশ আমি উঠছি।' কল্যাণ হাসল।

'আমি উঠতে বলিনি। চা চলবে?'

'চলতে পারে। আমি বাইরে দাঁড়াছি।' ওষুধের গুণেই হোক কিংবা এই
ওষুধের ভিড়ে বসেই হোক এখন একটু ভাল লাগছিল কল্যাণের। এইসময়
সে শুভব্রতকে দেখতে পেল। শুভব্রত এ পাড়ায় থাকে না। কল্যাণ হাসল,
কি খবর?'

'আরে কল্যাণ। ব্যাপারটা কি বলত?'

'কিসের ব্যাপার?'

'তুমি তিন মাস হঠাৎ ডুব মারলে কেন? বিমলেশদা তোমাকে খুব খুঁজছে।
বাড়িতে লোক পাতিয়েছিল। খুব ভাল রোল ছিল তোমার নেক্সট নাটকে।
কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

'তুমি আর গ্রুপে যাবে না বলে ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। বিমলেশদা বা তোমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক
নেই। আসলে আমার ভাল লাগছে না কিছু।'

শুভব্রত একটু বাঁকা হাসল, ‘গ্রুপ থিয়েটার করার মত মানসিকতা সবার থাকে না। ঠিক আছে। চলি।’ কল্যাণ ওর চলে যাওয়াটা দেখল। তারপর মাথা নেড়ে গলা তুলে বলল, ‘বঙ্কিমদা, চা থাক, আমি বাড়িতে যাচ্ছি।’

‘আরে এসে গেল বলে!’ কাউন্টারের ভেতর থেকে চোঁচালো বঙ্কিমদা।

‘না থাক।’ হাঁটিতে হাঁটিতে কল্যাণ বুঝল তার শরীরে যে সুস্থবোধটা ফিরছিল শুভব্রতের সঙ্গে কথা বলার পর তা উধাও হয়েছে। আবার মাথাটা টিপটিপ করছে, হাত পা কামড়াচ্ছে, সমস্ত শরীরে ম্যাজম্যাজানি। আজ সারাটা দিন তাকে পড়েই থাকতে হবে।

গলির মুখে আসতেই বাবাকে উদভ্রান্তের মত বেরিয়ে আসতে দেখল। তাকে দেখতে পেয়েই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ‘সর্বনাশ হয়েছে, বড় বউমার হাত পুড়ে গেছে।’

‘সেকি! কি করে হল?’

‘রান্না করতে গিয়ে। আমি বঙ্কিমের দোকানে যাচ্ছি ওষুধ আনতে।’ তারপর একটু থেমে বললেন, ‘সঙ্গে তো বেশী পয়সা নেই, বঙ্কিম যদি—’

‘আমার কথা বলো, আমি দাম দিয়ে দেব বঙ্কিমদাকে।’

আশ্বস্ত হয়ে বাবা ছুটলেন দোকানের দিকে। কল্যাণ বাড়িতে তাকে দেখল তুলকালাম কাণ্ড চলছে। বড়দা চিৎকার করছে, মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। শুধু মেজবউদির অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সূজনের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল।

সূজন বলছে, ‘রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়েছে, এ নিয়ে এত চিন্তাবার কি আছে! বাড়িটা মাইরি নরক হয়ে গেল।’

সঙ্গে সঙ্গে বড়দা বেরিয়ে এল ঘর থেকে, ‘চোপ। বড়দের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না। রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে। ইচ্ছে করে উনুনের ওপর এমনভাবে সসপ্যানটা রেখেছিল যাতে ছুঁলেই অ্যান্ড্রিডেন্টটা হয়।’

‘কে রেখেছিল?’ সূজন একটু খিঁচিয়ে গেল যেন।

‘মেজ। এই পনের দিন তার ডিউটি নয়। বিপাকে পড়ে বলেছিলাম রান্নাঘরে যেতে।’ মা তীব্রস্বরে জানালেন।

‘কেন বলবে? তুমি যখন দুই বউকে মাসটা ভাগ করে দিয়েছ তখন কেন মেজবউদি যাবে? মেজবউদির পালা এলে কি বড়বউদি কখনও রান্নাঘরে ঢোকে?’

‘সে বিষয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।’ মা বাঁকিয়ে উঠলেন।

এবার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, ‘বড়বউদির হাত কিরকম পুড়েছে?’

বড়দা বলল, ‘কি রকম মানে? আমি কি ডাক্তার?’

‘বেশী পুড়লে হাসপাতালে নিয়ে গেলেই হত। বাবাকে কেন ছুটতে হল বঙ্কিমদার কাছে? দায়িত্বটা কার ছিল?’

‘দায়িত্ব শেখাচ্ছ আমাকে ? আমি যদি এক সময় টাকা বন্ধ করতাম তাহলে না খেয়ে মরত সবাই। দায়িত্ব !’ বড়দা ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল।

সুজন হঠাৎ বলে বসল, ‘আমার কেসটা গড়বড়ে লাগছে। কই দেখি, বড়বউদির হাত কিরকম পুড়েছে !’

বড়দা ঘুরে দাঁড়াল, ‘তার মানে ? তুই সন্দেহ করছিস ? মা দ্যাখো, কিরকম অপমান করছে আমাদের ? এর পরে আমার কি করা উচিত ?’

সুজন বলল, ‘অপমান ? আরে দেওয়ার হিসাবে বউদির হাত দেখতে চাওয়া কি অপমান করা ! মা তুমি কি বল ?’

এবার মায়ের গলায় কামা এল, ‘আমার আর এই বাড়িতে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। কি ভুল করেছি বিয়েতে সম্মতি দিয়ে।’

‘সম্মতি না দিলে চারশো টাকা লস করতে প্রত্যেক মাসে !’

এই সময় বাবা ফিরে এলেন মলম হাতে, ‘এই যে নাও, ভাল করে হাতে লাগিয়ে দাও। তবে বন্ধিম বলল, বেশী পুড়ে গেলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। কতটা পুড়েছে ?’

মা বাবার হাত থেকে মলমটা টেনে নিয়ে বললেন, ‘হাসপাতালে যেতে হবে না !’

তারপর বড়দার দরজায় এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘এইটে লাগিয়ে দে খোকা। দেখিস বেশী চাপ যেন না পড়ে।’

বাবা কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বন্ধিম আমার কাছ থেকে পয়সা নিল না। বলল, আপনার ছেলের কাছ থেকেই নেব।’

সুজন হা হা করে হাসল, ‘যা বাবা, সেজদা তোরাই তাহলে চোট গেল।’

‘চোট কেন বলছিস ?’ কল্যাণ নিজের ঘরের দিকে এগোল।

‘যাকে নিয়ে এত কেন তাকে একবার নিজে দেখনি ?’

‘কাকে ?’

‘যার হাত পুড়েছে। আসলে পোড়েইনি। সব ভাওতা। এই হাত পোড়ার নাম করে দিব্যি পনের দিন কাটিয়ে দেবে খাটে বসে। রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না। মেজবউদিকে তখন হেঁসেল ঠেলতে হবে। সব ট্যাকটিস বোঝা আছে আমার ?’

বাবা বললেন, ‘কি বলছিস তুই ?’

সুজন বলল, ‘মিথ্যে বলছি কিনা বড়বউদি বাইরে এসে প্রমাণ দিক। হাতে কাপড় জড়িয়ে এলে চলবে না। কই আসুক।’

এতক্ষণে বড়দার ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল, ‘মস্তানি করছে তোমার ভাই। বলে দাও এটা মস্তানির জায়গা নয়। মেজর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক তা কি আমার জানতে বাকী আছে।’

হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল একটু সময়। তারপর সুজনের হো হো হাসি শোনা গেল, ‘মা, তোমার বড়বউকে পাঠি করতে বল। হেভি টপে যাবে।’

কেউ উত্তর দিল না। যে যার ঘরে চলে গেল। কল্যাণ মেজদার ঘরের দিকে তাকাল। সেখানে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে আর পারছিল না। ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সুজন জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কিছু হয়েছে সেজদা ?

'হ্যাঁ, জ্বর।'

'ওমুখ খেয়েছিস ?'

হ্যাঁ।

'বাড়িটা ক্রমশ নরক হয়ে যাচ্ছে। এখন থেকে যে সটকাবো তার উপায় নেই। একশ টাকায় কে আমাকে থাকা-খাওয়া দেবে, বল ?'

কল্যাণ জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করল।

॥ ৫ ॥

বিছানায় গা এলিয়ে প্রথমে মনে হয়েছিল ঘুম আসবে না, কিন্তু কখন যে রাতটা কেটে গেছে টের পাননি জয়িতা। দরজা জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটায় এখনও আবহা অন্ধকার। মাড় ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। নটা বাজতে দশ। আজ সকাল দশটায় কপি হাউসে প্রত্যেকের মিট করার কথা। এত বেলা পর্যন্ত কখনও বিছানায় থাকে না জয়িতা। আজ কেউ তাকে ডেকেও দেয়নি।

আর এই সময়েই তার মনে পড়ল আগের রাত্রের কথা। এ ঘরে চলে আসার পর সে সীতারামের কোন সাড়াশব্দ পায়নি। এখনও এই বাড়িতে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। লাগোয়া বাথরুম থেকে তাজা হয়ে ফিরে এল জয়িতা। কিন্তু তখনই বুঝতে পারল মাথাটা টিপটিপ করছে। এতটা ঘুমিয়েও স্থিরতা আসেনি।

জিনসের প্যান্ট আর নীল সার্টটা পরে নিল জয়িতা। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি বোলাল। তার মুখে একটা মিষ্টি ছাপ আছে। চোখে এবং চিবুকে সেটা মাখা মাখি। কিন্তু আর কোথাও মেয়েলিপনা নেই। এই যে সার্ট প্যান্ট পরে আছে, কোথাও কোন চেউ নেই। আজ হঠাৎ তাঁঁট কামড়াল জয়িতা। তারপর মাথা ঝাকিয়ে হেসে ফেলল।

বাইরে বেরিয়ে সে শ্রীহরির মুখোমুখি হল। জয়িতা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি বেরুচ্ছি।'

শ্রীহরি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জলখাবার খাবে না ?'

'না। সমস্যা নেই।' চলতে চলতে উত্তর দিয়ে চারপাশে তাকাল সে। না, কোথাও সীতারামকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জয়িতা নিজেও চাইছিল না এইসময় মুখোমুখি হতে। দরজা টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে।

নিচে নেমেও মনে হল এই পাড়ায় দিন শুরু হয়নি। বড় লোকদের পাড়ায় অজুদ একটা আলস্যের ছায়া মাখা হয়ে থাকে। ফুটপাতেও লোকজন নেই।

দোকানপাট বলতে এই পথে একটা কেক-পাটিসের দোকান, সেটা এখনও খোলেনি।

আরও কিছুটা এগোতেই সে অজুত দৃশ্য দেখল। একটি চৌদ্দপনের বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে হনহন করে এগিয়ে আসছে কাঁদতে কাঁদতে আর তার খানিকটা পিছনে ছুটে আসছেন একজন প্রৌঢ়। প্রৌঢ় ডাকছেন, ‘খুকি আয়, খুকি শোন, জাস্ট এ মিনিট।’ হঠাৎ মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘ডোল্ট চেজ মি, ডোল্ট কল মি খুকি।’

ভদ্রলোক ততক্ষণে কাছে এসে পড়লেন, ‘আরে, তুই বুঝতে পারছিস না।’

‘আমার কিস্যু বোঝার দরকার নেই। তুমি আমার সঙ্গে এসো না।’

‘না মানু, রাগ করিস না—।’

‘রাগ? নো, রাগ কেন করব। হু আর ইউ? তুমি তো আমার বাবা নও। আমাকে একাই যেতে দাও।’ মেয়েটা চোখের জল মুছে নিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। জয়িতা ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। এতক্ষণে তার মনে হল ভদ্রলোককে সে দু-একবার দেখেছে তাদের ব্লকে চুকতে। তবে এদিকে থাকে না নিশ্চয়ই, নইলে চিনতে পারত। মেয়েটি মেরকম ভঙ্গী করছে তাতে অন্য জায়গায় ভীড় জমে যেত। জয়িতা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘একসকিউজ মি! মে আই হেল্প যু?’

মেয়েটা ওর দিকে তাকাল। তারপর ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়ল, ‘না।’

জয়িতা এবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি ওর কে হন?’

ভদ্রলোক জয়িতাকে যেন আমল দিলেন না, মেয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘খুকি, বাড়িতে চল।’

‘আমাকে তুমি খুকি বলে ডাকবে না।’ মেয়েটি একবার ফুঁপিয়ে উঠল।

এবার ভদ্রলোক জয়িতার দিকে খানিকটা অসহায় চোখে তাকালেন। বোধহয় এই সময় বুঝতে পারলেন সামনে আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন নিজের কাছে সাফাই দেবার ভঙ্গীতে তিনি বললেন, ‘এই পাড়াটাকে ভদ্রপাড়া বলেই জানতাম। এখানে তো আগেকেরকবার এসেছি, এরকমটা দেখিনি।’

‘কি হয়েছে?’ জয়িতা বুঝল ভদ্রলোক খুব নার্ভাস।

‘ওই তো, ট্রাম থেকে নেমে মেয়েকে নিয়ে আসছিলাম।—’

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে মেয়েটি কান্না জড়ানো গলায় ফুঁসে উঠল, ‘মেয়ে বলবে না।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে।’ ভদ্রলোক চাপা দিতে চাইলেন, ‘হ্যাঁ, ওই যে ওখানে একটা পার্ক আছে, ওর পাশ দিয়ে আসার সময় তিনটে ছেলে রিমার্ক পাশ করতে লাগল।’

‘কোন তিনটে ছেলে?’

‘পার্কের রিলিঙে বসে ছিল। তা আমি বললাম, প্রতিবাদ করার দরকার নেই, নির্জন রাস্তা তাড়াতাড়ি চলে এস। ওসব ছেলেরা যে কি মারাত্মক হয় তা তো জানি।’ ভদ্রলোক জয়িতাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে হালকা করতে চাইলেন পরিবেশটাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি প্রতিবাদ করল, ‘না, তুমি সব কথা বললে না। আমি আর বাবা আসছিলাম। তিনটে রোগা রোগা ছেলে রেলিঙে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। একজন চিৎকার করে বলল—।’ মেয়েটি কান্না থামাতে তেঁাট কামড়ে ধরল।

‘কি বলল?’ নিবিকার মুখে জয়িতা প্রশ্ন করল।

‘আমি বলতে পারব না। খুব খারাপ কথা। ওইসব বলে ওরা আমাকে ডাকছিল। আমি বললাম ছেলেগুলোকে কিছু বলো। তুমি শুনতেই চাইলে না। বরং জোরে জোরে পা ফেলে জায়গাটাকে পেরিয়ে আসতে চাইলে। আমি বললাম ওরা আমাদের পিছনে আসছে? তুমি বললে, তাকিও না। ওরা ডেজারাস। ওরা অবশ্যই এল না কিন্তু হায়নার মতো হাসতে লাগল। নিজের মেয়ের সম্মান বাঁচাতে পার না তুমি, কি করে নিজেকে বাবা বলছ?’ শেষ প্রশ্নটায় স্বর উঁচুতে উঠল।

‘কি বলি বলুন তো, ওখানে প্রতিবাদ করতে যাওয়াটা—।’

ভদ্রলোক জয়িতার সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে তাকাতেই সে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘ছেলেগুলো যদি ওকে জড়িয়ে ধরে অত্যাচার করত তাহলে কি করতেন?’

‘না না, সে সাহস পাবে না। নির্জন রাস্তা বটে তবে অতটা।’

‘যদি করত?’

ভদ্রলোক জয়িতার মুখের দিকে তাকালেন। কি বলবেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না। জয়িতা বলল, ‘আপনি যদি তখনই প্রতিবাদ করতেন, একটি ছেলেকে মেরে অন্য দুজনের কাছে যদি মার খেয়ে মরেও যেতেন তাহলে সারা জীবন আপনার মেয়ে বলত বাবা আমাকে রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন। আপনি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাইলেন আজ কিন্তু চিরকালের জন্যে মেয়ের কাছে মরে থাকবেন।’

ভদ্রলোক মাথা নিচু করে বললেন, ‘আমি বুঝতে পারছি, এখন বুঝতে পারছি। আসলে ওরকম কিছু হলে সরে আসাই অভ্যেস হয়ে গেছে তো।’

‘ছেলেগুলো কি এখনও আছে ওখানে?’

‘জানি না।’

‘চলুন তো।’

‘আঁ। মানে—।’

‘আমার মনে হয় আপনার যাওয়া উচিত।’

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, ‘ওরা এখন ওখানে নাও থাকতে পারে। তাছাড়া আমাদের এমনিতে খুব দেরী হয়ে গেছে। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের

মামা পুলিশে বড় কাজ করে। তাকে রিপোর্ট করব আমি।' ভদ্রলোক কথা শেষ করার আগেই মেয়েটি গন্তব্য পথে হাটতে শুরু করল। ভদ্রলোক যেন তাতে বেঁচে গেলেন। আর কথা না বাড়িয়ে মেয়েকে অনুসরণ করলেন। জয়িতা ওর চলে যাওয়াটা দেখল। ভদ্রলোককে সে বুঝতে পারছে কিন্তু মেয়েটি? তার প্রস্তাবে সে তো সাড়া দিল না। বাবাকে অভিযুক্ত করছিল কিন্তু এই সময় তো বাধ্য করতে পারত বাবাকে ছেলেলোকের সামনে যেতে। ও কেন ফিরতে চাইল না?

জয়িতা সতর্ক হয়ে হাটছিল। দুপাশে বাগানওয়ালা চমৎকার বাড়ি। এবং তারপরেই পার্কটাকে দেখতে পেল। পার্কের রেলিঙে একটি ছেলে একা বসে আছে। তিনজনের দলটাকে ধারে কাছে দেখতে পেল না জয়িতা। সন্ধিগ্ধ চোখে ছেলেটির দিকে তাকাল। ছেলেটি উদাসীন মুখে বসে আছে। যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। এই সময় পার্কের ধারে ট্রাম স্টপে ট্রাম এসে দাঁড়াতে একটি অল্পবয়সী মেয়ে নামল। মেয়েটিকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে ছেলেটি হাত নাড়তে আরম্ভ করল। জয়িতা আর দাঁড়াল না। এবং তখনই তার নজর গেল হাত ঘড়িতে। সর্বনাশ, আনন্দ আজ খচে ফায়ার হয়ে যাবে। একটা উত্তরের দিকে যাওয়ার বাসের জন্যে উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাতে লাগল সে। দেরি হলে আনন্দ শুধু গভীর চোখে তাকাবে কিন্তু চিমটি কাটার সুযোগ পেয়ে যাবে সুদীপটা।

কফি হাউসের সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতালার কোণের দিকে তাকাতেই ওদের দেখতে পেল জয়িতা। আনন্দের চোয়াল শক্ত, অর্থাৎ খচেছে। সুদীপটা ওকে দেখাবার জন্যেই ইচ্ছে করে ঘড়ির দিকে তাকাল। কল্যাণ বসে আছে চুপচাপ। ওর পাঞ্জাবির উপরের বোতামটাও বন্ধ। অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে। চতুর্থ খালি চেয়ারটায় গিয়ে বসল জয়িতা। সুদীপ বলল, 'আধ ঘণ্টা, এমন কিছু বেশি নয়।'

আনন্দ বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সামলালো নিজেকে, 'আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত সময়টা ঠিক রাখা। বাঙালির টাইম ব্যাপারটাকে আমি ঘেন্না করি।'

সুদীপ বলল, 'ঠিক হয়, ওর নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধে হয়েছিল। ব্যাপারটা শোনা যাক।'

আনন্দ বলল, 'অসুবিধে তো নিশ্চয়ই হয়েছিল নইলে দেরি করবে কেন? তবে সেটা আমাদের শোনার কোন প্রয়োজন নেই। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা ইন্টারেস্টেড নই।'

জয়িতা হেসে বলল, 'ফাইন।'

আনন্দ মুখ ফেরাল, 'ফাইন মানে?'

জয়িতা বলল, 'আমি যে টেবিলে বসে সরি বলব তার সুযোগ পর্যন্ত তোরা দিলি না। আর এমন ভঙ্গীতে কথা বলে যাচ্ছিস যেন আমি ফাঁসির

আসামী। আমি স্বীকার করছি আমার দেরী করা অন্যান্য হলে গেছে। আর এই দেরীটা হত না যদি রাস্তায় একটা ঘটনা না ঘটত। তিক আছে, আমি আবার বলছি, দুঃখিত।’

সুদীপ চোখ কুঁচকে তাকান, ‘রাস্তায় আবার কি হল?’

জন্মিতা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা ইন্টারেস্‌ডেট নই।’

আনন্দ বলল, ‘স্টপ ইট। তোরা কেউ কফি খাবি?’

জন্মিতা বলল, ‘আমি সকাল থেকে কিছুই খাইনি। আমি একটা লেটব্রেকফাস্ট চাই।’

কল্যাণ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সুদীপ জন্মিতাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘পকেটে মাল আছে তো?’

জন্মিতা মাথা নাড়ল, ‘দ্যাটস নট ইওর হেডেক।’

এবার কল্যাণ জন্মিতার দিকে তাকাল। সেটা দেখতে পেলে জন্মিতা জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার কি হয়েছে? গলা বন্ধ করে বসে আছিস কেন?’

‘জ্বর, গা হাত পা ব্যথা এবং খিদে।’ কল্যাণ হাসল।

‘খিদে?’

‘হ্যাঁ। কাল থেকে অনশনে আছি। সারাদিন জ্বরের ঘোরে উঠতে পারিনি। সকালে একটু বেটার মনে হওয়ায় চলে এলাম। বাড়িতে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি কিছু খাব কি না।’

‘সেকি!’

‘এরকমই হয়। এ নিম্নে মাথা ঘামানোর মানে যদিও হয় না তবু শালা আমি মাঝে মাঝে সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাই। তোদের স্ক্রিজ ভর্তি খাবার তুই খাসনি আর আমার বাড়িতে খাবার নেই বলে আমি খেতে পারিনি। তুই যা বলবি তাই আমার জন্যে বলে দে কিন্তু পয়সা আমি দিতে পারব না। কল্যাণ জন্মিতার দিকে তাকাল, আবার হাসল।’

জন্মিতা হেঁট কামড়ালো। তারপর বলল, ‘দ্যাখ কল্যাণ, তোকে কথাটা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমাদের জন্মের ওপর কোন হাত ছিল না। তুই বিত্তহীন পরিবারে জন্মেছিস আমি বড়লোকনীতে। ফলে আমি যা দরকার তার চেয়ে বেশী পেয়েছি, তুই তার তুলনায় কিছুই পাসনি। কিন্তু তার জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই। তাছাড়া আমি সবসময় চেষ্টা করি বাড়ি থেকে দেওয়া ফেসিলিটিগুলো অ্যাভয়েড করতে। আমার মানসিকতার সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। তুই জেনে শুনে আমাকে খোঁটা দিস কেন?’

কথাগুলো কল্যাণ শুনছিল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ সমস্ত নিয়ে বলল, ‘আমি চাই না বলতে, কেন যে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।’ আনন্দ বলল, ‘আসলে তুই কখনও কমপ্লেক্সটা কাটাতে পারিসনি।’

‘কিসের কমপ্লেক্স?’

‘জয়িতা বা সুদীপ বড়লোক।’

‘একমিনিট, আমি বড়লোক নই, শ্রীযুক্ত বাবু অবনী তালুকদারের সঙ্গে আমার কোন আর্থিক দেওয়ান-নেওয়ার সম্পর্ক নেই ভাই।’ সুদীপ হাত নাড়ল।

কল্যাণ বলল, ‘তুই আমাকে এখনও বুঝতে পারিসনি আনন্দ। ওদের সম্পর্কে আমার জানত কোন কমপ্লেক্স নেই। আসলে আমাকে কি লড়াই করে বাড়িতে একা একা বেঁচে থাকতে হয় তা তোরা কেউ জানলি না।’

সুদীপ বলল, ‘তোকে লড়াই করতে হয় জন্মের সঙ্গে। আর আমাদের লড়াই নিজের বিরুদ্ধে। একা একা বেঁচে থাকাটা কিন্তু এক। আমরা তো সবাই আমাদের কথা জানি তাহলে আর এই আলোচনা কেন?’

জয়িতা বলল, ‘সুদীপ, রামুকে ডাকতো, কল্যাণ আর আমার জন্যে খাবার বল। আমি যা খাবো তাই তোকে খেতে হবে কিন্তু।’

সুদীপ বলল, ‘বাঃ, আমি আর আনন্দ?’

চারজনের জন্যেই খাবার বলল জয়িতা। তারপর সকালে দেখা মেয়েটার ঘটনা বলল। আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘এইটেই মুশকিল। পাবলিকের মেরুদণ্ডটা আটব্লিশ বছরে প্লাস্টিকের হয়ে গেছে। কেউ প্রতিবাদ করবে না। কাল আমি আর সুদীপ যখন দমদমে যাচ্ছিলাম তখন টানা ব্রিজের ওপর সব বাস মিনিবাস লরি একঘন্টা ধরে দাঁড়িয়েছিল। পাকপাড়ার কাছে ব্রিজের মুখে চারটে ছেলে টেম্পোয় সন্তোষী ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছিল নাচতে নাচতে, কেউ তাদের সরতে বলছিল না, তারাও নেচে যাচ্ছিল।’

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, ‘তারপর? তোরা কি করলি?’

সুদীপ উত্তর দিল, ‘আমরা আছি খালের এপাশে বাগবাজারে।’

জয়িতা হাসল, ‘সবাই ওরকম ভাবে, আমি দূরে আছি, সামনাসামনি যারা আছে তারা প্রতিবাদটা করুক।’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘কথাটা ঠিক বলেছিস তুই কিন্তু কিছু করতে গেলে আমাদের এক মাইল দৌড়ে যেতে হত। ততক্ষণে জ্যামটা বাধিয়ে দিয়ে ছেলেগুলো হাওয়া হস্লে গেছে।’

ওরা প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে নিচ্ছিল। সুদীপ মাঝে মাঝে জয়িতার দিকে তাকাচ্ছিল। গতরাতে ওরকম একটা ফোন করার পর সেই প্রসঙ্গ একবারও এল না। কথাটা তোলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। খাওয়া শেষ হলে সে খুব স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, ‘এন্টরিথিং নর্মাাল?’

জয়িতা তখন কল্যাণের প্লেটের দিকে তাকিয়ে। ওর যে ক্ষিদে পেয়েছিল খুব তা বোঝা যাচ্ছে। কারণ কল্যাণ খাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে। বাকি তিনজনের শেষ হয়ে গেছে, কল্যাণ এখনও মাঝপথেই আছে। বেশ কিছুদিন আগেও এই খিউরিটা জানিয়েছিল। যদি খিদে খুব বেশী থাকে এবং সেই তুলনায়

খাবার কম থাকে তখন পেট ভরাবার আমেজ পাওয়ার উপায় হল ধীরে, খুব ধীরে খাওয়া। মনে হবে অনেক খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু ওর জন্যে আবার খাবার বলাও যাবে না, সবাই যা খেয়েছে তার বেশি ওকে দিতে চাইলে স্বাভাবিক ভাবে নেবে না। সে সুদীপের প্রশ্নটা এইসময় গুনতে পেয়ে মুখ ফেরাল, ‘কোনটে নর্মাল?’

সুদীপ একটু বিস্মিত, বলল, ‘কাল রাত্রে যেটা বললি।’

জয়িতা কাঁধ নাচাল, ‘ওই বাড়িতে থাকতে হলে ওই সব প্রশ্নে মনিয়েই থাকতে হবে। সরি, কাল রাত্রে তোকে ডিস্টার্ব—!’

ওকে থামিয়ে দিল সুদীপ, ‘হোয়াটস দিস?’

‘মানে?’

‘হঠাৎ এরকম ফর্মাল হতে আরম্ভ করলি কেন?’ সুদীপের গলা চড়ল।

আনন্দ এতক্রমে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার?’

জয়িতা হেসে বলল, ‘এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই না সুদীপ?’

আনন্দ বলল, ‘কাজের কথায় আসা যাক। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম কল্যাণকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাব। কিন্তু তোর শরীর তো ফিট নয়, রেস্ট নিয়ে সারিয়ে তোলা নিজেকে। যদি মনে হয় আমার হোস্টেলে আসতে পারিস।’

কল্যাণের খাওয়া তখন শেষ পর্যায়ে। বলল, ‘আজ যেতে পারব।’

‘পারবি তবু বিশ্রাম নে। সুদীপ চলুক। ওর কে এক আত্মীয়া থাকেন ঠাকুরপুকুর। আজই ফিরে আসার চেষ্টা করব। প্রত্যেকে কিপ ইন টাচ।’ আনন্দ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে জানাল।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, ‘কাল দমদমে কি হল? পাটি’ রাজি হয়েছে?’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘না, পাটি’ এখনই কোন অ্যাকশনে নামবে না।’

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘কি করবে? শহীদ মিনারের তলায় দাঁড়িয়ে গরম গরম কথা বলে পাটি’র অস্তিত্বের প্রমাণ দেবে? কি চায় পাটি’।’

আনন্দ বলল, ‘পাটি’ এমন কাজ করতে চায় না যেটাকে হঠকারিতা বলা হয়ে থাকে। একটু একটু করে দেশের মানুষের মন দখল করার পরেই পাটি’ আন্দোলনের ডাক দেবে। একাত্তর সালে একদল যে ভুল করেছিল পাটি’ তা আর করতে চায় না।’

কল্যাণ একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল, ‘পাটি’ ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে কবে?’

সবাই হেসে ফেলল। বলল, ‘একটা কথা ঠিক পাটি’ এখনও অর্গানাইজড নয়। এদেশে এই পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব নয়। একজন নেতা নেই যার ওপর দেশের মানুষ নির্ভর করবে, বিশ্বাস করতে পারবে।’

জয়িতা বলল, ‘পিপুল? আই ক্যান্ট বিলিভ দেম।’

আনন্দ বলল, ‘ভুলে যাস না ইউ আর ওয়ান অফ দেম।’

জয়িতা হাসল, ‘সিওর। আই বিলিভ, ঠিক আছে; ক্যারি অন।’

আনন্দ মুখ নামাল, 'ব্যাপারটা হল, এখন শুধু বিপ্লব বিপ্লব খেলা করা যেতে পারে। উইদাউট অর্গানাইজিও পিপল ঝাঁপিয়ে পড়া বোকামি। তার জন্যে সময় লাগবে। অনেকরকম প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাছাড়া জনসাধারণ এখন দিনকে দিন আরও ক্যালাস হয়ে পড়েছে। তাদের ইনভলভ করা দরকার। একাত্তরের ভুল পার্টি করতে চায় না। ওই অভিজ্ঞতাই পার্টি কাজে লাগাতে চায়। যুক্তি খুঁজতে চাইলে এই বক্তব্যে আমি কোন ফাঁক পাইনি।' জয়িতা চোখ ছোট করল, 'তাহলে?'

কল্যাণের খাওয়া শেষ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'দ্যাখ আনন্দ, পার্টির সঙ্গে তোর সম্পর্কেই আমরা সম্পর্কিত। সুদীপ বোধহয় কিছুটা। কিন্তু আমি কিংবা জয়িতা এসব মানব কেন?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কেউ মানতে বলেনি।'

কল্যাণ এমন উত্তর আশা করেনি। ও ভেবেছিল আনন্দ পার্টির পক্ষ নিয়ে তাকে বোঝাতে চাইবে। একাত্তরের আন্দোলন এখন শুধুই স্মৃতি। সেই স্মৃতি কোন কোন পরিবারের পক্ষে তীব্র বেদনাদায়ক। কিন্তু ওরা জেনেছে সেই সময় একটা বিরাট ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। তখন ওদের বয়স খুবই অল্প। জয়িতা কিংবা সুদীপের কিছুই মনে নেই। আনন্দের আবছা কিন্তু কল্যাণের স্পষ্ট। তখন উত্তর কলকাতায় তাদের পাড়ায় প্রায়ই বোমা ফাটত। মা ওদের ভাইদের জড়িয়ে ধরে বসে থাকতেন। আর বাবার আসার সময় চলে যাওয়ার উপক্রম হলেই তাঁর কান্না শুরু হত। আর মাঝে মাঝেই পুলিশের হামলা হত পাড়ায়। দুদিন তাদের বাড়ি তছনছ করেছিল পুলিশ। সেই ছবিটা এখনও কল্যাণের স্পষ্ট মনে আছে।

কিন্তু পরে একাত্তরের আন্দোলন নিয়ে ওরা অনেক আলোচনা করেছে। নকশালপন্থী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয় তারা কেন ওই কাজ করেছিল তাই নিয়ে নানান বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। সেসবও ওদের পড়া। যত জানতে চেয়েছে তত ধোঁয়াশা বেড়েছে। পরবর্তীকালে সেইসময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ দেখে সেটা আরও ঘনীভূত হয়েছে। সেই সময়ের এক ভারতবিখ্যাত বিপ্লবী নেতা এখন দিনরাত দেশী মদ খেয়ে বেড়ান। কোন দলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। বিপ্লব করার কল্যাণে তিনি সরকারী আনুকূল্য পেয়েছিলেন ব্যবসা করার জন্যে। সেসব উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় মানুষের করুণা ভিক্ষে করেন মদ খাওয়ার জন্যে। সম্প্রতি ওঁরই এলাকার একদা কমরেডদের সম্মেলন হয়ে গেলে কিন্তু তাঁকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, তাঁর নিজেরও বোধহয় সে আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এই মানুষটি বুদ্ধিমান নন। নিজের অজিত নামকে তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। কিন্তু আন্দোলন খতম হয়ে গেলে যেসব মাঝারি নেতা জীবিত রইলেন তাঁরা কিছুদিন অপেক্ষার পর চেহারা পাল্টাতে লাগলেন দ্রুত। বিভিন্ন দল ভাগ হয়ে গিয়ে একে অপরের নিন্দে করা শুরু করলেন।

এ আন্দোলন একটা মহৎ প্রচেষ্টার সম্মান পেতে পারত তাকে ছিন্নভিন্ন করার প্রবণতা দেখা দিল এইসব যাদুনাগ্নকদের। তারপর এঁদের অনেকেই ফিরে গেলেন সেইসব মানুষ, প্রতিষ্ঠান কিংবা ধারার কাছে যাঁদের এতকাল এঁরা গালাগাল দিয়ে এসেছিলেন বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্ট বলে। যাঁরা এককালে নির্বাচন পদ্ধতিকে গালিগালাজ করেছেন তাঁরাই অতঃপর নির্বাচনের দিকে ঝুঁকেছেন।

মজার কথা দু-একজন ছাড়া কাউকেই জনসাধারণ নির্বাচিত করেনি। তাও প্রথমবার, পরের নির্বাচনে তাঁদের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

তবে বেশীরভাগ গুছিয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে বসেছেন। এঁরা অবশ্য সেইসময় সম্মুখ সমরে নামেননি বুদ্ধি চালান করে পুলিশের বিরাগভাজন এবং জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। যদিও খুব অন্তরঙ্গ মহলে একটা গোপন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বাতাবরণ সৃষ্টি করে রাখেন এঁদের কেউ কেউ কিন্তু আসল সত্যটা এতদিনে প্রকট হয়ে পড়েছে। আর যাঁরা সম্মুখ সমরে নেমেও জীবিত আছেন তাঁরা ক্রমশ বুঝে যাচ্ছেন কিছু করার নেই। জীবনের সবচেয়ে দামী সময় আন্দোলনে কাটিয়ে দেওয়ায় এঁদের পক্ষে এখন পায়ের তলায় মাটি পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর ফলেই বিভিন্ন উপদলের উৎপত্তি হয়েছিল, পরস্পরকে সন্দেহ এবং গালিগালাজ করার প্রবণতা বেড়েছিল। এখন সে সবও থিতুয়ে গেছে। অতবড় একটা আন্দোলন, যৌবনের বাধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস যেন কোন কাজেই লাগল না। জনসাধারণের জীবনযাত্রার কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না। দেশের ষাট থেকে সত্তর কখনও আশিভাগ নাগরিক ভোটের বাস্কে কাগজ ফেলে নিশ্চিন্তে ঘরের কোণের জায়গা খুঁজছে। দেশটার দায়দায়িত্ব দুটো রাজনৈতিক দলের ওপরে দিয়ে তারা জেনে নিয়েছে কিছু করার নেই। যে তাদের পাইয়ে দেবে সেই দলই ব্যালটটা পাবে। মাঝে মাঝে আবেগের হাওয়ায় অবশ্য ভাসাভাসি চলে কিন্তু স্বার্থ শব্দটার বাইরে আর কিছুই কথা জনসাধারণ ভাবতে রাজী নয়। 'ক্রমশ এই স্বার্থ শব্দটার ক্ষেত্রও ছোট হয়ে আসছে। এখনও পাশের বাড়িতে আঙুন লাগলে নিজেরটা বাঁচাও-এর মধ্যে সীমিত আছে। কদিন পরে পাশের ঘরে মা বাবা পুড়ে মরলে সে নিজের শরীরটাকে বাঁচাতে আগে ছুটবে।

এই পরিস্থিতিতে নবগঠিত পার্টি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বেশী কিছু অচলায়তনকে ধাক্কা দেওয়া রক্তগরম করা শব্দাবলী একত্রিত করে ছাপা একটি লিফলেট ওদের হাতে পড়েছিল। ওরা বিস্মিত হয়েছিল কিছু মানুষ এ ব্যাপারটা নিয়ে সক্রিয় ভাবনা ভাবছেন এবং খুব গোপনে সংগঠন গড়ে তুলছেন। এরপরেই আনন্দের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ হয়। আনন্দ প্রায় নিয়মিত যাওয়া আসা করত। বাকি তিনজন ছিল অনিয়মিত। এর পিছনে কোন নির্দিষ্ট কারণ ছিল না। শুধু একটি জনসভায় উপস্থিত থেকে

ওরা কিছু জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনার পর ওদের কিছু প্রশ্ন জাগে। সেইসঙ্গে দ্বিধা। ওরা স্থির করে নেয়, আনন্দই যোগাযোগ রাখবে। ওদের ধারণা হচ্ছিল এখন কোন অবস্থাতেই পার্টির পক্ষে সাহসী হওয়া সম্ভব নয়। এমন একজন নেতা পার্টিতে নেই যাকে জনসাধারণ বিশ্বাস করবে। অতএব আরও বিশদভাবে পরবর্তী কার্যাবলী লক্ষ্য করা দরকার বলে ওদের মনে হয়েছিল।

কল্যাণ এবার সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুর পুকুরে তোর কে থাকে?'

'কাফি দূরের রিলেটিভ। বুড়ি আমাকে পছন্দ করে বলে মনে হয়।'

'তা করুক। কিন্তু এর সঙ্গে তোর গ্রামের কি সম্পর্ক?' প্রশ্নটা আনন্দের উদ্দেশ্যে।

আনন্দ হাসল, 'এই নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আমরা এখানে এসেছি। তার আগে আমি প্রত্যেককে একটি প্রশ্ন করছি। যে কাজ করব বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে কারও কোন দ্বিধা বা ভয় নেই তো?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'প্রশ্নই ওঠে না।'

সুদীপ বলল, 'এই প্রশ্নটাই নিরর্থক।'

জয়িতা আনন্দের দিকে তাকাল, 'এই প্ল্যানটার কথা এখন পর্যন্ত ক'জন মানুষ জেনেছে?'

আনন্দ বলল, 'দমদমে কাল তিনজন ছিল আর ধর, আমরা ছাড়া আর চারজন জানে। কিন্তু নট ইট ডিটেলস। আমি স্পটটাও বলিনি তবে ওরা জানে আমরা চারজন এক সঙ্গে আছি, দ্যাটস অল।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'এই চারজনের কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না, সেরকম হওয়ার চান্স খুব কম। তাছাড়া তোদের সঙ্গে কথা বলেই আমি গিয়েছিলাম। কখনও কখনও তো বিশ্বাস করতে হয়।'

জয়িতা বলল, 'এই বিশ্বাসটা যেন আমাদের খুব বড় দাম দিতে বাধ্য না করে।'

আনন্দ চট করে প্রশ্ন করল, 'তুই কি ভয় পাচ্ছিস সঙ্গে আসতে?'

'মোটেই না।' হেসে উঠল জয়িতা, 'আবার সেইসব বস্তাপচা শব্দগুলো যেন তোরা বলতে শুরু করিস না। তোরা যা করতে পারবি আমিও তাই পারব। এই ভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে মরতে আর মরা দেখতে ভাল লাগে না। ভবিষ্যতের কথা যদি ভেবে ভয় পেতাম তাহলে তো নিজের ক্যারিয়ার গোছাতাম রে। তবে এখন থেকে আমাদের চারজনের বাইরে কোন কথা আর কাউকে বলার দরকার নেই। কারও কাছে কিছু পাওয়া যাবে না—।'

সুদীপ গুনগুন করল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—।'

আনন্দ চাঁপা গলায় বলল, 'বি সিরিয়াস সুদীপ!'

গান খামিয়ে গম্ভীর মুখ করে সুদীপ বলল, 'আই অ্যাম অলওয়েজ সিরিয়াস।'

তারপরেই দূরের এক টেবিলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, ‘কিরে তোদের পত্নিকা বেরিয়েছে?’ ওপাশ থেকে একটি ছেলে হাত নেড়ে না বলল।

জয়িতা বলল, ‘চমৎকার নমুনা!’

সুদীপ হাসল, ‘যদি কেউ আমাদের লক্ষ্য করে তাহলে এখন ভাববে আমরা প্রক্স আঙা মারছি। এতক্ষণ যা গম্ভীর মুখে তোরা কথা বলছিলি যে দেখলেই সন্দেহ হত।’

আনন্দ বলল, ‘ঠিক আছে। আর ফালতু কথা নয়। শোন, আমরা বিকেলের বাস ধরে ডায়মন্ডহারবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। ওখানে পৌঁছুতে হবে এমন সময় যাতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে না আসে। তোরা সবাই আমার বাড়িতে চলে আসবি। আমার এক বন্ধু ড্রাইভারি করে, মানে এক সঙ্গে আমরা স্কুলে পড়তাম, তাকে বলব গাড়ি আনতে। সেই গাড়ি নিয়ে জয়িতা অ’র সুদীপ প্যারাডাইসে পৌঁছে যাবি।’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘আর একজন উইটনেস থাকছে না?’

আনন্দ বলল, ‘ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভেবেছি। কিন্তু আমাদের একটা গাড়ি দরকার।’

সুদীপ বলল, ‘আমি গাড়ি চালাতে পারি। কাউকে কিছু বলার কোন দরকার নেই।’

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘গাড়ি পাবি কোথায়?’

সুদীপ হাসল, ‘পেয়ে যাব। রাস্তায় এত গাড়ি আর একটা গাড়ি পাব না? আমি তো আজ আনন্দের সঙ্গে যাচ্ছি, হালচাল দেখে ওটা ঠিক করে আসব।’

আনন্দ বলল, ‘ধর, তোর কিছু হল?’

হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল। আনন্দের প্রশ্নটা নিয়ে সুদীপ অবশ্য বিরত হচ্ছিল না। কারণ তার ঠোঁটে হাসি লেগেই ছিল। জয়িতা বলল, ‘আমি চালাবো তাহলে।’

আনন্দ খুশী হল, ‘বেশ তাহলে একটা ঝামেলা চুকল। গাড়িটা কিভাবে পাওয়া যায় তা আজ আমরা দেখে আসব। এবার কেন সুদীপের আত্মীয়ের বাড়ির কথা বলছি সে প্রসঙ্গে আসছি। সুদীপের কাছ থেকে শুনেছি যে ওই বাড়িতে উদ্রমহিলা একা থাকেন, বেশ বড় বাড়ি। জায়গাটা কলকাতার কাছেই আবার আমাদের গ্রাম থেকে সোজা চলে আসা যায়। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে অথবা ওই বাড়িতে সেন্টার নিতে পারি। কিন্তু এসবই নির্ভর করছে সুদীপ ওর আত্মীয়কে ম্যানেজ করবে তার ওপর। যদি তিনি রাজী হন তাহলে যতদিন না সবকিছু ঠাণ্ডা হচ্ছে ততদিন আমরা নিশ্চিত।’

সুদীপ বলল, ‘বুড়িকে আমি ম্যানেজ করে নেব, চিন্তা করিস না।’ আমি বলছি না যে ওই রাত্রে সেন্টারের প্রয়োজন হবেই। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা যে যার বাড়িতে ফিরে যাবো হয়তো, কিন্তু সামান্য ঝুঁকি হয়ে গেলে বিকল্প ব্যবস্থা হাতে রাখতে হবে। অন্যান্য যা দরকার আমি আর সুদীপ

ম্যানেজ করে নেব। শুধু জয়িতা, পাঁচ হাজার টাকা দরকার। এইটের ব্যাপারে তুই কোন হেল্প করতে পারিস?’

‘পাঁচ হাজার! ও সিওর!’

‘কিভাবে?’

‘দুটো বালা আছে, হার আছে, মানে আমার কাছে যা আছে তাতেই ওই টাকা হয়ে যাবে। শুধু আমি জানি না কোথায় বিক্রি করলে ঠিকঠাক টাকা পাওয়া যায়!’

‘ওগুলো বিক্রি না করে টাকাটা পাওয়া যাবে না?’

‘কিভাবে? আমার মুখ দেখে পাঁচ হাজার টাকা দেবে? টু মার্চ এক্সপেকটেশন!’

‘ইয়াকি মারিস না। বাড়ি থেকে টাকাটা ম্যানেজ করতে পারবি?’

‘নো! আমি কারও কাছে ভিক্ষে চাইতে পারব না।’

কল্যাণ চুপচাপ গুনছিল, বলল, ‘পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে আকাশের চাঁদের মত। এখন আমি কোন কাজেই লাগতে পারছি না, না?’

আনন্দ বলল, ‘তোর কাজ পরে।’ তারপর জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমাদের কিছু টাকা হাতে রাখা উচিত। বেশ কিছু টাকা হাতে প্রয়োজন হলে কিছুদিন চুপচাপ কাটিয়ে দিতে পারি। সুদীপের সঙ্গে ওর বাবার রিলেশন অনেকদিন থেকেই খারাপ। তার ওপর ওদের বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স-রেইড হয়ে গেছে। এছাড়া আর একটা জিনিসের দায়িত্ব নিয়েছে সুদীপ। আমি জানতাম যতই তুই অপছন্দ করিস না কেন, তাদের সম্পর্ক সুদীপদের মত নয়। তুই চেষ্টা করলে—।’

‘গত রাত্রে সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে। ভুল বললাম, শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই কাল তার শ্রাদ্ধ হল। এখন আর আমি কিছু চাইতে পারব না।’

সুদীপ বলল, ‘ঠিক হয়। এখনও কিছুদিন সময় আছে হাতে। সবাই মিলে ভাবলে একটা পথ বের হয়ে যাবে। জয়িতা, আমরা যেটা করতে চাইছি সেটা এদেশের আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু আমরা মনে করি ওই অপরাধগুলো মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করবে। আমরা মনে করি ওই অপরাধগুলো করা মানুষ হিসেবে আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ব্যাপারটা যদি তাই হয় তাহলে ঘরের দুর্গ আক্রমণ করতে দোষ কি?’

‘একটাই প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা যে সব অপরাধ মানে ওই আইনের চোখে, করতে যাচ্ছি তা আরও অনেক বড় অপরাধকে নষ্ট করার জন্যেই। কিন্তু আমার বাবামায়েের জীবন তাঁরা তাঁদের মত চালাচ্ছেন, আমি তা মানতে পারছি না, কিন্তু তাঁরা অপরাধ করছেন কি না সেটা প্রমাণিত হচ্ছে কোথায়?’ জয়িতা খুব সরল প্রশ্ন করল।

সুদীপ ভাবছিল জবাবটা। আনন্দ বলল, ‘ঠিক আছে, আপাততঃ এই প্রসঙ্গ থাক। তোরা একটু এগিয়ে আয়। পাশের টেবিলে লোক এসেছে। আমার

প্ল্যানটা হল—।

চারটে মাথা প্রায় একহাতের বৃত্তে পৌঁছে গেল চারকোণা থেকে ।

॥ ৬ ॥

‘অপারচুনিষ্ট !’

খানিকটা তাঁটার মিশেল দিয়ে জয়িতার দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করল সুদীপ । কল্যাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু এইসময় ড্রাইভার এমন আচমকা গতি হ্রাস করল যে বেচারার হাত রড থেকে ছিটকে গেল এবং সুদীপকে আঁকড়ে ধরে সোজা হল । বাসের অন্যান্য যাত্রীরা তখন ড্রাইভার কণ্ঠস্বরের মুগ্ধপাত করতে শুরু করেছে । সেই ফাঁকে সামলে নিয়ে কল্যাণখা নিকটা চেষ্টা নিয়ে বলল, ‘এই ! সুদীপ তোকে অপারচুনিষ্ট বলছে ।’

লেডিস সিটে বসে ওদের টালমাটাল ব্যাপারটা উপভোগ করতে করতে জয়িতা হাসল, ‘আই ডোন্ট মাইণ্ড ।’

সুদীপ কল্যাণকে বলল, ‘ফুটনোট না পড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া ।’

প্রাইভেট বাসটায় ওরা ওঠেছে কলেজের সামনে থেকে । তখনই ভিড় ছিল, এখন আরও বাড়ছে । ওরা চারজনে কোনমতে উঠতে পেরেছিল । লেডিস সিটে একজন পুরুষ জাঁকিয়ে বসেছিলেন মহিলাদের সঙ্গে । ওরা যখন ভিড়ে সাঁতরাচ্ছে তখন জয়িতা কোনমতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ‘আমাকে বসতে দিতে আপনার আপত্তি আছে ?’

ভদ্রলোক ভৃত দেখার মত চমকে ছিলেন । জিনসের প্যান্ট আর হ্যাণ্ডলুমের শার্টে জয়িতাকে তিনি আবিষ্কার করে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন । কাঁধের ব্যাগটা কোলে নিয়ে আরাম করে জানালার পাশে বসে বন্ধুদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে বেশ মজা পাচ্ছিল । সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘এসপ্লানেড থেকে মিনিট পঞ্চাশেক লাগবে, না রে ?’

‘হ্যাঁ, ওইরকম । তোর ব্যাগটা সামলে রাখিস ।’ আনন্দ উত্তর দিল ।

‘ডোন্ট ওরি ম্যান ! আমি ঠিক আছি ।’

ভিড় বাসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে মোটেই ভাল লাগে না আনন্দর । কিন্তু সুদীপের বোধহয় চেষ্টা করে কথা না বলতে পারলে মোটেই আরাম হয় না । ক্রমশ চাপে পড়ে ওরা তিনজনেই ভেতরের দিকে সরে আসছিল । বউবাজারের মুখে তিনটি ছেলে উঠল । ওদের অস্তিত্ব জানা গেল কারণ বাসের পাদানিতে পা রেখেই ওরা কণ্ঠস্বরের অম্লীল ভাষায় ধমকাল স্টপেজে না রাখার জন্যে । এত ভিড় তবু ওদের জায়গা করে দিল যাত্রীরা লেডিস সিটের সামনে যেতে । সুদীপ চাপা গলায় বলল, ‘এটা এখন একটা কায়দা হয়েছে । খিস্তি করলে ফেসিলিটিস পাওয়া যায় ।’ আনন্দ কিছু বলল না । তার কানে খুব বিশ্রী শব্দগুলো এখনও নোংরার মত লেগে আছে । তারপরেও ওর কানে এল উঁচু গলায় গল্প করছে তিনজন । কোন একটি মেয়ে রোজ রাত্রে বাড়ি ফেরে ।

পাড়ার ছেলেরদের পাত্তা দেয় না বটে তবে পয়সা ফেললেই পাওয়া যায়। এইসব গল্পগুলো বলার সময় তারা সমানে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে মজা পাচ্ছিল। নিজেদের অতৃপ্ত বাসনাকে ব্যক্ত করতে যেন ওইসব শব্দ সাহায্য করছিল। আনন্দ দেখল বাসের সবাই এইসব বাক্য শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না। বরং প্রত্যেকে এমন ভঙ্গীতে রুড ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওইসব কথা কিছুই কানে যাচ্ছে না। সবকটা মুখই যেন মুখোশ পরা।

এই সময় জয়িতার গলা শুনতে পেল, 'এই যে, হয় আপনারা ভদ্রভাবে কথা বলুন, নয় বাস থেকে নেমে যান। এটা আপনাদের শোওয়ার ঘর নয়।' তিনজনেই একটু থমকে গেল প্রথমটায়। তারপর একজন একটু ঝুঁকে একটা হাত বাড়িয়ে বলল, 'শোওয়ার ঘর করে নিলেই হয়। বাসটা আপনার ফাদারের মাল নাকি যে বললেই যাব।'।

দ্বিতীয়জন বলল, 'এগরোল মাইরি হেভি লস্কার্ভাসা।'

তৃতীয়জন বেকিন্সে বসল, 'বাঙালির মেয়ে হয়ে প্যান্ট পরেছেন লজ্জা করে না।

সীতা সাবিন্দ্রী—।'

ভড়াক করে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের ছেলেটার কলার ধরে ঠাস করে চড় মাড়ল জয়িতা। কিন্তু সেইসময় তিনটে ছেলে বিপরীত দিক থেকে আঘাত পেল। তুমুল হইচই শুরু হয়ে গেল বাসে। যাত্রীরা ভয়ে সরে গেল যে যে-দিকে পারে। চলতে চলতে বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল একপাশে। ততক্ষণে তিনটে ছেলে ওদের পা জড়িয়ে ধরেছে। কল্যাণের স্বাস্থ্য ভাল, সে বিরক্তিতে একটা লাথি মেরে বলল, 'ভাগ, তোদের শরীরে হাত দিতেও ঘেন্না করে। এর পরের বার দেখলে মুণ্ডু ছিড়ে ফেলব।'।

তিনটে ছেলে ব্যাঙাচির মত লাফ দিয়ে নেমে গেল রাস্তায়। এইসময় জয়িতা চাপা গলায় ফুঁসে উঠল, 'তোরা কেন এলি? আমি তোদের ডেকেছিলাম?'

কল্যাণ একটু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

'আই ক্যান টেক কেয়ার অফ মাইশেলফ্। ওই তিনটে বাইপ্রোডাক্টকে ট্যাকল করার ক্ষমতা আমার আছে। তোরা কি ভেবেছিস আমাকে?'

উত্তেজিত অবস্থায় জয়িতা নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ওর পাশে বসা একটি মধ্যবয়সিনী এবার নিচু গলায় বললেন, 'আমিও সহ্য করতে পারছিলাম না ভাই। কি করে যে ওইসব কথা ওরা উচ্চারণ করছিল।'।

চট করে মুখ ফেরাল জয়িতা, 'সহ্য করতে পারছিলেন না তো প্রতিবাদ করেন নি কেন?'

'ভয় করছিল। আসলে আমার তো বাইরে বলাকওয়ার অভ্যেস নেই।'।

ক্রমশ সরে যাওয়া ভিড়টা জমাট হল। একজন বললেন, 'দেশটার কি হল।

এদের কিছু বলতে ভয় হয়। শুনেছি খুরটুর থাকে এদের সঙ্গে।’
জন্মিতার সামনে দাঁড়ানো এক প্রৌঢ় বললেন, ‘না না, ভয় ফয় কোন ব্যাপার
নয়। আমি ওদের সুযোগ দিচ্ছিলাম। কতটা বাড়ে বাড়ুক তারপর প্রতিবাদ
করব।’

আর একজন গলা বাড়িয়ে বললেন, ‘আমার তো হাত নিশপিশ করছিল।
কিছু করব করব ভাবছি—

হঠাৎ জন্মিতা চিৎকার করে উঠল, ‘স্টপ ইট। আপনাদের প্রত্যেকের
মুরাদ জানা আছে। এতক্ষণ তো ভয়ে গর্তে ঢুকে বসেছিলেন। যেই ওদের
নামিয়ে দেওয়া হল অমনি বীরত্ব দেখাচ্ছেন। আপনারা ভীতু, প্রতিবাদ
করতে পারেন না সেটা সহ্য করলেও করা যায়, কিন্তু নিরাপদে দাঁড়িয়ে
আস্তিন গোটানো সহ্য করা যায় না।’

একজন বিড়বিড় করে বলল, ‘কিন্তু প্রতিবাদ করলে তো আপনি, মানে, একটু
আগে ওনাদের ধমকালেন, কেন এসেছে এগিয়ে। তাই না?’

অবজ্ঞার হাসি হাসল জন্মিতা, ‘সেটুকু যদি বুঝতে পারতেন তাহলে অবস্থাটা
অন্যরকম হয়ে যেত। সবাই তো যুধিষ্ঠির হয়ে বসে আছেন দ্রৌপদীকে
দৃঃশাসনের হাতে ছেড়ে দিয়ে। রাবিশ।’

ওপাশ থেকে সুদীপ চিৎকার করে উঠল, ‘ইটস অলরাইট। কেউ আর কথা
বাড়াবেন না। কার কত মুরাদ তা আমরা জানি।’

ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে বাসটা দাঁড়িয়ে গেল। সামনে জব্বর জ্যাম।
বউবাজারের উত্তেজনাটা এখন মিলিয়ে গেছে। স্বাক্ষরীরা যে যার নিজের বিষয়
নিঙ্গে কথা বলছে। সুদীপের সামনের সিটে বসা এক মধ্যবয়সী বললেন,
‘জ্যাম তো হবেই। পাতাল রেলের ডাইরেক্ট রিঅ্যাকশন এটা।’

তার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করল, ‘পাতাল রেল এখানে কোথায়?’

মধ্যবয়সী বললেন, ‘পা কেটে গেলে সমস্ত শরীরে ধনুষ্টকার হয় কেন?
তাছাড়া পুলিশেরও হাত আছে। দে আর ক্যালাস। জাপানে কখনও এমন
হয় না। নিউ ইয়র্কে জ্যাম হয় কিন্তু বড় জোড় আধ ঘন্টা। মস্কোতে জ্যাম
হলে তো কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে।’

‘চীনে?’

‘ওয়াল, চীনে তো এত গাড়ি নেই। সবই জাতীয় সম্পত্তি। অতএব জ্যামও
নেই।’

‘এদেশে সব জাতীয় সম্পত্তি করে নিলে জ্যাম হবে না বলছেন?’

‘তা নেবে কেন? ওই যে পাতাল রেল, যার জন্যে এখানে আমরা বসে আছি
এটা প্রফ আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে তৈরী। চীনে পাতাল রেল আছে?
নেই। না না তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করতে এস না। আমি সবই জানি
শুধু জানি না কবে মারা যাব!’ অতি অমায়িক একটা হাসি হাসলেন
ভদ্রলোক।

সুদীপ মুখটা নামিয়ে আনল ভদ্রলোকের সামনে, ‘কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি? রেগনের ব্রেকফাস্টের মেনুতে কি কি থাকে?’

‘অ্যা?’ ভদ্রলোকের মুখ আফ্রিকা থেকে চট করে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ হয়ে গেল।

‘আপনার স্ত্রী কোথেকে কেরাসিন তেল যোগাড় করেন সে খবর রাখেন?’

‘মানে, মানে, আপনি আমাকে অপমান করছেন?’

গুল মারাটা বন্ধ করুন তো। এই হামবড়া ভাবটা, সব জেনে বসে আছেন। আপনাদের বয়সে এলে সব বাঙালি খবরের কাগজের নিউজ এডিটরকে হার মানিয়ে দেয়। ‘অন্তুত!’

সুদীপের কথা শেষ হওয়ামাত্র আনন্দ তাকে ডাকল, ‘এই নেমে আয়, এখানে জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। হাঁটলে দশ মিনিট লাগবে।’

বাস থেকে নেমে সুদীপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘আসলে বুঝলি দোষ কারও নয়, দোষটা আমাদের। একটা জাতের যদি মেরুদণ্ডটা প্লাস্টিকের হয়—’

‘তোর কি দরকার? সব জায়গায় নাক গলাস কেন?’ আনন্দ বিরক্ত হল।

কয়েক পা এগিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল, ‘এই দ্যাখ, জ্যামটা হচ্ছে মিছিলের জন্য আর লোকটা অবতারের মত বলে গেল পাতাল রেল এর জন্য দায়ী। লোকটাকে নামিয়ে আনতে হচ্ছে করছে।’

জয়িতা চুপচাপ মিছিলটাকে দেখছিল। ও জানে এই মুহূর্তে সে অনেকের দ্রষ্টব্য। জিনসের প্যান্ট শার্ট ছেলেদের মত ছাঁটা চুলে যে লম্বা শরীরটা তারা দেখছে তাকে চট করে মেয়ে ভাবতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে। এবং এই অসুবিধে হওয়াটা দর্শকের মনে কিলবিলে বোধের জন্ম দিচ্ছে। সংসারের গভীরে দাঁড়িয়ে থেকে নাক ঝাড়া ভাবের সঙ্গে রগরগে রহস্যের জন্যে খুশখুশ সুড়সুড়ি। দুটোই চলছে সমানে। বিদ্রান্ত হওয়ার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। বাঙালি মেয়ের কাঁধ চওড়া এবং শরীর অমন লম্বা হয় না। তার বুক কিংবা নিতম্ব শৈশবের অসুস্থতার কারণে সঞ্চয়ী হয়নি। সে প্রসাধন ব্যবহার করে না। মেয়েলিপনার সঙ্গে তার অস্তিত্ব অনেক দূরের ফলে যারা দেখে তাদের ভ্রান্তি হয়ই। পথে ঘাটে চলতে মানুষের চোখে খটকা দেখেছে সে। হচ্ছে করে সুবিধে আদায় করার সময় সে যখন ঘোষণা করে আমিও কজন মহিলা তখন বেশ মজা পায় সে। পুরুষরা তো সব কিছু আগলে বসে আছে, ওদেরই ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে যদি কিছুটা আদায় করা যায় ক্ষতি কি! একবার একটা ত্যাগদড় ছেলে লেডিস সিট না ছাড়তে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনি যে মহিলা তা কি করে বুঝব?’

জয়িতা চটপট জবাব দিয়েছিল, ‘নিজের দিকে তাকান, বুঝতে পারবেন।’ এখন আর এসব নিয়ে কোন অস্বস্তি হয় না জয়িতার। তার বন্ধুরাও এই নিয়ে মাথা ঘামান না।

হঠাৎ জয়িতা গলা তুলে বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ সুদীপ, লোকটাকে দ্যাখ !'
ওরা তিনজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মিছিলটাকে দেখছিল। জয়িতা সামান্য এগিয়ে। মিছিলটা কোন কারণে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দু'সারি লোক পুরো ধর্মতলা স্ট্রীটকে আগলে রেখে আকাশে হাত ছুঁড়ে চৌঁচিয়ে যাচ্ছে বীভৎস ভঙ্গীতে। যোগ দিন যোগ দিন। আনন্দ বলল, 'এইভাবে ধমকে বললে কেউ যোগ দিতে সাহস পাবে। লোকগুলো নর্মান বিহেভ করে না কেন ?'

কল্যাণ বলল, 'কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা এটা।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন লোকটার কথা বলছিস জগ্ন ?'

'ওই যে রোগা মতন, হাওয়াই শার্ট প্যান্ট পরা, হাতে কাপড়ের ব্যাগ।' জয়িতা জানাল।

সুদীপরা দেখল। নিশ্চিন্ত বাঙালির প্রকৃষ্ট উদাহরণটি হাত তুলছেন। কিন্তু মুখে কোন শব্দ করছেন না। বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের মোটেই ইচ্ছে করছে না ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। এইসময় একটি পঙ্গু মানুষ ক্রাচে ভর করে এগিয়ে গেল অন্য ফুটপাতে যাওয়ার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি খিঁচিয়ে উঠলেন, 'নেহি, নেহি ! দেখতা নেহি হামালোগ মিছিল করতা হয়। যানে নেহি দেগা।' ক্রাচে ভর করা মানুষটি কাকুতি মিনতি করতে লাগল কিন্তু লোকটা এই মুহূর্তে হিটলারের মত কঠোর হয়ে গেল।

ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'কাউকে মিছিল ভাগতে দেবেন না। কেন্দ্রের কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও।' ভদ্রলোক এমনভাবে হাত চালানলেন যে পঙ্গু লোকটা গুল পেয়ে সরে এল এপাশে।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'এই মিছিলে কত লোক অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে জানতে ইচ্ছে করছে ?'

জয়িতা বলল, 'ন্যাকামি করিস না। আমরা সবাই জানি। এই মিছিলগুলো হল কোরা মিনের মত। নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে বন্ধ এবং মিছিল করতে হয় মহাপ্রভুদের।' ততক্ষণে মিছিলটা আবার চলতে শুরু করেছে। এর শেষ কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। তবে ফেস্টুন দেখে মনে হচ্ছে শহরের চেয়ে শহরতলীর মানুষ বেশী সংখ্যায় এসেছেন।

আনন্দ বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। চল, এই ফুটপাত ধরে হাঁটা যাক। সুযোগ পেলে পার হওয়া যাবে।'

সুদীপ ফুট কাটল, 'সুযোগ এরা দেয় না, আদায় করে নিতে হয়।'

ওরা যখন জ্যোতি সিনেমার সামনে পৌঁছেছে তখন কল্যাণ দেখতে পেল, 'এই, দ্যাখ দ্যাখ, লোকটা ! মিছিল থেকে সটকেছে।'

চারজনেই লোকটাকে দেখল। একটা পানের দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে মিছিলটাকে দেখছে। যেন পিছনের সারিতে কোন চেনা মুখ আছে কিনা জরিপ করে নিচ্ছে। সুদীপ চট করে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নমস্কার কেমন আছেন ?'

লোকটি খতমত হয়ে যেন চিনতে চেষ্টা করল, 'ভাল, মানে, এই একরকম !' সুদীপ বলল, 'কতদিন পরে দেখা হল। আপনি আমাকে চিনতে পারবেন ভাবিনি। যাক, এদিকে কেন এসেছিলেন ?'

'এই একটু দরকার ছিল।' তারপর ফ্যাকাশে হেসে বলল, 'ওই মিছিলের জন্যে আটকে গেছি।'

সুদীপ আড়চোখে বন্ধুদের দেখে নিল, 'আপনাদের অফিসের লোকজন আসেনি মিছিলে ?'

'আসেনি আবার ? যাড় খরে নিয়ে আসে। আমার আজ রেশন তোলা হল না।' কথাটা বলেই লোকটা সচকিত হল, 'মানে এই মিছিলের জন্যে আটকে গেলাম। আচ্ছা, কোথায় দেখেছি আপনাকে—মানে—'

'আপনার অফিসে। বড়বাবুর কাছে গিয়েছিলাম।'

'ও তাই বলুন। আমি সেই থেকেই ভাবছিলাম চেনা চেনা, ঠিক মানে, বয়স হয়েছে তো।'

'আপনি তো লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক ?'

'আজ্ঞে না, আপার ডিভিসন।'

'চলে ?'

লোকটা যেন কুঁজো হয়ে গেল। তারপর বলল, 'চলতে হয়।'

'এইসব মিছিল টিছিল করলে হয়তো মাইনে বাড়বে আপনার।'

'ছাই বাড়বে। শালারা নিজেদের ধান্দায় আমাদের মিছিলে টেনে আনে। যা দেবার সরকারের হিচ্ছে হলে তবেই দেয়। এখন তো কথায় কথায় কেন্দ্র দেখিয়ে দিচ্ছে।' লোকটা আবার নিবে গিয়ে বলল, 'এদের কথা শুনলে কাজ কম করলেও চলে।'

'ওহো, যে কথাটা বলতে এসেছি, আপনাকে আপনার বড়বাবু ডাকছেন। উনি এদিকে আসবেন না বলে জ্যোতি সিনেমার কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে দেখে বললেন ডেকে দিতে।'

সুদীপের কথা শেষ হওয়া মাত্রই লোকটি সচকিত হয়ে উঠল। এখন সামনে বেলঘরিয়ার ফেস্টুন। লোকটি বলল, 'এতক্ষণ বলেননি কেন ? যাচ্ছিলে !' তারপর দ্রুত রাস্তায় নেমে এগিয়ে যেতেই মিছিলের একটি মানুষ বাধা দিলেন, 'না না যেতে পারবেন না। দেখছেন না আমরা মিছিল করছি।' লোকটি মাথা নাড়ল, 'জানি কিন্তু আমার খুব জরুরী দরকার। একটু যেতে দিন।'

'রিঅ্যাকশনারি কথাবার্তা বলবেন না। এই দেখিস তো বুড়োটা যেন না পার হয়।' পেছনের লোকগুলোর দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে এগিয়ে গেল জলী মানুষটি।

হো হো করে হাসছিল সুদীপ হাঁটতে হাঁটতে। জয়িতা বলল, 'তুই পারিস বাটে !'

হাসি খামিয়ে সুদীপ বলল, ‘দ্যাখ, যে লোকটা মিছিলে আসতে চায় না, ঘাড় ধরে নিয়ে আসা হয় সে-ই মিলিটারি মেজাজে একজন খোঁড়াকে রাস্তা পার হতে দেয় না। আবার নিজের বেলা বোধহয় বাপবাপান্ত করছে। এই হল আমাদের নেতাদের সৈন্যবাহিনী!’

আনন্দ বলল, ‘তুই অমন ব্রাফ দিলি লোকটা টের পেলে না কিন্তু! অস্ত্রুদ!’
কল্যাণ বলল, ‘সোজা ব্যাপার। মিছিল থেকে সটকে লোকটা ভয়ে ছিল। তাছাড়া এই ধরনের মানুষ এমনিতেই সারাক্ষণ কেঁচো হয়ে থাকে। নিজের পরিবারের বাইরে একটু ভাল পোশাকের যে কোন মানুষকে স্যার বলতে ওদের জিভ সুড়সুড় করে। দোষ নেই অনেক কালের অভ্যেস। এরা চ্যালেক্স করতে জানে না।’

জয়িতা বলল, ‘অল রাইট। বাট আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কি করে এই লোকটা ছেলের বয়সী সুদীপকে আপনি আঙে করে গেল।’

‘বয়সটয়স কোন ফ্যাক্টর নয়। আসলে ব্যক্তিত্ব যাদের গড়ে ওঠেনি তারা তো এই রকম আচরণ করবেই।’ আনন্দ কথাটা শেষ করল এই বলে, ‘ওদের নিয়েই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে হচ্ছে।’

কল্যাণ প্রতিবাদ করতে গেল। আনন্দ আজকাল মাঝেমাঝেই খুব উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে। কতগুলো নিখাদ সত্য সামনে রেখে আমাদের কাজে নামতে হয়েছে, সেটা জানার পরও এই ধরনের আক্ষিপ মনে অস্বস্তির জন্ম দেয়। সে ঠিক করল আনন্দের সঙ্গে এ নিয়ে পরে আলোচনায় বসবে। ধর্মতলার মোড়ে এসে সুদীপ চৌঁচিয়ে উঠল, ‘চলে আস চটপট।’ সামনের মানুষজন তাড়াতাড়ি হাঁটায় মিছিলটা আলাদা হয়ে গেছে। সেই ফাঁক গলে ওরা পেরিয়ে এল।

এখন বেশ গুমোট। সময়টাকে আর দুপুরে বলা যায় না আবার বিকেলের ছায়াও নামেনি। ওরা চারজন আঙপিছু মেট্রোর সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিল। হঠাৎ কল্যাণ দেখতে পেল বিমলেশদাকে। তাকে দেখে এগিয়ে এলেন, ‘কি ব্যাপার কল্যাণ, তোমার পান্তা নেই কেন?’

‘আমি একদম সময় পাচ্ছি না বিমলেশদা। ইনফ্যাক্ট নাটক করার ইচ্ছেটা আমার নেই।’

‘কেন জানতে পারি? তুমি তো একসময় খুব উৎসাহী ছিলে।’
কথাগুলো শোনার পর বিমলেশদাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কল্যাণ পাজামা-পাজাবি পরা স্বপ্ন দেখতে চাওয়া মানুষটির দিকে তাকিয়ে এক পলক ভাবল রূচ কথা ব্যবহার করবে কিনা। তারপর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি রিয়ালাইজ করেছি ওই মিডিয়ামটা আমার জন্যে নয়।’

‘কিন্তু তুমি তো ভাল অভিনয় করতে। বুঝতে পারছি না তুমি সত্যি লুকোতে চাইছ কিনা!’

কল্যাণ হাসল, ‘ঠিক আছে। যদি সুযোগ পাই পরে একদিন এ বিষয়ে কথা বলব। বিমলেশদা, ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু। ঠিক

আছে, আজ আমাদের একটু তাড়া আছে।’

একটু জোর করেই সরে এল কল্যাণ। তার মন ভাল লাগছিল না। তিনমাস হল গ্রুপে সে যায় না। খবর এসেছে অনেকবার। সে নাটক করবে না জানিয়েও দিয়েছে। কিন্তু তবু এই মানুষটির মুখোমুখি হয়ে তার এই মুহূর্তে ভাল লাগছিল না। সুদীপ আর আনন্দ কথা বলতে বলতে সামনে হাঁটছে। জয়িতা কল্যাণের পাশে চলে এল, ‘হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেলি কেন?’

কল্যাণ কাঁধ নাচাল প্রথমে। তারপর যেন নিজের কাছেই কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল, ‘বিমলেশদাদের মত সিরিয়াস লোক চিরকাল লড়াই করে যান কিন্তু বুঝতেই চান না যুদ্ধটা একতরফা। ফলাফল আগেই ঠিক করা আছে।’

জয়িতা বলল, ‘সেকথা উনিও নিশ্চয়ই জানেন। তোর মন খারাপ করার কি আছে।’

কল্যাণ কথাটা শুনে একটু উত্তেজিত হল, ‘তুই ব্যাপারটা বুঝবি না। আমাদের দলের জন্য পনের ছেলে শুধু ভাল নাটক করবে বলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা রিহার্সালরুমে কাটিয়ে দিল। কিন্তু ভাল নাটক করবে বলেই করা যায় না। কলকাতার যে দুটো হল লোকে কাউন্টার থেকে টিকিট কিনে নাটক দ্যাখে সেই দুটো হল তুই চাইলেই পাবি না। একটা হল বিখ্যাত দলগুলোর মধ্যে বিতরিত, অন্যটি সরকারী আমলা আর ধামাধরাদের খেয়ালখুশিতে চলে। উত্তর দক্ষিণে যেখানেই নাটক করবি তোকে পায়ে ধরে দর্শক ডেকে আনতে হবে। সেটা দুতিনটে শো-এর পরে অসম্ভব। বিমলেশদারা যে প্রযোজনাই করুক প্রতিটিতে ধার বেড়ে যায়। তুই বলবি মফঃস্বলে যা, গ্রামে যা। প্রযোজনার টাকাটা কে দেবে? এতো গেল বাইরের ব্যাপার। আমরা নাটক পাব কোথায়? কলকাতায় তিনচারজন নাটক লিখতে পারতেন। বড় দলগুলো তাঁদের একচেটিয়া করে রেখেছেন। ইদানীং সেসব কলমও বন্ধ হয়ে আসছে। ফলে অনুবাদ এবং অনুসরণের জোয়ার চলছে। সেসব মঞ্চস্থ করে কার কি লাভ হচ্ছে তা নিয়ে কেউ ভাবছে না। আমাদের কেউ নেই যে নাটক লিখতে পারে। পুরোন নাটক অভিনয় করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সেসব করে শুধু আগ্রসাদ বাড়ানো, যৌবন এবং অর্থের অপচয়। আসলে আমাদের সব কিছুর মত এই নাটক করার মধ্যেও কোন পরিকল্পনা নেই। এসব কথা বিমলেশদাও জানেন। কিন্তু নেশা জিনিসটা বোধহয় খুব মারাত্মক, সবসময় তার চোখের পাতা বন্ধ থাকে।’

জয়িতা একটু অবাক হয়ে বলল, ‘তুই যে এসব নিয়ে ভেবেছিস এতদিন জানতাম না।’ তারপর আবহাওয়া হালকা করার জন্যে জুড়ে দিল, ‘চমৎকার কথা বলতে পারিস তুই। কোথাও বক্তৃতা করার প্রয়োজন হল তোকে আগে তৈরি দিব।’

কল্যাণ হাত তুলল, ‘ভাগ।’

ডায়মণ্ডহারবারের বাসে ওরা জায়গা পেয়ে গেল। সমস্ত কিছুই আগে থেকে বারংবার ছকে নেওয়া ছিল। গত সপ্তাহে সুদীপ এবং আনন্দ একবার পাক দিয়ে এসেছে। ঠাকুরপুকুরের সুদীপের আত্মীয়্যার বাড়ি বড় রাস্তার কাছাকাছি। খুবই নির্জন বাড়িটা। রন্ধা বিধবা, কোন আত্মীয়স্বজন সেখানে থাকে না। এক চিলতে বাগান আর পেছনদিকে দু'ঘর ভাড়াটে আছে। আনন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সুদীপ। ইঙ্গিত দিয়ে এসেছিল যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ওরা এক-আধদিন ওখানে গিয়ে থাকতে পারে। বাড়িটার চারপাশে বেড়াবার নাম করে চিলেকোঠার ঘরটা আনন্দকে দেখিয়েছিল সে। লুকিয়ে থাকার পক্ষে চমৎকার জায়গা। শুধু পাখির ডাক ছাড়া কোন শব্দ সেখানে আসে না। আনন্দ লক্ষ্য করেছিল রন্ধা নিলিগু হয়ে গুনলেন এবং নিজে যা করছিলেন করতে লাগলেন। সুদীপ বলেছিল ওটা নাকি ভাল লক্ষণ। অপছন্দ হলে এতক্ষণ চিৎকারে আকাশ ফাটাতেন। বস্তুত এই অঞ্চলে ওঁর ওই গুণের বেশ খ্যাতি আছে। অতএব এদিকটা নিয়ে ভাবনা নেই।

সন্ধ্যার পর গ্রামে পৌঁছাতে আনন্দ চেয়েছিল। এতে সুবিধে অনেক। এই লাইনে লোডশেডিং নিয়মিত ব্যাপার। রাত দশটার আগে আলো আসে না। ঠিক গ্রামের মধ্যে না নেমে মুখটায় নামলে কারো চোখে পড়ার কথা নয়। পড়লেও একটা কৈফিয়ত দেওয়া যাবে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলে নিশ্চিন্তি। এসব নিয়ে চিন্তা করতে হত না যদি জয়িতা সঙ্গে না থাকত। ওর ওই পোশাক গ্রামের মানুষদের স্মরণে থেকে যাবে। সংশয়ের কথা সে বলেছিল বন্ধুদের। কিন্তু জয়িতাই কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিল, 'তোমার বাড়ির লোকদের নিয়ে ভাব, গ্রামের মানুষদের আমি ট্যাকল করব।'

দুবছর ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আনন্দ জেনে গেছে জয়িতার মধ্যে কোন ন্যাকামি নেই। একটা ছেলের পক্ষে যা করা সম্ভব ওর কাছে তা অসম্ভব নয়। প্রথমদিকে তাদের তিনজনেরই যে ওর সম্পর্কে দ্বিধা ছিল এটা অস্বীকার করার মানে হয় না। কিন্তু সময় এবং কাজ সেটাকে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে কখন! আনন্দ ছুটন্ত বাসে বসে পেছন ফিরে তাকাল। বেশ ভিড়। কল্যাণ চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তার ঠিক পাশে বসে জয়িতা উদাসমুখে জানলা দিয়ে দৃশ্য দেখে যাচ্ছে। সে আড়চোখে যাত্রীদের মুখ দেখল। জয়িতার দিকে তাকাচ্ছে কেউ কেউ। আনন্দের মনে বিরক্তি এল। ও যদি শাড়ি পরে আসত তাহলে ব্যাপারটা এড়ানো যেত।

ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নামছে। এই লাইনে যেতে যেতে অনেকবার দৃশ্যটা দেখেছে সে। প্রথমে অনেক দূরে দিগন্তের কাছে উলের বলের মত অন্ধকার জমে। তারপর সেটা সূতো খোলার মত এগিয়ে আসে সামনে। এবং শেষমেশ রাত হয়ে যায়। এখন রাস্তা অনেক চওড়া হয়েছে, হহ করে ছুটতে পারে বাস। হঠাৎ সুদীপ ছটফটান উঠল, 'ওই যাঃ!'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

সুদীপ বলল, 'সিগারেট কিনতে ভুলে গেছি। তোদের গ্রামে সিগারেট পাওয়া যাবে?'

পেছন থেকে জয়িতার গলা ভেসে এল, 'আমার কাছে একটা প্যাকেট বাড়তি আছে। দাম দিয়ে দিস।' সঙ্গে সঙ্গে বোবা যাত্রীরা উশখুশ করে উঠল। কল্যাণ সেটা ধরতে পেরে চোখ খুলে বলল, 'তোমার কাছে রাখতে দিয়েছি বলে প্যাকেটটা নিজের হয়ে যায়নি। ওটা আমার সিগারেট। পরের জিনিস দান করা খুব সোজা।'

জয়িতা চোখ বড় করল, 'বাঃ। তুই এই আটটা বেশ রপ্ত করেছিস তো?'

কল্যাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, সামনের সিট থেকে আনন্দ বাধা দিল, 'ঠিক আছে। ওখানে সিগারেট পেতে কারো অসুবিধে হবে না। তোরা বড্ড কথা বলিস।'

সুদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে জয়িতাকে বলল, 'এই জন্যে তোকে ভাল লাগে।'

জয়িতা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোমার নিজেকে ভাল লাগে তো? তাহলেই চলবে।'

ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, মাঝে মাঝেই দ্বীপের মত আলো দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে। বাসের ভেতরে আলো জ্বলছে। আনন্দের মনে হচ্ছিল এটা নিবিঘ্নে রাখলেই ভাল হাত। কারণ তার পরিচিত একজন অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছেন। শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। আনন্দ গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন?'

আধ ঝুলন্ত প্রৌঢ়টি বললেন, 'আছি দেখতেই পাচ্ছ। পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?'

'হুচ্ছে, যেমন হয়।' ইচ্ছে করেই কথাটা বেঁকিয়ে বলল আনন্দ। এতক্ষণ উনি যেভাবে তাকাচ্ছিলেন তাতে মনে হয়েছিল কথা না বললে অন্যায্য হবে কিন্তু কথা শুরু করতেই কান্দা শুরু করেছেন। ওর গ্রামের কিছু মানুষকে এই কারণেই সে সহ্য করতে পারে না। প্রৌঢ় এবার বললেন, 'মন দিয়ে পড়াশুনা কর। তোমার বিধবা মায়ের কণ্ঠ তুমি ছাড়া আর কে দূর করবে! তোমার বাবা কি সরল মানুষ ছিলেন!'

আনন্দ প্রতিটি শব্দ আলাদা উচ্চারণ করল, 'আমার মা আপনাকে কণ্ঠের কথা বলেন নাকি? কি আশ্চর্য, আমাকে ওসব বলেন না।'

'মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?'

'খুবই সামান্য কাকাবাবু। আমার মায়ের কি কি কণ্ঠ আছে সেটা তো আপনার জানার কথা নয়। কেন কথা বলার জন্যে কথা বলছেন?'

সুদীপ এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আপনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কত পার্সেন্টেজ নম্বর পেয়েছিলেন? ও বিরাশি পেয়েছিল। কেন ফটাফট জ্ঞান দেন?'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্র একটা চাপা হাসি উঠল চারপাশে। দু একজন

আলোচনা শুরু করে দিলেন। কুড়ি বছর আগে যত ছেলেমেয়ে হায়ার সেকেন্ডারিতে ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করত এখন তার দ্বিগুণ করে। যত নম্বর এরা এখন পায় তখন সেটা ঝপ্পেও ভাবা যেত না। এই সময়ের ছেলেরা বেশী ব্রিলিয়ান্ট কিনা তাই নিয়ে তর্ক শুরু হল। আনন্দ দেখল সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিলিগু ভঙ্গীতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু লোকটা চটেছে এবং সুযোগ পেলেই চিমটি কাটার চেষ্টা করবে। ছোবল মারার ক্ষমতা নেই। সে চাপা গলায় সুদীপকে বলল, “কেন আগবাড়িয়ে কথা বলতে হাস।”

‘গা জ্বলে যায়।’

‘কখনও কখনও চামড়া মোটা করতে হয়।’

সুদীপ কাঁধ ঝাঁকাল, ‘যারা জীবনে কোন দারিদ্র্য নেবে না তারা নিরাপদে দাঁড়িয়ে জ্ঞান দিয়ে যায়।’

আনন্দ আর কথা বাড়াল না। সুদীপের বাড়ির অবস্থা সে জানে। প্রাচুর্য সেখানে দমবন্ধ করে ছড়ানো। ওর নিকট আত্মীয় স্বজন যে স্তরের তাতে ভারত বর্ষের এক শ্রেণীর সুবিধের চাষি হাতে নিয়ে জন্মানো ছেলে-মেয়ের মত সেই রকম জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারত। ইংলিশ মিডিয়ামে ওর রেজাল্ট চোখে পড়ার মতই ছিল। ও তার নম্বরটা চেঁচিয়ে বলেছে কিন্তু নিজেরটা বললে লোক গুলো হেঁচট খেত। অথচ সুদীপ জে ই-তে বসল না। কিন্তু তার ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে নেই জানার পর গ্রামের যে পেরেছে সেই জ্ঞান দিয়েছে।

বাস থেকে নেমে জয়িতা বলল, ‘জেনারেলের চলছে রাজার মতন।’

আনন্দ বলল, ‘রাজার মতনই আছে ওরা।’

সুদীপ উদাস গলায় বলল, ‘আজ রাতে রাজা যাবে বনবাসে। চক্ষু লজ্জা বলেও একটা কথা আছে। সমস্ত গ্রামে টিমটিমে হ্যারিকেন জ্বলছে আর ওখানে আলোর ফোয়ারা ছুটছে। আর এসব মানুষ মেনে নেয়, চুপচাপ।’

কল্যাণ বলল, ‘এটা কোন অভিযোগ নয়। আমার সামর্থ্য থাকা অপরাধ? সেটা আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা রাখার জন্য ভোর রাগ করার যুক্তি নেই।’

ওরা ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে কয়েক পা এগিয়ে আসার পর পুরো এলাকাটা দেখতে পেল। ঠিক রাস্তার কয়েক পা নিচে মাধবীলতার গাছে সাজানো গেট। দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল তার দুপাশ থেকে চলে গেছে বাড়টাকে ঘিরতে। মোহার গেটটি বন্ধ। কিন্তু ভেতরের আলোয় বোঝা যাচ্ছে সাদা নুড়ি বিহানো পথ চলে গেছে ভেতরে। গেটের দুপাশে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে যু-নিফর্ম পরে। ওরা জানে লোক দুটো নেপালি এবং খুব অনুগত। গেটের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ালে একজন গেট খুলে দেয় অন্যজন প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিক নির্দেশ করে। এদের বিশদ বিবরণ চারজনেই জানে। ওরা দেখল গেটের

ওপর ইংরেজিতে লেখা আছে জায়গাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অতএব প্রবেশ এবং প্রস্থান অনুমতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। যাঁরা রাত্রে থাকবেন না তাঁদের বলা হয়েছে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে উদ্যান ছেড়ে যেতে হবে নইলে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়া কর্তৃপক্ষের সম্ভব নয়। চারপাশের গভীর অন্ধকারের মধ্যে বিশাল এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটাকে স্বপ্নের জাহাজের মত মনে হচ্ছে। জয়িতা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় পেছনে হেডলাইটের তীব্র আলো এবং গাড়ির গতি হ্রাস হওয়ার শব্দ কানে এল। ওরা দ্রুত সরে এল এক পাশে যাতে রাস্তার ধারের বড় গাছটার আড়াল পাওয়া যায়। গাড়িতে আরোহী দুজন। চালাচ্ছেন পঞ্চাশের কাছাকাছি খুব স্মার্ট হতে চাওয়া মানুষ। ওপাশে চটকদার এক ম্যানিকিন যিনি ন্যাকা গলায় বলে উঠলেন, 'এই তো প্যারাডাইস ওঃ, নটি ডিয়ার!'

'বাইরে থেকেই এত এক্সাইটেড হবেন না মিসেস মিত্র, তাহলে ভেতরে গিয়ে নার্ভ তিক থাকবে না। দেয়ার আর মোর সারপ্রাইজ—' পুরুষটি হাত বাড়িয়ে টান টান চুলে আগুলের ডগা ছোঁওয়াল।

সঙ্গে সঙ্গে কপট অভিমানে ছিটকে সরে গেলেন ম্যানিকিন, 'তুমি এখনও মিসেস মিত্র আপনি বলে যাচ্ছ। ভোগু টাচ মি।'

'ইউ আর রিয়েল সুইটি।' গাড়িটা ধীরে ধীরে প্যারাডাইস সাইনবোর্ড ঝোলানো লোহার গেটের দিকে এগিয়ে যেতে একজন প্রহরী কিছু জিজ্ঞাসা করল। ভদ্রলোক উত্তর দেওয়ামাত্র সসম্ভ্রমে গেট খুলে দেওয়া হল। গাড়িটা যেন আলোর সাগরে ডুব সাঁতার দিয়ে মিলিয়ে গেল। গেট বন্ধ হল।

আনন্দ বলল, 'গাড়িতে এলে বেশী প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয় না। অবশ্য হেঁটে খুব কম পার্টি আসে।'

জয়িতা বলল, 'আমরা গাড়িটা কখন পাচ্ছি?'

সুদীপ জানাল, 'এখনও ঘন্টা আড়াই বাকি আছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। লোকজন যাওয়া আসা করছে। চল, এগোই।'

আনন্দও আর দাঁড়াতে চাইছিল না। একটু বাদে বড় রাস্তা ছেড়ে ওরা কাঁচা পথে নেমে এল। আনন্দের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে একটু বেশী হাঁটতে হবে কিন্তু কারও সামনে পড়ার সম্ভাবনা কম। সুদীপ বলল, 'পা চালা, জব্বর খিদে পেয়ে গেছে।'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'আমারও।'

জয়িতা হাসল, 'কি করে তোরা এইসময় খাবার কথা ভাবতে পারিস কে জানে!'

সুদীপ চেঁচালো, 'ঈশ্বর তোমাদের শরীরে এক্সট্রা একটা যন্ত্র দিয়েছেন যা দিনে সবরকম প্রাকৃতিক ব্যাপার তোমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ঘামিয়ে রাখতে পার। বাট উই আর হেল্পলেস।'

'আহা বেচারী! কিন্তু তোর মুখে তুমি খুব অলীল শোনাচ্ছে।' জয়িতা

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল।

পাল্টা সুদীপ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় স্থির হ্যারিকেনের আলো দেখা গেল। আনন্দ চাপা গলায় বলল, ‘আস্তে।’

বিশাল একটা বট কিংবা অশ্বথ গাছের গায়ে লম্বাটে মুদির দোকান। সেখানে হ্যারিকেন ঝুলছে। দোকানের সামনে মাটিতে পোঁতা বেঞ্চিতে বসে কয়েকজন গল্প করছে। আনন্দরা এমনভাবে হাটছিল যাতে জমিতা আড়ালে থাকে। অবশ্য অন্ধকারে কেউ তাদের স্পষ্ট বুঝতে পারবে না। কিন্তু মুখোমুখি প্রশ্নটাকে এড়াতে পারল না আনন্দ, ‘কে যায়?’

‘আমি। আনন্দ।’

‘আনন্দ? সেন বাড়ির ছেলে?’

‘হ্যাঁ।’

‘সঙ্গে কারা?’

‘আমার বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছে। ভাল আছেন মেশোমশাই?’

‘হ্যাঁ, ওই আর কি!’

জায়গাটা পেরিয়ে এসেই সুদীপ জিজ্ঞাসা করল ‘এত কৈফিৎ দিলি কেন?’

আনন্দ হাসল, ‘প্রত্যেক জায়গায় নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। সেই জায়গার মানুষের ব্যবহারও সেই চরিত্রের মধ্যে পড়ে। আমি সেটা অস্বীকার করলে সাহায্য পাব না কিন্তু সেটাকে মানিয়ে নিলে অসুবিধে হবে না, বুঝলি?’

সুদীপের যে কথাটা ভাল লাগল না এটা বুঝতে পারল আনন্দ। যারা এইরকম গ্রামে আবল্য থাকেনি তারা বুঝে উঠবে না। তাছাড়া সুদীপ সব ব্যাপারে চাঁচাছোলা কথা বলতে ভালোবাসে। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। ট্রামে যাচ্ছিল আনন্দ সুদীপের সঙ্গে। এক ভদ্রলোক কংগ্রেস এবং সি পি এমের মুণ্ডু পাত করছিলেন। কংগ্রেস এইরকম সি পি এম সেইরকম। হঠাৎ সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনি কোন দলের?’

‘মানে?’

‘কংগ্রেস না সি পি এম?’

‘কোন দলের নয়। আমি কোন রাজনীতিফিতি করি না!’

‘ভোট দিয়েছেন গতবার?’

‘হ্যাঁ, দেব না কেন! আমার ডেমোক্রেটিক রাইট!’

‘আপনিই সবচেয়ে ডেঞ্জারাস লোক। দেশের শত্রু!’ সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার হেসে উঠেছিল সজোরে। এই সুদীপের কাছে গ্রাম্য কৌতূহল তো খারাপ লাগবেই।

ক্রমশ একটা অন্ধকার দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দুটো ঘরে হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে। সামনে কিছুটা বাগান। আনন্দ বলল, ‘এই আমার বাড়ি!’

ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। পরিষ্কার কাঁচের কারণে বেশ উজ্জ্বল। ওরা তিনজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। জয়িতা একটা বেতের চেয়ারে বসে হ্যারিকেনের আলোয় রঙিন পত্রিকা খুঁজতে চোখ রেখেছিল। সুদীপ আনন্দের বিছানায় চিৎ হয়ে পড়েছে। কন্যাণ আর একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে। এই ঘরে বিভূতির চিহ্ন নেই। কিন্তু বাঙালি মানসিকতার ছাপ রয়েছে। এখন আনন্দ বাইরে।

ওরা পেছনের দরজা দিয়ে এখানে ঢুকেছে। সমস্ত তল্লাটটা অন্ধকারে ডুবে থাকায় ঢোকান সময় কেউ তাদের লক্ষ্য করেনি। এই ঘরে তাদের বসতে বলে আনন্দ বেরিয়েছে অনেকক্ষণ। কোথাও কোন শব্দ নেই। জয়িতা পত্রিকা থেকে মুখে তুলে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার শরীর ঠিক আছে?’

সুদীপ সেই অবস্থায় বনল, ‘ফাস্ট ক্লাশ’

জয়িতা আবার চোখ নামাল। কিন্তু সে পত্রিকা পড়তে পারছিল না। এই ঘরে আসার পর থেকেই বুকের ভেতর ছটফটানি শুরু হয়েছে। এরকম উত্তেজনা কখনও সে বোধ করেনি। এই ঘরটা যেন মেক-আপ রুম। স্টেজে নামবার আগে জিরিয়ে নেবার পাল। এতক্ষণ কলকাতা থেকে আসবার আগে অথবা বাসে বাসেও এরকম অস্থিত একবারও হয়নি। চোখ বন্ধ করল জয়িতা। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুকের ভেতরে একটা চিনচিনে অনুভূতি শুরু হয়েছিল। কতকালের চেনা দেওয়াল, আসবাব এমনকি টুকিটাকি জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা কষ্টবোধ শুরু হচ্ছিল। ঠিক সেইসময় দরজায় শব্দ হয়েছিল। সেই মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু শব্দটাকে থামাবার জন্যেই দরজা খুলতে হয়েছিল। বহুদিনের অভ্যেসে রান্না শোওয়ার সময় হাউসকোট থাকে ওর, দরজা খুলতেই রামানন্দকে দেখতে পেয়ে বুকের কাছটা হাত দিয়ে টেনে ধরল সে। এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা সে কিছুতেই করতে পারে না। ওই মুহূর্তেই সে একটুও দৃষ্টিটুকটু পোশাকে ছিল না কিন্তু হাউসকোট পরনে থাকার জন্যেই কি তার হাত বুকের ওপরে উঠে গিয়েছিল? শার্ট প্যান্ট পরে সারাদিনে কত মানুষের মুখোমুখি হয় সে, কিন্তু কখনই তো ওরকম আচরণ করে না। মেয়েলিপনা অভ্যেসে নেই, মেয়েরা যা করে থাকে তা ওর ধাতে আসে না কিন্তু একথাও ঠিক কিছু মেয়েলি স্বভাব অগোচরেই রক্তে থেকে গেছে। অচেতন মুহূর্তে সেটা প্রকাশ পায় এবং এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। রামানন্দকে দেখে সে সত্যি অবাক হয়েছিল। নিশ্চয়ই তার চোখে মুখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল নইলে রামানন্দ কেন কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গী করে বলবেন, ‘তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। ঠিক আছে, তুই ফ্রেস হয়ে নে, আমি না হয় পরে আসব।’ রামানন্দ বিব্রতভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়াতেই জয়িতা

বলেছিল, 'তুমি বসতে পার, আমার দু'মিনিট লাগবে। রামানন্দ চকিতে একবার ডেস্কের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর চট করে ঘরে চলে এলেন। জন্মিতা আর অপেক্ষা করেনি। বাথরুমে নিজেকে ভদ্রস্থ করতে করতে সে ডেবে পাচ্ছিল না কি কারণে রামানন্দ অমন আচরণ করছেন। বোঝাই যাচ্ছে ও'র এই আসাটা সীতার দৃষ্টি এড়িয়ে। কেমন একটা চোর চোর ভাব আছে। হাউসকোটটা পাল্টাতে গিয়ে মত পরিবর্তন করল জন্মিতা। সে এমন কিছু অশোভন পোশাকে নেই যে প্যান্ট পরতে হবে। অস্বস্তিটাকে উড়িয়ে দিতেই সে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকে দেখল একমাত্র চেয়ারে রামানন্দ বসে আছেন। খাটে পা মুড়ে বসল জন্মিতা, বসে বলল, 'বল।' রামানন্দ মাথা নামালেন। কথাটা কিভাবে বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। লক্ষ্য করল জন্মিতা। কিন্তু সে কিছুই বলতে চাইল না। মিনিটখানেকের মত সময় ব্যয় করে রামানন্দ চোখ না তুলে বললেন, 'ইটস নট মাই ফল্ট, নট অ্যাট অল।'

'কি ব্যাপারে বলছ?'

'প্রিন্সিলা ব্যাপারটার রঙ চাপিয়েছে। এটা ওর অভ্যেস। অন্তত আরও পাঁচটা ফ্যামিলিতে ও এই কাণ্ড করেছে।'

'হঠাৎ একদিন পরে এইসব কথা বলতে এলে কেন?'

'না, মানে, আমি ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না। তুই, তুই—'

'ইটস অলরাইট। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন আমার নেই।'

রামানন্দ এবার চোখ তুলে তাকালেন, 'ঠিক আছে, তোকে অন্য একটা কথা বলতে চাই। অনেক ভেবেচিন্তে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। তুই এখন বড় হয়েছিস, তোর কথাটা জানা দরকার। তোর মা যে জীবন যাপন করছে এটা আর আমার পছন্দ নয়। কিন্তু সে আমার নিষেধ মানতে চাইছে না। এই অবস্থায়—'

জন্মিতা দেখল রামানন্দ পরের কথাটা: কিভাবে বলবেন সেটা ভেবে নিচ্ছেন। সে প্রমত্ত করেই ফেলল, 'তুমি যা করে যাচ্ছ তা মা পছন্দ করছে?'

'হ্যাঁ সে চাইছে। কারণ আমি এইরকম জীবনযাত্রা থাকলে তার সুবিধে হয়। ও আজ দুপুরের ফ্লাইটে স্যানালের সঙ্গে বাইরে যাচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক করে আমাকে জানিয়েছে। এটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'সমস্যাটা তোমার এবং মায়ের। আমাকে বলতে এসেছ কেন?'

রামানন্দ জন্মিতার দিকে তাকালেন, 'জন্মিতা তুই আমার মেয়ে, আমি যদি বিবাহবিচ্ছেদ চাই তাতে তোর আপত্তি আছে?'

'নোঃ। নট অ্যাট অল। এটা তোমাদের ব্যাপার। তবে যদি আমার খাকা নিয়ে কোন অসুবিধে হয় তাহলে জানিয়ে দিও। ওহো, আমাকে হয়তো

কয়েকদিন কিংবা অনেকদিনের জন্যে বাইরে যেতে হতে পারে। সেটা হলে তোমরা কোনরকম দৃষ্টিভঙ্গা করো না। অবশ্য তার জন্যেও তোমাদের সময় হবে না হয়তো।’

‘কোথায় যাবি?’ প্রায় চমকে উঠেছিলেন রামানন্দ।

‘এখন কোথায় যাব আমি তোমাকে এই মুহূর্তে জানাতে চাই না।’

‘তোরা কি আরম্ভ করেছিস? জয়ী, আমি তোকে অন্যরকম মেয়ে বলে জানতাম।’

‘তাই? না, আমি কোন, স্যানালের সঙ্গে জয়ট্রিপে যাচ্ছি না।’

রামানন্দ এবার সোজা হলে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখমুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। প্রাণপণে নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করছিলেন বুঝতে পারছিল জয়িতা। ওর বেশ মজা লাগছিল। এই মুহূর্তে অত্যন্ত দায়িত্ববান পিতার মত মনে হচ্ছে তাঁকে। অজুদ গলায় রামানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিলেন ‘কত টাকা সঙ্গে নিতে চাও?’

নিঃশব্দে মুখ তুলে প্রশ্ন করল জয়িতা। যেন প্রস্তাবটা সে ধরতে পারছে না।

রামানন্দ এবার সরল করার চেষ্টা করলেন, তাঁর মুখ এখনও লাল, ‘বাইরে যাচ্ছ, তোমার কি টাকার দরকার আছে?’

জয়িতা ঘাড় নেড়ে না বলল। রামানন্দ আর দাঁড়ালেন না। সেই মুহূর্তে ওই ঘরে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল জয়িতার। একটু বড় হবার পর থেকেই একা একা থাকতে থাকতে সেটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে কারও সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা না বলার প্রবণতা এসে গিয়েছিল। চুপচাপ বই পড়া, গান শোনা বা ঘুমোনের মধ্যে বেশ স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু রামানন্দ বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই শব্দহীন ঘরে বসে কিরকম একটা কাঁপুনি এল শরীরে। ও চটপট বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। এবং সেই সময় সীতার গলা কানে আসতেই কাঁপুনিটা থেমে গেল। টেলিফোনে সীতা কাউকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় যেন তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। শব্দগুলো কানে যাওয়ামাত্র সহজ হয়ে গিয়েছিল জয়িতা। স্বচ্ছন্দে ঘরে ফিরে গিয়েছিল সে।

পল্লিকটা বন্ধ করে চোখ তুলল জয়িতা। সুদীপ কি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল? উল্টোদিকে বসা কল্যাণ বলল, ‘আনন্দ কোথায় গেল? দেখব!’

জয়িতা মাথা নাড়ল, ‘না। বেশী ঘোরাঘুরির দরকার নেই, কখন দেখে ফেলবে তারপর! আসবে নিশ্চয়ই কাজ সেরে।’ তারপর নিচু গলায় প্রশ্ন করল, ‘তোর এখন কি মনে হচ্ছে?’

‘ঠিক হয়। তাছাড়া যাচ্ছিস তো তোরা, মনে হবে তোদেরই।’

‘তোরাও তো একসময় যাবি।’

‘সময়টা আসুক। এখন আমার খিদে পেয়েছে খুব।’

‘তুই একটা পেটুক আছিস!’ হাসল জয়িতা।

‘দুপুরে কি খেয়েছিস?’

‘লাঞ্চ!’ জয়িতা খানিকটা বিস্মিত কল্যাণের প্রশ্ন করার ধরনে।

‘বাড়িতে ফাটাফাটি হয়ে গেছে আজ। উনুন ধরেনি। ভাত আর তরকারিকে যদি লাঞ্চ বলা যায় তো সেটা আমার ভাগ্যে জোটেনি।’

‘আই অ্যাম সরি।’

‘দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আমাদের এইসব নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়।’

‘কেন ঝগড়া হল?’

‘হল। না হয়ে কোন পথ ছিল না তাই। আসলে অভাব থেকেই তো অক্ষমতা, ঈর্ষা আসে। আর সেটাকে চাকতে বেশীর ভাগ মানুষই গলা চড়িয়ে মেজাজ দেখানো ছাড়া অন্য কোন পথ পায় না।’ কল্যাণ চোখ বন্ধ করল।

এই সমস্ত বারান্দায় শব্দ হল এবং তারপরেই আনন্দ দরজায়, ‘একটু দেরি হয়ে গেল। মা ছিল না বাড়িতে। খবর দিয়ে এলাম। সুদীপ কি ঘুমোচ্ছিস? কি করে পারিস!’

সুদীপ কোন সাড়া দিল না। তার শরীরটা তখনও টানটান পড়ে আছে। আনন্দ এবার জয়িতার দিকে তাকাল, ‘কি শাড়ি এনেছিস?’

‘দক্ষিণী।’

‘মানে?’ আনন্দের মুখে বিস্ময়।

‘তুই বুঝতে পারবি না। ভালই কাজ চলবে।’

‘চটপট পরে নে। ওপাশে একটা ঘর আছে, চলে যা।’

‘এক্ষুনি?’

‘হ্যাঁ। যে মেয়েটা খাবার দেবে সে যেন তোর প্যান্ট শার্ট না দেখে। গ্রামের কেউ যদি লক্ষ্য করেও থাকে তাহলে তোকে মেয়ে বলে চেনেনি। সবাই ভাববে তিনটে ছেলে আমার সঙ্গে এসেছিল। একে জিজ্ঞাসা করলে এ বলবে দুটো ছেলে একটা মেয়ে। দুটো স্টেটমেন্ট মিলবে না। যা।’

ব্যাগটা নিয়ে উঠল জয়িতা। তারপর পাশের ঘরে চলে গেল। এই ঘরেও একটা হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে রাখা ছিল। দরজা বন্ধ করে সে ব্যাগটা খুলল। তারপর সাউথ ইণ্ডিয়ান সিল্কটা বের করল। রঙটা সত্যি ভাল কিন্তু এইরকম জমকালো শাড়ী পরার ইচ্ছেই হয় না তার। শার্ট প্যান্ট খুলল সে। তারপর ধীরে ধীরে শাড়ি-ব্লাউজের খোলস চাপাতে লাগল। তার ছোট চুল এই শাড়ির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। সুদীপের পরামর্শে নকল চুল এনেছিল সে। এখন আধা-আলোয় নিজেকে আয়নায় দেখে কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছিল তার। এইভাবে কোনোদিন প্রসাধন করেনি জয়িতা। আর অনভ্যস্ত হাতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সাবধানী আঙুলে নকল চুলকে প্রায় আসনের চেহারায় আনল সে। নিজের দিকে তাকিয়ে হাসি পাচ্ছিল তার।

কিছুতেই নিজেকে লবঙ্গলতিকা বলে মনে হচ্ছে না। কি আর করা যাবে, সবার তো সব হয় না। প্যান্ট শার্ট ব্যাগের ওপরেই রাখল সে, প্রয়োজনে যেন হাতড়াতে না হয়। দরজা খুলে পাশের ঘরে যেতেই সুদীপ চৈঁচিয়ে উঠল, 'দারণ দেখাচ্ছে কিন্তু তুই আমার পাশে আসবি না।'

কথাটা সবাই শুনল কিন্তু কেউ কিছু বলল না। আনন্দ আর কল্যাণ জয়িতার দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়েছিল। আনন্দ এক পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো 'দেখলে মনে হবে তো বড়লোকের মেয়ে ফুঁতি করতে এসেছিস্ বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে!'

জয়িতা বলল, 'সেটা তোরা বল, আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।'

কল্যাণ হাসল, 'ভাগ্! তোদের সোসাইটিতে দেখিস নি।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কেউ সন্দেহ করবে না। তোকে চমৎকার মানিয়েছে।'

সুদীপ চুপচাপ শুনছিল মুখে হাসি রেখে। বলল, 'উঃ, এখান থেকেই গন্ধ পাচ্ছি।'

জয়িতা চোখ ছোট করল, 'তখন থেকে কি বকছিস?'

'পারফিউম আনিসনি সঙ্গে?' নাক টানল সুদীপ।

'না।'

'এই জন্যেই তুই মেয়ে হলি না। যে মেয়ে প্যারাডাইসে যাবে তার ব্যাগে দুটো পি থাকবেই।'

'দুটো পি মানে' কল্যাণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'একাডেমিক ডিসকাশন হিসেবে নেবে সবাই। পারফিউম অ্যাণ্ড প্রোটেকশন।'

'ভাগ।' প্রায় চিৎকার করে উঠল জয়িতা।

'যে পুজায় যে ফুল ভাই। তোর ওই নকল চুলে বিটকেল গন্ধ ছাড়ছে নিশ্চয়। একটু গন্ধটুকু ঢাললে আমার ভাল হত।' সুদীপ আবার গুতে গুতে বলল, 'চলবে আনন্দ।'

এই সময় আনন্দ পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মা আসছে।' কথাটা শোনামাত্র সুদীপ আবার উঠে বসল। জয়িতার মুখ তখনও লাল, নিজেকে সামলে নিতেই সে পাশের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। আনন্দ বলল, 'এসো মা, এরাই আমার বন্ধু।'

পঞ্চাশয়েরা এক মহিলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। কল্যাণের মনে হল আনন্দের মা এখনও সুন্দরী। জয়িতা মুগ্ধ চোখে দেখছিল। এত আঘাত, একাকী একটি মহিলার বেঁচে থাকার লড়াই সত্ত্বেও সর্বান্তে কেমন স্নিগ্ধ মা মা ভাব ফুটে উঠেছে। আনন্দের মা বললেন, 'তোমরা অনেকক্ষণ এসেছ শুনলাম। কিছু মনে করো না, খুব দরকারেই আমাকে বেরোতে হয়েছিল।'

কল্যাণ বলল, 'না না, আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি।'

সুদীপ বলল, 'মাসীমা ঘরে এসে বসুন। আমি সুদীপ।'

‘হাঃ, তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব ? তুমি কল্যাণ ?’

‘হ্যাঁ মাসীমা ।’

‘আর তুমি জন্মিতা ! তাই তো ।’

জন্মিতা মাথা নাড়ল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল।

মাসীমা তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘তুমি তো খুব ভাল ।’

জন্মিতাকে প্রণাম করতে দেখে আনন্দ উঠল। সুদীপ বলল, ‘ওহো, আমি তো গতবারও প্রণাম করেছি। জন্মিতা না এমন ডোবায়—।’

‘না মা তোমাদের ডুবতে হবে না। বসো তো সবাই। তুমি এসো আমার সঙ্গে ।’

মাসীমা চলে গেলেন জন্মিতাকে নিয়ে। কল্যাণ বলল, ‘ভাগ্যিস ও শাড়িটা পরে নিয়েছিল, প্যান্ট পরা দেখলে হস্মে যেত চিন্তির ।’

আনন্দ বলল, ‘কিছুই হতো না। মাকে কনজারভেটিভ ভাবার কোন কারণ নেই ।’

সুদীপ বলল, ‘পুরো ব্যাপারটা তোমার মাথায় আছে ?’

‘আছে ।’

‘তুই আর কল্যাণ খেয়েদেয়ে আধঘণ্টা পরে বের হবি। তার ঠিক ঘণ্টাখানেক পরে আমি জন্মিতাকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোডের সেই বটগাছটার নিচে থাকব। আবার বলছি গাড়িটা নেবার সময় কোন বুকি নিবি না। এমন পরিস্থিতি যেন না হয় যে নেওয়া মাত্র চারধারে গোলমাল শুরু হয়ে গেল ।’

‘হবে না ।’

এই সময় দরজায় শব্দ হল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘খাবার দিনেছে ?’

একটি প্রৌঢ়া মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল। আনন্দ বলল, ‘চল, খেয়ে নিই ।’

ওরা বারান্দায় এল। উঠোনটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। ওদিকটায় একটা ছোটখাটো বাগান আছে, গাছের গন্ধ বাতাসে। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল,

‘মাসীমা ব্যাপারটা জানেন ? মানে, এখন যে—।’

‘না ।’

‘কোন প্রশ্ন করবেন না ?’

‘না। মা মনে করেন আমি কোন অন্যান্য করতে পারি না ।’

সুদীপ চাপা গলায় মন্তব্য করল, ‘ফেনহান্ন ।’

‘না। যদি বুকি কাজটা অন্যান্য হয়ে গেল তাহলে এসে মাকে জানাই ।’

কল্যাণ ঠোঁটে শব্দ তুলল, ‘তোকে হিংসে হচ্ছে রে ! কপাল করেছিলি ।’

চারজনে মাটিতে আসন পেতে খাচ্ছিল। সুদীপ পা ছড়িয়ে বসেছিল। হাঁটু মুড়ে খাওয়ার অভ্যেস না থাকায় তার অসুবিধে হচ্ছিল। জন্মিতা দুই হাঁটু

মুড়ে শাড়ি নিয়ে জবুখুবু হলে বসে কিছুক্ষণ বাদেই টের পেল তার দুটো পা টনটন করছে, ঝি ঝি ধরে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এইভাবে খাওয়ার অভ্যেস তারও নেই। কিন্তু ওরা দুজন মুখে কিছু বলল না। এখন তো সবরকম পরিস্থিতির সঙ্গেই মানিয়ে নিতে হবে এইরকম একটা ভাবনা ভাবতে চেষ্টা করছিল ওরা। কল্যাণ খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে খেতে খেতে হঠাৎ জয়িতার আওড়ানো পেটুক শব্দটা মনে পড়ে যেতেই গ্লথ হয়ে গেল। আনন্দর কোন উত্তাপ ছিল না। মাসীমা একটু তফাতে আসন পেতে বসেছিল। সুদীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কিছুই খাচ্ছ না। তুমিও না জয়িতা।'

'সুদীপ উত্তর দিল, 'ও ফিগার ঠিক রাখছে আর আমার খিদে পায়নি।' জয়িতা প্রতিবাদ করল, 'ওর কথায় একদম বিশ্বাস করবেন না মাসীমা। বড্ড বাজে কথা বলে।'

আনন্দ বলল, 'ওরা কিন্তু আজকেই চলে যাবে মা।'

মাসীমা অবাক হলেন, 'সেকি! তাহলে আসাই বা কেন? এই অন্ধকারে এসে ফিরে গেলে তোমরা তো কিছুই দেখবে না। চলে যাওয়াটা কি খুব জরুরী?'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ।'

মাসীমা এবার গলার স্বর নামালেন, 'তুইও যাচ্ছিস?'

'এখনই বলতে পারছি না। হয়তো ফিরে আসতে পারি।'

জয়িতা লক্ষ্য করল আনন্দের মা আর কথা বাড়ালেন না। উদ্রমহিলাকে সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। বন্ধুদের কাছ থেকে সরিয়ে নিজের ঘরে এনে উনি বলেছিলেন, 'বোকা মেয়ে ওভাবে শাড়ি পড়তে হয়? তোমার সায়্য দেখা যাচ্ছে, পেছন দিকটা উঠে আছে।'

ষাড়ি ঘুরিয়ে সেটা আবিষ্কার করে লজ্জিত হয়েছিল সে। শাড়ি পরার ব্যাপারে যে সে একদম আনাড়ি এটা বুঝতে ওঁর মোটেই অসুবিধে হয়নি। নিজের হাতে শাড়ি পরিয়ে দিলেন উনি। আর সেই মুহূর্তে সীতার কথা মনে হচ্ছিল খুব। অবশ্য মনে হওয়াটাও বোকামি। তারপর টুকটাক কথা। কিন্তু কখনই জয়িতার ব্যাপারে শোভনতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে নয়। এমন কি এই ছেলে তিন বন্ধুবান্ধবীকে নিয়ে সন্ধ্যার পর হাজির হল তা নিয়েও বিস্ময় নেই। অথচ মহিলাকে বোকা কিংবা সরল ভাবার কোন কারণ নেই। উনি কথা বলেন সঙ্গম রেখে। আনন্দ বোধহয় মায়ের স্বভাব খানিকটা পেয়েছে। তাদের বয়সী কেউ অমন গাঙ্গীর্ষ রপ্ত করেনি, গুছিয়ে কথা বলতে শেখেনি। জয়িতা আনন্দের মায়ের মুখের দিকে তাকাল। এমন নির্লিপ্ত অথচ স্নিগ্ধ মুখ সে কোনদিন দ্যাখেনি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ছেলেরা ঘরে ফিরে গেলে জয়িতা বাধরুমে ঢুকল। হ্যারিকেনটা চৌবাচ্চার উপরে রেখে সে দেখল ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কার

কিন্তু বালতিতে জল তোলা আছে, কলের ব্যবস্থা নেই। কমোড নেই। কথাটা মনে হতেই সে হেসে ফেলল। অভ্যেস বড় বদ জিনিস, অজান্তেই মনে কামড় দেয়।

সিগারেট ধরিয়ে সুদীপ বলল, ‘মাসীমাকে কিছু বললি না?’

‘না। বললে অসুবিধে, অস্বস্তিতে থাকবে। হয়তো মুখে কিছু বলবে না কিন্তু মন থেকে চাইবে কিনা সন্দেহ আছে। জিনিসগুলো আলাদা কর।’

‘ওগুলো আলাদা করাই আছে। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নে। এখন ঠিক সাড়ে আটটা বাজে। তোরা সাড়ে আটটায় চলে আসবি। আগে এলেও ক্ষতি নেই।’

আনন্দ সময়টা ঠিক করে নিয়ে বলল, ‘অঙ্ককারে পৌঁছাতে পারবি তো?’

‘রাস্তাটা পরিষ্কার মনে আছে, তবে অঙ্ককারে একটু—, আর একবার বল।’

‘তোরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে হাঁটতে শুরু করবি। মিনিট তিনেক যাওয়ার পর রাস্তাটা দু ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিক দিয়ে হাঁটলেই তোরা ডায়মন্ডহারবার রোডে গিয়ে পড়বি। তারপর বাঁ দিকে খানিকটা এগোলেই গ্রামটা শেষ হয়ে যাবে। মিনিট দশেক হাঁটলে পেট্রল পাম্প দেখতে পাবি।’

বিশদ বুঝিয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি কি তোদের কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসব?’

সুদীপ মাথা নাড়ল। তারপর সেই সময়ে নিয়ে আসা ব্যাগটা খুলে দুটো প্যাকেট বের করল। ভারি প্যাকেটটা সে আনন্দের দিকে এগিয়ে দিল। ওর মুখে সামান্য কাঁপন নেই। যেন অভ্যস্ত হাতে সে কাজ করছে। তারপর দুটো রিভলবার বের করে একটা এগিয়ে দিল আনন্দের সামনে, ‘গুলি রোড করা আছে। ওকে আর একবার বুঝিয়ে দিস।’

সুদীপ যন্ত্রটাকে লুকিয়ে নিল শরীরে। তারপর কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘চল।’

কল্যাণ উঠল। ওকে এখন বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সেটা বুঝতে পেরে আনন্দ বলল, ‘শোন কল্যাণ, তুই ইচ্ছে করলে এখনই কলকাতায় ফিরে যেতে পারিস।’

‘না। মানে, তুই এই কথা বলছিস কেন?’

‘তোমার যদি মনে হয়—ইটস আপটু ইউ!’

‘আনন্দ, আমি ঠিক আছি। কিন্তু গ্রামের পথে কেউ যদি পরিচয় জানতে চায় তাহলেই মুশকিল। আসার সময় তো দেখলাম।’ কল্যাণ স্বাভাবিক হতে চাইছিল।

‘তোরা বলবি আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছিল। তবে চেষ্টা করবি যাতে সেরকম কারো সামনে না পড়িস।’

ওরা বাইরে বেরিয়ে আসতেই জন্মিতাকে দেখতে পেল। কল্যাণ বলল, ‘বেরুচ্ছি।’

জয়িতা হাসল, 'উইস ইউ গুড লাক।'

সুদীপ বলল, 'নায়িকা নায়িকা ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে থাকিস। আমার কপালে শেষ পর্যন্ত এই জিনিস জুটলো। ওরা চুকতে দেবে কি না সন্দেহ।'

জয়িতা তীব্র প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু আনন্দ রাখা দিল, 'আঃ সুদীপ, এই সময়টায় না হয় তাঁটটা বন্ধ রাখ।'

সুদীপ হাসল, 'পেছনে না লাগলে যেটা খেলায় সেটা হজম হতো না। মাসীমা কোথায়?'

আনন্দ বলল, 'বলে যেতে হবে না। গুড বাই।'

ওরা দুজন চুপচাপ অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা তিকমত চিনতে পারবে তো? সুদীপ তো মাত্র একবার এসেছিল।'

'সুদীপকে দিয়ে কোন চিন্তা নেই। চিন্তা কল্যাণের জন্যে।'

'কেন?'

'টিপিক্যাল লোহার মিডল ক্লাশ মেস্টিমেন্ট এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও। বিপদে কতটা শক্ত থাকবে বলা মুশ্কিল।'

'আমার কিন্তু কল্যাণের ওপর আস্থা আছে। ওর তো ভাল রেজাল্ট ছাড়া কোন সম্ভব কিংবা পিছুটান নেই। কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার সুযোগও নেই। ও যেটা করে সেটা এক ধরনের অভ্যেস থেকেই করে, বাঙালীদের অভ্যেস।'

ওরা ঘরে ফিরে এল। গ্রাম এখন আরও নিস্তরূ। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে কি করতে হবে সেটা আবার বলে দেবার দরকার আছে?'

মাথা নাড়ল জয়িতা, তারপর বলল, 'এই বিদ্যুটে চুলটা বড্ড ডিস্টার্ব করছে।'

'কিছু করার নেই। তোর অরিজিন্যাল চুল মনে রাখতে কারও অসুবিধে হবে না।'

'আজকাল অনেক শাড়িপরা মেয়ের চুলের কাট এইরকম, আমারটা অবশ্যই একটু বেশী।'

'সেইটেই আমাদের বিপক্ষে থাকবে। বরং এই চুলের বর্ণনা পেয়ে কেউ আন্দাজ ঠিক রাখতে পারবে না। তুই ঠিক আছিস, এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

আনন্দ দ্বিতীয় রিভলবারটা জয়িতার হাতে দিল, 'গুলিভরা আছে। কি করে ওপেন করবি তা জানিস! খুব প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করিস না। ওটা শরীরে রাখিস না, অসুবিধে হবে। তোর ব্যাগের ঠিক ওপরেই রেখে দে। প্রয়োজন বুঝলে বের করিস। সুদীপকেও বলে দিস তোরা যে যে জিনিস নিয়ে ভেতরে যাচ্ছিস সেগুলো যেন ওখানে পড়ে না থাকে।'

জয়িতা ঘুরিয়ে রিভলবারটা দেখছিল। এবার হেসে বলল, 'প্র্যাকটিসের সময় আমি ফার্টি পার্সেন্ট মাস্ক পেয়েছিলাম। এবার যেন নম্বরটা একটু বাড়ে। ওটাকে ভালভাবে রেখে দিয়ে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের এখানে

পঞ্চায়ত তো সি পি এমের ?

‘না শুধু এই দুটো গ্রাম কংগ্রেসের। এর আগেরবার সি পি এমের ছিল।’

‘দুটো পার্টি প্রটেস্ট করেনি ?’

‘করলে আমরা এখানে আসতাম না। পোস্টারগুলো কোথায় ?’

‘কল্যাণের ব্যাগে। এদিকে নতুন পার্টির কোন কাজকর্ম নেই ?’

‘আছে, না থাকার মতন। তুই আধঘন্টা রেস্ট নে। আমি মাল্লের কাছ থেকে ঘুরে আসি।’

জম্বিতা আনন্দের দিকে তাকাল। তারপর নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

কল্যাণ বড় বড় পা ফেলছিল। সুদীপ চাপা গলস্ব বলল, ‘আস্তে চল।’

পথে মানুষ নেই তা নয়। অন্তত পাঁচজনকে ওরা পেয়েছে ইতিমধ্যে। কেউ

কারো মুখ দেখতে পারেনি এই রক্কে। শুধু কল্যাণ বারংবার বলছে, ‘এই তিক

রাস্তায় যাচ্ছিস তো ?’ প্রথম দুতিনবার উত্তর দিয়েছিল সুদীপ তারপর চুপ

করে গেছে। অন্ধকারে পথ চেনা সত্যি অসুবিধেজনক কিন্তু ওর মনে হচ্ছে

কোন ভুল করেনি। শেষপর্যন্ত গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেয়ে নিঃশ্বাস

স্বাভাবিক হল। মাঝে মাঝেই অন্ধকার চিরে একটা গাড়ি কলকাতার

দিকে ছুটে যাচ্ছে। ওরা চুপচাপ ডায়মণ্ডহারবার রোডে উঠে এল। কল্যাণ

জিজ্ঞাসা করল, ‘পেট্রল পাম্পটা কতদূরে ?’

‘দূর আছে। তোর কি হয়েছে কল্যাণ ?’

‘কেন ? কিছু না।’ চমকে উঠল যেন কল্যাণ।

‘চেপে যাচ্ছিস। নার্ভাস লাগছে ?’

‘একটু।’ সময় নিয়ে উত্তর দিল কল্যাণ, ‘আসলে আমি কোনদিন ডাকাতি

করিনি তো।’

‘আমি করেছি ? আনন্দ করেছে ? তাড়াছা আমরা ডাকাতি করতে

যাচ্ছি না।’

‘জানি। কিন্তু লোক তো তাই বলবে।’

‘তা হলে কি চাস বল ? মনে হয় স্টেশনে গেলে কলকাতার ট্রেন পেয়ে

যাবি।’

‘আমি স্টেশনে যাওয়ার জন্যে এখানে আসিনি। তুই ব্যাপরটা বুঝতে পারছিস

না। আমি জানি কি করতে চলেছি, সে ব্যাপারে আমার মন পরিষ্কার, কিন্তু

তবু যে ছাই, কেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছি কে জানে।’ তারপর নিজেই হেসে

বলল, ‘মিডলক্লাশ সংস্কার। নে চল, দাঁড়া না। আর এসব কথা আনন্দকে

বলিস না।’

সুদীপ কোন কথা বলল না। হেডলাইট বাঁচিয়ে কল্যাণকে নিয়ে সে এগোতে

লাগল। এখন গাড়ির সংখ্যা কম আর যারা যাচ্ছে তাদের গাড়ির গতি

জোরালো। রিস্তা যাচ্ছে কখনো সখনো। কিছু মানুষ ওপাশ থেকে বোধ

হয় গ্রামে ফিরছিলেন বেশ হনহনিয়ে। সুদীপ একটু আংশকা করছিল কিন্তু প্রশ্ন এল না কোন। শেষতক ওরা গ্রাম ছাড়িয়ে গেল। সঙ্গে কিছু নেই সুদীপের কিন্তু কল্যাণকে ব্যাগটা বইতে হচ্ছে। নিজের কথা ভেবে একটু অবাক হচ্ছিল সুদীপ। তার মনে কোন কাঁপুনি নেই। ঘেন খুব স্বাভাবিক কাজ সে করতে চলেছে।

এই সময় পেট্রল পাম্পের আলোটা চোখে পড়ল। উঁচুতে হ্যাঁজাকটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কাছাকাছি গিয়ে ওরা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। মেইন রোড থেকে নুড়ির পথটা নেমে গেছে পাম্পের দিকে। পাম্পের ওপাশে দুটো ঘর। একটায় অফিস অন্যটার বোধ হয় স্টোরের কাজ চালানো হয়। কল্যাণ বলল, 'দুটো লোক দেখতে পাচ্ছি।'

একজনের তো গলাই পাওয়া যাচ্ছিল। চিৎকার করে হিন্দী গান গাইছে সে হ্যালিকেনের আলোয় বসে। দ্বিতীয়জন প্রৌচ। চুপচাপ বসে আছে। এই দুজনকেই এর আগেরবার দেখে গিয়েছিল সুদীপ আনন্দের সঙ্গে এসে। কিন্তু আজ কোন গাড়ি নেই পাম্পে। সেদিন দুটো গাড়ি গ্যারাজ করা ছিল। একটু বাদে প্রৌচ ভদ্রলোকটি ছেলেটিকে কিছু বললেন। গান খামিয়ে সে চিৎকার করল, 'উরে বাপ, এই অন্ধকারে আমি যেতে পারব না।' কথাটা বলে সে ঘরের ভেতরে প্রৌচের কাছে চলে গেল।

ওই ঘরে বিরাট কাঁচের জানলা রয়েছে। কিন্তু পথ একটাই। কল্যাণ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি কোথায়?'

সুদীপ কোন উত্তর না দিয়ে ঘড়ি দেখল। এখনও মিনিট পনের সময় আছে। যদি তার মধ্যে কোন গাড়ি না আসে তাহলে আনন্দরা অপেক্ষা করবে। সে চাপা গলায় কল্যাণকে বলল, 'মালটা বের করে হাতে রেখে দে, পরে হয়তো চান্স পাবি না। তাড়াহড়ো করবি তখন।'

কল্যাণ অন্ধকারেও হাসল, 'দু-রকমের মাল আছে। কোনটের প্রয়োজন হবে তা আগে থেকে বুঝব কি করে? চান্স তৈরী করে নেব।' এই সময় ডায়মণ্ডহারবারের দিক থেকে একটা গাড়ি এগিয়ে এসে পাম্পের হদিশ পেয়ে নেমে এল নিচে। প্রচণ্ড হর্ন বাজাচ্ছিল ড্রাইভার। কল্যাণ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল গাড়িটাকে দেখে। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'যাবি?' সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না।' কারণ গাড়িতে ড্রাইভারকে নিয়ে অন্তত ছয়জন মানুষ বসে। প্রত্যেকেই যুবক, ক্যাসেটে গান বাজছে। ছোকরাটা বেরিয়ে এসে পনের লিটার তেল ভরে দিল। দাম মিটিয়ে চলে গেল ওরা কলকাতার দিকে। ছোকরা ফিরে গেল ঘরের ভেতর। বাইরেটা আবার অন্ধকার। এদিকে মশাও আছে বেশ। কানের কাছে তারা ইতিমধ্যেই পাখা বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। সুদীপ আবার ঘড়ি দেখল। তিন মিনিট বাকি আছে। প্ল্যানটা ওরই। কল্যাণ কিংবা আনন্দ এই ঝুঁকি নিতে চায়নি। কিন্তু ওর মনে হয়েছিল এইটেই সহজ পথ। আনন্দের কাছে জেনেছিল এ তল্লাটে সন্ধ্যের

পর লোডশেডিং হয় না এমন রাত খুব কমই আসে। সেইটে কাজে লাগাতে চেয়েছিল সে। কিন্তু যদি গাড়ি না আসে আজ পাম্পে তাহলেই চিড়ির। জয়িতা চেয়েছিল কোলকাতা থেকে কারও গাড়ি সন্নিবেশে এখানে চলে আসতে। তাহলে আর আনন্দ সেই খুঁকিটা আবার নিতে চায়নি। এর মধ্যে অনেক গাড়ি বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে গিয়েছে, কারো প্রয়োজন হয়নি তেলের। সুদীপ লক্ষ্য করল যত দেরি হচ্ছে তত কল্যাণ শান্ত হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে সমস্তটা পেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আনন্দ আর জয়িতা বটগাছের নিচে অপেক্ষা করছে এতক্ষণ। সুদীপ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিল। ওকে ঘাড়ি দেখতে দেখে কল্যাণ বলল, ‘ওদের তো অপেক্ষা করতেই হবে। যদি গাড়ি না পাই তো আনন্দের বাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তখন আবার আগামীকাল ভাবতে হবে।’

সুদীপ বলল, ‘কাল যদি ইলেকট্রিক চলে আসে? যা করার আজই করতে হবে।’

‘লোডশেডিং যে হবেই তা আজ আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। হয়ে গিয়ে সুবিধে হয়েছে। কাল না হলে অন্য কিছু ভাবতে হবে। কিপ ইন্টার আইস ওপেন। বলেই কল্যাণ হাসল। সুদীপ ঠাট্টাটা বুঝেও বুঝল না। ওর মনে হয় কল্যাণ এতক্ষণে শান্ত হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় কোলকাতার দিক থেকে গাড়িটাকে আসতে দেখল সে। আলো দেখেই বোঝা গেছে ওটা অ্যান্ডারসাইডার। গাড়িটা গতি কমাচ্ছে। সুদীপ কল্যাণকে নিয়ে গাছের এপাশে চলে এল। হেডলাইটটা বাঁক নিচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল রাস্তা ছেড়ে। পাম্পের সামনে নয়, পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। ভেতর থেকে ছোকরাটা মুখ বাড়াল, ‘মাল এনেছ? দাদুর গলা শুকিয়ে গেছে। চটপট চলে এস।’ রোগা মতন একটা লোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মদের বোতল হাতে নিয়ে। তারপর ঢুকে গেল ভেতরে। হ্যাজাকের যেটুকু আলো নাশ্বার প্লেটে পড়েছিল তাতেই সুদীপ চিনতে পারল। এই গাড়িটাকেই ওরা গতবারে দেখে গেছে।

॥ ৮ ॥

ব্যাগ থেকে গ্লাভস বের করে পরে নিল সুদীপ।

এখন হঠাৎই যেন সব শব্দ মরে গেছে আচমকা। ঘন অন্ধকারে শুধু পাম্পের কাচের ঘরের আলো টিমটিম করছে। দ্বিতীয় গ্লাভসটা কল্যাণকে দিয়ে সে আর একটু সময় অপেক্ষা করল। না, ভেতর থেকে কোন মানুষ চটপট বেরিয়ে আসবে বলে মনে হয় না। যে লোকটা গাড়ি চালিয়ে এল সে নেহাতই মাস মাইনের ড্রাইভার। মালিক থাকে ডায়মণ্ডহারবারে। ভাল ব্যবসা তার। অতএব কোন নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। ওরা সেদিনই দেখে গিয়েছিল গাড়ির কাচ ওদের সুবিধে দেবে। বাইরে থেকে ভেতরটা

বোঝা যায় না। অবশ্য এই গাড়িটাকেই যে পাবে এমন নাও হতে পারত। কিন্তু সম্ভাবনাটা কাজে লেগে যাচ্ছে। সে কল্যাণকে বলল, ‘আমি গিয়ে পিটয়ারিং-এ বসছি। তুই ঘুরে গিয়ে পাম্পের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ছুটে আসবি।’

কল্যাণের গলার স্বর অন্যরকম শোনাল, ‘যদি চাবিটা নিয়ে গিয়ে থাকে? মাথিক ক্যাপ দুটো বের করব?’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘না, নিয়ে যাবনি। কারণ ও যখন নামল তখন ভগ্নী দেখলে বুঝতে পারতাম। তাছাড়া বেচপ জায়গায় রেখেছে গাড়িটা, নিশ্চয়ই পরে পার্ক করবে বলে ভেবেছে। যা হোক যদি চাবি না থাকে তখন ক্যাপ বের করলে চলবে। দাঁড়া, একটা গাড়ি আসছে। ওটা চলে যাক।’

কল্যাণ ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখল আর একটা গাড়ি আসছে। ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাল। দুবার বাজাতেই একটু আগে আসা গাড়ির ড্রাইভার দরজায় এসে দাঁড়াল ‘কি খবর?’

নতুন গাড়ির ড্রাইভার সিটে বসেই উত্তর দিল, ‘খুব মাল টানছো দোস্ত আমাকে এখন শালা কলকাতায় ছুটতে হবে। শোন, সাহেব বলেছে কাল ঠিক ছটায় গাড়ি নিয়ে যেতে।’

‘ছটায়? সাহেব কোথায় আছে?’

‘প্যারাডাইসে। কলকাতা থেকে মেহমান এসেছে। জব্বর ফুটি। গাড়ি আজ ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ভোর বেলায় চলে যেও।’ কথা শেষ করে লোকটা গাড়ি ঘুড়িয়ে কলকাতার দিকে চলে গেল।

দরজায় দাঁড়ানো ড্রাইভারটা একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে পেছন ফিরল, ‘দিল শালা ফুটিটা জবাই করে। উনি প্যারাডাইসে মজা মারবেন আর আমাকে এখানে রাত জাগতে হবে।’ বিরক্তে লোকটা ফিরে গেল নিজের গ্লাসের কাছে। ওকে বা কাউকে আর দেখা যাচ্ছিল না। আবার অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে চরাচর। সুদীপ আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল। তারপর কল্যাণকে ইঙ্গিত করে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে। নিঃশব্দে সে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। চাবিটা রয়েছে লটকানো। সে কল্যাণকে ইশারা করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে দরজা খুলল। তারপর নিচু হয়ে সিটে বসে ওপাশের দরজাটা খুলে দিল।

কল্যাণের বুকের মধ্যে এখন হাতুড়ির শব্দ। দুটো পা প্রায় নিঃসাড়। সে চোখের কোণে সুদীপের দিকে তাকাল। গাড়ির আদল ছাড়া কিছুই নজরে এল না। আর দেরি করা উচিত হবে না এমন বোধ হওয়া মাত্র সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ছুটে এল দরজার কাছে। ভেতরের মানুষগুলো জমিয়ে

মদ্যপান করছে। দরজার দিকে মুখ করে আছে একজন। সে বিস্মিত হওয়ার আগেই দুটো পাল্লা শব্দ করে বন্ধ করে শেকলে হাত দিল। উত্তেজনায় শেকলটা হাত থেকে গলে গেল প্রথমটায়, কাঁপুনি সত্ত্বেও দ্বিতীয়বারে সেটা হস্তগত করে ছকে আটকে দিতে পারল কল্যাণ। আর তখনই চিৎকার উঠল, 'অ্যাঁই, কে রে?' কল্যাণ ততক্ষণে গাড়ির কাছে চলে এসেছে।

ইঞ্জিন চালু করে সুদীপ চিৎকার করল, 'উঠে আয়।'

কোনরকমে সামনের আসনে বসে দরজা বন্ধ করতেই কল্যাণ টের পেল ওর শরীরে কোন সাড়া নেই। ওপাশের দরজায় যে ঘন ঘন শব্দ হচ্ছে, ঘরের ভেতরের চিৎকার কাঁচের দেওয়াল ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসছে, সুদীপ গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে বড় রাস্তায় চলে এসেছে—এসবই ঘটে গেল অথচ টের পেল না যেন সে। ঘাম জড়ানো শরীরে শীতল অনুভূতি। একটা ছাড়া গরুকে কাটাতে সুদীপ গালাগাল করতে কল্যাণ চেতনায় ফিরল। পকেট থেকে রুমাল বের করে সুদীপের দিকে আধা অন্ধকারে তাকিয়ে বেশ লজ্জিত হল। সে কি সত্যিই এতটা নার্ভাস। কই, সুদীপকে দেখে তো মনে হচ্ছে না কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। কল্যাণ মুখ ফিরিয়ে দেখল। পেট্রল পাম্প অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। কোন মানুষের সাড়া নেই পেছনে। দুপাশে কিছু চা সিগারেটের দোকান এল। সেখানেও কোন সন্দেহ নেই। যখন সে দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন লোকটার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। দরজা বন্ধ করা মাত্র চিৎকারটা উঠেছিল। সে দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে, লোকটা কি তাকে স্পষ্ট দেখেছিল? পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে ছব্ব বর্ণনা দিতে পারবে? নিজের মনেই প্রশ্নগুলো নিয়ে উত্তাল হচ্ছিল কল্যাণ। সে বুঝতে পারছিল ওই আলোর চকিতে দেখা কোন মুখ কেউ মনে রাখতে পারে না। কিন্তু যদি লোকটার স্মৃতি অসাধারণ হয়! অস্বস্তির কাঁটাটা কিছুতেই দূর হচ্ছিল না। এই সময় সে শিস শুনতে পেল। কোন চেনা গান নয়, অথচ বেশ খুশীর শিস দিচ্ছে সুদীপ গাড়ি চালাতে চালাতে। হেডলাইটের আলোয় সামনের পথ আলোকিত। পাম্প থেকে বেরিয়ে আসার পর ও একটাও কথা বলেনি। নিজেকে শক্ত করতে চাইছিল কল্যাণ। সুদীপ যদি নার্ভাস না হয় তবে সে কেন হবে? নড়েচড়ে বসল কল্যাণ। এই সময় সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'মাগলুলো আলাদা করে রাখা আছে? আর একবার চেক করলে।' 'সব ঠিক আছে।' যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলতে চেষ্টা করল কল্যাণ। তারপর আবার পিছন দিকে তাকা। অন্ধকারে কোন আলো চোখে পড়ছে না।

সুদীপ হাসল, 'ও নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। ওরা যখন ঘর থেকে ছাড়া পাবে তখন আমরা নাগালের বাইরে। মনে হচ্ছে প্রথম কাজটায় কোন বাধা পাব না। মনিং শোজ দ্য ডে।' কল্যাণ কোন জবাব দিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল সুদীপ বড় বেশী

স্মার্ট, এইটেই যেন শেষ পর্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানে এসে বাঁ দিকে চেপে গাড়িটা দাঁড় করাল সুদীপ। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে বনেটটা খুলল। এখন যে কোন গাড়ি এই পথে গেলে ভাববে নির্ঘাঁৎ ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে। আর তখনই আনন্দের গলা শুনতে পেল সে, ‘সব ঠিক আছে?’

‘হ্যাঁ।’ কল্যাণ জবাব দিল।

‘তুই পেছনের সিটে চলে আয়।’

কল্যাণের দরজা খোলার শব্দ হল। কলকাতার দিক থেকে একটা ট্রাক আসছে। সুদীপ আরও ঝুঁকে পড়ল ইঞ্জিনের ওপর। না, কোনভাবেই মুখ দেখানো কাম্য নয়। আজকাল পথেঘাটে গাড়ি খারাপ হয়ে আছে দেখলে সাধারণ কোন ড্রাইভার দাঁড়াতে চায় না। ট্রাকটা বেরিয়ে যেতে স্বস্তি হল। বনেট নামিয়ে ড্রাইভারের সিটে ফিরে এল সুদীপ। পেছনের সিট থেকে আনন্দ বলল, ‘তোদের ব্যাগে সব জিনিস আছে। আর দেরি করিস না, ভেতরে তোকার পর তোরা মন্টা চারেক সময় পাবি। তোরা লিগ্যাল পেয়ার নস, এটা মনে রাখবি। তোরা ঘড়িতে কটা বাজে সুদীপ?’

ইঞ্জিন চালু করে সুদীপ বলল, ‘দশটা পাঁচ। লেটস গো।’ তারপর সে জঙ্গিতার দিকে তাকাল। যেটুকু আলো ছিকে আসছে তাতে জঙ্গিতার মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বেশ রহস্যময়ী মনে হচ্ছে তাকে। জঙ্গিতা বসেছে তার বাঁ দিকে। সে ঠাট্টার গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘কিরে, সেন্ট মাথিসসনি? তুই একটা হোপলেস। সেন্ট ফেন্ট না মাথলে প্রেম প্রেম ভাব আসে?’

জঙ্গিতা মাথা ঝাঁকাল, ‘একটা সিগারেট দে তো।’

পেছন থেকে আনন্দ বলল, ‘না সিগারেট খাবি না। ওটা দারোয়ানগুলো মনে রাখবে। আর তোরা নিজেদের তুই তুই করে অ্যাড্রেস করবি না। এসব কাজে যারা আসে তারা তুই তোকারি করে না।’

‘তুই তোকারি প্রেমে অচল, বুঝলি জঙ্গী, আমার কপালে কি মাল জুটলো বল। সহানুভূতি জানা ভাই। তোকেও মেয়ে আই মিন প্রেমিকা ভাবতে হচ্ছে!’ জিভে শব্দ তুলল সুদীপ গাড়ি চালাতে চালাতে।

মাথা ঝাঁকাল জঙ্গিতা, ‘সেম টু ইউ।’

আনন্দ বলল, ‘অনেক হয়েছে, এবার রসিকতা বন্ধ কর। প্যারাডাইস দেখা যাচ্ছে।’

‘ডোনট গেট এক্সাইটেড ম্যান। আমি ঠিক আছি। জঙ্গিতা মাই হনি, তুমি ঠিক আছো?’

‘একটা ঘুঁষি মারব সুদীপ, ন্যাকামি করিস না।’

সুদীপ গাড়ির গতি কমাল। সমস্ত চরাচর অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু স্বপ্নের জাহাজের মত প্যারাডাইস আলোয় ভাসছে। ধীরে ধীরে ও বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি নিয়ে গিয়ে হর্ন বাজাল দুবার। একটু বাদেই সেই দারোয়ানদের

একজন সামান্য ফাঁক করল গেটের একটা কপাট, 'আট বাজে বন্ধ হো যাতা হ্যায় সাব।'

সুদীপ জানলায় মুখ এনে বলল, 'টেলিফোনসে বাত ছয়া থা হামারা।'

চাপা গলায় জয়িতা বলল, 'জিত দিয়ে চটকায় আহা রে কি হিন্দী!'

লোকটা এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কেতনা আদমি হ্যায়?'

'দ্বিগুণ দো জন।'

'ক্বাহাসে আ রহা হ্যায়?'

'কলকাতা।'

এবার লোকটা দরজা খুলল। সুদীপ গাড়িটা চোকাতেই লোকটা চাপা গলায় বলল, 'লোটেনেকা টাইমমে মুঝে ইয়াদ রাখিয়ে সাব।' সুদীপ হাসল। তারপর দেখল সাদা নুড়ি বিছানো পথ চলে গেছে ভেতরে। ডানদিকে বেশ কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। দরজায় আগল তুলে লোকটা বলল, 'সাব ডাইনামে গাড়ি রাখিয়ে।'

আর একটু এগিয়ে সুদীপ গাড়িটা একটু মুখ বঁকিয়ে পার্ক করল। যেন প্রয়োজনেই ইঞ্জিন চালু করে ছুটে যেতে পারে সদর গেটের দিকে। সে জয়িতাকে ইশারা করল। তারপর দুটো ব্যাগ দুজনে নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। সুদীপ যখন দরজায় চাবি দিচ্ছিল তখন জয়িতা চারপাশে তাকাল। এপাশে সুন্দর লন আর কিছু ফুলের গাছ। ঝকঝকে আলো চারপাশে। এবার আরও তিনজন যুনিফর্ম পরা দারোয়ানকে দেখতে পেল সে। অর্থাৎ মোট চারজন এই জায়গার পাহারায় আছে। হঠাৎ কোমরে হাতের স্পর্শ পেল জয়িতা। সে ছিটকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সুদীপ বলল, 'নো। কিছু মনে করিস না, ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে তো। এইসব জায়গায় যারা ফুটি করতে আসে তারা এইভাবেই হাঁটে।' সুদীপের কাঁধের কাছে প্রায় তার কাঁধ।

জয়িতা বলল, 'আলগা করে রাখ, আমার সুড়সুড়ি লাগছে।'

কয়েক পা হাঁটতেই একটা দারোয়ান তাদের দেখে দাঁত বের করে হাসল। ওরা কি খান্দায় এসেছে সেটা বুঝে যেন সে গলিত হচ্ছে। হাত বাড়িয়ে একটা দিক দেখিয়ে লোকটা উচ্চারণ করল, 'অফিস উধার।'

মগ্ন ভঙ্গীতে নুড়ির ওপর পা ফেলে খানিকটা এগোতেই সুদীপ একটা ছোট ঝাড়ি দেখতে পেল। গাছপালার মধ্যে আলো জ্বলে কাউন্টার সমেত অফিস খুল করা হয়েছে। কমপ্লিট স্যুট পরা একটা লোক উটপেন হাতে নিয়ে কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়েছিল। কাউন্টারে ছোট্ট বোর্ডে লেখা 'রিসেপশন'। লোকটি ওদের দেখে উষ্ণ হাসি হাসল, 'গুড ইভনিং স্যার। ওয়েলকাম টু প্যান্ডাভাইস। বাট আই অ্যাম অ্যাক্সেড ইউ আর লিটল বিট লেট।'

'বেটার লেট দ্যান নেভার। আই মেড এ কল।' জয়িতার কোমর থেকে হাত সরিয়ে সুদীপ পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে এগিয়ে

ধরে ইঙ্গিত করল।

লোকটা মাথা নাড়ল, 'নো, থ্যাঙ্কস। হোল্লাটস ইওর শুড নেম প্লিজ?'
'এম রয়।' সুদীপ সতর্ক ভঙ্গীতে গ্লাভসটার দিকে তাকাইল। এটা থাক হাতে, অনেকেই তো পরে। লোকটা একটা প্যাড টেনে নিয়ে নজর বোলাচ্ছিল। জয়িতা তখন কতকগুলো নোটিশের দিকে তাকাচ্ছিল। এই করে যতটা সম্ভব লোকটার চোখ এড়ানো যায়। নোটিশ বোর্ডে নিয়মকানুন লেখা রয়েছে। দিবা-ভ্রমণের জন্যে ভ্রমণার্থীদের পঁচিশ টাকা দিতে হবে। তারা সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উদ্যানে থাকতে পারবেন, আধুনিক কুঁড়েঘর ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু সাঁতার কাটা নিষিদ্ধ। কাউকে বিরক্ত করা চলবে না মদ্যপান অবৈধ। রেস্টোরাঁ থেকেই খাবার কিনতে হবে। উদ্যানে রাত্রিবাসের জন্যে এ সি এবং নন এ সি কটেজে সব রকম আধুনিক ব্যবস্থা আছে। প্রতি রাত্রির জন্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কটেজের ভাড়া আড়াইশো থেকে চারশো টাকা। একমাত্র এই শ্রেণীর অতিথিরাই সাঁতারের পুল ব্যবহার করতে পারবেন। সাধারণত উদ্যানে মদ খাওয়া অবৈধ হলেও কটেজের ঘরে বাইরের মানুষকে বিরক্ত না করে সেটা খাওয়া আপত্তি নেই। তবে যে কোন মুহূর্তেই উদ্যান কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা থাকবে কাউকে বহিষ্কার করার।

জয়িতা আরও হুমকি দেওয়া উপদেশাবলী পড়ল। এই সময় সুদীপ খাতায় সেই করছিল। এম রয় লেখার সময় তার নিজেরই হাসি পেল। তিনশো টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে লোকটি বলল, 'আপনাদের রাত শুভ হোক।'
'ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমরা কি একটু বাগানটা ঘুরে দেখতে পারি। খুব গন্ধ শুনেছি এই বাগানের। কাল ভোরেই চলে যাব তাই আর সুযোগ হবে না হয় তো।' সুদীপ হাসল।

'দুঃখিত স্যার। রাত্রে, আটটার পর কারো বাগানে থাকা নিষেধ।'
সুদীপ একটা কুড়ি টাকার নোট কাউন্টারে রাখল, 'দেখুন না চেপ্টা করে।' চকিতে নোটটা সরিয়ে নিজে চারপাশে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'আধ ঘন্টার বেশী থাকবেন না। বস আসবেন এগারটার পরে। তার মধ্যে কটেজে ফিরে যাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

লোকটা বেল বাজাতেই অন্ধকার ফুঁড়ে স্বাস্থ্যবান একটা বেয়ারার উদয় হল। রিসেপশনিস্ট তার দিকে একটা চাবি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কটেজ নাম্বার টুয়েলভ। সাহেবরা কিছুক্ষণ বাগানে থাকবেন, হাবিবকে বলে দিও।'
সুদীপ খুব সহজ ভঙ্গীতে জয়িতার পাশে এসে দাঁড়াল, 'হনি, লেটস গো।' বলে একহাতের বেড়ে জয়িতাকে টেনে কাছে এনে বেয়ারাকে অনুসরণ করল।

জয়িতা ফিসফিস করে বলল, 'ইটস টু মাচ সুদীপ।'

সুদীপ সেই গলায় জানাল, 'এইটেই স্বাভাবিক পাচু।'

এই আলোকিত বাড়িটাই প্রবেশপথ। কারণ দুদিকে চারটে ঘরের মাঝখানে প্যাসেজ, সেটা গিয়ে পড়েছে বাগানে। ওপাশে কোথাও জেনারেটর চলছে। তার আওয়াজ চেপে রাখার চেষ্টা সজ্জেও সক্রিয়। সুদীপ এবং জয়িতা বাগানটার দিকে তাকাল। মাঝে মাঝে ছোট লন, সাজানো ফুলের গাছের মধ্যে দিয়ে বাঁধানো পথ চলে গেছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে রাখা আলো অন্ধকারকে পাতলা করে জোৎস্নার আভাস এনে দিয়েছে। এখন বাগানে কেউ নেই। বেয়ারাটা ফুলের গন্ধে ডুবিয়ে তাদের নিয়ে এল পেছন দিকে। পর পর কটেজগুলো রহস্যময় আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপ বেয়ারাটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এইগুলো ?'

'না স্যার। এ সি কটেজ ওপাশে।'

নন-এসি কটেজের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় নারী-পুরুষের সম্মিলিত হাসির শব্দ কানে এল। স্টিরিওতে বাজনা বাজছে আর তার সঙ্গে নেশায় জড়ানো ছল্লোড়। সুদীপ বেয়ারাটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল, 'আজকে তোমাদের গেস্ট কি রকম ?'

বেয়ারা মাথা নাড়ল, 'আর দুটো কটেজ খালি আছে। হেভি ডিমান্ড। নিশ্চিতে ফ্রুটি করার ব্যবস্থা আর কোথায় পাবেন ?'

'ঠিক। তুমি এখানে অনেকদিন আছ ?'

'না স্যার। আগে সাকুলার রোডের একটা হোটেলে কাজ করতাম।' একটা রঙিন কটেজের সামনে এসে দরজায় চাবি ঢোকাল বেয়ারাটা। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বলে এ সি চালু করল। জয়িতা মুগ্ধ হয়ে গেল। এই অজ পাড়াগাঁয়ে এমন আধুনিক ব্যবস্থা সম্ভব ? বেয়ারা বলল, 'আপনারা যদি রাত্রে খাবার চান বলে দিন।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না আমরা খেয়ে এসেছি।'

বেয়ারা জিজ্ঞাসা করল, 'ড্রিন্ks ? আপনাদের নিয়ম হল ঘরে বসে ড্রিন্ks করা চলবে কিন্তু সেটা এখান থেকেই নিতে হবে। কি আনব স্যার ?'

সুদীপ জয়িতার দিকে তাকাল। জয়িতা সোফায় বসে পড়েছে। সে বেয়ারাটাকে নিচু গলায় বলল, 'মুশকিল হল মেমসাহেব ড্রিন্ks করেন না। একা একা খেতে আমার খুব খারাপ লাগে।'

বেয়ারা হাসল, 'নো প্রবুম স্যার। আমাদের ককটেল রুমে গিয়ে খেয়ে আসতে পারেন।'

'ককটেল রুম ? সেটা কোথায় ?'

'ঠিক এই কটেজগুলোর পেছনে। ওখানে যাওয়ার সময় চাবিটা নিয়ে যাবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ ! সকালে যাওয়ার আগে তোমার দেখা পাব নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ স্যার। আমাদের তো চক্ৰিশ ঘন্টা ডিউটি। আপনারা কি এই রাত্রে বাগানে যাবেন ?'

‘হ্যাঁ, একটু দেখব।’

‘ঠিক আছে, আমি হাবিবকে বলে দিচ্ছি স্যার। সঙ্গে চাবিটা রাখবেন। ওতে কটেজ নাম্বার আছে।’

‘হাবিব কে?’

‘হেড গার্ড। গুড নাইট স্যার।’ দাঁত বের করে জগ্নিতার দিকে হাসি ছড়িয়ে লোকটা চলে গেল।

এখন চারধার নিঃশব্দ নয়। নারী-পুরুষের হুল্লোড় ধ্বনি ছিটকে ছিটকে আসছে। সুদীপ চটপটে গলায় বলল, ‘জয়ী, উঠে পড়।’

জগ্নিতা উঠে দাঁড়ান, ‘শাড়িতে আমাকে খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, না?’

‘উঁহ। ডিলিসিয়াস।’

‘ভদ্রভাবে কথা বল সুদীপ। আই উইল নট টলারেট দিস।’

‘জাস্ট এ মিনিট, আমি লু থেকে আসছি।’ সুদীপ পাশের দরজা খুলে টয়লেটে চলে গেল। জগ্নিতার মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল। সুদীপটার কথাবার্তা একটু লাগামছাড়াই। মনে কোন পাপ নেই। কিন্তু এভাবে কখনও একটা ঘরে রান্না ওর সঙ্গে থাকেনি। শাড়িটার জন্য অস্বাচ্ছন্দ বোধ শুরু হল জগ্নিতার। ভীষণ রকম মেয়ে মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। শরীরের গঠন অনুযায়ী সে মেয়ে নিশ্চয়ই কিন্তু মেয়েলিপনা তাকে কখনই কব্জা করেনি। নিজের শরীর সম্পর্কেও সে সচেতন ছিল না। তিন বন্ধুর চোখে কোনদিন সেরকম ছায়া দ্যাখেনি সে। বরং ওরা স্বাচ্ছন্দে কলেজের লবঙ্গলতিকাদের সম্পর্কে রসালো আলোচনা করেছে তার সামনে। ন্যাকা মেয়েগুলোর সমালোচনার সময়ে জগ্নিতাও গলা মিলিয়েছে ওদের সঙ্গে। নিজেকে আলাদা করে ভাবার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু আনন্দের মায়ের সঙ্গে সময় কাটানোর পর থেকেই একটা অস্বস্তি এঁটোর মত লেগে আছে মনে। সুদীপ যখন গাড়িতে তুলে নিয়ে রসিকতা আরম্ভ করল তখন থেকেই সেটা বেড়ে যাচ্ছে। প্রেম ফ্লেম সে জীবনে করেনি। করার কথা মাথায় আসেনি। আনন্দ আজকের প্রোগ্রাম জানানোর পর তার হাসি পেয়েছিল। আউট অফ অল পার্সেন সুদীপের সঙ্গে তাকে প্রেমের অভিনয় করতে হবে। মজাও লেগেছিল। কিন্তু এখানে আসার পর সুদীপ এমন ভাব করছে যে, সে যেন একটি রক্তমাংসের খাদ্যবস্তু।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে সুদীপ টেবিল থেকে চাবি নিল, ‘ফাইভ স্টার হোটেলের সঙ্গে পাল্লা দেবে বুঝলি। বাথরুমে দি সোপ অফ বিউটিফুল ওমেন রয়েছে।’

‘মানে?’ জগ্নিতার চোয়াল শক্ত হল।

‘ক্যামে হোয়াইট। ক্যানাডায় তৈরি। ভাব ব্যাপারটা। তোর কি হল?’

‘কিছু না।’

‘চল, ওদের বস আসবার আগেই পাক দিয়ে আসি।’

জয়িতা সুদীপের দিকে তাকাল। খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে ওকে। সে কি ভুল বুঝছে? জয়িতা উঠল। দরজায় চাবি দিতে গিয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, “ব্যগগুলো এখানে রেখে যাওয়া কি সেফ হবে। ডুল্লিকেট কি থাকতে পারে।”

জয়িতা বলল, “ব্যগ নিয়ে বাগানে ঘুরলে তো ওরা সন্দেহ করবে।” বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরা চারপাশে তাকাল। সন্দেহজনক কিছুই নজরে পড়ছে না। সুদীপ বলল, “চল, আমার হাত ধর।”

জয়িতা চোখের তলায় তাকাল, “হাত ধরতে হবে কেন?”

“প্রেম প্রেম ভাব আনতে হবে না? সবাই আমাকে কেমন স্যার স্যার বলছে দেখেছিস। আমার বয়সটা যেন কোন ফ্যান্টারি নয়। সেক্স নিয়ে যারা ব্যবসা করে তারাও কেমন অন্ধ হয়ে থাকতে পছন্দ করে।”

সুদীপ কথা শেষ করা মাত্রই ওপাশের কটেজের দরজা খুলে গেল। একটি মেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল বারান্দায়, “না, আমাকে যেতে দিন, এরকম কথা ছিল না আমি এখানে কিছুতেই থাকব না।”

সেইসময় দরজায় একটি প্রৌঢ় এসে দাঁড়াল, “ওসব বুজরুকি ছাড়। টাকা দিয়েছি যখন তখন যা বলব তাই করতে হবে। ভেতরে এসো বলছি, নইলে হাবিবকে ডাকব।”

“আপনার পায়ে পড়ি। তিনজন থাকবেন তো ওরা বলেনি আমাকে।”

“আমি তো একজনের টাকা দিচ্ছি না। এসো, মিলি মিসি করি কাজ, নাকি হাবিবকে ডাকব?” মেয়েটি মাথা ঝাঁকাল। তারপর পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করল।

সুদীপের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ওর দৃষ্টি বন্ধ দরজার ওপর। জয়িতা নিচু গলায় বলল, “বি ইজি। ছোট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়িস না। চলে আয়।”

সুদীপ নিঃশ্বাস ফেলল শব্দ করে, “ইচ্ছে করছে মুন্ডুগুলো ছিঁড়ে ফেলি। টাকা দিয়ে মেয়েটাকে কিনে নিয়েছে। আশেপাশের গ্রামের কোন গরীব মেনে হয়তো।”

সুদীপের হাত ধরে জয়িতা বাগানে চলে এল, “সব কটেজে নিশ্চয়ই একই নাটক হচ্ছে, না?”

বাগানটা বেশ বড়। অন্তত এই মুহূর্তে ওরা শেষ দেখতে পাচ্ছে না। একদিকে যেমন সাজানো লন, যত্নে গড়া ফুলের বিছানা তেমনি অন্যদিকে ঘনজঙ্গলের আদল তৈরীর চেষ্টা হয়েছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে ডে-হাট। চারটে খুঁটির ওপর খড়ের ছাউনি, নিচে ত্রিপল পাতা, ইলেকট্রিক লাইন আছে। এখন এইগুলো ফাঁকা। বুনো গন্ধ বের হচ্ছে সব গাছদের শরীর থেকে। সুদীপ জরিপ করে নিল। পুরো এলাকাটা তিনটে ভাগে বিভক্ত। রিসেপশন এবং গাড়ির পার্কিং সামনের দিকে। মাঝখানে বাগান, জঙ্গল, জেনারেটর রুম এবং নন-এসি কটেজ। তৃতীয় ভাগে এসি কটেজ, সাঁতারের পুল এবং

ককটেল রুম, যার কথা বেয়ারাটা বলল। এসি কটেজ থেকে দৌড়ে রিসেপশনের কাছে পৌঁছাতে তার মিনিট দুয়েক লাগবে কিন্তু জয়িতার দেরি হবে। ও নিচু গলায় বলল, ‘আমার কোমরে হাত রাখ। জেনারেটরটা দেখে আসি।’ জয়িতা এবার আপত্তি করল না। ওরা ঘেন বেড়াতে বেরিয়েছে এমন ভঙ্গিতে বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝে জঙ্গলের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা ইলেকট্রিক বালুর আলো তাদের গায়ে পড়ছিল বটে কিন্তু তারা কোন পাহারাদার দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সুদীপ খড়ের ছাউনির তলায় ত্রিপলের নিচে গিয়ে বলল, ‘মিনিট দশেক এখানে শুয়ে থাক। কেউ আমাদের লক্ষ্য করেছে কিনা বোঝা যাবে। তুই বস, তোর কোলে মাথা রেখে শুচ্ছি।’

‘কোন দরকার আছে? কাউকেও কাছাকাছি দেখছি না।’ জয়িতা মৃদু আপত্তি জানাল।

‘হাতে সময় আছে যখন, তখন একটু রিল্যাক্স করা যাক।’

জয়িতা হাঁটু মুড়ে বসল। সুদীপ পা ছড়িয়ে দিয়ে তার কোলে মাথা রেখে বলল, ‘একটু গন্ধ-ফন্ধ মেখে এলে পারতিস।’

‘তোর তাতে কি। তোকে যা করতে বলা হয়েছে তাই কর।’

‘করছি তো। এই সময় প্রেমিক প্রেমিকারা ঠিক কি কি করে বলতো? মানে তাদের কি কি বিজনেশ থাকে? হাতটাত নিশচয়ই ধরে। গানও গায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে। তুই একটা গান টান গা জয়ী। ঘুম ঘুম মার্কা গান।’ সুদীপ চোখ বন্ধ করল।

‘ট্র্যাস! কতক্ষণ শুয়ে থাকবি? তোর কোমরের ওপরে শক্ত মতন জিনিসটা একটু সরাতো, আমার পায়ে লাগছে।’ জয়িতা কথাটা বলে নিজেই সরিয়ে দেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে আবার সরিয়ে নিল। রিভলভারটা সরাতে চাইলেও সরানো যাবে না এখন। সে চোখ বন্ধ করল। তারপর মনটাকে শান্ত করার জন্যেই গুনগুন করল, ‘ওয়ান্না বি স্টাটিং সামথিং।’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘চমৎকার। বাংলা গান ট্র্যাস আর মাইকেল জ্যাকসন—’

‘নট দ্যাট।’ ওকে খামিয়ে দিল জয়িতা, ‘ইট ডিপেণ্ডস অন মুড।’

‘আপনারা কে।’

ঠিক এইসময় অন্ধকার ফুঁড়ে একটি বিশাল শরীর সামনে এসে দাঁড়াল। সুদীপ কোন জবাব দিল না। জয়িতা বলল, ‘আমরা এখানে স্নাত কাটাতে এসেছি।’

‘ভাল করেছেন। কিন্তু এতরাত্রে বাগানে থাকা নিষেধ। উঠুন।’

‘কেন? আমরা তো কারো ক্ষতি করছি না। জাস্ট বসে আছি এখানে।’

‘বসা শোওয়া সব নিজের কটেজে গিয়ে করবেন।’ নিলিখ ভঙ্গীতে বলল লোকটা।

এবার সুদীপ উঠে বসল। তারপর পকেট থেকে চাবিটা বের করে এগিয়ে

ধরল, 'আমাদের আধঘন্টার জন্যে বাগানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন
রিসেপসনিস্ট।'

চাবিটা হাতে নিয়ে সেই আধ অন্ধকারে উল্টে-পাল্টে দেখল লোকটা। সুদীপ
বলল, 'আমরা আধঘন্টার মধ্যেই চলে যাব হাবিবাবু।'

লোকটা হাঁ করে তাকাল। তারপর চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে
গেল। বাবু হয়ে বসল সুদীপ 'কি বলেছিলাম একটু আগে? দিস প্লিস ইজ
'ওয়েথ প্রটেক্টেড। কিন্তু আজ রাত্রে তিক কতগুলো পাহারাদার আছে তা বোঝা
যাচ্ছে না।'

জয়িতা বলল, 'হাবিবাবু তো ছাড়পত্র দিয়েছেন। চল একটু ঘুরে দেখি।'
সুদীপ জয়িতার হাত ধরে উঠল। ওরা যেকোনো হাবিব চলে গিয়েছিল সেই-
দিকে পা বাড়াল। না, ধারে কাছে কেউ নেই। এবং তখনই কুকুরের ডাক
এবং শিস শুনতে পেল ওরা। জয়িতা সুদীপের হাতে চাপ দিতেই সে মুখ
ফিরিয়ে দেখল দূরের একটা প্যাসেজ দিয়ে কেউ হাঁটছে। তার হাতের চেনে
চারটে কুকুর বাঁধা। ওরা লোকটাকে যেন টেনে নিয়ে চলেছে। সুদীপ বলল,
'যাক নেহাতই অ্যাগসেসিয়ান। তাহলে এখানে কুকুরও আছে। লেটস গো।'
ওরা হাঁটতে হাঁটতে জেনারেটরের শব্দ ধরে এগিয়ে গেল কাছাকাছি। এখানে
গাছের আড়াল বেশী। জেনারেটর রাখা হয়েছে একান্তে একটি ঘরে। তার
দরজা খোলা, আলো জ্বলছে ভেতরে। দরজায় টুল পেতে একটি পাহারাদার
বসে আছে চুপচাপ। ধারে কাছে আর কেউ নেই! সুদীপ লক্ষ্য করল
ঘরটির পেছনে একটা জানলা আছে। জানলাটাও খোলা।

ওরা আবার লনে ফিরে এল। সুদীপ বোতাম টিপে ঘড়ির আলো জ্বলে সময়
দেখল। তারপর বলল, 'প্রচুর সময় আছে। চল ঘরে যাই।'

ফেরার পথে ওরা দুজন পাহারাদারদের দেখা পেল। গাছের গায়ে তেঁস দিয়ে
তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি মানুষ সুনির্বাচিত। ওদের দেখে
নিবিড়ভাবে হেঁটে এল নন-এসি কটেজগুলোর সামনে দিয়ে। এবার সেখানেও
একজনকে নজরে পড়ল। যাওয়ার সময় লোকটিকে দেখতে পায়নি। এখনও
ঘরে ঘরে বাজনা বাজছে। হুল্লোড় চলছে। নিজের কটেজে ঢুকে জয়িতা
বিছানায় এলিয়ে বলল, 'এবার শাড়ি চেঞ্জ করি?'

'আর একটু বাদে।' সুদীপ সোফায় বসে সিগারেট ধরালো।

জয়িতা হাত বাড়াল, 'আমাকে একটা দে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'বাঙালি মেয়ের সিগারেট খেতে নেই।'

জয়িতা চোঁচালো, 'সুদীপ!'

সুদীপ প্যাকেটটা ছুঁড়লো, 'নিজের পায়ের দাঁড়াতে শেখ তো। অন্যের প্যাকেট
দেখলেই সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে, না? শোন, হাবিবকে নিয়ে আমরা
বাগানে পাঁচজনকে দেখতে পেলাম। দিজ গাইজ আর রিয়েল টাফ। কিন্তু
এদের সঙ্গে আর্মস আছে কিনা সেটা বোঝা গেল না। আমাদের প্ল্যানটা

মনে আছে তো ?

সিগারেট ধরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে জয়িতা বলল, 'আছে।'

'মনে হচ্ছে কোন অসুবিধে হবে না। তুই তো বেশ মেজাজে শুয়ে আছিস। আনন্দ আর কল্যাণের কথা ভাব ? পেছনের সিটের নিচে কিভাবে বসে আছে ওরা।'

'এসবই খেলার অঙ্গ ব্রাদার।' নিবিচার মুখে ধোঁওয়া ছাড়ল জয়িতা।

'তোকে মাঝে মাঝে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়।'

'তাই ?'

'ভগবান তোকে মেয়েলি কোন গুণ দেয়নি।'

'দিলে কি তোর সঙ্গে প্রেম করতাম ?'

সুদীপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকাতাই স্পিকারটা দেখতে পেল। তার নিচেই সুইচ। সে উঠে ওটা অন করতেই বাজনা শুরু হল। দারুণ গরম বাজনা। সুদীপ জিতে শব্দ করল, 'বাঃ কি ভাল ব্যবস্থা। আমার খুব নাচতে ইচ্ছে করছে। ওয়ার্ম আপ করাই ?'

'পারিস তুই। এখন নাচের কথা ভাবছিস ?' জয়িতা উঠে দাঁড়াল। তারপর ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করে আলাদা করল। দুজনের কাছে দুটো ভাগ থাকবে। সীতা রায় যখন টের পাবে তাদের কিছু হারিয়েছে তখন বেশ দেরি হয়ে যাবে। পাঁচভরি সোনার হার চুরি করার সময় অবশ্য একটা অপরাধবোধ কাজ করেছিল জয়িতার মনে। কিন্তু এখন সেটা মরে গেছে অজান্তেই।

নিজের জিনিসগুলো কাছে রেখে সে সুদীপকে বলল, 'এখন কি করবি ?'

সুদীপ বলল, 'একবার ককটেল রুমে যাব। মনে হচ্ছে জায়গাটা ইন্টারেস্টিং হবে। তিক দেড় ঘন্টা পরে আমরা কাজ শুরু করব। তুই ততক্ষণ রেস্ট নে। এখান থেকে বেরিয়ে একটু পরে জেনারেটোরের কাছে পৌঁছাবি। যদি লোকটাকে অ্যাভয়েড না করতে পারিস তাহলে জানলাটাকে ব্যবহার করবি। তারপর দৌড়ে যাবি রিসেপশনের দিকে। অন্ধকার হয়ে গেলেই আমি যা করার করব। ওড লাক। আমি এগোচ্ছি।'

জয়িতা ডাকল, 'সুদীপ ?'

সুদীপ ঘুরে দাঁড়াল, 'কি ?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'না, থাক।'

'কি বলবি বল না ?'

'আমি তোর সঙ্গে যাব। একা থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

সুদীপ কিছু চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, 'ভয় পাচ্ছিস ?'

'না ভয় নয়। জাস্ট একা থাকতে চাইছি না। জানি না কি হবে আজকে কিন্তু কিছুক্ষণ তো একসঙ্গে থাকি।' জয়িতা স্পষ্ট চোখে তাকাল।

'ও কে! চল।'

ওরা দুজন প্রস্তুত হয়েই ঘর থেকে বের হল। এবার উল্টোদিকে যাত্রা। সেখান থেকে উল্লাস ছিটকে আসছে বাতাসে। ওরা একটি আলোকিত দরজা দেখতে পেল। কাছাকাছি যেতেই একটি সুবেশ মানুষ এগিয়ে এসে হাত বাড়াল। সুদীপ তাকে কটেজের চাবিটা দেখাতেই লোকটি ঝুঁকে হেসে বলল, ‘ওড ইন্সিং স্যার। ইউ আর ওয়েলকাম ইন দিজ প্যারাডাইস।’ ককটেল রুমের দরজা খুলে ঢুকল ওরা।

॥ ৯ ॥

চাপা গলায় কল্যাণ বলল, ‘আর পারছি না, একটু উঠে বসব?’ আনন্দ নাক দিয়ে যে শব্দটা করল তার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হল না। প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে গেছে ওরা দুজনে গাড়ির পেছনের সিটের পা রাখার জায়গায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে। সামান্য নড়াচড়া করতে পারছে না। এখন খুব মৃদু আওয়াজও জেরে শোনাবে। বসে থাকতে থাকতে দুই পা অসাড় হয়ে গেছে। কোমরে ব্যথা হচ্ছে। কল্যাণ সুদীপের কথা ভাবল। বেশ আরামে শুয়ে আছে নিশ্চয়ই জন্মিতার সঙ্গে। জন্মিতার মুখটা মনে পরতেই আবার তার অস্বস্তি হল। জন্মিতা যে মেয়ে এমন ভাবার কখনও কারণ ঘটেনি। ওর শারীরিক গঠনের কথা মনেই আসত না কখনও। নিজের পরিচিত রঙে এমন মেয়ে কখনও দ্যাখেনি। কিন্তু আজ শাড়ি পরার পর থেকেই জন্মিতা যেন আচমকা পালটে গেল। ওর হাবভাবে একটু জড়তা এসে গেছে। যখন গাড়ির সামনের সিটে বসেছিল সুদীপের পাশে তখন তো একদম অপরিচিতা বলে মনে হচ্ছিল। সুদীপের সঙ্গে সম্ভবত এয়ারকন্ডিশন ঘরে জন্মিতা এখন কি করতে পারে? কুঁজো হয়ে বসে কল্যাণ দৃশ্যটা কিছুতেই কল্পনায় আনতে পারছিল না।

এইভাবে বসে থাকতে আনন্দরও কণ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ভেতরে ঢোকান তে অন্য কোন উপায় ছিল না। সঙ্গে নারী না থাকলে প্রধান ফটক ওরা পেরোতেই দেবে না। এছাড়া গাড়ি অবশ্যই চাই। সুদীপ যে এই গাড়িটা সহজেই আনতে পেরেছে এটা সুলক্ষণ। ওরা এমন ভাবে বসে আছে গাড়ির পাশ দিয়ে কেউ চলে গেলেও বুঝতে পারবে না কেউ আছে। তাছাড়া গাড়িটার কাঁচও ওদের সাহায্য করছে। বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না। ওরা যদি সোজা হয়ে বসত তাহলে সামান্যই ঝুঁকি থাকতো। অবশ্য সামনের কাঁচ দিয়ে যদি কেউ তাকায় তাহলেই বিপদ। কিন্তু না, কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি আনন্দ। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল এইভাবে বেশীক্ষণ থাকাও যায় না। এর পরে যখন সময় আসবে তখন হয়তো অ্যাকশনে নামা দূরের কথা হাঁটাও সম্ভব হবে না। সুদীপ জন্মিতা সামনের দরজায় চাবি দিয়ে নেমে গেছে অনেকক্ষণ। এই সময়ে কোন সন্দেহজনক কিছু আশেপাশে ঘটেনি। আনন্দ ফিসফিসিয়ে বলল, ‘আমি উঠে বসছি, তুই পা ছড়িয়ে শুয়ে পড় এখানে।’

ধীরে ধীরে সিটের ওপর উঠে বসতেই আনন্দ বুঝতে পারল আর দেরি করলে ভুল হয়ে যেত। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোন সাড় নেই। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে কিছুটা সময় নিল। তারপর একটু সুস্থ বোধ করলে সে ধীরে ধীরে জানলার নিচে চোখ রাখল। ভৌতিক ছবির মত দেখাচ্ছে সামনের রাস্তা, গাছপালা এবং লনটাকে। ওপাশে মৃত মোম্বের মত পড়ে আছে গাড়ির সারি। আনন্দ সতর্ক চোখে দেখতে চেষ্টা করছিল। বাইরে আলো খুবই কম। কিন্তু তাতে দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছিল না। পাহারাদারদের খোঁজার চেষ্টা করল আনন্দ। কাউকেই চোখে পড়ছে না। সে নিজের শরীরটাকে গাড়ির দরজার গায়ে এমনভাবে লেপ্টে রেখেছিল যে একমাত্র বনেটের ওপর বসে মুখে টর্চ না ফেললে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এই সময় পায়ের তলায় সমস্ত শরীর যতটা সম্ভব ছড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলে কল্যাণ বলল, ‘আঃ কি আরাম!’ আনন্দ ঘড়ির দিকে তাকাল। এখনও অনেক দেরি আছে। তাড়াহুড়া করে কোন লাভ নেই। শুধু দুটো জিনিস আগে থেকে পরিষ্কার রাখা দরকার। সদর দরজার তালাটা খুলে রাখতে হবে আর পাহারাদারদের কোনরকমে নিশ্চিয় করে কাজ হাসিল করতে হবে। সে যে তথ্য পেয়েছিল তাতে যদি ভুল না থাকে তাহলে অসুবিধে হবার কথা নয়। এখন শুধু সঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে থাক। সুদীপটা ঠিক থাকলেই হল। জয়িতার ওপর গোড়া থেকেই ভাল আস্থা রাখে সে। শুধু এই কল্যাণটা ঠিক সময়ে নাভ না হারালেই হল।

আনন্দ একটা গাড়ির হর্ণ শুনতে পেল। সঙ্গে দপাদপ আলো জ্বলে উঠল লনে, রাস্তায়। তিনচারজন লোক ছুটোছুটি শুরু করে দিল, ওদেরই কেউ গেটের তালা খুলে দিল। আনন্দ চোখ রেখে দুটো তীর আলো দেখতে পেল। গাড়িটা সরাসরি এগিয়ে এসে ওদের সামনে থামতেই সে আরও নিচে নেমে এল। কল্যাণ ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল, ‘কি হল?’

‘বাইরে থেকে কেউ এসেছে। পুলিশ কিনা বুঝতে পারছি না।’

‘পুলিশ? কি করবি?’

‘কিছু না। এখানেই বসে থাকব। আর কথা বলিস না। না পুলিশ না, একটাই বুড়ো মতন লোক নামছে গাড়ি থেকে। দারোয়ানগুলো ওকে খুব সেলাম করছে।’

যে লোকটি গাড়ি থেকে নামলেন তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় তিনি ক্ষমতাবান। গভীর মুখে কিছু বললেন দারোয়ানদের। ব্যাপসা শুনতে পেল আনন্দ। তারপর ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন ভদ্রলোক। আনন্দ এবার চিনতে পারল। প্যারাডাইস-এর মালিককে এই প্রজেক্ট শুরু করার সম্মত কল্লেকবার দেখেছে সে দূর থেকে।

তিনি অদৃশ্য হওয়ামাত্র আলো নিবে গেল, সদরে তালা পড়ল। আনন্দ দেখল একটা দারোয়ান টুল পেতে বসে আছে পাতাবাহার গাছের পাশে। লোকটাকে

এর আগে লক্ষ্য করেনি সে। বাকিরা ফিরে গেল বাঁ দিকে। তার মানে ওরা পালা করে পাহারা দেয়।

সময় হয়ে এলে আনন্দ কল্যাণকে ডাকল, 'শোন, আমি নামছি। তুই গাড়ির লকগুলো খুলে তৈরী থাক। গেট থেকে ফিরে আস। মাত্র তুই আমার সঙ্গে চলে আসবি ওগুলো নিয়ে।'

'ঠিক হয়।' কল্যাণ উঠে বসল। ওর গলার স্বর বেশ শক্ত এখন। কানে লাগল আনন্দের। সে মুখে কিছু না বলে লকটা খুলল। কট্ শব্দটা যেন রাত্নের নিস্তব্ধতায় বড় হয়ে বাজল। তার একটু অপেক্ষা করল আনন্দ। না, কেউ এদিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। ওপাশে ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে ভারি লরির কনভয় যাচ্ছে বোধ হয়। সুযোগটা হারাল না সে। টুক করে দরজা খুলে নিচে নেমে উঁবু হয়ে বসল। তার কাঁধে ঝোলানো সরু স্ট্র্যাপেস ব্যাগে মালগুলো আছে। এবং এই প্রথম শরীরে একটা কাঁপুনি টের পেল আনন্দ।

পার্ক করা গাড়িগুলোর পেছন দিয়ে দ্রুত মাথা নিচু করে দৌড়ে এল সেখানে যেখানে পাতাবাহার গাছগুলো শুরু হয়েছে। লোকটা বসে আছে বাড়িটার দিকে মুখ করে। মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে। আনন্দ স্ট্র্যাপটা বের করল। তারপর শব্দহীন পায়ে পৌঁছে গেল লোকটার পেছনে। গলায় স্ট্র্যাপটা চেপে বসতেই লোকটা কোঁক করে একটা শব্দ তুলল। তারপর এলিয়ে পড়তেই আনন্দ ওর কাঁধ ধরে ফেলল। এত সহজে লোকটা অজ্ঞান হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি সে। অবশ্য মরে গেছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার মাথা গাছের গায়ে এমনভাবে ঠেকিয়ে রাখল সে যাতে দূর থেকে মনে হয় ও বাসে আছে। সদর দরজার চাবি ওর পকেট থেকে বের করতে সময় লাগল না। আনন্দ মুখ ফিরিয়ে দেখল। কোথাও কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।

সদরের তাল খুলে নিঃশব্দে আনন্দ ফিরে এল গাড়ির কাছে। পাল্লা যেমন ছিল তেমনই রেখে দিল সে। যদি কারো নজর যায় কিছুই টের পাবে না। হড়ি দেখল আনন্দ। এখনও পাঁচ মিনিট বাকি আছে। এইসময় কল্যাণ তার পাশে এসে দাঁড়ল, 'সাবাস্!'

আনন্দ কিছু বলল না। কয়েকদিন আগে তার একবার মনে হয়েছিল ব্যাপারটা তাদের পক্ষে বেশ ভারি হয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে তো নেহাতই আনাড়ি, স্ট্রেনিং ছাড়া করতে যাওয়া বোকামি। ধরা পড়লে কোন কাজই হবে না। লোকে জানতেই পারবে না তারা ঠিক কি করতে চেয়েছিল। হয়তো সামান্য ডাকাতির চেহারা দেওয়া হবে ব্যাপারটাকে। তাছাড়া একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। একাধিক এই রকম ঘটনা যদি বারংবার ঘটে যায় তাহলেই সেটা একটা স্পষ্ট চেহারা নেবে কিন্তু প্রতিদিন খুঁটিনাটি আলোচনা করে করে শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছিল এটা পারা সম্ভব। এখন কাজে নেমে মনে হচ্ছে অভিজ্ঞতাটা উপরি লাভ, ইচ্ছা এবং পরিশ্রমই সার্থক হতে সাহায্য করে। এবং এই সময়েই টুপ করে আলো নিবে গেল।

এবং তখনই একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল ভেতর থেকে ।

দড়াম করে গেটের পাল্লা দুটো দুদিকে ছিটকে গেল এবং রাগী সিংহের মত গর্জন করে গাড়িটা দারুণ ঝাঁকুনি সামলে উঠে এল রাস্তায় । আনন্দ চিৎকার করে উঠল, 'সামলে চালা ।' সুদীপ এমন কিছু উচ্চারণ করল যার অর্থ বোঝা গেল না কিন্তু তাতে অবস্থার হেরফের হল না । পেছনে তখন চিৎকার অনেক কন্ঠে ছড়িয়ে পরেছে । প্যারাডাইসের একাংশে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে । শেষ বোমাটা ছুঁড়ল কল্যাণ । তীব্র শব্দে সেটা বিস্ফোরিত হল প্যারাডাইসের গেটের বাইরে মুখ বাড়ানো গাড়ির ওপরে । আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধাক্কা খেল রাস্তার পাশের গাছে, তারপর পাক খেয়ে উল্টে পড়ল ঠিক গেটের মাঝখানে । এবং তার শরীর থেকে দপ করে একটা আগুন লাফিয়ে উঠল আকাশে । ফলে প্যারাডাইস থেকে বাইরে বেরোবার পথ বন্ধ করে দিল জ্বলন্ত গাড়িটা । ভেতরে উদ্যানে তখন নারী পুরুষের চিৎকার এবং কান্না সমান তালে চলছে । যেসব নারী পুরুষ পাগলের মত ছুটোছুটি করছিল তাদের অনেকের শরীরের লজ্জাবস্ত্র শেষ মুহূর্তে টেনে-নেওয়া । মজার কথা হল, আগুন নেবানোর কোন চেষ্টা হচ্ছে না । আতঙ্ক যেন তার খাবার সবাইকে অবশ করে দিয়েছে । এর মধ্যেই পাহারাদাররা জানতে পেরেছে বড় সাহেব নেই । সরাসরি গুলি লেগেছে তাঁর বুকে । জ্বলন্ত ককটেল কুটিরের পাশে তার মৃতদেহ ঘিরে ছোট্ট ভিড় । ভিড় সেই পাহারাদারের পাশে বোমায় যার মাথা উড়ে গেছে । মধ্যরাত্রের এই চিৎকার এবং আগুন দেখে আশে পাশের মানুষজন ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে তফাতে । এই বিশাল দুর্গের মত ঘেরা স্বর্গেদ্যানে চোকার অনুমতি তারা কখনই পায়নি । চিরকাল কিছুটা বিস্ময় কিছুটা ঈর্ষায় তারা একদিকে তাকিয়ে এসেছে । এখন অবশ্য দ্বিতীয়টি নেই কিন্তু বিস্ময় বাড়ছিল এরকম অঘটন কিভাবে ঘটল তাই ভেবে ।

কলকাতার দিকে ঝড়ের মত ছুটে যাওয়া গাড়িটার গতি এক সময় স্বাভাবিক হয়ে এল । জম্বিতার দুটো হাত জ্বলছিল তবু সে সুদীপকে বলল, 'তুই সরে আয়, আমি চালাচ্ছি ।'

'ফোট । এখন আমি সিঁটারিং ছাড়ব না ।'

জম্বিতা মুখ ফিরিয়ে আনন্দকে বলল, 'ওর মাথা থেকে এখনও রক্ত বের হচ্ছে ।'

আনন্দ কিছু বলল না । ও বুঝতে পেরেছে এখন সুদীপকে কিছু বলে লাভ হবে না । এই জেদটুকুই ওর অহঙ্কার । এবং বুঝতে পারে না সেটাই ওর ক্রটি । যতক্ষণ শক্তি থাকবে চালাক, খামোকা তিক্ততা এনে কি লাভ । সে পিছন কিরে তাকাল । সমস্ত চরাচর নিশিছন্ন অন্ধকারে তেকে গেছে । এখন প্যারাডাইস অনেক পেছনে । সে লক্ষ করল কল্যাণ তখন থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে

পিছনে তাকিয়ে আছে। এরকম একটা গাড়ির জানলা দিয়ে বোমা ছুঁড়ে
থায়াল করা সোজা কথা নয়। কল্যাণ সেটা পারল বলেই তাদের পেছনে
এখনও কোন গাড়ি নেই। কল্যাণের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সাবাস্ !'
মুখ না ফিরিয়ে কল্যাণ বলল, 'কি জন্যে ?'

'সব কিছুর জন্যেই।' আনন্দ হাসল।

'তোকে কে সাবাস বলবে ?'

'তোরা, যদি সাবাস পাবার মত কিছু করে থাকি। বি ইজি, আমাদের
পেছনে আর কেউ নেই। উই আর সেফ। এবং জন্মিতা তুই চটপট শাড়িটা
খুলে শার্ট প্যান্ট পরে ফ্যাল। যদি সামনের পুলিশ স্টেশনে গাড়ি আটকায়
তাহলে তোর শরীরে ওরা যেন শাড়ি না দ্যাখে।' আনন্দ বলতে বলতে দেখল
সামনের দিকে দুটো হেডলাইট এগিয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ
বলল, 'ভ্যান !'

'হাইওয়ে পেট্রল দিচ্ছে বোধ হয়। ওরা যদি থামায় আমরা মাথা নামিয়ে
নেব। তোদের যদি উল্টোপাল্টা বলে, চার্জ করব, তুই ইঞ্জিন চালু রাখ।' আনন্দ
কল্যাণকে ইশারা করতেই সে মাথা নামাল। গাড়িটা পুলিশের।
হেড লাইট নেবাচ্ছে না। বোধ হয় ইচ্ছে করেই। সুদীপ একটা গালাগালি
দিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাল। জন্মিতা কাপড়টাকে টানল। কটেজেই সে
ভেবেছিল জিনস্ পরে নেবে। কিন্তু ককটেল কুটিরের যাওয়ার পর সেই সুযোগ
পাওয়া যায়নি। না পেয়ে ভালই হয়েছে বলে মনে হল এখন। পুলিশের
গাড়িটা একটু থামল। কেউ একজন মুখ বাড়িয়ে কিছু দেখল। তারপর
আবার গতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়ি চালু করে সুদীপ পকেট থেকে
সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে পাশে ফেলে বলল, 'ধরিয়ে দে।'

আনন্দ বলল, 'আমি দিচ্ছি, তুই শাড়ি ছাড় জন্মিতা।'

'আমি এই গাড়ির মধ্যেই ছাড়ব নাকি ?'

'ন্যাকা,' সুদীপ বলল, 'আমি তোমার জন্যে গাড়ি থামাতে পারব না।'

আনন্দ বলল, 'আমি তোর ব্যাপারটা বুঝতে পারছি জন্মিতা, কিন্তু আমরা
যদি এক মিনিট দেরী করি তাহলে একশট্রা ট্রাবল ইনভাইট করব।' সিগারেট
ধরিয়ে সুদীপের মুখে ও'জে সে পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিল।

একটু কাঁপন এল শরীরে। মেয়ে বলে তার কোন রক্ষণশীলবোধ নেই।
কিন্তু তাই বলে চলন্ত গাড়ির সিটে বসে শাড়ি ছাড়ার কথা সে এই মুহূর্তে
ভাবতে পারছে না। বুউজটা না খুললেও অবশ্য চলে, ওর ওপর সার্ট গলিয়ে
নিলে বোঝা যাবে না। কিন্তু সায়্যা ? প্রচণ্ড রাগ হল নিজের ওপরে। তার
মুখে যে রক্ত জমছে সেটা বুঝেই সে সোজা হয়ে বসল। তারপর কোমরে
হাত দিয়ে শাড়ির গিঁট খুলে খানিকটা উর্থে শাড়িটাকে পেঁয়াজের খোসার মত
ছাড়িয়ে নিল শরীর থেকে। চোখের কোণায় সে পাশে বসা সুদীপের দিকে
তাকাল। সুদীপের নজর সামনের দিকে। একটু স্বস্তি বোধ করল সে।

সুদীপ একবারও মুখ ফেরায়নি। পেছনের দুজনের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সায়ার নিচে প্যাণ্টি পরা থাকায় আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল জয়িতা। সায়ার শাড়ি মুক্ত হয়ে শার্টটা গলিয়ে নিল ওপরে। বুউজটা না থাকলে আরও সহজ হতে পারত সে। জিপার টেনে বোতাম আটকে সে চটপটে হাতে শাড়ি ভাঁজ করে সায়ার দিয়ে মুড়ে ব্যাগে চালান করে দিয়ে স্থির হয়ে বসল। এবং তখনই তার মনে অশ্রুত নিশ্চিন্তিবোধ এল। জীবনের যেকোন সময়েই সে এই তিন বন্ধুর কাছে শুধু বন্ধু হিসাবেই গ্রহণীয় হবে, নারী বলে আলাদা কোন ব্যবহারের জন্যে তাকে কখনও আতঙ্কিত থাকতে হবে না। চোখ বন্ধ করল জয়িতা। আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর খিনখিনিয়ে উঠল।

ককটেল কুটিরের ঢোকার পরই বাজনা কানে এসেছিল। ঘরটা বিশাল। একপাশে বার কাউন্টার। এমন চমৎকার আলো আঁধারি যে দৃষ্টিত ব্যাহত হয় না আবার কোন কিছুই কটকটে নয়। প্রায় কুড়ি বাইশজন নরনারী আলিঙ্গন বদ্ধ অবস্থায়। মদ্যপান এবং চুম্বন করে যাচ্ছে সানন্দে। এই দুটো এক সঙ্গে যে সম্ভব হয় তা না দেখলে কল্পনা করতে পারত না। তাদের দেখে একটা সুন্দরী হোস্টেস এগিয়ে এসে বলল, ‘ওয়েলকাম!’ সুদীপ মাথা নেড়ে সেটা গ্রহণ করতেই মেয়েটি দুটো হাত ছড়িয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, ‘আজকে তোমাদের জন্য অনেক মজা অপেক্ষা করছে। তার আগে বল কি ড্রিন্ক তোমরা নেবে?’

সুদীপ তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জানাল নিজেদের দেখাশোনা তারা নিজেরাই করে নেবে, সুন্দরী স্বচ্ছন্দে অন্য গ্রাহকদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। মুক্ত হয়ে সুদীপ বলল, ‘আমাদের হাতে গ্লাস রাখা দরকার জয়, চল ওখানে যাই।’

‘তুই ড্রিন্ক করবি?’

‘আবার শালা তুই আমাকে তুই বলছিস?’

‘তুই কি বলছিস?’

সুদীপ একটা ব্লাণ্ডি আর সফট্‌ড্রিন্ক দুজনের জন্যে নিয়ে বলল, ‘পেয়ারগুলোকে দ্যাখ। তোর আমার বয়সী কেউ নেই।’

জয়িতা গ্লাসটাকে হাতে নিয়েছিল। অন্তত চার ডাবল দাম নিয়েছে এরা। ওর দৃষ্টি এবার সামনের দিকে ছড়াল। পুরুষদের কারো বয়স চল্লিশের নিচে নয়। তাদের সঙ্গিনীরা বেশীর ভাগই পঁচিশ ছোঁয়া। একজন টেকোমাথা বুড়ো উনিশ-কুড়ি বছরের সঙ্গিনীর গালে এমনভাবে কামড়ে দিলেন যে বেচারী উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিপরীত। বোঝাই যাচ্ছে তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে এসেছেন। এবং তাঁদের বেশীরভাগই অল্পবয়স্ক। সেদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, ‘এই বুড়ুলোই শয়তানের বউ।’ জয়িতার নজর তখন দুটো জোড়ার ওপর পড়েছে। একজন বয়স্ক এবং স্বল্পবসনা যাকে জড়িয়ে আদর করছেন

বাজনার তালে সে পুরুষ নয়। মিনি স্কাৰ্ট পরা মেয়েটিকে তার চেনা চেনা লাগছিল। অথচ কিছুতেই সে ঠাওর করতে পারছিল না। তখন থেকেই শরীরে যিনযিনে ভাবটা চলে এল। মেয়েটি যেন খুব মজা পেয়েছে এমন গদগদ ভাব। আলিঙ্গনের সময় ওর শরীরে মহিলার হাত সাপের মত ঘুরছে এবং মেয়েটি আরও ব্যবধান কমাচ্ছে। জয়িতা বলল, ‘আমি কটেজ ফিরে যাচ্ছি।’

সুদীপ বলল, ‘দাঁড়া। এই মানুষগুলো কলকাতা থেকে চুরি করে এসেছে।’ জয়িতা বলল, ‘চেনাস না আমাকে। সাম অফ দেম আর নোন টু মি।’ ‘চিনিস?’

‘আমার বাবা মাগ্নের মত দেখতে।’ নিষিকার মুখে বলল জয়িতা। ‘ওকে!’ সুদীপ হাসল, ‘তবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। এগিয়ে আয়।’ জয়িতার কাঁধে হাত রেখে ও এগিয়ে গেল ভিড় কাটিয়ে। জয়িতা ইঙ্গিতে দাঁড়াতে বলল তাকে। একটা সোফার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছেন সুন্দর পোশাক পড়ে যে দুজন তাঁদের বয়স সত্তর পেরিয়েছে অনেকদিন। বন্ধুর শরীরের চামড়ায় অনেক ভাঁজ। বন্ধুর মুখে ভাল রঙ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দুজনে যৌবন দেখছেন এমন ভঙ্গী। সুদীপ বলল, ‘হা-ই’। বন্ধু মুচকি হাসলেন, বন্ধু জবাব দিলেন, ‘হা-ই।’

‘তোমাদের কেমন লাগছে?’

‘চমৎকার। আমরা তো উপভোগ করতে সপ্তাহে একদিন এখানে আসি।’

‘উপভোগ করতে?’ জয়িতা প্রশ্ন না করে পারল না।

সেই সময় লোকটি ঢুকল। লম্বা, সুগঠিত শরীর, হাঁটার মধ্যেই বুঝিয়ে দিলেন কর্তৃত্ব ওঁর করায়ত্ত। চট করে একটা আলোর রক্ত তাঁকে ধরে নিল। দুটো হাত ওপরে তুলে তিনি হাতছানি দিলেন। গুঞ্জন কমে গেল, ‘লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন। আশা করছি আপনারা আমার প্যারাডাইসে চমৎকার আছেন। এখন হল সেই সময় যখন আপনারা যা খুশী করতে পারেন। কোন সংকোচ নয়, মজ্জা ত্যাগ করুন। আমাদের প্রত্যেকের মনে যে গোপন ইচ্ছা আছে সেটা ব্যক্ত করার সময় এখন। লেটস এনজয়!’

দুম করে আলো নিবে গেল। বাজনা বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর গাঢ় নীল আলো জ্বলে উঠল হলে। জয়িতার মনে হল নীলের স্রোত বইছে যেন ঘরে। নিজেদের চেহারা ইভৌতিক হয়ে গেল আচমকা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে লোকটি পোশাক খুলছেন। তাঁর পাশে বিকিনি পরা দুটি মেয়ে। সযত্নে সেই পোশাকগুলো তারা সরিয়ে রাখছে। জয়িতা বিস্মিত হয়ে দেখল লোকটি সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে গেলেন। একটুও সঙ্কোচ নেই তাঁর ভঙ্গীতে। এবার ওপাশের দেওয়ালে হেলিয়ে রাখা একটি মসৃণ তক্তা টেনে আনা হল। তক্তাটির নিচে গোটানো পায়াল ছিল। সেটি সাজিয়ে নেওয়ার পর লোকটি উপড় হয়ে তার ওপরে শুয়ে পড়লেন। দম বন্ধ করে দেখছিল জয়িতা। ককটেল রুমে

অধিকাংশ মানুষ লোকটিকে কেন্দ্র করে রুজু রচনা করছে। সেই রুদ্ধদম্পতি সবার আগে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। লোকটি এবার শব্দ করলেন। তাঁর মুখ অবশ্য এখন তক্তার ওপর চেপে রাখা, শব্দটা তাই বিকৃত শোনাল। সহকারিণীর একজন তখন দেওয়ালের কাছে ফিরে গেল। তারপরই বাতাসে সাঁ শব্দটাকে সাপের নিঃশ্বাসের মত সোচ্চার করে দু'ইঞ্চি নরম চামড়ার চাবুকটা আছড়ে পড়ল লোকটির নিতম্বে। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হল না তাঁর শরীরে। জয়িতা লক্ষ্য করল লোকটার সমস্ত পিঠে, নিতম্বে হাঁটুর নিচে অজস্র সরু সরু দাগ। নিয়মিত ব্যবধানে চাবুক পড়ছে লোকটির শরীরে। সুদীপ বলল, 'নিচু গলায় দর্শকদের দ্যাখ।'

রুদ্ধের গাল বেয়ে লাল পড়ছে। চোখ বিস্ফারিত। রুদ্ধা তাকে মুঠোয় শক্ত করে ধরে আছেন। দর্শকদের অনেকের চোখই জ্বলছে। এই সময় সহকারিণী আঘাত বন্ধ করল। লোকটির পেছন দিকটা এতক্ষণে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন লোকটি। তারপর দেওয়ালের পাশে দাঁড় করানো লম্বা টুলের ওপর উঠে ইঙ্গিত করলেন সহকারিণীকে। সে চটপট ওপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা চামড়ার ট্র্যাপ লোকটির মনিবন্ধে আটকে দিল। দুহাত মাথার ওপরে রেখে নগ্ন লোকটিকে দেখিয়ে সহকারিণী চীৎকার করলেন, 'এগিয়ে আসুন আপনাদের মধ্যে কে প্রথম সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন যার চাবুকের আঘাত এর শরীরে বাড় উঠবে, সমুদ্র মগ্নিত হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তিনজন সুন্দরী মধ্যবয়সিনী একই সঙ্গে এগিয়ে এলেন সামনে। প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে চাবুক চাইছেন। একটা হিলহিলে নোংরা স্রোত টেনে আনল সেই চাওয়ার শব্দগুলো। সুদীপ বলল, 'মাথা ধরার নাম করে তুই কটেজে ফিরে যা। আমি আসছি।'

জয়িতা মাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুই কি করবি?'

'ফিউজ বক্সের কাছে কেউ নেই। আগে আগুন জ্বালাবো তারপর লোকটাকে গুলি করে মারব। এ ব্যাটাই প্যারাডাইসের মালিক।' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল সুদীপ।

'না, আমি গুলি করব।' নিঃশ্বাস বন্ধ করল জয়িতা।

'যা বলছি তাই কর। কটেজের দরজায় মালগুলো রেডি করে দাঁড়িয়ে থাকবি চাবি নে।'

জয়িতা সুদীপের দিকে তাকাল। ততক্ষণে সেই মহিলা চাবুক মারার সৌভাগ্য পেয়েছেন যিনি সঙ্গীকে নিলে প্যারাডাইসে লীলা করতে এসেছেন। এই মুহূর্তে তাকে উন্মাদিনীর মত দেখাচ্ছিল। চাবি নিয়ে দ্রুত পায়ে জয়িতা ককটেল কটেজের বাইরে আসতেই সেই লোকটি এগিয়ে এল, 'এনি প্রব্লম ম্যাডাম?' 'বমি পাচ্ছে, শরীর খারাপ লাগছে।' সত্যি কথাটা বলল জয়িতা।

'ও কিছু নয়, প্রথম প্রথম এরকম হয়। শরীর সুস্থ করে আবার ফিরে আসুন।

এখনও অনেক আইটেম বাকি আছে।’ লোকটি দাঁত বের করে হাসতেই জয়িতা পা বাড়াল। নিজেদের কটেজের কাছে এসে সত্যি তার বমি হয়ে গেল। ঈষৎ ঝুঁকে সে শব্দ করে কিছুটা অস্বস্তি বের করে দিতেই একজন পাহারাদার সামনে এসে দাঁড়াল ‘কি হয়েছে ম্যাডাম?’

‘শরীর খারাপ। ককটেল কুটির থেকে আসছি। বমি পাচ্ছে।’

‘হায়। কি অবস্থা! কেন যে ওখানে যান, আপনাদের মত ভাল মেয়েদের জায়গা ওটা নয়!’ লোকটা অত্যন্ত সমবেদনা মাখানো স্বরে কথাগুলো বলতেই জয়িতা মুখ তুলে তাকাল। বছর পঞ্চাশেকের মত বয়স, মুখে একটা নরম ভঙ্গী আছে। সে কোনরকমে বলল, ‘আমাকে বমি বন্ধ হওয়ার ওষুধ এনে দেবেন?’

‘ওষুধ? দেখি। কোন কটেজে উঠেছেন।’

আঙ্গুল দিয়ে কটেজটা দেখিয়ে দিয়ে জয়িতা চলে এসেছিল। ঘরে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে শরীর স্থির করতে সময় লেগেছিল বড়জোর পাঁচ মিনিট। সে সুদীপের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে যে তার শরীর এমন বিকল হয়ে পড়েছিল তা নিজেই টের পায়নি, সুদীপ যদি জোর করে না পাঠিয়ে দিত তাহলে ওখানেই হয়তো বমি হয়ে যেত। সে যখন শাড়ি ছেড়ে জিনস পরবে বলে ভাবছে সেই সময় গুলির শব্দটা কানে এসেছিল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোতেই সুদীপের দেখা পেয়েছিল। দৌড়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে সুদীপ বলেছিল, ‘জেনারেলটারটাকে চার্জ কর। তিন মিনিট সময় দিচ্ছি।’ তারপর ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে গেল আবার। জয়িতা নিজের ব্যাগটা তুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আঙুন দেখতে পেল। এবং সেইসঙ্গে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে মাঠময় ছুটোছুটি করছে মত্ত-অর্ধমত্ত নরনারী। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কটেজে আঙুন জ্বলতে দেখল। পাহারাদাররা যে যেখানে ছিল ছুটে আসছে ককটেল কটেজের দিকে। এই সময় একটি নারীকণ্ঠে চিৎকার উঠল, ‘সাহেব মর গিয়া।’ জয়িতা আর দাঁড়াল না। বাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে সোজা চলে এল জেনারেলের রুমের দিকে। যে লোকটা পাহারায় ছিল সে হতভস্তের মত দাঁড়িয়ে দূরের আঙুন দেখছে। জয়িতা চিৎকার করে বলল, ‘আপনাকে ডাকছে ওদিকে।’

‘আমাকে?’ বলেই লোকটা দৌড়াতে শুরু করল। বোধ হয় এতক্ষণের কৌতুহল এবার মেটাতে পেরে সে খুশী হল। যেভাবে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেইভাবেই বস্তুটিকে ছুঁড়ল জয়িতা খোলা দরজা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, আঙুনের হলকা এবং সমস্ত এলাকাটি নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। দূরের তিনটে কটেজে আঙুন জ্বলছে। তারই লাল আলোয় চারধার ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। এই সময় সামনের দিকে বিস্ফোরণের আওয়াজ এবং কান্না মেশানো চিৎকার ভেসে এল। ক্রমশ ডানদিকের রুকেও

আগুন জ্বলে উঠল। জয়িতা দৌড়ে খানিকটা এগোতেই সুদীপের চিৎকার শুনতে পেল, 'লেট মি গো ব্যাক। সরে যাও সামনে থেকে। যে বাধা দেবে তার জান খতম করে দেব।' এই গলা কখনও শোনেনি জয়িতা।

এখন সেই সুদীপ তাঁঁটি টিপে স্টিয়ারিং ধরে আছে। সে ছাড়া আর কেউ আহত হয়নি। ব্যাপারটা এত সুষ্ঠুভাবে শেষ হবে তা কল্পনাতেও ছিল না। এখন কেউ কথা বলছে না। মধ্যরাত পেরিয়ে গেলেও ওরা কোনরকম ক্লাস্তি বোধ করছিল না। হঠাৎ কল্যাণ বলল, 'বড্ড খিদে পাচ্ছে!'

আনন্দ বলল, 'বাড়িতে গিয়ে খাবি।'

'বাড়িতে গিয়ে! আমরা কি বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। সেরকম তো কথা ছিল না।' কল্যাণের গলায় আপত্তি স্পষ্ট। আনন্দ একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'যতদূর মনে হয় আমাদের কেউ দ্যাখেনি। আর কেউ যদি দ্যাখেও পরে মনে করতে পারবে না। আমরা কোন লিফলেট ফেলে আসিনি। অতএব ব্যাপারটা পুলিশকে ধাঁধায় ফেলবে। নিছক ডাকাতি নয় কারণ আমরা কিছু নিয়ে যাচ্ছি না আবার কোন পলিটিক্যাল চেহারা দেওয়াও মুশকিল। এখন আমরা যদি বাড়িতে ফিরে না যাই তাহলে খোঁজ খবর হবেই। আমরা হোস্টেল থেকে কিংবা তাদের বাড়ি থেকে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ হয়তো একটা রুু খুঁজে পেতে পারে। আমরা ওদের সাহায্য করব কেন?' খুব ভেবেচিন্তে শান্ত গলায় কথাগুলো বলল আনন্দ।

'কিন্তু আমরা ঠিক করেছিলাম বাড়িতে ফিরব না। সুদীপের আত্মীয়র বাড়ি সেই কারণেই দেখে এসেছিলি।' কল্যাণের প্রস্তাবটা মেনে নিতে ইচ্ছে করছিল না।

'যদি আমাদের কেউ মারাত্মক আহত হত, কেউ ধরা পড়ে যেত কিংবা কাউকে ওরা চিনে ফেলত তাহলে সেই ব্যবস্থাই করতে হত। খামোখা মানুষের মনে সন্দেহ এনে কি লাভ?'

সুদীপ এতক্ষণে কথা বলল, 'তোরা বাড়িতে ফিরতে এত আপত্তি কেন?'

কল্যাণ নাক দিয়ে শব্দ করলো, 'আমার আর ওখানে থাকতে ইচ্ছে করে না।'

সুদীপ বলল, 'আমারও করে না। কিন্তু হঠকারিতা করে কোন লাভ নেই। তিনটে লাস পড়েছে আজ।'

'তিনটে?' জয়িতা চমকে উঠল।

সুদীপ স্টিয়ারিং ধরে মাথা দোলাল, 'অ্যাই অ্যাম হ্যাপি। প্যারাডাইসের লোকটাকে গুলি করেছিলাম। ঠিক সেই সময় ওই লেসবিয়ান মহিলা লোকটির নিতম্বে চুমু খাবে তা কে জানত! ফলে দ্বিতীয়বার গুলি করতে হল। বাইরে বেরিয়ে আসার পর আগুন জ্বালায় পর রিসেপশনিষ্ট লোকটা সামনাসামনি পড়ে গেল। গুলি করতাম না কিন্তু লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'আপনি!' অর্থাৎ ও আমাকে চিনতে পেরেছিল। চোকার সময়ও

আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছে, জন্মিতাকে লক্ষ্য করেছে। অতএব পুষ্টিশ ওর কাছ থেকে ডিটেজস পেয়ে যেত।’

আনন্দ বলল ‘ওও। অতএব আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যা বিপদ থেকে আনতে পারে। এখন কদিন খুব নর্মাণ ব্যবহার করব। অ্যাডজাস্ট করতে শেখা কল্যাণ।’

‘সারাজীবন তো অ্যাডজাস্ট করে আসছি।’

‘সারাজীবন?’ খুব করে হাসল জন্মিতা। তারপর হঠাৎ গভীর হয়ে সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘গুলি করার সময় তোর কিরকম মনে হয়েছিল?’

‘আনন্দ হচ্ছিল। আই অ্যাম ডুয়িং রাইট জব। যদি এইভাবে বাংলাদেশের নোংরা অসৎ মানুষগুলোকে গুলি করে মারতে পারতাম, আঃ, সেদিন কি আসবে।’ সুদীপ বলল। আনন্দ কল্যাণের কাঁধে হাত রাখল, ‘গুলি করতে হলে ঘরে বাইরে করতে হয়। এই পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করতে হলে জঞ্জাল সরাতে হবেই। কোন আপোষ চলবে না। কল্যাণ, তুই ইচ্ছে করলে কয়েকদিন আমার হোস্টেলেই থাকতে পারিস।’

কল্যাণ মাথা নাড়ল, ‘না, ভোর বেলায় বাড়িতে ফিরে যাব।’

ওরা বেহাঙ্গা স্টোরাস্টা ছাড়িয়ে খানিকটা দূর আসতেই আনন্দ বলল, ‘হাওড়া স্টেশনে চল।’

স্টেশনের বাইরে কার পার্কে গাড়ি রেখে খুঁটিয়ে দেখে নিল আনন্দ। সুদীপের রক্ত অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ি লক করে সুদীপ বলল, ‘চাবিটা গঙ্গায় ফেলে দেব।’ তখন ভোর হয়ে আসছে। সাত সকালের ট্রেন ধরতে ট্যান্ডি চুকছে স্টেশনে। আগামী কাল বিকেলে কোথায় দেখা হবে স্থির করে কল্যাণ আর আনন্দ উত্তরের সবে চালু হওয়া ট্রাম ধরল। সুদীপ আর জন্মিতা দক্ষিণের প্রথম দোতারা বাসের সামনের আসনে উঠে বসতেই পাতলা আঁধারে মিশতে শুরু করা আলোয় মাথামাথি গঙ্গা দেখতে পেল। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘বাড়ি গিয়ে বাইরে রাত কাটানোর কি কৈফিয়ত দিবি?’

জন্মিতা চুপ করে ভোরের কলকাতা দেখছিল। প্রশ্ন শুনে মাথা নেড়ে বলল, ‘কৈফিয়ত নেবার জন্যে কেউ এখন জেগে নেই।’

॥ ১০ ॥

ভোর বেলায় কলকাতার রাস্তা বড় মোলায়েম, একটু আঁধার লেগে থাকলে আদুরে বেড়ালের মত মনে হয়। সারাদিন শহরটাকে যারা নরক করে রাখে তারা ঘরে ঘরে মৃন্মিয়ে। কিছু শান্ত মানুষ গঙ্গা স্নানের জন্যে পথ হাঁটিছেন। কিছু ভ্রমণবিলাসী অক্সিজেন নিচ্ছেন প্রাণভরে। জন্মিতার মনে হচ্ছিল

শৌচাঙ্গ জল জমার মত সারারাত যে অন্নিভেদনটুকু কলকাতাকে দিয়ে থাকে তা পাওয়া যায় এই সময়টুকুতেই। যারা পথে বের হতে পারে এখন তারা ই ভাগ্যবান।

সে সুদীপের দিকে তাকাল। ঠোঁট কামড়ে বসে আছে চোখ বন্ধ করে। ওর মাথার ক্ষতটা এখনও লালচে হয়ে আছে। এই নিম্নে কিছু বলতে যাওয়া বোকামি। সুদীপ জানে কি করে নিজের যত্ন করতে হয়। ঠিক কখন লাগল সেটাও বলতে চায়নি। জয়িতা এবার বাড়ির কথা ভাবল। কাল দুপুর থেকে অঙ্কুত একটা টেনশনের মধ্যে কেটে গেল সময়টা। এমন কি একটা গোটা রাত না ঘুমানো সত্ত্বেও অস্থিস্থি হচ্ছে না। যেন অন্তকাল সে জেগে থাকতে পারে। একটা গোটা রাত না বলে বাড়ির বাইরে কাটাগল সে এই প্রথম। বেরুবার সময় জানা ছিল আর ফেরা হবে না। কিন্তু আনন্দের কথায় যুক্তি ছিল। সমস্যা হল বাড়ি ফিরে সীতা রায়কে কি জবাবদিহি দেবে সে? মুখের ওপর ঘোলা করে বলার পর থেকেই তো বাক্যান্যাপ প্রায় বন্ধ। আজ নিশ্চয়ই বদলা নেবে ওরা। জয়িতা কপালে হাত বোলাতেই টের পেল। গত রাত্রে মাসীমা টিপটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, এত ঝামেলাতেও স্থির ছিল এটা। ফেলে দিতে গিয়ে কেমন মায়্যা হল ওর। এমন ভালবেসে কেউ তাকে অনেকদিন সাজায়নি। টিপটাকে সে পকেটে রেখে দিল। তারপর সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'মাসীমা কিন্তু জানেন না না?'

'কোন মাসীমা?' সুদীপ চোখ খুলছিল না।

'আনন্দের মা।'

'সব জানে। আনন্দ ওঁকে সব বলেছে।'

'আশ্চর্য! আমাকে একবারও এ নিম্নে কোন প্রশ্ন করেন নি।'

'তোর চেয়ে যে অনেক গভীর-স্বভাবের মানুষ, তাই।'

জয়িতা কথা বাড়ায় না। সুদীপ খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে পারে না। শুনলে শরীর জ্বলে যায় কিন্তু ওর সঙ্গে ঝগড়া করার কোন মানে হয় না। কিন্তু বাড়িতে ঢোকান পর আর একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে ওকে। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে চুপচাপ থাকার পাত্র রামানন্দ কিংবা সীতা নন। জয়িতাকে যদি সরাসরি প্রশ্ন করে তাহলে সে না বলবে না। সত্যি কথা স্বীকার করে বলতে চাইলে পাওয়া যেত না তাই নিম্নেছি। এতে যা হবার তা হবে। ক্রমশ একটা রোখ দখল করল তাকে। মনে মনে বাবা মায়ের মুখোমুখি হবার জন্যে সে তৈরী হয়ে নিল। আর তখনই সুদীপ বলল, 'আমি নামছি। মালগুলো নিম্নে যাচ্ছি। পারলে আজ বিকেলে কফিহাউসে আসিস।'

গুরুসদয় রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে জয়িতা চারপাশে তাকাল। রাস্তায় লোকজন নেই। রোদ্দুর ওঠেনি এখনও। একটা শীতল ছায়া গাঢ় হয়ে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর গায়ে। এবং এই প্রথম মন খারাপ হয়ে গেল ওর। এটা কি ধরনের মন খারাপ তা ও নিজেই জানে না কিন্তু বুকের ভেতর একটা ভার

এসে জমল। এখন কলকাতা কত ভাল, কত শান্ত। মানুষেরা যে যার ঘরে বলেই বাতাসে এখনও আদুরে ছোঁয়া। একটা হলুদ পাখি উড়ে গেল ডানা মেলে। পাখিদের কি মন খারাপ হয় ?

আড়াশি পায়ে বালিগঞ্জ পার্ক রোডে এল সে। বাগানওয়ালার বাড়ির দারোয়ানটা অস্তিত্ব চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জমিতার ঘুম এল। হাঁটিতে হাঁটিতেই মনে হল সমস্ত শরীর জুড়ে ঘুম নামছে। শুধু চোখ বন্ধ করাটাই বাকি আর তখনই কেউ মোটা গলায় হা-ই বলে চেঁচিয়ে উঠল। চোখ বড় করে জমিতা দেখল সাদা গেঞ্জি আর শর্ট পরে তিনতলার রবীন সেন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শরীর ঝাঁকচ্ছেন প্রাণপণে। খুব বড় চাকুরে ওই ভদ্রলোকের ওজন অন্তত আড়াইশো পাউন্ড। ওকে বেশ কয়েকবার মিট করেছে সে। লিফটে ওঠার সময় কিংবা ওই চত্বরে। একদিন অবশ্য ওদের ফ্লুটে এসেছিলেন মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। মা ওকে খবর দিতে কৃতার্থ হয়ে ছুটে এসেছিলেন। কাদের সাহায্যার্থে সীতা রায়রা কি ফাংশন করবেন তার ডোনেশন দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। লোকটার দিকে তাকিয়ে ঘুম উবে গেল জমিতার। খাটো প্যান্টের নিচে মাংসগুলো কি বীভৎসভাবে কাঁপছে থলথলিয়ে। জমিতার শরীর গুলিয়ে উঠল।

ব্যায়াম সেরে রবীন সেন এগিয়ে এলেন, ‘মনিং, তুমি রোজ সকালে বের হও জানতাম না।’

জমিতার হেঁট মোচড় খেল। মনে মনে বলল ব্যাঙ। রবীন সেন তখন হাত পানেড়ে বলে যাচ্ছেন, ‘তোমার রোজ মনিং ওয়াক জগিং করা উচিত। কে বলে কলকাতার বাতাসে অক্সিজেন নেই! আমি রোজ এত এত অক্সিজেন বুক ভরে নিই। তুমি যদি দুমাস আমার সঙ্গে বের হও তাহলে দেখবে মিসেস রায়ের মত ফিগার হয়ে যাবে।’

‘কান্ন মত ?’

‘মিসেস রায়। মানে তোমার মায়ের কথা বলছি। উই মাস্ট অ্যাডমিট শী ইজ এ বিউটি। কোমর কত বল তো ? দ্যাখা যায় না আজকাল! আমি অবশ্য তিন সপ্তাহ বেরুচ্ছি। খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি, বুঝলে! মাত্র সাতশ। ডেইলি। স্তন্যতাই সাতশ, কি খাই জানো ? ভোরে অক্সিজেন। তারপর এক চামচ চিনি দিয়ে দুধ ছাড়া চা। বিশ ক্যালরি। তারপর একটা শূকা টোস্ট—, তোমাকে বোর করছি ? আসলে আজকাল সারাদিন শূখু খাওয়ার চিন্তা মাথায় ঘোরে। প্রেক্টিক্যালি, ভারতবর্ষের মানুষ কেন এত খায় বলতে পারো ? অপচয়, অপচয়। মিসেস রায় আমাকে শরীর তৈরীর কারখানায় যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি নিজেই নিজেকে বানাবো বলে ঠিক করেছি। আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন রবীন সেন।

‘বানাতে পারছেন ?’

‘কমছে বেশ কমছে। তবে মনে হয় কারো কারো চুমু খেলেও ফ্যাট বাড়ে। কিছু মনে করো না, এসব অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন। তুমি কি মনে কর চুমুতেও ফ্যাট জমে? ওতেও কি ক্যালরি আছে?’

‘আপনি ওটা বন্ধ করে দেখুন না।’

‘না ভাই, মিষ্টি, দুধ, মাংস, ডিম সব কমিয়ে দিয়েছি কিন্তু চুমু, এম্পসিবল্। একেই ভারতবর্ষের মানুষ কম চুমু খায়, ইটস অ্যান আর্ট। তবে ওতে কত ক্যালরি আছে সেটাই জানতে হবে! খুব ঘোমে গেছি, কিছু মনে করো না।’ রবীন সেন নিঃশ্বাস নিলেন।

‘মিসেস রায়কে জিজ্ঞাসা করুন। এ ব্যাপারে উনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। চলি।’

‘আহা, দাঁড়াও না এক মিনিট। মিসেস রায় তো দার্জিলিং-এ। চমৎকার ওয়েদার এখন ওখানে! এয়ারপোর্টে ওদের দেখলাম। স্যানাল হোকরাটা খুব লাগি। এত মেয়েদের সঙ্গে ঘোরে তবু ফ্যাট জমেনি শরীরে। আসলে আমার সেক্রেটারিটাই ইনফেকশন।’

‘খুব মোটা বুদ্ধি?’

‘ছিল না, মাস নয়েকের মধ্যে। ওকে ছাড়াতে হবে। তুমি চাকরি-টাকরি করলে আমাকে বলো। খুব লাইট জব। ওকে!’ রবীন সেন আবার ফিরে গেলেন শরীর নাচিয়ে হাঁটার জন্যে। এই ফাঁকে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে। নরম আদুরে রোদ। জয়িতা লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। সীতা রায় তাহলে সত্যি এখন দার্জিলিং-এ। ওর মনে পড়ল কিছুদিন আগে সীতা রায় কাউকে টেলিফোনে বলছিলেন, আই ডোল্ট লাইক অ্যানমারেড গাইস। এই বয়সে বিয়ে থা করতে বলবে—ওরে বাব্বা। যার সম্পর্কে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তাকে নিয়েই তিনি এখন দার্জিলিং-এ আরাম করছেন।

যা হোক; একজন অন্তত কৈফিয়ত নিতে সামনে দাঁড়াবে না। সোঁ সোঁ করে লিফটে সোজা ওপরে চলে এল সে। এখনও আলো নেবেনি বাড়িটার। বাতামে চাপ দিল জয়িতা। এই প্রথম গোটা রাত বাইরে কাটিয়ে সে বাড়িতে ফিরছে। বেলের আওয়াজ বাইরে থেকে শোনা যায় না। কিন্তু একটু বাদেই দরজা খুলে গেল। তাকে দেখে শ্রীহরিদা কি করবে বুঝতে পারছিল না। তারপর কেমন গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথায় ছিলে সারারাত। আমি ভেবে মরি। কান খাড়া করে বসেছিলাম।’

মানুষটার জন্যে কণ্ঠ হল জয়িতার। সে চুপচাপ ভেতরে চলে এল। এমনিতে বেল বাজালে শ্রীহরিদার হাঁশ হয় না। এই নিয়ে রামানন্দ এবং সীতার মধ্যে প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। সীতা রায়ের জন্যেই ওকে ছাড়াতে পারছেন না রামানন্দ। অথচ আজ একবার বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল শ্রীহরিদা। কখনও কখনও কি ও ঠিকঠাক শুনতে পায়।

পেছন পেছন আসছিল শ্রীহরিদা ‘তোমার মা বাড়িতে নেই, বাবা কাল রাত্রে

ফেরেনি, তুমিও সেই লাইন ধরলে। আমার আর এই সংসার আগলাতে ভাল লাগছে না।

নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জয়িতা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা বাড়িতে নেই?'

মাথা নাড়ল শ্রী হরিদা, 'না, বাইরে গেছে। কালকে ফিরবে। স্যুটকেশ নিয়ে গেছে।'

'বাবা বাইরে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমিই তো গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম স্যুটকেশটা। সেই সান্যাল ছোকরাটা গাড়ি নিয়ে এসেছিল। তুমি, আবার কোন চুলোয় গিয়েছিলে?'

জয়িতা জবাব দিল না। সত্যি, শ্রীহরিদার সঙ্গে কথা বলার কোন মানে হয় না। বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে মায়ের সম্পর্কে স্তন্যভেদ হচ্ছিল! রামানন্দ কি বাইরে গেছেন কারও সঙ্গে? হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে জয়িতা রামানন্দ রায়ের ঘরে এল। পাশের দরজাটা বন্ধ। সীতা রান্না বাইরে গেলে ঘরের দরজার চাবি নিয়ে যান।

ঘরটাকে খুঁটিয়ে সে দেখল। এই ঘর দেখে অবশ্য বোঝা যাবে না কেউ বাইরে গেছে কিনা। রামানন্দ রায়ের তিনটে স্যুটকেশ পাশাপাশি রয়েছে। নতুন স্যুটকেশ কেনাটা অস্বাভাবিক নয়। রামানন্দের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। পরিপাটি করে সাজানো। এমন কিছু চোখে পড়ল না যা থেকে কোন সূত্র পাওয়া যায়।

ঘরে ফিরে এসে স্নান করল জয়িতা। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ সর্বত্র মাথামাখি হওয়ার পর মন প্রফুল্ল হয়ে গেল ওর। রামানন্দ রায়ের বাড়িতে না ফেরা, সীতা রায়ের ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়ায় তার কিছু এসে যায় না আর। গতরাতে যে কাজটা ওরা করেছে এইরকম কাজ যদি একটার পর একটা করে যেতে পারে, যদি শুণ্ড কপট মানুষগুলোর মুখোশ খুলে দিয়ে দেশের মানুষের বিবেকে কিল্কিৎ চেঁচু তুলতে পারে তাহলে বেঁচে থাকার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। পোশাক পাক্টে জয়িতা শূন্যে পড়ল। এই সময় শ্রীহরিদা চা নিয়ে ঢুকল। দামী কাপে গরম চা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল সে। আজ যদি সুদীপের সেই আত্মীয়ের বাড়িতে তাদের থাকতে হত তাহলে রূপালো কি জুটত? বালিশে মুখ গুজে সমস্ত আরাম নিতে নিতে হঠাৎ ওর মনে হল নরম বিছানা, দামী চা এই সব শরীরে আরামদায়ক বস্তু তার জন্যে নয়। এসবই রামানন্দ রায় মারফৎ তার অভ্যেসে এতকাল মিশে ছিল। এখন চটজলদি এসব থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। ঠিক এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। করিডোর ডিঙ্গিয়ে জয়িতার ঘরে পেই আওয়াজ ঢুকল কুকুরের কুঁই কুঁই ডাকের মতন। জয়িতা উঠে বসল। আশ্চর্য, পথে আসবার সময় তার ঘুম পাচ্ছিল স্বাভাবিকভাবেই অথচ বিছানায় গা এলিয়ে দেবার পর অন্ন দু'চোখের পাতা এক হচ্ছে না। সে নিজের ঘরের দিকে

তাকাল। এই ঘরে এমন সব আসবাব আছে যা অনেকের বাড়িতে নেই। এই স্বাম্হন্দ্য আনন্দের বাড়িতে দ্যাখেনি সে, কল্যাণের ওখানে তো কল্পনা করা যায় না। এক কথায় নিশ্চয়ই এসব ছেড়ে যাওয়া যায় কিন্তু নিরাসক্ত মন নিয়েও তো এদের সঙ্গে থাকা যায়। ভাতরবর্ষের কয়েক লক্ষ মানুষ অর্ধাহারে থাকে বলেই আমাকে অর্ধাহারে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। বরং যা সহজ তাই মেনে নেওয়া ভাল। তাতে আর যাই হোক টেনশন থাকে না।

শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রিসিভারটা তুলল জয়িতা, 'হেলো।'

'এডরিথিং অলরাইট জয়ী?'

'কে বলছেন?' ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা করল জয়িতা।

'আমার গলা চিনতে পারছিস্ না? আমি তোর বাবা।'

'ও! কি বলছ?'

'আমি হঠাৎই অফিসের কাজে জামসেদপুরে চলে এসেছি। গতকাল ফোন করেছিলাম তোরা কেউ বাড়িতে ছিলি না। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। রামানন্দ যেন কথা খুঁজছেন। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি একাই গিয়েছ জামসেদপুরে? আই মিন, তোমার সঙ্গে কেউ নেই?'

'আমার সঙ্গে? নো, আর কারও তো আসার কথা ছিল না। কেন বল তো?'

'মা দার্জলিং-এ গিয়েছে। সঙ্গে স্যানাল আছে, তাই।'

'জয়ী।' হঠাৎ রামানন্দ রায়ের গলা রুদ্ধ হয়ে এল, 'আমি জানি, আমি জানি। কিন্তু, এসব তো এখন নর্মাল, খুব নর্মাল, আমাকে, আমাদের মানতেই হয়। হয়তো তোর মা কোন একটা একজিবিশনের ব্যবস্থা করতে দার্জলিং-এ গিয়েছে।'

হঠাৎই চুপচাপ হয়ে গেল লাইনটা। রামানন্দ কথা বলছিলেন না। জয়িতা রিসিভারটা চুপচাপ কানে চেপে রেখেছিল। এটা কতক্ষণ? তিরিশ সেকেণ্ড হতে পারে, একমিনিটও। তারপর রামানন্দই বললেন, 'আমি আজ বিকেলের ট্রেনেই ফিরছি।'

জয়িতা বলল, 'আচ্ছা।'

রামানন্দ গলায় জোর আনতে চেষ্টা করলেন, 'আমি—আমি, আচ্ছা, থাক, গিয়ে বলব। আসলে প্রত্যেক মানুষের তো কিছু বলার থাকেই। ওডবাই।'

লাইনটা কেটে গেল। এবং হঠাৎই রামানন্দ রায়ের জন্যে জয়িতার কণ্ঠ বোধ হল। সে মুখ তুলে দেওয়ালের দিকে তাকাল। সেখানে এক বছরের জয়িতাকে শূন্যে তুলে ধরে রামানন্দ হাসছেন। মেয়ের আতঙ্কিত মুখ দেখে পিতার আশ্বস্ত করা হাসি।

রাস্তায় নেমে সুদীপ চারপাশে তাকাল। এই ভোরে মানুষ থাকার কথা নয়। কিন্তু এখন সবাই স্বাস্থ্য-উদ্ধার করতে বেরিয়ে পেড়েছে। তার কাঁধের ব্যাগটা ভারী, হাতেরটা তেমন নয়। দ্রুত পা চালাচ্ছিল সে। এই সময় একটা লোককে সে ফুটপাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। চোখাচোখি হওয়া মাত্র আকাশের দিকে মুখ তুলল লোকটা। সুদীপের বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। এই লোকটা কে? কখনও এপাড়ায় দ্যাখিনি ওকে! এই কি ওর খোঁজে এসেছিল বাড়িতে। যদি পুলিশের চর হয় তাহলে এই মুহূর্তে তাকে অ্যারেস্ট করলে আর কিছু করার থাকবে না। হাতের ব্যাগটায় প্রচুর রসদ পেয়ে যাবে লোকটা। কিন্তু মিনি বেড়ালের মত ধরা দেবে না সুদীপ। এখনও তার কোমরে মালটা গোঁজা আছে।

সুদীপের চোয়াল শক্ত হল। লোকটা ওর দিকে আর একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। না আর সন্দেহ করার কিছু নেই। নির্ধাৎ ওরই জন্যে দাঁড়িয়ে। সুদীপের গতি কমে এল। এখনও হাত দশেক বাকি। দূরে ঠাকুরের দোকানটা এখনও বন্ধ। হঠাৎ যেন রাস্তাটা আরও ফাঁকা হয়ে গেল। ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে স্ট্রাপটা বদল করে সুদীপ সরাসরি লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর ডান হাতটা এখন অন্যত সতর্ক। লোকটা যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছে না। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

চট করে মুখ ফিরাল লোকটা। তারপর দ্রুত মাথা নেড়ে না বলল। ঢাঙা, রোগা লোকটার শরীরে তেমন শক্তি নেই। ময়লা পাজামা আর হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবির দু'তিন জায়গায় সেলাই-এর দাগ। সুদীপ একটু সাহস পেলে, 'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'না, মানে, একটু দরকার ছিল।' লোকটার গলার স্বরে বেশ অসহায় ভাব। 'আপনি আমাকে চেনেন?'

দ্রুত ঘাড় নাড়ল লোকটা, 'না, আমি তো এপাড়ায় থাকি না।'

'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

লোকটা মুখ নামাল। ঠিক কি উত্তর দওয়া উচিত বুঝতে পারছিল না যেন। সুদীপ বুঝতে পারল গোয়েন্দা হিসেবে লোকটা খুব ঝানু নয়। ওর খুব রাগ হচ্ছিল কিন্তু কিভাবে লোকটাকে বেশ শায়েস্তা করা যায় বুঝতে পারছিল না। এই সময় আর একটা গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে রে?'

সুদীপ তাকিয়ে দেখল সীতানাথ ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে। ভাল ক্রিকেট খেলে সীতানাথ, নিশ্চয়ই দৌড়াতে বেরিয়েছিল। ফাস্ট বোলার, বেশ রাগী। সুদীপ বলল, 'দ্যাখ না সীতানাথ, এই লোকটা কোন ধান্দা নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিচ্ছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বলল, 'না ভাই, আমার কোন ধান্দা নেই।'

সীতানাথ বেশ রুখু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কি জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন?'

লোকটার তেঁটি নড়ল, তারপর বলল, 'আমি একজনকে দেখতে এসেছি।'
সীতানাথ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে দেখতে এসেছেন? রাস্তায় দাঁড়িয়ে
দেখছেন?'

লোকটি মাথা নাড়ল দ্রুত, 'ঠিক রাস্তায় নয়। আসলে ওই ফ্ল্যাট বাড়িটার ও
আছে। বলেছিল পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে আসবে। তাই দাঁড়িয়ে আছি।'

সুদীপ ফ্ল্যাট বাড়িটার দিকে তাকাল। সম্প্রতি কন্ট্রাক্টর জমি কিনে ফ্ল্যাট
বানিয়ে বিভিন্ন মানুষকে বিক্রী করেছে। ওই ফ্ল্যাটগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে
পাড়ার লোকের তেমন জানাশোনা হওয়ার সুযোগ নেই। সে জিজ্ঞাসা করল,
'আপনি ওই ফ্ল্যাটেই গেলেন না কেন?'

'স্বাওয়া নিষেধ আছে। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।'

'সুদীপ, একে ছাড়িস না। পাড়াতে বহু দু নম্বরী চলছে, এ শালার কি ধান্দা
কে জানে! এই যে মশাই, বাংলা বলুন তো, ধান্দাটা কি?'

এই সময় ফ্ল্যাট বাড়ির শরীর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। আটপৌরে
পোশাক, সুন্দরী। তাকে দেখা মাত্র লোকটি চঞ্চল হয়ে উঠল, 'আমি যাই, ও
এসেছে।'

সীতানাথ বাধা দিল, 'দাঁড়ান। কে হন উনি আপনার; সাত সকালে পাড়ার
মেয়ে বউ-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন অথচ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকছেন।'

কথাটা শোনার হাসি পেল সুদীপের। এই মুহূর্তে সীতানাথকে বেশ পাড়ার
গার্জনে বলে মনে হচ্ছে। পাড়ার মেয়ে বউরা সজ্জাবেলায় ধ্যাষ্টামো করলে
দোষ নেই, ভোরবেলায় সেটা দৃষ্টিকটু। মেয়েটি খমকে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল।
তারপর দ্রুত পা ফেলে কাছে এল, 'কি হয়েছে বাবা?'

'কিছু না কিছু না। এখানে দাঁড়িয়ে আছি বলে এরা কারণ জানতে
চাইছিলেন।'

'তুমি কেন সাতসকালে এখানে দাঁড়িয়ে থাক? তোমাকে রোজ আসতে নিষেধ
করেছি না?'

'তোকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে খুকী।'

'এসো। ওদিকে হাঁটি। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।' মেয়েটি হাঁটিতে
শুরু করল।

লোকটি সুদীপের দিকে তাকাল, 'আমার মেয়ে। বড়ঘরে বিয়ে দিয়েছিলাম।
বরপণের টাকা পুরো মেটাতে পারিনি বলে আমার বাড়িতে আর পাঠায় না
ওর স্বামী। শরীর খারাপ হয়েছিল বলে ডাক্তার মনিং ওয়ার্ক করতে বলেছে।
জামাই আবার সকালে বিছানা ছাড়তে পারে না। তাই আমি এখানে এসে
দাঁড়িয়ে থাকি, মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। আমি যাব?'

সুদীপ হঠাৎ গলায় কোন স্বর পেল না। ও তাকিয়ে দেখল সীতানাথ হঠাৎ
দৌড়াতে শুরু করে দিল। লোকটার উদ্দেশ্যে ঘাড় নেড়ে সে হাঁটিতে শুরু
করল। নিজেই খুব খারাপ লাগছিল। খামোকা মানুষটাকে সে সন্দেহ

করল। এইভাবে সবসময় আতঙ্কিত থাকায় সব সরষের মধ্যে ভূত দেখার অভ্যাস হয়ে থাকে। তাকে হয়তো কেউ অনুসরণ করেনি, কেউ তার খোঁজ করেনি এই উদ্দেশ্যে অথচ সে সবসময় ছায়া দেখছে। ধরা যদি পড়তে হয় তাহলে একবারই পড়বে। এবং পড়ার আগে কিছু কাজ করে যাবে। সে আর একবার ফ্ল্যাট বাড়িরটার দিকে তাকাল। মেয়েটার স্বামী এখনো ঘুমোচ্ছে। এ শালাকে শেষ করে দেওয়া উচিত। বরপণের জন্যে বউকে বাপের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। সুদীপ মাথা নাড়ল। এরকম দেখলে দেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে এমন এমন মানুষ পাওয়া যাবে যাদের মেয়ে ফেলতে হয় এখন। আমরা বড় অপরাধগুলো দেখি, কিন্তু ছোট ছোট অপরাধগুলো জড়ো হয়ে যাওয়ায় বড় অপরাধগুলো শক্তি পায় প্রবল হতে। তাই সব পরিষ্কার করলেই দেশ নির্মল হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র সক্রিয় না হলে সেটা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সেটা আবার অসম্ভব। অতএব সীমিত সুযোগে বড় বড় অপরাধগুলোকেই টার্গেট করতে হবে। তার প্রতিক্রিয়া যদি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

সুদীপের আর ঘুম পাচ্ছিল না। সে সহজভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে প্যারাডাইসের কথা চিন্তা করল। ঠিক কতজন লোক মারা গেছে তাঁওর করা সম্ভব নয়। কিন্তু আশুন লেগেছে মারাত্মক, এত দ্রুত বৈদ্যুতিক আশুন যে চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে তা ভাবতে পারেনি সুদীপ। এইভাবে কেহ আহত না হয়ে প্যারাডাইসের কোমর ভেঙে ফেলতে পেরে খুব ভাল লাগছে না। ওর মালিক যখন আর কোনদিনই ফিরে আসবে না তখন ধরে নেওয়াই যায় প্যারাডাইস বন্ধ হল।

বাড়ির সামনে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। এখন অবনী তালুকদারের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনরকম ঝামেলা করার বাসনা নেই তার। অবনী তালুকদার যদি চেঁচামেচি করে কৈকিয়ত চায় তাহলে যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে এড়িয়ে যেতে হবে। যে কদিন এখানে থাকতে হবে সে কদিন অশান্তি করে কি লাভ!

এইসময় কাতিকদাকে দেখতে পেল সে। সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দেখলেই বোঝা যায় রাত্রি ঘুমায়নি। ওকে দেখে সামান্য নড়ল না পর্যন্ত। কাতিকদার পেছনে বাড়ির সদর দরজা আধভেজানো। সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, এখানে বসে আছেন?'

কাতিকদা নড়ল না। কিন্তু তার দুই চোখ জলে ভরে এল। সুদীপ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কাতিকদা। তার শরীর কাঁপছে, দুটো হাতে মুখ ঢাকা। সুদীপ অবাক হয়ে বাড়িটা এবং কাতিকদাকে দেখল। এবং তখনই কাতিকদা কোনমতে বলতে পারল, 'মা নেই, মা চলে গেল।'

'কে চলে গেল?' সুদীপ হতভম্ব।

‘মা। বাবু আমাকে বসিয়ে রেখেছে এখানে গাড়ি আসবে বলে।’

সুদীপের মাথাটা একপাশে সামান্য ঝুকল। ও যেন কথাটা বুঝতে চেষ্টা করল। মা নেই। মা মারা গেছে? এক লাফে কয়েকটা সিঁড়ি উপকেই সুদীপের খেয়ালে এল। হাতের ব্যাগ নিয়ে এইভাবে লাফালে উল্টো বিপত্তি ঘটতে পারে। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকল সে। নিচে কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে। আর তখনই অবনী তালুকদারকে দেখতে পেল। মায়ের ঘরের দরজার সামনে একটা বেতের চেয়ারে গালে হাত রেখে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি ভেতরের দিকে। সুদীপ যে উঠেছে তা তিনি খেয়ালই করলেন না। ব্যাগ দুটোকে টেবিলের ওপরে রেখে সুদীপ এগিয়ে গেল। এইবার ওকে দেখতে পেলেন অবনী তালুকদার। দেখে সোজা হয়ে বসতে বসতে আবার কি মনে করে আগের ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন। বাবাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে মায়ের ঘরে পা বাড়াল। এবং তখনই ধূপের গন্ধ পেল। মা শুয়ে আছেন। তাঁর চিবুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা।

‘আর কাছে গিয়ে কি হবে! যে চুলোয় রাত কাটালে সেখানে থেকে গেলেই হত।’

সুদীপের চোয়াল শক্ত হল। কিন্তু অবনী তালুকদারের কথার কোন জবাব দিল না। মায়ের মুখ কত পাল্টে গেছে। তার চেনা স্মৃতি, এমনকি জীবন্ত অবস্থায় শেষবার দেখা মানুষটির সঙ্গে এই মৃত দেহের কোন মিল নেই। যে চামড়াটুকু অবশিষ্ট আছে তা হাড়ের সঙ্গে লেপ্টে। এবং এখনও সেই বীভৎস পচা গন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে। মহিলা বেঁচে গেলেন। হঠাৎই এইরকম বোধ হল সুদীপের। সে মুখ তুলে নার্সকে জিজ্ঞাসা করল ‘কখন চলে গেছেন?’

‘রাত তিনটের সময়।’

‘যাওয়ার আগে জান ছিল?’

‘না।’

এই সময় সুদীপ পায়ের শব্দ পেল। অবনী তালুকদার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, ‘কি জানতে চাইছ তুমি। না, তোমার সম্পর্কে কোন কথা জানতে চাননি যাওয়ার আগে।’

‘আপনি ছিলেন সে সময়?’

‘থাকব না? সতীসাবিত্রী চলে যাচ্ছে সেই পবিত্র সময়ে থাকব না? আমি আজ লক্ষ্মীহীন হলাম। সে আমার লক্ষ্মী ছিল। ও হো!’ শেষদিকে গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল অবনী তালুকদারের।

সুদীপ আবিষ্কার করল, তার চোখে জল নেই, কান্না পাচ্ছে না মোটেই। অথচ এইরকম সময়ে মানুষেরা কান্নাকাটি করেই। নিজের মা চলে যাওয়ার পর তার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সন্তানের কান্না তো স্বাভাবিকই। এইসময় অবনী তালুকদার বিছানার একপাশে বসে হাটু হাটু করে কাঁদছেন। সুদীপ

নার্সকে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। একটু আগে এসেছিলেন।'

সুদীপ বেরিয়ে যাচ্ছিল, অবনী তালুকদার ডাকলেন, 'কোথায় যাচ্ছে?'

'আজীবন স্বজনকে খবর দিতে।'

'কেন?'

'শ্মশানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না?'

'না। ও ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

'তার মানে?'

'আমি হিন্দু সংস্কার সমিতির ফোন করে দিয়েছি। ওরা গাড়ী নিয়ে আসছে।'

'পাড়ার মানুষ, আজীবনদের কেউ জানে না তো।'

'পরে জানবে। এখন দলে দলে লোক এসে নাচতে নাচতে শ্মশানে যাবে আর আমাকে ওদের গাঙুপিঙু খাওয়াতে হবে! এসব বাজে খরচ করার কোন দরকার নেই।'

'চমৎকার।'

'উঁহঁ! ব্যঙ্গ করে আমার সঙ্গে কথা বল না। আমি জানি কখন কি করতে হবে আমাকে।'

সুদীপ আর একবার মায়ের দিকে তাকাল। এখন ছাল ছাড়ানো পোড়া কাঠের মত লাগছে। সে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে ব্যাগ দুটো নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। এবং তখনই সমস্ত শরীরে একটা ঝিমুনি ছড়িয়ে পড়ল তার। বিছানায় বসে সে দুহাতে মুখ ঢাকল। তারপর চকিতে মনে পড়তেই তার পড়ার টেবিলের পেছনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকাল। ছোট সুদীপ দুহাতে মাকে জড়িয়ে হাসছে। মায়ের মুখে তখন স্বর্গীয় তৃপ্তি। কাছে উঠে এল সুদীপ। ও ঘরে যে শুয়ে আছে তার সঙ্গে এই শরীরের কোন মিল নেই। হাত বাড়িয়ে মায়ের ঠোঁটে আঙ্গুল রাখল সে! এবং তখনই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে জলপ্রোত ছিটকে এল। আচমকা কান্নায় ভেঙে পড়ল সুদীপ।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এগার নম্বর ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিল আনন্দ। কল্যাণ প্রথমে ভেবেছিল বাড়ি যাবে পরে মত বদলানো। কলেজ রোর মুখের একটা চায়ের দোকান তখন খুলে গেছে। ওরা সেখানে চা খেল। তারপর ধীরে ধীরে হোস্টেলের দিকে পা বাড়াল। কলেজ স্কোয়ারের সামনে এসে আনন্দ বলল, 'এত ভোরে হোস্টেলে ঢোকা ঠিক হবে না। চল, কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসে কিছুটা সময় কাটিয়ে দিই।'

'তুই আমাদের বাড়িতে মাঝি? কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার বাড়িতে?' আনন্দ কিছুটা অরাক। কল্যাণের বাড়ির গল্প তারা শুনেছে।

কিন্তু কোনদিন যাওয়ার আমন্ত্রণ পায়নি। একটু আগে বাড়িতে ফিরবে বলে কল্যাণ নিজেই ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিল।

‘আমার বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এই যে একটা রাত বাইরে কাটিয়ে এলাম তা নিয়ে বাবা ছাড়া কেউ কোন প্রশ্ন করবে না। উত্তর যা দিই তাই মনে নেবে। ওই বাড়িতে আর ফিরব না বলেই বেরিয়েছিলাম। এক এক সময় মনে হয় কি জানিস, আমি যদি প্রচুর রোজগার করতে পারতাম, যদি বাড়ির কারো কোন অভাব রাখতাম না তাহলে হয়তো মানুষগুলোয় ব্যবহার পালেট যেত। কিন্তু আমার যা অবস্থা তাতে কোনদিন বড় চাকরি পাব কিনা তাই সন্দেহ ছিল। আর এখন —।’

‘এখন?’

‘তোকে কাল বলিনি, আমি একটা লোকের মাথা লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিলাম। এই আমি কোনদিন বোমা ছুঁড়তে পারব বলে ভেবেছিলাম! কিন্তু লোকটা তোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল বলে স্থির থাকতে পারলাম না। পুলিশ যদি ধরতে পারে তাহলে ফাঁসি হয়ে যাবে, নারে?’

‘আগে ধরুক তারপর চিন্তা করা যাবে। চল তোর বাড়িতেই যাই। এই ভোরে তোর সঙ্গে আমাকে হোস্টেলে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করতে পারে। বিশেষ করে আমাদের গ্রামেই যখন ঘটনাটা ঘটেছে। তোর কাছে রেডিও আছে?’

‘কেন?’

‘সকালের খবর শুনব। কাগজে নিশ্চয়ই ছাপার সুযোগ পাবে না।’

‘আমার ভাই-এর একটা ট্রানজিস্টার আছে।’

আবার ট্রামে চেপে ওরা শ্যামবাজার চলে এল। বস্তি এলাকা বলেই সাতসকালে রাস্তায় লোকজন। ওরা নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকল। একজন মহিলা বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলেন। কল্যাণ বলল, ‘আমার বড় বউদি। আজ সাতসকালে কেন উঠেছে বুঝতে পারছি না।’ একজন রুদ্ধ ভদ্রলোক খালি গায়ে রকে বসেছিলেন। ওদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় ছিলে সারারাত?’

‘কাজ ছিল। এর সঙ্গে ছিলাম। আমার বন্ধু!’

ভদ্রলোক কিছু বললেন না। নিজের ঘরে ঢুকে কল্যাণ বলল, ‘আমার বাবা। এই ঘরে আমার ছোট ভাইও থাকে। মনে হচ্ছে গত রাতে সে ফেরেনি। চেয়ারটায় বস, আমি বিছানাটা পরিষ্কার করছি। মুখটুখ ধুবি নিশ্চয়ই! একটু দাঁড়া। হাওয়াটা কি রকম দেখে আসি।’

কিছুক্ষণ পরে কল্যাণের ভাই-এর ট্রানজিস্টারে বাংলা খবর শুনল ওরা। কিছু অসার খবরের পর সংবাদ পাঠক পড়লেন, ‘গত রাত্রে ডায়মণ্ড হারবার রোডের একটি স্বাস্থ্যনিবাসে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যনিবাসের মালিকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। যাওয়ার আগে ডাকাতরা আগুন ধরিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ ভস্মীভূত স্বাস্থ্যনিবাসটিকে ধ্বংস করার পেছনে ডাকাতদের কোন

উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ ব্যাপক তল্লাসী চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনজনকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ নিশ্চিত এটা কোন উগ্রপন্থীদের কাজ নয়।
আনন্দ বলল, 'দরজাটা বন্ধ কর, একটা লম্বা ঘুম দেব।'

॥ ১১ ॥

শ্মশান থেকে বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে গুম হয়ে বসেছিল সুদীপ। একটি মানুষ যিনি তাকে এই পৃথিবীতে এনেছিলেন, যার সঙ্গে তার শৈশব, বাল্যকাল এবং কৈশোর কেটেছে তাঁকে বিদ্যাৎচল্লীতে চুকিয়ে ছাই করে দিয়ে এসেও বুক ভেঙ্গে পড়ছে না, টিংকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে না। তার বদলে বারংবার মনে হচ্ছে, ভালই হল, খুব ভাল, তিনি তো এই চেয়েছিলেন। সুদীপ নিজেকে বুঝতে চাইছিল। সে কি নির্মম হয়ে গেছে খুব? স্নেহভালবাসার সুতোগুলো কি পচে গেছে? মায়ের শরীরটা ছাই হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এই কথাটা মাথায় পাক খাচ্ছিল।

কণ্ঠেরও কি একটা ব্যস থাকে। যেই সেই সীমাটা পেরিয়ে যায় অমনি তার ধার-ভার সব লোপ পায়? যার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক, যার জন্যে জীবন দিয়ে দেওয়া যায় সে যখন অসুস্থ হয় তখন ব্যাপিয়ে পড়তে যে ইচ্ছে করে সেই ইচ্ছেটাকে কেন সময় ঠুকরে ঠুকরে খায়? কখন যে ভালবাসা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তাই বোঝা যায় না বলেই গ্লানিবোধ বড় অনুভূত হয় না। সুদীপ এই নিয়ে আর ভাবতে পারছিল না। মাকে দাছ করে এসেও তার কান্না পাচ্ছিল না। মা নেই, কোনদিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না এই ভাবনাটাও মাথায় আসছে না। তবে কি মানুষের মনে একটি অংশ একদম অসাড়? সম্পর্কগুলো যখন সেখানে এসে পৌঁছায় তখন এমনই হয়! এই সময় কান্টিকদা এসে জানাল তার ফোন এসেছে।

উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কথা বলতেও না। ঠিক শোক থেকে নয়, সব মিলিয়ে কিছুই ভাল লাগছিল না তার। সুদীপ বাইরে এসে ফোন ধরতেই জয়িতার গলা গুনতে পেল, 'ঘুমাচ্ছিলি।'

'না। কি ব্যাপার?'

'কিছু না। বাড়িতে কেউ নেই। মা এবং বাবা বলে যাদের ডেকে এসেছি এতকাল—তারা কলকাতার বাইরে। আমি কাল ছিলাম না তার খোঁজ নেবার কেউ নেই। তোর।'

'আমার মানে?'

'কিছু বলেছে কেউ?'

'আমি বলাবলির বাইরে।'

'রেডিও শুনেছিস?'

‘না, কেন?’

‘খবরে বলল। ওরা কি করে খবর বানায় আজ বুঝতে পারলাম। হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তবে আমরা যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে।’

হঠাৎ সচকিত হল সুদীপ, ‘ইটস অলরাইট। সামনাসামনি দেখা হলে এ ব্যাপারে কথা বলব।’

‘তোর মাথায় ওষুধ দিয়েছিস?’

‘ভুলে গিয়েছিলাম। ছাড়ছি।’

‘ভুলে গিয়েছিলাম। মানে? ডোন্ট টেক রিস্ক সুদীপ। এখনই ওষুধ লাগা।’

‘সময় পাইনি রে। বাড়িতে এসে দেখলাম মা মারা গেছেন। এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরছি আমরা। রাখছি, বিকেলে দেখা হবে।’ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সুদীপ।

হল ঘরটায় কেউ নেই। এই ভরদুপুরে কোন শব্দও নেই। সুদীপের খিদেও পাচ্ছিল না। এখন ঠাণ্ডা জলে শরীর ডুবিয়ে স্নান এবং তারপর লম্বা ঘুম একমাত্র কাম্য। অবনী তালুকদারের ঘরের দিকে তাকাতে সে। মায়ের শরীর বলে যা অবশিষ্ট ছিল তা চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়ামাত্র ভদ্রলোক হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন। অসুস্থ অবস্থায় শ্মশান নিশ্চয় বড় ভীতিকর জায়গা। তড়িঘড়ি গাড়িতে চেপে বসেছিলেন কাতিকদাকে ভর দিয়ে। বড় দায় চুকে গেল ওঁর। এখন ফ্রি ম্যান। কিন্তু এই বয়সে এত বড় বাড়ি, প্রচুর টাকা, (আয়কর বিভাগ তছনছ করার পরও), ভদ্রলোক বোধহয় কখনই একা বোধ করবেন না। টেবিলের পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে আজকের কাগজটা তুলল সে। না কোথাও নতুন খবর নেই। ভারতবর্ষে রাজ্য যা হয়ে থাকে তাই ছাপা হয়েছে পাতায়। সেই কংগ্রেসের ঝগড়া, সি পি এমের হুক্কার, রেগনের বিব্রতি, রাজীবের প্রশস্তি। একবছর আগের কাগজটা যদি হুবহু ছেপে আজ বের করা হত তাহলে কোন প্রভেদ বুঝতে পারত না কেউ। জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন রাজীব। তার নিচেই সংবাদদাতা লিখেছেন কোন এক কেন্দ্রীয় অফিসের সদর দপ্তর কি বিহারে উঠে যাবে কলকাতা ছেড়ে? যেন বিহার আর একটা দেশ? দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছোট্ট একটি সংবাদ আছে। নকশালপন্থী সন্দেহে চারজন যুবককে গিটিয়ে হত্যা করেছে জনসাধারণ। পরে পুলিশ আরও দুজনকে গুলি করে মেরেছে; তাঁঁটি কামড়াল সুদীপ। ঘেয়ো কুকুর, কুখ্যাত ডাকাত, নারী ধর্ষণকারী লম্পট আর নকশালদের মধ্যে যেন কোন ফারাক নেই—এমন ভাব সংবাদদাতার। আনন্দ এই দেশের মানুষের মনে বিবেকবোধ জাগাতে চায়, তাদের প্রতিবাদ করার রাস্তাটা চিনিয়ে দিতে চায়। কাদের? যেসব ছেলোমেয়েরা একান্তরে গুলি খেয়ে মরেছিল একটার পর একটা ভুল করে তাদের ভূমিকা ছিল তো দখীচীর। কিন্তু এখনও এতবছর পরে গ্রামগঞ্জে যারা তাদেরই অনুপ্রেরণায় কাজ করছে তারা

তো মূর্তি ভাঙছে না জোতদারের গলা কাটছে না। তাহলে তাগের ডাকাত ভাবার কি কারণ আছে? কেন তারা গ্রামবাসীর সহানুভূতি পাচ্ছে না? খবরের কাগজগুলোর ভূমিকা না হয় বোঝা গেল! সুদীপ চোখ বন্ধ করল। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ডায়মণ্ডহারবার রোডে পুলিশ গিজগিজ করছে, রিপোর্টাররা ছুটোছুটি করছে। আগামীকালের কাগজে যখন খবরটা বের হবে তখন জনসাধারণের কি প্রতিক্রিয়া হবে?

এই সময় নার্স ভদ্র মহিলাকে অবনী তালুকদারের ঘর থেকে বের হতে দেখল সে। ওঁর হাতে কাঁচের জাগ, তাতে জলের তলানি। চোখাচোখি হতেই ভদ্রমহিলা মাড় কাত করে হাসলেন। সুদীপ অবাक হল। মা চলে যাওয়ার পরও ভদ্রমহিলার ছুটি হয়নি? সে দেখল নার্স তার দিকে এগিয়ে আসছেন, 'উনি ভাল আছেন।'

'কে?' সুদীপের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

'আপনার বাবা। ডাক্তার এসেছিলেন। শক থেকে হয়েছে, রেস্ট নিতে বলেছেন।'

'ও।'

'আমি ভেবেছিলাম আজ চলে যাব। কিন্তু আপনার বাবা আরও কিছুদিন থেকে যেতে বলেন। বয়স্ক মানুষ, আর এই সময়—!' তারপর মুখ ফিরিয়ে ভদ্রমহিলা, 'কার্তিক, কার্তিক' বলতে বলতে আড়ালে চলে গেলেন।

সুদীপের এবার মজা লেগেছিল। মা যতদিন বিছানায় শুয়েছিলেন ততদিন এরকম সক্রিয় ছিলেন না মহিলা। যেন হঠাৎ কতৃৎ পেয়ে গেছেন এমন উজ্জ্বল হয়ে গেছে চোখমুখ।

একটু পরেই কার্তিকদা সামনে এসে দাঁড়াল, 'চা খাবে?'

'একটু পরে, স্নান করে নিই।'

'হবিষ্য করবে কখন?'

'হবিষ্য?'

'এখন তো তোমাকে তাই খেতে হবে কাজ না হওয়া পর্যন্ত।'

'কেন?'

'তাই নিয়ম, হিন্দুদের তাই করতে হয়।'

'আমি যা খাই তাই খাবো।'

'কি বলছ তুমি?'

'তোমার সঙ্গে বাগড়া করতে চাই না কার্তিকদা। মা চলে গিয়ে যে ভাল হয়েছে তা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। আর ভাল আমাদেরও। যে মানুষটার থাকাকাটাই আমরা চাইছিলাম না তাঁর চলে যাওয়ার জন্যে লোক দেখিয়ে শোক করতে হবে কেন? আমি ওসব করলে মা মোটেই সুখী হতেন না। কারণ তিনি মরে যেতে চাইতেন। তাছাড়া, এতকাল হিন্দুধর্মের কোন কিছু মানলাম না, ধর্ম ছাড়াই তো বেশ বেঁচে আছি, কোন অসুবিধে হচ্ছে না,

তখন আজ ধর্মের চোখ রাঙানো মানবো কেন! ওসব তুমি তোমার বাবুকে করতে বল। ভগ্নামিটা উনি ভালই জানেন।' একটানা কথাগুলো সে কাঠিকদাকে বলল না নিজেকে শোনাল তা তার কাছেই স্পষ্ট নয়।

ঘরে এসে জামা কাপড় ছেড়ে উদ্যম হয়ে বাথরুমে ঢুকল সে। শাওয়ারটা খুলে দিয়ে দেওয়াল আয়নার দিকে তাকাল। তার স্বাস্থ্য সুগঠিত, কোথাও মেদ নেই, মুক্ত শরীর থেকে এক ধরনের ভিজে আভা বের হচ্ছে। রুটির ধারার মতো জলের ফোঁটা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে নরম আদরের মতো। কিছুক্ষণ নিজের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল সুদীপ। গতরাত্রে কি সহজে এই লোকটা মানুষ খুন করে ফেলল! কোনরকম প্র্যাকটিস ছাড়াই খুন করতে একটুও হাত কাঁপেনি। নিজেকে খুঁচী মনে হচ্ছে কি? নিজের ঠোঁটেই এক রহস্যময় হাসি দেখল সে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সুদীপ তা সে জানে না, কিন্তু এমন মড়ার মতো ঘুম অনেকদিন ঘুমায়নি। চোখ মেলে সে দেখল ঘরে ঘন ছায়া এবং প্রচণ্ড খিদে শরীরে। পাঞ্জাবিটা শরীরে গলিয়ে সে ব্যাগ দুটোর দিকে তাকাল। এখনও ওদুটো ভারতীয় পুলিশের কাছে আতঙ্কের বিষয়। ধরা পড়লে চূড়ান্ত ঝামেলায় ফেলতে অসুবিধে হবে না। এগুলোকে বাড়িতে রাখা উচিত নয় কিন্তু রাখার তো তেমন জায়গাও নেই। কাঠিকদাকে ডাকার জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েই সে দেখল অবনী তালুকদার ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে নার্স কিছু কথা বলছেন। অর্থাৎ একদিনের মধ্যেই ভরলোক বিছানা ছেড়ে বাইরের ঘরে আসতে সমর্থ হয়েছেন। সুদীপের সন্দেহ ছিল এখন আরও সত্য বলে মনে হল, শরীরের বাহানা দেখিয়ে অবনী তালুকদার শ্মশান থেকে কেটে পড়েছেন। সে চিৎকার করে কাঠিকদাকে ডাকতেই অবনী তালুকদার মুখ ফেরালেন।

'সুদীপ! এদিকে এসো।' গলার স্বরে নখ আঁচড়ানোর শব্দ পেল সুদীপ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। নইলে তোমায় ডাকব কেন!'

সুদীপ কয়েক পা এগিয়ে যেতেই মায়ের ঘরের দরজাটা দেখতে পেল। অবনী তালুকদার সেই শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। আপাদ-মস্তক সময় নিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'তুমি মাতৃদায়গ্রস্ত!'

'না। আমি মাতৃদায়মুক্ত। অবশ্য যে ভাবে মা ছিলেন তাকে যদি দায় মনে করা যায়।'

'তুমি কি বলতে চাও?'

'কিছু না। আপনিই বোধহয় কিছু বলবেন বলে আমার ডেকেছিলেন।'

অবনী তালুকদার ছেলের মুখের দিকে এক পলক তাকালেন। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'তোমার মা আমার কতখানি ছিল তা তুমি জানো না।

অমন সতীন্দ্রী আমি জীবনে দেখিনি। আমাদের সব অসুখ তিনি একাই ঙ্গোণ করে গেলেন। আমি তার মৃত্যু নিয়ে হইচই করতে চাইনি। পাঁচভুতে এসে ঢুক ঢুক করে সহানুভূতি জানাবার নাম করে লুটেপুটে থাকে এটা তোমার মা পছন্দ করত না। কিন্তু পুত্র হিসেবে তোমার কর্তব্য আছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যা যা করণীয় বলে স্থির করা আছে তাই কর।’ সুদীপ ঘাড় নাড়ল, ‘মা বেঁচে থাকতে যখন কোন কর্তব্যই আমি করতে পারিনি তখন—’

‘চোখের সামনে উনি আপনার ব্যবহারে যন্ত্রণা পাচ্ছেন দেখেও আমি তাকে সেটা পেতে দিয়েছিলাম।’

‘সুদীপ!’

‘চিত্কার করে কথা বলবেন না। এখনও আপনার নার্সের প্রয়োজন হচ্ছে।’

‘তুমি, তুমি আমাকে অপমান করছ!’ সোজা হয়ে উঠে বসলেন অবনী তালুকদার।

সঙ্গে সঙ্গে নার্স ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ‘আপনি এত উত্তেজিত হবেন না। আপনার এখন রেস্ট প্রয়োজন।’

একটা হাত নেড়ে মাছি তাড়ালেন অবনী তালুকদার, ‘ছাড়ো তো তোমার রেস্ট। এমন কুলঙ্গার পুত্রের মুখদর্শন করাও পাপ। শোন, এ বাড়িতে থাকতে হলে তোমাকে অশৌচ পালন করতে হবেই। শ্রাদ্ধটা তুমি না-হয় কালীঘাটে গিয়ে করে আসতে পার কিন্তু আজ থেকে হবিষ্যি খাও গলায় কাছা নাও। দিস ইজ মাই অর্ডার।’

‘পারলাম না।’

‘মানে?’

‘আপনাকে খুশী করতে পারলাম না।’

‘আচ্ছা! দেন গেট আউট! আমি জানবো আমার স্ত্রী স্বর্গে গেছেন, আমার পুত্র মারা গেছে। আমি এখন থেকে একাই থাকবো, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।’ তারপর নার্সের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, ‘আমি এবার রেষ্ট নেব, বুঝলে। আমার একটু ঘুম দরকার।’ অবনী তালুকদার ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে যেন টলে গেলেন, হাত বাড়িয়ে নার্সের কাঁধ আঁকড়ে ব্যালেন্স রাখলেন। মহিলা পরমমমত্রে অবনী তালুকদারকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

সুদীপ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। কাঠিকদা বোধহয় অবনী তালুকদারের জন্যেই এতক্ষণ সামনে আসতে সাহস পাচ্ছিল না, এবার এগিয়ে এল, ‘ডাকছ?’

‘না। থাক। যে জন্যে ডাকছিলাম তার আর দরকার নেই।’

‘শোন, বাবুর ওপর রাগ করো না। তুমি তো ওঁকে জানো। সারাদিন কিছু খাওনি, একটু সরবৎ আর মিষ্টি এনে দিই। আর তোমাকেও বাপু আমি

বুঝতে পারছি না। মা মারা গেলে সন্তান কাছা নেবে না ?’

‘আমার মা অনেকদিন আগে মারা গিয়েছিলেন কাঠিকদা, আজ দাহ করা হল তাঁকে। আমি নিজের মন থেকে যা সাড়া পাচ্ছি না তা করতে পারব না। তোমাকে আর সরবৎ আনতে হবে না। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যেতেই হ’তো, ওই উদ্রলোক যাওয়াটা সহজ করে দিলেন।’ সুদীপ টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেল।

কাঠিকদা ছুটে এল, ‘চলে যাচ্ছে মানে ?’

ঘুরে দাঁড়াল সুদীপ, ‘আমি আর এই বাড়ীতে থাকছি না। তুমি তোমার বাবুকে হবিষ্য করতে বল।’

‘বাবুর শরীর খারাপ, ডাক্তার পথ্য ঠিক করে দিয়েছেন।’

সুদীপ হেসে ফেলল। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে নাম্বার ঘোরাতে লাগল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল কাঠিকদা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। পায়ের শব্দে তার চলে যাওয়াটা টের পেল সে। তিনবার ডায়াল করেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সুদীপ। কলকাতার টেলিফোন সিস্টেমটাকে নতুন করে চলে না সাজালে জনসাধারণের উপকারে লাগবে না কখনই। ঠিক এই সময় নিচে বেল বাজল। সুদীপ নিজের ঘরে ফিরে এল।

চটপট ব্যাগ দুটোয় জিনিসপত্র পুরে নিল আবার। তার কাছে এখনও যা টাকা আছে সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু অবনী তালুকদারের ওই কথার পর আর এই বাড়িতে থাকা উচিত নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি বোলাতে গিয়ে সে ছান্না দেখল। চমকে ফিরে সে দরজায় জয়িতাকে দেখতে পেল। জয়িতার মুখ গভীর, দৃষ্টি উদ্ভিন্ন। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘কখন হল ?’

‘কাল রাত্রে। সকালেই দাহ হয়ে গেছে।’

ঠোঁট কামড়াল জয়িতা। তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় বসে মুখ নামাল।

সুদীপ জয়িতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার কি হল ?’

‘মানে ?’

‘তুই অমন শোক-শোক মুখ করে বসে পড়লি কেন ?’

‘তোমার কষ্ট হচ্ছে না সুদীপ ?’

‘আমি জানি না।’ সুদীপ পলকেই ঘুরে চুল আঁচড়ানো শেষ করল, ‘হঠাৎ এলি ?’

‘খবরটা শুনে মনে হল আমার আসা উচিত। তোমার নাম্বার সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার কথা বলেছিলাম, মনে আছে ? সেদিন তোকে বলেছিলাম আমার মা যদি এরকম হত !’ জয়িতা হঠাৎ কেঁদে ফেলল। এই কান্নাটার জন্যে ও মোটেই তৈরি ছিল না। এমন আচমকা শরীর কাঁপিয়ে জল তেউ হয়ে নামবে চোখে তা কে জানত।

সুদীপ ঠোঁট কামড়ালো, ‘স্টপ ইট জয়, আই ডোন্ড নিড ইট !’

‘তোমার কণ্ঠ হচ্ছে না?’

‘না। আমি কাঁদব না, আমি কোন নিয়ম মানব না। যে মানুষটার জন্যে জীবিত অবস্থায় কিছু করতে পারিনি তার মৃত শরীরটার কথা ভেবে চোখে জল ফেলাটা একধরনের হিপোক্রেসি। লেটাস গো। তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। ওদের একটা খবর দেওয়া যাবে।’ সুদীপ ব্যাগ দুটো তুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

‘কোথায় যাচ্ছিস?’ পুরো ব্যাপারটা সহজে নিতে পারছিল না জয়িতা।

‘এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। তুই বস, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।’ বড় বড় পা ফেলে হলমারে চলে এল সে। তারপর মায়ের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ঘরের মেঝেতে একটা প্রদীপ জ্বলছে। একটা তীর গঙ্গ বের হচ্ছে ধূপ থেকে। মায়ের জিনিসগুলো চোখে পড়ল না। ধীরে ধীরে আলমারিটার কাছে এগিয়ে গেল সে। হাতলটা ঘোরাতেই সেটা আটকে গেল। চাবি দেওয়া আছে। চাবিটা এতকাল মায়ের কাছে ছিল।

মায়ের ঘর থেকে সোজা অবনী তালুকদারের দরজায় চলে এল সুদীপ। অবনী তালুকদার শুয়ে আছেন। আর তার মাথার পাশে বসে নার্স রামকৃষ্ণ কথামূত পড়ে শোনাচ্ছেন। ওকে দেখতে পেয়ে শুভ্রমহিলা পড়া থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। তাতে মনোযোগ নষ্ট হল অবনী তালুকদারের। চোখ খুলে তিনি পুত্রকে দেখতে পেলেন। সুদীপ বলল, ‘চাবিটা দিন।’

‘চাবি? কিসের চাবি?’

‘মায়ের আলমারির।’

‘সে চাবি নিয়ে তোমার কি হবে?’

‘আমার জন্যে কিছু জিনিস মা রেখে ছিলেন। যাওয়ার সময় সেগুলো নিয়ে যাব।’

‘কোন জিনিস তোমার জন্যে তোমার মা রাখেননি!’

‘ঠিক বলছেন না। বিয়ের সময় তিনি বাপের বাড়ি থেকে যা এনেছিলেন সেটাই আমার জন্যে রাখা ছিল। আপনার দেওয়া কোন সম্পদ আমি নিতে আসিনি।’

‘বাপের বাড়ি থেকে এনেছিলেন?’ নাম দিয়ে শব্দ বের করলেন অবনী তালুকদার, ‘তারা যে কত দেবার ক্ষমতা রাখতেন তা তোমার মা ভাল জানতেন। কিছু হবে না। কোন জিনিস তুমি এ বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাকে তিনদিন সময় দিলাম তার মধ্যেই ব্যবস্থা করো।’

‘অত কষ্ট দেব না আপনাকে। আমি আজই চলে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে মায়ের আলমারির চাবিটা আমি চাই। উনি সব গয়না আলাদা করে তার উপর লিখে রেখেছিলেন কাকে কি দেবেন। যদি আমার নামে কিছু লেখা না থাকে তাহলে আমি আপনার কথা মেনে নেব।’

‘তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে?’

‘না ভদ্রভাবে অনুরোধ করছি।’

‘যে মায়ের কাজ করতে চাইছ না তার গয়না চাইতে লজ্জা করছে না?’

‘না। আমি কোন অন্যায় করছি না। চাবিটা দিন।’

‘গয়নাগুলো আমার কাছে নেই।’

‘কোথায় আছে সেগুলো?’

‘এখনও ইনকামট্যাক্সেই জমা আছে। কেস চলছে।’

‘এতদিন ধরে ওরা আটকে রাখবে কেন? ওগুলো তো বেআইনী গয়না নয়।’

‘কোন প্রমাণ নেই যে তোমার মা বাপের বাড়ি থেকে পেয়েছিল। আমাকে তো কোনদিন দেখতে দেয়নি তাই আমার রিটার্নে ডিক্লেয়ার করাও ছিল না। আর এইসব কৈফিয়ৎ তোমাকে আমি দিচ্ছি কেন!’

‘কোন অফিসে আপনার ইনকামট্যাক্স হয়?’

‘কেন?’

‘আমি সেখানে গিয়ে খোঁজ নেব।’

‘সার্চ অ্যাণ্ড সিজার কেস হয় যেখানে সেখানে আমার নাম বললেই জানতে পারবে। মামার বাড়ি উনি গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ইনকামট্যাক্স ওকে সব খুলে দেখাবেন!’

‘আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি খোঁজ নেব। যদি ওরা অন্য কথা বলে তাহলে আমার কোন কাজের জন্যে আমি দায়ী থাকব না। আমি আমার মায়ের নিজস্ব গয়নাগুলো চাই।’

‘কি করবে নিজে?’

‘আর যাই করি আপনার মত শঙ্ক হয়ে থাকব না।’

সুদীপ আর কথা না বলে বেরিয়ে এল। জয়িতা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাগ দুটে তুলে সুদীপ বলল, ‘চল।’

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘কি হয়েছে।’

‘বাইরে বেরিয়ে বলব, এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।’

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সুদীপ। জয়িতা দেখল নিচের দরজায় দাঁড়িয়ে কাতিকদা জিজ্ঞাসা করল, ‘কবে আসবে?’ সুদীপ কোন জবাব দিল না।

রাস্তায় নেমে সুদীপ যেন আচমকাই সহজ হয়ে গেল। জয়িতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘আমার খুব খিদে পেয়েছে। কাল রাত্রে আনন্দের বাড়ির পর আর খাইনি। চল, ওখানে একটা চাইনিজ দোকান আছে, পেট পুরে চাইনিজ খাই।’

‘আমার খিদে পায়নি।’

‘তোকে খেতে বলিনি আমি।’ বলেই মতটা পাল্টাল সুদীপ, ‘নাঃ, এখন বেশি খরচ করা উচিত হবে না। এখানে আয়।’ ফুটপাথের ওপর একটা দোকানে

খাবার বিক্রি হচ্ছে। মাঝারি ভিড় আছে সেখানে। একটা বেঞ্চির কিছুটা জায়গা দখল করে সুদীপ জয়িতাকে বসতে ইশারা করে চারটে পরোটা আলুরদম আর দুটো চা দিতে বলল চৌঁচিয়ে। জয়িতা লক্ষ্য করল যারা এখানে আছে তাদের অধিকাংশই বিহারের মানুষ এবং শ্রমিকশ্রেণীর। তারা অশুভ্রুত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্যান্ট পরা কোন মেয়ে এইরকম পাড়ায় ফুটের দোকানে খেতে আসতে পারে এমনটা বোধহয় ওদের কল্পনার বাইরে ছিল। সে একটু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল। সুদীপ ইচ্ছে করেই এখানে আছে। চোখে লাগাবার জন্যেই, কিন্তু এই নিয়ে রসিকতা করার নোভটা সে সংবরণ করল।

খুব আরাম করে পরোটাগুলো খেল সুদীপ। তারপর চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বলল, 'কলকাতার খুনোয় দারুণ একটা মশলা আছে বুঝলি, তরকারির টেস্টই পাল্টে দেয়। আগে ভাবতাম এইসব খাবার খেলে পেট খারাপ করবে। ফোর্ট। যারা খায় না তাদের জন্যে আমার করুণা হয়। সারা জীবন পিটপিটিয়ে কাটাল তারা।'

চায়ের কাপ দেখেই অস্বস্তি হয়েছিল, সুতোর মত ফাটা দাগ ওপর থেকে নিচে নেমে গেছে। চুমুক দিয়েই শরীর গুলিয়ে গেল জয়িতার। এমন অখাদ্য চা সে কখনও খায়নি। বিটকেল গন্ধ বের হচ্ছে। সে কাপটা নামিয়ে রেখে আড়চোখে সুদীপকে দেখল। দুবার চুমুক দিয়েছে সুদীপ। এবার নামিয়ে রেখে হেসে ফেলল সে, 'বুঝলি জয়, সমস্যা লাগবে, রাতারাতি তো এসবে অভ্যস্ত হওয়া যায় না।' তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল সে, 'তুই তখন জিজ্ঞাসা করছিলি মায়ের মৃত্যুতে আমি কেন শোকগ্রস্ত নই, কেন বাড়ি থেকে চলে এসেছি—এইসব। ব্যাপারটা হল—' 'সুদীপ প্লিজ।' তাকে থামিয়ে দিল জয়িতা। 'আমি আর কারণগুলো জানতে চাইছি না। তুই নিশ্চয়ই ভাল মনে করায় করেছিস। তোর নিজের কাছে যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে আর কিছু বলার নেই। অতএব এই প্রসঙ্গ থাক। এখন বল, তুই কোথায় থাকবি?'

অবাক হয়ে জয়িতার দিকে তাকাল সুদীপ। জয়িতা যে এমন দ্রুত নিজেকে পাশ্চাত্যে পারে তা সে জানত না। কদিনের মধ্যেই মেয়েটা যেন গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছে। জয়িতা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁ করে কি দেখছিস?' 'কিছু না। আমি কোথায় থাকব ঠিক করে বের হইনি। ভাবছি আনন্দর হোস্টেলে চলে যাব। ওদের ওখানে গেস্ট হয়ে কিছুদিন থাকা যায়!' সুদীপ পয়সা মিটিয়ে দিল।

'আমার মনে হয় ওখানে তোর না থাকাটাই উচিত হবে।'

'কেন?'

'তোর আর আনন্দর একসঙ্গে থাকা উচিত নয় তাই।'

সুদীপ ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর নীরবে মাথা নাড়ল, 'ঠিক বলেছিস।

আমি অবশ্য আর এক জায়গায় যেতে পারি কিন্তু ওখানে গেলে দিনের বেলায় রোজ বের হওয়া যাবে না।’

‘কোথায়?’

‘আমার সেই বুদ্ধা আত্মীয়র ওখানে।’

ওরা হাঁটছিল। বিকেল এখন ঘন। যে কোন মুহূর্তেই টুক করে সন্ধ্যা নেমে পড়বে। ঘড়ি দেখল জয়িতা। তারপর হাত নেড়ে একটা ট্যান্ডি দাঁড় করাল। সুদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই জয়িতা বলল, ‘আনন্দ আর কল্যাণ বোধহয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। ওদের ওখানে চল, তারপর একটা সিদ্ধান্ত নেব।’

সুদীপ ব্যাগ দুটো দেখাল, ‘এইগুলো নিয়ে কলেজ স্ট্রীটে যাব?’

‘সেই জন্যে তো ট্যান্ডি নিলাম। তুই ট্যান্ডিতে বসে থাকবি, আমি ওদের ডেকে আনব।’

সংস্কৃত কলেজের সামনে ট্যান্ডি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল জয়িতা। রাস্তার আলো জ্বলে গেছে। জয়িতা ওপরে উঠে এল। এবং তখনই দুপ করে আলো নিবে গেল এই তল্লাটের। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল কফি-হাউসে। ঘুটুঘুটে অন্ধকারে যেন এক লক্ষ শেয়াল হায়েনা ডেকে উঠল। বিরাট হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে খুব অসহায় চোখে তাকাল জয়িতা। তার সামনে প্রচুর মানুষ অথচ সে কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বিকট গলা করছে এক একজন। দম্বলের মধ্যে কোথাও আনন্দ এবং কল্যাণ আছে। কিন্তু সামান্য আলো না থাকলে ওদের খুঁজে বের করা মুশকিল। কখনও কখনও মানুষ কিরকম অচেনা হয়ে যায়! এই সমস্ত বেয়ারারা মোমবাতি জ্বালাতে শুরু করল। জয়িতা চিৎকার করে আনন্দের নাম ধরে ডাকল। যতটা সম্ভব গলা তুলে সেই আওয়াজটা ছুঁড়তেই কফি-হাউসের সমস্ত শব্দ আচমকা থেমে গেল। বিস্ময়ে প্রত্যেকেই ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে। এবং তার মধ্যেই কেউ বাটপট বলে উঠল, ‘কোথায় তুমি চণ্ডালিকা জল দেবে নাকি?’

ঠোঁট কামড়াল জয়িতা। মুখটা দেখতে পেলে সে চড় মারতো। এবং তখনই সে কনুই-এ একটা হাতের স্পর্শ এবং টান অনুভব করল। হলের বাইরে সিঁড়ির কাছে এসে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘চেন্টাচ্ছিস কেন?’

‘তোদের দেখতে পাচ্ছিলাম না।’

‘আশ্চর্য! তাই বলে চেচাবি। আফটার অল তুই একটা মেয়ে।’ কথাগুলো বলল কল্যাণ।

‘ও! কোন ছেলে চেঁচালে দোষ হত না, না? আই ডোল্ট থিংক—।’

‘ঠিক আছে।’ আনন্দ থামিয়ে দিল, ‘দেখি করলি কেন?’

একটু আগে অন্ধকার থেকে উড়ে আসা মন্তব্য আর কল্যাণের কথাটা সমস্ত মনে জ্বালা ধরিয়েছিল জয়িতার। সেটা সামলাবার জন্যেই সে কল্যাণকে

বলল, 'কল্যাণ, একটু চোখ খুলে তাকা। পাতি বাঙালির মত গ্যান্ডেনে কথা বলা বন্ধ কর। নিচে ট্যান্ডিতে সুদীপ বসে আছে আনন্দ।'

'ট্যান্ডিতে বসে আছে কেন?' আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'ওর সঙ্গে জিনিস আছে। তাছাড়া ও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। আজ সকালে ওর মা মারা গিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে ও কথা বলতে চাইছিল না। বোধহয় বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। যা হোক, তোরা নিচে আয়।' জয়িতা কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না।

ওরা ট্যান্ডিতে উঠে এল, সুদীপ ড্রাইভারকে ধর্মতলার দিকে যেতে বলল। তারপর আনন্দের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন খবর আছে?'

'না। আমি এগারটা নাগাদ হোস্টেলে ফিরেছি। সকালটা কল্যাণদের বাড়িতে ছিলাম। এসে শুনলাম সুরখদা আমার খোঁজ করতে এসেছিল দশটা নাগাদ। গ্রাম থেকেও কোন খবর আসেনি। তুই কোথায় থাকবি?'

'জানি না। তোর হোস্টেলে থাকব ভেবেছিলাম কিন্তু পরে সেটা বাতিল করলাম। আমি ঠাকুরপুকুরেও যেতে পারি কিন্তু সেখানে গেলে দিনের বেলায় বের হওয়া চলবে না।'

'তোর আর বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়?'

'না।'

'অন্তত আজই ঠাকুরপুকুরে যাওয়া উচিত হবে না। ওদিকটায় নিশ্চয়ই পুলিশ নজর রাখছে। ব্যাপারটা খিতিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।'

জয়িতা বলল, 'আমাদের আর একটু কেয়ারফুল হওয়া উচিত। ট্যান্ডিতে এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।'

সুদীপ বলল, 'সর্দারজীরা বুঝবে না।'

জয়িতা বলল, 'উই শুউ নট টেক রিস্ক।'

সুদীপ বলল, 'ঠিক আছে বাবা। তোর সব কিছুতেই বেশী বেশী।' সুদীপ মাথায় হাত বোলানো, 'ব্যাপারটা খিতিয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের দ্বিতীয় কাজটা করে ফেলা দরকার। তাহলে পুলিশ পাজ্‌ল্ড হয়ে যাবে।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'এখন নয়। আমি আমাদের প্র্যান মত না এগোবার কোন কারণ দেখছি না। ব্যক্তিগত বামেলা এইসময় এড়িয়ে গেলেই পারতিনস সুদীপ।'

'আমি ম্বে কটা ব্যাপারে কখনও আপোস করতে পারব না সেটা নিয়ে কেন কথা বলছিস! ব্যক্তিখুনে যদি আমি বিশ্বাসী হতাম তাহলে ওই লোকটাকে আগে খুন করতাম আমি। আমার মায়ের আটটা সোনার সাপ ছিল। মোট ওজন কত আমি জানি না। বাবা বলছে ইনকামট্যান্ড ওগুলো নিয়ে গেছে। সেটা সত্যি কিনা জানবার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।' খুব জেদী দেখাচ্ছিল সুদীপকে।

আনন্দ বলল, 'মাথা গরম করিস না। আগামীকাল আমার সঙ্গে একটা

লোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যদি স্ত্রিক থাকে তাহলে যা পাওয়া যাবে তা এনাফ।’

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, ‘টাকা কত লাগবে?’

‘এমাউন্টটা জানি না।’

জয়িতা এতক্ষণ চূপচাপ বসেছিল। এবার বলল, ‘সুদীপ আজ আমাদের ফ্ল্যাটে থাকুক। আমার মা নেই এখানে, বাবা নাও ফিরতে পারেন। আর ফিরলেও আমি ম্যানেজ করতে পারব।’

আনন্দ বলল, ‘খুব ভাল। তাহলে সুদীপ তুই আজ ওখানেই থাক। আমি কাল সকালে তোদের ফোনে বলব কি করতে হবে এখানেই নামিয়ে দে আমাদের।’

ওয়েলিংটনের মোড়ে ওরা ট্যাক্সি থেকে নামল। সুদীপ মুখ বাড়িয়ে বলল, ‘টাকার জন্যে চিন্তা করিস না। ওই ভারটা এবার আমি নিষ্ছি।’

গাড়ি চলতে শুরু করলে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ভাবে নিবি?’

ঠোঁট টিপে দুটো গাল ফুলিয়ে হাসল সুদীপ, ‘আর চক্ষু লজ্জা নয়। কিন্তু তুই তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস, গোলমাল হবে না তো?’

জয়িতা কাঁধ নাচাল। তারপর বলল, ‘সিগারেট দে একটা।’

রামানন্দ রায় আজও ফিরলেন না। খাওয়া দাওয়া করে গেস্টরুমে শুয়ে পড়েছিল সুদীপ। ওর আজ খুব ঘুম পাচ্ছিল। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল জয়িতা। এই প্রথম সে কোন বন্ধুকে বাড়িতে রাত কাটাতে বলল। সীতা রায় জানলে কি রকম নাটক হবে? ওর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সুদীপের মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা আছে। ওরা দুজনে দুজনের পেছনে প্রায়ই লাগে। কিন্তু আজ এই বাড়িতে আসার পর কেমন শান্ত হয়ে গেল। জয়িতা আনো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গেস্টরুমের দরজার সামনে এসে সে থমকে গেল। চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে অন্ধকার ঘর থেকে। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে সুদীপ। জয়িতা পা টিপে টিপে ফিরে এল নিজের ঘরে।

॥ ১২ ॥

ঘুম ভাঙ্গল একটু বেলা করে। জয়িতা তড়াক করে বিছানায় উঠে বসে চারপাশ তাকাল। এবং তখনই মনে পড়ল সুদীপের ঘর থেকে নিজের ঘরে ফিরে আসার সময় তাকে টেলিফোনটা ধরতে হয়েছিল। রামানন্দ রায় ফোন করেছিলেন। রাতের ট্রেন ধরে ভোরে কলকাতায় পৌঁছাবেন জানিয়েছিলেন। নিজের অজান্তেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছিল। রাতটুকু নিশ্চিত কটেবে। যদি প্রয়োজন হয় কাল ভোরেই সুদীপকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে যাবে। এইরকম একটা ভাবনা মাথায় এসেছিল। যে ছেলে দুমদাম কথা বলে, কাউকে কেয়ার করে না, মা মারা গেলেও যে সহজভাবে নেয় তাকেই মাঝরাতে একা

কাঁদতে হয় যখন, তখন খুব স্বাভাবিক লাগে। সুদীপ না কাঁদলে যে জয়িতার অস্বস্তি থেকে যেত। এই নিয়ে কোন কথা ওর সঙ্গে বলা যাবে না, বলা উচিত হবে না।

জয়িতা মুখ চোখে জন দিয়ে হাউসকোট পরেই ঘরের বাইরে চলে এল। এবং তখনই রামানন্দ রায়কে দেখতে পেল। সোফায় বসে রামানন্দ সিগারেট খাচ্ছেন। রাত্রি জাগরণের ছাপ চোখে মুখে। এখনও বাইরের পোশাক ছাড়েননি। পায়ের আওয়াজ শুনে রামানন্দ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। জয়িতা হাসবার চেষ্টা করল, 'ওড মনিং।'

রামানন্দ নীরবে মাথা নাড়লেন। জয়িতা কয়েক পা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, 'কখন ফিরলে?'

রামানন্দ আবার মেয়ের দিকে তাকালেন পূর্ণদৃষ্টিতে, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'এই তো।'

জয়িতা এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, 'কাল তোমরা কেউ ছিলে না। আমার এক বন্ধু, সুদীপ, তুমি দেখেছ ওকে, কাল রাত্রে এখানে ছিল কারণ ওর কোথাও থাকার জায়গা ছিল না।'

'কেন?'

'অসুবিধে ছিল।'

'ওর বাড়িতে অসুবিধে হল কেন?'

'ওটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'তুমি জানো না?'

'জানি।'

রামানন্দ মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা কি কোন খবর দিয়েছে?'

'না।' তারপর বলল, 'সুদীপ আজই চলে যাবে, তোমাকে দৃষ্টিভ্রম থাকতে হবে না।'

'আমি দৃষ্টিভ্রম নেই। তবে আমরা যখন তোমাদের বয়সে ছিলাম তখন এইভাবে বাড়ি ছেড়ে অন্য কারো বাড়িতে রাত কাটানোর স্পর্ধা দেখাতে পারতাম না। তাছাড়া, তুমি এখন আর ছোট নও, আমাদের অনুপস্থিতিতে সমবয়সী একটি ছেলেকে রাত্রে থাকতে দেওয়াটা অনেকের চোখেই শোভন বলে ঠেকবে না। এইটে তোমার বোঝা উচিত ছিল।'

'তুমি কি ইঙ্গিত করছ?'

'আমি কোন ইঙ্গিত করছি না। যা বাস্তব বলছি।'

'আমরা বন্ধুরা কেউ কাউকে কখনই বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। তোমার এই 'সবাই' কি বলছে তা কেয়ার করি না আমি। তাছাড়া তোমাদের বেলায় যখন এই 'সবাই' চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে তখন আমার ক্ষেত্রে চোখ

খুলতে নিষেধ করে।’

রামানন্দ দুহাতে মুখ চাকলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল জয়িতা। একটু সময় লাগল তার নিজেকে সামলাতে। শেষ পর্যন্ত রামানন্দ উঠলেন, ‘তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে খুকী। আমরা যা করছি সেটা না করলে অস্তিত্ব রাখা যাবে না। আমাদের রাজত্বে গিয়ে চোখ খোলা রাখলে দলচ্যুত হতে হবে। কিন্তু বেসিক্যালি আমি তো—আমি তো—কিছু মনে করিস না, আই লাভ ইউ, আর তাই হঠাৎ ভয় হল, আমি তোমার মাকে হারিয়েছি তোকে হারাতে ভয় হয়।’

রামানন্দ আর দাঁড়ালেন না। নিজের ঘরের দিকে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় ‘বাবা’ ডাক শুনে স্থির হলেন। জয়িতা বলল, ‘আমি কোন অন্যায় করছি না।’

মাথা নাড়লেন রামানন্দ, ‘আমি তোকে বিশ্বাস করি।’

‘বিশ্বাস কর?’ তাহলে তোমাকে বলতে হয়—।’

‘কি?’

‘না, এখন না। সময় হলেই তোমাকে জানিয়ে যাব।’

‘জানিয়ে যাবি? কোথায়?’

জয়িতা এবং রামানন্দ পরস্পর চোখের দিকে তাকালেন। রামানন্দের কাতর চোখে বিস্ময়। জয়িতার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ছেলেবেলায় একটা গল্প সে প্রায়ই শুনতো। রামানন্দ সাংসারিক কাজ একদম করতে পারতেন না। তখন ওদের এই বাড়ি ছিল না, এই অবস্থাও নয়। সেই সময় জয়িতা যখন দু বছরের শিশু তখন মাঝরাত্রে প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল হামের ফলে। রামানন্দ রায় সেই মেয়েকে দুহাত আঁকড়ে সারারাত ঘরে পায়চারি করেছিলেন। মেয়ের মলমূত্র স্নেহে পরিষ্কার করেছেন, ক্লান্ত ভ্রীকে ঘুমুতে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য এ থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তিনি স্নেহপ্রবণ সাংসারিক পিতা ছিলেন। তখন রামানন্দ রায়ের সীমিত আয় ছিল, গাড়ি ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার কথা বারংবার ব্যবহার করে করে নিজের গৌরব জাহির করার যে চেষ্টা তা শুধুই বিরজিত উৎপাদন করত। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সেই মানুষটাকে দেখতে পেল জয়িতা। যার কিছু নেই অথচ সবকিছু থাকার বাতাবরণ যাকে সৃষ্টি করতে হচ্ছে।

জয়িতা মাথা নাড়ল, ‘আমাকে জিজ্ঞাসা করো না এখন।’

রামানন্দ বিস্মিত হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, ‘ও! খুকী, তোমার বিবেকে যা সত্যি তাই করিস। এইভাবে কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা বলিনি, আবার বলার সুযোগ হবে কিনা জানি না। নিজের কাছে যদি তুই ঠিক থাকিস তাহলে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই। তোমার বন্ধুকে চলে যেতে বলে আমাকে ছোট করিস না। প্লিজ ট্রাই টু আওয়ারস্ট্যাণ্ড মি।’ রামানন্দ আর দাঁড়ালেন না। তিনি অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত জয়িতা তাকিয়ে থাকল। এই

মানুষটার কাছে মা কি পায়নি? কোন্ অভাববোধ থেকে মা এক শেকড়হীন জীবনটাকে আঁকড়ে ধরলেন। নাকি এই মুহূর্তের রামানন্দ রায়কে সীতা রায় চেনেন না? অথবা রামানন্দ রায় তার এই মুখটাকে অর্জুন মুখোশের ভিড় থেকে বেশীর ভাগ সময় খুঁজেই পান না বলে সীতা রায় স্নোতটাকেই বেছে নিয়েছেন। কে জানে!

‘তোমার চা।’ শ্রীহরিদাকে চায়ের কাপ আর কাগজ রাখতে দেখল জম্বিতা। শ্রীহরিদা দাঁড়াল, চা ঠাণ্ডা করো না। তোমার বন্ধুকেও চা দিয়েছি। সে শুয়ে আছে।’

মাথা নাড়ল জম্বিতা। সুদীপ নির্ধাৎ এখনও ক্লাস্ত। শ্রীহরিদা চলে গেলে সে চায়ে চুমুক দিল। এবং ঘুম থেকে ওঠার পর এই প্রথম তার ভাল লাগল। বাগডোঙ্গরার ফ্লাইটটা বিকালে আসে। ততক্ষণ আর নতুন কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না এই বাড়িতে। খবরের কাগজটা টেনে নিল সে। ভাঁজ খুলতেই সোজা হয়ে বসল জম্বিতা। জীবনের প্রথমবার মেরুদণ্ডে বরফের স্পর্শ পেল যেন সে। প্রথম পাতায় ছবি ছাপা হয়েছে। বাড়ী ঘর ঝাপসা, আঙনের শিখা লকলক করছে। কোন মানুষের চেহারাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এমন কি জম্বিতা নিজেও জায়গাটাকে ভাল করে চিনতে পারা তো দূরের কথা সম্পূর্ণ অচেনা লাগছিল তার কাছে। তার পাশেই বড় অক্ষরে হেডলাইন, ‘প্যারাডাইস ভঙ্গমীভূত।’ জম্বিতা রিপোর্টটা খুঁটিয়ে পড়ল।

‘পরশু মধ্যরাত্রে ডায়মণ্ডহারবার রোডের একটি প্রমোদনিবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। শেষ রাত্রে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর আমাদের অফিসে আসে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি দমকল আপ্রাণ চেষ্টা করছে আঙন নিবিয় ফেলতে, কিন্তু ততক্ষণে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। পুলিশসূত্রে জানা যায় একাধিক ব্যক্তি ডাকাতির উদ্দেশ্যে ওই প্রমোদনিবাসে প্রবেশ করে এবং নিবিচারে ‘প্যারাডাইসের’ মালিক এবং দুজন কর্মীকে হত্যা করে আঙন ধরিয়ে দেয়। প্যারাডাইস নামক ওই প্রমোদনিবাসটি সরকারের অলক্ষ্যে মধুকুঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ওই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ঠিক কতজন অগ্নিদগ্ধ কিংবা আহত হয়েছেন জানা যায়নি। কারণ সেইরাত্রে যারা মধুকুঞ্জের মধু আন্দান করতে গিয়েছিলেন তাঁরা কেউ প্রকাশ্যে আসতে চাইছেন না। অনুমান সংখ্যাটি দশের কম নয়। ডাকাতরা তাদের কাজ শেষ করে নিবিঘ্ন গা ঢাকা দেয়। প্রকাশ সেই রাতেই ডায়মণ্ডহারবার রোডের একটি পেট্রলপাম্প থেকে গাড়ি চুরি হয় এবং অনুমান ডাকাতরা সেই গাড়ি ব্যবহার করেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে ডাকাতরা স্থানীয়। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এই ডাকাতি তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় ডাকাতদের সংখ্যা বেশী ছিল না। এবং তারা প্রত্যেকেই তরুণ। প্যারাডাইসের ক্রিমাকলাপ আশেপাশের গ্রামের মানুষ কখনই ভাল চোখে

দ্যাখেনি। তথাকথিত ডাকাতি হোক বা না হোক এই কাজ প্যারাডাইসকে চিরকালের জন্য গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে অনেকেই খুশী, যদিও মৃত্যুর খবরে কেউ আনন্দিত হননি। পুলিশ বলেছে, অপরাধীরা দু-একদিনের মধ্যে ধরা পড়বেই কারণ তদন্ত খুব দ্রুত এগোচ্ছে।’

ধীরে ধীরে কনকনানিটা স্থির হল। কোথাও তার কথা লেখা হয়নি। একটি মেয়েও যে ওই দলে ছিল তা রিপোর্টে বলা হয়নি। কেউ কি পুলিশকে এই খবরটা দেয়নি? ক্রমশ নিজেকে বেশ হালকা মনে হচ্ছিল তার। কিন্তু তার পরেই মনে হল এটা একটা চাল হতে পারে। পুলিশ তাদের নিশ্চিত করতে চায় বলেই খবরটা বেমালুম চেপে গেছে। শেষের লাইনটা খুব অস্বস্তিকর। পুলিশ কি কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছে? যদি ওরা আনন্দের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে—! যে হালকাভাবটা এসেছিল তা আচমকাই চলে গেল। কাগজটাকে ভাঁজ করে ঠোঁট কামড়ান জয়িতা। কাল সারা দিন এবং রাত্রে এই ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই ঘামায়নি সে। অথচ কাগজটা পড়ামাত্র ওইসব চিন্তা মাথা তুলল। সে চা শেষ করে কাগজটা নিয়ে সুদীপের ঘরের দিকে পা বাড়াল। শুয়ে শুয়ে সুদীপ সিগারেট খাচ্ছিল। জয়িতাকে দেখে উঠে বসল, ‘এখনই বের হব?’

‘তোর যা হচ্ছে। আমি তোকে যাওয়ার কথা বলতে আসিনি।’

‘আমি একটু বাদে বের হব। মালগুলো নিয়ে তো ঘোরা যাবে না, এগুলো এখানে রাখা যাবে? মানে তোদের যদি কোন অসুবিধে না হয়?’

‘তোদের তোদের করছিস কেন?’

‘আই অ্যাম সরি। তোর বাবা মা ফিরেছেন?’

‘বাবা এসেছে।’

‘আমার কথা জানেন?’

‘হ্যাঁ, বললেন, তাঁর কোন আপত্তি নেই তোর এখানে থাকতে যদি আমার বিবেক পরিষ্কার থাকে। আজকের কাগজ।’ জয়িতা কাগজটা ছুঁড়ে দিল। দিয়ে দেখল সুদীপের মাথার একদিক বেতপ ফুলে উঠেছে।

কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে সুদীপ বলল, ‘তোর বাবা তো দেখছি চমৎকার ভদ্রলোক। কখন যে এরা ঘাম ব্যবহার করে আর কখন যে জালি হয়ে যায় তা শালা অনুমান করাই মুশকিল। আই বাপ, একি রে, একদম হেডলাইন।’ সুদীপ এবার গম্ভীর হয়ে কাগজটা পড়া শুরু করল। শেষ লাইন অবধি খুঁটিয়ে পড়ে কাগজটাকে সরিয়ে রেখে সে মন্তব্য করল। ‘কোন কাজ হল না।’

‘মানে?’

‘আনন্দ চেয়েছিল এইসব ঘটনা থেকে কাগজগুলো এমন মাতামাতি করবে যে সাধারণ মানুষ ধরতে পারবে ব্যাপারটা। একটার পর একটা ঘটনা ঘটাবো আমরা আর সাধারণ মানুষের অসাড়া হয়ে যাওয়া বোধটায় টান লাগবে। এই সো-কলড ডেমোক্রেসিতে অর্থবান মানুষদের ব্যাভিচার করাই সবচেয়ে সুবিধে।

যত রকমের অন্যান্য করেও আইনের দোহাই দিয়ে তারা পার হয়ে যায়। ঠিক ঠিক পয়েন্টে ঘা দিয়ে ওদের মুখোশ খুলে দিলে মানুষ নিজেরাই এগিয়ে আসবে। কিন্তু পরশুর ঘটনাটা কাগজ কিভাবে লিখেছে দেখেছিস? যেন আমরা সত্যি ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম। কি ডাকাতি করলাম তা লেখিনি।

‘তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস।’

‘কি কথা?’

‘আমরা সবে একটা ঘটনা ঘটালাম। পুলিশ কিংবা সাংবাদিকদের কোন সুযোগ নেই জানার, কারা করেছে কি জন্য করেছে? আমরা কোন সূত্র রেখে আসিনি। কাগজে কোথাও লেখিনি আমার কথা, আই মিন দলে মহিলা ছিল সেইকথা। অর্থাৎ হয় পুলিশ চেপেছে নয় ওরা টোটাল ইনফরমেশন পায়নি। কিন্তু আরো কয়েকটা ঘটনা ঘটলে জনসাধারণ জেনে যাবেই। রিপোর্ট টায় পরিষ্কার বলা আছে প্যারাডাইসে মধুচক্র ছিল। পাবলিক নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটায় খুব কষ্ট পাবে না।’

জমিতার কথা শেষ হওয়ামাত্র সুদীপ গুয়ে পড়ল। জমিতা অবাব হল, ‘কি ব্যাপার?’

‘ঘুম পাচ্ছে। খুব টানার্ড লাগছে।’

‘একটা অ্যাকশন করেই—।’

‘না, নিজের সঙ্গে লড়াই করে। তুই বুঝবি না। আমাকে যখন যেতে হবে ডেকে দিস।’

‘তোর যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ থাক।’

‘বাঃ, হঠাৎ এই বাড়ির ওপর তোর কর্তৃত্ব এসে গেছে মনে হচ্ছে। আনন্দ ফোন করবে, বলবি বিকেলের আগে আমি ফিঁ হবো না, অবশ্য কোন জরুরী ব্যাপার থাকলে আলাদা কথা।’ সুদীপ পাশ ফিরে শুতেই জমিতা উঠে এল। এই মুহূর্তে ওর মনে হল সুদীপ ঠিক আগের মতন নেই। কাল রাত্রে যাকে কাঁদতে শুনেছে সে এখনও সুদীপকে ছেড়ে যায়নি। কিংবা আর একটা ব্যাপার হতে পারে। আমরা যেসব মানুষকে বাইরের জীবনে নিয়মিত দেখে থাকি, যাদের সঙ্গে বন্ধু হয়ে অথবা কর্মসূত্রে মিশি তাদের একটাই চেহারা আমাদের কাছে ধরা পড়ে। তারা যখন নিজের শোওয়ার ঘরে ফিরে যায় তখন তাদের আচরণ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই থাকে না। সুদীপকে তো বাইরে থেকেই সে দেখে এসেছে। ছটফটে, টিঁজ করতে ভালবাসে, কোনকিছুই গায়ে মাখে না, চক্ষু-লজ্জার ধার ধারে না। এই রকম ছেলেও হয়তো বাড়িতে চুপচাপ গভীর, একা একা থাকতেই ভালবাসে। জমিতা মাথা নাড়ল, কখনও কখনও একাকী নিজেকেই বিরক্তিকর মনে হয়। সুদীপ দুই ভূমিকায় থেকে নিজেকে ব্যালেন্স করে।

রামানন্দ রায় বাইরে নেই। কাগজটাকে টেবিলের ওপর রেখে পা বাড়াবার আগেই টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই আনন্দের গলা শুনতে

পেন, নম্বর জিজ্ঞাসা করছে। জয়িতা বলল, 'তোকে ডিজিট চিনিয়েছিল কে? মাসিমা? ঠিক শিখেয়েছিলেন। বল, কি বলবি।'

আনন্দ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, তারপর বলল, 'পারিস। শোন, সুদীপ কান ঠিকঠাক ছিল তো?'

'ঠিকঠাক মানে?' জয়িতার গলাটা করকরে হয়ে উঠল আচমকা।

'কোন অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

'অসুবিধের সম্ভাবনা থাকলে আমি ওকে ডেকে আনতাম না।'

'ওইভাবে কথা বলছিস কেন?'

জয়িতা নিজেকে সামলালো। কেন যে ফট করে রাগ হয়ে যায়। সে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলবার চেষ্টা করল, 'ওয়েল, ঠিক আছে, কি বলবি বল।'

আনন্দ চট করে কথা বলল না। যেন সময় নিয়ে কি বলবে স্থির করল, 'জয়িতা, তোকে একটা কথা শেষবার জিজ্ঞাসা করছি। আমাদের সম্পর্কে কোন অসুবিধে আছে?'

'না। নেভার। হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'তাহলে চটজনদি ভুল বুঝছিস কেন?'

'আই অ্যাম সরি। আসলে একটু আগে বাবার সঙ্গে—, মেজাজটা ভাল ছিল না। তারপর তুই যখন জিজ্ঞাসা করলি ঠিকঠাক শব্দটা উচ্চারণ করলি তখন—, রিয়েলি আই অ্যাম সরি! হ্যাঁ, সুদীপ ভালই ঘুমিয়েছে। একটু আগে কথা বলেছি। ও আবার ঘুমাচ্ছে।'

'তোমার বাবা কি টের পেয়েছেন?'

'সুদীপকে বাবা দেখেছেন।'

'দূর, সুদীপের কথা বলছি না, টাকাটার কথা।'

'ওটা মায়ের ডিপার্টমেন্ট। শী হ্যাজ নট কাম ব্যাক!'

'ও। আমি সকালে বেরিয়ে যাচ্ছি। অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। ইউ ক্যান মিট আফটার দ্যাট। কোন অবস্থাতেই আজ ঠাকুরপুকুরে যাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু কাল যেতেই হবে। সুদীপ আজ কোথায় থাকবে তোরা ঠিক করে নে। আর সন্ধ্যাবেলায় বসুশ্রী কফি-হাউসে মিট করবি। অ্যারাউণ্ড সিন্স। সুদীপকে বলবি ও যদি পারে যেটা যোগাড় করবে বলেছে করে রাখো। হয়তো আজই দরকার হবে, ও কে?'

'ঠিক আছে। কল্যাণ কোথায়?'

'ওর বাড়িতেই। কাগজ দেখেছিস?'

'হ্যাঁ। আনন্দবাজার।'

'টেলিগ্রাফটা দেখিস। স্বর্গে কি কি হতো তার ডিটেলস ছেপে দিয়েছে। ওরা মন্তব্য করেছে যে বা মারাই কাজটা করুক তারা আইনের চোখে অন্যায় করেছে

কিন্তু গ্রামবাসীরা আশীর্বাদ বলে যদি মনে করে তাহলে দোষ দেওয়া যায় কি ? দ্যাটস অল তাই না।’ আনন্দর গলায় খুশীর সুর। সকাল থেকে প্রথম এই বার ভাল লাগল জয়িতার।

ট্রামে উঠেই সুদীপ টের পেল। দুজন ভদ্রলোক খবরটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, ‘পুলিশ লাইসেন্স দিয়েছে ওরা মধুচক্র চালিয়েছে, এতে দোষ কিসে ? কলকাতায় তো কয়েক হাজার প্রস কোয়ার্টারস আছে তা নিয়ে তো হেঁচক করেন না। বেশ্যারুত্তি কি আইন সম্মত ?’

ওই রুত্তিটা আইনসম্মত কিনা সে বিষয়ে যাত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা গেল। কারোর কাছে কথাটা স্পষ্ট নয়। কেউ একজন বলল, ‘বেআইনী হলে ওরা বিধান রায়ের সময়ে মিছিল করে গিয়েছিল কি করে ?’ সুদীপ লক্ষ্য করল কি চটপট মানুষ প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত একজন বলল, ‘না মশাই, ডাকাতরা যে দুতিনজনকে খুন করেছে তাতে আমি একটুকুও দুঃখিত নই। মধুচক্রে সেদিন যারা ছিল, মানে যারা আহত হয়েছে তাদের নাম কাগজগুলো এড়িয়ে গেছে। কেন ?’

আর একজন বলল, ‘আপনি এই ডাকাতি নরহত্যাকে সাপোর্ট করছেন ?’ এবার লোকটি জবাব না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রথম লোকটি বগল, ‘যাই বলুন, আমার সব পড়েটড়ে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা পলিটিক্যাল অথবা পুন্ডান ঝগড়া। ওই প্যারাডাইসের অ্যান্টিপার্টি হয়তো করেছে।’ ‘পলিটিক্যাল কথাটা বলেন কেন ? আপনি জানেন এই অঞ্চলে কোন উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ। তাছাড়া যারা এতকাল উগ্রপন্থী হিসেবে চিহ্নিত ছিল তারা এখন নরম হয়ে গেছে।’

‘কিন্তু ডাকাতদের উদ্দেশ্য কি ছিল ?’

আলোচনা এখন সেই বিষয়ে চলল। আনন্দ যা চাইছে, তাই কি হতে যাচ্ছে ? আঙুলে কানের পাশের ফোলা জায়গাটা স্পর্শ করল সুদীপ। জয়িতার চাপে ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা টেডভ্যাক নিয়ে ওষুধ লাগাতে হয়েছে। ব্যাণ্ডেজটা নিশ্চয়ই খুব দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে। কি রকম ? তাকে কি ডাকাত ডাকাত মনে হবে কারো ? ও যদি এখন এই মুহূর্তে চিৎকার করে বলে, দেখুন মশাই আমিই একজন ডাকাত যাদের কথা আপনারা বলেছেন তাহলে এই ট্রামের লোকগুলো কি তাকে বিশ্বাস করবে ?

ধর্মতলায় নেমে হটিতে লাগল সুদীপ। এখন প্রায় এগারটা। অফিসযাত্রীদের ভিড় এখন চারপাশে। সাধারণত দশটায় অফিসগুলো চালু হওয়ার কথা। কিন্তু ট্রামে-বাসে বারোটা পর্যন্ত অফিস-টাইম শব্দটা চালু থাকে। সুদীপের সামনেই একটি মধ্যবয়সী লোক হাতে রেস্তোনের ছোট ব্যাগ নিয়ে হটিছিল। এগুলোকে টিপিক্যাল কেরানী ব্যাগ বলা হয়। ওপর থেকে টিফিনবাস্কেটার সাইজ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত সময় যেন ওর সামনে পড়ে আছে এমন ভঙ্গীতে লোকটি হাটছিল।

বহুতল বাড়িটির সামনে এসে সুদীপ লক্ষ্য করল লোকটি সেখানেই ঢুকেছে। সামনেই লম্বা কাউন্টার। সেখানে কেউ নেই। লিফটের সামনে বিরাট লাইন। লোকটি লাইনের শেষে দাঁড়াতেই সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, রেইড করে যারা গয়নাগাঁটি নিয়ে আসেন তাঁদের ডিপার্টমেন্টটা কোথায়?'

লোকটি ছোট চোখে তার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'লাইনে দাঁড়ান, বলে দেব।'

রাক্ষসের পেটেও বোধহয় এত জায়গা থাকে না, লিফটে দাঁড়িয়ে মনে হল সুদীপের। ভাগ্যিস সব ফ্লোরে থামছে না। হঠাৎ শুনল, 'নেমে ডানদিকে।' বাইরে বেগ্নিয়ে আসামাত্র দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক পা এগিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল তার। পুরো ধর্মতলাটা দেখা যাচ্ছে এখন থেকে। দোতলা বাসগুলোকেই ছোট দেখাচ্ছে, মানুষজন লিলিপুট। অনেক উঁচু থেকে দেখলে বোধহয় এইরকম সুন্দর দেখায়।

খুঁজে খুঁজে অফিসটাকে বের করল সুদীপ। অফিসার ভদ্রলোক চমৎকার। বসতে বলে প্রশ্ন করলেন 'অবনী তালুকদার আপনার কে হন?'

'উনি আমার বাবা। আমার মা মরে গিয়েছেন। আপনারা মায়ের গহনাগুলো নিয়ে এসেছিলেন। বাবা বলছেন তিনি সেগুলো এখনও ফেরত পাননি। কথাটা সত্যি কিনা জানতে এসেছি।'

'বাবার কথা অবিশ্বাস করছেন কেন?'

'করার কারণ আছে।'

'দেখুন, এটা অবনীবাবু এবং সরকারের ব্যাপার। এক্ষেত্রে আপনি খাড়া পাবেন। আপনাকে আমরা আইনত জানাতে পারি না। ওঁর অ্যাসেসমেন্ট কোথায় হয় জানেন?'

'না উনি আমাকে বলেননি। কিন্তু সোনাগুলো তো আমার মায়ের।'

'হতে পারে। তবে যেহেতু ওইসব আনডিসক্লোজড ওয়েলথ অবনীবাবুর বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে এবং সত্যিকারের কোন মালিক যদি প্রমাণ দেখাতে না পারেন তাহলে আমরা অবনীবাবুর সম্পদ হিসেবেই ধরব। আশ্চর্য আইনে যা যা ব্যবস্থা নেবার তা নেওয়া হবে। তবে আমি আপনাকে আন-অফিসিয়ালি জানাচ্ছি, কিছু কিছু জিনিস আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি। ডিটেলস জানতে চাইলে আপনাকে পরিচয় দিয়ে দরখাস্ত করতে হবে।'

অফিসারের কাছ থেকে বাবার যেখানে অ্যাসেসমেন্ট হয় সেখানকার ঠিকানা নিয়ে সুদীপ বাইরে বের হল। কয়েকতলা ভেঙ্গে নির্দিষ্ট তলায় আসতেই ও থমকে দাঁড়াল। অবনী তালুকদার হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে ফাইল বগলে একটা লোক। লোকটা যেন কি চাইছে আর অবনী ঘাড় নেড়ে খুব সম্পতি দিয়ে যেতে যেতে একটা ঘরের দরজা তৈলে ঢুকে পড়লেন। দরজার উপর

টাঙানো ফলক থেকে নাম পড়ল সুদীপ। গতকাল অবনী তালুকদারকে যে অবস্থা সে দেখে এসেছিল তাতে একবারও মনে হয়নি আজ উনি সুস্থ হয়ে নামলা করতে আসতে পারেন। একটু বাদেই সেই ফাইলবাহক বেরিয়ে এল। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে কেস আছে?' সুদীপ মাথা নেড়ে না বলতে লোকটি বিরক্ত হল, 'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'আমার বাবা ভেতরে গেছেন তাই।'

'বাবা? অবনীবাবু আপনার বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'ওহো, নমস্কার, নমস্কার। আপনার কেসটা খুব কঠিন তবে ছাড় পেয়ে যাবেন। আমাদের এই সাহেবের মনটা নরম। একটু চেপে ধরলেই হয়ে যাবে। আমি তো বললেই ফাইল এনে দিই।' লোকটি কৃতার্থ হয়ে হাসল।

'আমাদের বাড়িতে যে সার্চ হয়েছিল তার ফাইলটা কোথায়?' দরদ গলায় জিজ্ঞাসা করল সুদীপ।

'ও বাবা, ওই ফাইল সাহেবের আলমারিতে। সাহেব ছাড়া কেউ হাত দেয় না। বসুন না।' কথা বলতে বলতে আর একজনকে দেখেছিল, লোকটি এবার সেইদিকে ছুটল।

সুদীপ একটু ইতস্তত করল। তারপর আলতো করে দরজায় চাপ দিতেই অবনী তালুকদারের গলা শুনতে পেল, 'না রায় সাহেব, সৎভাবে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। আপনি একটু রাজী হয়ে যান দেখবেন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার।' অবনী তালুকদারের কন্ঠস্বর রহস্যময়।

অফিসার কিছু বলতে গিয়ে গলা তুললেন, 'কে কে ওখানে?'

সুদীপ দরজা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকতেই উদ্ভ্রলোক উত্তেজিত হলেন, 'না বলে ঢুকলেন কেন? কে আপনি?'

সুদীপ দেখল অবনী তালুকদারের মুখ শাদা হয়ে গেছে। এমন অবাক বোধ জীবনে হননি তিনি। সে হেসে বলল, 'আপনি বলে দিন আমি কে?'

অবনী হেঁটে চাটলেন, 'আমার ছেলে।' তাঁর গলার স্বর ফ্যাসফেসে শোনাল।

'ও।' অফিসার ইঙ্গিত করলেন একটা চেয়ার দেখিয়ে বসার জন্যে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন অবনী তালুকদার, 'স্যার, আজকে আমি চলি। আমাকে আর একটা ডেট দিন।'

'কেন? হঠাৎ ডেট চাইছেন? আমি কেসটা আর ঝুলিয়ে রাখতে চাই না।'

'প্লিজ স্যার। তুমি-তুমি, একটু বাইরে দাঁড়াবে?'

'কেন?' সুদীপ হাসল।

'ঠিক আছে স্যার। আমি পরে দেখা করব।' কাগজপত্র তুলে অবনী

তালুকদার বাইরে বেরিয়ে যেতেই সুদীপ তাঁকে অনুসরণ করল। সেই জানলাটা যেখান থেকে সুন্দর কলকাতা দেখা যায় সেখানে পৌঁছে অবনী উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'এখানে এসেছ কেন? কি চাই?'

'আপনিই আসতে বলেছিলেন।'

'আমি? কই কখন? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

'আমার মায়ের গহনা।'

'উঃ, সেটা এদের কাছে আছে, এদের কাছে চাও।'

'তাইতো চাইতে এসেছি।'

'ওয়েট। তুমি ওখানে গিয়ে কি বলবে?'

'যা জানি।'

'কি জানো? ডু স্কু নো আমার সবচেয়ে বড় শত্রু তুমি।'

'এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি। আমি আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্য চাই না। আমার মা বাপের বাড়ি থেকে যে সম্পত্তি নিয়ে এসেছিলো তা-ই চাইছি। কারণ টাকার আমার খুব প্রয়োজন। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'এতদিন তো টাকার দরকার ছিল না। ছাত্র হিসেবে তোমার যা খবচ তা আমি দেব। তুমি হোস্টেলে গিয়ে থাকো। ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার মায়ের গয়না কবে এরা ছাড়বে জানি না। দোজ আর আনডিসক্লোসড ওয়েলথ।'

'কার?'

'মানে?'

'ওসব তো আপনার নয়। আমার মায়ের। আপনার আনডিসক্লোসড ওয়েলথ হবে কেন?'

'আমার কাছে পাওয়া গেছে যখন তখন আমার। তোমার মার নাম ওতে লেখা নেই। নট ইভন এনি পেপার। তোমার মায়ের বাবা কোথেকে কিনে-ছিলেন প্রমাণ নেই।'

'তার মানে মায়ের সম্পত্তি আপনারই হয়ে যাচ্ছে। চলি।'

'দাঁড়াও। কত টাকা দরকার তোমার?'

'অন্যসব ছেড়ে দিচ্ছি। আটটা কুড়ি ভরি ওজনের সাপের দাম কত হবে? কমপক্ষে সোওয়া তিন লক্ষ টাকা। আমাকে এক লক্ষ দিলেই হবে।' সুদীপ শান্ত মুখে বলল।

'কি? এক লক্ষ? আমার বাড়ি? ব্যাক মেইলিং? পুলিশে দেব তোমাকে গুল্লার।'

'মাইগু ইওর ল্যান্সয়েজ।' চাপা গলায় বলল সুদীপ। সে দেখছিল কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়েছে তাদের কথাবার্তা শুনে। কিন্তু এখন ঠিক কি করা যায় তা ওর মাথায় আসছিল না।

অবনী তালুকদার খুব কষ্টে নিজের উত্তেজনা সামলে বললেন, 'ল্যান্সয়েজ, ল্যান্সয়েজ শেখাচ্ছে আমাকে। এক হাজারের বেশী এক পয়সা দিতে পারব

না। ওই নিয়ে চিরজীবনের জন্যে দূর হয়ে যেতে হবে।’

‘আমি চলি। আপনি যখন সহজে মুক্তি চাইবেন না তখন সেই ব্যাগটার কথাও আমাকে বলতে হবে।’

‘শোন, ঠিক কত হলে চলবে তোমার?’

‘এক লাফ।’

‘অত টাকা আমি কোথায় পাব? দেখছ না এরা সব সিঁজ করে নিয়েছে।’

‘তা হলে লিখে দিন আমার মায়ের গহনাগুলো আপনি নেবেন না। সেগুলোর একটা লিস্ট দিন।’

‘ঠিক আছে। তুমি সামনের রবিবারে দেখা কর?’

‘না। আজ। বিকেল চারটের মধ্যেই টাকা দরকার। কিভাবে দেবেন সেটা আপনার ব্যাপার।’

‘তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?’

‘আপনার জানার কোন প্রয়োজন আছে?’

‘আমি তোমার বাবা। রাগ করে তো অনেক কথা বলতে পারি। তোমার মা আমাকে কোনদিন শান্তি দেয়নি। ঠিক যে প্লেজার চাই তা ওর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি আমার মত থাকতে চেয়েছি সবসময়। বেশ, চারটের সময় এসে। আমি যা পারবো দিয়ে দেব। আই ডোল্ট ওয়ান্ট টু সি ইওর ফেস আফটার দ্যাট।’

একা একা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সুদীপের বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। একটা যন্ত্রণা, সেটা ঠিক কি কারণে তা সে জানে না, নিশ্বাস ভারি করে তুলেছিল। কোন নির্দিষ্ট মানুষের জন্যে নয় এমন কি নিজের জন্যেও নয়, অদ্ভুত শূন্যতা যে কতখানি ভারি হয়ে যন্ত্রণা ছড়ায় তা এর আগে সে কখনই টের পায়নি। চারটে বাজতে ঢের দেরি, তবু সে বাড়ির দিকে চলল। মায়ের ঘরটা তাকে চুশ্বকের মত টানছিল।

॥ ১৩ ॥

ব্যাপারটা বেশ মজার। সারারাত বাইরে কাটিয়ে সকালে ছেলে আর একজনকে নিয়ে ফিরল কিন্তু এ বাড়ির কেউ সেটা দেখেও দেখল না। বাবা বসেছিলেন রকে, একবার তাকালেন এবং তারপরেই উদাস হলেন। আনন্দ থাকাকালীন এই ঘরে দুকাপ চা এসেছিল। দরজার কাছে শব্দ হচ্ছে শুনে কল্যাণ উঠে গিয়ে দেখেছিল মেজবৌদী যার নাম বিনীতা সংকুচিত হয়ে দুটো কাপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এবং সেই দেওয়ার দৃশ্যটি বড় বউদি যুথিকা নজর করেছে তার দরজায় দাঁড়িয়ে। আশে পাশে কোথাও মা নেই। আনন্দ মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি, সে নিজেও আলাপ করিয়ে দেয়নি। সুজন আজকাল প্রায়ই রাত্রে বাড়িতে ফেরে না। প্রথম প্রথম এই নিয়ে চেঁচামেচি হলেও এখন প্রত্যেকের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কল্যাণ কাউকে কিছু না বলে এই

প্রথম রাতে বাড়ির বাইরে কাটাল। অথচ কেউ তাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করল না। প্রথমে মজা লাগছিল শেষ পর্যন্ত মনটা খারাপ হয়ে গেল।

জয়িতা আর সুদীপ চলে গেলে এই ব্যাপারটা সে আনন্দকে বলেছিল। কথাটা শুনে আনন্দ ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেউ তোকে খুব জেরা করলে, ধমক দিলে তোর ভাল লাগত?'

কল্যাণ বলেছিল, 'সেই মুহূর্তে কিরকম লাগত জানি না কিন্তু ওটা না হওয়ায় এখন মনে হচ্ছে আমি যেন বিদেশে বাস করছি।'

আনন্দ বলেছিল, 'পারিবারিক সেন্টিমেন্টালগুলো না থাকলে এইরকম মনে হয়। আমার কথাই ধর, আমি হোস্টেলে আছি। অসুখ করলেও কেউ দেখার নেই। হোস্টেলের অন্য ছেলেরা যে তখন পাশে আসে না তা নয় কিন্তু তাদের ওপর তো আমি জোর করতে পারি না। এইসব করে-টরে বেঁচে-থাকা আর কি। কার লাইন রে?'

কল্যাণ হেসে ফেলল, 'এক জীবনে যাঁর কিছুই করা হয় না।'

আনন্দ মাথা নেড়েছিল, 'কিন্তু এক জীবনে আমরা অনেক কিছুই করতে চাইব।'

রাড়িরে বাড়িতে ফিরে চুপচাপ এইসব কথাই ভাবছিল সে। টাকা থাকলে এই ভারতবর্ষে বসে যে কোন অস্ত্র কেনা যায়। শুধু ঠিকঠাক লোকের কাছে পৌঁছে যেতে পারলেই হল। প্রয়োজনে তারা সেইসব অস্ত্রের ব্যবহারও শিখিয়ে দিতে পারে। তার জন্যে ভাল টাকার দরকার। কিন্তু আনন্দ চাইছে গ্রেনডে ডিনামাইট আর রিভলভার। সেগুলো সহজে বহন করা যায় এবং যার প্রতি-ক্রিয়া হয় মারাত্মক, প্রয়োগ করতে দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। জয়িতা যে টাকা এনেছে এবং সুদীপ যা ব্যবস্থা করবে তাতে বেশ কয়েকটা অ্যাকশনে অস্ত্রের অভাব হবে না। অবশ্য ততদিন যদি পুলিশ তাদের ধরে না ফেলে। প্যারাডাইসের ব্যাপারটা যেরকম নিবিঘ্নে ঘটে গেল প্রতিবার যে তাই হবে এমন আশা করা ভুল। কিন্তু তার আগে যদি নাড়া দেওয়া যায়, পাথরের মত অনড় মানুষের মনগুলোকে যদি বিচলিত করা যায়! ব্যাপারটা খুব আশাপ্রদ বলে মনে হয় না কল্যাণের কাছে। অতবড় নকশাল আন্দোলন যা পারেনি তারা চারজন বিক্ষিপ্তভাবে সেটা করতে পারবে এমন আশা করা বোকামি। কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কি! গ্রেপ্তার এড়িয়ে যদি বুর্জোয়া শোষকদের দুর্গগুলোতে একটার পর একটা আঘাত করা যায় তাহলে হয়তো আগামী কালের জন্যে কাজ আগাম করে যাওয়া হবে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। আজ কিংবা আগামীকাল।

আনন্দ বলে পশ্চিমবাংলায় একমাত্র সি পি এম এই কাজটি করতে পারত। তাঁদের সংগঠন শক্তি যদি এই কাজে ব্যবহার করা হত তাহলে ফল পাওয়া যেতই। কিন্তু তাঁরা এখন ক্ষমতালোভী এবং সংবিধানের আশ্রয়ে নিরাপদ থাকতে চায়। সুবিধে অনুযায়ী সর্বহারা শব্দটির সীমা বাড়িয়ে বাড়িয়ে

লক্ষপতিকেও তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর কেউ নয়, কোন রাজনৈতিক দল নয়, একমাত্র দেশের মানুষ যদি এগিয়ে না আসে সক্রিয়ভাবে তাহলে এই সমাজব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। দেশে শুধু অর্থবানরাই গণতন্ত্রের সুবিধে ভোগ করতে পারে সে দেশের মানুষ আর কতকাল শুধু দেওয়ানের কোণ খুঁজে যাবে। দিন পাঁচটাবেই কিন্তু কবে সেটাই কেউ জানে না। সুদীপ সেদিন একটু অশ্লীল হলেও সত্যি কথা বলেছিল। পেতে হলে কিছু দিতে হয়। ত্যাগ করতে না জানলে পাওয়ার আশা অর্থহীন। সুদীপ বলেছিল, 'বাঙালি মল মুত্র এবং বীর্য ছাড়া আজ আর কিছুই ত্যাগ করতে জানে না।' কথাটা সত্যি হয়তো বেশীরকমের সত্যি। আনন্দর কথা অনুযায়ী পরিকল্পিত পথে মানুষের অসাড় হয়ে যাওয়া বোধগম্যলোকে আমাত হেনে হেনে সক্রিয় করতে হবে। তার জন্যে যদি এক জীবন খরচ হয়ে যায় কোন আক্ষেপ নেই। চাকরির জন্যে পড়াশুনা এবং বেঁচে থাকার জন্যে চাকরি করা এবং মরে যাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু অশ্রুতি অন্য জায়গায়। প্যারাডাইসকে কেন্দ্র করে যে বিরাট কাণ্ডটি ওরা করে এল তার প্রতিক্রিয়া তো কিছুই হচ্ছে না। শুধু আজ একজনকে বলতে শুনেছে, 'ভালই হয়েছে, ওসব জায়গা পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়াই উচিত।' শুনে খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু লোকটা কথা বলছিল কোন উদ্দাপ না নিয়ে। খবরের কাগজগুলোতেও তাদের উদ্দেশ্যটা ছাপা হয়নি। অবশ্য ওরা জানেই না ঘটনার পেছনে কি পরিকল্পনা আছে। এ ব্যাপারে আনন্দ কাউকে জানাতে চায়নি। এখন কল্যাণের মনে হল এইটে ভুল হচ্ছে। এদেশের মানুষ নিজেদের যতই বুদ্ধিমান মনে করুক আসলে তাদের বুঝিয়ে দিলেও তারা বুঝতে চায় না যেখানে সেখানে নীরব থাকা মানে পশুশ্রম। একটা প্যারাডাইস গোড়ানো তখনই মূল্যবান হবে যখন তাই নিয়ে তোল পেটানো যাবে। দরজায় শব্দ হল। কল্যাণ মুখ ফিরিয়ে দেখল মেজবউদি দরজায় দাঁড়িয়ে। সে উঠে বসতেই নীচু স্বরে প্রশ্ন হল, 'খাবে না?'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল সরাসরি উত্তর না দিয়ে, 'সবাই খেয়ে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তুমি রাগে ফেরনি বলে না আজও খাবার রাখতে নিষেধ করেছিলেন।'

'তাহলে আমার খাবার আসবে কোথেকে?'

'আছে।'

'ভাল।' কল্যাণ কথাটা বলতেই বিনীতা ফিরে যাচ্ছিল। সে আবার ডাকল, 'শোন তোমার খুব ভাল লাগার কথা নয় এখানে। তাহলে আছ কেন?'

বিনীতা একটু থমকে গেল। তারপর মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কেন! আমি তো ভালই আছি।'

কল্যাণ হেসে ফেলল, 'চমৎকার! আচ্ছা, তুমি প্যারাডাইস-এর ঘটনা জানো?'

বিনীতা নীরবে মাথা নাড়ল।

‘তুমি খবরের কাগজ পড়ো না?’

‘না।’ তারপর সে চলে গেল।

কল্যাণ খুব বিমর্ষ হল। বিনীতারা কি করে জানবে? ওরা যতদিন না জানছে, ওদের ভাবনা যতক্ষণ না পাল্টাচ্ছে ততক্ষণ—!

শ্রিক সেই সময় বাইরে একটি গলা শোনা গেল, ‘কি ব্যাপার, সাতসকালে বাড়িটার এই অবস্থা কেন? মা—মা?’

গলাটা মেজদার। একটু হাঁকাহাঁকির পর বাবার কথা শোনা গেল, ‘সে নেই।’

‘নেই মানে? মা কোথায় গেল?’

‘তোর দাদার সঙ্গে তারকেশ্বরে গিয়েছে।’

‘সাবাস। তোমার বাড়ির হালচাল কিরকম?’

বাবা কোন জবাব দিল না। মেজদা এবার তার বউকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল।

একটা প্রাণবন্ত মানুষ যার কোন লক্ষ্য নেই, যে সম্মান আদায় করতে জানে না, ভাবেও না, বাড়িতে ফিরল। মানুষটিকে খুব ভাল লাগছিল কল্যাণের। কিন্তু মা আর দাদা এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই তা সে জানত না। হঠাৎ তারকেশ্বরে কেন? এই বাড়িটাই যেন ভারতবর্ষ। কেউ কারো খবর জানে না, জানতে চায় না। কারও সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। অথচ একই বাড়িতে প্রত্যেকের বাস। খাবারটা আসছে না। যতক্ষণ মেজবউদি কথা তোলেনি ততক্ষণ খিদেটাই ছিল না। কল্যাণ দেখল বড় বউদি যুথিকা যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। চোখাচোখি হতে যুথিকা এগিয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল, ‘কি খবর? আজ বাইরে রাত কাটাবে না?’

ঠোঁট কামড়ালো কল্যাণ। একটা কটু কথা বলার ইচ্ছে সামলে নিল, ‘না।’

‘আজ তোমার ভাগ্যে আর খাবার জুটবে না। মেজকর্তা না এলে জুটতো। কেউ কি তার ভাগ ছাড়ে।’

যুথিকা হাসল। তারপর ঘরে পা দিয়ে বলল, ‘অনেকদিন এই ঘরে আসিনি। বসব?’

মাথা নাড়ল কল্যাণ। যুথিকার হাতে এখনও ব্যাগুজ জড়ানো! কিন্তু প্রসাধনে সুখের আমেজ। খাটের একপাশে পা ঝুলিয়ে বসে যুথিকা বলল, ‘ছোট কর্তার খবর শুনেছ?’

‘কি খবর?’ কল্যাণ একটু অবাক হল।

‘পুলিসে ধরেছে। আচ্ছাসে প্যাঁদাচ্ছে। বড় বাড় বেড়েছিল।’

‘যাঃ। সুজনকে পুলিস ধরবে কেন? ও তো সরকারি দলের লোক।’

‘অত খায় না। তোমার দাদা বলছিল ওকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেলগাছিয়ার ওয়াগন ব্রেকারদের কাছ থেকে যারা হিস্যা পায় তাদের কাছে টাকা চেয়েছিল তাই। অল্পে তো মন ভরে না সোনার চাঁদের। এর আগে

নাকি কেস ছিল খানায় এখন ধরে নিয়ে গেছে।’
,কেউ জামিন দিয়ে ছাড়াতে যায়নি?’

‘কে যাবে? তোমার দাদা তো খবর শুনে তারকেস্বরে চলে গেল। বাপের ক্ষমতা জানো। যাক, এইসব ফালতু কথায় আমার দরকার নেই। সেদিন তোমার কথা আমার পিসতুতো বোন বর্ষা বলছিল। অমন সুন্দরী মেয়ে যে কেন দেখা হলেই তোমার কথা বলে তা বুঝি না বাবা!’ যুথিকা চোখমুখ ঘুরিয়ে কথাগুলো বলে ফিক করে হেসে ফেলল। এবং তখনই দরজায় বিনীতাকে দেখা গেল একটা ডিসে রুটি আর তরকারী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। যুথিকার হাসি চট করে মিলিয়ে গেল, বিনীতা খাবারটা টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল যুথিকা ডাকল, ‘এই যে, এখানে তো তোমার ভাসুর নেই, দেওরদের সঙ্গে তো খুব মাখামাখি, তা এখন মুখে বাক্যি নেই কেন?’

‘কি কথা বলব?’

‘অ। মন খারাপ? এতকাল বাদে স্বামী ঘরে এল তাও মন ভাল হল না। তা ভাল হবে কি করে? কাউকে অত মারধর করলে কি মন ভাল থাকে? কিন্তু স্বামীকে খাবার না দিয়ে দেওরকে দিচ্ছ যে বড়! রুটি তো ওই কটাই পড়েছিল!’

‘উনি খেয়ে এসেছেন।’ বিনীতা আর দাঁড়াল না।

কল্যাণ একমুহূর্ত চিন্তা করল। সূজনের জন্যে সে কখনও কোন টান তেমন বোধ করেনি। এর আগে মাস্তানি করার জন্যে কল্যাণ তাকে এড়িয়েছে যতটা সম্ভব। ও আছে থাকতে হয় বলেই এইরকম একটা মনোভাব তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণ চটপট খেয়ে নিল। খিদেটাকে সে কখনই এড়িয়ে যেতে পারে না। এমন কি এ বাড়ির তরকারির সেই বিদঘুটে স্বাদটারে পর্যন্ত খেয়াল করল না।

যুথিকা বলল, ‘অত তাড়াহড়ো কিসের! ধীরে ধীরে খাও। এরকমভাবে গল্প করার সুযোগ তো পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, যেকথা বলছিলাম, আজ বর্ষা এসেছিল। তুমি যদি ফাস্ট ক্লাশ পাও তাহলে ওর বাবা তোমাকে আমেরিকায় পাঠাতে রাজী আছেন। আমার পিসেমশাইকে তো জানো, টাকার কোন হিসেব নেই। বর্ষার সঙ্গে একটু ইয়েটিয়ে করলেই হয়ে যাবে।’

‘তাতে এ বাড়ির কি লাভ?’

‘এ বাড়ির কথা কে ভাবছে! তোমারই ভাল হবে বর্ষা তো খারাপ মেয়ে না।’

‘বড্ড বাজে কথা বলছ!’

‘ইস! তুমি অমন করে বকছ কেন আমাকে? কতদিন পরে তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলতে এলাম। মেরা তো ছোট্টর সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। আমার কপাল কেন পোড়া হবে?’ যেন খুব মজার কথা বলছে এমনভাবে

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল যুথিকা।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণ কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। কলতলায় মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই সে মেজদাকে দেখতে পেল।

খালি গায়ে লুঙ্গি পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর রে? বাড়িটা ডিপফ্রিজ হয়ে গেল কেন?'

কল্যাণ বলল, 'অনেকদিন বাদে এলে বলে এইরকম মনে হচ্ছে। আমি একটু আসছি।'

'এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস?'

প্রশ্নটা শুনে কল্যাণের ভাল লাগল। এইরকম আন্তরিক গলায় এ বাড়িতে কেউ আজকাল কথা বলে না। সে জবাব দিল, 'থানায়। শুনলাম সূজনকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'সেকি। সেই তো এতকাল পাড়ার হিরো ছিল। কি করেছিল সে।'

'জানি না।'

'আমি যাব তোর সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল কল্যাণ, 'না। অনেকদিন পরে এলে, তুমি এখন রেস্ট নাও।'

রাত্রির কলকাতা দিনের চেয়ে অনেক সুন্দরী। আলো আধারিতে মেশা রাস্তার নির্জনতা চমৎকার শান্তি ছড়ায়। রাত হয়েছে, পথের চেহারায় মালুম হল। দু-একটা রিকশা কিংবা অলস মানুষ ছাড়া পথটা পরিষ্কার। বক্ষিমদার ডম্বুধের দোকানটাও বন্ধ।

থানা বেশী দূরে নয়। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণ দেখল বেশ জোরালো আলো জ্বলছে। দুজন কনস্টেবল বাড়ান্দায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে একজন

মোলায়েম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই ভাই?'

কল্যাণ বলল, 'দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করব।'

'ও সি সাহেব তো এখন থানায় নেই। কি ব্যাপার বলুন।' লোকটি সত্যি বিনীত।

'আমার ভাইকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে সেই ব্যাপারে কথা বলব।'

'ও, ওপাশের ঘরে যান, সেকেন্ড অফিসার আছেন।'

থানা সম্পর্কে কত উল্টোপাল্টা ঘটনা শুনেছিল কল্যাণ, এখন মনে হল সেগুলো সব ঠিক নয়। ভেতরের ঘরে ঢুকে দেখল তিনজন মানুষ তিনটে টেবিলের ওপাশে বসে গল্প করছেন। তাদের সামনে মোটামুটি এই রাত্রেও ভিজিটারস আছে। যে ঘাঁর কেস নিয়ে কথা বলছেন। তিনজনের মধ্যে যিনি বেশী সক্রিয় তাঁকেই সেকেন্ড অফিসার সাব্যস্ত করল সে। শুদ্রলোক তখন তাঁর সামনে দাঁড়ানো মানুষটিকে আস্থস্ত করছিলেন, 'আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনি বাড়ি যান আমরা দেখছি।' মানুষটি বিদায় হলে সেকেন্ড অফিসার চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে উঁচু গলায় মন্তব্য করলেন, 'সত্যি, মানুষ কত সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকে। মানুষের কত ঝকমারি।' তারপর কল্যাণের

দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন ভাই, আপনার কি সমস্যা?'

কল্যাণ ও'র মুখোমুখি হল, 'আমি গুনলাম আমার ভাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।'

'ভাই-এর নাম?'

'সুজন। আমি কল্যাণ।'

'ও। হ্যাঁ, সুজন আমাদের এখানে আছে। ও আপনার কিরকমের ভাই?'

'নিজের।'

'পার্টি করেন?'

'না।'

'ও থাক না এখানে কিছুদিন। কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন?'

'আমি জানতে চাইছি ওর বিরুদ্ধে কেসটা কি? ও জামিন পেতে পারে কিনা?'

'কেস যেমন হয়ে থাকে। মাস্তানদের কেস হাওয়া পালালেই তৈরী হয়ে যায়। আর জামিন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই পেতে পারে। কিন্তু জামিন পেলে ওর ক্রতি হবে। সুজনও চাইছে না বাইরে বের হতে। অন্তত দিন চারেক। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলবেন? যান না ওপাশেই ওরা আছে!' হাত বাড়িয়ে আর একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন অফিসার।

কল্যাণ সেদিকে কিছুটা হাঁটার পর খাঁচাটাকে দেখতে পেল। জনা পনের বিভিন্ন বয়স এবং চেহারার মানুষ গুয়ে বসে রয়েছে। কেউ কেউ আবার তাস খেলছে। এত রাত্রে সুজন একটা সিনেমা পত্রিকা দেখছিল। তাকে দেখে বিন্দুমাত্র অসুখী মনে হচ্ছিল না। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বাটে কিন্তু কল্যাণের মনে হল সুজন মোটেই আহত নয়। মারধরের সামান্য চিহ্ন তার শরীরে নেই। চিৎ হয়ে শোওয়া সুজনের একটা হাঁটুর ওপর আর একটা পা দুগ্ন ছিল। নিঃশব্দে সরে এল কল্যাণ, অফিসার ঠিকই বলেছেন। সুজনের চেহারা এবং ভঙ্গী বলে দিচ্ছে সে মোটেই অসুখী নয়। এই অবস্থায় ওর জন্যে উদ্ভিগ্ন হবার কোন মানে হয় না।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলল?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে।'

'আরে ভাই আমরা তো চিরকাল পাবলিকের গালাগাল খেয়ে এলাম। কিন্তু মানুষের উপকারও তো কিছুটা করি। সুজন যদি বাইরে থাকত তাহলে ওর অ্যান্টিপার্টি ওকে ছিঁড়ে খেত। শেলটার নেবার জন্যে খানার চেয়ে আর ভাল জায়গা কি আছে। চার পাঁচ দিনে হাওয়া নর্মাল হয়ে গেলে হয়তো ওর অ্যান্টিপার্টি শেলটার নিতে আসবে।' কথা থামিয়ে অফিসার বেজে ওঠা টেলিফোন-টাকে কব্জা করলেন, 'হ্যালো! হ্যাঁ ইয়েস স্যার, হ্যাঁ, তিনটে ছেলে আর মেয়ে একুশ বাইশ বছর, ও কে স্যার, ঠিক আছে।'

চলে যাওয়ার আগে শব্দগুলো কানে যাওয়া মাত্র কল্যাণ শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

সেকেণ্ড অফিসার খানিকক্ষণ পরে রিসিভার নামিয়ে ঘুরে দ্বিতীয় অফিসারকে জিজ্ঞাসা করল, 'পাল, আমাদের তল্লাটে তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ের কোন গ্যাও আছে ?'

পাল হার নামে তিনি বললেন, 'মেয়ে ? তিনটে ছেলে আর মেয়ে। ওই তো খালধারের হিনি আর তার নাগর। কিন্তু কেসটা কি।'

'প্যারাডাইসে ডাকাতি। রুটিন রিপোর্ট দিতে হবে। হিমির ফোর ফাদার অবশ্য ওই কাজ করতে যাবে না তবু ওদের ডেকে পাঠাও।'

কল্যাণ বলল, 'আমি আসছি।'

সেকেণ্ড অফিসার ততক্ষণে কি সব লেখা শুরু করেছেন সেই অবস্থায় মাথা নাড়লেন। নির্জন রাস্তায় নেমে কল্যাণের পা সিরসির করতে লাগল। পুলিশ তাহলে বুঝতে পেরেছে কজন ছিল ! ওরা এখন পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করছে। আনন্দকে খবরটা দিতে হবে। এখন কোন অবস্থায় চারজনের প্রকাশ্যে দেখা করা উচিত নয়। জোরে জোরে পা চালাতে লাগল কল্যাণ।

সুদীপ আর অবনী তালুকদার মুখোমুখি বসেছিল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু উত্তেজিত শব্দ বিনিময় হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবনী তালুকদার বললেন, 'তোমাকে টাকা দিয়ে আমার কি লাভ ?'

'আপনাকে আর কখনও আমার মুখোমুখি হতে হবে না।'

'তোমাকে আমি কেয়ার করি নাকি ? তোমাকে আমি ভয় পাই ?'

'পান। মা এককাল শুয়ে থাকলেও ভয় পেতেন। শেষ কাঁটা আমি। এটাকে উপড়ে ফেলার সুযোগ পাচ্ছেন, সুযোগটা হাতছাড়া করার মত বোকা আপনি নন।' সুদীপ নিলিপ্ত গলায় বলল।

'সুদীপ আমি তোমার বাবা, ডোল্ট ফরগেট ইট।'

'আমার সন্দেহ আছে।'

'মানে, হোয়াট ডু য়ু মিন ?'

'আমার বাবার মিনিমাম য়েটুকু হৃদয় থাকা উচিত আপনার তা নেই।'

অবনী তালুকদারের মুখটা বুলডগের মত হয়ে গেল, 'টাকা নিয়ে তুমি কি করবে ?'

'ফুটি করব।'

'স্টপ ইট, এইভাবে কথা বলবে না আমার সঙ্গে। তুমি তাহলে এই বাড়িতে আর থাকবে না ? আমার সম্পত্তির ওপর কোনদিন নজর দেবে না ?'

'ঠিক বলেছেন।'

'কিন্তু এসব নিয়ে আমি কি করব ? আমি মরে গেলে তো তুমি মালিক হবে। আমার ইচ্ছে না থাকলেও—'

'আমার ইচ্ছে নেই। পাপের টাকা ভোগ করতে চাই না।'

'ও। তাহলে এখন টাকা চাই কেন ?'

‘পূণ্য করব বলে। অনেকরূপ একই কথা বলছেন, মালটা বের করুন।’

‘ওই ভাষায় কথা বললে আমি এক পয়সাও দেব না।’

‘আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন। নার্স কোথায়?’

‘নার্স আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি। আমার আয়া হলেই চলবে।’

‘সাবাস।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমাকে টাকা দিচ্ছি আমি। কিন্তু তোমাকে এখনই লিখে দিতে হবে ভবিষ্যতে আমার সম্পত্তির ওপর তোমার কোন দাবী থাকবে না।’ অবনী তালুকদার উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। রাগী এবং অন্ধ মেয়ের মত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

সুদীপ বলল, ‘আপনি যা ইচ্ছে লিখে আনুন আমি সই করছি।’

হঠাৎ বেশ হালকা লাগল নিজেকে। সুদীপ দুবার আঙুলে তবলার বোল তুলল টেবিল ঠুকে। এবং সেই সময় জলের জগ হাতে একজন অল্পবয়সী মেয়েকে সে দেখতে পেল। মেয়েটির গায়ের রঙ শুধু কালো নয়, মুখে সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র ছায়া নেই। ঈশ্বর ওকে শুধু বাড়তি শরীর দিয়েছেন। মেয়েটি অবনী তালুকদারের ঘরের দিকে যাওয়ার সময় সুদীপের দিকে স্পষ্টতই অপছন্দের দৃষ্টি রেখে গেল। সুদীপের চোয়াল শক্ত হচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। অবনী তালুকদার এখন যা ইচ্ছে করতে পারে। এই লোকটার পিতৃত্ব যখন সে অস্বীকার করেছে তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে মায়ের ঘরের দিকে তাকাল। তারপর নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল। এবং তখনই বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি চলে এল। এই ঘরটায় সে এতকাল একা একা ছিল। দেওয়ালের দাগগুলো পর্যন্ত তার ভীষণ চেনা, ওই দাগগুলোকে নিয়ে মনে মনে কত ছবি এঁকেছে এককালে। এখনও বুকসে লুফে তার বই ওয়ার্ডরোবে জামা প্যাণ্ট। সুদীপ বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল অবনী তালুকদার কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তার মুখের চেহারা এখন স্বাভাবিক নয়। একটু চিন্তিত এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। যদিও তিনি রাগত ভঙ্গীটা রাখার চেষ্টা করলেন, ‘ওঘরে কি করছিলে?’

‘শেষবার দেখে এলাম।’

সুদীপের কথা শেষ হওয়া মাত্র অবনী তালুকদার টেবিলে ফিরে গেলেন। সেখানে একটা মোটা লম্বা খাম রাখা ছিল। সেইটে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, ‘এই নাও তোমার টাকা।’

সুদীপ এগিয়ে এসে খামটা তুলে নিল, ‘কত আছে?’

‘সত্তর। এর বেশী এক পয়সা দেবার উপায় নেই আমার। গুণে নিতে পারো।’

সুদীপ চিন্তা করল এক লহমা। না, আর চাপ দিতে প্ররুতি হচ্ছে না। সে নোটগুলোকে দেখল। বেশীর ভাগই একশ টাকার ব্যাঙ্ক, দশও আছে।

খামের মুখটা বন্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার অক্কে কখনই ভুল হয় না। তবে ওর মধ্যে জালি মিশে যায়নি তো?'

'জালি! জালি মানে?' হতভম্ব হয়ে গেলেন অবনী তালুকদার। ওঁর হাতে ধরা কাগজটা এবার কাঁপতে লাগল। সুদীপ প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে কাগজটা টেনে নিল। তারপরেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাড়িতে টাইপরাইটার নেই অথচ অবনী তালুকদার ইংরেজীতে টাইপ করিয়ে রেখেছিলেন। পুরো ব্যাপারটাই পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। লেখাটা পড়ল সে। 'আমি সুদীপ তালুকদার, বয়স একুশ বছর দুমাস তিনদিন, শ্রীঅবনী তালুকদারের একমাত্র পুত্র, স্বৈচ্ছায় এবং সানন্দে ঘোষণা করছি যে আজ এই মুহূর্ত থেকে আমি আমার পিতা শ্রীঅবনী তালুকদারের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির ওপর থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকার ত্যাগ করছি। আজ থেকে আমি এবং আমার বংশধরগণ আর শ্রীঅবনী তালুকদারের স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হবে না। এই ঘোষণা আমি কোন চাপের দ্বারা করতে বাধ্য হচ্ছি না।' নীচে তার নাম, আজকের তারিখ এবং ঠিকানা টাইপ করা।

সুদীপ হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'সাক্ষী থাকবে না কেউ? কলমটা দিন।' 'দরকার নেই।' অবনী তালুকদার একটা সস্তা কলম টেবিলের ওপর রাখলেন।

সুদীপ বেশ যত্ন করে সই করল। তারপর কাগজ এবং কলম রেখে উঠে দাঁড়াল, 'এখন থেকে আপনি মুক্তপুরুষ। যা ইচ্ছে করুন কেউ বলতে আসবে না! চলি।'

সুদীপ পা বাড়াতেই অন্য গলায় কথা বললেন অবনী তালুকদার, 'সুদীপ, এটা কি ঠিক করছ?'

'মানে?' সুদীপ অবাক হয়ে ফিরে তাকাল।

'আফটার অল উই ফাদার অ্যাণ্ড সন। এইভাবে চলে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে?'

আপনি তো এতকাল তাই চেয়েছিলেন। মাকে আপনি কোনকালেই সহ্য করেননি। আমার সঙ্গে আপনার কোন সেতু ছিল না। চিরতাকাল আপনি নিজের জন্যে ভেবে এসেছেন। তাছাড়া আমারও এই শাবকের জীবনে থাকার কামনা নেই। প্লিজ, শেষমুহূর্তে আর কোন নাটক তৈরী করবেন না। টাকা-পুলোর জন্য ধন্যবাদ।'

সুদীপ বেরিয়ে আসছিল, পেছন থেকে অবনী তালুকদার বলে উঠলেন, 'টাকাগুলো সাবধানে নিয়ে যেও, দিনকাল খারাপ।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সতর্ক হল সুদীপ। এত সহজে টাকাগুলো হাতছাড়া করার মানুষ অবনী তালুকদার নন। তিনি টাকা দেবেন এটা বাড়িতে ফেরার আগেই ভেবে রেখেছিলেন। নইলে লেখাটা টাইপ করা হত না।

টাকাটা যাতে হাত ছাড়া না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে রাখেননি তো! দিনকালের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে নির্মল রাখার জন্যেই কি এই মন্তব্য! সুদীপ রাস্তাটা দেখল। এখন রাত হয়েছে। ঠাকুরের দোকানের সামনে দু-তিনজন খদ্দেরের ভিড়। খানিকটা দূরে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। কোন সন্দেহজনক ব্যাপার চোখে পড়ল না। বাঁ পাশের ফুটপাথ দিয়ে হনহন করে হাঁটিতে লাগল সে প্যাকেটটাকে হাতে ঝুলিয়ে। এত টাকা সঙ্গে নিয়ে সে কোনদিন হাঁটেনি বলে কেমন একটা ঘোর লাগছিল। প্রাইভেট কারটা দাঁড়িয়ে আছে ডান ফুটপাথ ঘেঁষে। এই ব্যাপারটাও অস্বাভাবিক। সে যখন প্রায় সমান্তরাল তখন একটা লোক গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বার করে তাকে দেখল। সুদীপ আরও জোরে পা চালাতেই ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল এই মুহূর্তে সাবধান হওয়া উচিত। কয়েক পা দৌড়ে চট করে বাঁ দিকের গলিতে ঢুকে পড়ল সে। কোন দিকে না তাকিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছিল সুদীপ খামটাকে আঁকরে ধরে। এই গলিটা তার মুখস্ত। ছেলেবেলায় অনেক লুকোচুরি খেলেছে সে। ডান দিকের একটা বাড়ির পাশ দিয়ে একটা মানুষ যেতে পারে এমন পথ আছে। সুদীপ সেইটে ব্যবহার করল। এখন আর পেছনে তাকাবার সময় নেই। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। কয়েকটা কুকুরের চিংকার কানে এল। এরা গৃহপালিত জীব। আক্রান্ত হবার ভয় নেই। ঘড়িতে যখন এগারটা তখন বাসিগঞ্জ পার্ক রোডে পৌঁছাল সুদীপ। প্যারাডাইসে অভিশ্যান করেও যা হয়নি এই মুহূর্তে তার চেয়ে অনেক বেশী ছিবড়ে মনে হচ্ছিল নিজেকে। বাকী পথটা অশ্রুত আতঙ্ক নিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। কিন্তু কেউ আক্রমণ করেনি, সামনে এসেও দাঁড়ায়নি। অথচ প্রতিক্ষণই মনে হচ্ছিল কেউ না কেউ আসছে।

লিফটে চেপে জয়িতাদের ফ্ল্যাটের দরজায় চলে এল সুদীপ। বেল বাজাতেই দরজা খুলল। সুদীপ দেখল অত্যন্ত সুন্দরী এবং সুবেশা এক মহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে। তখনও ধাতস্থ হয়নি সুদীপ, কিছু বলার আগেই মহিলা প্রশ্ন করলেন, 'কাকে চাই?'

'জয়িতা আছে?'

'আছে। তুমি কে?'

'আমি সুদীপ। ওর সঙ্গে পড়ি!'

'ও। এত রাত্রে এসেছ, কি ব্যাপার?'

'আমি এখন এই বাড়িতে আছি।'

'এই বাড়িতে মানে, আমাদের এখানে তুমি আছ অথচ আমি জানি না।'

সীতা রায়ের গলার বিস্ময় ফুটে উঠতেই ভেতর থেকে জয়িতা বলে উঠল, 'বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে, ভেতরে আয় সুদীপ!'

সীতা রায় দুই ভ্রু এক করে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর কোন কথা না বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি খবর?’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘ঠিক আছে! যে ঘরে আমি ছিলাম সেখানে যেতে পারি?’

‘নিশ্চয়ই। উনি হলেন সীতা রায়। আমার সম্মানিতা গর্ভধারিণী। এখন মেজাজ গরম আছে। ট্রিটমেন্টের জন্যে কিছু মনে করিস না। একটু মনের কষ্টে আছেন।’ জয়িতা কোমরে হাত রেখে বলল। এখন ওর পরনে হলদে পাঞ্জাবি আর সাদা প্যান্ট। সুদীপ কথা বাড়ল না। জয়িতা ওকে অনুসরণ করে ঘরে এল। এসে বলল, ‘তোমার জিনিসপত্র এই আলমারিটার মধ্যে রেখেছি।’

সুদীপ চোখের কোণে আলমারিটা দেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল খাতে। জয়িতা টেবিলের ওপর উঠে বসে চেয়ারে পা রাখল, ‘টায়াড?’

‘নট অ্যাট অল। জাস্ট একটু শুয়ে নেওয়া।’

‘ঘুমোচ্ছিস? না চোখ বন্ধ করে ভাবছি।’ এইরকম হল কথাটা।

‘খাবি কিছু?’

‘এখন থাক।’ সুদীপ কনুইতে ভর দিল, ‘অবনী তালুকদার টাকা দিয়েছেন। চাপ দিলে আরও ম্যানেজ করতে পারতাম। কিন্তু প্ররুতি হল না। আনন্দকে খবরটা জানানো দরকার।’

জয়িতার মুখটা উজ্জ্বল হল, ‘গুড। টাকাগুলো কোথায়?’

সুদীপ মাথার পাশে রাখা প্যাকেটটা দেখাল।

জয়িতা একটু অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই ওইভাবে হাতে বুলিয়ে টাকা এনেছিস? যদি পথে কিছু হয়ে যেত?’

সুদীপ বলল, ‘হয়নি দ্যাটস অল। আমার জন্মদাতাই ছিনতাই করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন নিশ্চয়ই খুব আফসোস হচ্ছে ভ্রূনোকের। গয়নার ব্যাপার তোমার গর্ভধারিণী জানতে পেরেছে?’

‘এখনও না। বাবা বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি ফিরেছেন। দাজিলিং-এর ঘোর এখনও কাটেনি। বোধহয় প্লেন নেট ছিল। সীতা-রায়ের সাক্ষাৎ হয়নি অযোধ্যায়।’ জয়িতা চোখ বন্ধ করল, ‘আমরা একটা প্যারাডাইস পোড়ালাম কিন্তু এখন ঘরে ঘরে প্যারাডাইসের নামক নামিকারা একই অভিনয় করে যাচ্ছে। তাদের তো জানচক্ষু খোলাতে পারব না।’

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ এসে থামল, ‘তোমার ফোন।’

সীতা রায় ঘোষণা করে ফিরে গেলেন। চট করে নেমে পড়ল জয়িতা। তারপর কোন কথা না বলে প্রান্ত দৌড় লাগাল। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ

করল সুদীপ। সত্যি এখন ক্লাস্ত এবং ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। কিন্তু সীতা রায়কে দেখার পর থেকে খাবারের কথাটা বলতে সংকোচ লাগছে। জন্মিতা যাই বলুক না কেন এই বাড়িতে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। এখন যেকোন হোটেলের থাকার সামর্থ্য আছে তার। শুধুমাত্র পুলিশ যাতে সন্দেহ না করে সেই ভয়ে এইভাবে থাকা।

চুকে গেল আজ সব সম্পর্ক। বলতে গেলে পৃথিবীতে সে এখন একা। সত্যিকারের মাতৃপিতৃহীন সে কবে হয়েছিল? নিজের মনেই সে হেসে ফেরল। জীবনের শেষদিকে মা অসুস্থ ছিলেন, একেবারেই শয্যাশায়ী কিন্তু যখন তিনি সুস্থ তখন তো বাবার কোন কাজের প্রতিবাদ করেননি। বাংলাদেশের মায়েরা চিরকালই স্বামীদের মার্শাল 'ল' মুখ বুজে মেনে নিয়ে থাকে। তাদের সময় থেকে হয়তো অবস্থাটা পাগলটাবে। আবার এই বাড়িতে সীতা রায় তো রামানন্দ রায়ের চেয়ে কোন অংশে কম নন। স্বাধীন মহিলা হিসেবে তিনি যা হচ্ছে তাই করতে পারেন। বয়স্কের সঙ্গে দাজিলিং ঘুরে আসতে পারেন বুক ফুলিয়ে। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তার পাল্লা নিশ্চয়ই সমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও জন্মিতা মনে করে সে একলা। তার কোন যোগাযোগ নেই মা-বাবার সঙ্গে। ওই শ্রেণীর স্বাধীনতাভোগী মহিলারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কোনভাবে নিজেদের দায়বদ্ধ বলে মনে করেন না। মিসেস অবনী তালুকদার এবং মিসেস রামানন্দ রায় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ হয়েও কোথায় এক হয়ে গিয়েছেন। এবং তখনই লোকটার মুখ মনে পড়ল। প্যারাডাইসের ককটেল রুমের লোকটা। কোনদিন সে চিন্তা করেনি কোন মানুষকে গুলি করে মারতে পারবে। প্রথমবার গুলিটা ছোঁড়ার সময় হাত কেঁপেছিল। দ্বিতীয়বার সরাসরি। একটি হত্যা-কাণ্ড করে ফেলল সে। অথচ নিজেকে খুশী বলে মনে হচ্ছে না তার। ওই গা গিন-গিনে অসীম ব্যাপারটা না ঘটালে হয়তো তার মন অত শক্ত হয়ে খুন করতে পারত না। আইনের চোখে সে খুশী। কিন্তু এই আইনকে কে কেয়ার করে। যে দেশের আইন মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচার সাহায্য করে না, যে দেশের আইন শুধু অর্ধাধাঙ্গদের পাহারাদার, সে দেশে এইরকম লক্ষ্যে খুন করতে সে সর্বসম্মত রাজী। কিন্তু তড়োহড়ো করে বোকামি করলে চলবে না। তিক এই লারণেই হোটেল নয়। আজ রাত্রে এই বাড়িতেই থাকতে হবে মেনে নিয়ে।

জন্মিতা গিরে এল। ওর মুখ উজ্জ্বল। এসে বলল, 'আনন্দ ফোন করেছিল। ওর মা এসেছিলেন। এখনও গ্রামের বাড়িতে কেউ খোঁজ খবর নিতে যায়নি।' সুদীপ চোখ বন্ধ করেই বলল, 'গেলেও লাভ হত না। অন্ধকারে কেউ দ্যাখেনি ভাল করে। তুই যে একটি মেয়ে এটাও কারও মাথায় ঢুকবে না। আনন্দটা থাকি।'

'কেন?' জন্মিতা প্রশ্ন করল।

'না হলে এরকম মা পায়। ভদ্রমহিলা বিশ্ববা। আনন্দ একমাত্র ছেলে।

অথচ বাধা দেবার বদলে নিজে এসে সাহায্য করছেন। বিশ্বাস কর, আমার একটা কথা খুব মনে হয়। এদেশের মেয়েরা যদি চায় তাহলে বিপ্লব অনিবার্য। এই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের অবসান মেয়েরাই ঘটাতে পারে যদি প্রতিটি ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরী হয়ে যায়।’ সুদীপ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল।

জয়িতা হঠাৎ উঁচু গলায় হেসে ফেলল। এবং তার হাসি খামছিল না।

সুদীপের মুখটা প্রথমে অবাক পরে গম্ভীর হয়ে গেল, ‘হাসছিস কেন?’

কোনরকমে নিজেকে সামলে জয়িতা বলল, ‘তোমার মাইরি হেঁচি ফাণ্ডা। অবিকল মুজিবের মত কথা বকছিস।’

‘মুজিব?’ এবার সত্যি সত্যি বিস্মিত সুদীপ।

‘মুজিবের রহমান। তোমরা সবাই ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা।’

‘ইয়াকি মারার লিমিট আছে জয়িতা। আর তাছাড়া মুজিব হলেন একটা ইন্সপিরেশন। একটা জাতিকে যিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। যদি তখনই শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে বাংলাদেশে তিনি চিরকাল আগুনের পাখি হিসেবে শ্রদ্ধা পেতেন।’

‘কি হলে কি হত ভেবে লাভ নেই। এই মানুষটাকেই শেষপর্যন্ত জনসাধারণের বিরক্তি কুড়োতে হয়েছিল তার অতিরিক্ত স্নেহানুভূতির জন্যে। সেটাই ঘটনা। কোন জিনিস অধিকার করা যতটা শক্ত তার চেয়ে বহুগুণ কঠিন সেটাকে ঠিকমত লালন করা।’ জয়িতা সিরিয়াস হল।

এইসময় শ্রীহরিদাকে দরজায় দেখা গেল। খপখপে পায়ে জয়িতার কাছে এসে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল। জয়িতা সেটা পড়ে শ্রীহরিদাকে ইশারা করল, ঠিক আছে। শ্রীহরিদা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেলে জয়িতা ঘোষণা করল, ‘শ্রীমুক্ত রামানন্দ রায় তোকে জানাচ্ছেন যে তুই ওঁর ঘরে গেলে তিনি খুশী হবেন।’

সুদীপ নীরবে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার?’

জয়িতা কাঁধ নাচাল। তারপর বলল, ‘হয়তো তোকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু এবাড়ি থেকে চলে যেতে বলবে না। দাঁড়া। আনন্দ জিজ্ঞাসা করছিল তুই টাকা পেয়েছিস কিনা। আমি বলেছি পেয়েছিস। ও মিনিট চল্লিশের মধ্যে আসবে। ট্যান্ডিতেই থাকবে। আমাকে বলেছে তোমার কাছ থেকে অন্তত পনের হাজার টাকা নিয়ে ওকে পৌঁছে দিতে। যারা মাল দেবে তারা আজ রাত্রিই টাকা চায়। আগামীকাল সকালে ও এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘দরকার নেই। আমি ওর সঙ্গে দেখা করছি এখন। আগামীকাল সকালে আমি এই বাড়িতে থাকব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তোমার বাবার নোটটা খুব গোলমলে। উনি নিজেই এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন এই ঘরে।’ সুদীপ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে

টাকার বরল।

জয়িতা বলল, 'না। বোকামি করিস না সুদীপ। তুই এত রাত্রে গিয়ে ট্যান্ডির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে ফিরে এলে দারোগারনা সন্দেহ করবে। ওরা তোকে চেনে না। দিনের বেলায় এক কথা কিন্তু রাত্রে যাই ঘটুক লোকে তা অন্যচোখে দ্যাখে। আমাকে সবাই চেনে, আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

সুদীপ বলল, 'আনন্দকে বলবি আমি ঠাকুরপুকুরের বাড়িতে চলে যেতে চাই।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'বলব।'

সুদীপ একবার ওর দিকে তাকাল। তারপর গুণে গুণে পনের হাজার টাকা আলাদা করে এগিয়ে দিল, 'এগুলো একটা খামে ভরে দিস। আর বলিস যাচাই করে নিতে।'

জয়িতা কিছু বলল না। আনন্দ অত্যন্ত সতর্ক ছেলে। সুদীপ যে মানসিকতা নিয়ে কথাটা বলল সে-ব্যাপারে আনন্দ অনেক বেশী ওয়াকিবহাল। সে ঘড়ি দেখল। চল্লিশ মিনিট বলেছে বাটে তবে পাঁচ দশ মিনিট আগেও আসতে পারে। যদিও এত রাত্রে পনের হাজার টাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো শোভনীয় হবে না। কিন্তু ডিনারের পরে নিচের বাঁধানো ঘেরা চালাতে অনেকেই পায়চারি করে। সেখানে হাঁটিতে হাঁটিতে গেটের দিকে নজর রাখা যাবে। জয়িতা টাকাগুলো নিয়ে বলল, 'চল তোকে রামানন্দবাবুর ঘরটা চিনিয়ে দিচ্ছি। যাবিই যখন তখন দেরি করে কি লাভ!'

সুদীপ বলল, 'আমি আগে বাথরুমে যাব। এইটুকু ফ্ল্যাটে ঘর চিনতে অসুবিধে হবে না। তুই বরং নিচে চলে যা, আনন্দ এসে পড়তে পারে।'

জিন্সের প্যাণ্টের ওপরে নোংরা গেজিটা রাখা যাচ্ছিল না। বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে বাত্নিকের পাঞ্জাবি চাপিয়ে চুল আঁচড়ে একটু ভদ্র হয়ে নিল সুদীপ। সিগারেটের প্যাকেটটা রাখতে গিয়েও আবার পকেটে ভরে নিল। আজকাল একনাগাড়ে অনেকক্ষণ সিগারেট ছাড়া জেগে থাকতে পারে না। খাক কিংবা না খাক পকেটে সিগারেট আছে এটাই স্বস্তিদায়ক মনে হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটটাকে খুব নির্জন বলে মনে হল তার। ছোট্ট ড্রয়িং রুমে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যটা দেখল। কোণে একটা রঙিন টিভি চলছে। কিন্তু তাকে শব্দহীন করে রাখা হয়েছে। টিভির সামনে উবু হয়ে বসে মগ্ন হয়ে দেখছে শ্রীহরিদা। লোকটা যেহেতু কানে শুনতে পায় না তাই শব্দের কোন প্রয়োজন নেই। বোবা ছবিগুলোকে অন্যরকম মনে হল সুদীপের। এর একটা আলাদা মজা আছে। যে দেখছে সে ইচ্ছে মতন সংলাপ বসিয়ে নিতে পারে পাত্রপাত্রীর মুখে। ওপাশে দুটো ঘর। তার দুটো দরজা বন্ধ। মনে হয় ওর একটিতে রামানন্দ রায় আছেন। দুবার পিঠে চাপ দেওয়ার পর শ্রীহরিদার সম্ভিত ফিরল। সুদীপ ইশারায় জিজ্ঞাসা করল। কোন্ ঘরটায় তাকে যেতে হবে? তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সঠিক দরজাটা দেখিয়ে দিল শ্রীহরিদা। তারপর আবার টিভিতে

সেঁদিয়ে গেল। সুদীপ নিদিষ্ট দরজায় টোকা মারতে ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'ইয়েস, কাম ইন!'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে একটা ছিমছাম ঘর দেখতে পেল সুদীপ। রামানন্দ রায় আরাম করে বসে আছেন। তাঁর পরনে পাজামা পাজাবি। সামনে একটি পাশপোর্ট হইফি বোতল, জলের জাগ এবং আধাভরতি গ্লাস। বোঝা যাচ্ছে অনেকক্ষণ পান করছেন উদ্রলোক। এক পলকেই সুদীপ বুঝল উদ্রলোক চুলে রঙ বোলান এবং তাঁর চোখের তলায় ব্যাগ তৈরী হয়েছে। সুদীপকে তিনি লক্ষ্য করছিলেন। এবার বললেন, 'এসো। তোমার কথা আমি জয়ের কাছে শুনেছি। ওখানে বসো।' টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। সুদীপ বুঝল উদ্রলোক মদ খাচ্ছেন বটে কিন্তু এখনও নেশা হয়নি। কিংবা কোন কোন মানুষ নাকি আট-দশ পেগ খেয়েও স্বাভাবিক আচরণ করেন, ইনি হয়তো সেই শ্রেণীর। সুদীপ চুপচাপ চেয়ারটায় বসল। রামানন্দ গ্লাস তুলে নিঃশব্দে চুমুক দিয়ে বললেন, 'হোয়াটস দ্য ট্রাবল?'

'কি ব্যাপার।' সুদীপ শব্দ হল।

'ওঃ আমি তোমাকে এইমাত্র বললাম জয় তোমার কথা বলেছে।'

'তাহলে তো জেনেই গেছেন। ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে আমার কোন প্রশ্ন নেই একটা ছাড়া।'

'হোয়াটস দ্যাট।'

'আপনাদের ফ্ল্যাটে থাক। আপনারা পছন্দ না করলে সেটাই স্বাভাবিক হবে।'

'কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?' রামানন্দ রায়ের চোখ ছোট হয়ে এল।

'না। কিন্তু আমার অস্বস্তি আছে। এত রাত্রে কোথাও যেতে অসুবিধে হবে। আমি ঠিক করেছি কাল সকালে চলে যাব। আপনি আমাকে কিছু বলবেন বলে ডেকেছেন?'

'ইয়েস। আমি জানতে চাই হোয়াইট ইউ পিপল আর ডুইং?'

'মানে?'

'জয় একটা রাত বাড়িতে ছিল না। তারপরে তুমি এখানে হঠাৎ এলে আই নো মাই উটার। কেউ যদি বলে সে ফুটি করার জন্যে বাইরে রাত কাটিয়েছিল আমি বিশ্বাস করব না। আমি মনে করি সে মনে করেছে যুক্তিযুক্ত তাই তোমাকে এই বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। কিন্তু আমার জানা উচিত কেন সে বাইরে গিয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল?'

'আপনার মেয়ের ওপর যখন এতটা আস্থা রাখেন তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন না কেন?'

'জিজ্ঞাসা করেছি, সে উত্তর দেয়নি। দোষটা তার নয়, আমার। আমি কোনদিন তার কথা খয়াল করিনি। আমার সঙ্গে চিরকাল ওর একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ রয়ে গেল। আমি ওকে বুঝতে পারি কিন্তু—'

রামানন্দ রায় আর এক চুমুক দিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা !'
সুদীপ মানুষটিকে দেখল। লোকটা কতখানি জালি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।
সে হাসল। এবং অশ্লানবদনে বলল, 'আপনি মিছিমিছি চিন্তা করছেন।
আমরা সবাই ক্লাসিক্যাল মিউজিকে গিয়েছিলাম।'

'ক্লাসিক্যাল মিউজিকে?' রামানন্দ রায় হাঁ করে গেলেন।

'হ্যাঁ, আমরা সব বন্ধুবান্ধবরা একসঙ্গে গিয়েছিলাম। আপনাদের বাড়িতে
পাশনি বলে জয়িতা বলতে পারেনি। আপনি কখনও হোলনাইট ক্লাসিকাল
মিউজিক শুনেছেন?'

মাথা নাড়লেন দ্রুত রামানন্দ, 'না। আমি ওসব বুঝি না। হঠাৎ তোমরা ওই
অনুষ্ঠানে গেলে?'

'আমিও তিক বুঝি না তাই যেতে চাইনি। কিন্তু আনন্দ বলল, না গেলে ভাল
লাগার অভ্যাসটা শুরু হবে না তাই গেলাম। আপনিও একবার গিয়ে
দেখুন।'

রামানন্দ বাকি মদটুকু শেষ করলেন, 'এই কথাটা আমাকে বললে কি অসুবিধে
হতো?' এই মেয়েটাকে কিছুতেই বুঝতে পারি না। তোমার বাড়িতে কি
গণ্ডগোল হয়েছে?'

'মানে?'

'জন্ম বলছিল তোমার স্টেপমাদার নাকি বাড়ি থেকে চলে যেতে বলায় তুমি
বেরিয়ে এসেছ।' কোনমতে হাসি চাপল সুদীপ। সে চট করে সেই কুদর্শনা
দাসীটিকে স্টেপমাদারের তকমা পরাবার চেষ্টা করল। এতে হাসিটা বিস্তৃত
হল, 'আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি—আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?
যদি কিছু মনে না করেন!'

'ও সিগার।' রামানন্দ একটি বিদেশী সিগারেট প্যাকেট এগিয়ে দিলেন, 'ছেলে-
মেয়েদের সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে সফ্রোচ করার কি আছে? আমি শুধু
জয়কে বলি সস্তা দিশি কিছু খেও না। খেতে হলে বিদেশী সিগারেট, ফিল্টারটা
ভাল থাকে।'

সুদীপ নিজের প্যাকেটটা বের করল না। বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু হার ম্যাজেস্টি
দ্য কুইন সিগারেটটা ধরাল সে। এই মানুষটির আদ্য কত? এই সিগারেট
দিনে দুপ্যাকেট, আধবাতল স্কচ হইফি, বড় হেটেনে লাঞ্চ, ক্লাবে ডিনার,
দুটো গাড়ি, বিলাস বহুল ফ্ল্যাট সুচারুভাবে চালাতে গেলে মাসে কত ব্যয়
হয়? চাকরি করে এসব চালানোর খরচ পাওয়া যায়? ওর এক সরকারি
অফিসারের সঙ্গে আলাপ আছে। উদ্রলোক মাইনে পান সাতাশ শো। এক
মেয়ে মরেটোতে পড়ে। উদ্রলোক থাকেন তিনশো টাকার ফ্ল্যাটে। কিন্তু বাড়িতে
কালার টিভি-ডিসিআর আছে। এটাও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু পন্নতাল্লিশ
হাজারে অ্যামবাসাডর কিনেছেন উদ্রলোক। গাড়ির পেছনে ড্রাইভার সমেত
মাসে খরচ অন্তত দুহাজার। উনি চালান কি করে? আশেপাশের মানুষ তাঁর

সহকর্মীরা নির্বোধ? কিন্তু চোখ বুজে থাকার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে প্রত্যেকের। এখন একটু সুযোগ পেলেই মানুষ দুঃস্বপ্নী কারবার করে। এবং সেটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মুশকিল হল এইসব মানুষের সামনে আয়না ধরলে তারাই আগে ছি ছি করে উঠবে! যে কারণে প্রতুল চৌধুরীকে কেউ পছন্দ করে না। আর পাঁচটা লেখকের মত ইনিয়োগে বিনিয়োগ গল্প লেখেন না উদ্রলোক। সরাসরি পাঠকদের নকল সাজগুলো খুলে ফেলে দেখিয়ে দেন তারা আসলে কি এবং কি হবার ভান করে থাকে! প্রথম প্রথম লোকের মজা লাগছিল। এখন জঘন্য, অশ্লীল বলে চিৎকার শুরু করেছে। প্রতুলবাবুর সঙ্গে আলাপ করেছিল সে একদিন। খুব ভাল লেগেছিল। উদ্রলোক বিশ্বাস করেন এই দেশটার প্রধান শত্রু এর জনসাধারণ। নিরানন্দের ইজনেই ভণ্ড!

‘কি ভাবছ?’ রামানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন।

‘প্রতুল চৌধুরীর কথা।’

‘সে কে?’

‘একজন বিতর্কিত লেখক। আপনি বাংলা গল্প উপন্যাস পড়েন?’

‘না ভাই, অত সময় নেই আমার। তবে হ্যাঁ, ছেনেবেলায় পড়েছিলাম। খুব স্ট্রাগল করে আজ এখানে এসেছি। আমার বাবা ছিলেন গরীব মাস্টার। এসব কথা এখন তো কাউকে বলা যাবে না। আমি তো তোমাদের মত রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মাইনি? তুমি স্কচ খাও—নেবে?’

পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল সুদীপ। তারপর হেসে বলল, ‘এখনও সুযোগ পাইনি।’

‘জয় তোমার গার্লফ্রেন্ড?’

‘না।’

‘না? আই সি। তাহলে কি?’

‘আমরা বন্ধু। ওকে আমার মেয়ে বলে মনেই হয় না।’

‘হ্যাঁ, ওর শরীরটা—। আসলে ছেনেবেলায় একবার টাইফয়েড হয়েছিল। যাই হোক তাই বলে মেয়ে বলে মনে হয় না এটা ভাবা ঠিক নয়। আসলে প্যান্ট পরে বলে—।’

‘না না আপনি ভুল বুঝছেন। ওর শরীর কোন ব্যাপারই নয়। একটি মেয়ে নয়, ও আমাদের একজন বন্ধু। এর মধ্যে মেয়ে হিসেবে কোন ভূমিকা ওর নেই।’

‘আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তোমার বাবা কি করেন?’

‘শুনেছি আইনের ব্যবসা করেন।’

‘শুনেছ মানে?’

‘আমি কোন দিন দেখতে যাইনি।’

ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হল। আনন্দকে টাকা দিয়ে জয়িতা নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। রামানন্দ রায় একটু টিপসি এখন। গলার স্বর ভারী পরিশ্রম করে চিৎকার করলেন, ‘কাম ইন।’

চাবকের মত দরজাটা খুলে গেল। সীতা রায় গনগনে আঁচের মত করে ঢুকলেন। সুদীপ চমৎকার পারফিউমের অস্তিত্ব, সুগঠিত শরীরের বিদ্যুৎ এবং দার্শনিক পদক্ষেপ দেখল। সীতা রায় সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার ঘরে গিয়েছিলে ?'

চটজলদি মাথা নাড়লেন রামানন্দ রায়, 'নো। নো ডালিং !'

একটু থমকে গেলেন সীতা রায়। সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় তাঁর শরীরে একটা চেটে গড়িয়ে গেল। ঠোঁট কামড়ে এক লহমা দাঁড়িয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার আলমারি কে খুলেছিল ?'

'তোমার আলমারি ? স্ট্রেঞ্জ ! এত সাহস কার হল ?' সত্যি যেন অবাक হয়েছেন রামানন্দ।

'লিশ্ন ! আমি কদিন ছিলাম না। একটু আগে লক্ষ্য করলাম আমার একটা ভারি হার মিসিং। যাওয়ার কদিন আগে হারটা আমি ভল্ট থেকে এনেছিলাম। আমি জানতে পারি কি কে নিয়েছে ?' মহিলার মুখে রক্ত জমছে এবার।

রামানন্দ রায় উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি বসো ডালিং। বসো প্লিজ।'

সীতা রায় আপত্তি করতে গিয়েও করলেন না। চেয়ারে নোংরা আছে এমন ভঙ্গীতে সেখানে শরীর রাখলেন।

রামানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি চাবি দিয়ে যাওনি আলমারিতে ?'

'গিয়েছিলাম। এসেও দেখছি বন্ধ আছে। শুধু গয়নাটা নেই। এই বাড়িতে কেউ এখনও আমার জিনিসে হাত দেবে ভাবতে পারিনি। হয় তুমি, জয় কিংবা ওই বুড়োটা ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না। আমি ফেরত চাই, কাল সকাল আটটার মধ্যে।'

কথা শেষ করে উঠতে যাচ্ছিলেন সীতা রায়। হাত তুলে ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে বলল সুদীপ, 'আপনার একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমি বাধা দিলাম বলে ক্ষমা চাইছি !'

যেদহীন মসৃণ চামড়ার মুখটি স্প্রিং-এর মত ঘুরল, 'হোয়াটস দ্যাট ?'

'তিনজন নয়। চারজন। আপনি আমার নামটা ইনক্রুড করুন। আপনার অনুপস্থিতিতে আমি এই বাড়িতে ছিলাম।' সুদীপ খুব সন্দর করে হাসল।

আর সেটা দেখে যেন সীতা রায়ের শরীর জলে উঠল, 'আমি বুঝতে পারি না রামানন্দ এত উদার হল কি করে ? মেয়ে বয়স্ক্রেণ্ড নিয়ে বাড়িতে থাকছে, চমৎকার !'

রামানন্দ চটপট প্রতিবাদ করলেন, 'সুদীপ জন্মের বয়স্ক্রেণ্ড নয়।'

কাঁধ নাচালেন সীতা রায়, 'ইটস নট মাই হেডেক। মেয়ের ব্যাপারে যা ভালমন্দ তুমি বুঝবে। ঠিক আছে, চারজন, চারজনের যে কেউ ওরা ফেরত দিলে খুশী হব।'

রামানন্দ নতুন করে হাইকি টানছিলেন, 'কিন্তু কে চুরি করবে ? কার এত সাহস ? তুমি একটু নেবে ডালিং। তুমি তো আবার ভদকা ছাড়া কিছু

খাও না'

সুদীপ বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

'বলুন।' সীতা রায় তাকালেন না।

'এখানে বলাটা ঠিক হবে?'

সীতা রায় এবার ঘুরে বসলেন, 'কি বলতে চাইছেন?'

'এমন কথা যা হয়তো আপনি চাইবেন না উনি শুনুন।'

'লুক, আপনি ভনিতা না করে বলতে পারেন।'

'হারটা আপনি দার্জিলিং-এ ফেলে আসেননি তো?'

'না! সেখানে আমি হার নিয়ে যাইনি।'

'আপনি খুব নিশ্চিত?'

'মোর দ্যান দ্যাট।'

'যিনি আপনার সঙ্গে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন তাঁকে একবার ফোন করুন না।'

হয়তো তিনি এমন কিছু তথ্য দিতে পারেন—।'

'শুনুন' আমি বলছি হার আমি এখানেই রেখে গিয়েছিলাম। সান্যাল কিছুই জানে না।'

'তবু যখন বলছে সান্যালকে জিজ্ঞাসা করো না ডালিং।' রামানন্দ বললেন।

এখন ওঁর গলার স্বর আরও জড়ানো। চোখ ছোট হয়ে এসেছে।

'সান্যাল তো স্কাউন্ড্রেল তা সবাই জানতাম। শুধু পরের বউ-এর সঙ্গে ঘুমানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। তুমি বুঝেছ, বেটার লেট দ্যান নেভার ডালিং।' রামানন্দ যেন তৃপ্তি পেলেন।

'আমি কি বুঝি সেটা আমি জানি। আমি দার্জিলিং-এ গিয়েছিলাম। কিছু পাহাড়ি বাটিকের জন্যে। সান্যালও ওখানে গিয়েছিল। দ্যাটস অল। আমি কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই। সান্যাল নিশ্চয়ই স্কাউন্ড্রেল, লম্পট, কিন্তু তোমার ওই হিপো এন্ড্রিলা দত্ত তার চেয়ে কম নয়। আমি যাচ্ছি।' শব্দ করে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সীতা রায়।

'ওয়েল।' জড়ানো গলায় বললেন রামানন্দ রায়, 'গুডনাইট। কি যেন নাম তোমার? সুদীপ। গুডনাইট। কালকে বিদায় হও ভাই। আমার স্ত্রী চাইছেন না যখন তখন কেটে পড়। গুডনাইট।' গ্লাসের বাকিটা শেষ করে টলতে টলতে বিছানার দিকে এগোলেন রামানন্দ রায়। সুদীপ উঠে পড়ল। সীতা রায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল সকালে আমার হার চাই। এ ব্যাপারে আমি কোন কথা শুনতে চাই না।'

সুদীপ আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল শ্রীহরিদা টিভির সামনে উবু হয়ে বসে। কিন্তু টিভিতে কোন ছবি নেই। স্টেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে যদিও সেটটা বন্ধ করা হয়নি। নিঃশব্দে বড়ো ঘুমোচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে নবটা ঘুরিয়ে দিতে সীতা রায় বেরিয়ে এলেন। স্মার্ট পায়ের নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তুমি তখন কি বলছিলে?'

দাজিলিং-এর ব্যাপারে ?’

‘আপনি তো আমার কথা শুনতে চাননি।’

সীতা রায় সুদীপের আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমার ঘরে এস।’ তিনি আর দাঁড়ালেন না। সুদীপ জয়িতার জন্যে তাকাল। তাকে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। হার নিয়ে ওই ভদ্রমহিলা একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বেন না। আপাতত জয়িতাকে সন্দেহের তালিকা থেকে সরানো দরকার। সে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মধ্যরাত্রে সীতা রায় চুলে বেশ ব্রাশ ঝোলাচ্ছিলেন। বললেন, ‘সত্যি করে বলত তুমি কে?’

‘আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম। আমার মা বাবা ছিলেন। তাদের দেওয়া নাম সুদীপ।’

‘তুমি পাস্ট টেন্সে কথা বলছ।’

‘ব্যাপারটা আমার কাছে অতীত বলে।’

সীতা রায়ের মুখে হাসি ফুটল। হাসলে এই মহিলাকে এখনও মিলিট দেখায়। বললেন, ‘তোমাকে আমার বেশ অভিনব মনে হচ্ছে। শোন, দাজিলিং-এ আমি হার নিয়ে যাইনি। শ্রীহরির কোথাও হাওয়ার জায়গা নেই। ও চুরি করতেই পারে না। রামানন্দর সাহস হবে না আমার জিনিস হাত দেওয়ার, সেটা আমি জানি। বাকী থাকল জয়িতা। ওকে আমি বুঝতে পারি না আজ কাল। অশুভ ব্যবহার করে। অত্যন্ত উদ্ধত। মুখের ওপর যা তা কথা বলে। আর এ সবই হচ্ছে রামানন্দর প্রশ্নে।’

সরল মুখে সুদীপ বলল, ‘জয়িতা তো গয়না পরতে ভালবাসে না। আমরা তো দেখিনি।’

কাঁধ নাচালেন সীতা রায়, ‘নিজের মেয়েকে সন্দেহ করতে নিশ্চয়ই আমরা ভাল লাগছে না। কিন্তু এছাড়া যে আর কোন রাস্তা নেই। মাঝে মাঝে নিজেকে খুব একলা মনে হয়। আই অ্যাম রিয়েলি অ্যালোন। এবার দাজিলিং-টি পটা আমার খুব খারাপ গেল।’

‘আমারও তাই মনে হয়।’

‘কি মনে হয়? তুমি জানছ কি করে?’

‘একজন স্কাউন্ড্রেল লম্পট মানুষের সঙ্গে সময় নিশ্চয়ই ভাল কাটে না। তবে ওকে তো সবাই জানতো—।’

‘আমি শোনা কথায় বিশ্বাস করি না। তুমি সান্যালকে চেন?’

অম্লানবদনে মিথ্যে বলল সুদীপ, ‘হ্যাঁ। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের স্ত্রী ওর বান্ধবী।’

‘ওউ গড। লোকটা—। অনেকদিন পরে আমি জুল করলাম।’

‘সান্যাল নিতে পারে না?’

‘না না। সে ওসব ঠুনকো জিনিস চায় না। ও যে দাজিলিং-এ আরও

একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে যাচ্ছে তাকে জানতো। আমাকে ও প্রথমে প্যারাডাইসে যেতে বলেছিল। সেখানে গেলে তো মরে যেতাম। কাগজ যা দেখলাম—' শিউরে উঠলেন সীতা রায়, 'বড্ড বেশী রিস্ক নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ওখানে এই হল আর বাড়িতে ফিরে এই দেখছি।'

'আপনি কিভাবে দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন?'

'কেন! প্লেনে। আমি ট্রেনে বেশী ট্রাভেল করতে পারি না। সান্যাল এল। আমি তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর সোজা এয়ারপোর্ট। বাগডোগরা থেকে ট্যাক্সিতে দার্জিলিং-এ। জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'সান্যাল এখানে এসেছিলেন আপনাকে নিতে?'

'হ্যাঁ।' বলেই সীতা রায় স্থির হয়ে গেলেন। তারপরেই তাঁর মাথা নড়ল, 'ও যখন এই ঘরে বসেছিল তখন আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। কিন্তু ও জানবে কি করে কোথায় হার আছে!'

চটপট লুফে নিল সুদীপ, 'যারা জানার তারা জানে। আচ্ছা আমি আসি।' সে আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এল। উদ্রমহিলার মুখ এখন রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে। দার্জিলিং-এ যে প্রতারণা তিনি সহ্য করে এসেছিলেন হার হারানো তার চেয়ে বহুগুণ বেশী ঠেকছে। শরীরটা তো সাবান ঘাসে সাফ করে নেওয়া যায় কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার? সুদীপ হেসে ফেলল। আনন্দ যা চেয়েছে তা করতে গেলে আজই তিনটে গুলি খরচ করতে হত। অবনী তালুকদার, রামানন্দ রায় এবং সীতা রায়দের সংখ্যা যেভাবে হহ করে বাড়ছে তাতে অবশ্য তিনটে গুলি বাজে খরচের মধ্যে পড়ত। এই মুহূর্তে তার ভাল লাগল প্যারাডাইসের কথা বলার সময় সীতা রায়ের শিউরে ওঠা মুখটা মনে পড়ায়। আনন্দ এ ক্ষেত্রে ঠিক, ধাক্কা দেওয়া দরকার। আতঙ্ক কখনও মানুষের চেতনা ফিরিয়ে আনে। একবারে না হলে একাধিকবারে।

॥ ১৫ ॥

সকাল বেলায় আনন্দ আর কল্যাণ এল। সব ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে ওদের। জম্বিতা দরজা খুলে নিয়ে এল এই ঘরে। সোফায় বসে কল্যাণ বলল, 'কি দারুণ ফ্ল্যাটে থাকিস তোরা!'

জম্বিতা বলল, 'সাবধানে বসিস, যে কোন মুহূর্তে পায়ী ভেঙ্গে পড়তে পারে।' সোজা হয়ে বসল কল্যাণ, 'সে কিরে!'

হো হো করে হেসে উঠল সুদীপ 'দারুণ বললি জম্বী, কল্যাণ কথাতার ভেতরের মানে ধরতে পারেনি। ও বলছে বাইরেটাই সাজানো, ভেতরে ফাঁকা।'

গতরাত্রে জম্বিতার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে তার। সে আর জম্বিতা ডাইনিং টেবিলে খেয়েছে। বাকি দুজনের খাবার ঘরে ঘরে পৌঁছেছে শ্রীহরিদা। রামানন্দ রায় খেয়েছেন কি না জানা নেই, তবে সীতা রায় যে খেতে পারবেন না এটা বিশ্বাস ছিল। ক্রমশ এক সময় রাগ নয়, ওই মানুষ-

দুটোর জন্য কণ্ঠ হচ্ছিল সুদীপের। একটা সম্পর্করহিত-সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে আছে দুজনে। শরৎচন্দ্রের একটা লেখা পড়ে আনন্দ বলেছিল একদিন, 'চমৎকার ব্যাখ্যা পেলাম। নেতিয়ে পড়া আত্মীয়তা। সারা দেশটার মানুষের এখন ওই সম্পর্ক।' টার্মসট এখানে প্রযোজ্য।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা বাবা মা কোথায়?'

জয়িতা জবাব দিল, 'তারা তাদের মতো আছেন। এ ঘরে কেউ আসবে না।'

কল্যাণ বলল, 'আমার যদি বোন থাকত তবে তার ছেলে বন্ধুরা এইভাবে বাড়িতে এলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেত!'

জয়িতা তাকাল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি তোরা বোন হয়ে জন্মাইনি।'

কল্যাণকে থামাল আনন্দ, 'শোন সুদীপ, তুই ঠাকুরপুকুরে যেতে চাইছিস?'

'হ্যাঁ?'

'আরও তিনটে দিন অপেক্ষা করা যায় না?'

'কেন?'

'ঠাকুরপুকুর আমাদের চারজনের পক্ষে ভাল শেলটার। ওটাকে ডিম্‌টার করতে চাই না।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'আমি আগে গেলে ভাল হবে। আত্মীয় বেড়াতে এসেছে বলে পাড়ার সবাই ধরে নেবে। তোরা যখন যাবি তখন কাজকে তো বাইরে বের হতে হবেই। সেই কাজটা আমিই করব। আগে থেকে থাকলে লোক সন্দেহ করবে না।'

কল্যাণ বলল, 'কথাটা ও ঠিকই বলেছে।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'বেশ! তাহলে আজ দুপুরের পর ওখানে চলে যা। সঙ্গে কল্যাণকে নিয়ে যাবি। যেন দুই বন্ধু বেড়াতে এসেছিস। কলকাতা দেখবি এমন ভান করবি। বুড়িকে ম্যানেজ করার ভার তোরা। তাকে তো কেউ কেউ চেনে ওখানে। যাওয়ার সময় দুটো স্যুটকেস নিয়ে যাবি। মানে লোকে বেড়াতে গেলে যেভাবে যায় সেই রকম ভাবটা যেন থাকে।'

আনন্দ একটু চুপ করল। তারপর বলল, 'আজকের কাগজে প্যারাডাইসের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু নতুন খবর বেরিয়েছে। কাগজ সন্দেহ করছে এটা উগ্রপন্থীদের কাজ। কয়েক হাজার প্রায় নিরস্ত্র মানুষের সামনে ওখানে যা যা ঘটত তার বিশদ বিবরণ ছেপেছে ওরা। কোন সাধারণ ডাকাতি হলে তারা ডাকাতি করত। কাগজ বলেছে যারা ঘটনাটা ঘটিয়েছে তারা চেয়েছিল প্যারাডাইস চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাক। কোন আর্থিক লোভের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বলা যেতে পারে উগ্রপন্থীরা সফল।'

আনন্দ থামলে জয়িতা বলল, 'যাচ্চলে। কাজটা করলাম আমরা আর কৃতিত্ব পাচ্ছে উগ্রপন্থীরা!'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'উগ্রপন্থী কারা?'

জয়িতা উত্তর দিল, 'ওই যে, মাঝেমাঝেই কাগজে দেখি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে

পুলিশের সংঘর্ষ? তারাই।’ আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে যারা সরাসরি আঘাত হানতে চায় তারাই উগ্রপন্থী। আমাদেরও যদি ওই পর্যায়ে ফেলা হয় তাতে আপত্তি করার কি আছে। কেউ কারো কৃতিত্ব দখল করছে না; তাছাড়া তোরা নিশ্চয়ই হাতহালি পাবার জন্যে কাজে নামিসনি।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘পুলিশ কি আমাদের খবর পেয়েছে বলে মনে হয়?’ আনন্দ বলল, ‘না। পুলিশের ধারণা ঘটনাটা যারা ঘটিয়েছে তারা স্থানীয় লোক নয়। নির্দিষ্ট ফর্মুলাতে তদন্ত চালালে কখনই ওরা আমাদের কাছে পৌঁছাবে না। তবে সুদীপ, ওই প্রস্তাবটা আমাদের যেনে নেওয়া উচিত। এই ধরনের ঘটনা ঘটাবার পরই আমরা কাগজগুলোকে টেলিফোনে জানাব কেন ঘটলাম। সরাসরি জনসাধারণের ব্যাপারটা জানা উচিত।’

জয়িতা বলল, ‘প্যারাডাইসের ঘটনাটা মাথা থেকে চলে গেছে। এবার নতুনটা শুরু কর।’...

আনন্দ হাসল, ‘এবার খুব সহজে হবে না। মনে রাখিস, নকশালার পর্যন্ত ওখানে একটাও বোমা ফাটায়নি। তোদের কারোর সঙ্গে কোন ওষুধের দোকানের কর্মচারির যোগাযোগ আছে?’

চুপচাপ শুনছিল কল্যাণ, বলল, ‘আমার আছে।’

‘না। তোর সঙ্গে দোকানের মালিকের জানাশোনা। ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর ভদ্রলোক তোকে সন্দেহ করতে গারেন। ঠিক আছে, আমিই ম্যানেজ করব। আমি আর সুদীপ দশটা নাগাদ বড়বাজারে যাব। কল্যাণ দুটো নাগাদ সুদীপকে মিট করবি ধর্মতলায় শহীদ মিনারের সামনে। ওখান থেকে তোরা চলে যাবি ঠাকুরপুকুরে। দুদিন জায়গাটাকে ভাল করে ওয়াচ করতে হবে।’ আনন্দ বলল।

জয়িতা খানিকটা উষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি কি করব?’

‘গুমুবি। চুপচাপ বাড়িতে বসে রেস্ট নে। তুই আমাদের পোস্ট অফিস। এই বাড়িতে তোর এখন ভূমিকা কেমন? তোর ঘর এটা নয় নিশ্চয়ই!’

‘না।’

‘তোর ঘরে প্রাইভেসি আছে?’

‘জামি ছাড়া আর কেউ যায় না!’

‘চমৎকার। কাল রাতে যে জিনিসগুলো কিনেছি সেগুলো রাখার একটা জায়গা দরকার। আমার হোস্টেল-মোটেল সেফ নয়। আমি ওগুলো আজ যেকোন সময়ে এখানে পৌঁছে দেব। তুই বাড়ি থেকে কোথাও যাস না। পুলিশের পক্ষে এতদূর চিন্তা করা সম্ভব নয়। সুদীপ, তোর কাছে আর কত টাকা আছে? টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরপুকুরে যাবি।’

সুদীপ হাত বাড়িয়ে খামটা বিছানা থেকে তুলে নিল, ‘বেশ কয়েক হাজার আছে।’

কল্যাণের চেখ বড় হল, 'তুই ওভাবে টাকাগুলো ফেলে রেখেছিস ?'
সুদীপ বলল, 'কী হয়েছে তাতে! এ বাড়িতে ডেকে না আনলে চোর
আসে না।'

কথাটা শুনে একমাত্র জয়িতাই শব্দ করে হাসল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি
ব্যাপার ?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'ছেড়ে দে। আনন্দ, তুই ব্যাপারটা আর একবার খুলে
বল।'

মাস দুয়েক আগে আনন্দের হোস্টেলের একটি ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়। সামান্য
জ্বর। টুকটাকি ট্যাবলেট খেয়েছিল ছেলেটি। জ্বর কমছিল কিন্তু অস্বস্তি
ছিল। সন্ধ্যার পর জ্বর বাড়তে শুরু করে। ওটা এমন অবস্থা যখন লোকে
ডাক্তার ডাকার কথা ভাবে কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার কথা চিন্তাও করে না।
রাত দশটা নাগাদ ছেলের পেটে ব্যথা শুরু হল এবং বমি-বমি ভাব এল অথচ
বমি হচ্ছিল না। তখন ছেলেরা হোস্টেলের ডাক্তারকে খবর দিল। সব
হোস্টেলেই যেমন, এখানেও ভদ্রলোকের চিকিৎসা নিয়ে ঠাট্টা চালু আছে।
ঘোড়া ছাড়া কেউ ওঁর ওষুধে সুস্থ হয় না কিন্তু রক্ত ভদ্রলোক খুব যত্ন করে
দেখলেন। কিছু কিছু লক্ষণ ম্যালেরিয়ার হলেও সব মিলছে না। তিনি জ্বর
এবং বমি কমাবার ওষুধ দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাতেও কোন
কাজ হচ্ছিল না। বাড়তে বাড়তে জ্বর চারে পৌঁছে গেল। এবং সেইসঙ্গে
বমির ভাবটা বাড়ল। কাছেই মেডিকেল কলেজ। ভদ্রলোক একটা বমি বন্ধ
এবং পেট ব্যথা সারানোর ওষুধ ইঞ্জেকশন পুরে বলেছিলেন- 'মনে হচ্ছে এতে
কমবে। আধঘন্টা অপেক্ষা করি। তারপর প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যেতে
হবে।' অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আনন্দও সেই ঘরে ছিল। অসুস্থ ছেলের
ভদ্র ব্যবহারের জন্যে সবাইই প্রিয়। কিন্তু ইঞ্জেকশনটা পুশ করার পরই অদ্ভুত
কাণ্ড ঘটল। ছেলের সমস্ত শরীরে লাল লাল দাগ ফুটে উঠল। জ্বর কমতে
লাগল হ হ করে। হাসপাতালে পৌঁছবার আধঘন্টা পরেই সে মারা গেল।
হোস্টেলের ছেলেদের ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। বমি
এবং ব্যথার ইঞ্জেকশনে কেউ মারা যায় না। হাসপাতাল থেকে ডেখ
সার্টিফিকেট দেওয়া হল রক্তচাপে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে—এই কারণ
দেখিয়ে। ছেলেরা রক্ত ডাক্তারের ওপর হামলা করেছিল। তিনি সমস্ত দায়িত্ব
অস্বীকার করেছিলেন। ওই দুটো ওষুধের মিশ্রণ যে কোন মানুষের পক্ষে
ক্ষতিকর নয়। দরকার হলে তিনি আদালত পর্যন্ত যেতে রাজী হয়েছিলেন।
আনন্দের খুব খটকা লেগেছিল। সে পরদিন রক্ত ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেছিল।
মৃত্যু এবং ছেলেদের আক্রমণে ভদ্রলোক তখন দিশেহারা। আনন্দ একা তাঁর
সামনে বসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই রকম ইঞ্জেকশন আপনি আগে কখনও
দিয়েছিলেন ?'

রক্ত ডাক্তার মাথা নেড়েছিলেন, 'সারাজীবন, হাজার হাজার। কিন্তু কেন এমন

হল এবার বুঝতে পারছি না।’

‘আপনি ঠিক কি ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন?’

ডাক্তার ইঞ্জেকশন দুটোর নাম বললেন। হঠাৎ আনন্দের মাথায় প্রশ্নটা এল, ‘ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন তো, এই ইঞ্জেকশন দুটো জেনুইন ছিল কি না? আজকাল শুনেছি জাল ওষুধ বাজারে বেরিয়েছে।’

রুদ্ধ ডাক্তারকে হতভম্ব দেখাল, ‘তাই যদি হয় তাহলে আমি কি করব!’

‘আপনার ইঞ্জেকশনগুলো কি স্যাম্পেল হিসাবে পেয়েছেন?’

‘না। ফোনে যখন ছেলেটির অসুখের কথা বলা হল তখন তোমাদের ওখানে যাওয়ার সময় দোকান থেকে কিনেছিলাম। এ বাবদ বিল করলে তোমাদের হোস্টেল থেকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়।’

‘কোন দোকান থেকে আপনি কিনেছিলেন?’

ডাক্তার নাম বললেন। দোকানটা দেখেছে আনন্দ। মাঝারি দোকান। সে ইঞ্জেকশন দুটোর নাম লিখে নিয়ে সোজা দোকানটায় হাজির হয়েছিল। মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ছিলেন দোকানে। দুটো ফাইল কিনল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ‘আচ্ছা, আপনারা ওষুধ কেনেন কোথেকে?’

‘কেন?’ ভদ্রলোক সঙ্গিন্য চোখে তাকালেন।

‘না, আমি জানতে চাইছি। সরাসরি কোম্পানী থেকে কিনে আনেন?’

‘না হোলসেলারের কাছ থেকে।’

কথা বাড়ায়নি আনন্দ। ওখান থেকে সোজা প্রফেসর চ্যাটার্জির গবেষণাগারে চলে গিয়েছিল। প্যাথলজিস্ট এই মানুষটি আত্মভোলা। আনন্দকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁকে বিস্তারিত বলেছিল সে। ভদ্রলোক বাক্সসুদ্ধ ওষুধদুটো নিয়ে দেখেটেখে বললেন, ‘তোমার এমন সন্দেহ হল কেন? ব্যাচ নম্বর পর্যন্ত দেওয়া আছে। যা যা আইনে দরকার তার সবই ছাপা আছে। জাল ভাবার কোন কারণ দেখছি না।’

আনন্দ এও বলেছিল, ‘হয়তো কোন কারণ নেই। কিন্তু এই দুটো দেওয়ামাত্র সমস্ত শরীরে চাকা চাকা লাল দাগ ফুটে উঠবে কেন? কেন মনে হবে রক্ত জমে যাচ্ছে চামড়ায়। আমার বিশ্বাস রক্তচাপ বাড়িয়ে দেবার কারণ ওটা। পোস্টমর্টেম করলে বোঝা যেত।’

প্রফেসর চ্যাটার্জির নির্দেশমত বিকেলবেলায় সুদীপকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিল আবার। এর মধ্যেই তিনি পরীক্ষা করে রাখবেন। গিয়ে দেখলেন চ্যাটার্জী খুব উদ্বেজিত। মুখোমুখি হওয়ারমাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় কিনেছো এইগুলো? ইটস ডেঞ্জারাস, রিয়েল ডেঞ্জারাস।’

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। প্রফেসর বললেন, ‘দুটো ওষুধ ওদের কোম্পানীতে তৈরী করতে পারে না। কারণ বমির ওষুধটাতে আর শাই থাক বমি বন্ধ হবার কোন উপকরণ নেই। ব্যাথাটাতেও তাই। যারা তৈরী করেছে তারা ম্যানুফ্যাকচারিং কন্সট্রাক্ট ভাগ কমাতে পেরেছে। এই ওষুধ পুশ করলে

কারও যদি উপকার হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ মানসিক। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এই ওষুধ পেশেন্টের ক্ষতি করবে না। কোন খারাপ লক্ষণও দেখা যাবে না। ফলে এটা জাল কি না তা বোঝার কোন উপায় রইল না। কিন্তু মুশকিল হল এই দুটো ওষুধ মেশালে যে রি-অ্যাকশন হবে তা মারাত্মক। সরাসরি রক্তে অ্যালার্জি শুরু হয়ে যাবে। শরীরে তার চাপ বাড়বে। এবং সেই সঙ্গে রক্ত দানা বাঁধতে শুরু করবে। এ অন্যান্য ভীষণ অন্যান্য। ডাক্তাররা না জেনে পাপের অংশীদার হচ্ছেন। ইউ শুড বি স্টপড, রাইট নাউ। আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম। এক্ষুনি পুলিশকে ইনফর্ম করে এই দোকানের এই সব ওষুধ সিজ করানো উচিত।’ প্রফেসর খুব শ্রুত বলছিলেন। সুদীপ বলল, ‘কিন্তু ওই ওষুধগুলো অন্য দোকানেও নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। একটা দোকান থেকে নিয়ে কি লাভ হবে। বন্ধ করতে হলে সোর্সটাকেই আটকানো দরকার।’

‘অফকোর্স। আই মাস্ট রাইট। সরকারকে আমি ডিটেলস দিয়ে লিখব। ওদের তো জাল ওষুধ বন্ধ করার একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু তার আগে থানায় যাব। ওরা ইমিডিয়েটলি দোকানটা বন্ধ করুক। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?’ প্রফেসর দাঁড়ালেন।

ওরা প্রফেসরের সঙ্গী হয়েছিল। ও সি সব কথা শান্তভাবে শুনলেন তারপর বললেন, ‘দুটো ওষুধ একসঙ্গে মিশিয়ে শরীরে ঢোকাবার কি দরকার? আলাদা ভাবে দিলেই তো হয়।’

প্রফেসর খতমত হয়ে গেলেন, ‘মানে? ওষুধগুলো তো জাল।’

ও সি বললেন, ‘এ ব্যাপারে আমরা তো অনভিজ্ঞ মশাই। আপনার অভিযোগ উপযুক্ত দপ্তরে করতে হবে।’

‘সেকি! পুলিশ জাল ওষুধের কারবার বন্ধ করবেনা? ওই ওষুধ শরীরে ঢোকালে কোন কাজ হয় না।’

‘কিসে কাজ হয় বলতে পারেন? কোন কিছুতেই কাজ হয় না। আপনি ডায়রি করুন। আমি ওই দোকান থেকে এই দুটো ওষুধ সিজ করে অথরিটির কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা অ্যানালিসিস করে যদি প্রমাণ পায় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সব কিছুই একটা নিয়ম-কানুন আছে মশাই। ধরুন চোখের সামনে দেখলেন একটা লোককে কেউ খুন করল। আপনি তৎক্ষণাত্ তার ফাঁসী দিতে পারবেন? আপনারা ডায়েরি করে যান তারপর যা ব্যবস্থা নেবার আমি নেব।’

প্রফেসরকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সুদীপ বলেছিল, ‘এ তো ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যা। ও সির কথা শুনে মনে হল একশ মাসের এক বছর। কি করা যায়?’

আনন্দ বলেছিল, ‘কিছু করার নেই একথা আমি বিশ্বাস করি না।’

ওরা খোঁজ নিতে আরম্ভ করেছিল। ওই দোকানটি ওষুধ কেনে কোথেকে?

যারা ওষুধ এদের কাছে বিক্রী করে তারা তা কার কাছ থেকে পায় ? শেষপর্যন্ত বড়বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে একটা রাস্তার হৃদিশ পেয়েছিল ওরা। আনন্দ তখন ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোতে চায়নি। কারণ ওদের সেই পরিচিত ওষুধের দোকানটি পাঁচদিন বন্ধ থাকার পর আবার স্বাভাবিকভাবে চালু হয়েছে। সেই সময় ওই তিকানায় পৌঁছে কোন লাভ হত না। বরং বিপদের সম্ভাবনাই থাকত। যারা জাল ওষুধের কারবার করে তারা নিশ্চয়ই নিরীহ মানুষ হবে না। এবং তার প্রমাণও পেয়েছিল ওরা। কেউ বা কারা প্রফেসরকে টেলিফোনে হুমকি দেয়, যদি তিনি জাল ওষুধ নিয়ে বেশী মাথা ঘামান তাহলে যে কোন-দিন তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস নিতে হবে। সেদিনই খবরের কাগজে 'জাল ওষুধ বাজারে' শীর্ষক একটি সংবাদ বেরিয়েছে। টেলিফোনটি পাওয়ার পর প্রফেসর সাহস হারিয়ে ফেলেন। তিনি এ ব্যাপারে কথাবার্তা বন্ধ করলেন। পশ্চিম বাংলায় যে কোন সারা-জাগানো ঘটনার পরিণতি যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হল, দু'দিনেই লোকে বিস্মৃত হল, ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যেতে তাই দেরী হল না।

কিন্তু এই ঘটনাটা নিলে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে চারজনের। বড়বাজার মানেই অসৎ মানুষের ডেরা নয়। সেখানে নিরীহ, ভদ্রমানুষ প্রচুর আছেন। কিন্তু মতলববাজ ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম নয়। আনন্দের ধারণা গ্রামের একজন জ্যোতদারের শোষণ ক্ষমতার চেয়ে লক্ষ গুণ ক্ষমতাবান হল এখানকার পূঁজিপতি অসৎ ব্যবসায়ীরা। ওই একটি অঞ্চল সমস্ত পূর্বদেশের শুধু অর্থনীতি নয়, মানুষের বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। রাইটার্সে সরকার আছেন তিকই কিন্তু একটি, অদৃশ্য শাসনব্যবস্থা এখান থেকেই চালু আছে। সাতষাট্টি থেকে বাহাত্তর—সারাদেশ যখন তোলপাড় তখন সাধারণ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল সিঁথি কিংবা কসবায় কিন্তু বড়বাজারে একটাও বোমা পড়েনি। পূঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থাকলে সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল।

সুদীপ বলল, 'আমাদের জানাশোনার মধ্যে একটি প্রাণ অকারণে শেষ হয়েছিল। কিন্তু আর একজন এই জাল ওষুধের শিকার হয়েছে আমি জানি না। এসব কেউ বন্ধ করবে না। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় বৃথা আমরা মাথা ঘামাচ্ছি। শরীরের একটা অংশে যদি পচন ধরে সেটা কেটে বাদ দিয়ে দেহটাকে বাঁচানো যায়। কিন্তু যে দেহের সর্বত্র পচন সেখানে কোনটা বাদ দিবি? যদিকে তাকাবি কোরাপসন। ট্রাফিক পুলিশ থেকে সরকারী অফিসার হাত বাড়িয়েই থাকে। খাবার ওষুধ এমন কি মানুষ স্বপ্নও ভেজালে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদি দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েগুলোকে রেখে বাকি সব সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসা যায় তাহলে হয়তো পরবর্তী প্রজন্ম সঠিক সমাজব্যবস্থা গড়ে নিতে পারবে।'।

আনন্দ হেসে ফেলল, 'তুই যেমন এই কথা বলছিস তেমনি দেশের কিছু কিছু

মানুষ ওই অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা শুধু তাঁদের আলস্যকে বিরক্ত করব। এই সব মানুষকে কিন্তু তুই সমুদ্রে ফেলছিস না ?

‘কি বলতে চাইছিস ?’

‘আচ্ছা ধর, আমার মা। কোন রাজনীতি বোঝেন না, প্যাঁচ পয়জারে নেই, তিনি চান আমি সুস্থ খার্কি, দুবেলা নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। তার জন্যে আমার একটা ভাল চাকরি কিংবা ব্যবসা চাই। তিনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আমি ব্যবসায় অসৎ মানুষকে ঠকাই কিংবা ফাঁকি দিয়ে চাকরি করে কতৃপক্ষকে ডোবাই। কিন্তু তিনি চাইবেন খাঁটি খাবার ওষুধে অন্ধ-নির্ভরতা। এই মানুষকে তুই বর্জন করবি কোন যুক্তিতে? আর এইরকম মা-মাসী অথবা বোনের সংখ্যাই এই দেশে বেশী। পুরুষরা, যারা অর্থের জন্যে বাহিরে বেড়িয়ে তাল রাখতে পারছে না তারা ই বাধ্য হচ্ছে অসৎ উপায় অবলম্বন করতে। দশ জন অন্ধের সঙ্গে তোকে এক ঘরে কয়েক বছর রাখলে তোর নিজেরই লজ্জা করবে চোখ চেয়ে দেখতে। তুই তখন চোখ বন্ধ করে অন্ধ সঙ্গে সহজ হবি। চারপাশে লোকের মখন বেআইনী পথে জীবনযাপন করছে তখন নিজের অজান্তেই মানুষ তাই করে ফেলে। বেআইনটাই আইন হয়ে দাঁড়ায়।’

আনন্দ খামতে জয়িতা বলল, ‘তাহলে তুই বলছিস পুরুষরাই কোরাপটেড, মেয়েরা নয়।’

‘তা বলিনি। তবে একথা ঠিক মেয়েদের স্থির থাকার পার্শ্বেটজ নক্সুই ভাগ। এবং তার কারণ আছে। আমাদের দেশে মেয়েরা বাড়ির বাইরে টাকা রোজগার করতে আসছে বড় জোর চল্লিশ বছর। মার কাছে শুনেছি কলেজে পড়ার সময় মেয়েরা অধ্যাপকের পেছনে পেছনে ক্লাসে ঢুকত বেরুতো। সেটা তা সাতান্ন আটান্ন সালের কথা। দীর্ঘদিন গৃহবন্দী থাকায় মেয়েদের নিজেদের আচরণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। একটি পুরুষের চেয়ে একটি শিক্ষিতা মহিলা অনেক বেশী ডিগনিফাইড, নিজের সম্প্রদায় বজায় রাখতে অনেক বেশী সচেতন। ওই পুরনো জীবিকার প্রয়োজনে আজ মেয়েদের বাইরে আসতে হচ্ছে। পর্দা ফেলে রাখেন। জীবিকার প্রয়োজনে আজ মেয়েদের বাইরে আসতে হচ্ছে। একই অভাবী অবস্থায় দুজন কর্মচারী পাশাপাশি কাজ করলে দেখা যাবে দশ জনের মধ্যে দুজন মহিলা ঘুষ নিতে পারেন। আমি এখনও বিশ্বাস করি এই দেশে যদি কখনও বিপ্লব আসে, যদি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় তাহলে মেয়েরাই সেটা করবে। এখনও সততা শব্দটাকে ওরাই বাঁচিয়ে রেখেছে। অতএব সুদীপ, তোর সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের চার জনের পক্ষে এই দেশের ছবিটা পাল্টে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা ধাক্কা দিতে পারি। এই ধাক্কার কাঁপুনিটা সাধারণ মানুষের মনে পৌঁছানো দরকার। হয়তো তাতে গরম ফল পাওয়া যাবে না। কিন্তু কে বলতে পারে এটাই বীজ হয়ে দেখা দেবে না এক সময়। তবে চারটে ঘটনা ঘটানোর আগে কেউ যেন আমরা

ধরা না পড়ি। ধরা পড়ার সুযোগ আছে এমন ঝুঁকি যেন না নিই। এবং যদি ধরা পড়ি তাহলে আদালতে স্পষ্ট বলব আমরা কেউ উকিলের সাহায্য নিয়ে মিথ্যে বলব না; আদালতকে স্পষ্ট বলব আমরা কি করতে চেয়েছি কেন চেয়েছি।’

কল্যাণ বলল, ‘আগে ধরা পড়ি তারপর ওসব ভাবা যাবে।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘তার এখনও এদেশের আদালতের ওপর বিশ্বাস আছে?’ জয়িতা হাত তুলল, ‘আমরা কিন্তু বারংবার পুরনো তর্কে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের প্রোগ্রামটা নিয়ে কথা এগোচ্ছে না। আমরা কি বড়বাজারেই প্রথম অ্যাকসন করব?’

কল্যাণ বলল, ‘আমার মনে হয় আগে রেসকোর্সটা টার্গেট করা উচিত।’

আনন্দ মুখ ফেরাল, ‘কেন?’

কল্যাণ এবার সোজা হয়ে বসল, ‘রেসকোর্সটা মোস্ট ডেঞ্জারাস, অন্তত আমাদের সামাজিক অবস্থায়। প্রথম কথা, বিশাল জায়গা খোদ শহরের বুক ফেলে রাখা হয়েছে। কলকাতার এত স্পেস ক্রাইসিস অথচ কতগুলো অর্থবান সেটাকে দখল করে রেখেছে মানুষকে বধ করতে। স্পোর্টস না ছাই। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত গরীব মানুষকে বড়লোক হবার লোভ দেখিয়ে ওখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিঃশ্ব করে ছেড়ে দেওয়া হয়। সরকার চোখের সামনে এই শোষণ দেখেও নিলিপ্ত কারণ তারা শতকরা চল্লিশ ভাগ ট্যাক্স পাচ্ছেন। আমি একদিন রেসকোর্সে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা দেখতে। অন্তত নব্বই ভাগ গরীব মানুষ ওই লোভের শিকার হয়েছেন। একটা রেসে দশটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। যে কোন একটা জিতবে। অর্থাৎ যে টাকা পাবে সে বাকি ন’জনের লাগানো টাকার একটা অংশ পাচ্ছে। যারা টাকা দিচ্ছে তারা ওই ন’জনের টাকার সামান্য অংশ বিজয়ীকে দিয়ে বাকীটা হাতিয়ে নিচ্ছে। হিসেব করলে দেখা যাবে দশ টাকা যদি রেসুড়েরা খরচ করে তার চার টাকা নেয় সরকার, চার টাকা রেসুড়েরা আর দু টাকা পায় বিজয়ীরা। আর এই দুটাকা রোজগার করতে তাদের দুশো টাকা বেরিয়ে যায়। এই শোষণযন্ত্রের চাপে গরীব আরও গরীব হচ্ছে। হাজার হাজার সংসার তার শিকার হচ্ছে। আর আশ্চর্য ব্যাপার জানিস, রেসকোর্সে দেখলাম অল্পবয়সী ছেলেদের ভিড়। ওই বয়সেই তাদের লোভের স্বাদ দেওয়া হয়েছে। সরকার জানেন ব্যাপারটা আইন কর্তাদের সুবিধে দিচ্ছে। এইটা বন্ধ করা দরকার। স্পোর্টসের নাম করে মানুষ মারার এই যন্ত্রটাকে অকেজো করে দেওয়া উচিত।’

আনন্দ বলল, ‘আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু রেসকোর্স বন্ধ করা সোজা ব্যাপার নয়। ওদের সিস্টেমটা ব্যাপক। প্যারাডাইসের মতো চারটে বোমা ফেলে বন্ধ করা যাবে না। ব্যাপারটা আমি যেভাবে ভেবেছি তাতে কিছুটা সময় দরকার। সেদিক দিয়ে কিছুটা কাজও এগিয়েছে। আমি জানি কথা বলে কোন কাজ হবে না। তবু কথা বলব। টেলিফোনেই। ওদের সুবুদ্ধির

কাছে আবেদন করব। এবং নাকচ হওয়া মাত্র সেটা খবরের কাগজে জানিয়ে দেব। সারাদেশে একটা টেনশন তৈরী হোক। কিন্তু তার আগে আমাদের আর একটি কঠিন কাজ করা দরকার। সেইটে ওই জাল ওষুধ বন্ধ করা। আমি মনে করি দুটো কারণে এটাই আমাদের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত। এই মিশ্রিত ওষুধ মানুষকে মেরে ফেলেছে, এক ভাবে কোন উপকারেই আসছে না, দ্বিতীয়ত, এই ঘটনা পরবর্তীকালে আমাদের সম্পর্কে আতঙ্ক তৈরী করতে সাধ্য করবে। এখন কিভাবে আমরা কাজটা করব ?

ওরা আলোচনা করল। কাজের কথায় এসে গেলে সুদীপ খুব সিরিয়াস। কল্যাণের একটু তর্ক করা অভ্যেস। শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল ওরা। এতক্ষণ এই ঘরে কেউ আসেনি। হঠাৎ শ্রীহরিদাকে দেখা গেল। তার হাতের ট্রেতে চায়ের কাপ এবং বিস্কুট। কল্যাণ হেসে বলল, 'শাক, আমি ভেবেছিলাম তোদের বাড়িতে এসবের কোনো ব্যবস্থা নেই।'

জয়িতা বলল, 'আমি কাউকে চা দিতে বজিনি। ইনফ্যাক্টর দিতে চাইনিও।' কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

তার কথা বলা শেষ হওয়ামাত্রই শ্রীহরিদাকে ট্রে নামিয়ে রেখে ঘোষণা করল, 'সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছেন। তোমাকে একবার দেখা করতে বলল।'

সুদীপ অবাক হয়ে জয়িতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে বললে কথা বুঝতে পারে ?'

'আমাদের কথা পারে। চা খেয়ে নে।' ওর বলার ভঙ্গীতে উষ্ণভাব ছিল না।

কল্যাণ বলল, 'রাগ করিস না। আমার খুব দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত আটটায় যেতে হয়েছিল একবার। খুব বড়লোক, বালিগঞ্জ সাকুলার রোডে থাকেন। কথা বলছি এমন সময় ভদ্রমহিলা বললেন, 'আটটা বেজে গেছে, এখন নিশ্চয়ই তুমি কিছু খাবে না।' বলার ভঙ্গীটা এমন যে পেটে প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও হ্যাঁ বলতে পারিনি।'

সুদীপ বলল, 'আমি হলে বলতাম আজ্ঞে না, খিদে পেয়েছে খেতে দিন। আসলে তোর মধ্যেও এক ধরনের মেকি ভদ্রতা কিছুটা ঢুকে আছে।'

'বাজে বকিস না।' কল্যাণের গলা উত্তপ্ত হল, 'কথাটা শোনামাত্র ভদ্র মহিলাকে আমার দয়া করতে ইচ্ছে করল। এই সব বড় লোকগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।'

'এটাও এক ধরনের কমপ্লেক্স।'

'তুই কিন্তু গায়ে পড়ে পেছনে লাগছিস সুদীপ।'

জয়িতা উঠে পড়ল, 'আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমরা চার জন একসঙ্গে মিললাম কি করে ? সব কিছুর পেছনে যে কারণ থাকে একথাটা বোধ হয় সব সময় সত্যি নয়।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'বৈতিক বোধটা এক বলে আমরা তাড়াতাড়ি কাছাকাছি

হয়েছি। এবং আমি তাদের বলব ওইটেকে বাঁচিয়ে রাখতে। নইলে তোরা জয়েন্ট দিতে পারতিস, আই এ এস হতে পারতিস, এসব করার দরকার ছিল না। ভারতবর্ষের একটি ছাপ মারা নাগরিক হতে তাদের বেশী কষ্ট করতে হতো না।’

হঠাৎ আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে গেল। সুদীপ হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুলল। জয়িতা বেরিয়ে এসে কয়েক পা হাঁটিতেই রামানন্দ রায়কে দেখতে পেল। স্যুট-টাই পরে তিনি একটু অধৈর্যভঙ্গীতে অপেক্ষা করছেন। জয়িতা মুখোমুখি হওয়ামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এতরিখিং অলরাইট?’

অভ্যস্ত প্রশ্নটি শুনে জয়িতার ঠোঁটে হাসি ফুটল, ‘ডেকেছ?’

‘না, মানে, তুমি আজ বেরুবে?’

‘দখি।’

‘তোমার মা খুব আপসেট।’

‘তাতে আমার কি!’

‘আই নো, আই নো জয়, তুই আমাদের ঘৃণা করিস এটা বলেছিস। কিন্তু আমি তো কাউকে ঘৃণা করতে পারি না। কেউ একটা অন্যায় করলে আমি পালাটা আর একটা অন্যায় করে নিজেকে ঠিক রাখি। আচ্ছা, চলি।’ রামানন্দ রায় হঠাৎ কথা শেষ করে বেরিয়ে গেলেন। জয়িতা ওঁর চলে যাওয়া দেখল। এবং এই মুহূর্তে হঠাৎ তার বুকে একটা বাষ্প গুঁড়ি দিচ্ছিল। সে ওপাশের দরজাটার দিকে তাকাল। সীতা রায় কি করছেন সে জানে না। হার হারানো না সান্যালের জন্যে তিনি আপসেট কে জানে। ব্যাপারটা ভাবতেই তার বুক থেকে বাষ্পটা মিলিয়ে গেল।

সুদীপ আনন্দ আর কল্যাণ যুঁ নিভাসিটির স্টেপেজে নামামাত্র মনে হল কানের পর্দা ফেটে যাবে। ফুটপাত দখল করে মাইকে ছাত্র-কর্মচারীরা চিৎকার করে যাচ্ছে। কাছাকাছি দুটো দল পরস্পর পরস্পরকে দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। ওরা উল্টো ফুটপাতে চলে এল। সুদীপ বলল, ‘দুদলের ডায়ালগ এক হয়ে কানে ঢুকছে।’

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘কোন ডিফারেন্স পাচ্ছিস?’

‘না।’

‘এদের আন্দোলনটা কিসের জন্যে?’

দু’দলই পরস্পরকে দোষী করছিল। এক দল উপাচার্যের কীর্তিকলাপ বন্ধ করতে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। আর এক দল এদের বামফ্রন্টের দানাল হিসেবে চিহ্নিত করছিল। ওরা লক্ষ্য করল প্রতিটি বক্তাই উত্তেজিত, হাত-পা নেড়ে বিশ্বরাজনীতিপ্রসঙ্গ নিয়ে আসছিল বক্তৃতাকে জ্বালাময়ী করতে। এবং তখনই ঠিক মাঝখানে একটা বোমা ফাটল সশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে দু’দলে প্রচণ্ড হড়াহড়ি শুরু হয়ে গেল। চিৎকার চেঁচামেচি। ভাইসব যাবেন না,

কমরেড ভয় পাবেন না। পিঁপড়ের লাইন থেকে আজুল সরিয়ে নেবার পর তারা যেমন আবার একত্রিত হয় তেমনি কিছুক্ষণ পরে আবার বক্তৃতা আরম্ভ হল। এবার দুপক্ষই পরস্পরকে বর্বর আক্রমণের জন্যে দায়ী করতে লাগল। আনন্দরা নড়েনি। পুরো ঘটনাটা দেখার পর আনন্দ বলল, 'ওরা কি করছে বল তো? কি ইস্যু নিয়ে এইভাবে নিজেদের শক্তি সময় অপচয় করছে? এতে কার কি লাভ হবে? আর ওরা তা জেনেই এইটে করছে। একটা নিরাপদ আন্দোলনের মধ্যে না থাকলে নেতৃত্ব হাত-ছাড়া হয়ে যাবে! দাদারা যা বলেছে তাই করছে ওরা। দেশ কিংবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বার্থ দূরের কথা, সহপাঠীদের জন্যেও ভাবনা নেই। বোমাটা কাম্বদা করে এমন জায়গায় ফাটল যাতে কারোর গায়ে আঁচ না লাগে! এসব দেখলে বমি আসে।' আনন্দকে প্রচণ্ড উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সুদীপ বলল, 'তাড়াতাড়ি চল, হাতে সময় নেই।'

॥ ১৬ ॥

সত্যনারায়ণ পার্কের ঠিক উল্টোদিকে কয়েকটা সরবতের দোকান আছে। বেশ সাংস্কৃতিকভাবে দোকানদাররা গুছিয়ে বসেছে। আনন্দ এদের কথা শুনেছিল। সামান্য সিদ্ধি মিশিয়ে এই রাবড়ির চেয়ে নোভানীয় স্বাদের সরবতের জন্যে জম্পেশ ভিড় জমেছে।

কলেজ স্ট্রীট থেকে হাঁটিতে হাঁটিতে হ্যারিসন রোড ধরে ওরা হতই পশ্চিম দিকে এগোচ্ছিল ততই কলকাতার একটা সর্বভারতীয় চেহারা নজরে পড়ছিল। এই পথে অনেকবার যাতায়াত করেছে কিন্তু আজকের মত খুঁটিয়ে কখনও দ্যাখেনি। ব্যাপারটা একটা সময় এমন দাঁড়াল যে কল্যাণ না বলে পারল না, 'আমরা কোথায় এসেছি? রাজস্থান না উত্তর প্রদেশে?'

আনন্দ বলল, 'তুই প্রাদেশিকতাদোষে দুশ্চি। উল্টোদিক দিয়ে ভাবতে পারছিস না কেন? এই সব পরিশ্রমী মানুষগুলো তাঁদের দেশ জমি ছেড়ে কলকাতায় এসে ধীরে ধীরে জায়গাটাকে শুধু নিজের মত করেই নেননি, এমনকি ভৌগলিক চরিত্র বদলে দিয়েছেন। তুই এখানকার মাটি কিংবা আকাশের দিকে তাকা, দেখবি, কোন বাংলাদেশী গন্ধ নেই। এটা চীনেরাও পারেনি।'

সত্যনারায়ণ পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণ চারপাশে খুঁটিয়ে নজর করছিল। দোকানপাট, বাড়িঘর এমন কি মানুষজনের হাঁটাচলার মধ্যে বাংলাদেশ নেই। বাইরে থেকে যারা আসে তারা সাধারণত নতুন দেশের অনেকটা গ্রহণ করে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিরাট একটা এলাকাকেই নিজেদের মত পাশ্টে নেওয়া কম কথা নয়। অত্যন্ত ক্ষমতাবান না হলে সোটা সম্ভবও নয়।

এই সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কল্যাণ, সরবত খাবি? ^{১৩} কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'খালি পেটে সরবত জমবে না। সকাল থেকে সন্ধি'

কিছু পড়ছে না। শালা জন্মিতাটাও লিকুইড খাওয়ালো।’

হঠাৎ আনন্দ ওর দিকে মূরে দাঁড়াল, ‘তোমর খুব খেতে ভাল লাগে, না?’

‘হ্যাঁ ভাই।’ কল্যাণ সরাসরি মাথা নাড়ল, ‘আমি খেতে চাই, প্রাণ ভরে ভাল ভাল খাবার খাব। জেলখানায় তো যা দেবে তাতে আমার আশা কোনদিন পূর্ণ হবে না। আমার পকেটে যদি তিনশো টাকা থাকত তা হলে একটা সাধ মিটিয়ে নিতাম।’

‘কি সেটা?’ এবার আনন্দ চারপাশে নজর বোলাচ্ছিল। সত্যনারায়ণ পার্কের পাশ দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে ভেতরে। ওখানেই ঢুকতে হবে তাদের। ঠেঁলা রিকশায় বেশ মন্থর হয়ে আছে পথটা।

কল্যাণ বলল, ‘আমার কাছে একটা লিস্ট আছে। কলকাতায় কোথায় কোন্ দোকানে কি পাওয়া যায়। সেই সব খাবারের কি বৈশিষ্ট্য। অনেক কল্‌স্ট কমিয়ে কমিয়ে যাটটা দোকান বেছেছি। অ্যভারেজে পাঁচ টাকা খরচ করলে তিনশো হয়ে যাবে। বেলা দশটায় শুরু করলে রাত দশটায় শেষ করা যাবে। খুব বেশী বলে মনে হচ্ছে এই ইচ্ছেটা?’

‘মোটাই না। চল হাঁটা যাক। ফেরার সময় ওই মিষ্টির দোকানটায় প্রথমে ঢুকব।’ কল্যাণ নামটা পড়ল। তারপর উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘আরে, এই দোকানটার নাম ছিল আমার লিস্টে। দারুণ মিষ্টি করে ওরা। বেনারসের ঘরখানায় তৈরি ওদের একটা মিষ্টির নাম—, যাঃ শালা ভুলে গেছি।’ হাঁটিতে হাঁটিতে আনন্দ বলল, ‘তুই আজ খাবার নিয়ে খুব উত্তেজিত হয়েছিস!’

‘উত্তেজিত? মোটেই না। মন খারাপ হয়ে যায়। তুই কেন মনে করিয়ে দিলি? আসলে খাবারের বিষয়ে বেশী আলোচনা হতেই আমার কি রকম যেন হয়। আচ্ছা আনন্দ, তুই আজ অবধি যা যা খাবার খেয়েছিস তার মধ্যে বেস্ট কোন্টা?’

‘মনে নেই বিশ্বাস কর। ভাল কিছু খেলেই মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভাল।’

‘তোকে একটা কথা বলি। আমি তো খুব বেশী কিছু খাইনি। কিন্তু ফুলকপি দিয়ে পোস্তর একটা তরকারি করেন মাতৃদেবী। তুলনা হয় না।’ পুত এগিয়ে আসা একটা ঠেঁলার আক্রমণ শেষ মুহূর্তে সামনে নিজ কল্যাণ। আনন্দ দেখল এখনও ওর মুখে তৃপ্তির চিহ্ন। ওর মনে হল এই খাদ্যরসুটা কল্যাণকে ওর মা নিশ্চয়ই সহজে দিতে পারেন। অন্তত শীতকালে। সে কল্যাণকে আর এ বিষয়ে কথা চালাতে উৎসাহিত করল না। এই কল্যাণকে সে এতকাল দ্যাখেনি। কোন কোন দুর্বল জায়গায় স্পর্শ পেলে বোধ হয় মানুষ এমন ক্রেজি আচরণ করে ফেলে।

এই রাস্তায় কোন বঙ্গসন্তান চোখে পড়ল না। হাট্টর ওপরে কোঁচা তুলে বাণিজ্যে বের হচ্ছেন ব্যবসায়ী, মাথায় ঘোমটা তুলে স্থলাঙ্গী মহিলারা বাজারে যাচ্ছেন। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘আচ্ছা ভাই, মেডিসিনকা দোকান কিধার হয়?’

‘কানসা মেডিসিন?’

এইবার অসুবিধেতে পড়ল আনন্দ। তার হিন্দির দৌড় খুব বেশী নয়। তাছাড়া ফ্যাক্টরির বদলে সে দোকান শব্দটা বলে ফেলেছে। চেষ্টা করে সে বলল, ‘হাঁহা মেডিসিন বানাতা হয়।’

লোকটা হাসল, ‘ও টিমার কোম্পানি! সিধা থাকে বাঁরা গলি। মোহনলালজী কা কোম্পানি।’

আনন্দ দোকান ছেড়ে এগিয়ে বলল, ‘লোকটা টিমার কোম্পানি বলল কেন? ওই ঠিকানায় তো অন্য কোম্পানির নাম পেয়েছি। টিমার মানে কি? আর মোহনলাল লোকটা তার মালিক?’

‘হবে কিছু একটা। তুই তো নম্বর জিজ্ঞাসা করলে পারতিস।’

‘তুই লক্ষ্য করিসনি। এখানকার বাড়ির গায়ে নম্বর পর পর নেই। ফ্যাক্টরি তো ছোট নয়, তাই চেনা সহজ। জায়গাটা ভাল করে লক্ষ্য কর।’ এই সময় একটা ট্রাক প্রায় রাস্তা জুড়ে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছিল। ওরা কোন রকমে একটা রকে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল ট্রাকটা ওষুধের বাক্স বোঝাই। ট্রাকের ওপরে দাঁড়িয়ে দুটো লোক তীর স্বরে চেঁচাচ্ছে যাতে সামনের রাস্তা পরিষ্কার হয়। তেঁরা এবং রিকশার কল্যাণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না যদিও। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, ‘আমরা যা সন্দেহ করছি তাই যদি হয় তাহলে কিন্তু অসুত ব্যাপার বলতে হবে।’

‘কেন?’ আনন্দ ট্রাকটার ওপরে সাজানো ওষুধের বাক্সগুলোকে লক্ষ্য করছিল। খুবই নিরীহ চেহারার, আর পাঁচটা যেমন হয়। কল্যাণ বলল, ‘এই রকম বিপ্তি জায়গায় ওরা কোম্পানী করেছে কারণ এর চেয়ে ভাল জায়গা পায়নি। ব্যবসাটা যদি খুব চালু হত তাহলে ওরা স্বচ্ছন্দে সেই জায়গায় উঠে যেত যেখানে ট্রান্সপোর্ট প্রবুৎ নেই। বেআইনি মাল এত ঝামেলার মধ্যে কেউ ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যায় না।’

‘তুই যা ভাবছিস তা সত্যি হতে পারে। কিন্তু নিজের কানেই শুনলি ওই দুটো ওষুধ হোলসেলারকে সাপ্লাই করে বড়বাজারের এই ঠিকানার কোম্পানি।’ আনন্দ ট্রাকটাকে এগিয়ে যেতে দেখল।

কল্যাণ মাথা নাড়ল, ‘এইটেই আমার কাছে গোলমাল লাগছে। যে দুটো ওষুধের এরা সাপ্লায়ার সে দুটো বাজারে খুব চালু। এরা যদি সেটা বাজারে ছাড়ে তাহলে অরিজিন্যাল কোম্পানির ব্যবসা মার খাবেই। তখন তারা ছেড়ে দেবে? জান কোম্পানিকে ধরিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগবে তারা। খুব গোলমালে ব্যাপার আনন্দ।’

‘যদি হোলসেলার আর এই কোম্পানি একই কনসার্ন হয়?’

আনন্দের প্রশ্নে একটু খিতিয়ে গেল কল্যাণ। তারপর বলল, ‘আমরা আধ ঘন্টার চেষ্টাতেই হোলসেলার ওখান থেকে জানতে পারলাম কোথেকে সাপ্লাই আসছে। এত সহজে খবর বেরিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞেশ করবে বলে

মনে হয় এরা ?’

ওষুধের হোলসেল মার্কেটে গিয়ে চমকে গিয়েছিল ওরা। বড় বড় কোম্পানির নিজস্ব বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কলকাতার পশ্চিমের এই বাজার থেকে পূর্বাঞ্চলের বেশির ভাগ ওষুধের দোকানগুলো রসদ সংগ্রহ করে। ওই ওষুধ দুটোর সঙ্গে আরও কিছু ওষুধের বিরাট লিস্ট করে ওরা দোকানে দোকানে ঘুরেছিল। বমির ওষুধটা মার্কেটে সাপ্লাই ছিল না সেই মুহূর্তে। ওদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। সেই সময় একটা টেম্পোতে নতুন মাল এল। বাস্ক দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে কি ওষুধ আছে। ব্যাচ নম্বর ইত্যাদি কোড তাদের জানাও ছিল না। কিন্তু তার কিছুক্ষণ বাদেই বলা হল ওষুধ এসে গেছে। টেম্পোটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। আনন্দ টেম্পোর হেলপারের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা খোসগল্প করে জেনেছিল ওরা আসছে বড়বাজারের এই ঠিকানা থেকে। সেখানে বিশাল কারখানা আছে। কল্যাণ বলছে এত সহজে খবর বেরিয়ে যাবে এমন কাজ ওরা করবে না। কিন্তু একটু আগে ট্রাকের ওপর ওষুধের বাস্কগুলোর গায়ে যে নম্বর পড়ল তা ওই টেম্পোর ওষুধের বাস্কের নম্বরের সঙ্গে মিলে গেছে। তাহলে সেই হেলপার ছেলেটির কথা মিথ্যে নয়।

ওরা যখন সত্যনারায়ণ পার্কের সামনে আবার এসে দাঁড়াল তখন আর কোন দ্বিধা নেই। টিমার কোম্পানি যে ওষুধ তৈরী করে তার চাহিদা বাজারে নেই ! সরকারের কাছে লাইসেন্স পাওয়া মাথা ধরার ট্যাবলেট এবং জ্বরের ইঞ্জেকশন মোটেই চালু নয়। আনন্দের স্পর্শট ধারণা এরই আড়ালে ওই দুটো ওষুধ তৈরী করে। কারণ দ্বিতীয় যে টেম্পো ওখানে থেকে একটু আগে বের হল তার ওপরে তোলা ওষুধের বাস্কের নম্বর আলাদা। একটু আগে শোনা নামের খোঁজে ওরা কারখানায় ঢুকেছিল। তাদের বসবার ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। সেই সময় একটা বেয়ারা গোছের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে আনন্দ জেনেছিল এখানে জ্বর মাথাধরা পেট ব্যথা এবং বমির ওষুধ তৈরী হয়। লোকটা খুব গর্বের সঙ্গে জানিয়ে ছিল এখানে কোন শ্রমিক বিক্ষোভ নেই। মালিক খুব ভাল লোক। মোট শওয়া দুশ মানুষ এই কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। কিছুক্ষণ বাদে যে খবর নিয়ে গিয়েছিল সে এসে জানাল আপনাদের ভেতরে ঢাকছে। মোহনলালবাবু নামক লোকটির কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ফিনফিনে ধুতি আর টেরিকটের পাঞ্জাবিপরা সেই শুভলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথেকে আসছেন আপনারা ? কি দরকার ?’

আনন্দ বলল, ‘আমি চণ্ডীগড়ে থাকি। এদের বাড়িতে উঠেছি। চণ্ডীগড়ে আমাদের ওষুধের বিজনেস আছে। সেখানে আপনার এক বন্ধু প্রায়ই আসেন আমার বাবার কাছে। উনি বলেছিলেন এখানে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে।’ আনন্দের কথা বলার ভঙ্গী এত স্বাভাবিক যে কল্যাণ পর্যন্ত পাথর হয়ে গেল।

মোহনলালের মুখে এবার কৌতূহল, 'তোমারা চণ্ডীগড়ে থাকো ?'

'ও না, আমি।'

'ওষুধের ব্যবসা। তোমার বাবার ওষুধের ব্যবসা আছে ?'

'হ্যাঁ। এস কে রায় অ্যাণ্ড কোম্পানি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রামনিবাস বলেছিল বটে। খুব ভারী ব্যবসা তোমাদের ?' এবার খুব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে তাকালেন মোহনলাল।

'খুব বড় নয়, এই আর কি !'

'রামনিবাস কেমন আছে ?'

'ভালই।'

'আরে তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো। কি খাবে বল ? চানা কোল্ড ড্রিঙ্কস ?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না না, এখন কিছু খাব না। বাবা বলেছিলেন আপনার কাছে এলে ফ্যাক্টরিটা দেখে যেতে। ব্যবসা কি করে বড় হয় তা জানতে।'

'ব্যবসা ? ব্যবসা হল আগুনের মত। তাকে যত খাবার দেবে তত বেড়ে যাবে। সব সময় সাপ্লাই দিয়ে যেতে হয়। এই কোম্পানী একটা লিমিটেড কোম্পানি। আমি একজন ডিরেক্টর, ব্যাস। আজ একটু অসুবিধে আছে। আমারও সময় নেই। শাওয়ার আগে একদিন এসো দেখিয়ে দেব ঘুরিয়ে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওরা ফ্যাক্টরির কিছু অংশ দেখতে পেল। ওই অঞ্চলে প্যাকিং চলছে। প্রায় সদর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন মোহনলাল। বললেন, 'রামনিবাসকে বলো আমাকে ফোন করতে। আমি দিল্লি যাবো নেক্সট মাসে। তখন দেখা হবে।'

যে বেয়ারা দুটো দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা সসন্দ্রমে তাকাল। বাইরে বেরিয়ে আনন্দ উল্টো দিকের রাস্তায় হাঁটতে লাগল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'এদিকে কোথায় হাঙ্কিস ?'

আনন্দ বলল, 'ভায় না।'

বাড়িটার গায়েই আর একটা সড়ক গলি। এ দিকটায় ছোটখাটো দোকান বেশী। স্টিক দোকান না বলে গদি বলাই ভাল। খুবই ঘিঞ্জি এলাকা। হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাড়িটার পিছনে চলে এসে একটা বিশাল গেট দেখতে পেল। গেটটা বন্ধ। ভেতরে একটা দারোয়ান টুলের উপর বসে আছে। গেটের ভিতরে দুটো টেম্পো দাঁড়িয়ে। এদিকে পথটা অপেক্ষাকৃত চওড়া। খানিকটা বেঁকে আবার জে এন বাজাজ স্ক্রিটে পৌঁছে গেছে। তিমার কোম্পানির প্রধান প্রবেশ পথ সত্যনারায়ণ পার্কের দিকে না হয়ে এদিকটায় হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

কল্যাণ বলল, 'তোর বুকের পাটা আছে। কি ঝটপট মিথ্যে কথা বলতে পারলি।'

আনন্দ বলল, 'আমি ভাবছি মোহনলালের কথা। লোকটা অনেক বড়

অভিনেতা।’

কল্যাণ বলল, ‘মানে?’

‘আমি চণ্ডীগড় থেকে এসেছি জেনেও উনি হিন্দিতে কথা বললেন না। এস কে রায় অ্যাণ্ড কোম্পানির নাম জীবনে শোনেননি তবু ভান করলেন কত শুনেছেন।’

‘এটা ভুল হল। হয়ত ওই রকম কোন কোম্পানির নাম শুনেছেন বন্ধুর কাছে, এখন গুলিয়ে ফেললেন। এটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।’

‘তাই? উনি যদি জিজ্ঞাসা করতেন ওঁর কোন বন্ধুর কথা আমি বলছি তা হলে কি আমি রামনিবাস নামটা বলতে পারতাম?’

‘হ্যাঁ মাইরি! আমার তো রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস ভদ্রলোক নিজে থেকেই বন্ধুর নামটা বলে ফেললেন। তুই যদি উল্টোপাল্টা নাম বলতিস? কিভাবে চান্স নিলি?’

‘শোন, আমি ভেবেছিলাম কোন একটা ডাকনামের সঙ্গে আক্সল শব্দটা জুড়ে দেব। কিন্তু মোহনলাল সেই ঝুঁকি নিতেই দিলেন না। আমার বিশ্বাস রামনিবাস বলে কোন মানুষকে মোহনলাল চেনেন না। আমাকে নিয়ে চমৎকার খেলে গেলেন ভদ্রলোক।’

‘সেকি রে। উনি ফোন করতে বললেন, দিল্লিতে গিয়ে দেখা করতে বললেন, সব জালি?’

‘হ্যাঁ। রামনিবাস না বলে রাম অবতার বললেও আমি তা মানতাম। আর সেই কারণেই ফ্যান্টরি দেখানোর ব্যাপারে অসুবিধে হয়ে গেল।’

‘কিন্তু উনি আমাদের ধরতে পারতেন মিথ্যে কথা বলার জন্য। তা না করে চা অফার করলেন। এটা করে কি লাভ ওঁর।’

‘ঝামেলাটা বাড়ালেন না। আমাদের মিথ্যেবাদী বললে একটা কিছু করতে হতো। তাতে লোক জমতো। অথচ ভদ্র ব্যবহার করে কাটিয়ে দিতে অসুবিধে হল না। এর পরে নিশ্চয়ই আমরা ওঁর কাছে যাওয়ার সাহস পাব না বলে উনি ভেবেছেন। এবং আমার বিশ্বাস ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর মোহনলাল লোক পাঠিয়েছেন কোথায় হাই জানতে।’

আনন্দর কথা শেষ হওয়া মাত্র কল্যাণ চট করে চারপাশে তাকাল। বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট অর রিকশার দঙ্গল সামনে। ফুটপাতে যাবতীয় দোকানের সামনে ভিড়। এর মধ্যে কেউ যদি দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করে তাহলে বোঝার উপায় নেই। ওর মনে হল আনন্দ বোধ হয় একটু বেশী বেশী ভাবছে। মোহনলালের সঙ্গে কথাবার্তায় লোকটাকে অতখানি ধূর্ত মনে হয়নি।

আনন্দ বলল, ‘চল, মিষ্টি খাই।’

ব্যাপারটা মনঃপূত হল কল্যাণের, সে রাস্তায় নেমে জিজ্ঞাসা করল, ‘কিন্তু এখানে এসে কাজের কাজ হল না। আমরা তো কোন ডাইরেক্ট প্রমাণ পাচ্ছি না। কি করবি এখন?’

মিষ্টির দোকানে তুকে পড়ল আনন্দ প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে। দোকানটা বিশাল। শো-কেসের ভেতরে ওপরে নানান ধরনের মিষ্টি সাজানো। চমৎকার একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবি?'

কল্যাণ থমকে গেল। এত বিরাট সাইজের রকমারি মিষ্টি সে একসঙ্গে কখনও দ্যাখেনি। দুতিনটে ছাড়া বেশীর ভাগই সে চেনে না। মাঝারি সাইজের একটা মিষ্টি দেখিয়ে সে দাম জিজ্ঞেস করল। সেলসম্যান জানাল 'চার টাকা পিস।'

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ চাপা গলায় বলল, 'ডাকাত মাইরি? দুটাকার বেশী হওয়াই উচিত নয়।'

আনন্দ বলল, 'কোনটা খাবি ঠিক কর তুই।'

কল্যাণ সেলসম্যানকে একটার পর একটা মিষ্টির দাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আনন্দ বুঝতে পারছিল কোনটাই কল্যাণের পছন্দ হচ্ছে না। তখন আর মিষ্টি নয়, মিষ্টির দামটাই ওর কাছে মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত কল্যাণ কাঁধ নাচাল, 'না রে আনন্দ, চল অন্য দোকানে যাই।'

'কি হল? তোর তো কিছু সলিড খাওয়ার দরকার ছিল।'

'ছিল। কিন্তু এত যেজি দামের মিষ্টি আমি খেতে পারব না।'

'ঠিক আছে। তোকে তো দাম দিতে হচ্ছে না, তুই খা যা ইচ্ছে করে।'

'ইম্পসিবল। এগুলো যদি আমার অজানা বস্তু হতো তাহলে খেয়ে নিতাম। যে জিনিস বাইরে অর্ধেকের চেয়ে কম দামে পাবো সেটা এখানে খেতে যাব কেন? তোর পছন্দ বলে আমার বোধ কাজ করবে না? তুই আমাকে পাবলিক ভাবছিস?'

'পাবলিক?'

'হ্যাঁ পাবলিক। সব সময় দুইয়ে নিতে চায়। অন্যের পয়সায় বিষ পেলেও খাবে। একবার একটা মেলায় দেখেছিলাম হাজার খানেক পাবলিক লাইন দিয়ে রোমদুরে দাঁড়িয়েছে। কি ব্যাপার? না সাহেবরা বাজারের ব্যাগ বিনা পয়সায় বিতরণ করছে। ব্যাপারটা ভাব। চল বের হই।'

'কিন্তু কল্যাণ, এরা যখন দাম বেশী নিচ্ছে তখন জিনিসটাও তিনগুণ ভাল দিচ্ছে।'

'আমার খিদে লাগনি, হয়েছে?' বাইরে বেরিয়ে এল কল্যাণ। তারপর বলল, 'কোনদিন তো বেশী খরচ করিনি কিংবা করার ক্ষমতা হয়নি তাই কেমন যেন আটকে যায়। দ্যাখনা, চটি কিনতে বাটার দোকানে যাই না, ফুটপাত থেকে কিনি।'

আনন্দ কোন কথা বলল না। ভিড়ের মধ্যে হাঁটিতে হাঁটিতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। কল্যাণ টিপি ক্যাল নিশ্চিন্দা মধ্যস্থিত ছেলে। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে দারুণ সততা আছে। নিজের বিশ্বাস বা পছন্দ সরাসরি বলতে কখনও দ্বিধা করে না। আর এইখানেই ওর সঙ্গে ওর শ্রেণীর তফাৎ। মাঝে মাঝে আনন্দ

অবাক হয়ে ভাবে কি করে তারা চারজন একত্রিত হল। চারজনের রুচি, সমাজ এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সংঘাত লাগেনি।

হঠাৎ সচেতন হল আনন্দ। কল্যাণ চুপচাপ তার পাশে হাঁটছে। এখন ওরা মহাআ গার্লী। চট করে গাশের একটা পাইস হোটেলে কল্যাণকে নিয়ে ঢুকেই পেছন ফিরে তাকাল। দুটো লোক হাঁটিতে হাঁটিতে ফুটপাতে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একজন রাস্তা পেরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। দ্বিতীয়জন কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে হোটেলের দিকে তাকাতে তাকাতে সরে গেল সামনে থেকে। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার রে?'

'আয় ভাত খাই। পাইস হোটেলে আমি কখনও খাইনি।' তারপর দেওয়ালে ঝোলানো মেনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তিন টাকা নিরামিষ পাঁচে আমিষ। দামটা তোর আওতায় থাকছে, কি বল?'

কল্যাণ উত্তর না দিয়ে নোংরা বেসিনে হাত ধুয়ে এল।

মোটাই তৃপ্তি করে খেতে পারল না ওরা। রান্না ভাল নয়, টেবিল এবং খানায় ময়লা দাগ লেগে আছে। আশেপাশের মানুষগুলো বোধ হয় অন্ত্যস্ত, তাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আনন্দের নজর ফুটপাতের দিকে ছিল। কিন্তু ওই দুটো লোক কি মোহনলালের কাছ থেকে এসেছে? চোখের আড়াল হবার পর তারা আর সামনে আসছে না। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?'

'বাইরে বেরিয়ে বলব।'

দাম মিটিয়ে ওরা বাইরে এল। সেই লোকদুটোকে কাছাকাছি নজরে পড়ল না। একটা ট্রাম শাঙ্খিল শিয়ালদার দিকে। আনন্দ কল্যাণকে বলল তাতে উঠে পড়তে। দৌড়ে ওরা ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে পাদানিতে পা রেখেছে, সেই সময় ভিড় ফুঁড়ে একটা লোক ছুটে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়ল। ট্রামে দাঁড়িয়ে আনন্দ হেসে ফেলল, 'চিনেছি।'

'কি চিনেছিস?'

'মোহনলাল আমাদের পেছনে লোক পাতিয়েছে। আমার সন্দেহটা তাহলে সঠিক।'

'কি করে বুঝলি লোক পাতিয়েছে?'

'আমরা যখন হোটেলে ঢুকলাম তখন যে লোকটা থমকে দাঁড়িয়েছিল সেই লোকটাই এখন সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। আমরা কোথায় থাকি সেটাই বোধ হয় জানতে চাইছে।'

'কি করবি এখন?' কল্যাণ প্রশ্নটা করেই ভেবে নিল, 'ব্যাপারটাকে ধরব?'

'পাগল! ও ওর মত থাক, আমরা আমাদের মত। হাতে বেশী সময় নেই, সুদীপ দাড়িয়ে থাকবে।' চটপট টিকিট কাটল আনন্দ।

'শাচ্চলে!' কল্যাণ বলল, 'আমাকে তো একবার বাড়িতে যেতে হবে। কিছু

জামাপ্যান্ট অন্তত আনা দরকার। কতক্ষণ সময় আছে হাতে ?'

'তোমরা এখনই বাড়িতে যাওয়া দরকার নেই। কারণ তোরা এখনই তাঁকুরপুকুরে
যাচ্ছিস না।'

'যাচ্ছি না ?'

'না। নেমে পড়, একটা টেন্ডার খালি হচ্ছে।' বলতে বলতে আনন্দ নিচে পা
বাড়াল। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ট্রাফিকের জন্যে ট্রামটা দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ
ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে বসে পড়ল।

ট্যাক্সিওয়ালা খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন ?'

'এসপ্লানেড। উঠে আস কল্যাণ। আনন্দ দেখল ট্রামের সেকেন্ড ক্লাস থেকে
সেই লোকটা নেমে পড়েছে। কিন্তু এবার তার কি করা উচিত বুঝতে পারছে
না।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'আপনারা নেমে যান, অসুবিধে আছে।'

কল্যাণ ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছিল, 'অসুবিধে কেন ?'

'গাড়ি খারাপ আছে।' নিষিকার মুখে ড্রাইভার বলল।

কল্যাণ ঝুঁকে এল সামনে, 'আপনি একটু আগে প্যাসেঞ্জার নামালেন। ভদ্রভাবে
বলছি এসপ্লানেড চলুন।'

আনন্দ মুখ বাড়িয়ে একজন ট্রাফিক কনস্টেবলকে চিৎকার করে ডাকল, 'এই
যে দাদা এদিকে আসুন।'

লোকটা খুব বিরক্ত হল ডাক শুনে। দূর থেকে মুখ নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি
হয়েছে।' তাই দেখে ট্যাক্সিওয়ালা হাসছিল। হঠাৎ কল্যাণ বলল, 'দেখুন
মশাই, আপনি আমাকে চেনেন ?'

এবার লোকটা বলল, 'চেনাচেনির কি আছে ? অফিসটাইমে অতটুকু পথ গেলে
আমার লস হবে। আপনারা অন্য ট্যাক্সি দেখুন।'

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে বললেন কেন গাড়ি খারাপ আছে ?'

এবার কনস্টেবল কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

আনন্দ অভিযোগ করল, 'উনি যেতে চাইছেন না। ট্যাক্সিওয়ালা রিফ্যুজ করলে
আপনাদের কাছে কমপ্লেন করতে বলা হয়েছে। দুপুর বেলায় উনি অফিস
টাইম বলছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিওয়ালা হাত নাড়ল, 'আরে না দাদা, গাড়ি খারাপ আছে, এঁরা
শুনছেন না।'

কনস্টেবল জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি খারাপ ?'

আনন্দ প্রতিবাদ করল, 'মিথ্যে কথা ! গাড়ি ঠিক আছে। এসপ্লানেড যাব বলে
উনি এসব বলছেন।'

কনস্টেবল মাথা নাড়ল, 'গাড়ি খারাপ কিনা আমি কি করে বুঝব। আমি
তো মেকানিক নই। এসপ্লানেড গেলে বাসে চলে যান। কাছেই তো !'
কনস্টেবল আবার ফিরে গেল।

কল্যাণের মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছিল। সে বলল, 'এই যে ড্রাইভার, এক মিনিটের মধ্যে যদি গাড়ি স্টার্ট না করেন তাহলে এটাকে ছালিয়ে দেব।'

ওর গলার স্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে ট্যাক্সিওয়ালার চমকে ফিরে তাকাল। কল্যাণ বলল, 'কাগজে পড়েছেন প্যারাডাইস কিভাবে পুড়েছে?'

আনন্দ শঙ্কিত হল। উত্তেজনায় কল্যাণ আরও কিছু না বলে বসে। হঠাৎ

ট্যাক্সিওয়ালার সিটয়ারিং-এর দিকে ফিরে গাড়ি স্টার্ট দিল। সেই লোকটা

এখন অনেকটা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি চালু করে ড্রাইভার বলল,

'প্যারাডাইসে লোকে বদমাইসী করতে যেত এর বউ ওর মেয়েকে নিয়ে। ওটা

পুড়িয়েছে যারা তারা ঠিক করেছে। আমার গাড়ি পুড়িয়ে আপনাদের কি লাভ

হবে? পেটের ধান্দায় ট্যাক্সি চালাই। দুটো পয়সার নোভ ছাড়ব কেন।'

কল্যাণ এবার আনন্দের চোখের দিকে তাকাল। তখনই আনন্দ ফুটপাতে

দাঁড়ানো লোকটাকে মিলিয়ে যেতে দেখেছিল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তায়

গাড়ি নিয়ে নেমেছেন আর প্যাসেঞ্জারদের কথা শুনবেন না? গাড়ি ছালাবো না

বললে তো আপনি যাচ্ছিলেন না।'

'গাড়ি আপনি ছালাতে পারতেন না। অ্যাক্সিডেন্ট না করলে আমাদের গাড়ি

জ্বলে না!'

'আপনি প্যারাডাইসের কথাটা বলামাত্র আমার মনে হল ফালতু খামেলা করে

কি লাভ?'

'কেন মনে হল?'

'প্যারাডাইস যারা জ্বলেছে তারা হিম্মতবাজ লোক। আমি মশাই একবার

প্যাসেঞ্জার নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। আপ ডাউন প্লাস তিরিশ টাকা। নিজের

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এক সাহেব তার সেক্রেটারিকে নিয়ে আমার ট্যাক্সিতে ফুটি

করতে গিয়েছিল। মেয়ের বয়সী সেক্রেটারি। ঠিক করেছে পুড়িয়ে দিয়ে।

কিন্তু কি লাভ? পুরো দেশটাই তো এখন প্যারাডাইস।' শেষের দিকে

ট্যাক্সিওয়ালার মনে নিজের মনেই কথাগুলো বলল।

কল্যাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আনন্দ ওকে ইশারা করল চুপ করতে।

ব্যাপারটা আনন্দের মন ভাল করে দিল। এই লোকটার বিরুদ্ধে একটু আগে সে

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যে ব্যবহার করতে ও অভ্যস্ত তাই করেছিল। এবং

এখনও নিজের দোষ লোকটা দেখতে পাচ্ছে না। অথবা প্যারাডাইস সম্পর্কে

বেশ খবরাখবর রাখে। অন্তত একটি মানুষকে সে দেখতে পেল যে মনে করছে

কাজটা ভাল হয়েছে। আশ্চর্য যদি লোকটা জানতে পারতো তার গাড়িতেই সেই

লোকগুলো'র দুজন বসে আছে তাহলে কি করত। হাত মেলাতো, না সোজা

ওদের লালবাজারে পৌঁছে দিত? ঠিক উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

মেট্রোর সামনে ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল ওরা। এখন বেশ রোদ। যদিও

এসপ্লানেডে বেশ ভিড়। মেট্রোতে যে হিন্দী ছবিটা চলছে সেখানে কোন লোক

নেই অবশ্য। একজন বাঙ্গালি পরিচালকের তৈরি আনাদা জাতের ছবি বলে

কাগজগুলো খুব লিখেছে। অথচ দর্শক আসছে না মোটেই। ওরা পেরিয়ে শহীদ মিনারের দিকে এগোল।

দূর থেকে দেখতে পেল ওরা। সুদীপ সিগারেট খাচ্ছে। ওর পাশে জয়িতা চোখে সানগ্লাস। জয়িতা তার খাটো চুল ঝুঁটি করে বেঁধেছে। অর্থাৎ কাণ্ড, এখন ও শাড়ি পরেছে। সেই শাড়িটা যেটা ও পরে গিয়েছিল প্যারাডাইসে। মেয়েটাকে শাড়ি পড়লে খারাপ দেখায় না। তারপরে সুটকেস দুটো নজরে এল। দেখলে মনে হবে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে ওরা। ওদের দেখে সুদীপ ঘড়ি চোখের সামনে আনল, 'কুড়ি মিনিট লেট!'

আনন্দ বলল, 'সরি! তুই সানগ্লাসটা খোল।'

জয়িতার কপালে জাঁজ পড়ল, 'কেন? খারাপ দেখাচ্ছে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। সেটাই গোলমাল। সবাই তোমার দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ শাড়ি পরতে গেলি কেন? সুদীপ, আমাদের হাতে সময় নেই।'

সুদীপ শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'তোদের আজই ঠাকুরপুরে যাওয়া হবে না। জয়িতা তোমার বাড়িতে ফিরে চল।'

'কেন। আমি তোকে বলেছি ওখানে থাকব না।'

সুদীপ প্রতিবাদ করল।

'তোকে থাকতে বলছি না। আজ রাত্রেই বড়বাজারে অ্যাকশন করব আমরা। ওরা সন্দেহ করেছে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশী ভাববার আগেই অ্যাটাক করা দরকার। আর দেরী করিস না, তৈরি হতে হবে আমাদের।' আনন্দ হাত বাড়িয়ে আর একটা ট্যান্সিকে খামাল।

॥ ১৭ ॥

ট্যান্সি দাঁড় করিয়ে যা ছিন সম্পদ তা তুলে দিয়েছিল আনন্দ। আপাতত সব থাকবে জয়িতাদের বাড়িতে। কল্যাণ চলে যাবে টুকিটাকি জিনিসপত্র আনতে। সুদীপ নিজের একটা ব্যক্তিগত কাজ সেরে ফিরে আসবে জয়িতার ফ্ল্যাটে আটটা থেকে সাড়ে আটটায়। একটা গাড়ি দরকার। এবং এই দায়িত্বটা নিয়েছে সুদীপ। হেঁকে বলেছিল, 'কলকাতা শহরে এত গাড়ি আর আমি একটা পাব না।'

নিজের বাড়ি সম্পর্কে জয়িতা হঠাৎ যেন বেশীমাত্রায় স্থির হয়ে গেছে। ও যা ইচ্ছে করতে পারে ওখানে, কেউ কিছু বলবে না—এই ধরনের আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে ওর। একথা ঠিক সুদীপের সঙ্গে অবনী তালুকদারের যে সম্পর্ক ওর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের তা নয়। বড় লোক মানেই সামান্য হৃদয়বোধ থাকবে না একথা পাগলরাই ভাবতে পারে। এবং উঁচু বড়লোকদের মনে এক ধরনের দুর্বলতা সব সময় তিরতির করে কাঁপে। জয়িতা সেই সুযোগটা ব্যবহার করতে চাইছে। করুক।

চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিল আনন্দ। এখন তার রুমমেট সুরজিৎ নেই। একমাত্র রাতের অন্ধকার বাড়লে ওর সঙ্গে দেখা হয়। কোথায় যান কি করে তা বলতে চান না। আনন্দও জিজ্ঞাসা করেনি। একই ঘরে পাশাপাশি বাস করেও দুজনের মধ্যে কোন যোগাযোগ হল না। এই ঘরে হয়তো আজই শেষবার শেষদিন। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে রইল সে। ঘুম আসছে না। যে কাজ করবে বলে তারা নেমেছে সেটা ঠিক পথ নয়, কেউ কেউ বলবেন। প্যারাডাইসে যে মানুষগুলো মরল তাঁদের সবাই শয়তান মন। হয়তো দু'একজন নিরীহ মানুষ শুধু লোভের তাড়নায় ফুটি করতে গিয়ে বন্দি হল। কিন্তু প্যারাডাইসের মালিক? সেই শোষণ লোকটার বেঁচে থাকার কোন অধিকার ছিল না। এই হত্যা কখনই ব্যক্তিহত্যা নয়। একটা চক্রকে ধ্বংস করা মানে ব্যক্তিআক্রমণ নয়? প্যারাডাইসকে যদি চনতে দেওয়া হত তাহলে প্রাথমিকভাবে দেশ কিংবা মানুষের খুব বড় ক্ষতি কিছু হত বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু এখন সেইসব লোভী মানুষেরা ভয় পাবে, তার গ্রামের গরীব মানুষগুলো আর অন্ধকারে থেকে সেই নকল আলোকে ঈর্ষা করবে না। আইন কোনকালেই ওখানে হাত বাড়াতো না। কারণ আইনকে টেকিয়ে রাখার মত সবটা মুখোশ পড়া ছিল। তাদের চারজনের পেছনে যেহেতু কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন নেই, কোন বড় সংগঠন কাজ করছে না তাই তারা যা করবে তাই গুপ্তঘাতকের কাজ হবে? না, সে একথা মনে করে না। কারণ যে সুদীপ জীবনে কাউকে আঘাত করেনি সে ওই হত্যাকাণ্ডের পর একটুও প্লানি বোধ করছে না। তারা সবাই নিশ্চিত্তে ঘুমাতে পারছে। গুপ্তঘাতক এই তৃপ্তি কখনও পায় না। সুরথদার কথা মনে পড়ছিল। বেশ কিছুদিন আগে সে সুরথদার সঙ্গে তার কল্পিত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিল। সুরথদা বলেছিলেন, 'তোমাকে এমনভাবে ব্রেইনওয়াশড করল কে? এ তো স্যাডিস্ট টেরোরিজম ছাড়া কিছু নয়।'

স্যাডিস্ট টেরোরিস্ট? নিজেকে তাই ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলেল আনন্দ। সুরথদারা কতগুলো নিদিষ্ট থিওরিতে বিশ্বাস করেন। এই এই পথে এগোলে দেশে বিপ্লব হবে, এই সব করলে সঠিক রাজনীতির পথে চলা হবে, ব্যতিক্রম মানেই বিদ্রোহ। যেন বই-এ লেখা অক্ষরগুলো যা তাঁরা মগজে রেখেছেন তার বাইরে গেলেই রাজনীতির বাঁধানো সড়ক থেকে সরে যাওয়া। কোন বিকার তাকে আচ্ছন্ন করেনি। সুরথদারা মাই ব্লুক না কেন ভারতবর্ষের মানুষকে কখনই কোন রাজনৈতিকদল বিপ্লবের পথে নিয়ে যেতে পারবে না। সে নিজে কিংবা তার বন্ধুরাও ব্যক্তিগত খুনে বিশ্বাসী নয়। বিত্তবান মানুষ মানেই শেয়াল-হায়না তা পাগল ছাড়া কেউ ভাবে না। কিন্তু একটা প্যারাডাইস দাহন হাজারটা মানুষকে চিত্তিত করবে এবং যে মানুষটি এই দেশে বিষাক্ত-উত্তেজনা আমদানী করছিল তাকে হত্যা করা মানে নিরীহ

মানুষকে খতম করা নয়।

দরজা ভেজানো ছিল। সামান্য নক সেখানে এবং তারপরেই সুরজিৎ চুকল। এই সময়ে আনন্দকে গুয়ে থাকতে দেখে সে বেশ অবাক হল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি? দারোগ্যান বলল তোমাকে নাকি এক ভদ্রমহিলা দুবার খুঁজে গেছেন।'

'ভদ্রমহিলা? আমাকে?'

সুরজিৎ তার খাটের ওপর দুটো চকচকে মলাটের ইংরেজি বই আর একটা বাংলা উপন্যাস ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নেই। দারোগ্যানকে মহিলার বয়স জিজ্ঞাসা করার পর আর কৌতূহলী হবার কোন কারণ পাইনি।'

আনন্দ উঠে বসল। সে যখন হোস্টেলে ঢুকেছিল তখন দারোগ্যানকে দ্যাখেনি। সুরজিৎকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রমহিলা কিছুর বলে গেছেন?'

'উহু'। দারোগ্যান বলল উনি বলে গেছেন আবার আসবেন।' সুরজিৎ সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসল, 'আমার বোধ হয় ইন্ডিয়ায় পাট চুকল।'

'ইন্ডিয়া!' আনন্দ একটু হোঁচট খেল। কোন বাঙালির মুখে ইন্ডিয়া শব্দটা অস্বস্তি আনে।

'হ্যাঁ। আমার কাকা যিনি শিকাগোয় থাকেন এবার আমাকে নিয়ে যাবেনই। এতদিন বাবার আপত্তি ছিল। আমি তো এই দেশ ছাড়ার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিলাম। এখন সব সেটল্ড।'

আনন্দ চুপ করে থাকল। সুরজিৎ যখনই কথা বলে তখনই কোন রুহৎ ব্যাপার ছাড়া ভাবতে পারে না। জ্ঞান হবার পর থেকেই, সম্ভবত দার্জিলিং-এর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকেই ও দেশটাকে 'ইন্ডিয়া' ভাবতে শুরু করেছে। এবং কবে স্বপ্নের দেশে পৌঁছাবে এই আশায় বসে আছে। আনন্দ ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ বাংলা বই আনলে যে!'

'আমার এক বাঙ্গালী উপন্যাসটা গছিয়ে দিল। তুমি তো জান আমি খিলার ছাড়া কিছু পড়তে পারি না। বাংলা যা লেখা হয় তা শালা দু'পাতা পড়া যায় না। হয় প্যানপেনে সাংসারিক গল্প, জোলো প্রেমকাহিনী কিংবা মজ ইন্ডিয়টিক ডাবনা। এই উপন্যাসটা নাকি পলিটিস্ট্র নিয়ে লেখা। বিহী বাড়ার কোন ধান্দা বোধ হয়। দেখি পড়ে।'

আনন্দ হাত বাড়িয়ে উপন্যাসটা নিল। ইদানীং বইটার নাম খুব শোনা যাচ্ছে। লেখকও নতুন। কিন্তু একটি উপন্যাসে ভদ্রলোক জনপ্রিয় হয়ে গেছেন। কয়েক পাতা ওলটালো সে। তারপরেই সে চমকে উঠল। এই উপন্যাসের নামক বাঙালি শুবক, থাকে মধ্যপ্রাচ্যে। আরবিফতের গেরিলাবাহিনীর একজন সদস্য। উপন্যাসটা খাটে রেখে দেওয়া মাত্র দারোগ্যান দরজায় এসে দাঁড়াল, 'ওহো, আপনি আছেন। আপনাকে একজন মহিলা ডাকতে এসেছে। এর আগে দুবার এসেছিল।'

আনন্দ চট করে পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল।

গেটের সামনেই ভিজিটার্সদের বসবার ঘর। আনন্দ সেখানে পৌঁছে দেখল কেউ নেই। দারোগান মাত্র ছমাস এখানে কাজ করছে। সে একটু বিব্রান্ত হয়ে বলল, 'উনি তো এখানেই ছিলেন।'

আনন্দ গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই মাকে দেখতে পেল। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। ও তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'কি ব্যাপার?'

মাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। গ্রামে যাওয়ার পর থেকেই চেহারা ভেঙ্গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল খুব সুকনো। আনন্দের চেহারাটা দেখলেন তিনি। তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু দরকারি কথা আছে।'

একটু অস্থিত, সেটাকে কাটিয়ে আনন্দ বলল, 'ভিজিটার্স রুমে বসবে চল।'

'না, এখানে নয়। তোমার কাছে কেউ আসেনি?'

'না। বোধ হয় তুমি এর আগে দুবার এসেছিলে।'

'বাইরে কোথাও বসা যায় না?'

আনন্দ ফাঁপরে পড়ল। নিশ্চিত্তে কথা বলার জায়গা হল কফি হাউস। কিন্তু মাকে নিয়ে সেখানে বসা যাবে না। ওই চিৎকার সহ্য হবে না ওঁর। সে বলল, 'চল। বসন্ত কেবিনে গিয়ে বসি।'

মা চুপচাপ ওকে অনুসরণ করলেন। আনন্দের খুব ইচ্ছে করছিল ব্যাপারটা জানতে। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। এই হোস্টেলে অনেকদিন আগে মা একবার এসেছিলেন। প্রয়োজন হলে চিঠিতে জানান। তাছাড়া আজ মানুষটাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা করার সাহস পেল না সে। স্নু মিভাসিটির সামনে দিয়ে ওরা এগিয়ে এসে রেস্টুরেন্টের দোতলায় উঠে এল।

এখন এখানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভিড়। দরজার সামনাসামনি একটা টেবিল খালি পেয়ে গেল ওরা। প্রকাশ্যে হয়তো ওরা বসতে চায়নি। একটু স্থির হয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবে তুমি?'

মা মাথা নাড়লেন, 'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। চা বল।' তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, 'তুই দুপুরে ভাত খেয়েছিস?'

আনন্দ দ্রুত ঘাড় নাড়ল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খাওনি।'

'তাতে কিছু এসে যায় না।' বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ তাকে দুটো চা আর টোস্ট আনতে বলল।

ঠিক সেই সময় কোণার টেবিল থেকে একটি মেয়ে উঠে এল, 'আনন্দ, সুদীপের খবর কী বল তো?'

চট করে নামটা মনে করতে পারল না আনন্দ। কিন্তু একে কলেজে দেখেছে।

‘ভাল আছে।’

‘ও কলেজে আসছে না কেন? আমি ওর বাড়িতে ফোন করেছিলাম। সেখানেও নাকি থাকে না। তোমার সঙ্গে দেখা হয়?’ মেয়েটি একবার আনন্দ আর একবার মায়ের দিকে তাকাল।

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘দেখা হয়। ও বোধ হয় আর কলেজ করবে না।’

‘সে কি? কেন?’

‘সেটা ওর বন্না উচিত।’

‘তোমরা চারজনেই ডুব মারলে কেন?’

‘এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।’

‘তাই? সুদীপকে বলো দীপা কারো অবহেলা সহ্য করে না।’ মেয়েটি যে ডাবে উঠে এসেছিল সেইভাবে ফিরে গেল কোণায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল আনন্দ। মেয়েটি এমন ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল যেন নিজেকেই সুদীপ বলে মনে হচ্ছে এখন।

এই সময় মা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোরা কেমন আছিস?’

আনন্দ মুখ তুলল, ‘ভাল।’

‘তুই কতদিন ওই হোস্টেলে থাকবি?’

‘জানি না। তবে সামনের মাস থেকে তোমাকে টাকা পাঠাতে হবে না।’

‘তোর আর ওই হোস্টেলে থাকা উচিত নয়।’

‘কেন? কিছু হয়েছে?’

‘হ্যাঁ। পুলিশ এসেছিল আজ সকালে। লোকাল থানা থেকে নয় কলকাতা থেকে গিয়েছিল। গ্রামের সমস্ত মানুষকে জেরা করেছে। মুদির দোকানে বিপ্রদাসবাবুর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল?’

আনন্দের মনে পড়ল। তারা যখন গ্রামে ঢুকছিল তখন মুদির দোকানটার সামনে দিয়ে অন্ধকারে মাওয়ার সময় বিপ্রদাসবাবু প্রস্থ করেছিলেন, কে? সে পরিচয় দিয়েছিল। কলকাতা থেকে বন্ধুরা সঙ্গে এসেছে এটাও জানিয়েছিল। সে উত্তীর্ণ হয়ে উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ। কিন্তু উনি কাওকে দ্যাখনি।’

‘সেই কথা উনি পুলিশকে বলেছেন। সেন বাড়ির ছেলে আনন্দ কলকাতা থেকে বন্ধুদের নিয়ে রাঙে গ্রামে এসেছিল। খবরটা পেয়ে পুলিশ বাড়িতে আসে।’

এই সময় চা আর টোস্ট দিয়ে গেল বেয়ারাটা। সেদিকে না তাকিয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘তারপর?’

মা বললেন, ‘আমি দেখলাম অস্বীকার করে কোন লাভ হবে না। তাই বলেছি তুই দুই বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলি বেড়াতে। রাতটা কাটিয়ে বকখালি শাবি বলে গিয়েছিস।’

‘ওরা বিশ্বাস করেছে?’

‘সেটা বুঝতে দেয়নি। তোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। কোথায় থাকিস,

কি পড়িস, রাজনীতি করিস কিনা এই সব। যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিল
তোর কোন বাব্বীকে আমি চিনি কিনা।’

‘তুমি জয়িতার কথা বলনি?’

‘না। গ্রামের সবাই জানে তিনজন ছেলে আর একজন মেয়ে ডাকাতিটা
করেছে। জয়িতা সেদিন গিয়েছিল বললে আর কিছুই বলার বাকি থাকত
না।’

‘ডাকাতি?’

‘সাধারণ মানুষের তাই ধারণা।’

আনন্দ ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির হয়ে উঠল। এতক্ষণ কি নিশ্চিত হয়ে সে
হোস্টেলে গিয়েছিল। আজ সকালে যদি ওরা সার্চ করত তাহলে কালকের
কাগজে পুলিশের কৃতিত্বের কথা হেডলাইন হত। কি কুক্ষণে বিপ্রদাসবাবুর
নজরে পড়েছিল ওরা! আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘কাজের মেয়েটাকে পুলিশ
জেরা করেনি? ও তো জয়িতাকে দেখেছিল!’

মা জবাব দিলেন, ‘ওর বাবার অসুখ বলে সকালে তাকে দেখতে গিয়েছিল।
পুলিশ ওকে পায়নি। কিন্তু গ্রামের কেউ একজন সুদীপ আর কল্যাণকে
অন্ধকারে বড় রাস্তার দিকে যেতে দেখেছিল। ওদের কেউ চিনতে পারেনি।
কিন্তু পুলিশ আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিল তোরা রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি
কিনা? ওরা সন্দেহ করছে।’

‘তুমি কি উত্তর দিয়েছো?’ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

‘কি উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া স্বাভাবিক?’ মা চোখ তুলে তাকাতে আনন্দ
আর কিছু বলল না। চুপচাপ চা আর টোস্ট খাচ্ছিল ওরা। তারপর মা
বললেন, ‘তোরা এবার কি করবি ঠিক করেছিস?’

‘আমরা আর থেমে থাকব না।’

‘আনন্দ! আমি তোকে না বলব না কিছুতেই। কিন্তু বলব বোকামি করিস
না।’

‘বোকামি কাকে বলে তাই নিয়ে তর্ক হবে মা।’

‘আমি সেই তর্কে যেতে চাই না। তোরা চারজন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে যা
করতে চাইছিস তার পেছনে কোন দলের সমর্থন নেই। অর্গানাইজড হয়েও
সেখানে একটা দেশের শক্তির সঙ্গে সব সময় লড়াই করা যায় না সেখানে
তোদের অবস্থা কি হবে বুঝতে পারছিস না?’

‘আমি, জানি। তোমার সঙ্গে এই নিয়ে অনেক কথা বলেছি মা। আজ যদি
ভারতবর্ষের এক নম্বর বুর্জোয়াকে কেউ খুন করে বলে দেশের শত্রুকে খতম
করলাম তাহলে হয়তো আইন তাকে ফাঁসি দেবে কিন্তু দুই তিন চার নম্বর
বুর্জোয়ারা সামান্য হলেও থমকে যাবে। এবং সাধারণ মানুষ—’

আনন্দকে থামিয়ে দিলেন মা। ওঁর হেঁটে অজুত হাসি ফুটে উঠল, ‘তোর সঙ্গে
তর্ক করতে চাই না। এই জীবনে আমি আমার জন্যে কিছুই চাইনি। তোর

বাবা হঠাৎ চলে গেলেন। তোকেও আমি ধরে রাখছি না। শুধু বলব যা করবি ভেবে করিস।’ মা একটু নিঃশ্বাস নিলেন। এখানে খানিকক্ষণ বসে, চা খেয়ে তাকে একটু শান্ত দেখাচ্ছিল। তারপর বললেন, ‘পুলিশ হাত থেকে বাঁচার জন্যে তোরা যদি কারো বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চাস তাহলে কেউ তা দেবে? যখন শুনবে তোরা মানুষ খুন করে এসেছিস? অতি কুখ্যাত খুনী যখন নিজে খুন হয়ে যায় তখন মানুষ তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়। মৃতরা চিরকালই নিরীহ।’

আনন্দ বলল, ‘না মা আমরা ভুল করছি না। আমরা কেউ বেঁচে থাকব না জানি। কিন্তু ধরো, আজ রাত্রে আমরা বড়বাজারের একটা জাল ওষুধ কারখানা ধ্বংস করব ঠিক করেছি। তুমি বলবে খবরটা পুলিশকে দিলে তারা ওটা বন্ধ করে দিত। হয়তো দিত। কেউ অ্যারেস্টড হতো কেউ হতো না। তিন মাস কেস লড়ে তারা ঠিক বেরিয়ে আসতো। এ দেশের আইন সব সময় চারপাশে ফাঁক রেখে দেয়। তারপর সেই লোকগুলো আবার আর একটা জায়গায় ওই ব্যবসা শুরু করতো। আমাদের হোস্টেলের ছেলেটার মত হাজার হাজার প্রাণ চলে যাওয়ার বদলে ওদের শেষ করাটা আমি পবিত্র কাজ বলে মনে করি। তুমি আমার জন্যে চিন্তা করো না। আমাকে কিভাবে তৈরি করবে কখনও বলনি তুমি। কিন্তু আমরা আমাদের মত করে আগামীকালকের জন্যে আজকের দিনটাকে উৎসর্গ করতে চাই।’

বেয়ারা এসে প্লেটে মৌরী আর বিল দিয়ে গেল। মা বললেন, ‘তুই এখনই ওই হোস্টেল ছেড়ে দে। তোর ধরা পড়া মানে তোর বন্ধুদের বিপদ। কিছু করার আগেই নিজে শেষ হয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তোর বাবার মারা যাওয়ার পর থেকেই আমি তোর কাছে কিছু চাইব না বলে ঠিক করেছিলাম। আজও সেটা পালটাবার কোন কারণ নেই। যা ভাল মনে করছিস তাই কর। সেটা যদি তোকে শান্তি দেয় দেবে।’

‘তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ না কেন?’ আচমকা আনন্দ প্রশ্নটা করে বসল।

মা হাসলেন, ‘কি লাভ? তুই যদি একটা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা অধ্যাপক হতিস তাহলে তো এই দেশে আর একটা সুবিধেবাদী মানুষের সংখ্যা বাড়তো এই তো।’

আনন্দ অবাক হয়ে গেল। মা ঠিক এইভাবে কথা বলবেন সে কখনও ভাবে নি। তার মনে হল পুলিশ যদি জানতে পারে তাহলে ওরা মাকেও ছাড়বে না।

‘তোকে যে কথাটা বলার জন্যে এসেছি সেটা এবার বলি।’ মা সোজা হয়ে বসেছিলেন, এবার সামান্য এগিয়ে এলেন। আনন্দ বুঝতে পারল না। পুলিশ তাকে যে কোন মুহূর্তে ধরতে পারে এ ছাড়া আর কি জরুরী কথা থাকতে পারে।

একটু ইতস্তত করলেন মা। তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, ‘তুই এক

সময় আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করতিস কেন তোর বাবা মূমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গেল? কি দুঃখ ছিল ওর!

আনন্দ হঠাৎ থমকে গেল। এই মুহূর্তে মা যে ওই প্রসঙ্গ তুলবেন তা কল্পনাতেও ছিল না। সে বলল, 'আজ হঠাৎ ওসব কথা তুলছ কেন?'

'আজ বলা দরকার। তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না। তোরও জানা উচিত। তোর বাবা আত্মহত্যা করার আগে জামসেদপুরের হোটেল থেকে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চেয়েছিল। লাইন পায়নি।

তারপর সে একটা চিঠি লেখে। লিখে নীচে নেমে নিজের হাতে পোস্ট করে। ওই চিঠিটা আমি পাই কলকাতা ফিরে গিয়ে। চিঠিটার কথা কেউ জানে না। আমিও তোকে বলিনি। শুনেছি আত্মহত্যা করার সময় নাকি মানুষের এক ধরনের অ্যাবনর্মালাটি প্রো করে। চিঠিটা পোস্ট করে যে আত্মহত্যা করেছে

তার একটা লাইনেও কিন্তু অ্যাবনর্মালাটি নেই।' মা ব্যাগ খুললেন। প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতরে আর একটা ছোট ব্যাগ। সেই ব্যাগের চেন খুলে তিনি একটা খাম বের করলেন। এখনও তার রঙ নতুনের মত, মা সেটা এগিয়ে দিলেন

'এটা আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম এতকাল। আর রাখার দরকার নেই। তোর যা ইচ্ছে তাই করিস। এবার আমি চলি।'

ব্যাগ হাতে নিয়ে মা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। খামটা হাতে নিয়ে আনন্দ বলতে পারল, 'চলে যাবে?'

হেসে ফেললেন মা, 'বাঃ আমি এই রেষ্টুরেন্টে সারাজীবন থাকব নাকি?'

ধক করে বুকের মধ্যে লাগল আনন্দর। ওর সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনি শুরু হল। সেটা লক্ষ্য করে মা বললেন, 'পাগলামি করিস না। আমাকে গ্রামে ফিরতেই হবে। মেয়েদের পরীক্ষা নিচ্ছি। দুজন পড়তে আসবে। বেশী রাত হলে অসুবিধে হবে।'

দাম মিটিয়ে দিল আনন্দ। পাশাপাশি চুপচাপ নীচে নেমে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইখানে ধর্মতলার বাস দাঁড়ায় না?'

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল আনন্দ। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর টাকা পয়সার নিশ্চয়ই দরকার, তাই না?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। টাকা পয়সা আছে।'

বাস এসে পড়েছিল। হাত দেখিয়ে সেটাকে থামিয়ে মা বললেন, 'সাবধানে থাকিস। কোন দরকার হলে জানাস।' তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেলেন বাসের দরজায়।

অনেক কষ্টে চোখের জল সামলালো আনন্দ। এখন রোদ নেই। ছায়া ঘন হয়নি। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছে। ধীরে ধীরে সে হেঁটে যাচ্ছিল ঝুঁনিভাসিটির উল্টো ফুট দিয়ে। আজ ওখানে মাইকে বক্তৃতা হচ্ছে না, জম্মায়েতও নেই। খামটার দিকে তাকাল সে। ঘরে এখন সুরজিৎ রয়েছে। ও ডানদিকে বাঁক নিল। কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকে জায়গা খুঁজতে

লাগল। সবকটা চেয়ার হুগ ডাঙ্গা, নয় কারো দখলে। শেষ পর্যন্ত একা ঘাসের ওপর বসে পড়ল আনন্দ। কাছাকাছি কেউ নেই কিন্তু চারপাশে বেশ উৎসবের আঁচ লেগেছে যেন। এই যে মানুষগুলো, এরা অন্তত এই মুহূর্তে দুঃখী নয়। কোন রাজনীতি এদের মাথায় ঢুকবে না। আত্মসুখী মানুষগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে খামের ওপর রাখল। মায়ের নাম ঠিকানা স্পষ্ট হাতে লেখা। মায়ের নামটায় দুবার কালি বুলিয়ে মোটা করা হয়েছে। ওপরে দুটো ডাকঘরের ছাপ। এতদিনেও তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামসেদপুরের ছাপটা পড়েছিল বাবার মৃত্যুর পরের দিন। খামের কাগজটা নরম হয়ে এসেছে। বোঝা যায় খুব মজ্ব করে রাখা। হয়তো এই ক'বছরে একদম হাত পড়েনি। সন্তর্পণে ভেতরের কাগজ দুটো বের করল সে। বাবার প্যাডের কাগজ। ওপরে তারিখ, আত্মহত্যা যে রাতে করেন সেই রাতের এগারোটা তিরিশ মিনিট। বাবার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। কালো কালিতে লেখা চিঠি এখনও ঝকঝক করছে। বাবা মাকে অনু বলে ডাকতেন। এই চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। অনু লিখে বাবা শব্দটার চারপাশে কালির রঙ এঁকেছেন। কেন? চিঠিটা পড়া শুরু করল আনন্দ। একজন মৃত মানুষের লেখা এত বছর পর পড়ার সময় অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল ওর।

‘অনু। একটু আগে তোমাকে টেলিফোন করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অপারেটর বলল কলকাতার লাইন এখন খারাপ। আমার বরাতটাই এই রকম। নইলে এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না কেন? এই মুহূর্তটুকু আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান। অতএব বাধ্য হয়ে এই চিঠি। কাব্য করে বলতে পারতাম এই চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছাবে তখন আমি আর পৃথিবীতে থাকব না। যদিও ব্যাপারটা সত্যি। ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চয়ই খবরটা পেয়ে যাবে। কারণ তোমার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং একটা ডিরেকশন আমার টেবিলে রেখে যাচ্ছি যাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে দিতে পারেন। এ দেশের পুলিশদের তো এইটুকু সাহায্য করা দরকার।

অনু। আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। কারণ এছাড়া আমার কোন উপায় নেই। বেঁচে থাকারটা তাদের কাছেই মূল্যবান যাদের আগামীকালের জন্যে আশা করতে ভাল লাগে। আমাকে ঘিরে এখন নানান সমস্যা। এবং কোনটাই আমি সমাধান করতে পারব না। তাছাড়া আমার বেঁচে থাকার অনেক ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি করছে। সবার ওপরে, বেঁচে থাকলে আগামীকাল আমি সুস্থ থাকতে পারব না। আমাকে সুস্থ থাকতে দেওয়া হবে না। শুধু সেই বেঁচে থাকারটা তোমাদের ওপর চাপ আনবে, তোমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে।

না। আজ কোন কথা তোমার কাছে লুকাবো না। অনু এতগুলো বছর আমরা একসঙ্গে বাস করেছি, বেরিয়েছি, আনন্দ করেছি, একই বিছানায় রাত

কাটিয়েছি কিন্তু তোমার কাছে সব কথা খুলে বলিনি। আমার জীবনের একটা দিক তোমাকে জানাতে চাইনি। প্রথমে ভেবেছিলাম জানলে তুমি আপত্তি করবে, পরে মনে হয়েছিল এতদিন জানাইনি বলে তুমি অপমানিত হবে। তুমি যদি খুব সাধারণ মেয়ে হতে তাহলে এসব ভাবতাম না। তোমাদের মত গভীর মনের মেয়েদের নিয়েই যত মুশকিল। অত কাছে এসেও কিসের যেন ফারাক তৈরী করে রাখ।

তুমি জানতে না, আমি নকসালপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতাম। আমি ভোট দিতে যেতাম না, কারণ হিসেবে তুমি ভাবতে আলস্য। আমি যে চাকরি করি তাতে দুহাতে ঘুষ নেওয়া যায়, অনেক উপরে স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়। আমার গাড়ি ছিল, ভাল ফ্ল্যাট ছিল, সুন্দরী স্ত্রী ছিল। অতএব বিশ্বাসটা যদি বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারতাম তাহলে আরও অনেক বুদ্ধিজীবী নকসালপন্থীর মত দেশলাইবাক্সের জীবন-যাপন করতে পারতাম। এই করে কেউ কেউ তো তলার কুড়োচ্ছে আবার গাছেরও খাচ্ছে। আমি পারিনি। সেই আন্দোলনের সময় থেকে যতটা সম্ভব আড়াল রেখে আমি একটার পর একটা কাজ করে গেছি। ঘুষ না নেওয়ায় এখনও সত্তর হাজার টাকার ঋণ আমার কাঁধে। যা আসলে পার্টির প্রয়োজনে দিতে হয়েছিল। তুমি কিছু জানতে না। শুধু জানতে অফিসের কাজে আমাকে প্রায়ই টুরে যেতে হয়।

না, নকসালপন্থী রাজনীতি নিয়ে আমি কিছু বলতে বসিনি। বীরভূমের সিউড়িতে পুলিশ অফিসার রবীন্দ্রনাথ দত্তকে খুন করা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল, একথা কি তোমার মনে আছে? পার্টির জরুরী মিটিং ছিল। রবীন্দ্রনাথবাবু কলকাতা থেকে ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন ওখানে। যে রাত্রে মিটিং সে রাত্রে রবীন্দ্রনাথবাবু জাল গুটিয়ে এনেছিলেন। দশ মিনিট দেরী হলে সবাই ধরা পড়ত! ভদ্রলোক সন্দেহ করেননি আমি একই উদ্দেশ্যে গিয়েছি। উনি জেনেছিলেন আমি বড় কোম্পানির কাজে ওই শহরে গিয়েছি। থানায় যাওয়ার আগে আমি ওঁকে খুন করেছিলাম। সাফল্যের সম্ভাবনায় ডগমগ। লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে আমার কমরেডদের বাঁচিয়েছিলাম আমি। পরদিন সবাই এটাকে উগ্রপন্থীদের কাজ বলে মনে করেছিল। আমার ওপর কোন সন্দেহ পড়েনি কারো। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কয়েক রাত ঘুমুতে পারিনি আমি। কিন্তু ধীরে ধীরে সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। পার্টি ভাঙ্গল, আন্দোলন মুখ খুবড়ে পড়ল। কিন্তু আমার ওপর আর একটা চাপ শুরু হল। চাপটা আমার প্রাক্তন দলের একজনের কাছ থেকে। সে এখন ফেরার। সে জানে আমি খুন করেছি। আর সেই কারণে আমার ওপর নিয়ত চাপ। প্রত্যেক মাসে টাকা দিয়ে যেতে হয়েছে। ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকলে কিছু বজার ছিল না। এইবার সুপ্রভার কথা বলছি। সুপ্রভা এই ফেরারী মানুষটার স্ত্রী। একসঙ্গে দলে ছিলাম আমরা—সেই সময় ওদের প্রণয় বিবাহ। সুপ্রভা অত্যন্ত সিরিয়াস টাইপের মেয়ে। কলকাতার একটা কলেজে

পড়ায়, পাইকপাড়ার হাউসিং স্টেটে থাকে। টালা পার্ক থেকে দত্তপুকুরের দিকে যেতেই প্রথম বাঁ দিকের হাউসিং স্টেট। স্বামীর আচরণ, পার্টি বিরোধী কাজকর্মের জন্যে সে পৃথক হয়েছিল। ডিভোর্স হয়নি ওদের। সুপ্রভার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। শুধু এটুকু হলে ক্ষতি ছিল না। অনু, তুমি কষ্ট পাবে, কিন্তু এখন আমার না বলে উপায় নেই। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে আমি সুপ্রভার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। এক্ষেত্রে আমার করার কিছু ছিল না। সুপ্রভার সঙ্গে জড়ানোর ব্যাপারে আমার কোন আফসোস নেই। সে কখনও আমাকে বিরক্ত করেনি। কখনও চায়নি আমাদের বিরত করতে। কিন্তু চেয়েছিল আমি যেন গোপন-রাজনীতি না ছাড়ি। এখনও সে সক্রিয়—যারা এখনও স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে ও তাদের দলে। কিন্তু একান্তরের পরে পার্টির ভাগাভাগি থেকে গুরু করে এত রকমের ছবি আমি দেখেছি যে আর আমার পক্ষে নতুন ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব ছিল না। এই জীবনে কিছু হবে না। ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের মতই থাকবে। আর এখানেই গুরু হল সুপ্রভার সঙ্গে সংঘাত। আর সেটাকেও কাজে লাগালো ওর ফেরারী স্বামী।

আজ একটু আগে সে আমার কাছে কতগুলো দাবী করেছিল। সেগুলো মেটালে সারাজীবন তোমাদের কাছে ছোট হয়ে থাকতাম। সে চাইছে তোমাদের ত্যাগ করে সুপ্রভাকে বিয়ে করতে হবে আমাকে। নিজেকে মৃত ঘোষণা করতে চায় সে। এই বিবৃত আবদারের পেছনে কি কারণ আমি বুঝতে পারছি না। এতে সুপ্রভার সায় আছে কিনা তাও জানি না। দ্বিতীয় দাবী ছিল টাকা। সেটা দেবার সাধ্য এখন আমার নেই। ফলে সে আজ বিহার পুলিশকে আমার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পৌঁছে দিয়েছে। বিহার পুলিশ কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তাদের একজন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন হোটেল ছেড়ে যেন না যাই। রবীন্দ্রনাথ দত্তকে খুন করার ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য এখন ওদের হাতে। আমি মামলা করতে পারি কিন্তু কি লাভ তাতে? আর এই মুহূর্তে আমি ফেরারী হতে পারি। তাতে কতটা গৌরব বাড়বে! ওরা আমায় ছেড়ে দেবে না। তোমাদের ওপর চাপ আসবে। তাছাড়া একজন খুনী হিসেবে তোমাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

অদ্ভুত ব্যাপার, এখন নিজেকে খুনী মনে হচ্ছে। অথচ সেই সময়, কমরেডদের বাঁচানোর সময় কখনই সেকথা মনে হয়নি। ওই আন্দোলন ব্যর্থ না হলে হয়তো মনে হত না। এখন আন্দোলনের বিভিন্ন ফাঁক ফোঁকর এত বড় হয়েছে, পরিকল্পনাহীনতায় মুখ খুবড়ে পড়া একটি উদ্যমের অনেক ব্রুটি চোখের সামনে। তখনই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ দত্ত মশাই একজন সাধারণ মশাই ছিলেন। তাঁর চাকরিটা তিনি মন দিয়ে করতে চেয়েছিলেন। একটি কর্তব্যপরায়ণ মানুষকে বুজোয়া, শ্রেণীশত্রু ইত্যাদি বলা যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে।

আগামীকাল কিংবা আজ রাত্রেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে ওই মানুষটিকে

হত্যা করার অভিযোগে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসবার মত অনেক তথ্য তখন সামনে দগদগ করবে। তারপর আর বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না অনু।

এবার তোমাকে দু টা কথা বলি। সুপ্রভার ব্যাপারটার জন্যে আমার ক্ষমা করো, যদি সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে মেয়েটার কোন দোষ ছিল না, আজও নেই। আজ এই মুহূর্তে একটা সত্যি কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। অনু, তোমাকে আমি ভালবাসি। যেহেতু তুমি আমার কাছেই ছিলে, ইচ্ছে হলে দেখতে পেতাম চাইলে বা না চাইলেও কাছে পেতাম তাই তোমাকে আলাদা করে কিছু ভাবিনি। নিজের ছায়াকে তো মানুষ গুরুত্ব দেয় না। দিনদুপুরে ছায়াহীন মানুষের কলট কি তা এখন বুঝতে পারছি। এখন তোমাকে দেখতে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বড় ইচ্ছে করছে। আবার বলি, সবকিছু করেও আমার শেষ ভালবাসা তোমার জন্যই রইল। আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কিছু টাকা তোমার নামে ট্রান্সফার করেছি আর অফিস থেকে প্রাপ্য টাকার নমিনি তুমি। জানি না তাতে তুমি হাত দেবে কি না।

শুধু একটা অনুরোধ করব। আনন্দকে ওর নিজের মত বড় হতে দাও। তোমার কোন ইচ্ছে ওর ওপর চাপিও না। ও যা করতে চায় করতে দিও। ও যদি বড় হয়ে ভারতবর্ষের তথাকথিত সুখী নাগরিক হয় তাহলে কিছু বলার দরকার নেই। যদি তা না হয়, যদি ওর মধ্যে ঝড়ের উদ্দামতা দ্যাখো তাহলে সময় এবং সুযোগমত আমার এইসব কথা ওকে খুলে বল। যদি চাও, এই চিঠি ওকে দ্যাখাতে পারো।

তোমাকে এই চিঠি লেখার এক ফাঁকে ট্যাবলেটগুলো খেয়েছিলাম। শরীর ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বড় ঘুম পাচ্ছে। এই সময় যদি তোমাকে দেখতে পেতাম! ক্ষমা চাই, শুধু তোমার কাছে। তোমারই (তুমি চাও বা না-চাও) সপ্নত।

মিনিট দশেক চুপচাপ বসে রইল আনন্দ। এখনও চোখের পাতায় সেই ঘুম স্পষ্ট। অথচ ধীরে ধীরে মুখের রেখাগুলো পাল্টে যাচ্ছে। ‘বড় হয়ে কোন মেয়ের কাছে জল চাইবে না।’

‘কেন?’

‘আনন্দ জল দাও বললেই সেই মেয়েগুলো চণ্ডালিকা হয়ে যাবে।’

ছোট্ট শিশুর সঙ্গে কি সরল গলায় রসিকতা করেছিল যে মানুষটি তার ব্যক্তিগতজীবনের আর একটা ছবি এই রকম। আনন্দের খুব ইচ্ছে করছিল সেই ফেরারী লোকটি এখন কোথায় আছে জানতে। আর এই সুপ্রভা নামের মহিলাটি?

মা কোনদিন ওদের কথা বলেনি। সুপ্রভার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কি না সে জানে না, কিন্তু বাবা নকসাল রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন এই তথ্য আজ এই মুহূর্তে মা তাকে জানিয়ে গেলেন

কেন ?

আনন্দ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে বেরিয়ে এল কলেজ স্কোয়ার থেকে। সে যখন রাস্তা পার হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই সুরজিৎ তাকে চিৎকার করে ডাকল। সুরজিৎ সেজেগুজে তার আড্ডায় যাচ্ছিল। ওকে দেখে দ্রুত কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বল তো ?'

'কিসের কি ব্যাপার ?' আনন্দ চোখ তুলে তাকাল।

'তোমার খোঁজে পুলিশ এসেছে হোস্টেলে। নালবাজার থেকে।'

'কখন ?'

একটু আগে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম বেরিয়ে গেছে। 'ওরা সুপারের সঙ্গে কথা বলে হোস্টেলেই অপেক্ষা করছে।'

আনন্দ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সুরজিৎ।'

'তুমি কি কোন ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত ?'

'না।' দ্রুত গলায় বলল আনন্দ, 'ক্রাইমগুলো ভাগতে চাই। ঠিক আছে, চলি।'

সুরজিৎ বাধা দিল, 'আনন্দ, আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি ?'

আনন্দ অবাক হল, 'তুমি! তুমি কি সাহায্য করবে ?'

'আমার ক্ষমতার মধ্যে যা পারি।'

'তুমি তো জান না আমি কি করেছি!'

'জানি না। কিন্তু তুমি কোন অন্যায় করেছ এটা বিশ্বাস করি না।'

'ধন্যবাদ। ঠিক এই মুহূর্তে কোন সাহায্য আমি চাই না। তবে পরে হোস্টেলের বাইরে কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে বলতে পার ?'

'হ্যাঁ।' সুরজিৎ হ্যারিংটন স্ট্রিটের একটা ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিল,

'আমি রোজ বিকেলে ওখানে থাকি। তোমার কথা আমি বলে রাখব।'

'বেশ। আমার প্যান্ট শার্ট হোস্টেলে আছে। যদি পারো সেগুলো ওখানে নিয়ে যেও। আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি সুরজিৎ।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি আর এখানে দাঁড়িও না। পুলিশ এখানেও থাকতে পারে। তোমার উচিত এখনই কোনো ভাল ল-ইয়ারের সঙ্গে দেখা করো।'

একটা ডাবল ডেকার আসছিল শ্যামবাজার থেকে। সেদিকে তাকিয়ে আনন্দ বলল, 'আইনের বই এদেশে যারা লিখেছে তারা আমাদের জন্য কোন লাইন রাখেনি। চলি।' প্রায় দৌড়ে বাসটায় উঠে পড়ল আনন্দ। এটাকে কি ভাগ্য বলে ? নইলে সুরজিৎ হঠাৎ এই সময় এখানে আসবে কেন ? সে যদি সোজা হোস্টেলে ফিরত কিংবা মা যদি না আসতেন তাহলে ? আনন্দ নিজেকে বলল, বন্ড কেন্দ্রারলেস হয়ে থাকছে সে।

এই সময় পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলছেন ভাই ?'

আনন্দ মাথা নাড়ল। এবং তখনই তার খেয়াল হল বাঁ হাতে খামটাকে সে ধরে আছে। সমস্ত পকেটে ওটাকে রেখে দিয়ে দুহাতে বাসের রড ধরল আনন্দ।

সুদীপ চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছিল। পুরো রাস্তাটা আনন্দ ওদের বোঝাতে বোঝাতে এসেছে। ওরা কেউ কথা বলেনি। জয়িতা এবং কল্যাণ খুব গভীর মুখে শুনেছিল কিন্তু সুদীপের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল সে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। আনন্দ সেটা লক্ষ্য করলেও কিছু বলেনি। তার ধারণা ছিল যে শিষ্য দিচ্ছে কিংবা রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে মানে এই নয় যে কিছুই তার কানে যাচ্ছে না। জয়িতা শেষ পর্যন্ত পারল না। সে আনন্দকে ইশারায় খামতে বলে রাগত গলায় বলল, 'সুদীপ, ইউ মাস্ট বি সিরিয়াস!'

সুদীপ শিষ্য খামিয়ে বলল, 'তাই?' তারপর আবার শিষ্য শুরু করল।

জয়িতা কাঁধ ঝাঁকাল, 'সব কিছুই একটা লিমিট আছে।'

'কি করব বল, আমার বেশ খিদে পেয়েছে।' সুদীপ বাঁদিকে আচমকা গাড়িটা পার্ক করল, 'আনন্দ, আমরা মিনিট পনের পরে স্পটে পৌঁছালে খুব অসুবিধে হবে?' এবার আনন্দ হতাশ হল। ওরা রাস্তার খাওয়া সেরেছে ঘন্টা দেড়েক আগে। এখন প্রায় সওয়া এগারটা। রাস্তাঘাট ফাঁকা। দোকানপাট বন্ধ হলেও সুদীপ যেখানে গাড়ি খামিয়েছে সেখানে একটা পাঞ্জাবী হোটেল তখনও চালু।

কল্যাণ বলল, 'আমরা তো একটু আগে খেলাম, তোর আজ এখনই খিদে পেয়ে গেল।'

'খিদে লাগলেই শুধু খেতে ইচ্ছে করে একথা তোকে কে বলল? অনেক সময় মনের শান্তির জন্যও লোকে খায়! ওই দোকানে দারুণ কাবাব করে। অনেকদিন ভেবেছি কিন্তু খাওয়া হয়নি। আজ যদি কিছু হয় শায় হয়তো এক জীবনের জন্যে বড় দেবী হয়ে যাবে। সুতরাং ইচ্ছেটা পূরণ করে দিতে আপত্তি কি! অবশ্য আনন্দ যদি অ্যালাউ করে।'

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। তারপর হেসে ফেলল, 'তোমার কি মনে হচ্ছে এটাই অগত্যা যাত্রা?'

'হু নোজ!'' তারপর সুর করে গাইল, 'এ খাওয়াই হয় তো!'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, চটপট খেয়ে আয়।'

সুদীপ কথা না বাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা খাবি না? আচ্ছা, কি জিনিস হারাচ্ছিস জানলি না!' ও দোকানের দিকে পা বাড়াল।

জয়িতা, নিঃশ্বাস ফেলল, 'কোনদিন যে জিনিস জিত্তে দেয়নি তার হয়ে বিজ্ঞাপন করছে।' কেউ কোন কথা বলল না।

কল্যাণ পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে বসেছিল। বাড়ির সঙ্গে তার আজ সম্পর্ক চুকলো? কিছু জামা-প্যান্ট, একটা বই এবং টুকিটাকি কিছু জিনিস নিয়ে সে চলে এসেছে নিঃশব্দে। একবার মনে হয়েছিল বাড়ির সবাইকে ডেকে বলে সে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে মায়ের সঙ্গে বড় বউদির ঝগড়া লাগল। এটা

একটু অভিনব ব্যাপার। কেননা মা এতকাল বড় বউদির ক্যাম্পেই ছিলেন। মেজদা ফিরে আসার পর এমন কি ঘটনা ঘটল, কিংবা তারকেশ্বর থেকে এসে মায়ের কোন্ কারণে মানসিকতা পাল্টানো তা সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু চিত্কারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল আর আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেবার ইচ্ছেটা রইল না। কল্যাণের একটা ধারণা জন্মেছে যে যাদের হাতে পয়সা থাকে না তারাই অকারণে ঝগড়া করে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চায়। এই সময় জয়িতা বলল, 'গাড়িটাকে এভাবে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা অন্যায্য হচ্ছে। পুলিশ যে কোন সময় নান্সারপ্লেট দেখে ফেলতে পারে।'

আনন্দ বলল, 'এখনও তার সময় হয়নি। লাইটহাউসের সামনে ড্রাইভারটা গাড়ির খোঁজ করে না পেয়ে চিত্কার চেষ্টামেচি করবে। তার মালিক সিনেমা দেখে বের হবে বারোটা নাগাদ। ড্রাইভারের কাছে খবর পেয়ে খানায় যাবে লোকটা। খানার অফিসার যদি সেই সময় চেয়ারে থাকেন তাহলে তিনি ডায়েরি নেবেন। নিয়ে লালবাজারে রিপোর্ট করবেন। লালবাজার সেই খবর ওয়ার্ল্ডেসকে যখন জানাবে তখন খুব কম পক্ষে সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। কাল সকাল হলেও অবাক হব না।'

জয়িতার পছন্দ হল না ব্যাখ্যাটা। বলল, 'আমরা অকারণে বুকি নিচ্ছি। এই গাড়িটাকে চেনে এমন কেউ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। সুদীপকে তাড়া দে।'

আনন্দ তাকাল পাঞ্জাবীর দোকানটার দিকে। সুদীপ ভেতরে ঢুকে গেছে। ও হয় সত্যিকারের সহজ কিংবা এই মুহূর্তে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এখন ওকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। ওকে ওর মত ভাবেই স্বাভাবিক হতে দেওয়া উচিত। রাতটা কলকাতায় ধীরেসুস্থে গড়াতে-গড়াতে যেন আচমকা ছুটতে থাকে। রাস্তার আলোর রঙ যেন পাল্টে যায়। শান্ত হয়ে যায় শহরটা কয়েক ঘন্টার জন্যে। আনন্দ দরজা খোলার শব্দ শুনল। কল্যাণ নামতে যাচ্ছিল, জয়িতা বাধা দিল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'সিগারেট স্টক করে রাখি। যদি ওখান থেকে সরাসরি ঠাকুরপুকুরে যেতে হয় তাহলে অসুবিধে হবে।'

কল্যাণ জবাব দিল। তার গাড়িতে বসে থাকতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। যখন চলছিল তখন একরকম ছিল কিন্তু সুদীপ পার্ক করার সময় তার অস্বস্তিটা হচ্ছিল। ডায়মণ্ডহারবার রোডে সেই কেসটা করার সময় তার এই রকম অনুভূতি হয়নি।

জয়িতা বলল, 'ঠাকুরপুকুরটা কোন গভীর জঙ্গল নয় যে সিগারেট পাঞ্জা যাবে না। সবাই মিলে নামা-ওঠা করলে ঝামেলা বাড়বে। কে কখন দেখে ফেলবে তারই জের চলবে। সেদিন আগাথা ক্রিস্টির একটা লেখায় পড়ছিলাম সবরকম সতর্কতা নিয়েও শুধু সিগারেটের টুকরো এলোমেলো ফেলার জন্যে

অপরোধী ধরা পড়ল। সুদীপটাকে ডাকলি না আনন্দ!’
কল্যাণ দরজাটা বন্ধ করল। আনন্দ বলল, ‘ওকে ওর মত থাকতে দে।
তোকে হঠাৎ নার্ভাস লাগছে?’
‘নার্ভাস? আমি’—হাসল জয়িতা। হাসলে ওকে হঠাৎ খুব সুন্দর দেখায়।
পাশে বসে কল্যাণের মনে হল।

আজ সারাদিন সীতা রায় বাড়ি থেকে বের হননি। টেলিফোন রিসিভ
করেননি। বলা যায় ঘর থেকেই দুবার মাত্র বেরিয়েছিলেন। অত্যন্ত স্বেচ্ছায়
বন্দী হয়ে আছেন তিনি। যে দুবার বেরিয়েছিলেন তার একবার রবীন
সেনের জন্যে। সেই বিশাল বপু মানুষটি এসেছিলেন কোন একটি দরকারি
কথা বলতে। কিন্তু সীতা রায়, যাঁর পরনের শাড়িটাকে মনে হচ্ছিল সালোয়ার
পাজাবি, খোলা চুলে একটু রুখু রুখু ভাব নিয়ে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, ‘বড়
মাথার যন্ত্রণায় ভুগছি আজ, কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না। আর
একদিন বসা যাবে, কেমন?’ বলার সময় মাথাটা একপাশে হেলিয়ে
রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ওই ‘একটু’ আর ‘কেমন’ শব্দ দুটো এমন আদুরে
উচ্চারণ করেছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে রবীন সেন পুলকিত হয়ে ‘ঠিক আছে, ঠিক
আছে’ বলে চলে গিয়েছিল। সীতা রায় যে এইভাবে ভেবেচিন্তে কথা বলেন
তা নয় কিন্তু এটা তাঁর অভ্যাসে এসে গিয়েছে। দ্বিতীয়বার বেরিয়েছিলেন
রামানন্দ রায়ের ডাকে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকায় রামানন্দ নক
করেছিলেন। খানিকবাদে একটা হাউসকোট শরীরে রেখে দরজায় এসে
দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে চোখের কাজে প্রস্তুত হুঁড়েছিলেন তিনি। রামানন্দ
ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘সীতা, কি হয়েছে তোমার?’

‘আমার? আমার আবার কি হবে!’ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন সীতা রায়,
‘আমাকে একটু একা থাকতে দাও তোমরা! নিজেকে কি ভীষণ প্রতারিত
মনে হচ্ছে আমার!’

রামানন্দ বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন, ‘কি বলছ? আমি তোমাকে প্রতারণা
করেছি?’

মাথা দুলিয়ে হেসেছিলেন সীতা রায়, ‘তুমি করলে তো বেঁচে যেতাম। জানতাম
তবু কিছু করলে।’ বলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন নিঃশব্দে। টেলিফোনের
পাশের চেয়ারটায় বসে চুপচাপ ঘটনাটা দেখেছিল জয়িতা। হঠাৎ তার মনে
হয়েছিল এই মা যেন অন্যরকম। কিন্তু রামানন্দ রায়ের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল
তার।

বন্ধ দরজার সামনে চুপচাপ কিছুকরণ দাঁড়িয়ে থেকে পাশ ফিরতে মেয়েকে
দেখলেন তিনি। তারপর ওই ধরা পড়ে যাওয়া ভাবটা কাটাবার জন্যে
নার্ভাস-হাসি হেসে স্মার্ট হবার চেষ্টা করলেন, ‘এভরিথিং অলরাইট?’

ঠিক সেই মুহূর্তে মত পালটানো জয়িতা। এই মানুষটিকে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গায়
আজ ফেলার দরকার নেই। সেই ঠিক করেছিল রামানন্দ রায়ের অনুরোধমত

সব কথা খুলে বলে যাবে। এবং আজই সেই বলার দিন। কিন্তু এখন সে মাথা নেড়ে বলল, ‘সব ঠিক আছে। আমি হয়তো আজ রাত্রে ফিরব না।’

‘ফিরবে না?’

‘হ্যাঁ। একটা অনুষ্ঠানে যেতে হবে বন্ধুদের সঙ্গে। যদি আটকে যাই, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।’

রামানন্দ রায় এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, ‘খুঁকি নিয়ে ফেরার কোন দরকার নেই। তবে যদি সুবিধে হয় তাহলে লেট-নাইট হলেও ফিরে এস। আমি অপেক্ষা করব।’

এখন এই গভীর রাত্রে সেন্ট্রাল অ্যান্ডিন্যুতে বসে জয়িতার চেপে রাখা অস্বস্তিটা মাথা তুলছিল। হঠাৎ ওই ঘটনার পর থেকে বাবা একদম পাল্টে গেছেন। আজকাল আর সীতা রায় রোজ সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে যান না, প্রায় মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরেন না। দুজন আলাদা রুতে বাস করছেন। সীতা রায় যদিও একটা ব্যবধান রেখেছে এখনও, কিন্তু রামানন্দ সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন। জয়িতার মনে পড়ল একটা লাইন, ‘একমাত্র পাপি মধ্যবিত্তরাই পারে বারংবার নিজেদের খোলস পাল্টাতে।’

এই সময় সুদীপ ফিরে এল সিগারেট খেতে খেতে। গাড়িতে উঠে বলল, ‘বুঝি জয়, এমন কিছু নয়। এর চেয়ে ভাল কাবাব অনেক খেয়েছি। দিল্লীর আজমল খাঁ মার্কেটের পাশে একটা দোকানে যা করে না! এর শুধু ফালতু নামডাক।’

কেউ কোন কথা বলল না। সুদীপ স্টার্ড দিয়ে আবার বলল, ‘গাড়িটা কিন্তু খুব স্বস্তি ছিল। খুব সুখ যাচ্ছে।’ তারপর ইণ্ডিকেটরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘পেট্রল নিতে হবে।’

‘নিয়ে নে।’ আনন্দ এতক্ষণে জানাল।

মেডিকেল কলেজের উল্টোদিকের একটা পাম্প তখন বন্ধ হতে চলেছে। সুদীপ ম্যানেজ করে পুরো ট্যাক্স ভরে নিল। ওরা কেউ কোন কথা বলছিল না। হ্যারিসন রোডে ঢুকে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে এখনও কিন্তু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাথ পরিষ্কার। কিছু শ্রমিক পরিশ্রান্ত হয়ে ভিথিরীদের পাশে ঘুমিয়ে আছে ফুটপাথে। দোকানপাট বন্ধ। কল্যাণ দেখল সেই মিষ্টির দোকানটারও ঝাঁপ পড়েছে।

আনন্দ সুদীপকে ইশারা করতেই ওরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পাশাপাশি অন্য গাড়িগুলোকে চাবি দিয়ে মালিকরা রাতের মত রেখে গেছে। সেখানেই গাড়িটা ঢুকিয়ে দেওয়ায় নজরে পড়বে না কারো। আনন্দকে দাঁড়াতে বলে সুদীপ ময়লা ডাশটারটা বের করে গাড়ির পেছন দিকে বেঁধে দিল, ‘তাড়াহড়ায় গাড়িটাকেই খুঁজে পাব না। অন্যের গাড়ি চেনা খুব মুশকিল।’ সত্যি, জায়গাটায় তেমন আলো নেই বলে নাস্তার প্লেটটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

খালি হাতে ওরা সেই গলিটার মধ্যে ঢুকল। কল্যাণ আর জয়িতা বসে থাকল

গাড়িতে। সেই পানের দোকানটা এখনও খোলা। আনন্দ দেখল সেই একই লোক বসে আছে দোকানে। তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা স্বাস্থ্যবান লোক দেশের গল্প করছে। সুদীপ চাপা গলায় বলল, ‘কে বলবে এটা ইউ পি কিংবা রাজস্থান নয়।’ ওরা আর একটু এগিয়ে কারখানার সামনে এসে দাঁড়াল। সেই দাড়োয়ানটা নেই, তার জায়গায় আর একজন বসে আসে। গেটটা আধা ভেজানো। উল্টোদিকের একটা বাড়ির রকে ওরা বসল।

আনন্দ নিচু গলায় বলল, ‘আমার সন্দেহ ছিল মোহনলাল সাবধান হয়ে যাবে। আজ সকালে ও নিশ্চয়ই গল্প পেয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও ব্যাপারটাকে আমল দেয়নি।’

সুদীপ বলল, ‘যে লোকটা তোদের ফলো করে গিয়েছিল সে নিশ্চয়ই রিপোর্ট’ করেছে আর যাই হোক তোরা পুলিশের লোক ন’স। পুলিশ হলে মিষ্টি খেতে গিয়ে দাম বেশী বলে বেরিয়ে আসে না। ট্যাক্সিওয়ালারিফ্যুজ করলে কনস্টেবলকে সাহায্য করতে বলে না।’

আনন্দ বলল, ‘ঠিক বলেছিস। ভেতরে আলো জ্বলছে। কারখানায় কাজ হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। পেছনের দিকের দরজাটা ওই গলি দিয়ে গেলে পাওয়া যাবে। যাবি ওদিকে?’

সুদীপ মাথা নাড়ল। বলল, ‘আর একটু অপেক্ষা কর।’

মিনিট পাঁচেক বাদে আর একটা গাড়িকে গলির মধ্যে ঢুকতে দেখা গেল। হেডলাইটের আলো এসে সরাসরি ওদের গায়ে পড়ছে দেখে আনন্দরা সরে বসল। একটা ঝকঝকে নতুন মার্কুটি ভ্যান। কারখানার গেটে সেটা পৌঁছানমাত্র দারোয়ানটা উঠে সেলাম করল। মোহনলালকে নামতে দেখে ইশারা করল আনন্দ সুদীপকে। মোহনলাল দারোয়ানকে কিছু বলতেই সে দরজা খুলে ভিতরে ছুটল। মোহনলাল ঘাড়ি দেখলেন। একটু অসহিষ্ণু দেখাচ্ছিল তাঁকে। ড্রাইভারকে বললেন, ‘গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।’

কয়েক সেকেন্ড বাদেই একটি মধ্যবয়সী লোক হস্তদত্ত হয়ে দারোয়ানের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল, ‘নমস্কার।’

মোহনলাল বললেন, ‘বনবিহারীবাবু, লাশট গাড়ি চলে গেছে?’

‘হ্যাঁ স্যার। সাত নম্বর একটু আগেই বেরিয়ে গেছে।’ লোকটি শূঙ্ক কর মূক্ত করছিল না।

‘কেমিস্ট সব কিছু চেক করেছেন?’ মোহনলালকে একটু নিশ্চিত দেখাচ্ছিল।

‘হ্যাঁ স্যার। এন্ট্রিথিং নর্মাল। শুধু আমাদের প্রোডাকশনগুলো চালু আছে।’

‘সেগুলো থাকবে। এ মাসে আপনার একশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। শুনুন কাল ভোরে এই কারখানায় রেইড হবে। সার্চ করা হবে। আপনারা অফিসারদের বলে আমাকে ফোন করবেন। কাউকে কোন বাধা দেবেন না।’

বুঝতে পারছেন?’ মোহনলাল হাসলেন।

মধ্যব্যঙ্গ লোকটি খুব ঘাবড়ে গেল, ‘এ কি বলছেন স্যার?’

‘যা বলছি তা জেনেই বলেছি। আমিই ব্যবস্থা করেছি। নিউজ পেপারে বের হবে শত্রুপক্ষ মিথ্যে করে আমার নামে বদনাম রটিয়েছে। কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম এই রকম কিছু একটা বলা দরকার। আজ চণ্ডীগড়ের ছোকরাটা আসায় বুদ্ধিটা খুলে গেল।’

‘চণ্ডীগড়ের ছোকরা? সেটা কি ব্যাপার স্যার?’ লোকটির হতভম্ব ভাব কাটছিল না।

‘সব কথা তোমার না জানলেও চলবে। বি নর্মাল, গার্ডদের বলে দাও কোন এক্সট্রা এফট’ নিতে হবে না। আর হ্যাঁ হোলসেনারদের দুটো কুলির আজ অ্যাকসিডেণ্ড হয়েছে। বাঁচবে বলে মনে হয় না। এই রকম অ্যাকসিডেণ্ড যাতে তোমার না হয় তাই যতটা সম্ভব মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করো। যাও, যা কাজ করছ তাই করো।’

মোহনলাল কথা শেষ করে আবার গাড়িতে উঠে বসলেন। উনি চোখের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত লোকটি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছল। দারোয়ানটা দাঁড়িয়েছিল সামনে। লোকটা এবার তার দিকে তাকিয়ে বড়া গলায় বলল, ‘আজ কজন ডিউটিতে আছে? চার্জ কে আজ?’

দারোয়ান বলল, ‘সুন্দরলাল সাব। ওকে ডেকে দেব?’

‘না। ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি। আমি বেশী কথা বলি? মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়।’ শেষ কথাগুলো যেন নিজের সঙ্গেই বলা! দ্রুত পায় লোকটা নিজের কাজে ফিরে যেতেই দারোয়ানটা আরাম করে বসল।

আর একটু অপেক্ষা করে আনন্দ সুদীপকে নিয়ে ফিরে এল সত্যনারায়ণ পার্কের কাছে। সুদীপ বলল, ‘কি কেস বলতো?’

‘খুব বুদ্ধিমান মানুষ। নিজেই সার্চের ব্যবস্থা করেছেন সমস্ত মাল সরিয়ে। কাল যখন জানা যাবে হঠাৎ সার্চ করেও ও’র কারখানায় কোন জাল মাল পাওয়া যায়নি তখন আরও সম্মান বাড়বে। এক বছরের মধ্যে কোন সরকারী হামলার সম্ভাবনা থাকবে না।’ আনন্দ কথাগুলো বলে দূরে দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে তাকাল।

সুদীপ একটু অবিশ্বাসী গলায় বলল, ‘যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে কর্মচারীদের ওপর কারখানা পরিষ্কারের দায়িত্ব দিত না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব যাচাই করে ওই সিদ্ধান্তে যেত।’

আনন্দ বলল, ‘সেটা আগেই করে যায়নি তাই বা কে জানে! হয়তো অতিরিক্ত বলল লোকটাকে যাতে সে ভয় পায়, কখনও মুখ না খোলে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। দুপুরে যারা ডিউটিতে ছিল তারা এখনও আছে না কি?’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই কি এখনও অ্যাকসনের কথা ভাবছিস নাকি?’

ওষুধ বখন ওখানে নেই তখন—।’

‘তবুও অ্যাকসন করব। মোহনলালকে সাধু সাজতে দেব না আমি। যদি এখনই ফ্যাক্টরি অ্যাটাক করে সব শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে প্রমাণ হবে না যে মোহনলাল কি ধরনের ব্যবসা করত। ভোরে সরকারী সার্চ পার্টি এসে ফিরে যাবে। এবং মোহনলাল হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে আবার দু নম্বর ব্যবসাটা শুরু করতে সাহস পাবে না। তার চেয়ে বড় কথা পাবলিককে ব্যাপারটা জানানো দরকার। আয়।’

ওরা গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কল্যাণ বেরিয়ে এল। আনন্দ জয়িতাকে ডাকল, ‘তুই আমার সঙ্গে চল। সুদীপ আর কল্যাণ থাকবে সেকেন্ড স্টেজে। আমাদের কপাল খুব ভাল। চণ্ডীগড়ের ছেলেরা অস্তিত্ব বনবিহারীবাবু জেনেছে কিন্তু কোন ডিটেলস জানে না। আমরা ভেতরে ঢুকবে যাওয়ার মিনিট দুয়েক বাদে তোরা চার্জ করবি। শুধু গ্রেনেড আর পেট্রল বোমা। এই গরীব কর্মচারীদের মারার কোন ইচ্ছে নেই। কল্যাণ, তুই দেখেছিলি ফ্যাক্টরিটা কোন্ দিকে। ওকে! যে যার মাল নিয়ে নে।’

চামড়ার ব্যাগের স্ট্র্যাপটা কোমরে আটকে নিল আনন্দ। জয়িতার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে মালপত্র আছে। ব্যাগের স্ট্র্যাপটা কাঁধের সঙ্গে আটকে নিয়েছে সে যাতে দৌড়বার সময় না পড়ে যায়। দুজনে খুব শান্ত পায়ে হাঁটছিল। ওদের স্টিক পেছনেই সুদীপ আর কল্যাণ। সিগারেটের দোকানের সামনে এসে আনন্দ দেখল লোকটা এখন একা। সে কল্যাণকে বলল, ‘এখান থেকে কিনে নে তোর সিগারেট। আমরা মোহনলালের সঙ্গে দেখা করে আসি।’

ওরা দাঁড়িয়ে পড়তেই জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘আর একটা রিস্ক নিলি। ওই পানওয়লাটাই হয়তো পরে কল্যাণদের আইডেন্টি ফাই করবে।’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘তার আগে মোহনলাল পুলিশকে আমার বর্ণনা দেবে।’

ওরা গেটের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। দারওয়ানটা ওদের দিকে তাকাতে আনন্দ বলল, ‘এই যে ভাই, চিনতে পারছেন?’

লোকটা খানিকটা অবাক হয়ে মাথা নেড়ে না বলল। ডুল হয়ে গেছে এমন করে আনন্দ চটপট বলল, ‘ওহো, তুমি না, সকালে যে ডিউটিতে ছিল সে আমাদের চেনে। মোহনলালজীর একবার ফেরার কথা ছিল, তিনি কি ফিরেছেন?’

লোকটি এবার মাথা নেড়ে বলল, ‘সাহেব একটু আগেই চলে গেছেন। আপনারা কে?’

‘আমরা চণ্ডীগড় থেকে এসেছি। সাহেব চলে গেছেন, খুব মুশকিল হয়ে গেল। বনবিহারীবাবু আছে?’

‘হ্যাঁ উনি ভেতরে আছেন। কিছু দরকার আছে?’

‘দরকার না থাকলে এত রাত্রে কেউ আসে? তুমি ওকে খবর দেবে?’

আনন্দ যতটা সম্ভব জয়িতাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার সরে

দাঁড়াতেই লোকটা ওকে দেখতে পেল। সে যেন ঠিক তাঁওর করতে পারছিল না যাকে দেখছে সে ছেলে না মেয়ে! শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরে একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে। তারপর দরাজ গলায় বলল, 'আপনারা যান না, বনবিহারীবাবু ভেতরে আছেন। ঢুকুই বাঁ হাতে।'

আনন্দ আর অপেক্ষা করল না। জয়িতাকে ইশারা করে ভেতরে ঢুকতে বলল। ভেতরে তীব্র আলো জ্বলছে। সকালের দেখা বারান্দাটা দিয়ে একটু এগোতেই ফ্ল্যাক্টরীর একটা অংশ চোখে পড়ল। এখন একটা তীব্র গন্ধ বের হচ্ছে কোন ওষুধের। বারান্দায় একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাকে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'বনবিহারীবাবু কোথায়?' লোকটা ইঙ্গিতে যে ঘরটা দেখিয়ে দিল তার দরজায় দাঁড়িয়ে আনন্দ দেখল সাত আটজন দারোয়ান গোছের লোককে কিছু বোঝাচ্ছেন বনবিহারীবাবু। তাদের দেখতে পেয়ে খানিকটা অবাধ হয়ে কথা বন্ধ করতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'বনবিহারীবাবু কে?'

'আমি। কি চাই? এত রাত্রে ভেতরে কেন? গেটে কে আছে? অনন্ত! এদের ঢুকতে দিল কেন?'

'আমাদের মোহনলালজী পাঠিয়েছেন!' অজ্ঞান বদনে লোকটির মুখের ওপর কথাগুলো বলল সে।

'মোহনলালজী। কই, উনি তো কিছু বলে যাননি আমাকে। কোথেকে আসছেন আপনারা?' এবার যেন জয়িতাকে দেখতে পেল, সামান্য বিস্ময় ফুটে উঠল বনবিহারীর মুখে।

'চণ্ডীগড় থেকে। উনি আপনাকে কিছু বলেননি?'

এবার বনবিহারীর মুখের ভঙ্গী সহজ হল। সে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের কথা হচ্ছিল বটে।'

'আমি এসে ওঁকে ওই বুদ্ধিটা দিলাম। সব তো ক্লিয়ার এখন?' আনন্দ সহজ গলায় প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। উনি সেটা জেনে গেছেন।' বনবিহারীবাবু আবার জয়িতার দিকে তাকাল, 'ইনি?'

'পাঞ্জাবের যে উদ্রলোক মোহনলালজীর সংগে ব্যবসা করতে চান তার মেয়ে। সাত নম্বর মালটা পাঞ্জাবে পাঠাবেন ভেবেছিলেন মোহনলাল। ফাস্ট স্যাম্পেল। তাড়াহড়োয় এ যাত্রায় হল না।'

'সাত নম্বরটা তো ব্রাবোর্ন রোডে স্টোর করতে পাঠানো হল।'

'ব্রাবোর্ন রোডে?' প্রশ্নটা করেই আনন্দের মনে হল আর সময় বেশী নেই।

'হ্যাঁ। ও আপনারা জানেন না। এস পি অ্যাণ্ড কোম্পানির গুদামঘরটা সাহেবের।'

'আচ্ছা। বনবিহারীবাবু, আপনার গাড়ীদের ঘরেই থাকতে বলুন। আর আপনি একটু বাইরে আসুন। খুব গোপনীয় কথা বলব।' আনন্দ কথা বলতে বলতে চোখের ইশারা করল। বনবিহারীবাবু রহস্যের গন্ধ পেয়ে ঘরের বাইরে

বেরিয়ে আসামাত্র জয়িতা দরজা টেনে শেকল তুলে দিল। বনবিহারীবাবু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আনন্দ রিভলভারটা বের করল, 'আপনাকে আমি খুন করতে চাই না। প্রাণের মায়্যা করলে যা বলছি শুনবেন। আপনার ফ্যাক্টরিতে কতজন কাজ করছে এখন?'

'বেশী না। মাত্র আটজন নাইট ডিউটিতে আছে।' খর খর করে কাঁপছিল মানুষটা। ওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

আনন্দ কড়া গলায় বলল, 'ওদের সবাইকে ওই লম্বা বারান্দাটায় এসে দাঁড়াতে বলুন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। আমি আপনার পেছনে আছি। অন্য কিছুর চেষ্টা করলে লাশ পড়ে যাবে।'

বনবিহারীবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না এসব কি হচ্ছে?'

'কিছুই নয়। জাল ওষুধের কারখানা ধ্বংস করা হচ্ছে। এখানে জাল ওষুধ হয় না?'

'হয়। ওরা কারা?'' বনবিহারীবাবুর চোখের দৃষ্টিতে ততক্ষণে সুদীপ এবং কল্যাণ এসে গিয়েছে। ওরা দারোয়ানটার শরীর টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে ছেড়ে দিতেই সে মাটিতে গুয়ে পড়ল।

আনন্দ হুকুম দিল দরজায় দাঁড়িয়ে, 'এবার ওদের বাইরে আসতে বলুন জলদি।'

রিভলভারটার খোঁচা খেয়ে বনবিহারীবাবু বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল, 'আপনারা সবাই বেরিয়ে আসুন। জলদি জলদি। এখন সব কাজ বন্ধ রাখুন।'

বিস্মিত মানুষগুলো একে একে বেরিয়ে আসতেই আনন্দ এক লাফে পেছনের বারান্দায় উঠে এসে চিৎকার করল, 'আপনাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না আমরা। যদিও জাল ওষুধের কারখানায় আপনারা টাকার জন্যে কাজ করছেন। নিজের প্রাণ বাঁচাতে যদি চান তাহলে ওপাশের ওই বারান্দায় উঠে যান। কেউ বীরত্ব দেখাতে চাইলে বা পালাবার চেষ্টা করলে মারা পড়বেন।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র হুড়োহুড়ি পড়ে গেল বারান্দায় যাওয়ার জন্যে। বনবিহারীও তাদের সঙ্গী হল। সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ আর কল্যাণ ছুটে গেল ভেতরে। বিশাল হলঘরে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ওষুধ তৈরীর ব্যবস্থা। সেই ঘর পেরিয়ে প্যাকিং এর ব্যবস্থা। সবকিছুই নিখুঁত।

চারটে শক্তিশালী গ্রেনেড চার্জ করা মাত্র মনে হল সমস্ত বড়বাজার কাঁপছে। আটটা পেট্রল বোমায় সমস্ত কারখানাটা দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। ওরা যখন দৌড়ে রাস্তায় নামল তখন চারদিকে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দলে দলে মানুষ ছুটে আসছে। তীব্রগতিতে ওরা যখন গাড়ির কাছে ছুটে এসেছে তখনই আনন্দ আবিষ্কার করল কল্যাণ নেই। সুদীপ ততক্ষণে গাড়ির মধ্যে উঠে

ইঞ্জিন স্টার্ট করে সেটাকে বের করে এনেছে রাস্তায়। এক পলকেই সিদ্ধান্ত নিল জয়িতা। চিৎকার করে দাঁড়াতে বলে সে ছুটে গেল আবার গলিটার দিকে। জোরে ছুটে গিয়ে পায়ের তলায় কিছু পড়ায় হোঁচট খেয়ে পড়েছিল কল্যাণ। সেই মুহূর্তেও তার খেয়াল ছিল ব্যাগটার কথা। এবং সেটাকে বাঁচাতে গিয়ে তার ডান হাতে প্রচণ্ড চোট লাগে। যারা ওদের দেখতে পেয়ে ধাওয়া করে আসছিল তারা কল্যাণকে দেখতে পেয়ে হই হই করে ধরে ফেলেছে কল্যাণ উঠে দাঁড়িয়ে ছাড়াতে চাইছে নিজেকে কিন্তু তিনজন শক্ত হাতের মানুষের কাছে তাকে হার মানতে হচ্ছে। জয়িতা দেখল কল্যাণকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। সে আর এক মুহূর্ত দেরী করল না। গ্রেনেডটা প্রচণ্ড জোরে ফাটল সত্যনারায়ণ পার্কের ফুটপাতে। অনেক জায়গা গর্ত হয়ে উড়ে গেল। এবং সেই শব্দে কল্যাণের আক্রমণকারীদের এমন ভীত করল যে তারা উদ্ধৃষ্ণাসে ছুটে পাশের বাড়ির দিকে চলে গেল। জয়িতা চিৎকার করল, 'কল্যাণ চলে আয়।'

কল্যাণ নিজে এতটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে জয়িতার চিৎকার না শোনা পর্যন্ত পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। এবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে প্রায় চলন্ত গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাড়ির মত গাড়িটাকে হারিসন রোডে বের করে আনতেই একটা পুলিশ ভ্যান দেখতে পেল সুদীপ। ভ্যানটা ধীর গতিতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিক দিয়ে আসছিল। চেষ্টা করেও গতি কমাতে পারল না। শেষ মুহূর্তে মনে হল যত তাড়াতাড়ি ওটাকে পেরিয়ে যাওয়া যায় তত মঙ্গল। ভ্যানের সামনে বসা সার্জেন্ট খানিকটা অবাক হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া গাড়িটাকে দেখতে দেখতে মন্তব্য করল, 'কি ব্যাপার? হসপিটাল কেস নাকি!' আর তখনই হই চই করা লোকগুলো ছুটতে ছুটতে হ্যারিসন রোডে এসে দাঁড়াল। ভ্যানটা সেখানে পৌঁছানোমাত্র সার্জেন্টের কানে হেসব অভিযোগ বসিত হল তাতে উদ্ভ্রলোকের কিছু সময় লাগল আসল কথাটা উদ্ধার করতে। তিনি অয়ার্লেন্ডে লালবাজার খবর পাঠালেন, 'সিরিয়াস ডাকাতি হয়ে গেছে বড়বাজারে। গাড়ির নাম্বার তিনটে পাওয়া গেছে।' তিনটে নাম্বার এবং কোন্ দিকে গিয়েছে জানাতে-না-জানাতেই দমকলের ঘন্টা শোনা গেল।

সুদীপরা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পড়ামাত্র, দমকলের ঘন্টা শুনতে পেয়েছিল। আনন্দ বজল, 'আস্তে চালা। যতটা সম্ভব নর্মালা। সোজা কলেজ স্ট্রীট ধরবি। কল্যাণ কেমন আছিস?'

পেছনের সিটে হেলান দিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে কল্যাণ বসেছিল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তার হাত ছিঁড়ে পড়ছিল। সেই অবস্থায় সে কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'ঠিক আছে।'

সুদীপ এখন অনেকটা স্বাভাবিক, 'পড়লি কি করে?'

'কলার খোসা ছিল। দেখতে পাইনি। তারপর এমন জোরে চেপে ধরল।'

'এইজন্যে বলে যেখানে সেখানে কলার খোসা ফেলতে নেই। মোস্ট অনাগরিক।'

ব্যাপার ।’

কল্যাণ শুধু দাঁতে দাঁত চেপে বলতে পারল, ‘শালা !’

জয়িতার শরীর এতক্ষণ বিন বিন করছিল। কল্যাণকে লোকগুলো জাপটে ধরেছে এই দৃশ্যটা ও দেখার পর থেকে ও ঠিক কি কি করেছে তা এখন মনে করে বলতে পারবে না। সুদীপ ঠাট্টা শুরু করতে ও স্বাভাবিক হয়ে এল। যন্ত্রণায় কাতর কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথায় কণ্ঠ হচ্ছে?’

‘হাতে।’ কল্যাণ চোখ বন্ধ করতেই নিজের শরীর থেকে জল বেরিয়ে গালে পড়ছে টের পেল, ‘মনে হচ্ছে পড়ার পর হাতটা ভেঙ্গেছে। ব্যাগ সামলাতে গিয়ে হাত ভাঙল বোধ হয়।’

ওপাশ থেকে সুদীপ মন্তব্য করল, ‘নইলে শরীরটাই উড়ে যেত এতক্ষণে।’

জয়িতা এবার চেষ্টায়ে উঠল, ‘ও সুদীপ। ইউ মাস্ট নট টক লাইক দিস। রসিকতার সময় নয় এটা।’

‘ওকে খুকী। আমি সিক্ হয়ে যাচ্ছি এখন থেকে।’ সুদীপ চটপট মুখ বন্ধ করল।

আনন্দ লক্ষ্য করছিল কেউ তাদের পেছনে আসছে কিনা। ভ্যানটা যখন দেখেছে তখন এতক্ষণে কলকাতার রাস্তায় যে সমস্ত টহলদারী ভ্যান রয়েছে তারা এই গাড়ির নাস্তার পেয়ে গেছে। অবশ্য অন্য ধান্দা ফেলে যদি সক্রিয় হয় তাহলে তারা ওদের খুঁজে বের করবেই। কিন্তু কল্যাণটাকে নিয়েই চিন্তা হচ্ছে। সুদীপের গাড়ি ততক্ষণে ওয়েলিংটন স্কোয়ার ছাড়িয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগোচ্ছে। এখন ঘড়িতে একটা। সুদীপ বলল, ‘সিরিয়াস কথা বলছি। আমাদের গন্তব্য কোথায়?’

আনন্দ বলল, ‘আমি ভেবেছিলাম ঠাকুরপুকুরে যাব। কিন্তু এই গাড়ি নিয়ে অত দূর যাওয়া ঠিক নয়।’

সুদীপ জানতে চাইল, ‘তাহলে এই মুহূর্তে তোর মাথায় কিছু চুকছে না, তাই তো?’

আনন্দ উত্তর দেবার আগে সুদীপ গাড়িটা থামাল। ইলিয়ট রোড আর ওয়েলসলি স্ট্রিটের মোড়ে একটি মেয়ে এই রাস্তাে দাঁড়িয়েছিল সাজুগুজু করে। সুদীপ লক্ষ্য করেছিল বেশকিছু আগে চলতে চলতে একটা অ্যান্সাডার আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার মুখ বের করে মেয়েটিকে দেখছে। মেয়েটি সেটা লক্ষ্য করে এমন ভাবভঙ্গী করেছে যা শুধু হিন্দী সিনেমায় দেখা যায়। উৎসাহ পেয়ে মেয়েটির কাছে নেমে এল। এবার ঘটনাটা ওরা দেখতে পাচ্ছিল। জয়িতা চাপা গলায় বলল, ‘কি হচ্ছে সুদীপ! আমাদের হাতে একদম সময় নেই। এইসব নোংরা ব্যাপার দ্যাখার রুচিটা বন্ধ কর।’

সুদীপ বলল, ‘তোরা তৈরী থাক। আমি ডাকস্মান বেরিয়ে আসবি। আনন্দ, গাড়ির স্টিয়ারিং থেকে আমার হাতের ছাপ মুছে ফেল। গ্লাভস পরে আসতে ভুলে গেছি।’ কথা শেষ করে সে শিষ দিতে দিতে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে

গেল।

মেয়েটা এবার সুদীপকে দেখতে পেয়ে আরও পুলকিত হল। লোকটি তখন দ্রুত মেয়েটিকে গাড়িতে ওঠার জন্যে অনুরোধ করছে। সুদীপ গুনতে পেল মেয়েটি উদাস গলায় বলল, ‘আই নিড ওয়ান হাল্ভেড। দ্যাটস অল।’

লোকটি বিদ্রান্ত হল, ‘একি কথা, একটু আগে বললে সত্তর আর ওকে দেখামাত্র তিরিশ বেড়ে গেল।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘তিরিশ বাড়িয়ে দিলে কেন? উনি ঠিকই বলেছেন। যাও ভাগো এখান থেকে। নইলে—।’ সুদীপের মুখের ভঙ্গী দেখে মেয়েটি এমন ঘাবড়ে গেল যে সে কোনদিকে না তাকিয়ে পেছনের গলিতে ছুটে গেল। হেসে ফেলল সুদীপ, ‘খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন। আজকে আপনি মারা পড়তেন, ওই রকম মেয়ের সঙ্গে এত রাত্রে কথা বলে। কোথায় যাবেন?’

‘গল্‌ফ গ্রীন।’ জবাব দিয়েই লোকটি গাড়ির দিকে এগোতে লাগল। চটপট পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ বলল, ‘আরে চললেন কোথায়। উপকার করলাম একটা ধন্যবাদ জানাবেন না?’

পেছনে বা পাশে মুখ না ফিরিয়ে লোকটি বলল, ‘ধন্যবাদ।’

সুদীপ চটপট গাড়ির সামনে পৌঁছে রিভলবারটা বের করল, ‘গাড়ির চাবিটা কোথায়?’

সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাশে হস্বে গেল লোকটার মুখ, ‘মানে—মানে আমার কাছে মাত্র একশ টাকা আছে, তাই দিয়ে দিচ্ছি ভাই। আমাকে প্রাণে মারবেন না।’

‘গাড়ির চাবিটা—।’ হাত বাড়াল সুদীপ। চাবিটা পেতে দেবী হল না। দরজা সন্তর্পণে খুলে সে বলল, ‘এবার উঠুন। আমি জোর করা পছন্দ করি না।’

শান্ত ছেলের মত ড্রাইভারের পাশের সিটে লোকটিকে তুলে সে পাশে বসে বলল, ‘একদম সামনে তাকাবেন। মুখ ঘোরালেই গুলি খাবেন।’

লোকটি মাথা নাড়ল, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে।’

পেছনের দরজায় শব্দ হল। ওরা তিনজন একে একে উঠে বসলে সুদীপ বলল, ‘শার্টটা খুলুন।’

‘অ্যাঁ?’ লোকটি মুখ ফেরাতে গিয়েও সোজা হল।

‘বাংলা বুঝতে পারছেন না?’ সুদীপ গাড়ি চালু করল। লোকটি কোনমতে শার্ট খুলে সুদীপকে দিতেই সে সেটাকে পেছনে ছুঁড়ে দিলে বলল, ‘চোখ বেঁধে ফেল।’ আনন্দ চটপট পেছন থেকে লোকটির চোখ শক্ত করে বাঁধল।

সুদীপ বলল, ‘বুঝতেই পারছেন, পেছনে আর একজন রয়েছে। এইবার চুপটি করে বসে থাকুক। আপনি এইভাবে রোজ মেয়ে ধরেন তাই না?’

‘না না’ অঙ্কলোকটি মুখ ফেরাল, ‘বিশ্বাস করুন এই প্রথম। কি যে হল মেয়েটাকে দেখেই—’

‘আপনি তো বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে, তাই না?’

লোকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সুদীপ বলল, ‘এই মেয়েটিকে আমি

চিনি। কাল সকালে ও যদি আপনার বাড়িতে গিয়ে গল্পটা করে তাহলে কেমন লাগবে? তার চেয়ে আসুন একটা রফায় আসি। আপনাকে আমি আনোয়ার শা রোডে নামিয়ে দিচ্ছি। কাল খুব ভোরে বেরিয়ে প্রিয়া সিনেমার পাশে এসে গাড়িটাকে নিয়ে যাবেন। পুলিশের বামেলা করলে কিন্তু মেয়েটা এসে যাবে। তখন আর একশতে হবে না। বুঝতে পারছেন?

‘গাড়িটা, গাড়িটা নিয়ে কি হবে?’ লোকটার গলায় আর স্বর ফুটছিল না।

‘আমার এক বন্ধু বিয়ে করতে যাবে তার গাড়ি দরকার। আপনার কোন ভয় নেই।’ আর কথা বলল না সে। গড়িয়াহাট-পোলপার্ক হয়ে সোজা চলে এল আনোয়ার শা রোডে। এখানেও একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে দেখে সে আনোয়ার শা রোডে চুকল। তারপর বেশ কিছুটা এগিয়ে গাড়িটা খামিয়ে বলল, ‘নেমে যান। চটপট।’

লোকটি এবার ইতস্তত করছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সে। আর অমনি লোকটি নেমে দাঁড়াতেই সে স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে লেক গার্ডে গেসে চুকবে পড়ল।

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘এই নাটকটার কি দরকার ছিল? লোকটাকে স্বচ্ছন্দে ওখানেই রেখে আসা যেত, সময় বাঁচত।’

সুদীপ সিগারেট ধরাল, ‘এই জন্যে ভোর নাম সুদীপ হয়নি। ওখানে লোকটাকে নামালে ফেলে রাখা গাড়িটাকে দেখতে পেত। পুলিশ বুঝতেই পারত আমরা গাড়ি বদল করেছি। আর এতক্ষণে সারা কলকাতায় খবর পৌঁছে যেত এই গাড়ি ধরবার জন্যে। মাথায় চুকছে?’

আনন্দ বলল, ‘আমি ভাবছি লোকটা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না আজই পুলিশকে জানাবে। দেখে তো মনে হল ভীতু সম্প্রদায়ের সদস্য।’

সুদীপ বলল, ‘জানাবে না। শালা, এরা হল মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তান। আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রেস্টিজ চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। কিল খেয়ে হজম করাই রক্তের অভ্যেস। এখন বল কোথায় যাব। ট্যাক্সে দশ লিটার তেল আছে। আশি থেকে নব্বই কিলোমিটার।’

জয়িতা বলল, ‘আমাকে একবার বাড়িতে যেতেই হবে। সমস্ত মালপত্র ওখানে পড়ে আছে। তাছাড়া কল্যাণকে ইমিডিয়েটলি একজন ডাক্তার দেখানো দরকার।’

যন্ত্রণায় বোধ হয় এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে কল্যাণ। এই ভঙ্গীতে বসে থাকায় সহ্যের মধ্যে এসে গিয়েছিল। সে একটুও না নড়ে বলল, ‘আমি ঠিক আছি।’

সুদীপ বলল, ‘জয়, তুই কল্যাণকে নিয়ে যেতে পারবি? আমরা ঠাকুর-পুকুরে চলে যাচ্ছি। ওখানে কল্যাণ গেলে ডাক্তার ডাকার অসুবিধে হবে। পারবি?’

জয়িতা মাথা নাড়লে, ‘ঠিক আছে। আজ বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। আর ওর কাছে লুকিয়ে রাখব না। তোরা আমাদের ওখানে একটু নামবি। গাড়ি আছে যখন তখন মালগুলো নিয়ে যা। একটা পুলিশ ভ্যান

আসছে সুদীপ।’

সুদীপ দেখল উল্টোদিক থেকে একটা ভ্যান আসতে আসতে হঠাৎ থমকে গেল। একজন সার্জেন্ট মুখ বের করে তাদের গাড়ির নাম্বারটা পড়ার চেষ্টা করছে।

॥ ১৯ ॥

খুব স্রাবাতিক ভঙ্গীতে ভ্যানটা পেরিয়ে এল সুদীপ। আনন্দ তৈরি ছিল। যদি সার্জেন্ট গাড়ি খামিয়ে চ্যালেঞ্জ করত তাহলে তাকে চার্জ করতে হতোই। বিনা যুদ্ধে ধরা দেবে না তারা। সার্জেন্টটা ভাগ্যবান। কারণ সে শুধু গাড়ি থেকেই অন্য নাম্বার দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। সুদীপ আনন্দের সতর্কতা লক্ষ্য করেছিল। একটু সহজ হয়ে সে বলল, ‘রাত দুপুরে যে কোন গাড়িকে পুলিশ ইচ্ছে করলে খামাতে পারে। যদি এর পরে কোন ভ্যান আসে তাহলে কি হবে কে জানে। এক রাত্রে বারংবার ভাগ্য পক্ষে থাকে না।’

‘ভাগ্য পক্ষে না থাকলে এতক্ষণ আমরা বাঁচতাম না।’ পেছন থেকে জয়িতা মন্তব্য করল।

‘তা যা বলেছিস।’ সুদীপ হেসে ফেলল, ‘সিনেমায় দেখলে বলতাম, ‘ওয়ান প্লাস ওয়ান।’

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার?’

‘সুদীপ রাসবিহারী পেরিয়ে ল্যান্সডাউনে পড়ে বলল, ‘তুই যদি মোহনলালকে না দেখতিস তাহলে চণ্ডীগড় শব্দটা এবং বনবিহারীবাবুর অস্তিত্ব, সাত নম্বর মানের খবর জানতিস না। আর এইগুলোই হয়ে গেল ওদের কাবু করার মশলা। জয়িতা যদি মালটা না ছুঁড়তো তাহলে এতক্ষণ কল্যাণ হয়তো ছবি হয়ে যেত। এই গাড়ির মালিকের যদি পটেটোপটুহ না থাকতো তাহলে আমাদের চোরাই গাড়িটাকে পুলিশ এতক্ষণে ধরে ফেলত। বেশ হয়ে যাচ্ছে পর পর মাইরি।’

আনন্দ বলল, ‘বাজে কথা বলছিস। রাস্তায় হাঁটিতে নেমে যদি গর্ত পড়ে তো সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পরিষ্কার জায়গাটাকে কাজে লাগানো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়াটাই বোকামি বলে মনে করি। আচ্ছা, এদিকে কোন টেলিফোন আছে?’

জয়িতা জিজ্ঞেস করল, ‘এত রাত্রে করবি কাকে?’

‘বলছি। আগে বল কোথায় পাবলিক ফোন আছে?’

‘গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা দেখেছিলাম। ওটা রাস্তায় পড়ে থাকে। বাড়িতে গিয়েও করতে পারিস।’

জয়িতা কথাগুলো বলতেই সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘সেইটেই উচিত হবে। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে এত রাত্রে টেলিফোন করলে পুলিশের নজর পড়বে। অবশ্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গেলে ঘেরা ঘর পাবি। খুব জরুরি দরকার?’

আনন্দ বলল, ‘হ্যাঁ। বাড়ি থেকে করতে চাইছি না। কলকাতার চারটে

কাগজের অফিসে ফোন করে আমাদের উদ্দেশ্যটা বলব। ব্রাবোর্ন রোডে এস পি অ্যাণ্ড কোম্পানির গুদামঘরটা এখনই সিল করে দেওয়া দরকার। চারটে কাগজে খবরটা ছাপা হলে আর চাপা থাকবে না।’

শেষ পর্যন্ত ওদের বালিগঞ্জ পার্ক রোডেই চলে আসতে হল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের লোহার গেটটা ভেতর থেকে তাল্লা দেওয়া। পাহারায় যিনি ছিলেন তিনি নিশ্চয়ই নানা প্রশ্ন করবেন। অথবা টেলিফোনের সংলাপ দাঁড়িয়ে শুনতেও পারে। বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ির ভেতরের পাকিং লটে গাড়িটা ঢুকিয়ে ওরা নিশ্চিত হল। অন্তত এখানে কিছুক্ষণ পুলিশের ভয় নেই। কল্যাণ অবশ্য অনেকটা স্থির। তবে তার হাত ভেঙেছে। সামান্য নাড়াবার ক্ষমতা তার নেই। ওর ব্যাগটা আনন্দ নিয়ে নিল। এখন কেউ জেগে নেই কোথাও। শুধু অনেক ওপরের একটা ফ্ল্যাট থেকে বিদেশী বাজনা ভেসে আসছে। গেটে দারোয়ান ছিল। সে তাদের ঢুকতে দেখেছে। কিন্তু চতুরে আর কাউকে চোখে পড়ল না। রাত্রি লিফটম্যান থাকে না। দরজা খুলে জম্বিতা বন্ধুদের নিয়ে ঢুকল। অটোমেটিক লিফট ওদের ফ্লোরে পৌঁছে দিতে সে বলল, ‘যা বলার আমি বলব। যদি কোন বামেলা না হয় তাহলে তোরা ঢুকবি। আর তেমন হলে আমরা মালগুলো নিয়ে বেরিয়ে যাব।’

জম্বিতা বেলের বোতামে চাপ দিল। সুদীপ বলল, ‘কেস খারাপ নাকি?’ এই সময় দরজাটা খুলে গেল। রামানন্দ রায় রাতের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। আনন্দরা একটু আড়ালে থাকায় তাঁর নজরে পড়েনি। রামানন্দ বললেন, ‘এসো।’

জম্বিতা ঘরে ঢুকল, ‘মা কোথায়?’

‘শুয়ে পড়েছে। ওর মনের অবস্থা ভাল নয়। এত রাত্রে কিভাবে এলে?’ রামানন্দকে খুব গভীর দেখাচ্ছিল।

‘আমার বন্ধু রা সঙ্গে আছে। ওদের ভেতরে আসতে বলতে পারি?’

‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।’ রামানন্দ ফিরে গেলেন হল ঘরের দিকে। জম্বিতা ওদের ডেকে ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করল। তারপর সুদীপ যে ঘরে ছিল সেইদিকে পা বাড়াল। দূর থেকে রামানন্দ বললেন, ‘জয়, তোমার এবং তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।’

জম্বিতা ঠোঁট কামড়াল, ‘আমার সঙ্গে বললে চলবে না? আমিই তোমাকে বলব ভেবেছিলাম!’

রামানন্দ বললেন, ‘ঠিক আছে। আমি পনের মিনিট বাদে আসছি। তোমরা রেস্ট নাও।’

ঘরে ঢুক কল্যাণ ধীরে ধীরে সোফায় হেলান দিয়ে বসল। এবার সুদীপ ওর হাতটা পরীক্ষা করতে করতে স্বস্তির শব্দ করল, ‘নাঃ, সিম্পল ফ্র্যাকচার। ভয়ের কিছু নেই।’

কল্যাণ মাথা নাড়ল, ‘শুরুতেই আমি অকেজো হয়ে গেলাম। কি করি

জন্যে ব্যবহার করতে না পারাটাকে কি একেজো বলে? বাজে কথা না বলে রেস্ট নে।’

কল্যাণ তবু মানছিল না, ‘জয়িতা যদি না বাঁচাতো—! আমি তোদের বোঝা হয়ে গেলাম।’

সুদীপ হেসে উঠল, ‘এ ব্যাটার মাথায় শুধু একই চিন্তা। আমার যদি একটা পা উড়ে যেত তোরা কি করতিস? এসব চিন্তা করা মানে বন্ধুদের তোর সম্পর্কে সন্দেহগ্রস্ত করে দিচ্ছিস।’

কল্যাণ আর কোন কথা বলল না। সুদীপ জয়িতাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘বিশ্বাস করা যাক এমন ডাক্তার আছে এখানে? কাল সকালের আগে তো ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে না।’

কল্যাণ মাথা নাড়ল, ‘এখনও যত্নটা হচ্ছে ওর, হাসপাতালে গেলে আমি ধরা পড়ে যাব।’

জয়িতা বলল, ‘নাঃ, আমি তো কারো ওপর ঝিনাই করার কথা ভাবতে পারছি না।’

আনন্দ জয়িতার দিকে ফিরে তাকাল, ‘তুই তোর বাবার সঙ্গে কি আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবি? এই ব্যাপারটা করার আগে আমাদের সঙ্গে তোর আলোচনা করা দরকার ছিল।’

‘আমি এমন কিছু বলব না যা তোদের ক্ষতি করবে। ট্রাস্ট মি।’ জয়িতা হাসতে চেষ্টা করল। ‘তুই ফোন করবি বলছিলি? বাবা আসবার আগে সেটা করে নে।’

জয়িতাকে অনুসরণ করে আনন্দ হলঘরটায় এল। রামানন্দ রায় এখানে নেই। শূন্য ঘরটায় আলো জ্বলছে। টেলিফোনের পাশের চেয়ারটায় বসে আনন্দ সর্বাধিক প্রচারিত কাগজটির নাম্বার গাইড থেকে খুঁজে বার করে জয়িতাকে বলল, ‘বাকি তিনটে কাগজের নাম্বার বের করে রাখ।’

জয়িতা আবার হাসল, ‘গড়িয়াহাটার টেলিফোনটা পেয়ে কাজ হত না। তুই সেখানে গাইড পেতিস না। তোর উচিত ছিল আগে থেকে নাম্বারটা নোট করে রাখা।’

কলকাতায় রাত্রি সবকিছু তিকঠাক থাকে। একেবারেই লাইন পেয়ে গেল। ওপাশ থেকে হ্যালো শুনে আনন্দ বলল, ‘আমি একটা জরুরি খবর দেব। দায়িত্ববান কেউ কিংবা নিউজ এডিটার আছেন?’

‘আপনি কে বলছেন?’

‘আমার পরিচয় পরে দিচ্ছি। আপনি কে?’

‘আমি এই কাগজের রিপোর্টার। নাইট ডিউটিতে আছি। বলতে পারেন যা বলবার।’

‘শুনুন, খানিক আগে বড় বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে মোহনলালজীর বিরাট ওষুধের কারখানা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ওটাতে আশুন লেগেছে।

মোহনলাল দুটো জাল ওষুধের কারখানা করতেন। যার একটা খেলে ক্ষতি হত না কাজও দিত না। দুটো খেলে প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকতো। আমরা মনে করেছি এই ধরনের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। মোহনলাল অক্ষত আছেন, তাঁর নিরীহ কর্মচারিরাও সম্ভব, কিন্তু কারখানা ধসে গেছে।’

‘আপনারা কারা?’

‘আমরাই ডায়মণ্ডহারবার রোডে প্যারাডাইস ধ্বংস করেছি। আইনের ফাঁক ব্যবহার করে যারা সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করছে তাদের আমরা একে একে ধ্বংস করব। মোহনলালের জাল ওষুধ স্টক করা আছে ব্র্যাবোর্ন রোডের এস পি অ্যাণ্ড কোম্পানির স্টোর রুমে। ওখানে থেকে ওটা সরিয়ে নেওয়ার আগেই আপনারা খবর নিন। আপনাদের কাগজের মাধ্যমে আমরা সেইসব মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছি, যাতে তারা হাত গোটায়ে। নইলে একটির পর একটি এই ধরনের অ্যাকশন নেব আমরা। আমরা চাই একটি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা। বর্তমান সংবিধানের আশ্রয়ে তা সম্ভব নয়। এই সব কাজগুলো সাধারণ মানুষের উদ্ধৃদ্ধ করুক এটাই কাম্য।’

রিসিভার নামিয়ে রেখে পর পর তিনটি কাগজে একই কথা বলল আনন্দ। শেষের কাগজের এডিটর স্বয়ং ফোন ধরেছিলেন। রাজনৈতিক রচনা লিখে তিনি খুব জনপ্রিয়। ফোন নামাবার আগে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনারা কি নকশালপন্থী?’

আনন্দ বলল, ‘না। আমাদের আগে কেউ এই পথে হাঁটেননি।’

এডিটর প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার নেজ্জট অ্যাকশন জানতে পারি?’

‘রেসকোর্স।’ রিসিভার নামিয়ে রেখে আনন্দ বলল, ‘এক গ্লাস জল খাওয়াবি জয়?’

জয়িতা চাপা গলায় বলল, ‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? রেসকোর্সের কথাটা বলে দিলি?’

আনন্দ উঠে সুদীপের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বলল, ‘রবীন হুডের মত কায়দা আর কি। না, না, আমাদের সেই রঘু ডাকাতিই তো এমন করত। আমরা এই মুহূর্তে রেসকোর্সকে কিছু করতে পারব না। যত সহজে দুটো কাজ করেছি রেসকোর্সে তা সম্ভব হবে না। কাগজে যদি বের হয় খবরটা তাহলে তার নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়া হবে। সেটাই দেখার।’

জল খেয়ে আনন্দ বন্ধুদের কাছে ফোনের কথা বলল। ‘অন্তত কাল সকালে কাউকে আর অনুমানের মধ্যে থাকতে হবে না কে বা কারা কেন এই কাজ করল। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট বোঝা যাবে। রেসকোর্সের ব্যাপারটা সে খুলে বলল। সরকারের প্রত্যক্ষ মদত পাচ্ছেন রেসকোর্সের কর্মকর্তারা। কারণ প্রচুর ট্যাক্স আসছে ওখান থেকে। বোমা বা গ্রেনেড ছুঁড়ে রেসকোর্স ‘হেঁটে। পায়ের পায়ের। পণ্ডিতিয়া দিয়ে শট কাট করে এলে মাইল খানেকও হবে না। লেটস গো।’

উড়িয়ে দিলে কোন কাজ হবে না। আস্তাবল থেকে যে ঘোড়াগুলো রেস করতে মাঠে আসে তাদের ক্ষতি করে কি লাভ! কিন্তু একটা ডয়ের আবহাওয়া তৈরি করতে হবে। প্রথমেই তার শিকার হবে দামী ঘোড়ার মালিকরা। তারা যদি এখন থেকে ঘোড়া বোম্বে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যায় তাহলে এখনকার রেসে ভিড় কমবে।’

সুদীপ বলল, ‘তাতে আমাদের কোন লাভ হচ্ছে না। শুনেছি বোম্বেতে ঘোড়া ছুটছে আর কলকাতা রেসকোর্সে তার রিলে শুনে লোকে টাকা লাগাচ্ছে। লাগাতার একটা প্যানিক তৈরী করতে পারলে ওখানকার ভিড় কমবে। কিন্তু কলকাতা না হয় বন্ধ হল, বোম্বে-মাদ্রাজ-ব্যাঙ্গালোরে তো চলবে।’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘কলকাতায় আমাদের দৃষ্টান্ত অন্যান্য শহরের ছেলেদের উদ্বুদ্ধ করবে, দেখিস।’

কল্যাণ চোখ বন্ধ করে পড়েছিল। মাঝে মাঝে যন্ত্রণা যে পাক দিয়ে উঠছে তা ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, ‘কলকাতার রেস যদি ডয়ে বন্ধও হয় পাড়ায় পাড়ায় যে স্পিন খেলা চলে তা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। সেটা বন্ধ করবি কি করে?’

আনন্দ বলল, ‘সেটা সরকারই বন্ধ করবে। কারণ তা থেকে তো কোন ট্যাক্স পাবে না।’

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই তাহলে সরকারের ওপর এখনও আস্থা রাখিস। সিনেমা হলে যে টিকিট ব্যাক হয় তা থেকে তো সরকার একটা পয়সাও ট্যাক্স পায় না। বন্ধ করছে?’

কল্যাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে রামানন্দ রায়ের গলা শোনা গেল, ‘জয়!’

জয়িতা বন্ধুদের দিকে তাকাল। সুদীপ বলল, ‘তুই ওঁকে এখানেই আসতে বল না।’

জয়িতা মুখ ফেরাল, ‘কেন?’

সুদীপ কাঁধ ঝাঁকাল ‘উই ক্যান হেল্প ইউ। তিক মাঝ রাত্তিরে লাগে ঘোর চিন্তিরে। কি বলতে কি বলে ফেলবি তার কোন তিক নেই। সবাই মিলে ম্যানেজ করব এই শেফটারটার জন্যে।’

জয়িতা আনন্দকে বলল, ‘আমি একথার প্রটেষ্ট করছি। এতে আমার ওপর অনাস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। ওয়েল, আমি বাবাকে ডাকছি।’ জয়িতা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, ‘ডাকছ?’

রামানন্দ রায় শান্ত গলায় বললেন, ‘তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?’

‘হ্যাঁ। এই ঘরে এসো।’ জয়িতা সরে দাঁড়াল। রামানন্দ বিস্মিত হলেন। তারপর খীর পায়ে ভেতরে ঢুকলেন। তিনজনেই ওঁর দিকে কিছুটা সম্ভ্রান্ত ভঙ্গীতে তাকাল। জয়িতা পরিচয় করিয়ে দিল, ‘সুদীপকে তুমি দেখেছ, এ হল কল্যাণ আর ও আনন্দ!’

আনন্দ ঠিক বুঝতে পারছিল না এই লোকটিকে উঠে দাঁড়িয়ে কতটা সঙ্গম
জানানো যায়। কিন্তু রামানন্দ রায় কোনদিকেই তাকাচ্ছিলেন না। তাঁকে
বেশ চিন্তিত এবং কাঙ্ক্ষিত দেখাচ্ছিল। আনন্দ বলল, 'বসুন।' সে উঠে
সুদীপের পাশে বসে জায়গা খালি করে দিল।

রামানন্দ রায় বসলেন না। বললেন, 'কিছু মনে কর না, এত রাত্রে তোমরা
যেভাবে ঘোরাফেরা করছ তাতে সন্দেহ হচ্ছে এমন কোন কাজ করছ যা খুব
স্বাভাবিক নয়। আমি কোন মন্তব্য করছি না। কিন্তু জয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা
করছি যা করছ তা কি ঠিক মনে করছ?'

'নিশ্চয়ই।' জয়িতা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল।

রামানন্দ রায় চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকাতেই কল্যাণকে দেখতে পেলেন।
সেই মুহূর্তে আর একটা যন্ত্রণার ঢেউ পাক খেয়ে ওর হাত থেকে শরীরে
গড়াচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে সামলাচ্ছিল সে। তিনি দ্রুত কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা
করলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

সেই অবস্থায় কল্যাণ একটু জোরে মাথা নাড়ল, 'কিছু না, কিছু হয়নি।'

সুদীপ আনন্দের দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু আগে ও
আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সিরিয়াস কিছু নয় বলে মনে হচ্ছে।'

'তুমি কি ডাক্তার?' রামানন্দ রায় ধমকে উঠলেন, 'ও তো হাতটা নাড়তেই
পারছে না। দেখি ঠিক কোন কোনখানে ব্যথা?' জখম হাতটা ধরতেই ককিয়ে
উঠল কল্যাণ। ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিল রামানন্দ।

সুদীপ মন্তব্য না করে পারল না, 'আপনিও ডাক্তার নন।'

'সেটা আমি জানি। কিন্তু এই ছেলেটিকে এইভাবে রেখে দিয়েছ তোমরা?
ওর হাতের হাড় ভেঙ্গেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার। ইমেডিয়েটলি ডাক্তার
ডাকা দরকার। কটা বাজে এখন? ও হ্যাঁ, রাত দুটো বাজে গেছে। কাকে
ডাকা যায়?' নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি।

এবার আনন্দ বলল, 'এখন বোধ হয় কাউকে না ডাকাই উচিত। আপনার
কাছে ঘুমের ঔষধ আছে? ও জদি ঘুমোতে পারে তাহলে সাকালবেলায় আমি
হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

রামানন্দ রায় কথা না বলে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সুদীপ জয়িতাকে
বলল, 'দ্যাখ উনি কোন ডাক্তারকে ফোন করছেন কিনা। ডাক্তার এসে যদি
আমাদের ওর সঙ্গে দেখে, তাহলে কাল সকালে কাগজ পড়ার পর দুই-এ দুই-এ
চার করতে দেয় হবে না। আচ্ছা লোক!'

জয়িতাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। সে বলল, 'তোদের হয়তো খারাপ
লাগছে কিন্তু আমি খুশী। মানুষটা যে এত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা দেখবেন তা
কল্পনা করিনি। কখনও কেউ যখন কারো জন্যে কেয়ার নেয় তখন আমার
ঈর্ষা হয়। আজ সেটা একটুও হচ্ছে না। ওই মানুষটি 'এন্টরিথিং অলরাইট'
ছাড়া আর কখনও আমার মনের কথা জানতে চাননি।'

এমন একটা বিষয় সূর ছিল যে সুদীপ পর্যন্ত চুপ করে গেল। এই সময় রামানন্দ ফিরে এলেন, 'জয়, ওকে এক গ্লাস জল দাও। এই ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নাও তুমি। পেনকিলার, ঘুমিয়ে পড়বে।'

'ট্যাবলেট!' কল্যাণ আনন্দের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমাকে একটা ট্যাবলেট দিন।'

'কেন? দুটো খেলে সকালের আগে ব্যথাটা টের পাবে না। দুটোই খেয়ে নাও।'

'না। আমি কোন রিফ্র নেব না।'

'রিফ্র? এতে রিফ্রের কি আছে?' রামানন্দ বুঝতে পারছিলেন না।

আনন্দের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু এখন কিছু বলা ঠিক হবে না। কল্যাণের মত শিক্ষিত ছেলেও ওই ব্যাপারটা জানার পর থেকে যে কোন সরষের মধ্যেই ভুত দেখছে। জয়িতা কল্যাণকে একটি ট্যাবলেট খাইয়ে দিল। রামানন্দ রায় মাথা নাড়লেন, 'মনে হয় কোন কাজ হবে না। এরকম কখনও গুনিনি। দুটো ট্যাবলেট খাওয়া রিফ্র!'

খালি সোফাটায় বসলেন রামানন্দ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'জয়, তোমার কিছু বলার আছে?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

এখন কেউ কোন শব্দ করছে না। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ঘরে। রামানন্দ রায় মুখ তুলছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত জয়িতা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছ থেকে কিছু আশা কর?'

'আমি!' রামানন্দ রায় মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি ভাল থাক এইটুকু।'

'তুমি কি মনে কর ভারতবর্ষের এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, এবং সামাজিক অবস্থায় কেউ ভাল আছে? যারা বলে আছে তারা চোখ বন্ধ করে ভাল থাকার ভান করে রয়েছে। বাবা, আমার পক্ষে চিরায়ত নিয়মগুলো মেনে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, যে কোন দিন এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারি। ডোল্ট আঙ্ক মি কোথায় যাচ্ছি। শুধু জেনো আমরা একটি কাজ করতে চাইছি। যা কেউ করে না। আমরা মানুষের বিবেকের অটল পাথরটাকে নাড়াতে চাইছি। প্রতিবাদ করলে, এক সময় সেই ভাষাটা সাধারণ মানুষের রপ্ত হয়ে গেলে, এই গণতন্ত্রের সুবিধে-ভোগী শক্তিগুলো ভয় পাবে বলে বিশ্বাস করি। না, কোন রাজনৈতিক দলের কার্যসূচী আমরা অনুসরণ করছি না। পণ্ডিতরা আমাদের আচরণকে বলবেন, ছেলেমানুষী কিংবা অশিক্ষাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেবেন। অনেক তো দেখলাম। বিখ্যাত বিখ্যাত তত্ত্ববিদ অনেক থিওরি গুনিয়েছেন। ময়দানের বস্তুতায়, পার্টির বুলেটিনে কিংবা সাপ্তাহিকের পাতায়। আর এইসব গুনিয়েই তাঁরা বুদ্ধ হয়ে মরে যাবেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ যেখানে ছিল

সেখানেই থাকবে। ওই থিওরির ভাষা ওদের অজানা থাকবেই। কিন্তু ওরা চোখের সামনে দেখবে এই লোকগুলো অন্যায্য করছিল, আর কয়েকটা ছেলেমেয়ে সরাসরি তাদের আঘাত করছে। এই আঘাত করা যায়। নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাদের পথ আমরা মানি না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশ রাশিয়া কিংবা আমেরিকার পরাধীন নয়। তাহলে দ্রুত আশ্রন জ্বলতো। প্রতিটি মানুষের বুক ভিয়েৎনাম হয়ে যেত। আমাদের প্রতিপক্ষ যেহেতু আমরা তাই সময় লাগছে। আমরা কি করে ভাল থাকব, বল?’ জয়িতা বড় বড় নিঃশ্বাস নিল।

আনন্দ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। জয়িতা যে এইভাবে মুখের ওপরে কথাগুলো বলতে পারবে তা সে ভাবতে পারেনি। সুদীপ খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। উত্তেজিত হয়ে জয়িতা যে ভঙ্গীতে কথা বলছে তা তার মোটেই ভাল লাগছে না। এই লোকটির কাছে সব কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও কেউ কোন কথা বলল না। কল্যাণ চোখ বন্ধ করে সোফায় হেলান দিয়ে পড়েছিল। একইভাবে থাকলে বোধ হয় তার যন্ত্রণা কম হচ্ছিল। রামানন্দ পূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ‘আমি দুঃখিত। আমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে জড়িয়ে তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমার সম্পর্কে তোমার বক্তব্য?’

জয়িতা এক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে উঠল, ‘আমি তোমাকে আর মাকে একদিন চিৎকার করে বলেছিলাম ঘেন্না করি। তোমরা কিছুই করোনি আমার জন্যে। নিজেদের পাখিব আনন্দ আর শারীরিক তৃপ্তির জন্যে টাকা রোজগার করে গেছে। তুমি যা মাইনে পাও তা দিয়ে এত পার্টি এত মদ আর মায়ের এত বিলাস মেটানো যায় না। এসব তোমাদের ব্যাপার। আমাকে পড়াশুনার সুযোগ আর খাওয়া পরার স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে তোমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমাদের মত এই দেশের সব বাবা-মা একই চিন্তা করে। কেউ ভাবে না পরবর্তী প্রজন্ম তৈরী করার দায়িত্ব তাঁদের। এই দেশের জন্যে আগামী প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে তাদের সময় দিতে হবে। নিজেকে ভীষণ অবহেলিত মনে হত এক সময়। এখন আর কিছু মনে করি না। যার কাছে কোন আশা করার নেই তার সম্পর্কে কোন ভাবনাও থাকে না। তোমাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সুতোটা কখন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।’

জয়িতা চুপ করলে রামানন্দ কোন কথা বললেন না। হঠাৎ কল্যাণ চোখ খুলে ধীরে ধীরে বলল, ‘ঠিক কথা। এ কথা আমারও। তবে তোর বাবা মায়ের অর্থ ছিল আর আমার বাবা মাঠিক উল্টো অবস্থায় থেকে একই আচরণ করেছিল।’

শেষ পর্যন্ত রামানন্দ উঠে দাঁড়ালেন, ‘আমি তোকে বুঝতে পারছি না। তুই কোথায় এইসব কথা শিখলি? এই মানসিকতা কি করে হল তোর? আমার

অজান্তে কখন তুই এত দূরে পৌঁছে গেলি?’

এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর দিল না জন্মিতা।

হঠাৎ রামানন্দ সুদীপের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কি আজ রাতে কোন কিছু করেছ?’

সুদীপ ঠোঁট কামড়াল, ‘আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি তো ওর সঙ্গেই কথা বলছেন।’

রামানন্দ বললেন, ‘তোমরা সবাই একই সঙ্গে পড়। না?’

আনন্দ জবাব দিল, ‘হ্যাঁ।’

রামানন্দ বললেন, ‘জন্ম, তোমার মা এইসব কথা জানেন না। আমার মনে হয় ওঁকে জানানোর দরকার নেই। উনি ঠিক মানতে পারবেন না। তবে জেনো তাঁকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ সব মেয়ে একই ধরনের মা হতে পারে না। যে মার নিজের মত তা হয়ে থাকে। বাইরের জগতের ওপর ওঁর এই আকর্ষণের জন্যে আমারও দায়িত্ব ছিল। তোমরা এখন এই বাড়িতে এসেছ তাও তাঁর জানা নেই। নীতিহীনতা যদি তোমাদের লক্ষ্যবস্তু হয় তাহলে তোমরা আমাদেরও খুন করতে পার। পাশের ঘরে গিয়ে তাকে যুমন্ত অবস্থায় পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি বলছি এটাও সঠিক পথ নয়। কিন্তু নিজে যেহেতু কিছু করতে পারিনি তাই তোমাদের বাধা দেব না। ডু হোয়াট এন্ডার ইউ লাইক, আমি বাধা দেব না। কিন্তু একটা কথা বলব। একটি শিক্ষিত রাষ্ট্রের পুলিশ এবং সংগঠিত সামরিক শক্তির চোখ এড়িয়ে বেশী দিন তোমরা এসব করতে পারবে না। অবশ্য তোমরা ঠিক কি করছ তা আমি জানি না। আমি সীতাকে বলব তোমাদের যেন বিরক্ত না করে। আর হ্যাঁ, ওই ছেলেটির ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার। কাল সকালে আমি আমার এক বন্ধুর নাসিং হোমে নিয়ে যাব।’

রামানন্দ রায় চলে গেলেন। হঠাৎ খুব বয়স্ক মনে হচ্ছিল তাঁকে। পিঠটা কুঁজো হয়ে গেছে। প্রায় নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘এবার কি হবে?’

আনন্দ পা ছড়ালো, ‘আমার বিশ্বাস উদ্রলোকের কাছ থেকে কোন ক্ষতির আশংকা নেই।’

সুদীপ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, ‘কিন্তু উনি যদি একটা টেলিফোন করেন তাহলে আমাদের কয়েক বছর জেল তো অবশ্যই, ফাঁসিও হতে পারে। সেটা যেচে চাইছি কেন?’

জন্মিতার হঠাৎ নিজেকে খুব দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল। সে মাথা নাড়ল, ‘আনন্দ ঠিকই বলছে। রামানন্দ রায় আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। জন্ম হচ্ছে আমার জননীকে।’

‘আগামীকাল সেটা চিন্তা করা যাবে। আমার মনে হয় প্রোগ্রাম চেঞ্জ করা উচিত। এখন এই রাতে রাস্তায় কোন গাড়ি আছে বলে মনে হয় না। সেই

লোকটা যদি খানায় জানায় তাহলে আমরা ঠাকুরপুকুরে যাওয়ার সময় সহজেই ধরা পড়তে পারি। ওয়েল, আমি ধরছি চান্স ফিফটি ফিফটি। তাছাড়া গাড়িটি রাখবি কোথায়? ভোরবেলা অবধি লোকটা যদি অপেক্ষাও করে তাহলে প্রিয়া সিনেমার কাছে না পেয়ে সোজা খানায় যাবে। আমরা গাড়িটা ঠাকুরপুকুরে নিয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। দ্বিতীয়ত, কল্যাণকে ফেলে রেখে আমরা যেতে পারি না। ঠাকুরপুকুরের ওর ট্রিটমেন্ট কেমন হবে তা আমরা জানি না। এসব ঝুঁকি আমাদের হয়তো নিতেই হতো কিন্তু জয়ের বাবাকে আমার এখন বিশ্বাস করা যায় বলে মনে হচ্ছে। ঝুঁকি নিবি কিনা ভেবে দ্যাখ।’ আনন্দ জানাল।

সুদীপ বলল, ‘গাড়িটা আমি ঠাকুরপুকুরে নিয়ে যেতাম না। খুব ভোরে প্রিয়া সিনেমার আশেপাশে পার্ক করে ওখানে থেকেই ট্যান্ড্রি নিতাম। ওয়েল, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তোরা দেখছিস টায়ার্ড ও হস্ট্রিস না। কিন্তু কোথায় ঘুমাবো? যে যেখানে শোও আমি বিছানাটা নিচ্ছি। এনি বডি ক্যান শেন্নার উইথ মি।’ জুতোটা খুলে টয়লেটের দিকে এগোচ্ছিন কিন্তু জয়িতা বাধা দিল, ‘তুই একটা ব্যাপার একদম ভুলে যাচ্ছিস।’

‘কোন ব্যাপার?’ সুদীপ দাঁড়াল।

‘গাড়িটাকে নিচে রেখে এসেছিস। ওটাকে এখান থেকে অবিলম্বে বিদায় করা দরকার।’

‘ওঃ গড। তোমার উচিত ছিল ড্রাইভিং শিখে নেওয়া। কাঁহাতক গাড়ি চালানো যায়! জয়, তুই ট্রাই করবি এখন। খুব ঘুম পাচ্ছে আমার।’ সুদীপ হাই তুলল।

আনন্দ বলল, ‘না রে সুদীপ। ওর যাওয়া ঠিক হবে না। শেষ রাত্রে কলকাতার রাস্তায় কোন মেয়ে একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এ-দৃশ্য অনেকের সহ্য হবে না। চল, তোতে আমাতে এখনই বেরিয়ে পড়ি। প্রিয়া সিনেমার কাছাকাছি যেতে হলে আর দেরি করা ঠিক হবে না। কে জানে ভোরে আমাদের জন্যে কোন ট্র্যাপ পাতা থাকবে কিনা।’

জয়িতা বলল, ‘প্রিয়া সিনেমার কাছাকাছি যেতে হবে কেন? তোরা বানীগঞ্জ সাকুলার রোডের কোথাও রেখে আয়। গাড়িটা দূরে থাকলেই তো হলো।’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘নো। আই মাস্ট গো দেয়ার। লোকটা নিৰ্মাত কাল সকাল পর্যন্ত মন স্থির করতে পারবে না। যদি এসে গাড়িটা পেয়ে যায় তাহলে প্রেফ চেপে যাবে। পুলিশ জানতেই পারবে না। ওরা ভাববে আমরা ইলিয়ট রোডের কাছাকাছি শেল্টার নিয়েছি। তুই যেটা বলছিস আনন্দ সেটারও সম্ভাবনা আছে। ফাঁদ পাতা থাকতে পারে। তবে তার সময় এখনও হয়নি। কিন্তু কথা হল এখন ওখানে পৌঁছে ফিরব কি করে?’

বল তো?’

আনন্দ এগিয়ে এল কল্যাণের সামনে, ‘অকেজো মানে? একটা হাত কিছুদিনের

আনন্দর সঙ্গে বের হবার আগে সুদীপ জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কল্যাণ ঘুমিয়ে পড়লে আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি বিছানায় বডি ফেলো না। আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত জেগে থাকবে। নইলে বেল বাজলে তোর মা হয়তো দরজা খুলে ডাকাত বলে চোঁচাবে।'

কল্যাণের ঝিমুনি আসছিল। ওর কনুই-এর কাছটায় জখম হয়েছে। জয়িতা ওকে বিছানায় শুয়ে পড়তে বলল। তারপর আলো নিবিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। আসবার সময় দেখল রামানন্দ আর সীতা রায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। এবং তখনই জয়িতার মনে হল তার দ্বন্দ্ব জান করা দরকার। সন্ধ্যা থেকে একটার পর একটা টেনশনে শরীর আর বইছে না। দারুণভাবে টানছে বিছানা। অথচ ওরা যখন এত করার পরও আবার বের হতে বাধ্য হল তখন তার মুনোটা অপরাধ। জানলার কাছে পৌঁছে পাল্লা দুটো খুলে দিতে ঠাণ্ডা বাতাস এলো। ঝিম ধরে আছে কলকাতা। এর ওপর থেকে শেষ রাতের দিকে এগোনো শহরটার ঘুমন্ত চেহারাটা দেখে জয়িতার মনটা হঠাৎ নরম হয়ে এল। একটাও গাড়ির হেডলাইট নেই, হলদে আলোয় রাস্তাগুলো আরও নির্জন হয়ে গেছে। কাছে কিংবা দূরে কোন বাড়ির খোপে আলো জ্বলছে না। হঠাৎই দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কল্যাণ পড়ে গেছে এবং লোকগুলো ওকে ঝাপটে ধরেছে। সেই মুহূর্তে কি তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল? নইলে হঠাৎ তার শরীরে কোন শক্তি ভর করেছিল? কল্যাণকে মুক্ত করতেই হবে শুধু—এই চিন্তাটাই তাকে উদ্দাম করে তুলেছিল। কি সে পেরেছিল। প্রেনেভটা ছোঁড়ার কোন রকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই তার হাত সক্রিয় হয়েছিল। নইলে কল্যাণকে কোনদিন আর ফেরত পাওয়া যেত না। নিজেকে তার অন্য রকম লাগছিল। সেই জয়িতা, যে কেবল দুঃখ পেত, এত বড় ফ্ল্যাটে একা একা থেকে নিজেকে যে শুধু অবহেলিত ভাবত সে কোথায় হারিয়ে গেল। এখন আমার একটু স্নান চাই। জয়িতা বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারা, সারা শরীরে বেয়ে তা গড়িয়ে পড়ছে, জয়িতার মনে হল এর চেয়ে শান্ত আর কোথাও নেই। রামানন্দ রায়ের মুখটা মনে পড়ল তার। এই প্রথম সে ওঁর মুখের ওপর কথাগুলো বলতে পারল। কিন্তু তার পর থেকেই এক ধরনের ক্ষরণ শুরু হয়েছে মনে। কিরকম কুঁকড়ে গেল রামানন্দ রায়ের মুখ। অমন অসহায় সে কোনদিন হতে দ্যাখেনি মানুষটাকে। যে কোনভাবে আসা অর্থের স্রোত এবং নিমেষে সমশ্রমীর মানুষের দ্রুতগতির জীবন রামানন্দকে প্রসূক করছে যৌবনকে ধরে রাখতে। আজ যেন এক নিমেষেই মানুষটা অতিরিক্ত প্রৌঢ় হয়ে গেল।

পরিষ্কার হয়ে ঘরে ফিরে সেই জমকালো শাড়িটা বের করল সে। হঠাৎ তার ইচ্ছে করল শাড়ি পরতে। শেষবার প্যারাডাইসের কাণ্ডটা হবার পর সে গাড়িতে বসে শাড়ি খুলেছিল। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা এখনই সন্দেহ

হচ্ছে। কিন্তু খুলতে তো পেরেছিল আরু রেখে। কত কিনা হাস্যকর ব্যাপার এক জীবনে মানুষকে করতে হয়। এমন কি সেই পরচুলটা! জয়িতার মনে পড়ল সেটাকে কোথায় রেখেছে। না, ফেলে দিতে হবে। সুদীপের পরামর্শে কিনতে হয়েছিল কিন্তু পরচুলটা আর নকল দাড়ি তার কাছে একই ব্যাপার। শাড়ি ব্লাউজ পরে জয়িতা ঘড়ি দেখল। ওদের ফিরতে চারটে তো বাজবেই। এবং সময়টা তাকে জেগে থাকতে হবে। কি করা যায়। সেল্ফ থেকে একটা বই নিয়ে বসল সে। যাড়ে হাওয়া লাগায় বেশ আরামবোধ হচ্ছে। কয়েক লাইনে চোখ বুজিয়ে পড়তেই ইচ্ছে করল না বইটা। সে ওটাকে সেল্ফে রেখে আর একটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল।

“সারাদিন মিছে কেটে গেল,
সারারাত বড্ড খারাপ
নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে; জীবন
দিনরাত দিনগত পাপ
ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু
ফণীমনসার কাটা তবুও তো স্নিগ্ধ শিশিরে
মেখে আছে; একটিও শূন্য নেই;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।”

জীবনানন্দের কবিতার বইটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল জয়িতা। বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কণ্ট থম ধরে আছে। এখন কলকাতার, এই কলকাতার সব জ্ঞানপাপী ফিরে গেছে নীড়ে। তারপরেই এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসল সে। কবিতার বইটি রেখে দিল সেল্ফে। না, শুধু দিনগত পাপ ক্ষয় করার জন্যে সে বেঁচে থাকবে না। এই হতাশা তার জন্যে নয়। বরং যে সব জ্ঞানপাপী সুবিশেষত নীড়ে ফিরে যায় তাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে না আনা পর্যন্ত শাস্তি নেই। কবিতাটাকে ভোলবার চেষ্টা করতেই যেন সে উঠে দাঁড়াল।

এই বাড়ির কোথাও কোন শব্দ নেই। যে বিদেশী বাজনা বাজছিল কোন ফ্ল্যাটে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। রামানন্দ রায়ের মুখটা মনে পড়ল জয়িতার। এইরকম ভাবে তিনি কোনদিন তাকাননি। জয়িতার হঠাৎ খুব ইচ্ছে হল বাবার কাছে গিয়ে বসে। তার বক্তব্য বলার জন্যে হয়তো সে সঠিক শব্দ নির্বাচন করেনি। আমরা যখন কথা বলি তখন বেশীর ভাগ সময়েই বক্তব্যটাই জানবার চেষ্টা করি কিন্তু আপতনিরীহ কোন শব্দ যে শ্রোতার কানে মারাত্মক অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায় তা ভাবার প্রয়োজন বোধ করি না। মুখে কোন ক্ষমা চাইতে পারবে না সে। কারণ সে বিশ্বাস করে ক্ষমা চাইবার মত কোন অপরাধ সে করেনি। কিন্তু চুপচাপ কিছুক্ষণ পাশে বসে থাকলে এক ধরনের আন্তরিকতা পৌঁছে দেওয়া যায়। জয়িতার স্থির বিশ্বাস রামানন্দ এখনও ম্যুমানি। তাছাড়া সে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। তিনি তাকে এবং তার বন্ধুদের এই ফ্ল্যাটে

আশ্রয় দিয়েছেন। এখন নিশ্চয়ই তার পক্ষে অনুমান করতে বাধা নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ ডেকে তাদের ধরিয়ে দেননি। বরং তাঁর ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে তিনি পারলে উপকারই করবেন।

রামানন্দ রায়ের দরজায় নক করতে গিল্পেও সামলে নিল সে। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। তারপর সেটা কাটিয়ে উঠে দরজায় চাপ দিল। খোলাই ছিল ওটা, জম্বিতা ভেতরে পা বাড়িয়ে অবাক হল। টানটান বিছানা দেখে বোঝা যায় কেউ সেটা ব্যবহার করেনি। ঘরে আলো জ্বলছে। রামানন্দ রায় তাঁর ঘরে নেই। ছ্যাত করে উঠল জম্বিতার বুক। এতরাত্রে কোথায় গেলেন তিনি। যেভাবে মানুষটা বেরিয়ে এসেছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে কিছু একটা করে বসা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই ফ্ল্যাটে তো আর যাওয়ার কোন জায়গা নেই। জম্বিতা বাথরুমের মুখ বাড়াল। না তিনি সেখানেও যাননি।

তাহলে কি রামানন্দ রায় বেরিয়ে গেছেন? তারা যখন ঘরে বসে কথা বলছিল তখন কি নিঃশব্দে বাইরের দরজা খুলে চলে গেছেন? এতক্ষণ যে ধারণা তৈরী হয়েছিল তা কি ভুল? বাড়ির টেলিফোন পর্যন্ত ব্যবহার না করে রামানন্দ নিশুতি রাত্রে বেরিয়ে গেছেন পুলিশকে খবর দিতে? জম্বিতার মনে হল অবিদ্রম্বে কল্যাণকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। সুদীপ আনন্দ ফিরে আসার আগেই রাস্তায় ওদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। জম্বিতা কিছুই ভাবতে পারছিল না। তার পরেই পাশের ঘরটার কথা মনে পড়ল ওর। সীতা রায় তো আজ সারাদিন প্রায় স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে রয়েছেন। এমন কি বাড়িতে তিনটে অপরিষ্কৃত ছেলে এসেছে তা নিলেও মাথা ঘামাননি। রামানন্দ তো ওই ঘরে যাননি? মনে হয় না। সীতা রায় রাত হলে স্বামীকে নিজের ঘরে অনুমতি দেন না। বেশ কিছুদিন ধরে জম্বিতা এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে। একসঙ্গে পাটি তৈরী যাচ্ছে ওঁরা, হেসে কথা বলছেন অন্য ফ্ল্যাটের লোকদের সঙ্গে, গেস্ট এলে আপ্যায়নও করছেন এবং তখন দেখলে বোঝা যাবে না এই স্বামী-স্ত্রী রাত্রে পরস্পরের মুখ দেখেন না। আজ কি করে রামানন্দ সীতা রায়ের ঘরে যাবেন? অন্তত এই শেষরাত্রে। সীতা রায়ের তো জেগে থাকার কথা নয়, শরীরের প্রতি তার অত্যন্ত সতর্কতা।

হঠাৎ জম্বিতার মনে পড়ল বাথরুমটার কথা। পাশাপাশি দুটো ঘরের জন্যেই একটাই বাথরুম। দুটো দরজা দিয়ে ওটায় যাওয়া যায়। জম্বিতা নিঃশব্দে বাথরুমে ঢুকল। এবং ঢুকতেই বুঝতে পারল পাশের ঘরের মানুষ জেগে আছে। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। একটু সংকোচ হল তার। কিন্তু রামানন্দ রায় ওখানে আছেন কিনা তা জেনে নিশ্চিত হতে চায় সে। সে ঠিক করল অন্তত একবার সে দরজার কাছে কান পেতে শুনবে রামানন্দ কথা বলছেন কিনা। হস্তুতো এটা অন্যান্য, রুচিতেও বাধছে তার। কিন্তু নিজের সন্দেহটা নিজেই মিথ্যা প্রমাণ করতে চাইল সে। ধীরে ধীরে পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কান্না শুনতে পেল জম্বিতা। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে

গেল। মা কাঁদছে।

রামানন্দ বললেন, 'কেঁদো না সীতা, গ্লিঞ্জ শান্ত হও।'

সীতা রায় বললেন, 'তুমি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। বল ক্ষমা করবে?'

রামানন্দ বললেন, 'আমিও যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

সীতা রায় একটু থামলেন। তারপর করুণ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু জয়ী? জয়ী?'

রামানন্দ বললেন, 'ওকে ওর মত থাকতে দাও। কখনও ওকে বাধা দিও না।

ও আর ঠিক আমাদের নেই। আমি ওর জন্যে গবিত সীতা।'

আর দাঁড়াতে পারল না জন্মিতা। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এল।

এবং হঠাৎই তার কান্না পাচ্ছিল। শূন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে কাঁদছিল। অথচ তার চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল পড়ছিল না। আর তখনই দরজা খোলার জন্যে অনুরোধের বেল বাজল।

॥ ২০ ॥

'বড়বাজারে উগ্রপন্থীদের আক্রমণ,' 'জাল ওষুধের কারখানা ধ্বংস,' 'প্যারাডাইসের গর বড়বাজার।' তিনটে খবরের কাগজের শিরোনাম সকালবেলায় ওদের চোখে পড়ল। শেষরাত্র এই ফ্ল্যাটে ফিরে সুদীপ ঘুমাবার চেষ্টা করেছিল। আনন্দ চুপচাপ শুয়েছিল। বাবার চিঠিটার কথা অন্ধকার ঘরে কেবলই মনে পড়ছিল তার। একটা মানুষ কোন অবস্থায় এমন চিঠি লিখতে পারে। বারংবার বাবা এবং তার সেই বান্ধবীকে ভুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে আবিষ্কার করেছিল ওই ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে তার কোন বিরূপ মানসিকতা তৈরি হচ্ছে না। এমন কি হয়তো তিনি মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী তবুও। আর এই ভাবেই ঘরের অন্ধকারটা মিলিয়ে গেল, জানালার বাইরে আলো ফুটল। শরীরে বেশ ক্লান্তি থাকায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল তার। ওপাশে কল্যাণ বোধ হয় ঘুমিয়েছে ওষুধের প্রভাবে। সুদীপ ঘুমিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যদিও সে কল্যাণের পাশে বিছানায় একইভাবে পড়ে আছে। পায়ের তলায় মোটা কার্পেট, দামী সোফা আর সুন্দর ছবিতে সাজানো ঘরটায় সকাল এল। জন্মিতাদের কালা চাকরটা দামী পটে চা দিয়ে গেল। তারপর যখন জন্মিতা এল কাগজে নিয়ে তখনও আলস্য পাক খাচ্ছে ঘরে। সুদীপ উঠে এসে শিরনামগুলো পড়ল। পড়ে হাসল, 'উগ্রপন্থী বলে কেন রে কাগজগুলো? উগ্রপন্থী শব্দটা শুনলেই নরমপন্থী শব্দটাকে মনে পড়ে। ভারতবর্ষের সবকটা মানুষ নরমপন্থী হোক এটাই যেন ইঙ্গিতে থাকে। কিন্তু ওরা ধরেছে, প্যারাডাইসের পর বড়বাজার। তার মানে দুটো যে আমাদেরই কাজ তা বুঝতে পেরেছে। ধন্যবাদ। কি লিখেছেন পড়তো!'

তিনটে কাগজে খবরগুলো এক করলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায়—'গতরাত্র কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের একটি ওষুধের কারখানায় উগ্রপন্থীরা আক্রমণ

চালায়। সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে মোহনলাল আগরওয়ালের এই ওষুধের কারখানাটি সম্পর্কে কোন অভিযোগ ছিল না। ব্যবসায়ী হিসেবে মোহনলালজীর খ্যাতি আছে। মধ্যরাত্রে কয়েকজন উগ্রপন্থী কোন এক সূত্রে কারখানার ভেতরে প্রবেশ করে। তারা কর্মচারীদের এক পাশে সরে যেতে বাধ্য করে। তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রেনেড এবং পেট্রল বোমা ছুঁড়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশাল কারখানাটিকে ধ্বংস করে দেয়। উগ্রপন্থীরা যখন পালাচ্ছিল তখন তাদের একজনকে জনসাধারণ ধরে ফেলতে গিয়েও পারে না। প্রকাশ, একজন মহিলা উগ্রপন্থী তাকে বাঁচিয়ে উদ্ধাও হয়। কোনরকম ডাকাতি হয়নি। দমকল এবং পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কিন্তু কারখানার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ক্ষতির পরিমাণ সঠিক না জানা গেলেনও কয়েক কোটি টাকা বলে আশংকা করা হচ্ছে। কোন মানুষ যাতে মারা না যায় সে ব্যাপারে উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য ছিল এটা বোঝা গেছে। তিনজন সামান্য আহত হয়েছেন বিস্ফোরণের ফলে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শহরে জাল বিছিয়ে ফেলে যে গাড়িটিতে উগ্রপন্থীরা অকুস্থল থেকে পালিয়েছিল সেটি ধরবার জন্যে। এই কপি প্রেসে দেবার সময় জানা যায় ইলিয়ট রোড এবং পয়েন্টসলির মোড়ে পুলিশ পরিত্যক্ত গাড়িটিকে পেয়েছে। এই গাড়িটি একটি সিনেমা হলের সামনে থেকে চুরি গিয়েছিল কয়েক ঘন্টা আগে। পুলিশ সন্দেহ করছে প্যারাডাইসের ঘটনাটির সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। উভয় ক্ষেত্রেই আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য ধরা পড়েনি। এই দলে যে মহিলা আছে সে ব্যাপারে পুলিশ নিঃসন্দেহ। এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। জোর তদন্ত চলছে। পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন তারা সূত্র খুঁজে পেয়েছেন।

সংবাদটির মধ্যে একটি বন্ধ করে আর একটি সংবাদ দেওয়া হয়েছে তিনটি কাগজেই। তার ছোট শিরোনাম, 'এবার রেসকোর্স ? ঘটনাটির পর আমাদের অফিসে টেলিফোনে উগ্রপন্থীদের একজন জানায় তারা এবার রেসকোর্স ধ্বংস করতে চাইছে। যেহেতু শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর আর তাদের কোন আস্থা নেই তাই তারা জনস্বার্থবিরোধী বলে যাদের মনে করবে তাদের ধ্বংস করবে। বড়বাজারের ঘটনা জানিয়ে তারা বলে যে ওই কারখানায় মানুষের জীবননাশকারী জাল ওষুধ তৈরী হত। টেলিফোনে ওই কারখানার মালিকের গোপন শুদামের খবর আমাদের জানানো হয়। সূত্রটি ধরে পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে প্রচুর ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে। এখন দেখা হবে এই ওষুধ আসল না জাল। সুনিপুণ অপারেশনের পর উগ্রপন্থীদের খবরের কাগজের সঙ্গে এইভাবে যোগাযোগ করে খবর দেওয়া অভিনব বলে মনে হয়েছে।'

সুদীপ চায়ের কাপটা তুলে নিল। 'খুব দামী চা খাস তোরা! আঃ!'
 আনন্দ সত্যি অর্থাৎ হলা। এই সময় যে সুদীপ এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অন্য কথা বলতে পারবে তা তার ভাবনায় ছিল না। জগ্নিতা কথা বলল আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে, 'তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হয়নি। এই সব খবর পড়ে

পাবলিক যা ভাবে তাই তো আমরা চেয়েছিলাম।’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘কিন্তু হোয়াই উগ্রপন্থী! ওই শব্দটা শুনলেই পাবলিক ভয় পায়। তবে রেসকোর্স-অপারেশন আর এখন হবে না। খামোকা তুরুরকের তাস তুলে দিলি। ওরা অনেক বেশ প্রটেকশন নেবে আর আমরা কাছে ঘেঁষতে পারব না।’

আনন্দ এবার কথা বলল, ‘এখনই আমরা রেসকোর্স যেতে পারতাম না। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। কিন্তু এই খবরটার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।’

এই সময় কল্যাণ বলল, ‘আমি এখন কি করব?’

জয়িতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘মানে?’

‘আমি যে ধরা পড়েছিলাম সেটা কাগজগুলো লিখেছে।’

‘কি আশ্চর্য! ওরা তো তোর নাম লেখেনি। তাছাড়া আমিও তো জড়িয়ে গেছি। কাগজে লিখেছে এই দলে যে মহিলা ছিল সে ব্যাপারে পুলিশ নিঃসন্দেহ। এমন করিস না!’ জয়িতা মুখ ফেরাল।

‘দূর!’ কল্যাণ খিঁচিয়ে উঠল, ‘আমি আমার কথা ভেবে বলিনি। আমার জন্যে তোদের বিপদ হোক এটাই চাইছি না। আমি কিছু করা দূরে থাক দৌড়তে পারব কিনা তাই বুঝতে পারছি না।’

আনন্দ বলল, ‘তোকে কিছু বুঝতে হবে না। এখন যত্ননা কেমন আছে?’

‘নড়তে ভয় পাচ্ছি। কিন্তু বাথরুমে যাওয়া দরকার।’

জয়িতা এগিয়ে এল, ‘আমি কি তোকে সাহায্য করব?’

কল্যাণ বলল, ‘তুই হাতটা দে। ব্যালেন্স রেখে উঠলে যদি ওপাশটায় কম চাপ পড়ে।’ জয়িতা হাত বাড়িয়ে দিল। কল্যাণ শরীরের ভর তার ওপর রেখে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামতে নামতে কয়েকবার অস্ফুট চিৎকার করল। তারপর দুর্বল পায়েরে বাথরুমে ঢুক গেল।

সেদিকে তাকিয়ে জয়িতা বলল, ‘ওকে এখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।’

সুদীপ সিগারেট ধরানো, ‘তোর বাবা তো কাল ঘোষণা করে গেছে। জিজ্ঞাসা কর।’

জয়িতা সুদীপের দিকে বিরজ্জি নিয়ে একবার তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আনন্দ বলল, ‘দাঁড়া। তোদের কাল একটা কথা বলিনি। আমার হোস্টেলে পুলিশ এসেছিল।’

সুদীপ হাসল, ‘বাঃ, কখন?’

‘কাল বিকেলে। ওরা আমার জন্যে ওয়েট করছিল। খুব জোর বেঁচে গেছি।’

‘মহাপ্রভুরা খবর পেলে কি করে?’

‘গ্রাম থেকে। আমরা যে গ্রামে গিয়েছিলাম তা ওরা জেনে গেছে। আজ এবং

আগামীকাল ছুটি। কিন্তু এর মধ্যেই ওরা নিশ্চয়ই জেনে যাবে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কারা। আমি জানি না সুদীপের বাড়িতে গেলে ওর বাবা বলবেন কিনা ও টাকা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। তবে গতকালের ঘটনা থেকে ওরা যখন জেনেছে একজন মহিলাও ছিল তখন তার বর্ণনাও নিঃসন্দেহে পেয়েছে। সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তোর বন্ধুদের খবরটা জানতে পারা খুব স্বাভাবিক। আর সেটা হলেই তোর এইখানে পুলিশ হাজির হবে। অতএব যতটা ভাড়াভাড়ি এখন থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি ততই মঙ্গল। আমাদের হাতে বেশী সময় নেই।’

সুদীপ বলল, ‘তাহলে একটা কাজ করা যাক। তুই আর আমি এখনই ঠাকুরপুকুরে চলে যাই। এই সকালে রাস্তায় তেমন লোকজন নেই নিশ্চয়ই। কল্যাণকে জয়িতার বাবা ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা কিংবা প্লাস্টার করিয়ে রাখুন। রাত্রে জয়িতা ওকে নিয়ে বেহালার চৌরাস্তার মোড়ে চলে আসুক। ওখান থেকে আমরা নিয়ে যাব কল্যাণকে।’

আনন্দ আপত্তি করল, ‘না, এখন দু তিনদিন জয়িতার আমাদের সঙ্গে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার দরকার নেই।’ এই সময় কল্যাণ বেরিয়ে এল। এবং ওর মুখ দেখে বুঝা যাচ্ছিল বেচারা অনেক কষ্টে যন্ত্রণা চেপে রেখেছে। আনন্দ দ্রুত তাকে জানাল কি করতে হবে। বেহালার ট্রাম ডিপোর সামনে সুদীপ রাত দশটার সময় অপেক্ষা করবে। ও যেন বেশি দেরি না করে। তাহলে ঠাকুরপুকুরে যাওয়ার কোন বাস পাওয়া যাবে না।

কল্যাণ শুনল। তারপর বলল, ‘তোরা তিকানাটা দে। আমি ডাক্তারের ওখান থেকেই সরাসরি চলে যাব।’

সুদীপ প্রতিবাদ করল, ‘দিনের বেলায় হাত প্লাস্টার করা কাউকে দেখলে ঠাকুরপুকুরের সবাই মনে রাখবে। অতএব সন্ধ্যার পরেই যাওয়া ভাল।’ অতএব সিদ্ধান্ত হল রাত দশটা নয়, সন্ধ্যা সাতটার সময় সুদীপ কল্যাণের জন্যে অপেক্ষা করবে। জয়িতা চূপচাপ শুনছিল। এবার বলল, ‘আমি কোথায় যাব?’

সুদীপ বলল, ‘তুই এখানেই থাক। পুলিশ এলে পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করবি।’

জয়িতার গলার স্বর শক্ত হল, ‘সেটা যদি ওরা অবিশ্বাস করে? শোন সুদীপ, আমি মেয়ে বলে কি তোদের অসুবিধা হচ্ছে? আনন্দের কথায় হয়তো যুক্তি আছে। কিন্তু সেটা অপারেশনে নামবার আগে তোদের খেয়াল ছিল না কেন?’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘সন্নি জয়ী, তুই কিছু মনে করিস না। কল্যাণের সঙ্গে তুইও আয়। যতটা পারিস মেয়েলি ব্যাপারগুলো পাবলিকের চোখে যাতে ধরা না পড়ে তা লক্ষ্য রাখিস।’

দরজার বাইরে শব্দ হল। রামানন্দ রায় এসে দাঁড়ালেন। নির্বাক চারজনের

মুখের দিকে খানিক তাকানেন। তারপর কল্যাণকে বললেন, 'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি আমার ভাগ্যে, বাথরুমে পড়ে গিয়ে ওই অবস্থা হয়েছে। তুমি কি একা আসবে, না কেউ এসকর্ট করবে?'

কল্যাণ মাথা নাড়ল, 'আমি একাই যেতে পারব।'

'বেশ। এসো।' ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন, 'আমি এইমাত্র রেডিওতে নিউজ শুনলাম। আমার অনুমান তোমরাই কাজটা করেছ। আমি তোমাদের কনডেম করতে পারছি না, আবার কনগ্রাচুলেশনও জানাতে পারছি না। আমরা কেউ রাস্তাটা চিনি না। ভারতবর্ষের মানুষের জটিল অবস্থায় পণ্ডিতদের কোন খিওরি কাজ করবে না। তবু ভুল পথটা তো বোঝা যায়। আই মাস্ট টেল ইউ, ইটস নট দ্য ওয়ে। তোমরা আত্মহত্যা করতে চাইছ। এক ধরনের হারা কিরি। এসো তুমি।'

কল্যাণ একবার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ওঁকে অনুসরণ করল। ওরা চোখের বাইরে গেলে সুদীপ বলল, 'বাঙালী মাইরি জ্ঞান দিতে পারলে আর কিছু চায় না। লেটস মুভ।'

জয়িতা দেখছিল। হঠাৎ সে বলল, 'বাট হি ইজ হেল্পিং আস, ইজন'ট ইউ?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি আগে যা শুনেছিলাম ওঁর ব্যবহার দেখে কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না। যে মদ খায় খারাপ পাড়ায় যায় তারও তো বিপরীত চরিত্র থাকে। বাট উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল টু হিম। জয়, তুই তাহলে কল্যাণকে নিয়ে ঠিক সময়ে চলে আসিস।'

ওরা কোন জিনিস ফেলে রাখল না। সুদীপ বলল, 'এইসব মাল হাট্টিয়ে কীটস বা রুকস্যােক কিনতে হবে। বেশ কয়েকটা জিনিসের প্যান্টও দরকার।'

জয়িতা হাসল, 'তোমর কথা শুনে মনে হচ্ছে কোন এক্সপিডিশনে যাচ্ছিস।'

'হ নোস। পেছনে ফেউ লাগলে ছুটে বেড়াতে হয়। টাকাকড়িগুলো কি তোরা ভাগ করে রাখবি?'

'না আপাতত তোমর কাছেই রাখ।' আনন্দের হাতের ব্যাগের ওজন বেশি। সে খুব সাবধানে ওটা বহন করছিল। অনেক টাকা খরচ হয়েছে গেছে মালগুলো সোপাড করতে। এখন পর্যন্ত বিক্রেতা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ওরা দরজার দিকে এগোতেই পেছন থেকে গলা ভেসে এল, 'কি ব্যাপার?'

সীতা রায় হলঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার পরনে হাউসকোট, চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা, বোধ হয় ঘারে হাওয়া লাগতে চান। এই সকালেও তাঁর মুখে হালকা প্রসাধন পড়েছে। জয়িতা জবাব দিল, 'আমার এই দুই বন্ধু চলে যাচ্ছে। আর একজন, যাকে বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে সে সন্ধ্যাবেলায় যাবে।'

'তোমার বাবা বলছিল ওরা এখানে থাকবে। দে নিড শেল্টার।'

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। শেল্টার শব্দটা চট করে কানে লাগল।

জন্মিতা হাসল, 'না, আর তার দরকার নেই। ওরা কি যেতে পারে, না তোমার কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ। তোমার নাম সুদীপ? কখনও যদি তোমার কোন সাহায্য দরকার হয় তাহলে জানাতে পার। আর হ্যাঁ, তোমরা, তোমরা কি ওই যাকে বলে নকশাল?' সীতা রায় একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'না। আমরা কংগ্রেস, সি পি এম, নকশাল বা কোন ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত নই। আমাদের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই। সাহায্য চাইতে বললেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' সুদীপ দরজাটা খুলল।

সীতা রায় যেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ খেয়াল হতে বললেন, 'তোমরা কিছু না খেয়ে চলে যাচ্ছে কেন? দশ মিনিট অপেক্ষা কর, তোমাদের বেকফাস্ট রেডি হয়ে যাবে।'

এবার আনন্দ মাথা নাড়ল 'সো কাইণ্ড অফ ইউ কাকীমা। কিন্তু আমাদের এমনিতেই খুব দেরি হয়ে গেছে। আপনার এই কথাটা আমাদের ভাল লাগল। বাই জয়।'

তবু জন্মিতা ওদের সঙ্গে লিফট পর্যন্ত এল। আজ ছুটির দিন বলেই এই বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে এখনও আলস্য জড়ানো। জন্মিতা বলল, 'সাবধানে যাবি, কোন ঝুঁকি নিবি না।'

লিফটের বোতাম টিপেছিল সুদীপ, 'থাক আর ঠাকুমাগিরি করিস না। কল্যাণটার হাত ঠিক হয়ে গেলে বাঁচি। আর শোন, তোর মায়ের যেন কিছু হয়েছে। আমি যেদিন কথা বলছিলাম সেদিন উনি খুব অ্যাগ্রেসিভ ছিলেন। আজ বড় সাধারণ মনে হচ্ছে। তোর দিনটা কাটাতে খুব অসুবিধে হবে না বুঝলি।'

জন্মিতা মাথা নাড়ল, 'ওই দুটো মানুষ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমি স্বস্তিতে থাকব। সেটাই একদিন হয়ে এসেছে, এবাড়িতে তার ব্যতিক্রম হলেই—।'

লিফট এসে গিয়েছিল। দরজা খুলে রবীন সেন নামলেন। তাঁর চোখে বিস্ময় ফুটল। দুই তরুণের দিকে তাকিয়ে তাঁর বিশাল মুখটা জন্মিতার দিকে ফিরল 'এই যে, গুড মনিং! চললে কোথায়?'

জন্মিতা মাথা নাড়ল, 'কোথাও তো যাচ্ছি না। আপনি?'

'ওই যে, মিসেস রায়ের সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলোচনা করব। উনি আছেন?'

'আছেন। কিন্তু কথা বলার মত অবস্থায় আছেন কিনা জানি না।'

রবীন সেনের বিশাল দেহ জন্মিতার কাছাকাছি হল। মুখটা সামান্য নামল, 'কি হয়েছে বল তো? ক্লাবে যাচ্ছেন না, কাউকে মিট করছেন না। দার্জিলিং-এ কিছু হয়েছিল?'

'আপনি ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। দরজা তো খোলাই আছে। বাই।'

শেষ শব্দটি সুদীপদের দিকে ছুঁড়ে ভেতরে পা বাড়াতে বাড়তে জন্মিতা দেখল

সীতা রায় একই জায়গায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। সে নিচু গলায় বলল, 'তোমার গেস্ট এসেছেন।' তারপর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। বালীগঞ্জ পার্ক রোডে কোন ট্যাক্সি নেই। রোদ উঠেছে কিন্তু এখনও ছায়া পালায়নি। রাস্তাটার দোকানপাট বলতে একদম মোড়ের কাছাকাছি, লোকজনও নেই ফুটপাতে। সুদীপ বলল, 'স্যুটকেস হাতে কলকাতার রাস্তায় হাটলে নিজেদের যেন অন্যরকম লাগে। যাবি কি করে?'

'ট্রাম রাস্তায় গেলে ট্যাক্সি পাব।' আনন্দ জানাল।

ওরা ট্রাম রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল। ট্যাক্সি নেই, মিনিবাসগুলো বোধ হয় এখনও বের হয়নি। সুদীপ বলল, 'খিদে পেয়ে গেছে জব্বর। ব্রেকফাস্টটা ছেড়ে আসা উচিত হয়নি।'

এ সময় একটা ট্রাম আসছিল পার্ক সার্কাসের দিক থেকে। আনন্দ বলল, 'চলে আয় সুদীপ, এই ট্রামটায় উঠব।'

'সেকি রে! এইসব নিয়ে ট্রামে উঠব?' সুদীপ প্রতিবাদ করল। কিন্তু ততক্ষণে আনন্দ হাত নেড়ে ট্রামটাকে খামিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠল ওরা। কণ্ঠকটর ছাড়া কোন যাত্রী নেই।

আনন্দ বলল, 'হঠাৎ মনে হল বালীগঞ্জ পার্ক রোড থেকে ট্যাক্সিটা না ধরলেই ভাল হবে। তাহাড়া গড়িয়াহাটা মোড় থেকে কিছু খেয়ে নিতে পারবি। শোন তোর ওই রুজ্জা আত্মীয়াকে বিরক্ত করতে চাই না। ওখানে আমাদের খাওয়া দাওয়ার কি হবে।'

'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যদি বুড়ি অফার করে তাহলে অ্যাকসেপ্ট করব।'

আরও ঘন্টাখানেক পরে ওরা ট্যাক্সিতে ঠাকুরপুকুরের দিকে যাচ্ছিল। কয়েক পাউণ্ড পাউরুটি, জ্যাম, বিস্কুট কিনে নিয়েছিল আনন্দ। মোড়ের কাছাকাছি একটা দোকানে বসে চা আর ডিম-রুটি খেয়ে নিয়েছে ওরা। এবং তখনই জানতে পেরেছিল কলকাতার শরীরে উত্তেজনার আশুন লেগেছে। চায়ের দোকানে প্রতিটি টেবিলে এখন ওই একটাই আলোচনা। প্যারাডাইসের পর বড়বাজার। আলোচকরা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে এটি নকশালদের কার্যকলাপ নয়। কেউ কেউ অবশ্য নকশাল পরবর্তী কিছু উগ্রমতাবলম্বী দলের নাম করল। কিন্তু কোন প্রমাণ না থাকায় অন্দভূত কল্পনা করছে। এবার রেসকোর্স। একজন বলল, 'আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। দেশ থেকে রেস তুলে দেওয়া উচিত। কংগ্রেস থেকে একবার রেস বন্ধ করার কথা ভাবা হয়েছিল।'

'রেস বন্ধ হলে কত বুকি পেন্সিলারের ইনকাম বন্ধ হবে তা জানেন?'

'আপনি যে অত চোচ্চাচ্ছেন, এরপর যদি ওরা বলে যারা ঘুস নেন তাদের খতম করব। তাহলে?'

'বড়বাজারে জাল ওষুধ তৈরী হত কেউ প্রমাণ করেছে? বড় বড় কথা বলবেন না। এই পার্টি যদি পুলিশের চোখ এড়িয়ে কাজ চালায় তাহলে অনেক

পাবলিকের জান কয়লা হয়ে যাবে।’

‘মাই বল ভাই, ছোকরাদের হিশ্মত আছে। বড়বাজারে বোমা! আমার খুব ভাল লাগছে ওরা নিরীহ কর্মচারীদের আগেই সরে যেতে বলেছিল।’

‘এটাকে কি বলবেন, বিপ্লব? সরকারের বিরুদ্ধে তো কিছুই করছে না। হরিদা, তুমি মাইরি আর দুনম্বর মাল চালিয়ে এক নম্বরের দাম নিওনা। এই দোকানেও হামলা হতে পারে।’ চায়ের দোকানের প্রতিটি নিয়মিত খন্দের হেসে উঠল।

ট্যান্ডিতে বসে আনন্দ বলল, ‘পুরো ব্যাপারটাই এই রকম হাসিঠাট্টার পর্যায়ে না পৌঁছে যায়। লোকগুলো কিরকম হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসছিল। এত তরল ভাবে দেখছে কেন বলতো ব্যাপারটা?’

ভাল খেলে মনটা ভাল থাকে। সুদীপ সিগারেট টানতে টানতে রাস্তা দেখছিল। আনন্দের কথায় হাসল, ‘দূর! পৃথিবীর কোন দেশের পাবলিক কখনও সিরিয়াস হয়? কিন্তু আলোচনা হচ্ছে তো। দ্যাটস অল। এখনও ঠাট্টা চলছে কিন্তু এরকম কেস আরও কয়েকটা হলে ওই লোকগুলো আর হাসবে না। এখন চায়ের দোকানের মালিক দুনম্বর মাল এক নম্বর বলে চালাচ্ছে জেনেও কোন প্রতিবাদ করছে না। কিন্তু তখন করবে। তখন এরাই বাধ্য করবে ওই লোকটাকে ঘুষ না নিতে। আসলে পাবলিক এত দেখেছে যে কোন নতুন ব্যাপারে প্রথমেই আস্থা রাখতে পারে না। আমাদের কাজ আমরা করে যাব। পাবলিক জাগল তো বহুৎ আচ্ছা! ফলের জন্যে চিন্তা করোনা, কাজ করে যাও।’

ওর কথার ধরনে আনন্দ না হেসে পারল না। একটু চুপ করে বলল, ‘রামানন্দ রায় আমার ধারণাটা বদলে দিল। ওই রঙিন মোড়ক দেওয়া লোকটা যে হঠাৎ এত চুপচাপ আমাদের সাহায্য করবে কে ভেবেছিল। আসলে ‘সুদীপ, কোন মানুষকেই স্টাম্প করে দেওয়া উচিত নয়। কে কখন কি ব্যবহার করে।’

‘মিডল ক্লাস, পাতি মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট। রামানন্দ রায় এখন মোটা মাল কামাচ্ছেন, ফ্যাট স্যালারির চাকরি করছেন। বালিগঞ্জ পার্ক রোডে ফ্ল্যাট, গাড়ি চারটে, ক্লাবের মেম্বরশীপ, দশটা বউ-এর সঙ্গে ঘুমানো ওই সুভ্রুই এসে যাচ্ছে। লক্ষ্য কর এরা কোন মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে বলে থাকেন আমি ওর সঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম। সেই ঘুম কিন্তু চোখ বন্ধ করে নয়। কিন্তু বেসিকালি লোকটা এসেছে উত্তর কলকাতার এঁদো গলি থেকে। নিশ্চয় কিংবা মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টগুলো গেঞ্জির মত শরীর জাপটে আছে, ওপরে যতই পোশাক চাপুক। এঁরা খুব দ্রুত নিজেদের পাল্টাতে পারেন। হঠাৎ কোন খাঙ্কা খেলে নড়বড়ে অবস্থায় বর্তমান চরিত্রের বিপরীত আচরণ করে ফেলেন। কিন্তু যারা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে উচ্চবিত্ত যাদের পেছনে কোন সেন্টিমেন্টাল অতীত নেই তারা এত সহজে উপকান না। শ্রীযুক্ত বাবু অবনী তালুকদার

কখনই রামানন্দ রায়ের মত কল্যাণকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে যেতেন না।' সকালবেলা বলেই বোধ হয় ট্যান্ডিওয়াল ঠাকুরপুকুরে যেতে আপত্তি করল না। গলিটার মোড়ে এসে ওরা গাড়িটাকে ছেড়ে দিল। কয়েক মিনিট ভেতরে চোকার পর জায়গাটা বেশ ফাঁকা হয়ে এল। এ দিকটায় প্রচুর গাছ-গাছালি, দুতিনটে পুকুর চোখে পড়ল। গলিটার মধ্যে দুটো মৃদির দোকান, একটা কয়লার এবং রেশনের। সুদীপের আত্মীয়ের বাড়িটিতে চোকার পথ দুটো। একটা ভাড়াটেরা ব্যবহার করেন, অন্যটায় সব সময় হড়কো লাগানো থাকে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সেই অংশে উঠান আছে, উঠানের ওপর বাপড়া কাঁঠাল গাছ। এখন দশটা বেজে গেছে। রোদ কড়া হয়েছে। একগাদা বাচ্চা তারপরে চিৎকার করছে বাড়িটার সামনে মার্বেল নিয়ে। সুদীপ বন্ধ দরজায় শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের চিৎকার থেমে গেল। ওরা যেন এখনই কিছু ঘটবে এমন আশায় চেয়ে রইল সুদীপদের দিকে। সুদীপ সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'কেসটা কি? এই খোকা কি হয়েছে?'

ওদের মধ্যে একটি ছেলে জবাব দিল, 'বুড়ি এবার খিস্তি করবে। আমরা দরজায় ধাক্কা দিলেই করে।'

সুদীপ আনন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলি। হার্ড'লি আট দশ বছর বয়স কিন্তু কি স্বচ্ছন্দে খিস্তি শব্দটা উচ্চারণ করল। টেনে চড় মারব?'

'না। এখানে কোন বামেলা করব না আমরা। এমনতেই ছেলেগুলোর নজরে পড়ে গেছি। টোটাটল অবক্ষয়ের শিকার এরা। এই দেশের পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো যাকে চড় মারতে চাইলি সে-ই একদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবে। আর তখন খিস্তিটাই স্বাভাবিক ভাষা হবে। এককালে শাল শব্দটা বড়দের সামনে উচ্চারণ করা অপরাধ ছিল, এখন তো স্বাভাবিক।' আনন্দ আবার দরজায় শব্দ করল।

'আবার, হাড়হাবাতের দল, গুথেপোর দল আমাদের জ্বালাচ্ছি। তাদের মরণ হয় না। বাপ মা তাদের পৃথিবীতে আনল কেন? আমরা একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না গো! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা—।' দরজাটা খুলে গেল। আনন্দ রুদ্ধাকে দেখল। খালি গা, থান কাপড়টি শরীরে জড়ানো। মুখের চামড়ায় অজস্র ভাঁজ। চুল ছেলেদের মত করেই কাটা। হাতে একটা বাঁটা। তিনি অবশ্য থমকে দাঁড়ালেন। ক্রোধের বদলে বিস্ময় ফুটল মুখে। সুদীপ হাসল, 'আমরা এসে গেছি।'

'অবনীর ছেলে না? অ! আমি ভাবলাম—।' জলন্ত চোখে রুদ্ধা দূরে দাঁড়ানো ছেলেগুলোর দিকে তাকালেন একবার। তারপর একটু সরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসো। দরজা বন্ধ করতে হবে।'

ওরা ভেতরে ঢুকতেই আবার বাচ্চাদের চিৎকার শুরু হল। দরজা বন্ধ করে রুদ্ধা বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, অবনীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু অভাগীর কি দোষ? তাকে ছেড়ে এলে কেন?'

‘মা নেই।’ সুদীপ খুব আশ্বে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল।

‘নেই?’ থমকে গেলেন রুহা, ‘কবে গেল? বেঁচে গেল। ভগবান এখনও মাথার ওপরে আছেন। তা অবনী তার কাজটাজ করেছে তো? এসেছ ভালই করেছে। সঙ্গে এটি কাকে জুটিয়েছ? দ্যাখো, আমি চে’চামেটি একদম সহ্য করতে পারি না। কদিন থাকবে?’

‘আসতে না আসতেই বিদায় করতে চাইছ। এই সেদিন এলাম তখন বললে কোন আপত্তি নেই।’

‘আমি কি তাই বলছি। যদি থাকবে থাকো কিন্তু তোমাদের খ্যাটিনের কি হবে? আমি বাবা রাত্রে চোখে দেখি না, মাছ মাংসের গন্ধ সহ্য করতে পারি না। তারপরে ও-পাশের যে ভাড়াটে কলেজে পড়াতো তার স্ট্রোক না কি বলে তাই হয়েছে। গত মাসের ভাড়া দেয়নি। আমার তো ওইটুকু সম্বল। দু-একদিন হলে ঠিক আছে, বেশী দিন আমি তোমাদের জন্যে হেসেল ঠেঁলতে পারব না।’

রুহার মাথাটা সবগে দুজতে লাগল।

সুদীপ বলল, ‘তোমাকে আমাদের জন্যে কিছুই করতে হবে না। আমার এই বন্ধু কবি। একটু নিরিবিগিতে কবিতা লিখতে চায় যেখানে কেউ ওকে বিরক্ত করবে না। তাই এখানে নিয়ে এলাম। খাবার দাবারের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেব। তুমি শুধু দেখো তোমার ভাড়াটেরা যেন ওপরে না যায়। কবিতা লেখা খুব সাধনার ব্যাপার তো।’

‘কবিতা। তুমি কবিতা লেখো?’ রুহা আনন্দর দিকে তাকাল। ‘আমার কর্তা এককালে কবিতা লিখত। না না কেউ এ বাড়িতে চুকবে না। ভাড়াটেরা এদিকে আসে না, আসা নিষেধ। আর যত ধান্দাবাজ আত্মীয়দের বলে দিয়েছি মরে গেলে এই বাড়ি রামকৃষ্ণদেবের আশ্রমে যাবে। কেউ ভাগ পাবে না। যাও ওপরে যাও। বিছানাপত্র নেই কিন্তু। সতরঞ্চি আছে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই আমার।’

রুহা বাঁটা হাতে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন। বারান্দার পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির গায়ে কোন কালে সিমেন্ট পড়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটি তৈরীর সময় মালিকের অনেক সাধ ছিল। কিন্তু সেটা কখনই পূর্ণ হয়নি। বিশাল ছাদটি ন্যাড়া। ছাদের এক পাশে একটি ঘর, তার কাঠের দরজার অবস্থাও করুণ। ছাদ ডিঙিয়ে যেতে যেতে আনন্দ লক্ষ্য করল চারপাশের গাছগাছালি ছাদটাকে আড়াল করে রেখেছে। মাঝ দুপুরের পরেই বোধ হয় এখানে ছায়া নামে। সুদীপ দরজার শেকল খুলল। একটা কব্জা আগলা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরটি পরিষ্কার। বিশাল একটি সতরঞ্চি পাতা আছে। ওপাশে একটা কাঠের জানলা। ঘরের এক কোণে কিছু স্তুপ করা কিছু পুরনো জিনিসপত্র। সম্ভবত স্টোররুম হিসেবেই ব্যবহৃত হত। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে আনন্দ বলল, ‘সব ঠিক

আছে। কিন্তু ওরা এলে একটাই প্রবেশম হবে। স্নান পায়খানার জন্যে নিচে নামতে হবে। জয়িতাকে বুড়ি মানতে পারবে বলে মনে হয় না।’ সুদীপ বলল, ‘তুই লক্ষ্য করিসনি। এই ঘরের পেছনেই একটা ছোট ঘর আছে। সেটা বানানো হয়েছিল দোতলা যারা ব্যবহার করবে তাদের জন্যে। তখন তো অ্যাটাচড্ বাথ বাড়িতে বোধ হয় করা হত না সংস্কারের জন্যে। দাঁড়া একবার নিজের চোখে অবস্থাটা দেখে আসি।’ সুদীপ শিশু দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

এই ঘরে কোন ফ্যান নেই। কিন্তু ইলেকট্রিক কানেকশনও যে থাকবে না তা ভেবেছিল। আনন্দ উঠে জানলাটা খোলার চেষ্টা করল। দীর্ঘদিন একই অবস্থায় থাকায় সেটাকে বন্ধমুক্ত করতে কুসরত করতে হল। দুটো পাল্লা খুলে মরচে পড়া লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে তাকাতেই পুকুরটাকে দেখতে পেল আনন্দ। একদম এই বাড়ির লাগোয়া। পুকুরের চারপাশে বাগান। জল মোটেই পরিষ্কার নয়। বেলা বাড়লেও এখনও পুকুরের সর্বাঙ্গে রোদ পড়েনি। মনে মনে পাক খেতে লাগল লাইনগুলো। ‘ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে, /টলমল করছে পুকুরের জল, /ঝিলমিল করছে বাতাবি লেবুর পাতা। / চোখে দেখি আর মনে হয়/এ যেন আর কোন একটা দিনের আবছায়া/ আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে/দূর কালের কার একটা ছবি নিয়ে এল মনে।’ যে মানুষটি চলে গেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তিনি কেমন করে যেন চলে আসেন আধুনিকতার আড়াল ভেঙ্গে। এবং তখনই আনন্দের নজরে পড়ল মেয়েটিকে যার ‘সাদা শাড়ির রাঙা চণ্ডা পাড় দুটি পা ঘিরে তাকে পড়েছে।’ মেয়েটি এঁটো বাসন ঘাটে রেখে অবাক হয়ে ওপরের দিকে তাকাতেই আনন্দ সরে এল। সে বুঝতে পারছিল না মেয়েটি খোলা জানলা দেখে অবাক হয়েছে, না তাকেও দেখতে পেয়েছে। দ্বিতীয়টি কিছুতেই কাম্য নয়। এই ঘরে কেউ আছে এটা যত কম মানুষ জানতে পারে ততই মজল। জানলাটা বন্ধ করে দিতে গিয়েও সে খেমে গেল। খোলা জানলায় মেয়েটি যদি অবাক হয় বন্ধ হলে সেটা আরও বেড়ে যাবে। আসলে সেই মহান রুদ্ধটি তার সব গোলমাল করে দিলেন। কেন যে এইভাবে সব পরিবেশ সব মন নিয়ে এমন করে শব্দ প্রতিমা গড়ে গেছেন!

সুদীপ হাসিমুখে ফিরে এল, ‘জয়িতার জন্যে চিন্তা নেই। প্যানটা ঠিক আছে বলেই মনে হল। স্নান করতেও কোন অসুবিধে হবে না। শুধু আমাদের নীচ থেকে জল এনে দিতে হবে ওকে।’

‘বুড়িকে কি কৈফিয়ত দিবি?’

‘তোমার কিংবা আমার পাল্লা করে শরীর ঋরূপ হবে। জানলাটা খুলেছিস?’ সুদীপ সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আনন্দ বাধা দিল, ‘ওখানে বাসনে সুদীপ।’

‘কেন? কেউ আছে নাকি?’

‘হ্যাঁ। একটি কৌতুহলী তরুণী। বাসন মাজতে এসেছে।’

‘তাই! আহা কি দৃশ্য। কেমন দেখতে রে?’

‘ভাল করে দেখিনি। আমরা এখানে এসেছি তা জানাজানি হোক নিশ্চয়ই চাস না।’

‘তোর কিছু হবে না। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা কখনই নায়কদের বিপদে ফেলত না। এই পুকুরঘাট, দোতলার জানলা নিয়ে এককালে কত রোমান্টিক কাহিনী লেখা হয়েছে বল।’

‘বাংলাদেশের বেশীর ভাগ লেখক পালিয়ে বাঁচতে ভালবাসেন। তাঁরা গল্প উপন্যাস লেখেন নিজের সময়টাকে এড়িয়ে গিয়ে। ছেড়ে দে, এই ঘরটা তো বেশ ভাল। কিন্তু কয়েকটা বালিশ লাগবে। আর ওই বস্তুগুলো কোথায় রাখা যায়?’

আনন্দ ঘরটাকে আর একবার জরিপ করল। তারপর একটা সুটকেস তুলে কোণার দিকে মালপত্র সন্নিবেশিত আড়াল করল। তারপর বলল, ‘এখানে সাপটাপ থাকা বিচিত্র নয়। চোখ খোলা রাখিস।’ তারপর জামা খুলে সতরঞ্চিতে শরীর এগিয়ে দিল, ‘বড় ঘুম পাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়।’

হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল আনন্দ। সুদীপ ওর দিকে তাকাল। আনন্দের স্বাস্থ্য ভাল নয়, গায়ের রঙও ময়লা। কিন্তু এই বয়সেও ও যে কিভাবে এতটা ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে যা তার চেহারা ছাপিয়ে উঠেছে। সুদীপেরও ঘুম পাচ্ছিল। কাল রাত্রের টেনশনের জোর এতক্ষণ চলছিল। সতরঞ্চিতে বসার পর শরীর টানছে। সে জামা খুলল। তার সুন্দর দেহ, উজ্জ্বল রঙ নিয়ে কিছুদিন আগেও একটা গর্ব ছিল এখন আর এসব নিয়ে ভাবে না। ময়দানে জুড়ো এবং পরে ক্যারাটে শিখেছিল কিছুদিন। ওই বয়সে শরীরটা তৈরী করতে বেশীর ভাগ ছেলের মত সে যত্নবান ছিল। কিন্তু সিগারেট ধরার পর ওসব ছেড়ে দিয়েছে। টান টান হয়ে শুয়ে পড়তে শক্ত মেঝে পিঠে লাগল সতরঞ্চির আড়াল ভেদ করে। এইভাবে শোওয়ার অভ্যাস তার কোনদিনই ছিল না। দু’তিনবার পাশ ফিরে একটু আরাম তৈরী করে নিচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত সুদীপ উঠে বসল। একটা বালিশ দরকার। আনন্দ এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। পারে বটে। কিন্তু সে এত দ্রুত মনোতে পারছে না। কিন্তু বালিশ ছাড়াই শুতে হবে ভাই তোমাকে। সুদীপ নিজের সঙ্গে কথা বলল। এবং তখনই জানলার দিকে নজর গেল। এবার ওখান দিয়ে রোদ ঢুকছে ঘরে। একটু অন্ধকার করে দিলে বোধ হয় ঘুম আসবে। উঠে জানলার কাছে সম্ভরণে যেতেই পুকুরটাকে দেখতে পেল সে। পুকুরের ধারে কেউ নেই। আনন্দ যে মেয়েটার কথা বলেছিল সে বোধ হয় কাজ শেষ করে ফিরে গেছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে গিয়েই তার চোখ আটকে গেল একটা গাছের তলায়। দুটি অল্পবয়সী ছেলে

মেয়ে সেখানে মগ্ন হলে গল্প করছে। ওদের চেহারা, রকম এবং ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলল সুদীপ। তারপর জানলাটা বন্ধ করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এখন অবধি কোন মেয়ের সঙ্গে সে প্রেমের কথা বলতে পারল না। সুদীপ কোন একটি মেয়ের মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। কিন্তু অবয়ব তৈরী হবার আগেই জোয়ারের মত ঘুম এল শরীরে। এমন কি কোমরে গোঁজা ধাতব বস্তুটিও আর অস্বস্তি আনল না।

বেহালা ট্রাম ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপ আর একবার হাই তুললো। আজ সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে কিন্তু তবু ঘুমঘুম লাগছে। আনন্দ যদি ডেকে না তুলতো তাহলে এখন এখানে দাঁড়াতে পারত না। তার সঙ্গী হতে চেয়েছিল আনন্দ কিন্তু সে নিষেধ করেছে। সুদীপ একাই ও-বাড়িতে আছে এই রকমই পাড়ার লোকের জন্য ভাল। বুদ্ধি কাউকে বলতে মাচ্ছে না এরকম বিশ্বাস করা যেতে পারে। দুপুরে অবশ্য আর একবার উঠতে হয়েছিল। ঘরের দরজায় এসে তারস্বরে চিৎকার করছিলেন বুদ্ধি ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে। কোন রকমে চোখ মেলতেই শুনেছিল, 'রাত জেগে চুরি করে এসেছে নাকি! এত ঘুম তো বাপের জন্মে দেখিনি। ভাত রে'খেছি, গায়ে জল ঢেলে সেগুলো উদ্ধার কর এখন।' একটা নিরামিষ তরকারি আর ভাত। কিন্তু অমৃত বলে মনে হয়েছিল সুদীপের। বি চাকরের হাতে রান্না খেতে খেতে ভুলেই গিয়েছিল নিরামিষ কতটা সুস্বাদু হয়। তারপর আবার ঘুম। কখন যে দিনটা কেটে গেল তা টেরই পায়নি।

এর মধ্যে এখানে এসে দুটো কাজ করেছে সে। একটা ছোট ট্রাঙ্কিটার কিনেছে। খবরের কাগজ রোজ পাবে কিনা ঠিক নেই। বুদ্ধির তো সে বালাই নেই। আনন্দই বলেছিল এটা কিনতে। আর ব্যাগ ভরতি করে খাবার কিনেছে, সিগারেট নিয়েছে, সঙ্গে মোমবাতি আর হাওয়ায় ফোলানো বাগিশ। সাতটা দশ। সাতটায় আসার কথা ওদের। কল্যাণটা কোনকালেই সময় ঠিক রাখে না। তার ওপর সঙ্গে রয়েছে জয়িতা। সুদীপ চারপাশে তাকাল। দেখে তো মনে হচ্ছে না কেউ তাকে নজর করছে কিন্তু বিশ্বাস কি! আজ বাড়ি থেকে বের হবার পরই ওই একটা অনভূতি হচ্ছে। রাত দশটা বদলে সাতটা করা হয়েছিল সেটা খেয়াল আছে তো ওদের। একটার পর একটা ট্রাম আসছে আর চলে যাচ্ছে অথচ সে উঠছে না, যা কোন মানুষই তো সন্দেহ করতে পারে। সুদীপ এগিয়ে গেল। একজন পুলিশ বগলে লাঠি গুঁজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠে হেসে ফেলল সে। দূর.. ওই পুলিশটাকে খুব দুঃখী দুঃখী মনে হচ্ছে। সাতটা পনের নাগাদ ট্রাঙ্কিটা ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়াল। পেছনের জানলা থেকে কল্যাণ হাত নেড়ে ওকে ডাকছে সুদীপ দেখতে পেল। চটপট ড্রাইভারের পাশে উঠে বসে চালাতে নির্দেশ দিল সে। কল্যাণ বলল, 'পনের মিনিট লেট.. কিন্তু কিছু করার ছিল না।'

‘কেন ? ট্যান্সি পাসনি ?’

‘না। ট্যান্সি নয়। ওরা জয়িতাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।’

সুদীপ ঠোঁট কামড়ালো, ‘কখন ?’

‘আমরা যখন বের হচ্ছি। খুব অল্পের জন্যে ওরা আমাদের মিস করেছে।’

‘তোর হাতের খবর কি ?’

‘মেজর কিছু নয়। তবে ডাক্তার প্লাস্টার করে দিয়েছে। এখন ব্যাথা টের পাচ্ছি না।’

সুদীপ এবার জয়িতার দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। মাথার চুল একদম ছেলেদের মত ছেঁটে ফেলেছে জয়িতা। কলার উঁচু শার্ট পরেছে। এখন ওকে একটি সতের বছরের তরুণের মত দেখাচ্ছে। একটা রসিকতা করতে গিয়ে চেপে গেল সে।

গলিতার অনেক আগেই ট্যান্সি ছেড়ে দিল ওরা। এদিকে রাত হলে লোকজন কমে যায়। ওরা হেঁটে এল চুপচাপ। জয়িতার ব্যাগটা ওর কাঁখেই ছিল, কল্যাণেরটা সুদীপ বইছিল। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপ বলল, ‘তোরা একপাশে দাঁড়া। বুড়ি দরজা খুললে প্রথমে আমি ভেতরে গিয়ে কথা চালাব। তারপর শিস দিলেই সোজা ভেতরে ঢুকে এগিয়ে গিয়ে একটা সিঁড়ি দেখতে পাবি। শব্দ না করে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে চলে যাবি তোরা। ওখানে আনন্দ আছে। তোরা এখন এলি বুড়ি তা জানতে না পারে।’ কথা শেষ করে দরজায় শব্দ করল সুদীপ। তৎক্ষণাৎ ভেতর থেকে আওয়াজ ছিটকে উঠল, ‘কে কেরে ? এখন কে জ্বালাতে এল ?’

সুদীপ মৃদুগলায় বলল, ‘আমি, আমি ফিরে এসেছি।’

॥ ২১ ॥

জয়িতা দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, ‘তাকে দেখে শরৎচন্দ্রের নায়কের কথা মনে আসছে।’

ওরা যে কখন নিঃশব্দে ওপরে উঠে এসেছে টের পায়নি আনন্দ। সে সতরঞ্জিতে চিৎ হয়ে শুয়ে জানলার দিকে তাকিয়েছিল। সেখান দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না থিয়েটারের আলোর মত ঘরে ঢুকেছে। কথা শুনে সে উঠে বসে বলল, ‘সেকি রে! তুই শরৎচন্দ্র পড়েছিস ?’

‘কিছু কিছু। সব ভাল লাগেনি। তুই আমাকে কি ভাবিস বলতো? প্যান্ট পরি বলে বাংলা সাহিত্য পড়বো না। স্বতসব অশ্লুতুড়ে আইডিয়া। ঘরটা কিন্তু খারাপ নয়। হ্যাটস অফ টু সুদীপ।’ ঘরে ঢুকে সোজা জয়িতা চলে গেল জানলার কাছে, ‘আরে স্বাস। ওটা পুকুর নাকি রে! ফান্টাস্টিক। জানলা দিয়ে পুকুর, এতো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।’

আনন্দ বলল, ‘জানলার সামনে দাঁড়ানো নিষেধ। দিনের বেলায় তো অবশ্য। আয় কল্যাণ।’ কল্যাণ চটি খুলে সতরঞ্জিতে বসতেই আনন্দ ওর হাতের রঙ

সাদা এবং গলা থেকে কিছু ঝুলছে দেখতে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল 'হাড় ভেঙ্গেছে?'

'ভালো নি, চিড় ধরেছে। কি ঝামেলা বল তো!'

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তোকে, নাসিং হোমে?'

'হ্যাঁ। রামানন্দ রায় লোকটা কিন্তু ভাল। বেশি কথা বলেন না যদিও তবু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। ওঁর বন্ধুই ডাক্তার। তাঁকে বললেন বাথরুমে পড়ে গিয়ে এই অবস্থা। উদ্রলোক সেটা বিশ্বাসও করলেন। রামানন্দ রায় আমাকে কোন প্রশ্ন করলেন না যাওয়া আসার পথে।' কল্যাণ জানাল, 'কিন্তু এই হাত নিয়ে কিছুই করতে পারছি না, কোন কাজে লাগব না—'

'কল্যাণ!' আনন্দ ওকে থামাল। 'তোমার অবস্থা আমাদের মতো কোন একজনের হাতে পারত।'

এই সময় সুদীপ উঠে এল। কল্যাণ যেখানে বসেছিল সেখান থেকে ছাদটা, পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় মাখামাখি ছাদটাকে দেখতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। সুদীপ সেই জ্যোৎস্না মাড়িয়ে এল। এসে বলল, 'বুড়ি আমাদের জন্যে রাগের রুটি করছে।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা এসেছে বুড়ি জানেন?'

সুদীপ বলল, 'জানতো না। আমিই বলে দিলাম। মায়ের ব্যাপারে অবনী তালুকদারের ওপর বুড়ির খুব রাগ ছিল। সেটাকেই ক্যাশ করলাম। বললাম মা মারা যাওয়ার পর বাবা বোধহয় আবার কিছু করবে তাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। আমার এই বন্ধুরা আমাকে এত ভালবাসে যে সঙ্গে এসেছে। আমি যে এসেছি তা বাবা জানলে আর রক্ষে থাকবে না। বুড়ি শুনে ক্ষেপে গেল খুব। বলল, 'কাকপক্ষী ছাড়া কেউ টের পাবে না। তবে বন্ধুদের বাড়িতে কি জানানো হয়েছে? আমি বলেছি ওরা সবাই হোস্টেলে থাকে।'

আনন্দ হাসল, 'তোমার কি মনে হয় বুড়ি এই গল্প বিশ্বাস করেছেন? আমি মনে করি না।'

'করুক বা না করুক যদি আমাদের তাড়িয়ে না দেয় তো ঠিক আছে। এই জয়ী, তুই ওই জানালার সামনে যাবি না। অসুবিধে আছে।' সুদীপ জোর গলায় বলল।

'শুনেছি।' জয়িতা জবাব দিল কিন্তু সরল না।

'কি শুনেছিস। ওখানে দাঁড়ালে তোমার চিত্ত চঞ্চল হবে। পুকুরের ধারে প্রেমের দৃশ্য দেখা যায়।'

জয়িতা ঘুরে দাঁড়াল, 'তুই প্রেম বুঝিস?'

'তোমার চেয়ে বেশী। তিন তিনটে মেয়ে আমাকে প্রপোজ করেছে জানিস।'

জয়িতা এবার সতরঞ্জিতে টান টান গুয়ে পড়ল, 'সত্যি, বাংলাদেশের মেয়েদের কি দূরবস্থা, তোকেও তারা প্রপোজ করে। আসলে সেইসব মেয়ে বোধহয়

প্রেম করা ছাড়া কিছু বোঝে না।’

কল্যাণ জয়িতার দিকে তাকান, ‘তুই কখনও কোন ছেলেকে ভালবেসেছিস?’
‘কেন বাসব না? তুই আনন্দ সুদীপকে তো ভালই বাসি। আজ আসবার সময় মনে হয়েছিল রামানন্দ রায়কেও ভাল বেসেছি। ভালবাসা এক কথা আর প্রেম আর এক জিনিস। তুই জিজ্ঞাসা কর আমি প্রেমে পড়েছি কি না? না পড়িনি। অবশ্য আমাকে মেয়ে বলে ছেলেরা চট করে ভাবতেও পারে না। আর কেন জানি না ভাই আমার সেই ফিলিংসটাই আজ অবধি এল না। সুদীপ দৃশ্য দেখে চিত্তচঞ্চল হবে তোর আমার নয়।’ শুয়ে শুয়েই সিগারেট ধরাল জয়িতা।

সুদীপ একটু উফ গলায় বলল, ‘কথা শুনলে মাইরি অ্যালার্জি বের হয়। চিমটি না কেটে কথা বলতে পারিস না? তোর চুল ছাটিল কে?’

জয়িতা উঠে বসল ‘তোর প্যান্ট বানায় কে?’

‘আনন্দ এবার হেসে উঠল, ‘ঠিক আছে। আর নয়। আমার একটু সিরিয়াস কথা আছে।’

সুদীপ একটু রাগত ভঙ্গীতে ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করে একপাশে রাখতে লাগল। ট্রাজিস্টার বোতাম টিপতেই চমৎকার শব্দ হল। তারপর ঘড়ি দেখে সেটাকে বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, ‘মোমবাতি জ্বালাতে হবে? কারো এখন অসুবিধে হচ্ছে?’

‘আনন্দ বলল, ‘না। বেশ তো দেখতে পাচ্ছি। জয়িতা, আমরা সারাদিন এখানে, ওদিকে কোন নতুন খবর আছে?’

জয়িতা বলল, ‘আছে। সারাদিন আমি ফ্ল্যাট থেকে বের হয়নি। বলতে গেলে টানা সাতঘন্টা ঘুমিয়েছি। বিকেলে মা এসে বললেন, সারা কলকাতায় নাকি তোলাপাড় হচ্ছে বড়বাজার নিয়ে। আমরা শাই বলি না কেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না ওরকম দুর্দান্ত ব্যাপার আমাদের পক্ষে করা সম্ভব। তাঁর ধারণা আমি যা করছি তা চেপে যাচ্ছি। যাক, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তোদের শুনে দরকার নেই।’

এই সময় সুদীপ বসে উঠল, ‘এখন থেকে আমাদের কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই।’

আনন্দ চাপা গলায় বলল, ‘আঃ সুদীপ। তারপর?’

সুদীপকে একবার দেখে নিয়ে জয়িতা বলতে লাগল, ‘বিকলে বাবা বাড়িতে ফিরে এল। লালবাজার নাকি উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের ধরবার জন্যে। ওর এক পুলিশ অফিসার বন্ধু বলেছে যে তারা অপরাধীদের খোঁজ পেয়েছে। ধরতে পারলে একটা সংগঠিত উগ্রপন্থী দলের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হবে। বাবা বলল যদি আমাদের সঙ্গে ঐ ঘটনার কোন যোগাযোগ থাকে তাহলে অবিলম্বে সতর্ক হওয়া দরকার। আমার এক কাকা আছে চণ্ডীগড়ে। তার কাছে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিল বাবা। আমি জানালাম আমাদের ব্যবস্থা

করাই আছে। আপাতত ঠিকানা জানাতে পারছি না। প্রয়োজন হলে জানাব। বাবা আমাদের এখানে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল আমি রাজী হইনি। কল্যাণকে নিয়ে যখন নামছি তখন জানতাম না পুলিশ অত তাড়াতাড়ি আমাদের ওখানে পৌঁছে যাবে। লিফট থেকে বের হতেই দেখলাম দুটো পুলিশ ভর্তি জিপ চুকল গेट দিয়ে। আমরা কোন রকমে ওদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।’

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘তোদের কেউ ফলো করেনি?’

‘না। সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, তাই না কল্যাণ?’

কল্যাণ বলল, ‘হ্যাঁ। আমরা পৃথিবী ঘুরে এসেছি। প্রথমে ট্যাক্সি নিয়ে গেছি যাদবপুর। সেখানে আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে বোধপুর পার্কের ভেতর দিয়ে লেক গার্ডেন্স হয়ে ফাঁড়ি পেরিয়ে এলাম। এত ঘুর পথে কেউ ফলো করলে দেখা যেতই। এখানে বাথরুম কোথায়? মানে টয়লেট?’

সুদীপ হাসল, ‘বাথরুম বললেই চলবে। আমাদের বাঙালিদের এইটেই অসুবিধে হয়। আয়।’

ওরা বেরিয়ে গেলে আনন্দ জয়িতাকে বলল, ‘সুদীপের কথায় কিছু মনে করিস না।’

‘দূর! ওর কথার কোন দাম আছে নাকি! ফালতু বকে।’

‘জয়িতা আজ থেকে আমাদের আর কোন নিশ্চিত জায়গা থাকল না। তোর মন পরিষ্কার তো?’

‘একশ ভাগ। নেক্সট অ্যাকশন কবে?’

‘একটু সময় দে। একটু ভেবেচিন্তে করতে হবে। আগের দুটো উত্তেজনায় করে ফেলেছি। কোন ক্ষতি তেমনভাবে হয়নি বটে কিন্তু যে কোন মুহূর্তেই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই রিস্কটা আর নেওয়া চলবে না।’

‘কিন্তু সময় দিলে যদি ওরা আমাদের ধরে ফেলে?’

‘চান্স কম। আমরা যদি নতুন কোন ভুল না করি তাহলে ওদের অনেক সময় লাগবে।’

জয়িতা কোন কথা বলল না। তার সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। সে চার পাশে তাকিয়ে একটা অ্যাশট্রে খুঁজল। না পেয়ে কোণা থেকে একটা পুরানো কৌটা টেনে এনে সেটাকে অ্যাশট্রে বানাল। সুদীপরা ফিরে এল। কল্যাণ বলল, ‘এই রকম জ্যোৎস্না অনেকদিন দেখিনি।’

আনন্দ কথা শুরু করল, ‘আমরা এই যে জায়গাটা পেয়েছি তা যে খুব নিরাপদ আমি মনে করি না। কিন্তু যদি আমরা সতর্ক হই তাহলে কিছুদিন থাকতে পারব। আমার প্রস্তাব, সুদীপ ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে যাবে না। দিনের বেলায় তো বটেই রাত্রেও ছাদে ঘোরাফেরা করা ঠিক হবে না। অন্তত দিন সাতেক স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকতে হবে সবাইকে।’

কেউ কোন কথা বলল না। আনন্দ আবার বলল, ‘রেসকোর্সে অ্যাকশন করতে

বাওয়া এই মুহূর্তে বোকামি হবে। তবে সুদীপ কাল রেসকোর্সের সেক্রেটারিকে টেলিফোন করে হুমকি দিবি। এবং সেই সঙ্গে খবরের কাগজগুলোকেও জানাবি। নেশ্টট রেসের দিন তার কি প্রতিক্রিয়া হয় জেনে সেই বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। পুন্নিশ আমার খবর পেয়েছে। আজ জয়িতার সন্ধানও পেল। বুঝতে পারছি না সীতা রায় ওদের কি বলবেন! যদি সত্যি কথা বলেন তো ওদের উৎসাহ বেড়ে যাবে।’

কল্যাণ বলল, ‘সীতা রায় কিছু বলবেন না।’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘শোন, এখন থেকে কোন অনুমানের ওপর চলবি না। না বলেন তো ভালই, বললে যা হবে তার জন্যে নিজেদের প্রটেক্ট করতে হবে। আপাতত আমরা এখানে থাকি। সুদীপ দ্যাখ কে আসছে।’

শোনামাত্র সুদীপ চট করে দরজায় চলে এল। আনন্দ দেখল কল্যাণ এবং জয়িতা যতটা সম্ভব ভেতরে সরে যাচ্ছে। চেহারাটা স্পষ্ট হলে সে নিঃশ্বাস ফেলল। সন্তর্পণে বৃড়ি এগিয়ে আসছেন। দরজার সামনে সুদীপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রায় ফিসফিসে গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘ওমা তোমরা এখানে ভুতের মতন বসে আছ? একটা হারিকেন লাগবে বলনি কেন?’

সুদীপ হাসার চেষ্টা করে সহজ গলায় বলল, ‘আমাদের সঙ্গে মোমবাতি আছে, আপনি চিন্তা করবেন না।’

বৃড়ি হাসলেন, ‘কি ছেলেরে বাবা! বাপের ভয়ে বন্ধুদের নিয়ে অন্ধকারে বসে আছে। কিন্তু এবার আমাকে উদ্ধার করো। আমি নটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে না তবু শুয়ে শুয়ে ঠাকুরের নাম জপি। খাবে চল।’

সুদীপ বলল, ‘এত ভাড়াটাড়ি। দুপুরে এত খেয়েছি যে একটুও খিদে পাচ্ছে না। আচ্ছা তিক আছে। চলুন আমাদের রুটি তরকারি নিয়ে আসি ওপরে। আপনি কাজ শেষ করে শুয়ে পড়ুন, আমরা খিদে পেলে খেয়ে নেব।’

বৃড়ির কপালে ভাঁজ পড়ল। এতক্ষণ যে চাপা গলায় কথা বলছিলেন তা বিস্মৃত হলেন, ‘আমার সমস্ত বাড়িটা সকড়ি করবে তোমরা?’

সুদীপ দ্রুত মাথা নাড়ল, ‘না না। খেয়েদেয়ে ভাল করে খুয়ে দেব।’

প্রস্তাবটা মনঃপূত হল না বৃড়ির। এই সময় সুদীপ বলল, ‘আর একটা কথা। কিছু টাকা রাখবেন আপনি! আমাদের জন্যে তো খরচ বাড়ছে।’

‘একি কথা! ছি ছি কদিন এই গরীবের বাড়ীতে আছ আর আমি হাত পেতে টাকা নেব? ইচ্ছে হলে আলু পটল কিনে এনো কিন্তু ওইটুকু ছেলের কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না। ও হ্যাঁ, আমার এক ভাড়াটের বউ জিজ্ঞাসা করেছিল কারা এসেছে? বউটা নাকি তোমাদের জানলা দিয়ে দেখেছে। তা আমি বললাম আমার মামাতো ভাই-এর ছেলে আর তার বন্ধু। বউটার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে বলবে না। আমার বাড়ীতে কে এসেছে তাতে তোর কি বাপু। চলে এসো, খাবার নিয়ে যাও। এ কি রকম ব্যাপার বুলি না।’ বৃড়ি তরতর করে ফিরে যেতে যেতে আবার

দাঁড়ালেন। কিছু ভাবলেন তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'না, থাক।' সুদীপ আগ্রহী হল, 'থাকবে কেন, বলুন না। কিছু হয়েছে?' 'না, কি আর হবে!' বড়ি সলজ্জ ভঙ্গীতে তাকালেন, 'বলছিলাম কি, যখন দিতে চাইলে তখন আমার একটা উপকার করো। ধুমতলার দিকে কোন দোকানে নাকি হাজার খুব ভাল ওষুধ পাওয়া যায়। আমাকে একজন নামটা লিখে দিয়েছিল, এদিকে কোন দোকানে নেই। তাই এনে দিও কয়েক কৌটা। জলে ভিজে ভিজে পায়ের এত হাজা হয়ে গেছে না বড় কষ্ট হয়।' কথা শেষ করে বড়ি আর দাঁড়ালেন না। সুদীপ তাকে অনুসরণ করল। জয়িতা ফিরে এসে দরজার দিকে মুখ করে বসল, 'কোন কোন মানুষের চাহিদা কত কম হয়, তাই না? এত জিনিস থাকতে হাজার ওষুধ। হাজা ঠিক কি?'

কল্যাণ বলল, 'হাতপায়ের আঙুলের ফাঁকে হয়। দিন রাত জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘা-এর মত হয়ে যায়। গ্রামের মানুষদের বেশী হয় শুনেছি।'

আনন্দ বলল, 'কিন্তু আমি ভাবছি এই মানুষগুলোর কথা। এইসব বিধবা পিসীমা, মাসীমা, দিদিমারা বাঙালির কতটা সহায় ছিল। খুব দ্রুত এঁরা চলে যাচ্ছেন। আমাদের পরের জেনারেশন এঁদের গুধু বইতেই পড়বে।'

জয়িতা বলল, 'এঁদের চলে যাওয়াই উচিত! বাপ মা শিক্ষিতা করতে চায়নি, বিয়ে দিয়েছে কিন্তু স্বামী মারা গেলে নিজের পায়ের দাঁড়াবার ক্ষমতা দেয়নি। এমন একজন মেয়ের এইভাবে বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। সংসারের সেবায় লাগবে বলে একদলকে কেন চিরকাল স্যাক্রিফাইস করতে হবে! ওঁরা হলেন পুরুষশাসিত সমাজের পুতুল।'

আনন্দ বলল, 'মানলাম। সত্যি কথাই বলেছি। কিন্তু এইসব সরল মন আর স্নেহের চেহারাটা তো আর দেখা যাবে না। এইটেই বলছিলাম। জয়িতা ট্রাজিস্টারটা দে।'

আনন্দ ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। সে ঠিক সময়ে সুইচ অন করল। কয়েক সেকেন্ডে বাজনার পর ঘোষিকা ঘোষণা করলেন এবার খবর হবে। ওরা সবাই উৎসুক হল। 'কানাডায় শিখদের বিষয়ে ভারত সরকারের প্রতিবাদ সদেশের সরকার বিবেচনা করছেন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট দেশদ্রোহিতা সহ্য করবেন না বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ডায়মণ্ডহারবারের প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের অন্তর্গতের পিছনে একটি দলই কাজ করছে।' এবার সংবাদ পাঠক বিশদে গেলেন। কল্যাণ বলল, 'ওরা তাহলে সবকিছু ঠিকঠাক জানতে পারছে। এদেশের পুলিশ ইচ্ছে করলেই সব জানতে পারে। ইচ্ছেটা করে না সব সময় এই যা।'

খবর হচ্ছিল। প্রথমে যে বিষয় জানানো হচ্ছিল তা তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। ওরা উৎসুক ছিল কখন সংবাদ পাঠক ওদের প্রসঙ্গে আসবেন। এই সময় সুদীপ ফিরল দুটো বড় সসপ্যান নিয়ে। ওগুলোকে মাটিতে নামিয়ে

সে আনন্দকে ডাকল, 'চল, জল আর খালা নিয়ে আসি। একা অত আনতে পারব না।'

আনন্দ ইশারা করল একটু অপেক্ষা করতে। এবং তখনই ট্রাজিস্টার তাদের প্রসঙ্গে এল, 'আজ বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন সম্প্রতি কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে যে অন্তর্হাতমূলক কাজ হয়েছে তা একটি দলই করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এ দুটি ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রমাণ করে কোনও ডাকাতদল অথবা ব্যক্তিগত লান্ডের জন্যে এই কাজ করা হয়নি। কলকাতা পুলিশ এর মধ্যে যে সব সূত্র পেয়েছে তা থেকে জানা যাচ্ছে এই দলটির সঙ্গে নকশালদের সম্পর্ক নেই। কিন্তু নকশাল পরবর্তী উগ্রচিন্তার সমর্থকরাই এটা করেছে। প্যারাডাইস কিংবা ওষুধ কোম্পানি যদি বেআইনী কাজ করে থাকে তাহলে তার ব্যবস্থা নিতে সরকার তৎপর। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দল যদি আইন হাতে তুলে নেয় তা কখনই বরদাস্ত করা হবে না। অনুমান করা হচ্ছে এই দলটি অত্যন্ত সংগঠিত। জনসাধারণকে সরকার সম্পর্কে বিভ্রান্ত করাই এদের উদ্দেশ্য। কোন বিদেশী শক্তির মদৎ এদের পেছনে আছে কিনা তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। রেসকোর্স বন্ধের হুমকির মোকাবিলা করার জন্যে এর মধ্যেই যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যারা এই কাজদুটো করেছে তাদের কঠোর হাতে মোকাবিলা করা হবে। তিনি আশ্বস্ত করেন, পুলিশ এর মধ্যেই নির্দিষ্ট সূত্র পেয়ে গেছে। দু'একদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে কলকাতার পুলিশ কমিশনার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে জানান যে ওই দলের সদস্যরা সবাই কলকাতার একটি নামী কলেজের ছাত্র। একজন ছাত্রীও এদের সঙ্গে আছে। এরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। কোন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এদের সংযোগ নেই।'

সাংবাদ পাঠক অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়াতে ট্রাজিস্টারটা বন্ধ করল আনন্দ। সুদীপ মন্তব্য করল, 'হাক, ষোল কলা পূর্ণ হল। ওদের আর কিছু জানতে বাকি রইল না। আমি ভাবছি শ্রীযুক্তবাবু অবনী তালুকদার পুলিশকে আমার সম্পর্কে কি বিবৃতি দিয়েছেন! চল আনন্দ।'

আনন্দ কোন কথা না বলে সুদীপকে অনুসরণ করল।

এখন জ্যোৎস্না আরও সাদা। ঘরের ভেতরটা বেশ পরিষ্কার। হঠাৎ কল্যাণ বলল, 'ফেরার পথ বন্ধ।'

চমকে উঠল জয়িতা। সে দেখল কল্যাণ অন্ধু ত চোখে বাইরের পৃথিবী দেখছে। জয়িতার খুব রাগ হচ্ছিল। সে চাপা গলায় ডাকল, 'কল্যাণ।'

কল্যাণ তাকাল, 'তুল বুঝিস না। আসলে কি জানিস, কখনও বাড়িতে আলাদা করে যত্র পাইনি। কেউ আমাকে খাতির করেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হত ওরা সবাই আমার নিজের লোক। কোন যুক্তি নেই তবু। আসলে একটা

সংস্কার। ফিরে গেলেও কোন লাভ হবে না। তবু—। ছেড়ে দে এসব কথা।’

জন্মিতা কিছু বলল না। কিন্তু তার মন বলছিল কল্যাণ অস্থির হয়েছে। কখন কি করবে তা বোঝা অসম্ভব। সে শুনেছিল নিশ্চিন্দা বাঙালি সেন্টিমেন্টের শিকার বেশি হয়। কল্যাণ সম্পর্কে তার একটা অস্বস্তি শুরু হল। কিন্তু এখনই কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলবে না বলে ঠিক করল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সুদীপ ফোলানো বালিশ বের করে দিল। পাশের ছোট খুপরিতে এক বালতি জল রাখা হয়েছে কল্যাণ আর জন্মিতার জন্যে। এখন পৃথিবীর কোথাও কোন শব্দ নেই। আনন্দ কল্যাণ সুদীপ পাশাপাশি শুয়ে পড়ল বালিশ মাথায় দিয়ে। মুখে জল দিয়ে দ্রুত ফিরে আসছিল জন্মিতা। ছাদ, আশেপাশের গাছপালা এবং সিন্ধু আকাশের দিকে চোখ পড়তে যেন সে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তেই সে একটা ঘোরের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল যেন সারাটা আকাশ থেকে মায়াবী স্বপ্ন চুইয়ে চুইয়ে নামছে পৃথিবীর বৃকে। ওই জ্যোৎস্নায় এমন একটা জাদু আছে যা সে কোনদিন এমন করে দ্যাখেনি। অনেকক্ষণ তার কেটে গেল একই ভাবে দাঁড়িয়ে। নিজেকে যেন জোর করে সে ফিরিয়ে নিয়ে এল ঘরে। পাশাপাশি তিনটি পুরুষ শুয়ে আছে। তিনজনই তার বয়সী পুরুষ। নিজেই হেসে ফেলল জন্মিতা। ওদের সে এই প্রথম পুরুষ বলে ভাবল, ভাবনাটা এল কেন? সে দরজা ভেজিয়ে এক পাশে চলে এল। তার ঠিক কাছেই সুদীপ শুয়ে পড়ল। শক্ত মেঝেতে প্রথমেই শরীরে অস্বস্তি এল। কখনও এমন বিছানায় শোয়নি সে। কখনও কি তিনটি পুরুষের পাশে শুয়েছিল? হঠাৎ সে নিজের ওপর রেগে গেল। নিশ্চিন্দা বাঙালি মানসিকতা নিয়ে একটু আগে কল্যাণ যে কথাটি বলেছিল তা তাকে আহত করেছিল। কিন্তু সে নিজেও তো মহিলাদের টিপি ক্যাল মানসিকতার শিকার হচ্ছে। তার এই ভাবনার কথা বন্ধুরা জানলে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হবে। সে তো সব সময় বলে থাকে বন্ধুদের সঙ্গে তার কোন ফারাক নেই।

ঘুম আসছিল না। জন্মিতার বন্ধু চোখের পাতায় রামানন্দ রায় বারংবার এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। এতদিনের দেখা মানুষটার চেহারা এই দুদিনে কি দ্রুত বদলে গেছে। মুখটা মুছতে চেষ্টা করতেই তার সেই দৃশ্যটি চোখে এল। সীতা রায় রামানন্দ রায় পরস্পর কাছাকাছি এসে গেছেন। হয়তো কয়েকদিন কিংবা কয়েক সপ্তাহ কিন্তু এই আসাটা কি আরামদায়ক।

হঠাৎ সুদীপের গলা কানে এল, ‘এই জয়ী চিৎ হয়ে শো।’

‘কেন?’

‘মা বলতো উপুড় হয়ে শুলে বোবায় ধরে।’

জন্মিতা চিৎ হল। এবং তখনই সে আবিষ্কার করল, সে একা নয়, তার অন্য তিন বন্ধুর কারো চোখে আজ রাতে ঘুম আসছে না।

সকালে উঠে একটা স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম আর কাগজ নিয়ে এল সুদীপ। এই কেনাকাটা সে পাড়ার দোকান থেকে করল না। কিনে আনবার সময় এমনভাবে প্যাক করেছিল যাতে পাড়ার কেউ তার জিনিসগুলো দেখতে না পায়। কিন্তু স্টোভ জ্বালাতে কেরোসিন দরকার। ওটা না পেলে সমস্যাটা থেকে যাবে। বাজারে একজন বলেছিল ব্যাকে ব্যবস্থা হতে পারে। রাজী হওয়ার কথা মনেই আসেনি। তিনটে খবরের কাগজ কিনেছে সুদীপ। হকারটা চেঁচাচ্ছিল জোর খবর জোর খবর বলে। তাড়া থাকায় খুলে দেখার অরসর পায়নি সে। হাজার ঝুঁটটা এখানেই পেয়ে গেল।

বাড়িতে ফিরতেই দেখল বুড়ি গজর গজর করছে। তাকে দেখা মাত্র সব ভুলে গিয়ে চিৎকার শুরু হল, 'আমি সারাদিন উঠানে বাঁট দিচ্ছি আর কোন নবাবপুস্তুর ওপর থেকে সিগারেট ফেলেছে এখানে? অ্যাঁ! এসব করলে এখানে থাকা চলবে না!'

সুদীপ মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ওরা কেউ নিশ্চয়ই অ্যাশট্রেটা খালি করেছে। ব্যাপারটাকে সামাল দিতে সে বলল, 'কেউ তো ইচ্ছে করে ফেলেনি, নিশ্চয়ই কাক পাখির কাণ্ড ওটা। আমি দেখছি যেন আর না হয়।'

'কাক? আমাকে কাক দেখাচ্ছ? এ বাড়ির কাক অত শয়তান নয়। চাকরি বাকরি নেই, পরের পয়সায় কত সিগারেট খেয়েছে দ্যাখো!' বুড়ির গজর গজর আবার শুরু হল।

সুদীপ একটু দাঁড়িয়ে থাকল তারপর জিনিসগুলো মাটিতে রেখে ঝুঁটটা বের করে বলল, 'আপনি কি এই ঝুঁটটার কথা বলেছিলেন?'

বুড়ির মুখ বন্ধ হল। সন্দেহের চোখে সুদীপের হাতের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর কাছে এসে বললেন, 'কি ঝুঁট?'

'হাজার। কাল রাত্রে খাবার দেওয়ার সময় যেটার কথা আপনি বলেছিলেন।'

'সত্যি? ওই ঝুঁট এটা? শুনেছিলাম ধস্মাতলা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। লোকেরা এত মিছে কথা বলে না! বড্ড কষ্ট হয়, বুঝলে! দেখি এ দিয়ে যদি কিছু উপকার হয়। বেঁচে থাক বাছা, তোমার বাবা তো কোনদিন কিছু আঙুল তুলে দেয়নি, তুমি দিলে!' বুড়ি এমন ভঙ্গীতে ঝুঁট নিলেন যেন দুহাত পেতে অমৃত নিচ্ছেন।

সুদীপ বলল, 'আমি এখনই উঠানটা বাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছি। আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।'

'থাক। আর কাজ বাড়াতে হবে না। ওগুলো কি? কি নিয়ে এলে?'

'এই কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস। আপনার কাছে একটু কেরোসিন তেল হবে?'

'ওমা, ও জিনিস কারো কাছে থাকে নাকি? দোকানে এলে দ্যাখো না রাত

থাকতে কত লোক লাইন দেয়। কেরোসিন দরকার কেন ?’

‘আপনার জন্যে একটা স্টোভ এনেছিলাম !’

‘স্টোভ ? ও মাগো ! ওসব আমি ধরাতে জানি না। স্টোভ ফেটে এ পাড়ার দুটো বউ পুড়েছে। না না ওসব বাদ দাও, ফেরত দিয়ে এস।’

‘ফেরত তো নেবে না। বিক্রি করার সময় বলে দিয়েছে। ঠিক আছে, ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুর আবার ঘন ঘন চায়ের নেশা হয় কিনা ! চা পাতাও কিনে এনেছি।’

‘ও। চায়ের নেশা। কিছুই আর বাদ নেই দেখছি। তা স্টোভটা এনেছিলে কার জন্যে ? বন্ধুর নেশা মেটাতে বলে না আমার জন্যে ?’ বলতে বলতে বুড়ি কান খাড়া করল। পেছনের দিকের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। বুড়ি ওখান থেকেই চিৎকার করলেন, ‘কি চাই ? অ্যা ?’

‘আপনার বাজার এসে গেছে।’ ওপাশ থেকে একটি নারী কণ্ঠ জবাব এল। শোনামাত্র বুড়ি দ্রুত সেদিকে চলে গেলেন। সুদীপ লক্ষ্য করল ওদিকে দরজার হড়কোটা খুলতেই সেই মেয়েটি প্রসন্ন মুখে এদিকে ঢুকল যাকে গতকাল সে পুকুরের ধারে গাছের তলায় দেখেছে। ওপর থেকে দেখার ফলে যত ছোট মনে হচ্ছিল তত কম বয়স নয়। মেয়েটি তুকেই আড় চোখে সুদীপকে দেখে নিল। তারপর ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি মিশিয়ে বুড়িকে বলল, ‘এই নিন, আলু আর ডিম। দোকানী জিজ্ঞাসা করছিল, দিদিমা হঠাৎ ডিম আনতে বললেন, খাবে কে ? আমি বললাম কুটুম এসেছে।’

‘কুটুম আবার কি ? ভাই-এর ছেলে কুটুম হতে যাবে কোন্ দুঃখে। পয়সা ফেরেনি ?’

‘না। চল্লিশ পয়সা বেশী লেগেছিল ওটা আর দিতে হবে না। ওই বুঝি আপনার ভাইপো ?’

স্পষ্টতই বুড়ি বিরক্ত হলেন। মাথা নেড়ে বললেন, ‘হ্যাঁ। এবার আমাকে কাজ করতে হবে। ছেলে মানুষ এতদিন বাদে এল তাই ভাবলাম মাছ না হোক ডিম খাওয়াই। ওসব তো রান্না অনেককাল হল করিনি। যাও, যাও আমার গল্প করার সময় নেই।’

মেয়েটি যাওয়ার জন্যে পেছন ফিরেই আবার ঘুরে দাঁড়াল, ‘আপনার ভাইপোর যদি পিসীর হাতে খাওয়া বায়না না থাকে তাহলে আমিই রেঁধে দিতে পারি !’

‘ঠিক আছে ঠিক আছে। না পারলে তোমাকে বলবখন।’

‘জায়গা তো ভাল। জলেও স্বাদ আছে। দেখবেন ভাইপোর স্বাস্থ্য ভাল হবে। যেখানে ছিল সেখানে বুঝি পুকুর গাছগাছালি ছিল না ?’

‘কেন ?’

‘বাড়ির পাশেই পুকুর, কত রকমের গাছ। সারাদিন তাকিয়ে বসে থাকলেই সমস্ত কেটে যায়। তাই না ?’ অদ্ভুত হাসিটা এবার ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি বিদায় নিল।

দরজার হড়কো দিয়ে বুড়ি চাপা গলায় বললেন, 'ছেনাল ছেনাল। স্বামী বেঁচে থাকতেও লোভ মেটে না। পাড়ার ছেলেরদের মাথা চিবোচ্ছে। তা তুমি এখানে সঙের মত দাঁড়িয়েছিলে কেন? খবরদার, ও মিশতে চাইলেও পাত্তা দেবে না।'

'কে উনি?'

'ভাড়াটের বউ। স্বামীটি দেবতুল্য মানুষ। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি আর ইনি এই করে বেড়াচ্ছেন। তা তখন কি বলছিলে? আছে একটিন। অনেকদিন হয়ে গেল। পচোটচে যায় কিনা তাও জানি না। ওতে যদি কাজ চালাতে পার তো দ্যাখো।'

এতক্ষণে মনটা ভাল লাগল সুদীপের। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ডিম আলু আনতে ওদের বলতে গেলেন কেন? তাছাড়া ডিমের কোন দরকার ছিল না!'

'বেশী কথা বলতে এসো না তো! এ পাড়ার দোকানগুলো ডাকাত। বাজারে গিয়ে কিনলে অন্তত দশ পয়সা সস্তা পাওয়া যায় বলে ভাড়াটেকে বললাম। এই রকম বেহায়া মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি গো।' বুড়ি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। তারপর ওপাশ দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে একটা প্রায় মরচে পরা টিন বের করে বারান্দায় রাখলেন।

সুদীপ সেটাকে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল প্যাকেটটা হাতে নিয়ে। বাড়ির পাশেই পুকুর, কত রকমের গাছ। সারাদিন তাকিয়ে বসে থাকলেই তো সমস্ত কেটে যায়! মেয়েটি তাকে শুনিয়েই কথাগুলো বলেছে। কেন? ও কি গতকাল জানলায় তাকে দেখেছে। সেই ছেলেরটার সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল গাছের তলায় তখনও কি তার চোখ ছিল জানলায়?

আনন্দ ডায়েরি লিখছিল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে কল্যাণ বসে আছে। আর জগ্নিতার হাতে বই। পায়ের শব্দে তিনজনেই সোজা হল। সুদীপ হেসে বলল, 'তোরা যেভাবে বসেছিস, যেন কারো বাড়িতে বেড়াতে এসেছিস। পুলিশ যদি আমার বদলে উঠে আসতো কিছুই করতে পারতিস না। যাক, চায়ের প্রবুম সলভড। স্টোভ এবং কেরোসিন এসে গেছে। আনন্দ তুই নিচ থেকে এক বালতি জল নিয়ে আয়।'

জগ্নিতা বই রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ দেখল বইটার নাম ফিউচার শক। 'সে জগ্নিতাকে প্যাকেটটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'জীবনে স্টোভ ধরিয়েছিস?' জগ্নিতা গম্ভীর মুখে বলল, 'জীবনে তো কত কি করিনি। এভাবে রাতও কাটাইনি।' সে প্যাকেট খুলে স্টোভ বের করে ঘরের কোণায় নিয়ে ধরাবার তোড়জোড় করছিল।

আনন্দ বলল, 'পুলিস এখানে এলে আমাদের কিছুই করার নেই সুদীপ। একমাত্র লাকিয়ে নিচে পড়া ছাড়া। বুড়ি চেঁচাচ্ছিল কেন?'

'তোরা ওপর থেকে অ্যাশট্রের সিগারেট নিচে ফেলেছিস? খুব খচে গিয়েছিল। আনন্দ কোন কথা না বলে জল আনতে গেল। সুদীপ কল্যাণকে খবরের

কাগজগুলো দিয়ে বলল, 'তোমার ডিউটি নিচু গলায় কাগজগুলো পড়ে শোনানো। জয়ী ওর মধ্যে চা চিনি দুখ আছে। দ্যাখ মনে করে চামচ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। কিন্তু তুই এর আগে চা করেছিস?'

ঠিক তখনই কল্যাণ অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ!'

ওরা দুইজন চমকে তাকাল। কল্যাণের সামনে খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা খোলা। সে মুখ তুলে বলল, 'আমাদের ছবি ছাপা হয়েছে।'

এক লাফে ওর পাশে চলে এল সুদীপ। স্টোভ ছেড়ে ছুটে এল জয়িতাও। বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন, 'চার বন্ধু না পেছনে আর শক্তিশালী সংগঠন?' প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের জাল ওষুধ কোম্পানিতে যে দলটি আক্রমণ চালিয়েছিল কলকাতার পুলিশ তাদের হৃদয় পেয়েছে। এই চারজনই কলকাতার নামী কলেজের ছাত্রছাত্রী। এখন পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে কোনও কেস পুলিশের খাতায় নেই। বস্তুত এদের দাগী আসামী বলা দূরের কথা শেষ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সূত্র অবশ্যই মেধাবী এবং কৃতী বলতে হয়। এই চারজনই এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। চারজনই বাড়ি থেকে পলাতক। পুলিশ সন্দেহ করছে এদের পিছনে কোন শক্তিশালী সংগঠন কাজ করছে। যেসব অস্ত্র এরা অপারেশনের সমন্বয় ব্যবহার করছে তা বিদেশী শক্তির উপহার হওয়া বিচিত্র নয়। চারজনের পারিবারিক পার্থক্যের জন্যই পূর্ব পরিচয় থাকা সম্ভব নয়। কলেজেই এরা পরিচিত হয়েছিল। সেই সামান্য সূত্রে এরা একত্রিত হয়ে অপারেশনে নেমেছে তা পুলিশ বিশ্বাস করে না। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এই ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ স্পষ্টতই দেশদ্রোহিতা। তিনি কোনভাবেই বরদাস্ত করতে পারেন না। পুলিশকে অবিলম্বে এদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছেন। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে প্যারাডাইসের সরকারের অগোচরে দুর্নীতি এবং পাপাচার হত খানার নাকের উগায় বসে, বিখ্যাত বা খ্যাতিহীন বড়লোকেরা সেখানে যেতেন গোপন অভিসারে, বড়বাজারের মোহনলালের কারখানায় যে জাল ওষুধ তৈরি হত তাতে সন্দেহ নেই, টেলিফোনে প্রাপ্ত সংবাদসূত্রে ব্রাবোর্ন রোডের গুদামে যে সব ওষুধ পাওয়া গেছে তা যে মোহনলালের তৈরি জাল ওষুধ এবং এসবের ধ্বংস করার চেষ্টা মানে জনসাধারণের এবং রাষ্ট্রের উপকার করা। কিন্তু আইন নিজেদের হাতে নিয়ে শক্তিপ্রয়োগ করার এই প্রচেষ্টা সরকার কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। কলকাতার পুলিশ কমিশনার আশা করেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীরা ধরা পড়বে। তবু জনসাধারণের কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করে তিনি ওই চারজনের ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে পাঠিয়েছেন।

এরপরে তাদের চারজনের চারটি ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছে। নিচে তাদের নাম লেখা। ওরা লক্ষ্য করল ছবিগুলো তিন বছর আগে তোলা। নিজেদের বালক বালিকা বলে মনে হচ্ছে! এগুলো পুলিশ নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে। একমাত্র কল্যাণ এবং জয়িতার বর্তমান চেহারার সঙ্গে ছবির বেশ

মিল আছে।

এই সময় আনন্দ জন নিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?' সুদীপ কাগজটা ওর সামনে রাখল। আনন্দ যতক্ষণ কাগজটা পড়ছিল ততক্ষণ কেউ কোন কথা বলছিল না। সে বাকি কাগজগুলো পাশাপাশি বিছিয়ে, দেখল প্রতিটিতেই তাদের ছবি ছাপা হয়েছে। একটি কাগজে লেখা হয়েছে, 'চার ডাকাত, একজন কলকাতার ফুলনদেবী?' রিপোর্টারটি প্রচুর কল্পনার রঙে জড়িতাকে রাঙিয়েছেন। দুটো ঘটনায় তার ভূমিকা নিয়ে যা লিখেছেন তা সত্যিই লোমহর্ষক ব্যাপার। কিন্তু চারটে কাগজই তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে। শেষ পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছিল তাও বন্ধ করে পাঠকদের জানানো হয়েছে। ইংরেজি কাগজটা অবশ্য পাশাপাশি আর একটা রিপোর্ট ছেপেছে। কাগজটি লিখেছে, এই দুটো ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য আমরা কলকাতার বিভিন্ন মানুষের কাছে যাই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টতই তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি দৃষ্টকৃতকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং চরম শাস্তি চান। কলকাতার পুলিশ কমিশনার ঘটনা দুটিকে উগ্রপন্থীদের স্ফীকলাপ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি নিশ্চিত যে পুলিশ কয়েকদিনের মধ্যেই এদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের একজন কর্তা বলেন, 'নকশাল আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই দুটি ঘটনা ঘটেছে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ। কোনও ব্যবসায়ী যদি অসৎ হন তার জন্যে আইন আছে। পূর্বাঞ্চলের শাস্তি নষ্ট করে এই আক্রমণের তিনি নিন্দা করেছেন।' রেসকোর্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন বিখ্যাত শিল্পপতি বলেন, 'রেস রাজার খেলা। এর একটা আলাদা সম্মান আছে। এদেশে সবরকম আন্দোলনের সময়েও কেউ রেস বন্ধ করতে চায়নি। একজন কংগ্রেস নেতা একবার এখানে সত্যাপ্রহ করবেন বলে হুমকি দিলেন পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন।' একজন অফিসযাত্রী কিন্তু ঘটনা দুটোর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এরকম ঘটনা হোক আমরা মনে মনে চাই কিন্তু করতে সাহস পাই না। মধুচক্র বা বেআইনী ব্যবসা এবং জাল ওষুধ তৈরি করে আইনের সাহায্যে যারা চিরকাল পার পেয়ে যায় তাদের এইভাবেই শাস্তি দেওয়া দরকার।' কলকাতার এক গৃহবধু বলেন, 'ঠিক করেছে ওরা। নকশালরা তো পুলিশ মারতো আর গলা কাটতো। কাজের কাজ কি করেছে? এরা তবু একটা জাল ওষুধের কারখানা ধ্বংস করেছে। আর প্যারাডাইস না কি বলে, ওখানে ওসব হতো? ছি ছি ছি! গরমেষ্ট কিছু বজ্রতো না? ঠিক করেছে পুড়িয়ে দিয়ে।' একটি তরুণ ছাত্র কফিহাউসে বসে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান, 'দারুণ ব্যাপার। জানি না এর পেছনে কোন রাজনৈতিক দল আছে কিনা! কিন্তু এই দুটো ঘটনায় অনেকে নড়ে বসবেন। জানি এরা ধরা পড়বেন কিন্তু ব্যাপারটা অনেককেই ভাবাবে।' যদিও সবকিছু রাজনৈতিক দল এই ধরনের

কাজকে নিন্দা করেছেন কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে সাধারণ মানুষের কাছে এরা যেন সমর্থন পাচ্ছে।’

সুদীপ বলল, ‘এই ব্যাপারটাই তো আমরা চেয়েছিলাম।’

কল্যাণ বলল, ‘তা হোক কিন্তু আমরা তো ধরা পড়ে গেলোম।’

জয়িতা উঠে স্টোভ জ্বালাচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘ধরা পড়ে গেলোম মানে?’

‘আমাদের ছবি ছাপা হয়েছে, পাবলিকই তো ধরিয়ে দেবে।’ কল্যাণের গলায় হতাশা ফুটে উঠল।

আনন্দ একটু উঁচু গলায় বলল, ‘কল্যাণ আমরা এখনও ধরা পড়িনি। এবং যতক্ষণ তা না পড়ি ততক্ষণ হতাশ হওয়ার কোন মানে হয় না। এখন শুধু দেখতে হবে আমরা এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি তা পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব কিনা।’

সুদীপ বলল, ‘পাড়ার লোক ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কারো জানা সম্ভব নয়। আমরা সতর্ক থাকবো যাতে পাড়ার লোকজন তাদের দেখতে না পায়। আমার ওই ছবির সঙ্গে এখনকার চেহারার কোন মিল নেই। অতএব আমি নিজেকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি না।’

আনন্দ বলল, ‘অগত্যা তাই করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এমন একটা শেল্টার চাই যেখানে কোন ভাবে পুলিশ পৌঁছতে পারবে না।’

কল্যাণ জবাব দিল, ‘তাহলে হিমালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।’

আনন্দ ওর দিকে মুখ ফেরাল, ‘আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।’

ঠিক তখনই নিচে মানুষের কথাবার্তা শোনা গেল। বুড়ি চিৎকার করে কাউকে কিছু বলছেন। যিনি লক্ষ্য তিনি চাপা গলায় কিছু জবাব দিতে চাইছেন। ওরা চারজন চুপ করে গেল। ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলে সুদীপ হাঁটু মুড়ে ছাদে চলে এল। তারপর ধীরে ধীরে কানিশের কাছে পৌঁছে সাবধানে উঁকি মারল উঠোনের দিকে। হাতে কয়েকটা খাম নিয়ে বুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন অবনী তালুকদার।

॥ ২২ ॥

অবনী তালুকদার বলছিলেন, ‘জন্মালে মরতে তো হবেই। কপালে যার যখন লেখা আছে তখন তাকে চলে যেতে হয়। আমি কি করতাম! আমি ভাল নার্স রেখেছিলাম, আয়া ছিল। এসব করতে তো কম পরস্যা খরচ হয়নি। আপনি খামোকা চেঁচাচ্ছেন।’

‘চেঁচাচ্ছি? আমি চেঁচাচ্ছি? তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না আমার। অমন সতীলক্ষ্মী বউটাকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল গো! আবার এসেছে তাঁর শ্রদ্ধের পিণ্ডি খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে। আমি কোথাও হাই না

এই বাড়ি ছেড়ে।' রুদ্ধা জানালেন।

'দেখুন, আপনি যাবেন না জানি। এই বাড়ি তো যথের মত পাহারা দিতে হবে আপনাকে। আমি বেশী লোক নেমন্তন্ন করছিও না। আপনাদের তরফে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি নিয়ম রক্ষার জন্যে। সেই কুলাঙ্গার থাকলে আমাকে আসতে হতো না।' অবনী তালুকদার এবার জোর করে খামটা রুদ্ধার হাতে গছিয়ে দিলেন।

রুদ্ধা বললেন, 'ছি ছি, একি ধরনের নেমন্তন্ন করা। এসব তুমিই পারো। টাকার পাহাড়ে বসে আছো, সব পোকায় কাটবে দেখে নিও। তা কুলাঙ্গারটি কে ?'

'তিনি যে অপদার্থটিকে রেখে গিয়েছেন পৃথিবীতে। কি লজ্জার কথা, আমার বাড়িতে দিনরাত পুলিশ আসছে! পাড়ার লোকজনের কাছে মুখ দেখানোর উপায় রইল না।'

'পুলিস আসছে কেন? নতুন করে আবার কি করলে? সেবার তো কারা এসে গয়নাগাটি নিয়ে গেছে জোর করে।' রুদ্ধা মনে করে বললেন।

'ওঃ, সেটাও তো ওই শ্রীমান করিয়েছেন। বাপকে বাঁশ দিতে হবে না? গোপনে গোপনে ইনকামট্যাক্সকে খবর দিয়েছেন যাতে বাপের কালো টাকা ধরা পড়ে। আরে আমি হলাম তোর বাপ। বনেদি রক্ত আমার গায়ে এটা তো মানেন? সব ছাড়িয়ে আনছি এক এক করে। তিনি তো হুমকি দিয়ে পার! ডাকাতি করছে, বুঝলেন? ডাকাতি। পুলিশ তাই আমার কাছে খুঁজতে এসেছিল। আমি সোজা বলে দিয়েছি, ও ছেলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যে আমার দু'লাখ টাকা চুরি করে হাওয়া হয়েছে, সে মরুক বাঁচুক আমার কিছু আসে যায় না!'

'দু লক্ষ!' রুদ্ধার চোখ বিস্ফারিত হল, 'সে দুলক্ষ টাকা পেল কি করে?'

উঁকি দিয়ে দেখছিল ছাদের কানিশে এসে সুদীপ। তার মনে হচ্ছিল লাফিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়ায়। সে দু লক্ষ টাকা চুরি করেছে? কাগজে সই করিয়ে হিসেব রেখে ওর এক তৃতীয়াংশ টাকা দিয়ে যে দায় চুকিয়েছে সে কি সহজে মিথ্যা বলছে। অনেক কণ্টে নিজেকে সংবরণ করেছিল সে। নিজেকে প্রকাশ করা মানে আত্মহত্যা করা। কিন্তু সেই সঙ্গে তার হাওগিরের চারপাশ কম্পন শুরু হয়েছিল। বুড়ি যদি বলে দেয় সে বন্ধুকে নিয়ে এখানে আছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে অবনী তালুকদার জানেনি খবরটা। জানলে অত নিশ্চিত হয়ে কথা বলতে পারত না। শোনামাত্র খানায় ছুটতো। অবনী তালুকদার তখন বলছে, 'আলমারিতে ছিল। একজনকে পেমেস্ট দেব বলে ব্যাংক থেকে তুলেছিলাম। আমাকে শ্মশান করে গিয়েছে সে।'

রুদ্ধা নিজের মনে বললেন, 'সে ডাকাতি করে?'

'মায়ের শিক্ষা! বুঝলেন! বেঁচে থেকে আমার হাড় জ্বালাতো এখন নিজের মত তৈরী করে একটি অপদার্থ রেখে গিয়েছেন। তা ইচ্ছে হলে যাবেন

নইলে আর কি করা যাবে! তাঁর আত্মার শান্তি চাই বলেই এইসব করছি। কথা শেষ করে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন অবনী তালুকদার।

হঠাৎ রুদ্ধা শব্দ গলায় বললেন, 'শোন তোমার মুখে পোকা পড়বে। মরবার সময় এক ফোঁটা জল দেবে না কেউ গলায়। অমন সোনার মেয়ের নামে যে কুৎসা করে তার কখনও শান্তি হবে না। মোটেই বিশ্বাস করি না তোমার কথা। ও ছেলে কখনও ডাকাতি করতে পারে না। তুমি মিথ্যে বদনাম দিচ্ছ। দূর হও এখান থেকে।'

অবনী তালুকদারের চোখ জ্বলে উঠল, 'আপনার বাড়িতে এসেছি ভদ্রতাবোধে। অনর্থক আমাকে অপমান করছেন আপনি। এই আমার শেষ আসা। তবে আপনাকে বলে দিচ্ছি সে যদি এখানেও আসে তাহলে পুলিশে খবর দেবেন।'

আর দাঁড়ালেন না অবনী তালুকদার। শুধু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রুদ্ধা। সুদীপ উঠে দাঁড়াল। গলি থেকে অবনী তালুকদারের গাড়িটা বেরিয়ে গেল। এক পলকে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিল সুদীপ। একবার ঘরের দিকে তাকাল। বন্ধদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনার দরকার নেই। সে সোজা নিচে নেমে এল। রুদ্ধা তখনও একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। তাঁর কোরা খান আরও বিষণ্ণ করে তুলেছিল তাঁকে। সুদীপকে দেখতে পাওয়া মাত্র তিনি দ্রুতবেগে ভেতরে চলে গেলেন উল্টো দিকে মুখ করে। সুদীপ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে প্রথমে সদর দরজাটা বন্ধ করল। তারপর বারান্দায় উঠে সোজা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। একটা সাবেকী আমলের খাট। ঘরে তেমন আসবাব নেই। রুদ্ধা সেই খাটে বসে আছেন মুখ ফিরিয়ে। সুদীপ পাশে দাঁড়াল। 'বাবা আপনাকে যা বলে গেল তা আমি শুনেছি। আপনি যদি ওসব কথা বিশ্বাস করেন তাহলে আমরা এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' কথাটা বলেই সুদীপের খেয়াল হল। বুড়ি যদি চিৎকার করে তাদের চলে যেতে বলে, যদি অবনী তালুকদারের অভিযোগ গুলো আওড়াতে থাকে তাহলে দেখতে হবে না। ডায়মণ্ড হারবার রোড পর্যন্ত তাদের পৌঁছতে হবে না আর। কিন্তু তার কথার উত্তরে রুদ্ধা কিছুই বললেন না। তাঁর ভঙ্গীরও কোন পরিবর্তন ঘটল না। সুদীপ কি করবে বুঝতে পারছিল না। এই আশ্রয়টুকু সে কিছুতেই হারাতে চাইছিল না। অথচ ওই প্রমাণটির উত্তর না পেলে এখানে থাকটা মোটেই নিরাপদ নয়। সে আবার জিজ্ঞাসা করল 'আমি কি করব বলে দিন!'

হঠাৎ রুদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন, 'আমারই মাথায় গোলমাল নইলে ডিম আনাই। আমার বাড়িতে বসে মায়ের কাজ করতে হবে। ছেলে বেঁচে থাকতে সে যদি কাজ না করে তাহলে মা কখনও শান্তি পায় না। অবনী যাই বলুক তাতে আমার কিছু আসে না। সে শ্রদ্ধানুষ্ঠান করছে, না করুণা করছে তা সে-ই জানে। মেয়েটাকে আমি ভালবাসতাম। কেউ যদি ডাকাতি করে

কিংবা বাপের টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আমি আশ্রয় দেব না। কিন্তু ওই মেয়ের ছেলে বলেই থাকতে দিয়েছি। মনে থাকে যেন।’ কথাগুলো বলে তিনি তাঁর রান্নাঘরে ঢুকে ডিমগুলো বের করলেন। বোঝাই মাছ ছিল হয় ফেলে দেবেন নয় কাউকে দিয়ে দিতে চান।

সুদীপ চটপট বলল, ‘ঠিক আছে, এখন যদি ডিম খেলে আপত্তি থাকে তাহলে পরে খাওয়া যাবে। কিংবা আমার বন্ধুরা তো কোন দোষ করেনি, ওদের মা-ও মারা যায়নি, ওরা তো খেতে পারে।’

রুহা দাঁড়ালেন। প্রস্তাবটা যেন তাঁর অপছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত ডিমের প্যাকেটটা মাছিতে নামিয়ে রেখে ফিরে যেতে যেতে বললেন, ‘যে খাবে থাক। আমি রাখতে পারব না। আমার বাড়িতে কাজ হবে আর আমি ডিম রাখব?’ আপাতত ঝড় উঠল না। সুদীপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ডিমের প্যাকেটটা তুলে উপরে উঠে এল। ওকে দেখা মাত্র আনন্দ জিত্তাসা করল, ‘কি হয়েছে?’

ওদের উদ্ভিষ্ট মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে সুদীপ বলল, ‘কেস খুব সিরিয়াস। অবনী তালুকদার এসেছিল শ্রদ্ধার নেমস্তম্ব করতে। আমার নামে বহু স্টোরি বলে গেল। ওসবের একটা যদি বুড়ি বিশ্বাস করে তাহলে এখান থেকেই আমাদের থানায় যেতে হবে।’

‘সে কি!’ কল্যাণ প্রায় সাদা হয়ে গেল, ‘অবনী, মানে তোর বাবা, আমাদের এখানকার খবর জেনে গেছেন?’

‘খুব কপাল জোর বুড়ি তাকে কিছু বলেনি। আশ্চর্য জালি পাটি মাইরি, নেমস্তম্ব করতে এসে বলছে না গেলেও চলবে। জরী, ডিমগুলো নে। বুড়ি আমাদের জন্যে আনিয়েছিল। মায়ের কাজ না হওয়া পর্যন্ত আর ছোঁবে না। দেখব তুই কি রকম ডিমের কারি করতে পারিস। চা বানিয়েছিস?’ সুদীপ সিগারেট ধরালো।

জন্মিতা চুপচাপ সুদীপের কথাগুলো শুনছিল। ও যথাবে চুপচাপ নেমে গেল তাতেই ওদের উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছিল। একটা লোক এসে রুহার সঙ্গে কথা বলছে উত্তেজিত ভঙ্গীতে, এইটে স্বস্তিদায়ক ছিল না। কিন্তু এখন সুদীপের কথার ধরনে ওর সর্বাস্ত জ্বলে গেল। সে সোজাসুজি জিত্তাসা করল, ‘সুদীপ, এখানে আরও দুজন বসে আছে। শুধু আমাকে কেন জিত্তাসা করলি ডিমের কারি রাখতে কেমন পারি?’

সুদীপ একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর হেসে বলল, ‘তুই স্টোডটার কাছাকাছি বসে আছিস, তাই!’

জন্মিতার তৌঁট বঁকে গেল, ‘সত্যি কথাটা বলার সাহসটুকু তোদের নেই। রান্নার ব্যাপার হলেই মেয়েদের ওপর হুকুম চালাতে হবে, না? তোর মা পিসী, দিদি হয়তো, জন্মেছিলেন যখন তখন তাঁদের বাধ্য করা হয়েছিল।’

ঠাকুরের কাজ করতে। সেই অভ্যেসটা তোদের রঞ্জে রয়ে গেছে। কিন্তু খাওয়াটা যখন তোর আমার সমান প্রয়োজন তখন খাবার তৈরী করার দায়িত্ব দুজনেরই। আজ ডিমটা তুই রান্না করবি, আমি চা করছি।’

আন্দন হেসে ফেলল। কথাগুলো কল্যাণকে সুখী করল না। সুদীপ বলল, ‘আমি কোনদিন রান্না ঘরে ঢুকিনি।’

জয়িতা চায়ের ব্যবস্থা করতে করতে উত্তর দিল, ‘তুই এর আগে কখনও মানুষ মারিসনি কিংবা বোমা ছুঁড়িসনি। সরি, সংশোধন করছি, মানুষ নয়, তুই অমানুষ মারিসনি! অর্থাৎ কখনও করিনি বলে করা যায় না তা ঠিক নয়।’

আন্দন বলল, ‘কেন ওকে এমন বলছিস জয়ী। একেই বেচারার ওপর সব চেয়ে বেশী চাপ পড়ছে।’

সুদীপ হাত তুলল, ‘মাইরি, এই বয়স অবধি সংসারের জন্যে যা করিনি দুদিনে তার চেয়ে বেশী করলাম। তুই চিন্তা কর, বাজার করে বাড়ি নিয়ে আসছে আমার মত ছেলে।’

জয়ী বলল, ‘নিজেদের জন্যে কিছু করলে যদি মান যায় তাহলে—।’ সে কথাটা শেষ না করে নীরত্ত্ব হাসল। তারপর চা ঢালতে ঢালতে বলল, ‘এখনও যখন রাস্তায় বুড়ো ভামগুলোকে মহিলাদের মেয়েছলে বলে অ্যাড্রেস করতে দেখি তখন ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে করে। একটা ছেলে প্রেম করার সময় যে সম্মান মেয়েটিকে দেয় বিয়ের পর কিন্তু বিনা মাইনের ঝি-কাম ঠাকুর ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। ইন্দিরা গান্ধী প্রাইম মিনিষ্টার হওয়ার পরও এক ফোঁটা পাল্টায়নি এই মানসিকতা। ও ডিমগুলো নিয়ে এসে বলতে পারত, আমাদেরই রান্না করে খেতে হবে। কিন্তু বলল, ‘দেখব কিরকম ডিমের কারি করতে পারিস!’ একটু তাতানো ব্যাপার আছে। যেন আমি তেতে গিয়ে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করব। তাতে রান্নার প্রব্লেমটা মিটবে। তুই-ভাব কত ঝড় চালাবি। যতই প্রগতির কথা বলিস সুদীপ মেয়েদের ব্যাপারে তোদের মনে একটাই ক্যাসেট ফিট করা আছে।’

চা ভাগ করে সে তিনজনকে দেয়। সবাই চুপচাপ সেটা খাচ্ছিল কিন্তু সুদীপ হাসল, ‘এটা খুব জেনুইন, আমি না বলে পারছি না। তুই যা মনে করিস করতে পারিস।’

‘প্যাস্পারিং কথা একদম বলবি না সুদীপ। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট!’ জয়িতা সুখ ফিরিয়ে চায়ের চুমুক দিতে গেল প্রথমবার।

সুদীপ বলল, ‘আমি জানি না এটাকে ঠিক প্যাস্পারিং কথার মধ্যে ফেলা যায় কিনা।’ সবাই ওর দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকাল। কল্যাণের ঠোঁটের সঙ্গে আন্দনের ঠোঁটের অভিব্যক্তির মিল দেখে খুশী হয়ে সুদীপ উচ্চারণ করল, ‘পৃথিবীর সবচেয়ে নিরুচ্চ চায়ের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য দেবার জন্যে নির্মাতা হিসাবে তুই আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর।’

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ গলা ফাটিয়ে হেসে উঠতেই আনন্দ চাপা গলায় ধমকে উঠল,
‘অ্যাঁই, আস্তে!’

সত্যি চা খাওয়া যাচ্ছিল না। রাগ মিলিয়ে গিয়ে ক্রমশ লজ্জা আচ্ছন্ন করল জয়িতাকে। অন্যের জন্যে না হোক নিজের জন্যেও তো লোকে একটু ভাল করে চা করতে শেখে। এমন লাউজি চা সে জীবনে খায়নি। এই বলস পর্যন্ত তাকে কেউ রান্নাঘরে যেতে বলেনি, তার নিজেরও প্রয়োজন হয়নি। সে ঠিক করল এর পরের বার সিরিয়াসলি ভাল চা করবে। কল্যাণ এবং আনন্দ খানিকটা খেয়ে নামিয়ে রেখেছে কিন্তু সুদীপ পুরোটা শেষ করল। এইটেতেই রাগ হল আবার জয়িতার। স্নেহ বদমাইসি। ওকে টিজ করার জন্যে সুদীপ পাঁচনটা খেল। যা নিজে জয়িতা খেতে পারছে না তা ফেলে দিলেই সে খুশী হত। সুদীপের পুরোটা খাওয়া যেন তাকে যন্ত্রণা দেওয়া। সে পাঁত্রটা রেখে সুদীপকে বলল, ‘কখনও উদারতা দেখানো খুন করার চেয়ে বড় অপরাধ, বুঝলি!’

‘বুঝলাম!’ প্যাকেট থেকে কল্যাণ আর জয়িতাকে দুটো সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে সুদীপ বলল, ‘আনন্দ, একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অবনী তালুকদারের সঙ্গে কথা বলার পর বুড়ির মাথায় ঢুকছে যে মায়ের কাজটা আমাকে এখানেই করতে হবে। ইটস সামথিং!’

কল্যাণ অবাক হল, ‘সামথিং কেন? মায়ের কাজ করতে অসুবিধে কোথায়!’

সুদীপ সোঁটি কামড়ান, ‘প্রথমত, আমি মনে করি না শ্রদ্ধ করলেই একটি মৃত মানুষ শান্তি পাবেন। দ্বিতীয়ত, যে মানুষটার কষ্ট জীবিত অবস্থায় দূর করা আমার সাধ্যাতীত ছিল বলে এড়িয়ে গেছি, সেই মানুষটির শ্রদ্ধ করে শান্তির ব্যবস্থা করা আমি অপরাধ বলে মনে করি।’

কল্যাণ বলল, ‘কিন্তু তোর কোন সংস্কার না থাকতে পারে, বুড়ির হয়তো আছে।’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘সে থাকুক। কিন্তু আমি তো এর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি। অবনী তালুকদার যে খান্দায় তার স্ত্রীর কাজ করতে যাচ্ছেন আমার কাজ করা তা থেকে কি খুব আলাদা?’

এই প্রশ্নের জবাব চট করে কেউ দিল না। শেষ পর্যন্ত জয়িতা বলল, ‘ঠিক আছে, তাহলে রাজী হোস না।’

‘রাজী না হলে হয়তো ছাদের এই ঘর আমাদের ছাড়তে হবে। অবনী তালুকদার বুড়িকে বলে গেছে, আমরা ডাকাত, পুলিশ খুঁজছে। বুড়ি সে কথা বিশ্বাস করেছে কিনা জানি না। কিন্তু ওর এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে কিছুতেই সহ্য করবে না। শালী, উত্তম সংকট। নেমস্তন্ন না করতে আসলে যেন চলছিল না!’

এবার আনন্দ বলল, ‘দ্যাখ সুদীপ, তোর বিবেক যা বলবে তুই তাই কর।’

সুদীপ কিছু বলল না। ও চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে ওর তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ঠিক তখনই সিঁড়িতে গলার শব্দ পাওয়া গেল, 'এই যে, নিচে একটু আসলে কি মান যাবে? যত ঝামেলা আমাকেই কি করে খুঁজে পায় কে জানে!'

আনন্দ বলল, 'তাড়াতাড়ি যা নইলে ওপরে উঠে আসবে।'

সুদীপ সিগারেটটা নিবিয়ে উঠে পড়ল। সিঁড়ির তিনটে ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে ছাদের দিকে তাকিয়েছিলেন বুদ্ধা। সুদীপকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আমি একটু ঠাকুরবাড়িতে যাব, পুরুতকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কি কি করা উচিত। দরজাটা বন্ধ করবে, নাকি তোলা দিয়ে যাব? চোর ছ্যাঁচোড়ের উৎপাত চারধারে, আমি বেরুচ্ছি দেখলে সবার জিভ দিয়ে জল ঝরবে।'

সুদীপ বলল, 'ঠিক আছে, আমি ভেতর থেকেই বন্ধ করে দিচ্ছি।' সুদীপ নেমে এল।

বুদ্ধা বললেন, 'কেউ এলে বলবে দুঘন্টা পরে ঘুরে আসতে।' বুদ্ধা উষ্ণ আবহাওয়াতেও গায়ে চাদর রেখেছে। এই পোশাকে তাঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। দরজা খুলে বের হবার আগে বুদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দ্যাখো বাপু সব তোমার ওপর জিম্মা রেখে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরিও না আর চোখ কান খোলা রেখ।'

বুদ্ধা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে সুদীপ উঠোনের মাঝখানে চলে এল। এর মধ্যেই বাঁটি দিয়ে সিগারেটের টুকরোগুলো সন্নিয়ে ফেলা হয়েছে। বুড়ি যা চাইছে তা করলে এখানে আরও কয়েকটা দিন থাকা যাবে! কারও শ্রদ্ধ করার সময় তো মাথা কামিয়ে ফেলতে হয়। ন্যাড়া হলে তাকে চেনা যাবে? এখনই খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে তার মিল পাওয়া বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তার ওপরে মাথা কামালে আর কোন চান্স থাকবে না। অবনী তালুকদার রাজী হয়েছেন কাজ করতে চক্ষু লজ্জার ভয়ে। কিন্তু তাকে রাজী হতে হবে আত্মরক্ষার জন্যে। সুদীপ সিগারেট ধরাল আবার। এই কদিন খুব ঘন ঘন সিগারেট খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এই সময় পেছনের দরজায় শব্দ হল। কেউ ওখানে ধাক্কা দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। এগিয়ে গিয়ে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কি চাই?'

ওপাশ থেকে মহিলাকণ্ঠে জানান এল, 'দিদিমাকে একটু ডেকে দিন তো! নিমপাতা নেব।'

'দিদিমা নেই। দুঘন্টা পরে ডাকলে পাওয়া যাবে।' সুদীপ এড়াতে চাইল। 'দুঘন্টা পরে আবার উনুন জ্বালবে কে? দুটো নিমপাতার জন্যে দুঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে? দরজাটা খুলে দিলেই তো হয়, কয়েকটা ছিঁড়ে নিয়ে আসি। আমি তো চোর ডাকাত নই, একি রে বাবা।' মহিলা হেসে উঠলেন।

সুদীপ বুঝতে পারল সকালে যে ডিম দিয়েছিল সেই এখন নিমপাতা চাইছে।

এই অবস্থায় কি করা উচিত? দরজা না খুললে কি সম্ভব করবে? পুকুর থেকে তো ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। নিমপাতা নিয়ে চলে গেলে তো বাসেলা চুক যাবে। সে এগিয়ে হড়কো খুলতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল। হাতকাটা নীল জামা, নীল শাড়ি, খোলা চুলে যেভাবে তাকাল তাতে রহস্যময়ী শব্দটাকে মনে পড়ল সুদীপের। খোলা দরজা দিয়ে পা ফেলে ভেতরে চুকে মেয়েটি নিমগাছের নিচে দাঁড়াল। কোমরে হাত রেখে ওপরের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'ডালগুলো অত ওপরে চলে গেল কি করে?'

সুদীপ দেখল নিমগাছের ডালগুলো মেয়েটির নাগালের বাইরে। এখন অবশ্য আর ওকে মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। শরীর যে কোন সুখী যুবতীর মত ভারী। সে বলল, 'নিমপাতা পাড়তে হলে একটা বাঁশ দরকার!'

'তাই?' যুবতী যেন হেসে ভেঙে পড়ল। তারপর কোনরকমে নিজেকে সামলে বলল, 'আপনি বাঁশটা আনবেন? দিন না দুটো নিমপাতা পেড়ে, বেগুন দিয়ে ভেজে খেতে যা ভাল লাগে!'

সুদীপ হাসিটাকে অগ্রহা্য করল। তারপর চারপাশে তাকাল একটা কিছুই জন্মে। সে মাথা নাড়ল, 'না, কিছুই তো দেখছি না!'

'আপনি গাছে উঠুন না। মই লাগবে?'

'উঠলে তো মইটা কেড়ে নেবেন!' সুদীপের রসিকতা করার লোভ হল।

'ওমা তাই বুঝি, এত জানেন! দিদিমা কোথায় গেলেন?'

'জানি না। দুঘন্টা পরে ফিরবেন বলে গেছেন!'

'ওমা। তাহলে আমার নিমপাতা খাওয়া হবে না?'

'অন্য কাউকে বলুন পেড়ে দিতে!'

'আমার কথা কে শুনবে বলুন। কর্তা গেছেন চাকরিতে, ফিরতে ফিরতে সেই রাত। ততক্ষণ আমি একদম একা!'

এইবার বিরক্ত হল সুদীপ। এমন ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনে তার একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। সুদীপ বলে ফেলল, 'আপনার নোকের অভাব আছে বলে মনে হয় না। পুকুরধারে ঘুরে আসুন না!'

গালে হাত দিল যুবতী, 'ওমা এত হিংসে! ও ছোঁড়া আমাকে ওখানে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একটা গল্প বলতে!'

'গল্প বলতে? আর জায়গা পেল না!' সুদীপ হাসল।

'কি করব বলুন! আমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটের কান জানেন না তো! আমি কিছু করলেই দিদিমাকে লাগায়। সেই গল্প যদি কানে যেত তো হয়ে গিয়েছিল আর কি?'

'কিসের গল্প?' সুদীপ সূত্রটা বুঝতে পারছিল না।

'ওই যে প্যারাডাইস বলে যে জায়গাটার আশুন লাগল, কাগজে পড়েননি? সেই জায়গায় তিক কি কি হত তার গল্প। বাবা, শুনেই আমার শরীর গুলিয়ে উঠেছিল। ছ্যা! আপনি ভাবলেন ওর সঙ্গে আমার বুঝি খু-উ-ব! ধ্যাৎ!'

ওতো আমার হাটুর বয়সী। আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?’

‘দেখি! ছুটি ফুরিয়ে গেলেই চলে যাব।’

‘কতদিনে ছুটি ফুরাবে? আপনি এখানেই থেকে যান না, দিদিমার বয়স হয়েছে, একা থাকা ঠিক না।’

‘এখানে থেকে আমার লাভ কি!’ প্যারাডাইসের কথাটা শোনামাত্র বুক টিপটিপ করছিল সুদীপের।

‘লাভ? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আগে দেখুন আপনার ইচ্ছে আছে নাকি। আর উপায় হলে দেখবেন এত লাভ হবে সামলাতে পারবেন না। আপনি ছাদের ঘরে থাকেন, না?’

‘হ্যাঁ।’

‘পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনি নিমপাতা পেড়ে দিলেন না, কি নিশ্চুর আপনি। চলি।’ একরাশ হাসির শব্দ ছড়িয়ে মেয়েটি চলে গেল। এরকম যুবতীর গল্প একমাত্র উপন্যাসেই পাওয়া যায় বলে ধারণা ছিল সুদীপের। শরৎচন্দ্রের ফিরণময়ী কি এই রকম? এই ঠারেরুঁরে কথাবার্তা, অকারণ হাসি, কথার চেয়ে চোখ আর ঠোঁটের ব্যবহারে বেশী অর্থ বোঝানো। অথচ এই যুবতী বিবাহিতা। গতকাল আর একটি পুরুষের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখাও গেছে। একেই কি আগের যুগের মানুষ কুলটা বলত? মেয়েরা কখন কেন এমন হয়? এই আচরণে যখন শিক্ষার পালিশ লাগে, বুদ্ধির ব্যবহার হয় এবং বিত্তের সম্মান জোটে তখনই যুবতীরা প্যারাডাইসের সদস্যা হয়ে যায়, কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে বয়স্কের পরিচয় হয় অথবা কাজের অছিলায় দার্জিলিং-এ বেড়াতে যায় নিজস্ব ‘মানুষের’ সঙ্গে। রাগ হল না, বরং এই ধরনের কণ্টবোধ হল যুবতীর জন্যে। কোথাও নিশ্চয়ই একটা ছোট্ট ফাঁক ছিল। সেটাই ওষুধের অভাবে বড় হতে হতে একটা অতল খাদ হতে চলেছে।

দরজাটা বন্ধ করে সুদীপ ওপরে উঠে এল। ছাদের মাঝখানে দাঁড়ালে আশেপাশের বাড়ি তেমন দেখা যায় না গাছগাছালির জন্যে। কিন্তু তার নজর পড়ল নিমপাতাগুলোর ওপর। গাছটা ছাদের কানিশ ঘোষে ওপরে উঠছে। এখান থেকেই হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। ওই তেতো পাতা কারও কাছে এত লোভনীয় যা নিতে সব সময় রসের ফোয়ারা ছোটে? গণ্ডীর বাইরে গেলেই কত কি দেখা যায়!

জয়িতা ঠোঁট টিপে হাসছিল। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করছিল, ‘কেসটা কি?’ সুদীপ বলল, ‘বড়িকে বলে দিলাম রাজী আছি। বড়ি যা চাইছে তা করতে দিলে কদিন এখানে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। তাছাড়া আমি ভাবছি কাজ করলে নিশ্চয়ই মাথা কামাতে হয়। আর সেটা করলে অবনী তালুকদার পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারবে না।’ সুদীপ আড়চোখে স্টোভের দিকে তাকাল। ওটা নেবানো।

জন্মিতা বলল, 'এতক্ষণ আমরা চল্লিশ দশকের রেডিও নাটক শুনছিলাম। তোর নাগ্নিকা দেখতে কেমন রে?'

'মানে?' সুদীপ হকচকিয়ে গেল।

'বাঃ, এমন ন্যাকামি করিস না, এইসব অ্যাক্টিং ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে ভাই।' জন্মিতা মন্তব্য করল।

'কি আশ্চর্য!' ইউ শুভ নট হাউজ দিজ ল্যান্সুয়েজস! ওই মহিলা যদি নিমপাতা চাইতে আসেন তাহলে আমি কথা বলতে বাধ্য। তা না হলে সোজা ছাদে উঠে নিমপাতা পাড়তো, সেটা নিশ্চয়ই সেফ ছিল না।'

'চট্‌হিস কেন? কলেজে তো প্রচুর মেয়ের সঙ্গে কথা বলতিস। তখন ঠাট্টা করলে চট্‌তিস না।'

'প্রত্যেকটা জিনিসের একটা লিমিট আছে। এই মহিলা বিবাহিতা।'

এবার কল্যাণ বলল, 'তাই? ডায়ালগ শুনলে একদম বোঝা যায় না মাইরি। ডেঞ্জারাস।'

আনন্দ বলল, 'ওয়েল বয়েজ। প্রচুর হয়েছে। তবে এই মহিলাকে এড়িয়ে যাওয়াই আমাদের মঙ্গল। যাক, আয় এবার কাজের কথা বলি। আজ রেস ডে। আমাদের একজনের রেসকোর্সের সামনে যাওয়া উচিত। রেসকোর্সের ভেতরে ঢুকবো না। পুলিশ নিশ্চয়ই সেখানে ওয়াচ করবে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পাক খাবি। ট্যাক্সি ড্রাইভার যেন সর্দারজী হয়। সর্দারজীরা বাংলা ইংরেজী কাগজ পড়বে না বলে মনে হয়। তারপর একটা নির্জন টেলিফোন বুথ থেকে প্রত্যেকটা মেজর খবরের কাগজকে টেলিফোনে জানাতে হবে যেসব মানুষ বুঝতে পেরেছেন আমরা যা করতে চলেছি তাতে আমাদের একমাত্র স্বার্থ এদেশটা বাসযোগ্য করা। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা তাদের অনুরোধ করছি এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতে।'

জন্মিতা জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যাব?'

সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না। একটা কেলেকারী না বাধলে আর তোমার চলছে না। কখন বের হব?'

'তুই যাবি?' আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। তোর এখন থেকে বের হওয়া উচিত হবে না। আমি যাওয়া আসা করতে করতে পাড়ার লোকের চোখ-সওয়া হয়ে গেছি। একটা নাগাদ বের হলেই হবে, না?'

'হ্যাঁ। কাগজে লিখেছে রেস আরম্ভ বেলা দুটোয়। বুড়ি কোথায় গিয়েছে?'

'পুরুতের কাছে।'

'তাহলে কল্যাণ, তুই আর জন্মি চট করে স্নান সেরে আয় না নিচ থেকে। তাহলে আর ওপরে বেশী জল আনতে হয় না। সুদীপ তুই লক্ষ্য রাখ বুড়ি আসছে কিনা।' আনন্দ বলল। এই সাত সকালে স্নান করতে ওদের মন ছিল না। কিন্তু কিছু করার যখন নেই তখন স্নান করা ভাল। জন্মিতা

কল্যাণকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নিজে স্নান করতে পারবি? চল, আমি জল তুলে দিচ্ছি।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল কল্যাণ। এক হাতে প্লাস্টার নিয়ে স্নান করা সত্যিই অসুবিধাজনক। কিন্তু সাহায্য করার প্রস্তাবটা যে জমিতার কাছ থেকে আসবে তা অনুমান করতে পারেনি। সে চট করে বন্ধুদের দিকে তাকাল। কারো মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। এবং তখনই নিজেকে খুব ছোট মনে হল তার। জমিতাকে সে এখনও মনে মনে একটি মেয়ে ভেবেই যাচ্ছে। এই ভাবনার কথা জমিতা জানলেও প্রচণ্ড ক্ষেপে যাবে। কল্যাণ বোঝে উত্তর কলকাতার নিশ্চিন্দমাধ্যমিত পাড়ায় আজন্ম কাটিয়ে তার মধ্যে যেসব সংস্কার শিকড় ছাড়িয়েছে সেগুলোকে টেনে ওপড়ানো সত্যিই সহজসাধ্য নয়।

ওরা নিচে নেমে গেলে আনন্দ আবার কাগজে চোখ রাখল। সুদীপ কাগজগুলো আনবার পর থেকে সে প্রতিটি খবর খুঁটিয়ে পড়েছে। কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ টাকা কাজ না করায় ফেরৎ গেছে, কেন্দ্রের কাছে অন্য খাতে টাকা চেয়ে রাজ্য বঞ্চিত হচ্ছে, সরকার তার স্বার্থানুযায়ী চলছে, কংগ্রেসীরা প্রকাশ্যে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে। এছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ না থাকলেও একটি ছোট্ট খবরে তার চোখ আটকালো। কলকাতার একজন বিখ্যাত স্মাগলার বিশেষ এলাকায় সাম্রাজ্য তৈরী করছে। সেই সাম্রাজ্যে বিদেশী নাগরিকরা পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই আশ্রয় পেয়েছে। এই স্মাগলারটি মাঝে মাঝে কলকাতার দাঙ্গা সৃষ্টি করে। এক একটি দাঙ্গার পরিণতিতে তার এলাকার বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়ি ফাঁকা হয়ে যায়। সেই বাড়িগুলো লোকটি বেশী টাকায় ভাড়া দিয়ে থাকে। সরকার এসব তথ্য জানেন। স্থানীয় দুটো থানার সঙ্গে লোকটির দারুণ ভাব-ভালবাসা আছে। এটা থাকার কারণ, একজন প্রগতিবাদী মন্ত্রী নাকি লোকটির গড়ফাদার হয়ে আছেন। তাঁকে নির্বাচিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে স্মাগলারটি। খবরটা বেরিয়েছে যে কাগজে তার পরিচয় এবং প্রচার খুব বেশী নয়। খবরটা পড়ার পর থেকেই আনন্দের মাথায় অনেক কিছু পাক খাচ্ছিল। প্রথম কথা, এই খবরটা সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, প্যারাডাইস অপারেশনে নামবার আগে সে পরবর্তী কার্যক্রমের তালিকা করেছিল। সেই তালিকানুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না কোন বিপদ ঘটে। সেই তালিকায় একজন মন্ত্রীর নাম ছিল। তিনি গত চার বছরে প্রায় খোলাখুলি ঘুম নিয়েছেন তাঁর পার্টির নাম করে। সেই টাকা পার্টির নাম করে নেওয়া যেমন বেআইনী তেমনি সেই টাকা তিনি পার্টি ফাণ্ডে জমা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ ভদ্রলোক প্রতিটি জনসভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন, বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুঁজিপতি এবং শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। এই লোকটির মুখোশ খুলে দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিল তারা। আনন্দ এখন উত্তেজিত হচ্ছিল এই দেখে যে ওই মন্ত্রী যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হন

সমাগলারটির সাম্রাজ্য সেখানেই।

আজ দুপুরেও নিরামিষ তরকারী আর ভাত। যদিও স্টোভে ডিম সেদ্ধ করা হয়েছিল বলে সুদীপ একটু খুশী হয়েছিল কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। রুদ্রা সত্যিই চমৎকার রান্না করেন। এখনও তিনি জানেন না তাঁর ছাদের ঘরে কজন রয়েছে। তিনি যে ওপরে ওঠেন না এটাই সৌভাগ্য। আজও নিচ থেকে খাবার ওপরে আনাবার ব্যাপারে সুদীপকে ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে হয়েছে। আনন্দের অনুমান, রুদ্রা সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। সে সুদীপকে বলেছে জন্মিতার কথা না বলে রুদ্রাকে জানিয়ে দিতে তারা কজন ওপরে আছে। এতে আর যাই হোক ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক পরিষ্কার থাকবে। উনি যখন অবনী তালুকদারকে কিছু জানাননি তখন এটা শোনার পর বিপদের সম্ভাবনা আধা আধি। সুদীপ রাজী হয়েছে। ও বিকেলবেলায় বুড়িকে বলবে।

ঠিক একটায় সুদীপ বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় জন্মিতা বলল, 'সাবধানে হাস কোন ঝুঁকি নিস না।'

সুদীপ হেসে বলেছিল, 'আমার কখনও বিপদ হবে না। কারণ বিপদটাকে আমি কখনও বিপদ মনে করি না।'

'খাওয়া, গল্প করা এবং ঘুমানো। এছাড়া আর কোন কাজ নেই। এমন কি ওই ছাদে দাঁড়ানোর উপায় নেই।' আনন্দ বৃষ্টিতে পারছিল জন্মিতা এবং কল্যাণ ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠেছে। এই ঘরটাকে জেনখানা না ভাবার কোন কারণ ওদের নেই। সে নিজেও একঘেয়েমির শিকার হচ্ছিল। এইভাবে বেশীদিন এই ঘরে আটকে থাকা সম্ভব হবে না। কিন্তু কলকাতা শহরের কোন পথ তাদের জন্যে নিরাপদ নয়। সে অনেক চিন্তা করেছে। কেউ তাদের আশ্রয় দিতে সাহস পাবে না। অথবা দিলেও তারা নিজেদের নিরাপদ বলে মনে করবে না। একটা ব্যাপার ওর কাছে খুব চমকপ্রদ মনে হচ্ছে। বড় বড় খুনের অপরাধীদের এখনকার পুলিশ ইচ্ছে করলেও খুঁজে বের করতে পারে না। অথচ কত দ্রুত ওরা সন্ধান পেয়ে গেল এই ক্ষেত্রে। কলকাতার পুলিশ এত তৎপর হবে সে কল্পনা করেনি। বোঝাই যাচ্ছে চাপ আসছে ওপর থেকে যাদের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে এই রকম অপারেশন একটার পর একটা চললে।

কিন্তু আপাতত কিছুদিন পুলিশের খাবার বাইরে যাওয়া দরকার। গত একবছর ধরে এই রকম একটা জায়গা খুঁজেছে সে যেখানে অজ্ঞাতবাস করা যায়। মোটামুটি একটা ছক করে নিয়েছে সে। যদি জায়গাটা ঠিক পৌঁছানো যায় তাহলে আর যাই হোক অন্তত ভারতীয় পুলিশের ভয় থাকবে না। বেশ কিছুদিন কাটানোর পর যখন এদিকের হাওয়া শান্ত হয়ে আসবে, আর নতুন বামেলায় পুলিশ ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখন আবার ফিরে আসা যাবে। কিন্তু সেই গন্তব্য-স্থানটিতে যেতে অনেক দূরত্ব পার হতে হবে। চারজন একসঙ্গে গেলে আর পৌঁছাতে হবে না। দুটো দলে ভাগ হয়ে তাদের যেতে হবে। কিন্তু যাওয়ার

আগে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় ইংরেজী উপন্যাসটি পড়ছিল জন্মিতা। কল্যাণ পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। আনন্দ ডাকল 'জয়ী, তোরা ঘন্টা তিনেক একা থাক। আমি বাইরে থেকে শেকল টেনে যাচ্ছি, সাড়াশব্দ করিস না।'

'কোথায় যাচ্ছিস?' জন্মিতা বইটা সরিয়ে রাখল।

'একটু চক্কর মারতে।' আনন্দ সেই মন্ত্রী নাম করল, 'এই কাগজটা পড়ে দাখ। আমার তো মনে হচ্ছে একই লোক। ওই এলাকা থেকে তো আর কেউ মন্ত্রী হয়নি।'

জন্মিতা আগ্রহ নিয়ে চোখের সামনে ধরল। আনন্দের দেখানো অংশটিতে চোখ বোলাতে তার বেশী সময় লাগল না। তার মুখ চোখ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'লোকটা আমাদের লিস্টে নয় নম্বর ছিল, না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওর প্রমোশন হল। তিন নম্বরটা ওর ভাগ্যেই জুটল। আমি তবু হালচাল দেখে আসি।'

জন্মিতা তখনও ভাবছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে কিছু লোক চিরকাল মুনাফা লোটে। কিন্তু একটি প্রগতিবাদী বলে দাবী করা সরকারের সঙ্গে যুক্ত থেকে একজন যে তাই করে যেতে পারে এবং প্রশ্রয় পায় সেটা ভাবতে অসুবিধে হয়। লোকটা চোর ঘুমুখোর, এই অবধি জানা ছিল। কিন্তু—। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল আনন্দ যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। জন্মিতা বলল, 'আজকেই বের হবি? খবরের কাগজের ছবি মনে করে কেউ যদি তোকে চিনে ফেলে তাহলেই—। ঝুঁকি নিচ্ছিস কিন্তু।'

আনন্দ হাসল, 'না রে, বোকামি করব না। তুই নিশ্চিত থাক। সুদীপ যদি এর মধ্যে ফিরে আসে তাহলে ওকে ব্যাপারটা বলিস।' ঘরের বাইরে এসে শেকল তুলে দিল আনন্দ। এখন তার কোমরে রিভলবারটা গোঁজা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে দেখল রোদের তেজ কমে এসেছে। বারান্দার দিকে চোখ পড়তেই সে রুদ্ধাকে দেখতে পেল। বড় খালায় চাল নিয়ে কাঁকড় বাছছেন। পায়ের শব্দে চোখ তুলতেই আনন্দ বিনীত ভঙ্গীতে বলল, 'আমি একটু বের হচ্ছি। ডাক্তারের কাছে যাব।'

'ডাক্তার? কি হয়েছে তোমার? কি আশ্চর্য!'' রুদ্ধা উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলেন।

'তেমন কিছু নয়। বুককেমন ব্যথাব্যথা লাগছে। আসছি।'

'এসো। এ পাড়ায় তেমন ভাল ডাক্তার নেই। ও হ্যাঁ তোমাদের ঘরের শেকল টেনে দিয়েছো তো?'

'হ্যাঁ।'

একমাত্র প্রার্থনা রুদ্ধা যেন ওপরে না ওঠেন। মনে মনে বলল আনন্দ।

সে খানিকটা আড়ল্ট ছিল গল্পিতে হাটবার সময় রাস্তার লোকজন তার দিকে মোটেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছিল না। সে বাস স্ট্যাণ্ডে আসতেই ট্যান্ডি পেয়ে

গেল। প্রথমে ধর্মতলার একটি বিখ্যাত দোকানে পৌঁছাল সে। একটা ম্যাপ আর জায়গাটার বিস্তারিত বিবরণের জন্যে বই কিনতে প্রায় তিনশো টাকা খরচ হয়ে গেল। ইংরেজি বই-এর এত দাম! ম্যাপটা তাদের খুব সাহায্য করবে।

ট্যান্ডিটাকে ছাড়ল যেখানে সেখান থেকে স্মাগলারটির এলাকা মিনিট খানেক। কলকাতার এই বিশাল এলাকার মানুষের প্রথম জীবিকা বিদেশী দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্রয়বিক্রয়ের সাহায্য করা। স্মাগলারটি ওদের কাছে দেবদূতের মত। আনন্দ প্রথমে মার্কেটের সামনে পৌঁছে চারপাশে চোখ বোলাল। তারপর একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চমৎকার চা চাইল।

দোকানটা জমজমাট। শুধু চা চাইলে খুব পাশা দেবার মত সময় কর্মচারীদের নেই। আনন্দ একটা বেঞ্চিতে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। বেশীর ভাগ খন্দের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের। কথাবার্তা যা হচ্ছে তা ওই কেনাবেচা নিয়ে। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করেও সে চা পেল না এবং এমন কিছু তথ্য পেল না যা নিয়ে ভাবা যায়। শেষ পর্যন্ত আনন্দ উঠল। একটু ঝুঁকি নিতে হবে কিন্তু এছাড়া কোন উপায় নেই।

সে সোজা কাউন্টারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যে লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আপনি বলতে পারেন নানুভাই-এর বাড়িটা কোথায়?'

হঠাৎ লোকটার শরীর স্থির হয়ে গেল। মাছের মত চোখ তুলে আনন্দকে দেখল সে। তারপর স্পষ্ট হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি দরকার?' আনন্দ লক্ষ্য করল, শুধু দোকানদার নয়, খন্দেরদের অনেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। সে খুব শান্ত গলায় উত্তর দিল, 'নানুভাই-এর সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার খুব জরুরী প্রয়োজন।'

লোকটি রাস্তার উল্টোদিকটা দেখাল, 'ওই গলি দিয়ে চলে যান। মিনিট তিনেক গেলে জিজ্ঞাসা করবেন।'

আনন্দ চায়ের জন্যে আর তাগাদা দিল না। সে দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই বুঝল একটা লোক তার সঙ্গ নিয়েছে। ক্যাশিয়ার লোকটা নানুভাই-এর নাম শুনে অমন করল, না তার মুখ চোখ চিনতে পারল বুঝতে পারছিল না সে। এই লোকটা তাকে অনুসরণ করছে। কেন?

গলিটার ঢুকল সে। যত এগোচ্ছে তত সরু হয়ে আসছে। এখন দুপাশে কোন বাংলা শব্দ নেই। দুজন লোককে জিজ্ঞাসা করে সে যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সেই বাড়িকে এই বস্তি এলাকায় আশা করেনি সে। সাদার্ন অ্যাভিনিউ বা আলিপুরে মানাতো বাড়িটা। দুপাশের বস্তি এত ঘন যে একটা লোক সেখানে ঢুকে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। আনন্দের আফসোস হচ্ছিল। এখানে যদি চেনাশোনা থাকত তাহলে চমৎকার অজ্ঞাত বাসের

জায়গা মিলতো।

সে বাড়িটার কলিং বেলে হাত দিতে যাচ্ছে এমন সময় অনুসরণকারী সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি চাই?'

'নানুভাই-এর সঙ্গে কথা বলব।'

'উনি বাড়িতে নেই।' এই লোকটিও হিন্দীতে কথা বলছিল।

'কোথায় আছে?'

'কি দরকার?'

'আমি একটা পত্রিকা থেকে এসেছি।'

লোকটি তাকে আপাদমস্তক দেখল। তারপর বলল, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি তিন মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

লোকটা বাঁ দিকের পথ ধরে হাওয়া হয়ে গেলে আনন্দ চারপাশে তাকাল। সে বুঝতে পারছিল অনেকেই তাকে দেখছে। বাড়িটার ভেতরে লোক আছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। একটু বাদেই সেই অনুসরণকারী ফিরে এল, 'আসুন। নানুভাই এখন খুব ব্যস্ত। শুধু পেপারের কথা শুনে রাজী হলেন।' আবার গলি, তস্য গলি। আনন্দের গা ছমছম করছিল।

যে বাড়িটার সামনে এবার সে দাঁড়াল অনুসরণকারীর সঙ্গে সেটা একতলা। লোকটা তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। একটা বিশাল ঘরে বসে আছে নানুভাই নামের লোকটা। তার চেহারা দেখে আনন্দের শোলের গব্বর সিংকে মনে পড়ে গেল।

॥ ২৩ ॥

নানুভাই তখন তিনজন লোকের কাছে কোন কিছুই হিসেব চাইছে। আনন্দকে চোখের কোণায় একবার দেখে নিয়ে লোক তিনটেকে বলল, 'আমি দুনস্বরী কথায় একদম মাথা ঠিক রাখতে পারি না। অ্যালার্জি, অ্যালার্জি জানো? সেইটেই হয় আমার। সোজা ব্যবসা কর আমি তোমার সঙ্গে আছি। ষাও, পাশের ঘরে যাও। তোমাদের পনের মিনিট সময় দিচ্ছি হিসেব ঠিক করার জন্যে।'

কথা শেষ করে সে ইঙ্গিত করতে আর একটা লোক এগিয়ে এসে লোক তিনটেকে ইঙ্গিত করল পাশের ঘরে যাওয়ার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের একজন ভেঙ্গে পড়ল, 'ভাইসাব এই রকম হবে না, আমি কথা দিচ্ছি এই রকম হবে না।' লোকটার গলায় কান্না এসে গেল। কিন্তু নানুভাই সেসব কথা যেন শুনতেই পেল না। আনন্দের পথপ্রদর্শককে ইঙ্গিত করল ব্যাপারটা জানানোর জন্যে। লোক তিনটে বাধ্য হল পাশের ঘরে চলে যেতে।

পথপ্রদর্শক লোকটি বলল, 'এই ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। এখানে ওখানে খোঁজ নিচ্ছিল। বলছে কোন পেপারের লোক।'

'আঃ।' নানুভাই এগিয়ে এল। বলল পক্ষাশ পরিয়েছে নির্ঘাৎ। গায়ের

রঙ গভীর কালো।

‘পেপারের লোক! আমার মত সামান্য লোকের কাছে, একি তাজ্জ্বব ব্যাপার! কোন পেপার?’

আনন্দ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি দৈনিকের নাম করল।

নানুভাই সেটার কথা বোধ হয় মনে করার চেষ্টা করল। তারপর বলল, ‘দেখুন ভাই, পেপারের লোক খুব দুঃস্বরী হয়। কলকাতার চারটে কাগজে আমাদের দোস্ত আছে। উপকার করার সময় তারা নানান ফ্যাকড়া দেখায়। আপনি কোন খান্কাই এসেছেন?’

‘আজকের একটা কাগজে আপনার সম্পর্কে কিছু লেখা হয়েছে। আপনি জানেন?’ খুব সহজ ভঙ্গীতে প্রশ্নটা করল আনন্দ।

সঙ্গে সঙ্গে নানুভাই হাসল, ‘আরে হাতি হাঁটে আপন মনে আর কুড়া চে’চায়। ওই কাগজে কি লেখা হল তা আমি খোড়াই কেয়ার করি।’

‘কিন্তু আপনার সঙ্গে মিনিষ্টারের নাম জড়ানো হয়েছে।’

‘এই তো আপনাদের ধান্দা। মিনিষ্টার কোন ঝামেলায় থাকেন না অথচ তাকে টানা হল। আমি ইচ্ছে করলে ওই রিপোর্টারকে বস্তির জিতরে তিরিশ বছর রেখে দিতে পারি। কিন্তু মিনিষ্টার চান না আপনাদের গায়ে হাত দিতে। কাগজগুলো বড় চে’চায়।’ নানুভাই ঘুরে দাঁড়াল, ‘আপনি কি জানতে চাইছেন? স্পষ্ট করে বলুন।’

‘দেখুন, এই খবরটা আমাদের কাগজে বের হয়নি। এই সব খবরের পেছনে সত্যি আছে কিনা বোঝা যায় না। তাই এডিটার চান আপনার সঙ্গে আলোচনা করে রিপোর্ট করতে।’

কয়েক পা এগিয়ে নানুভাই টেলিফোনের রিসিভার তুলল। ডায়াল শেষ হলে কান থেকে রিসিভার শব্দে নামিয়ে বলল, ‘কুত্তাকা বাচ্চা! টেলিফোনের লোকগুলো কেউ কাজ করতে বলে না কেন!’ এ কালু! গমগমে গলায় নানুভাই যাকে ডাকল সে তৎক্ষণাৎ চলে এল, ‘মিনিষ্টার সাহেবকে টেলিফোনে ধর। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আছে।’ কালু নামের লোকটা তৎক্ষণাৎ টেলিফোন নিয়ে বসে গেল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল আনন্দ। নানুভাই একগাল হেসে বলল, ‘আরে আপনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন! ছি ছি! গোস্তাকি মাপ করবেন। বসুন, কি খাবেন?’

‘কিছু না। আপনি কি আমাকে কিছু সময় দেবেন?’

‘সময়?’ নানুভাই ঘড়ি দেখল, ‘আধঘন্টার মধ্যে তিন নম্বর বুক দুটো নলকূপ বসাতে যেতে হবে। লোকগুলো খুব জলের কণ্ঠে আছে।’

‘এই কাজটা তো কর্পোরেশনের। আপনি করছেন কেন?’

‘বাঃ, আমার মানুষদের জন্যে আমি করব না? কর্পোরেশনকে বলেছি তোমাদের ওপর আমার লোকদের বিশ্বাস নেই। যা করবার আমি করব, তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।’

‘এখানকার লোকগুলো আপনাকে কি মানে?’

প্রশ্নটা শুনে ঘর কাঁপিয়ে হাসল নানুভাই, ‘এর উত্তর আমি জানি না। আপনি জিজ্ঞাসা করুন। আপনি ওদের কাছে গিয়ে জানুন। মশাই সব থেকে বড় ধান্দা হল পেটের। এই এলাকার বেশির ভাগ মানুষের পেট আমি ভরাই। ওদের বিপদে আমি পাশে দাঁড়াই। মিলা?’

কালু দ্বিতীয়বার ঘাড় নাড়তেই নানুভাই এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরলেন, ‘নানু, হ্যাঁ, না কোন গোলমাল নেই, আরে আপনি একবার বলুন আমি ও শালা রিপোর্টারের বদলা নেব চুন চুন করে। ওই তো মুশকিল, হ্যাঁ একজন রিপোর্টার এসেছে আমার কাছে ওই শালা রিপোর্টার যা লিখছে সে সম্পর্কে জানতে চায়। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ, রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে নানুভাই জিজ্ঞাসা করল গলা নামিয়ে ‘কোন পেপার বললেন যেন আপনি?’ আনন্দ নামটা মনে করিয়ে দিতে সে মাথা নাড়ল ‘ঠিক হ্যাঁ, আমি কথাবার্তা বলে নিচ্ছি। রাত্রে দেখা হবে।’

রিসিভার নামিয়ে রেখে নানুভাই বললেন, ‘আপনি কি চান বলুন তো?’

আনন্দ জবাব দিল, ‘শুধু এই রিপোর্টটা সত্যি কি-না তাই জানতে চাই।’

‘বিলকুল ঝুটা। মিনিস্টার আমাকে ভালবাসেন, আমি ভালবাসি পাবলিককে। অ্যান্টি পার্টি বদমাইশি করে এই সব লিখিয়েছে।’ নানুভাইকে আবার ঘড়ি দেখতে দেখল আনন্দ।

‘আপনার যা জনসংযোগ, ইলেকশনে দাঁড়ালে তো আপনি এম এল এ হয়ে যেতেন। আপনারও তাহলে অ্যান্টি পার্টি আছে এখানে?’

‘হিন্দুস্থানে কার কবে অ্যান্টি পার্টি ছিল না বলতে পারেন? এ শালা দেশটাই হল বেঙ্গমানের দেশ।’ নানুভাই হাসল, ‘ইলেকশনে দাঁড়াবে মিনিস্টার, আমি কে? অতুল্যাবুক আমার এই জন্যে খুব পছন্দ। সত্যিকারের শরিফ আদমী। হ্যাঁ, কি জানতে চান বলুন, আমার টাইম নেই।’

একটু সিরিয়াস হবার চেষ্টা করে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘এই এলাকায় আপনার প্রতাপ কি করে হল?’

‘খুব সোজা কথা। পাবলিককে ভালবাসলাম, পাবলিকও ভালবাসল।’

‘আপনি কি খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ?’

‘নিশ্চয়ই! ধর্ম ছাড়া আমার কি আছে!’

‘এলাকায় আপনার ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যায় বেশি। অন্য ধর্মের মানুষের আপনার সম্পর্কে কি ধারণা?’

‘একথা তাদের জিজ্ঞাসা করুন ভাই। কার মনে কি আছে তা আমি বলব কি করে!’

‘এই এলাকায় ভারতীয় নয় এমন অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে। তাদের পাসপোর্ট ভিসার বালাই নেই। এই লোকগুলোকে আপনি সেনটার দিচ্ছেন বলে অভিযোগ!’

‘কি ফালতু কথা। এখানকার প্রত্যেকটা লোকের রেশনকার্ড আছে। মাস

তিনেক থাকলেই ভোট দিতে পারে। যারা এই সব অধিকার পায় তারা ফোরেনার? আমার এলাকার পাশেই বর্ডার নেই। এখানে আসতে হলে অনেক মাইল পেরিয়ে আসতে হবে। যদি বহু লোক এইখানে আশ্রয় নেয় তাহলে সরকারের পুলিশ ডিপার্টমেন্টটা তুলে দিতে বলুন। লোকগুলো যখন এল তখন আটকাতে পারল না? যারা রেশনকার্ড ইস্যু করল তারা কি দেখে করল? যারা ভোটে নাম তুলল তারা কি অন্ধ? আমি শেলটার দিচ্ছি? আমার কাছে যে এসে আশ্রয় চাইবে আমি তাহাকে ফিরিয়ে দেব না। এইবার নানুভাইকে উত্তেজিত দেখাল।

‘অভিযোগ উঠেছে এই এলাকা সমাগলারদের সাম্রাজ্য। কত টাকার লেনদেন হয় প্রতি মাসে?’

‘ও হিসেব আমি দেব না। তবে প্রত্যেকটা লোক যারা আমার সঙ্গে আছে তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব আমার। দেখুন রিপোর্টার ভাই আজ আমার সময় নেই। আপনি আর একদিন আসুন। তবে একটা শর্ত আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারবেন না।’ নানুভাই চিৎকার করল, ‘ও কালু। উনলোগকো হিসাব মিল গিয়া? পুছ নেও।’

‘আপনি যদি মানুষের উপকার করেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে লিখব না। কিন্তু আপনার মিনিষ্টার নাকি বলেছেন আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা ঠিক?’

হাসিতে মুখ ভরে গেল নানুভাই-এর, ‘এক কাজ করুন। মিনিষ্টারের বাড়ি চেনেন?’

‘চিনে নেব।’

‘পরশু সন্ধ্যাবেলায় চলে আসুন। আমিও থাকব সেখানে। তখনই বাতচিত হবে। তার আগে কিছু লিখবেন না। আর একটা কথা, আমার এলাকায় বেশী ঘুরবেন না। দুনস্বরী লোক ভেবে যে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে।’ নানুভাই ইঙ্গিত করতে সেই পথপ্রদর্শক সামনে দাঁড়াল।

ওই সরু গলিতে একবার চুকলে বের হওয়া নতুন লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। গোলকর্ধাখা বললে কম বলা হবে। দুপাশে যে সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে বসে কথা বলছে তাদের চেহারা সুবিধের নয়। তারা আনন্দের দিকে তাকাচ্ছে কৌতূহলী চোখে, কিন্তু পথপ্রদর্শকটির ওপর নজর পড়ামাত্র শীতল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একজন সৌম্য চেহারার বৃদ্ধকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল আনন্দ। তারপর বাংলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি ভোট দেন?’

লোকটি মাথা নাড়ল। তারপর চমৎকার হিন্দীতে জানাল, বাংলা ভাল বোঝেন না, হিন্দীতে বল। পথপ্রদর্শক বুঝতে পারছিল না কি করবে। নানুভাই আনন্দকে সম্মুখ করে কথা বলছে এবং কোন নির্দেশ দেয়নি তাকে। আনন্দ যতটা সম্ভব কাছাকাছি হিন্দীতে প্রশ্ন করল, ‘কেন ভোট দেন?’

‘এলাকায় থাকব বলে। নানুভাই বলে তাই আমরা দিই।’

‘কাকে দেন ভোট ?’

লোকটি মন্ত্রীমশাই-এর নাম উচ্চারণ করল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল ‘মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আছে ?’

লোকটি হাসল, ‘নানুভাই-এর সঙ্গে আলাপ থাকলেই কাজ নয়, মন্ত্রীকে প্রয়োজন হয় না।’

‘কেন ?’

‘এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আমি কেন এলাকার কেউ দেবে না। আপনি কে ?’

‘আমি খবরের কাগজে কাজ করি। আপনি এখানে কতদিন এসেছেন ?’

‘সেভেনটি ওয়ান। ঢাকা থেকে চলে এসেছি।’

‘কি করে চলে ?’

‘ডকে নানুভাই-এর বিজনেসে মদত দিই।’

লোকটি কথাটা বলামাত্র পথপ্রদর্শক বলল, ‘চলুন সাহেব, আমার অন্য কাজ আছে।’ অতএব আনন্দ পা চালাল।

পাশাপাশি হাঁটিতে হাঁটিতে সে বলল, ‘নানুভাইকে সবাই খুব ভালবাসে, না ?’

‘পেটের ধান্দা বড় ধান্দা!’ লোকটা কথা বলতে পেরে বোধ হয় খুশী হল, ‘ভোটের কথা আপনি বলছিলেন না? এখানে প্রায় সবাই ভোট দেন। মিনিস্টার ফিনিস্টার সব ফালতু, আসলে নানুভাই যা বলবে তাই হবে। আগে যে এম এল এ ছিল সে নানুভাইকে টেক্সা দিতে চেয়েছিল, এখন একদম আটক। আমাদের এলাকায় পুলিশ পর্যন্ত ঢোকে না।’ লোকটা কথা বলছিল প্রায় মন খুলেই। হঠাৎ কাউকে দেখে চুপ করে গেল।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে ট্যাক্সি নিল আনন্দ। এই সময় লোকটা মুখ বাড়িয়ে বলল, ‘সাহেব আপনাকে যেসব কথা বললাম তা কাউকে বলবেন না। এসব বলা ঠিক না।’

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে আনন্দ নানুভাইকে অনেক রকম করে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে যেতেই সামনে তাকিয়ে বুক ধক্ করে উঠল আনন্দর। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চলে গেল কোমরে। একটা পুলিশের জিপ সামনে দাঁড়িয়ে। একজন অফিসার এবং সেপাই এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, ‘ডক থেকে তো ? নাম শালা গাড়ি থেকে।’ ড্রাইভার কাতর গলায় বলল, ‘না স্যার, ডক থেকে না, এই বাবু একটু আগে ট্যাক্সি নিলেন।’

অফিসার এবার আনন্দর দিকে তাকালেন, ‘অ্যাঁ কি আছে সঙ্গে ?’

‘কোথেকে আসা হচ্ছে ?’

‘নানুভাই-এর কাছ থেকে। চটজলদি নামটা ব্যবহার করল আনন্দ। অফিসার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভেতরটা মুহূর্তে কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু নামটা যে ম্যাজিকের মত কাজ করবে তা কল্পনাতেও ছিল না। সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে ইশারা করলেন ড্রাইভারকে এগিয়ে যেতে। একটু ব্যাক করে গাড়িটা বের করে আনছিল যখন ড্রাইভার তখন অফিসার তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে যাবার জন্যে জিপের দিকে।
ড্রাইভার বলল, 'আপনার জন্যে বেঁচে গেলাম দাদা।' আনন্দ উত্তর দিল না।

বেশ কিছুটা কষ্ট মাংস আর তন্দুরি রুটি নিয়ে আনন্দ যখন ফিরল তখন সজ্জা পেরিয়ে গেছে। রুদ্রা দরজা খুলে আনন্দকে দেখে একটু থমকে গেলেন, 'এত রাত করে বাড়িতে ফেরা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আজ ওপরে বসে খাওয়া চলবে না, তাকে বল নিচে আসতে।' আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। আমি ঘন্টাখানেক বাদেই আসছি। সুদীপ এসেছে?'

রুদ্রা মাথা নাড়লেন, 'ছেলেটা ভাল। ওর বাপ যা বলেছে তা সত্যি বলে আমি ভাবতেই পারি না। আমার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে মায়ের কাজ করে আসবে বলেছে। বাপ ছেলের এই যুদ্ধের কথা কে কবে শুনবে বল? তোমার বাপের সঙ্গে গোলমাল নেই তো?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমার বাবা বেঁচে নেই।'

'ও।' রুদ্রা খতমত হয়ে একটু সময় নিলেন, 'মা?'

'মা আছেন, প্রামের বাড়িতে।'

'আহা! পিতৃহারা ছেলের দায়িত্ব খুব বেশী। মায়ের দুঃখ দূর করবে তুমি। না হলে সন্তান কিসের?'

রুদ্রা ঘুরে দাঁড়াতেই আনন্দ ওপরে উঠে এল। সুদীপ কল্যাণ জয়িতা গোল হয়ে বসে তাস খেলছে। জয়িতাই বলল, 'ওই যে, এসে গেছে। উঃ কি চিন্তা হচ্ছিল!'

'চুপ কর! মা মা ভাব করিস না। ওই বস্তুটি আবার আমদানি করলি কেন?'

'সময় কাটানোর পক্ষে দারুণ জিনিস। তুই শাল্লা নাইনটিন সেক্সুরির বিধবা। সিগারেট খাস না, মদ তো প্রায়ই ওঠে না, কোন মেয়ের সঙ্গে আজ পর্যন্ত প্রেম করলি না, আবার তাসেও অ্যালাজি।' সুদীপ নাটক করে কথাগুলো বলছিল। কল্যাণ এক হাতে তাস খেলছিল। সেটা অবশ্যই মোটেই শ্রদ্ধাদায়ক নয়।

আনন্দ বলল, 'কি ব্যাপার, খুব ফুটিতে আছিস মনে হচ্ছে।'

তাস নামিয়ে রেখে সুদীপ বলল, 'দারুণ রি-অ্যাকশন। রেসকোর্সের সামনে গিয়ে দেখি গেটের বাইরে পাবলিক দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে ভিড়। কিন্তু কেউ ঢুকছে না। ওপাশে যে মেম্বার্স এনক্লোজারটার সামনে গাড়ির লাইন লাগতো সেখানটা আরও ফাঁকা। আমি একদম নেকু সেজে একটা রেসের বই বিক্রী করা ছোকরাকে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতে সে বলল,

রেসকোর্সে নাকি বোমা পড়বে সেই ভয়ে কেউ ঢুকছে না। পাবলিকের প্যানিক যদি দেখতিস! শেষ পর্যন্ত ভেতর থেকে অ্যালাউন্স করল অনিবার্শ কারণে আজ রেস বন্ধ থাকল। পুলিশে পুলিশে রেসকোর্স ভরতি ছিল। হেস্টিংসের স্টেবল থেকে ঘোড়াগুলো নাকি মালিকরা আনতে চায়নি। এক একটা ঘোড়ার দাম নাকি লাখ দু'লাখ। হেডি লস হয়ে গেল গভর্নমেন্টের। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে পার্কস্ট্রীটে চলে গেলাম। একটা পাবলিক টেলিফোনে সবকটা কাগজকে যা তুই বলেছিলি তাই বলেছি। লোকগুলো প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। বলেছে, 'আপনি যে ওদের দলে তার প্রমাণ দিন।' সুদীপ হাসতে লাগল।

খবরটা খুব পছন্দ হল কল্যাণের। সে আনন্দকে বলল, 'ব্যাপারটা বেশ, না? ধর, তোর কাছে কাগজপত্র নেই। কিছু লোক তোকে ধরে পরিচয় চাইল। তুই বললি। তারা প্রমাণ দেখাতে বলল। কোন প্রমাণ নেই। তোর পরিচয় সঠিক কিনা সেটা প্রমাণ করবে তোর পারিপার্শ্বিক। তোর আত্মীয় বন্ধু স্কুল কলেজ। কিন্তু তুই না!'

আনন্দ কোন জবাব দিল না। তার ভাল লাগছিল। সে এই রকমটাই হবে ভেবেছিল। কাগজে ওই হুমকির খবরটা পড়ে লোকে ভয় পাবে। তারা নিজেদের প্রাণের মাম্বায় আজ রেসকোর্সে যাবে না। কিন্তু সেটা আজ অথবা পরের দিন। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে আবার পিল-পিল করে ঢুকবে তারা। কিন্তু মেম্বার্স এনক্লোজার, সুদীপ যা বলছে, এমন ফাঁকা হবে সে আশা করেনি। তাহলে কলকাতার উচ্চবিত্তরাই বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে? কিছু একটা করা দরকার। হুমকিটা যে অহেতুক নয় এটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আজ যে লোকটা সংসারকে বঞ্চিত করে রেস খেলতে টাকা নিয়ে এসেছিল সে নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে তার কিছু টাকা সংসারের পেছনে খরচ করেছে। কিন্তু এইটুকু তো তাদের পরিকল্পনায় ছিল না।

জয়িতা আনন্দকে লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি খবর?'

আনন্দ ওদের বিশদ বলল। একটা কাগজে যতটা সম্ভব জায়গাটা এঁকে দেখাল সে। তারপর বলল, 'মানুভাই লোকটার হাতের পুতুল হল এই মন্ত্রী। দেখলে মনে হবে আচরণে রবিনহুড চেহারায় গব্বর সিং। কিন্তু ওকে প্রচণ্ড ভয় পায় এলাকার লোক। মানুষ যার কাছে উপকার পায় তাকে ভয় করে না। তাছাড়া ওখানে নানুভাই-এর চর ছড়ানো রয়েছে। একা একা বস্তির ভেতরে তোকা বেশ বিপজ্জনক হবে। অতএব নানুভাই-এর মুখোশটার নিচে যে মুখটা রয়েছে তা বীভৎস হতেই হবে। আমি সাহস পাইনি বেশি ঘাঁটানোর। ওখানে যদি আমাকে পুঁতেও রাখতো তাহলে পৃথিবীর কেউ টের পেত না। আমি ভয় পেয়েছিলাম, হয়তো নানুভাই আমার কাছে রিপোর্টারের আইডেন্টিটি কার্ড চাইবে। কিন্তু লোকটার অশিক্ষা এবং রিপোর্টার শব্দটা শোনার পরে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যার জন্যে ওটা ওর মাথায়

আসেনি। ওই এলাকায় পুরো স্মাগলিং-চেনটা কন্ট্রোল করে নানুভাই। শুধু বাংলাদেশ থেকে নয়, পাকিস্তান থেকেও এখানে লোক আসছে বলে আমার ধারণা। একবার এলাকায় ঢুকে পড়লে রেশন কার্ড এমন কি ভোটিং রাইট পর্যন্ত পেতে অসুবিধে নেই। এম এল এ, মন্ত্রী হাতের মুঠোয়। তাদের নির্বাচন নানুভাই দেখাশোনা করে। অজুত জোট। লোকটা দাঙ্গা তৈরি করতে পারে প্রয়োজন হলে। আর পুলিশের সঙ্গে ওর সম্পর্কের চেহারা তো আসবার সময় দেখলাম। সুতরাং আমার মনে হয় আগামী পরশু আমাদের যাওয়া উচিত।’

কন্যাণ চট করে বলল, ‘এত তাড়াতাড়ি?’

সুদীপ বলল, ‘মানে? এখানে অনন্তকাল বসে থাকতে তোর ভাল লাগছে? আমি তবু মাঝে মাঝে বেরুচ্ছি, তোদের তো দম বন্ধ হবার কথা। পুলিশের ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না। তাছাড়া এই লোকটাকে মিট করতে খুব ইচ্ছে করছে।’

জয়িতা বলল, ‘মিনিস্টারটার কথা ডাব। খবরের কাগজ খুললেই ওর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেখা যাবে। ওর দলের লোকেরাই ওকে বম্মেছে বেশী কথা না বলতে। অথচ এই লোকটাই—!’

আনন্দ বলল, ‘আমাকে একটু ভাবতে দে কিভাবে এগোবো। লোকটা হঠাৎ আমাকে মন্ত্রী বাড়িতে যেতে বলল। এটা কোন ট্রাপ কিনা কে জানে। আমাকে দেখে ওর কোন সন্দেহ হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে মেলাতে পারিনি। পারলে আমাকে ছাড়তো না। ওহো উনি আমাদের খেতে ডেকেছেন। আজ ওপরে খাওয়া চলবে না। তোরা রুটি মাংস খেয়ে নে। সুদীপ চল, নিচে যাই, ওঁকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।’

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই রুটি মাংস এনেছিস? ফাস্ট ক্লাস!’

সুদীপ উঠল, ‘বেশ আছিস! আমরা খাচ্ছি নিরামিষ আর তোরা মাংস সার্ভিস। কিছু মাল রেখে দিবি, আমি এসে খাব। চল আনন্দ।’

রুদ্রা সামনে বসে ওদের খাওয়ালেন। আনন্দের খুব ভাল লাগছিল। মাটিতে বসে খেতে খেতে সে দেখছিল রুদ্রা সামনে বসে ওদের সঙ্গে কথা বলছেন। ওঁর হাতের পাখা মাঝে মাঝে তাদের হাওয়া দিচ্ছিল। দেখলেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কথা মনে আসে। এই শেষ, এই জেনারেশনের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎবাবু শেষ হয়ে যাচ্ছেন। কি ভালোই না ছিল সম্পর্কগুলো। রুদ্রা কথা বলছিলেন সুদীপের মাঝের কাজ নিয়ে কালীঘাটের পুরোহিতকে টাকা ধরে দিলেই সব করে দেবে সে। এখনও হাতে কয়েকটা দিন সময় আছে। রুদ্রার আজ মনে হয়েছে, তাঁরও তো কেউ করার নেই। নিজের কাজটা নিজেই করে গেলে কেমন হয়। কি রকম বিষণ্ণ হয়ে গেল পরিবেশটা। এবং তার সঙ্গে মানানসই হল কাপড়ে ওঁর চোখ মোছা। সুদীপ কোন কথা বলছিল না।

কিন্তু আনন্দের মনে হল সুদীপটা ভাগ্যবান। নইলে এমন দুরের সম্পর্ক যাওয়া আসা প্রায় নেই যেখানে সেখানে একজন জীবন থেকে প্রায় সরে যাওয়া মানুষের এই রকম আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়াটা কম কথা নয়।

খাওয়া শেষ হয়ে এলে সুদীপ রুদ্ধাকে উঠে যেতে দেখে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'কল্যাণদের কথা বলব? এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ নিজের কাছেই বাধো বাধো তেঁকতে লাগল আনন্দর। এই বিশ্বাস এবং স্নেহ নষ্ট হতে পারত আজ সকালে অবনী তালুকদারের কথা শুনে। কিন্তু হয়নি। এবং এখন ইনি নিজে থেকেই সুদীপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। হঠাৎ যদি জানতে পারেন ওঁরই বাড়ির ছাদের ঘরে দুটি ছেলেমেয়ে গোপনে বাস করছে তাহলে চট করেই অবিশ্বাস আসবে। সুদীপ সম্পর্কে তাঁর এই নরম অনুভূতি দূর হবেই এবং আজ অবনী তালুকদারের কথাগুলো সত্যি বলে বোধ হবে। সে ইশারা করল সুদীপকে কিছু না বলতে।

এই সময় পাশের দরজায় ক্রমাগত শব্দ শুরু হল। রুদ্ধা বিরক্ত হয়ে বারান্দায় এলেন, 'আবার কি জ্বালাতন', এই ধরনের কিছু বলে উঠানে নেমে গলা তুললেন, 'কে? কি চাই? এত রাত্রে কেন?'

ওপাশ থেকে চাপা গলায় শোনা গেল, 'দিদিমা, তাড়াতাড়ি খুলুন সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

রুদ্ধা ছুটে গেলেন। ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। শেষ কথাটা কানে আসায় ওরা কোনমতে হাত ধুয়ে উঠানে নামল। রুদ্ধা পেছনের দরজা খুলতেই একজন মধ্যবয়স্ক রোগা লোক সামনে এসে দাঁড়াল, 'দিদিমা, আমাকে বাঁচান, ও, ও মনে হয় বিষ খেয়েছেন।'

'কি খেয়েছে? বিষ?' রুদ্ধা আঁতকে উঠলেন, 'ওমা কি সর্বনেশে কাণ্ড! বিষ খেতে গেল কেন?'

'আমার দোষ! বিশ্বাস করুন, কিন্তু তাতে যে বিষ খাবে আমি ভাবিনি। একটা কথা শুনে বাড়ি ফিরে ওকে খুব বকেছিলাম। তারপর চূপচাপ ছিল। হঠাৎ দেখি কাতরাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করায় বলল ও মরে যেতে চায় বলে বিষ খেয়েছে। আমি এখন কি করি?' লোকটি অসহায় গলায় বলছিল।

'মরেনি তো! তাহলে হাসপাতালে নিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে দেখছ কি? গাড়ি ডাক!' রুদ্ধা ধমকালেন।

'আহা! আপনি বুঝতে পারছেন না। হাসপাতালে নিয়ে গেলেই পুলিশ কেস হবে। এখন চারপাশে ঘেরকম গৃহবধু হত্যার কেস হচ্ছে তাতে আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে ওর ভাইরা। ও তো বলবে আমি বকেছি বলে বিষ খেয়েছি।' লোকটির অবস্থা সত্যি করুণ। সে এবার আনন্দের দেখতে পেল। রুদ্ধা বললেন, 'চল তো, যদি তেমন দেখি তাহলে তো হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হবে। তোমার পাশের ডাড়াটে জানে?'

'না। তাহলে আজ রাত্রে পৃথিবীর সব লোক জেনে যাবে।' লোকটি রুদ্ধাকে

অনুসরণ করছিল।

রুদ্রা দরজার আড়ালে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তেঁতুল জল আছে ? আর নুন ! নিয়ে এস এখনই !'

সুদীপ বলল, 'কেসটা কি ! একবার দেখা দরকার !'

আনন্দ আপত্তি করল, 'না। খামোকা জড়াস না। আমাদের অনেক ঝামেলা আছে।'

সুদীপ বলল, 'কে বিষ খেয়েছে বুঝতে পারছিস ? পুকুর ধারের সেই মেয়েটা আমার কাছে নিমপাতা চেয়েছিল। এই লোকটা মনে হচ্ছে ওর স্বামী। এমনও তো হতে পারে ও-ই বিষ খাইয়ে এখানে এসে অ্যাক্টিং করছিল ! সকালে যাকে দেখেছি সে বিষ খাবে ভাবাই যায় না।'

এই সময় রুদ্রা চলে এলেন এ পাশে। ওদের দিকে তাকিয়ে খতমত হয়ে গেলেন। তারপর না বলে যেন পারলেন না, 'চোখ উল্টে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। আমি বলে দিলাম হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ছেলের কোন দোষ নেই। নির্দোষীরাই তো মরে।'

হঠাৎ সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রাণ আছে ?'

'এখনও আছে মনে হচ্ছে।'

'উনি যদি হাসপাতালে না নিয়ে যান তাহলে তো আরও বিপদ। মারা গেলে ডেথ সার্টিফিকেট লেখার ডাক্তার পাবেন না। যা হয় হোক ওর উচিত স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া। আমি একবার দেখতে পারি ?'

'তুমি ! তুমি আবার কি দেখবে ? তুমি ডাক্তার না কি ? রুদ্রা উড়িয়ে দিতে চাইলেন।'

'আমি ফাস্ট এইড ট্রেনিংটা নিয়েছিলাম।' সুদীপ তার গলায় আত্মবিশ্বাস বোঝাল। রুদ্রা যেন ধ্বজে পড়লেন। মনে হচ্ছিল ওই ঝামেলায় সুদীপ যেন না জড়ায় সেটাই ওর কাম্য ছিল। কিন্তু সুদীপের ট্রেনিং-এর খবরটা শোনার পর সরাসরি না বলতে বাধে।

তিনি মাথা নেড়ে ডাকলেন, 'এসো। দুজনেই এসো।' যেন শুধু সুদীপকে নিয়ে যেতে তিনি সাহস পাচ্ছেন না। দরজার গায়েই সিঁড়ি। দুই ভাড়াটের অস্তিত্ব একটা পার্টিশন তুলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সামনের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। ভেতরের অন্ধ আলোর সামান্যই বাইরে আসছে। রুদ্রা দরজাটা খুলতেই ওরা একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলতে দেখল। যুবতি শুয়ে আছে খাটের ওপর। ওর পায়ের কাছে মাথায় হাত রেখে সেই লোকটি কাঁদছে যতটা সম্ভব নিচু গলায়। রুদ্রা বললেন, 'কি তিক করলে ? এরা আমার বাড়িতে এসেছে। খুব ভাল ছেলে। এসবের চিকিৎসা জানে বলল। দ্যাখো তো বাপু কিছু করতে পার কি না। না পারলে খামোকা এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন দরকার নেই।'

সুদীপ এগিয়ে গেল বিছানার পাশে। পড়ে থাকা হাতটা তুলে পাল্স দেখল।

জীবনের চিহ্ন রয়েছে এবং সামান্য দ্রুত ছাড়া কোন অস্বাভাবিকতা নেই। বিষ খেলে কারো দাঁত লেগে যায় বলে সে জানতো না। কিন্তু মহিলার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অবস্থা প্রায় শেষের দিকে। অথচ নাড়ি তার বিপরীত কথা বলছে। সে লোকটিকে বলল, ‘বমি করানো যায় এমন কিছু আনুন।’ ‘বমি? কি খেলে বমি করে?’ অত্যন্ত নির্বোধের মত প্রশ্নটা করল লোকটা। ঠিক কাকে করল তা সে নিজেই জানে না। বৃদ্ধা বললেন, ‘এসো আমার সঙ্গে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

আনন্দ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আলোর পেছনে। সে লক্ষ্য করছিল মহিলার সঙ্গে স্বামীর বয়সের পার্থক্যটা অনেক। সেদিন দোতলার জানালা থেকে ভাল করে নজরে পড়েনি, আজ স্পষ্ট হচ্ছে, এই মহিলার শরীরে ঈশ্বর বাড়াবাড়ি রকমের যৌবন দিয়েছেন। জয়িতা কল্যাণ একে দেখলে সুদীপকে আর একটু বেশি ঠাট্টা সহ্য করতে হতো। সুদীপ মহিলার পায়ের তলায় হাত বোলাতে প্রতিক্রিয়া হল। পা নড়ে উঠে স্থান পরিবর্তন করল। সে উঠে চোখের পাতা টেনে দেখল। তারপর আনন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি বুঝতে পারছি না। বিশ্বের লক্ষণ বিশেষ নেই।’

আনন্দ বলল, ‘তুই ডাক্তার নস। এই সব ঝামেলায় না জড়ালেই ভাল করতিস।’

এই সময় লোকটি ফিরে এল একটা বড় পাত্র নিয়ে, ‘দিদিমা বললেন এটা খাওয়াতে।’

সুদীপ বলল, ‘আপনি খাওয়ান।’

লোকটিকে খুব নার্ভাস দেখাল, ‘নানা, আমি পারব না। আপনি চেষ্টা করুন, প্লিজ। আমার মাথায় কিছু আসছে না। কি যে করি ছাই।’

পাত্রটা হাতে নিয়ে সুদীপ হুকুম করল, ‘বালতি আনুন। বমি হলে ফেলবে কোথায়?’

লোকটি আবার ছুটে বেরিয়ে গেল। এবার সুদীপ মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, ‘আপনার কিছুই হয়নি। কিন্তু ওই ভাবে পড়ে থাকলে এই তরল পদার্থটি গিলে বমি করতে হবে। ভেবে দেখুন কি করবেন? বেশি সময় নেই।’

আনন্দ অবাধ হয়ে দেখল পলকের মধ্যেই মহিলার দুটো চোখের পাতা খুলে গেল। অদ্ভুত একটা শিরশিরে হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। তারপর মায়াবী গলায় বলল, ‘আমি ওকে ভয় দেখাতে চাই যাতে জীবনে আর গায়ে হাত না তোলে। ওটা গিলাবেন না, দোহাই।’

পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্রই চোখ বন্ধ করলো শুবতী। লোকটি একটা বালতি হাতে নিয়ে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথায় রাখব? মাথার পাশে রাখি? কিভাবে খাওয়াবেন? শুয়ে শুয়ে কি গিলতে পারবে?’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘না। মনে হচ্ছে ওর আর খাওয়ার দরকার হবে না।’

বিষটা মনে হচ্ছে বুকের নিচে নামেনি। যেমন গুয়ে আছে তেমন গুয়ে থাকতে দিন।’

‘বিপদ হবে না? মারা যাবে না?’ লোকটি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটি।

‘কেন? মারা গেলে কি আপনি খুশি হতেন?’ সুদীপ আনন্দকে ইশারা করে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

‘না না। আমি ওকে প্রচণ্ড ভালবাসি কিন্তু ঠিক যন্ত্র করতে পারি না। আপনি বলছেন কোন বিপদ নেই। আঃ, বাঁচালেন। তাহলে এইটে ফেলে দিই?’ লোকটি তার পদার্থটি দেখাল।

‘আপনার যা খুশি।’

ওরা এপারে এসে দরজা বন্ধ করতেই দেখল রুদ্রা চুপচাপ জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে এই পাশে তাকিয়ে আছেন। কেমন ভৌতিক মনে হল আনন্দর। মুখোমুখি হওয়ামাত্র রুদ্রা প্রশ্ন করলেন, ‘কেমন দেখলে? কি বুঝলে?’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘ওর কিছুই হয়নি। স্বামীকে জন্দ করার জন্যে বিষ খাওয়ার ভান করছেন। তবে আজ রাত্রে একথা স্বামীকে না বলাই ভাল হবে।’

ধীরে ধীরে রুদ্রার মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটল। তিনি হাত বাড়িয়ে সুদীপের চিবুক ছুঁয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল স্পর্শ করলেন, ‘জিতে গেলে বাবা! ও যে বিষ খায়নি তা আমি দেখেই বুঝেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন যেতে চাইলে তখন ইচ্ছে হল পরীক্ষা করে দেখি। না, অবনী খামোকা মিথ্যে দোষ দিয়ে গেল, তুমি সত্যি খাঁটি ছেলে।’ রুদ্রা আর দাঁড়ালেন না। সেই নির্জন জ্যোৎস্নায় প্রাবিত উঠানে দাঁড়িয়ে সে আনন্দর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই তাকে ব্যাপসা দেখতে পেল। কেন যে ঈশ্বর মানুষের শরীরে এত জল দেন?

মোমবাতির আলোয় উপর হয়ে গুয়ে আনন্দ নোট করছিল। ওর সামনে ম্যাপটা খোলা। ম্যাপের একটা অঞ্চল ও দাগিয়ে রেখেছে গোল করে। উত্তর বাংলার শেষ প্রান্তে একদিকে সিকিম, ভূটান আর নেপালের জঙ্গলগুলো ছাড়িয়ে ও পর পর কয়েকটা জায়গার ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। ট্রেন বা বাসে ওখানে পৌঁছাতে নিউ জলপাইগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। অথবা শিলিগুড়ি। মুশকিল হল, এইটেই তার পছন্দ হচ্ছে না। সে দাজিলিং গিয়েছে। সুদীপ এবং জয়িতাও ছেলেবেলায় ওদিকে গিয়েছে। কিন্তু কেউ বাংলার বাইরে পা দেয়নি। চারজন একসঙ্গে রওনা হলে আর পৌঁছাতে হবে না। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ বাগডোগরা পর্যন্ত যায়। সেখান থেকেও ম্যাপের জায়গাটার পৌঁছাতে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। ওই জায়গাটার পৌঁছাতে পারলে আর যাই হোক পুলিশের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হবে না সব সময়। কিন্তু বাস বা জিপ যে পর্যন্ত যায় সেই পর্যন্ত গিয়ে তারপর হাঁটতে হবে। কল্যাণ

কি হাটতে পারবে? ওর হাত সারতে এখনও অনেক দেরি আছে। কিন্তু কলকাতায় আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না। সুদীপ হঠাৎ উপুড় হল। ম্যাপের গোল দাগানো জায়গাটায় নজর রাখল। তারপর বলল, 'কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া দরকার তার একটা লিস্ট বানানো দরকার।'

'বল তো।' আনন্দ ওর দিকে তাকাল।

'ওষুধ। সাপে যদি কামড়ায় তার জন্যে। বিষ ব্যাপারটা মাথায় আসার পর থেকেই মনে হচ্ছে। লেখ, পেট খারাপ হলে কম থেকে হাইডোজের সব রকমের ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল। প্রত্যেকটা একশ করে। উল্টোদিকে কিছুটা জোলাপ এবং হজমের ট্যাবলেট। জ্বরের ওষুধ। সব রকমের। পোড়া এবং কাটার জন্যে ওষুধ মলম। ঠাণ্ডা লাগলে যা দরকার তাই। বেশ কিছু অ্যান্টিসেপটিক। ট্যাডভ্যাক ইন্জেকশন। মাথা ধরার ওষুধ। ব্যাণ্ডেজ। স্কিন ডিজিজের ওষুধ। বরফে যা হলে তার জন্যে যা দরকার। বুকের ব্যথার ওষুধ। রক্ত বন্ধ হবার ইন্জেকশন। চোখ কান দাঁত-এর লোশন ট্যাবলেট। সব রকম অ্যান্টিবায়োটিক। অর্থাৎ একটা মিনি ডিসপেন্সারি। হাসিস না, এটা খুব কাজে লাগবে। আমরা যদি জনমানবশূন্য জায়গায় পৌঁছাই তাহলে এগুলোই বাঁচাবে।'

'যদি অবশ্য ওষুধের ডেটগুলো পার না হয়ে যায়। আর?'

'প্রত্যেকের দুসেট শস্ত জুতো। শস্ত কিন্তু হালকা। চামড়ার না হলে ভাল হয়। জিনসের প্যান্ট প্রত্যেকের অন্তত ছটা করে। জিনসের জ্যাকেট। গরম ওভারকোট। ওয়াটার প্রুফ। গ্লাভস।'

'এসব নিয়ে হাটতে পারবি?'

'পারতে হবে। কাল তোতে আমাতে সারাদিন এইসব কেনাকাটি করব। একই দোকানে একসঙ্গে এত মাল চাইলে সন্দেহ করতে পারে। তাই সময় লাগবে। পরশুদিন আমরা ওই নানুভাই-এর সঙ্গে দেখা করতে মন্ত্রীর বাড়িতে যাচ্ছি?'

'নানুভাই-এর সঙ্গে দেখা করতে নয়, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাই উদ্দেশ্য। নিশ্চয়ই যাচ্ছি। উই নিড হিম। কিন্তু যাব তুই আর আমি। তুই যাবি আমার সঙ্গে ক্যামেরাম্যান সঙ্গে। একটা ফালতু ক্যামেরা আজ ব্যবস্থা করতে হবে। কল্যাণের বের হবার দরকার নেই।'

'কিন্তু বাইরের গাড়িতে কেউ থাকবে না আমাদের কভার করতে?'

'জয়িতা থাকবে। সন্ধ্যার পর ওকে আর মেয়ে বলে বোঝা যাবে না। কিন্তু এবার তুই গাড়ি পাবি কোথায়? ট্যাক্সিতে যেতে মন চাইছে না।'

'গুটা আমার ওপর ছেড়ে দে। কিন্তু পরশুর অপারেশন যদি সাকশেসফুল হয় তাহলে আমরা রওনা হচ্ছি কবে?'

'পরশুই এই আস্তানা ছাড়তে হবে আমাদের। আমি আর তুই বাই রোড বেরিয়ে যাব। আর জয়িতা ও কল্যাণ পরের দিন ফ্লাইট ধরবে এয়ারপোর্টের

থেকে। আনন্দ জানাতেই কল্যাণের গলা ভেঙ্গে এল, 'অপারেশনের সময় আমাকে বাদ দেওয়া চলবে না। আমার একটা হাত এখনও ঠিক আছে। এত আঙুর এস্টিমেট করছিস কেন?'

॥ ২৪ ॥

ঘুম থেকে উঠে সুদীপ বেরিয়ে গিয়েছিল। খোলামাত্র খবরের কাগজগুলো ওকে টানছিল। শত্রু পক্ষ কি ভাবছে, পাবলিকের কি রিঅ্যাকশন; এই ছাদের ঘরে বসে জানা যায় না। যদিও সে বাইরে বের হচ্ছে তবু গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে সাহস হয় না। তার ছবি দেখে যদিও কেউ চিনতে পারবে না তবু বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে। সে যখন বেরিয়েছিল তখন বন্ধুরা ঘুমিয়ে। হঠাৎ নিজেদের খুব অ্যামেচার বলে মনে হয়েছিল ওর। পুলিশ যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা এমন পাহারা না রেখে মড়ার মত ঘুমায়ে না। কিন্তু অ্যামেচারিশ বলেই মনের মধ্যে কোন পাপবোধ নেই। তারা নিজেদের জন্যে কিছু করছে না, এমন কি মানুষ খুনও। কল্যাণের হাত নিশ্চয়ই সেট হতে চলেছে, নিঃসাড়ো ঘুমাচ্ছে ও। আনন্দ বেশী রাত জেগেছিল, এখন হুঁস নেই। আর জয়িতা? দরজায় দাঁড়িয়ে জয়িতার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত অসার হয়েছিল সুদীপ। পরনে প্যান্ট আর 'সার্ট' থাকা সত্ত্বেও শোওয়ার ভঙ্গী বদল হওয়ায় শরীর থেকে এক ধরনের মেয়েলি আভা বেরিয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়লে মানুষ অকপট হয়ে যায়। তাই আনন্দ কল্যাণকে কি সরল বালক এবং জয়ীতাকে রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে। সুদীপ এগিয়ে গিয়ে পাশে পড়ে থাকা চাদরটা জয়িতার শরীরে ছড়িয়ে দিতেই সে একটি সরল বালক হয়ে গেল। ছাদে পা দিতে দিতে সুদীপের মনে হল ঘুমন্ত অবস্থায় তার নিজের মুখ কেমন দেখায় তা সে কোনদিন দেখতে পাবে না। জয়ীতাকে বলতে হবে তার ঘুমন্ত মুখ লক্ষ্য করে তার কাছে বর্ণনা করে। ঘুম ভাগাতে হচ্ছে করল না বলেই সে যাওয়ার সময় বন্ধুদের ডাকেনি।

গলির মধ্যে ভোরবেলায় কারো কৌতূহল নেই। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই সময়টাতেই বোধ হয় পৃথিবীর মানুষেরা অত্যন্ত শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ থাকে। ভোরবেলাতেই কেউ কারো দিকে সন্দেহের চোখে তাকায় না। অতএব খুব সহজ মনে হেঁটে মোড়ের মাথায় এল সুদীপ। এবং তখনই লোকটিকে দেখতে পেল। একটা ফুলের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গেল্লাস হাতে। তাকে দেখে একটু বিব্রত হলেন। কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটল, 'চা খাবেন? ভাল করে ও।'

মাথা নাড়ল সুদীপ। এই সময় চা তো অমৃত। সে আশেপাশে কোন খবরের কাগজের হকারকে দেখতে পেল না। এখনও কাগজ এদিকে আসেনি বোধ হয়। লোকটি সুদীপকে বললেন, 'আপনি আমাকে কাজ বাঁচিয়েছেন। চিন্তায় আমার—!'

‘কেমন আছেন উনি ? রাত্রি ঘুম হয়েছিল ?’ সুদীপ গভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল।

‘ঘুম ! ঘুম কি মশাই, খেয়ে দেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এত ঘুম। আপনি যে ক্যাপসুলটা দিয়েছিলেন ওর মুখে ওঁজে সেটা কি আপনার পকেটেই ছিল ? ডেজারাস লোক তো। কখন কাকে দিতে হবে জানেন না তবু পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। মাঝ রাত্রে চোখ মেলে বলল খিদে পেয়েছে। শরীরে অবশ্য বল ছিল না। আমিই খাইয়ে দিলাম। তখনই দুতিনটে কথা বলল। আপনি ওর মুখে ক্যাপসুল ওঁজে দিয়েছেন বলল। তাই খেয়ে নাকি বিশ্বের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করলাম না কথাটা। অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর যখন বুঝলাম শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক তখন চোখ বন্ধ করলাম। ভাবুন তো, হাসপাতালে এই কেস নিয়ে গেলে কি হুজুত হত। ছেলে পড়িয়ে খাই, আমার কি আর খাবার জুটত !’ লোকটি যখন কথা বলছিল তখন সুদীপ তাকিয়েছিল। সত্যি সরল মানুষ। বউ যা বোঝান তাই বোঝেন। নইলে ক্যাপসুলের গল্প বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। অথচ লোকটিকে নির্বোধ বলে মনে হচ্ছে না।

চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে সুদীপ কোন কথা না বলে চুমুক দিল। শুবতীর উদ্দেশ্য কি ? স্বামীর কাছে চটপট মিথ্যে কথা বলার কি কারণ থাকতে পারে। এর পরে লোকটি তার প্রচণ্ড রাগ হলেও শুবতীকে কোন কষ্ট কথা বলতে সাহস পাবে না। এইটেই হয়তো কাম্য ছিল শুবতীর। কিন্তু যদি উল্টো হত, যদি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত তাহলে তো ডাক্তাররা বলেই দিত সত্যি কথাটা। এরকম ঝুঁকি নিল কেন শুবতী ! সে লোকটিকে বলল, ‘সাত ভাড়াভাড়ি বাইরে বেরিয়েছেন !’

‘আমি তো রোজই এই সময় এখানে আসি চা খেতে। ফাস্ট কাপ টি। ওর তো চা তৈরি করতে করতে সাতটা বেজে যায়। আজ ভাবছি আমিই এখান থেকে চা নিয়ে যাই, কি বলেন ?’

‘নিশ্চয়ই !’ লোকটির ওপর রাগ করা যাচ্ছে না কিন্তু মোটেই খুশী হচ্ছিল না সুদীপ। একজন মাস্টারমশাই এত ক্যালাস হন কি করে ! সে জিজ্ঞাসা করল, ‘কিছু মনে করবেন না, আপনাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে ?’

‘দিন কি বলছেন ? পাঁচ বছর !’

‘ছেলেমেয়ে হয়নি, না ?’

লোকটির মুখ অন্য রকম হয়ে গেল। সেটাকে কাটাতেই বোধ হয় চায়ের শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, ‘কপাল ! অনেক ট্রিটমেন্ট করলাম। সবার তো সব হয় না, আমারও হল না। যাক, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আসুন না আমার ওখানে। ও খুব খুশী হবে। কালই বলছিল, দিদিমার বাড়িতে লোক এসেছে। ওখানে যে কেউ থাকবে তা কখনও ভাবিনি। আপনারা দুই বন্ধুতে এসেছেন ?’

‘হ্যাঁ।’

কথাটা বলেই সুদীপ দেখল কাগজ নিয়ে হকার আসছে। সে চা শেষ করে দাম দিতে শাঙ্খিল কিন্তু লোকটা সরবে প্রতিবাদ জানাল, ‘ছি ছি ছি! আপনি রাখুন। গরীব মাস্টার হতে পারি, তাই বলে একটু চা খাওয়াতে পারব না ভাবলেন কি করে!’

সুদীপ মুক্তিটা কাটাতে পারত কিন্তু আর কথা না বারিয়ে সে এগিয়ে গিয়ে কাগজ কিনল। চারটে কাগজ। খুচরো ফেরত নেবার সময় একটা কাগজের প্রথম পাতায় নজর পড়তেই ওর মেরুদণ্ডে যেন শীতল বাতাস লাগল।

এই সময় লোকটি ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ ওর গলা শুনতে পেল, ‘কি আরম্ভ হল বলুন তো! দেশটা পাঞ্জাব হয়ে গেল নাকি! দুটো খুন। যাক, একজন প্রেপ্তার হয়েছে। নকশালরা তাহলে এখনও অ্যাকটিভ, কি বলেন?’

সুদীপ ওর দিকে তাকাল, ‘নকশালরা এসব করছে তা আপনাকে কে বলল?’ লোকটি বিন্দুমাত্র বিব্রত না হয়ে বলল, ‘ওরাই তো এসব করে। কি লাভ হয় কে জানে!’

সুদীপ অনেক কণ্ঠে তর্ক করার মোভ সংবরণ করল। তারপর বলল, ‘আমি শাঙ্খিল।’

‘যাচ্ছেন? বাড়িতে? চলুন, আমিও তো ফিরবো।’ লোকটি ওর সঙ্গ নিল।

‘আপনি চা নিয়ে যাবেন বলেছিলেন না?’

‘চা! ও হ্যাঁ। কিন্তু এখন নিয়ে গেলে জল হয়ে যাবে। আবার আসতে হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ওই যারা প্যারাডাইস পুড়িয়েছে, বড়বাজারে খুন করেছে তারা নকশাল হোক বা না হোক আমি কিন্তু সমর্থন করি না। আমার স্কুলের অনেক মাস্টার অবশ্য ওদের সমর্থন করছে, কিন্তু এই আইন নিজের হাতে নেওয়ার ব্যাপারটা খুব খারাপ। তাহলে দেশটাই পাঞ্জাব হয়ে যাবে। রোজ খুন, রোজ লুণ্ঠপাট, ভারতবর্ষ থাকবে না। পাবলিক তো বোঝে না, এই সব দেখলেই তেতে ওঠে।’ খুব বিরক্ত গলায় কথা বলতে বলতে পাশে হাঁটছিল লোকটি। সুদীপ এবারেও কিছু বলল না। তার গুয় হাঙ্খিল, সে যদি কথা বলতে শুরু করে তাহলে লোকটির সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে না। এবং এই সময় খামোকা একজন শত্রু বানিয়ে কোন লাভ নেই।

লোকটি বলল, ‘আমি আমাদের ইংরেজি মাস্টারমশাইকে বলেছিলাম এটা সম্ভব নয়। এই দেশে কেউ খুন করে, প্যানিক তৈরি করে জিতে যেতে পারে না। ধরা এদের পড়তেই হবে। চারজন ছেলেমেয়ে কোন রকম ট্রেনিং ছাড়াই এত বড় একটা অর্গানাইজড সরকারী শক্তিকে কত দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে? তাই তো হল। ধরা একজন পড়ল ওদের! এবার কান টানলেই মাথা আসবে। বাকি তিনজনের ধরা পড়তে বেশী দেরী হবে না। আপনি কি বলেন?’ খুশী মনে প্রশ্ন করলেন লোকটি।

‘একজন ধরা পড়লে তো সবাই ধরা পড়বে।’ সুদীপ বিরস গলায় উত্তর দিল।

বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। লোকটি বললেন, ‘তাহলে এখন আসি। একটু বেলায় চলে আসুন। গল্প করা যাবে।’

উঠানের দরজা খোলাই ছিল। এটা স্বাভাবিক নয়। তারপর নজরে এল বৃদ্ধা উঠানে বসে আছেন চাদর গায়ে দিয়ে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মোটেই সুস্থ নন। সুদীপ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি হয়েছে আপনার? এভাবে বসে আছেন কেন?’

‘জ্বর। কাল রাতেই চেপে ধরেছে। আমার তো ম্যালেরিয়া আছে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে। ও কিছন্নয়। আমি ভাবছি তোমাদের ভাত রাঁধব কি করে?’ বৃদ্ধির শরীর কাঁপছিল।

‘আমাদের জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। কোন ওষুধ খেয়েছেন?’

‘ওষুধ লাগবে না। একবেলা শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে আর কোন যমে নেবে?’

‘ঠিক আছে আমি ওষুধ এনে দিচ্ছি একটু পরে। আপনাকে আজ কিছু করতে হবে না। কি কি অসুবিধে হচ্ছে বলুন।’ সুদীপ হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধার কপাল স্পর্শ করে দেখল জ্বর বেশ।

‘আর মায়া বাড়িও না তো। ওষুধ আমার লাগবে না। দরজাটা বন্ধ করে দিও।’ কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধা যখন মোড়াটা নিয়ে উঠে বারান্দার দিকে এগোচ্ছেন তখন চকিতে ওর চোখ ওপচানো জল দেখতে পেল সে। সুদীপ আবিষ্কার করল ওর বুকের ভেতরটা টনটন করছে।

দরজা বন্ধ করে ওপরে এসে দেখল বন্ধুরা উঠে পড়েছে। জন্মিতা চা করছিল। ওকে দেখামাত্র বলল, ‘তুই নিশ্চয়ই এত সকালে দুবার চা খাবি না?’

আনন্দ ওকে বলল, ‘আজ কিন্তু তুই প্রথমে ওর পেছনে লাগছিস! কাগজ দে।’

সুদীপ দুটো কাগজ আনন্দের দিকে ছুঁড়ে বসে পড়ল। তারপর হেডলাইনে নজর রেখে নিজের মনে উচ্চারণ করল, ‘ডেঞ্জারাস! এ কি ব্যাপার?’

‘হেস্টিংসের ঘোড়ার আস্তাবলে অগ্নিকাণ্ড। আটটি ঘোড়া মৃত, দুজন খুন, একজন ধৃত।’ নিজের কাগজে চোখ রাখতেই আনন্দও সোজা হয়ে বসল।

‘রান্নাে কলকাতা রেসকোর্সে যে সব ঘোড়া দৌড়ায় তাদের আস্তানায় চারজনের দুবৃত্ত দল হানা দেয়। বেপরোয়াভাবে বোমা মেরে তারা প্রহরীদের ভীত করে তোলে। বোমার আঘাতে দুজন প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারায়! আক্রমণকারীরা তারপর আস্তাবলে আগুন ধরিয়ে দেয়। অসহায় জীবগুলো সেই আগুনে আত্মরক্ষা করার কোন সুযোগ পায়নি। আটটি ঘোড়া জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। চারটি এত পুড়েছে যে তারা আর কোনদিন দৌড়াতে পারবে না বলে রেসকোর্সের ডাক্তার জানিয়েছেন। এদের জীবনহানির সম্ভাবনা

যায়নি। মধ্য রাত্রের কিছু পরে এই নুশংস কাজ শুরু হয়। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় চারজন ছিল। পালাবার সময় ওদের একজন ধরা পড়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের ঘটনার পর হুমকি দেওয়া হয়েছিল রেসকোর্স আক্রমণ করা হবে। সেই হুমকির ফলে রেসুডেরা গতকাল রেসকোর্সে ঢুকতে সাহস না করায় কতৃপক্ষ রেস বাতিল করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু মধ্যরাত্রে এই ধরনের আক্রমণের কথা কেউ কল্পনা করেনি। যে বারোটি ঘোড়া মৃত এবং একেজো হয়ে গেল তাদের ক্রয়মূল্য ছিল আঠারো লক্ষ টাকা। এ ছাড়া, অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। আক্রমণকারীরা যে সাধারণ ডাকাত নয় বা তারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই কাজ করেনি তা পরিষ্কার। মধ্যরাত্রে পুলিশ কমিশনার জানান, যে আক্রমণকারীকে ধরা হয়েছে তার বয়স একুশ। সংঘর্ষে আহত হওয়ায় তাকে এখন হাসপাতালে রাখা হয়েছে। জ্ঞান ফিরলেই জেরা শুরু হবে। এবং তাহলে ওর দলের অন্যান্যদের ধরা অসম্ভব হবে না। তিনি বলেন, প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের বিপ্লবীদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।’

এর পরে কাগজগুলো বিশদ বিবরণ দিয়েছে কিভাবে ঘটনাটা ঘটে। তার পাশেই বন্ধ করে ওরা সুদীপের টেলিফোনের খবরটাও ছেপেছে। তারপর সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু টেলিফোন যিনি করেছিলেন তিনি জানাননি যে আর কিছুক্ষণ পরে যে কাজ করতে যাচ্ছেন তাতে জনসাধারণের সমর্থন পাবেই না বরং কতগুলো নিরীহ প্রাণিকে হত্যা করে তারা নিছক খুনী বলেই প্রতিভাত হবে।

কল্যাণ বলল, ‘এটা কি ব্যাপার? আমি তো মাথা মুণ্ডু বুঝতেই পারছি না।’ আনন্দ তাঁঁট কামড়ে বসেছিল। জয়িতা বলল, ‘ওই চারজনের মধ্যে কোন মেয়ে আছে কিনা তা লেখিনি। একজন ধরা পড়েছে। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ছেলেটাকে।’

সুদীপ বলল, ‘বুঝতেই পারছি ওই চারজন আমাদের কাজ দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে এই কাণ্ডটা করল। একবারও ভেবে দেখল না এটা আমাদের কিরকম বিপক্ষে যাবে। অবলা জানোয়ার পুড়িয়ে মারল ওরা। পুরো পাবলিক সিমপ্যাথি নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এই চারজন যে খুব বিক্ষিপ্ত কোন ছেলের দল তা মনে হচ্ছে না। উগ্রপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোন দল এটা করিয়েছে। যেভাবে মৃতি ভাঙতো, পুলিশ মারতো ঠিক সেইভাবে ঘোড়া পোড়াল। ইন্ডিয়ট।’

আনন্দ কিছু বলছিল না। একটা চিন্তা ওর মাথায় কেবলই পাক খাচ্ছিল। কোন দল বা স্বার্থ আছে এমন কেউ বা কারা তাদের সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই এমন কাণ্ডটা করালো না তো! কিন্তু যে ছেলেটি ধরা পড়ল তার তো মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। ফলে আদালতে সে সত্যি কথা বলবেই। সে ক্ষেত্রে নিয়োগকারীদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে। তারা কখনই চাইবে না ছেলেটা মুখ খুলুক। এখন যদি ওর জ্ঞান না ফেরার ব্যবস্থা করতে পারে

ওরা! আনন্দ প্রচণ্ড অস্থির মধ্যে আবার কাগজে চোখ বোলাল। বড়বাজারের ঘটনাক্রমে পরিপ্রেক্ষিতে মোহনলালের সম্পর্কে আরও তথ্য বেরিয়েছে। সে যে শুধু জাল ওশুখের কারবার করত তাই নয়, অনেকরকম দুনস্বরী ব্যবসা ছিল তার প্রমাণ পুলিশের হাতে এসেছে। প্রথম পাতটা জুড়েই তাদের খবর। পুলিশ একে কিছুতেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে চাইছে না। অস্থিরমতি কিছু বিপথগামী ছেলেদের কীতি এটা। পুলিশের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে কিছু রাজনৈতিক দল। একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, 'বিপ্লবের কোন সংজ্ঞায় এরা পড়ে না। জনসাধারণের সামনে বিপ্লবের নামে কিছু বিদ্রোহিত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই কার্যমীম্বার্থ রক্ষাকারীরা এদের নিয়োগ করেছেন।' কয়েকটি উগ্র মতাবলম্বী দল স্পষ্ট বিরূতি দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করেছে এই বলে যে তাদের সঙ্গে এই কাজের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু পুলিশ যদি আজ সকালে সন্ধ্যা হয়, যে চারজন আগের কাজ দুটো করেছে তাদের একজনকে যখন ধরা সম্ভব হল তখন বাকী তিনজনও ধরা পড়বে সেই সম্ভূতি দূর হতে বেশী সময় লাগবে না। ছেলেটির পরিচয় জানামাত্র পুলিশ বুঝবে আনন্দ কল্যাণ এবং সুদীপের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। ওদের সঙ্গে কোন মিলে নেই এটাও ওরা জানতে পারবে। তবে এটা ঠিক, এতে পুলিশের সমস্যা বাড়বে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই চুপচাপ যে!'

আনন্দ হাসল অনেকক্ষণ পরে, 'কি বলব! এরকম হোক আমি চাইনি। যদি কোন সাধারণ ছেলের দল কাজটা করে থাকে তাহলে বলব ভুল করেছে। আটটা ঘোড়াকে না পুড়িয়ে আটজন অসৎ ব্যবসায়ী কিংবা ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতাকে পুড়িয়ে মারলে মনে করতাম আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। আর এরা ধরা পড়লেই পুলিশ জানবে আমরা কাজটা করিনি। সেটা যদি প্রেস জানতে পারে তাহলে পাবলিক জানবে। আমাদের তরফ থেকে আজ আবার প্রেসকে জানাতে হবে এই ব্যাপারটা সমর্থন করি না আমরা। যারা আমাদের কাজের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করতে উদ্যোগ নেবে তারা যেন প্রতিটি পরিকল্পনা হাতে নেবার আগে খুঁটিয়ে দেখে নেয় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে। কাগজগুলো যদি বিরূতি ছাপে তাহলে আর জনসাধারণ আমাদের ভুল বুঝবে না। চা দে। গলা শুকিয়ে কাঠ হলে গেছে।'

কল্যাণ বলল, 'আগে ভাগে প্রেসকে জানালে বোকামি হবে না? পুলিশ ভাবছে কাজটা আমরাই করেছি। ছেলে তিনটে ধরা পড়লে আমাদের ওপর থেকে পুলিশের নজর সরে যাবে। অথচ আগে ভাগে জানালে আমরা এই সুযোগটা সদ্ব্যবহার করতে পারব না, তাই না?'

আনন্দ আবার হাসল, 'এরকম হলে আমিও খুশী হতাম। কিন্তু যে ছেলেটি ধরা পড়েছে তার পরিচয় জানার পর পুলিশের বুঝতে অসুবিধে হবে না আমরা আলাদা। আমরা তাই বেশীক্ষণ নিশ্চিত থাকার সুযোগ পাচ্ছি না।'

কল্যাণ ।’

সকাল নটা নাগাদ যে বাংলা খবর হয় সেটাতে নতুন কোন তথ্য জানা গেল না। ধরা পড়ার পর আশ্চাব্যের লোকজন ছেলেটিকে এমন মারধোর করেছে যে এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। সামান্যতম সুযোগই পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যে ট্যান্ড্রি করে ওরা এসেছিল সেটিকে সফট থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সেখানে অনেকের ছাপ পেয়েছে। এই হাতের ছাপের সঙ্গে পূর্ববর্তী দুটি ঘটনার জন্যে দায়ী সন্দেহ ভাজনদের হাতের ছাপ মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

আনন্দ বলল, ‘এই ঘটনাটার কথা আমরা ভুলে যাব অথবা উপেক্ষা করব। আগামীকাল সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় আপাতত তৃতীয় অ্যাকশনটি করব। আগের দুটি ঘটনায় আমরা দুটো প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছি। এবারে আমাদের লক্ষ্য ব্যক্তি। এমন একটি ব্যক্তি যিনি জনদরদী সেজে জনসাধারণের সর্বনাশ করছেন। ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও ভারত বিরোধীদের প্ররয় দিচ্ছেন ভোটে জেতার জন্যে। পার্টি তাঁকে মন্ত্রী দিচ্ছে যাতে তিনি পার্টির স্বার্থ বজায় রাখেন। এই লোকটি নিজের ব্যাংকের জমানো টাকার পরিমাণ বেআইনী পথে শুধু বাড়াচ্ছেন না, একটি বিশাল এলাকায় তিনি স্মাগলারদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে সাহায্য করছেন। তোরা কি সবাই একমত এই ব্যক্তির পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন আছে কি নেই সে ব্যাপারে?’

সুদীপ বলল, ‘এত ভূমিকা করার কোন দরকার নেই। এই মন্ত্রী যিনি ষড়যন্ত্রী তার বিসর্জনের বাজনা শুনতে পাচ্ছি। আগামী সন্ধ্যায় ভাসান দিয়ে আসবো।’

কল্যাণ বলল, ‘এই ব্যক্তি হত্যায় ফোন পাপ নেই।’

জয়িতা খিঁচিয়ে উঠল, ‘পাপ। ওসব ফালতু কথা বলিস না। পাপ পুণ্য বলে কোন কথা নেই। আসল ব্যাপার হল ভাল এবং মন্দ। শুধু মন্ত্রী নয় ওই নানুভাইটাকেও সরাতে হবে। কারণ মন্ত্রীকে মারলে নানুভাই আর একটা লোককে মন্ত্রী বানিয়ে দিতে দেবী করবে না। শেকড় না ওপড়ালে অ্যাকশনটা করার কোন মানে হয় না। কিভাবে করবি প্ল্যান করেছিস?’

‘অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আজকে একবার মন্ত্রীর বাড়িটা দেখতে যাব। এই সব জনতার সেবক বাড়িতে বেশী পুলিশ প্রটেকশন রাখবে। তাছাড়া নানুভাই এলে তার সঙ্গীরাও থাকবে। অতএব যা করতে হবে খুব ভেবে চিন্তে করতে হবে। আমি রিপোর্টার হয়ে যাব সংগে থাকবে ক্যামেরা নিয়ে সুদীপ।’

আনন্দকে বাধা দিল জয়িতা, ‘ক্যামেরা নিয়ে তোর সঙ্গে আমিও যেতরে যেতে পারি।’

‘পারিস কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয়। কলকাতার কোন কাগজের মহিলা ক্যামেরাম্যান নেই।’

সুদীপ হেসে বলল, ‘মহিলা ক্যামেরাম্যান?’ কানে লাগলেও চান্নাতে পারিস

শব্দটাকে।’

‘নেই বলে হবে না কেন? এককালে তো খবরের কাগজে মেয়েদের চাকরিই দেওয়া হত না। এখন সব এডিটিং তো অবশ্যই, বিজ্ঞাপন এমন কি সম্পাদনার কাজেও বড় কাগজগুলো মেয়েদের চাকরি দিচ্ছে। অতএব ক্যামেরা নিয়ে যেতে দোষ কি?’ জয়িতা প্রতিবাদ জানাল।

‘দোষ আছে আমি বলিনি। যতদিন না চোখ সওয়া হচ্ছে ততদিন আমাদের পক্ষে এই কাজটা তোকে দিয়ে করানো ঝুঁকি হয়ে যাবে। যাক, আজ আমরা বের হব। আমি আর সুদীপ। তোদের আগেও বলেছিলাম মাঝে হয়তো কিছুদিনের জন্য কলকাতা থেকে আমাদের দূরে চলে যেতে হতে পারে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটবে ভাবিনি। ভারতবর্ষের কোন জায়গায় আমাদের চারজনের পক্ষে লুকিয়ে থাকা নিরাপদ হবে না। আমরা যাব ভুটান বা নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে একটা পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে যোগাযোগের কোন সুবিধে নেই। কিছুদিন সেখানে থেকে যখন এদিকে আমাদের সম্পর্ক খোঁজ খবর নেওয়ার ইচ্ছেয় চিলে পড়বে তখন আবার ফিরে আসা যাবে। তাছাড়া এইটুকুতে দেশের লোকের প্রতি কি প্রতিক্রিয়া হল তাও জানতে পারব আমরা। কাল রাত্রে অ্যাকশনের পরই আমরা বেরিয়ে যাব। মাল-পত্র নিয়ে আমরা যাব বাই রোড এবং বাই ট্রেন। কল্যাণ আর জয়িতা যাবি বাই প্লেন। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে প্লেনে কলকাতা ছাড়াই নিরাপদ। ওরা মনে করতে পারবে না বাঙালিরা প্লেনে পালাতে পারে।’

জয়িতা বলল, ‘প্লেনে কোথায় যাব?’

‘সেসব ডিটেলস আজ রাত্রে আলোচনা করব। তার আগে সারাদিন কিছু কেনাকাটা আছে। শীত প্রধান অঞ্চলে যাতে বেশ কিছুদিন থাকা যায় সেই রকম ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। সুদীপ বলছে বুড়ির জর হয়েছে। অতএব আজ দুপুরে খাবার পাওয়া যাবে না নিচ থেকে। তোর এখানে যা আছে তাই খেয়ে নে, ফেরার সময় আমি খাবার কিনে নিয়ে আসব। আজ অন্তত তোরা সেফ, বুড়ি হঠাৎ ওপরে উঠে আসবে না। সুদীপ, আমি আগে বেরিয়ে যাচ্ছি। লিস্টটা আমার সঙ্গে থাকল। যত তাড়াতাড়ি পারিস ফিরে আসিস।’ গতরাত্রে টাকা আর লিস্ট দুজনে ভাগ করে নিয়েছিল।

জয়িতা বলল, ‘চুপচাপ এখানে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না আনন্দ।’

‘বুঝতে পারছি। আর একটা দিন। তাঁরপর যে ছোট্ট গুরু হবে তখন বলবি আর ছুটতে পারছি না আনন্দ, এবার চুপচাপ বসতে চাই।’ আমি আসছি তাহলে। সুদীপ তুই একটু পরে বের হবি। নিচে আয় দরজাটা বন্ধ করে দে।’ আনন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লে সুদীপ তাকে অনুসরণ করল।

আজ দিনটা বেশ মেঘলা। নিচে আনন্দ একবার স্বদ্ধার বারান্দার দিকে তাকাল। ঘরের দরজা আধাভেজানো। সে ইশারা করতে সুদীপ ওর সঙ্গে

এগিয়ে দরজাটা খুলল। খাটের ওপর রুদ্ধা কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। সুদীপ কাছে গিয়ে ডাকল, 'কেমন লাগছে এখন ?' রুদ্ধা চোখ মেলালেন। তার পর কোনমতে উচ্চারণ করলেন, 'জ—ল। জল দেবে ?'

আনন্দ চটপট পাশের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে সুদীপের হাতে দিতে সে রুদ্ধার সামনে গ্লাসটা ধরল। শুয়ে শুয়েই মুখ পাশ ফিরিয়ে রুদ্ধা খানিকটা খেয়ে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা, ভীষণ শীত করছে আমার। তোমাদের রুঁধে দিতে পারলাম না। অতিথি উপোস করে রইলে।'

কিশুকুণ অপেক্ষা করে ওরা বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ওষুধ আনা যায় বল তো। শীত করছে যখন তখন ম্যালেরিয়া। কুইনাইন খায় না এই সময় ? নাকি কোন ডাক্তারকে গিয়ে সিমটমগুলো বলব ?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না তুই চলে যা। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খায় কি না তাই জানি না। আমি আর একটুখানি দেখি, যদি না কমে তাহলে পাশের বাড়ির ড্রল্লোককে ডাক্তারের কাছে পাঠাব।'

আনন্দ বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে। সুদীপ আকাশের দিকে তাকাতেই নিম্ন গাছটার পাতা দেখতে পেল। বেশ ঝাঁকড়া হয়েছে গাছটা। অথচ রুদ্ধা এই গাছ থেকে কোন উপকার নেন কিনা কে জানে! এসে অবধি তো দ্যাখিনি। অবশ্য কে যেন বলেছিল নিম্নগাছের বাতাস নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। আবার ঘরটার দিকে তাকাল সুদীপ। খুব খারাপ লাগছিল ওর।

দরজায় কয়েকবার শব্দ করার পর সাড়া মিলল। লোকটি সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে যেন পুলকিত হল, 'আরে, আসুন আসুন। আমি বললাম ওকে বলে এলাম তবু এলেন না কেন, ভেতরে আসুন।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না। মানে, আপনার কাছে অন্য উদ্দেশ্যে এলাম। পিসীমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে, ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। একটু ডাক্তারকে বলে ওষুধ আনা দরকার।'

'ডাক্তার! মুশকিলে ফেলে দিলেন—!' লোকটিকে চিন্তিত দেখাল।

'অবশ্য আপনার কাছে যদি জ্বরের, মানে এই ধরনের জ্বরের কোন ওষুধ থাকে তাহলে—'

'না না। আপনি বুঝতে পারছেন না। উনি তো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাবেন না। জ্বর দিলে হিতে বিপরীত হবে। মানসিক রোগ। বেহালা চৌরাস্তার মোড়ে একজন হোমিওপ্যাথের কাছে ওষুধ এনে খান দরকার হলে। আমিও দু-একবার এনে দিয়েছি। কিন্তু আজ সেই ডাক্তার এবেলা বসবেন না বলেই মুশকিল শব্দটা বললাম। ট্যাবলেট ক্যাপসুল দিলে খাবেন ভেবেছেন ? জ্ঞান থাকতেও না। এক কাজ করি বরং দুপুরের পরে যখন ফিরব তখন আমি ওষুধ নিয়ে আসব। জ্বর, কাঁপুনি। কত জ্বর ?'

‘সেটা তো জানি না তবে বেশ জ্বর। দাঁড়াতে পারছেন না।’

‘পায়খানা হয়েছে? খেয়েছেন কিছু?’ লোকটি যেন ডাক্তার হয়ে গেল এই মুহূর্তে।

‘সে-কথা জিজ্ঞাসা করিনি।’

‘ঠিক আছে তাতেই চলবে। আমি তো স্নান খাওয়া সেরে বের হচ্ছিলাম এই সময়ে আপনি—’

‘তাহলে আমি চলি। আপনি দয়া করে ওষুধটা আনবেন। কত দিতে হবে?’ কত আর, পাঁচ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। হোমিওপ্যাথি ওষুধ গরীবদের জন্যে বুঝনেন!’

সুদীপ পকেট থেকে সত্তর্পণে টাকা বের করতে গিয়ে একটা একশ টাকার নোট বের করে ফেলল। সে ভয় পেল, পাল্টে আর একটা বের করতে। চেষ্টা করলে যদি আরও একশ বেরিয়ে পড়ে। তার পকেটে অত টাকা দেখে নিশ্চয়ই লোকটি স্বস্তি পাবে না। সে টাকাটা লোকটির দিকে এগিয়ে ধরল, ‘আমার কাছে খুচরো নেই, এটা রাখুন।’

‘কি আশ্চর্য! পাঁচ টাকার জন্যে একশ দিচ্ছেন কেন? ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসি তারপর ও নিয়ে ভাবা যাবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না দরজা থেকে আপনি চলে যাবেন কেন? আসুন, ভেতরে, আসুন।’ লোকটি প্রায় হাত ধরেই টানলো ওকে।

সুদীপ শেষবার আপত্তি জানাল, ‘আপনি তৈরী হয়ে নিয়েছেন, বেরুবেন বললেন, এই সময়ে আসা মানে বিরক্ত করা, তাই না?’

লোকটি এবার মুখ নামিয়ে আনল সুদীপের কাছে, ‘কাল থেকে শুয়ে আছে। সকালে কোনমতে কল-পায়খানা সেরেছে। বলছে মাথা ঘুরছে আর দুর্বল লাগছে। তা আমি নিজেই সব কিছু করলাম। চা খাওয়ালাম, রান্না করলাম। ওর জন্যে ভাত ডাল ভাজা আর ডিমের ঝোল করে ঢেকে রেখে দিয়েছি। বলেছি যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমাক। এই অবস্থায় বেশী নড়াচড়া করতে হবে না। শিবের আশির্বাদ যে কাল তিনি দেহ রাখেননি। যদি আপনার কাছে ক্যাপসুল—’ হঠাৎ লোকটি থেমে গেল, ‘লোকে কপালে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আপনার পকেটে এত ক্যাপসুল থাকতে ঠিক বিষ নষ্ট করার ক্যাপসুল থাকতে যাবে কেন? আপনি তো জানতেন না ও তখন বিষ খাবে।’

লোকটি কথাটা বলে সুদীপের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। অর্থাৎ এখন লোকটির মনে সন্দেহ ঢুকেছে। অথচ এ নিয়ে বোধ হয় কারো সঙ্গে কথাও বলতে পারছে না। সুদীপ চটজলদি জানাল, ‘আমার বন্ধুর খুব ভয় যে ওকে সাপে কামড়াবে। মানে ধারণা এসব অঞ্চলে প্রচুর সাপ আছে। ও-ই আমাকে ক্যাপসুলটা রাখতে দিয়েছিল। সাপ কামড়ালে ওটা ওর মুখে দিয়ে দিলে রক্ত বিষকে আর গ্রহণ করবে না। সেটাই পকেটে ছিল আমার।’ এর চেয়ে বেশী মিথ্যে ওর মাথায় এল না। যদিও তার বলতে ইচ্ছে করছিল, আপনার স্ত্রীর

কিছুই হয়নি। তিনি স্নেহ ভড়কি দিয়েছেন আপনাকে!

লোকটি এবার তৃপ্তির হাসি হাসল। মানুষ কত সহজে খুশী হয়। সে নিজেও যখন জানে বোকামি করছে কিন্তু তা যদি আনন্দদায়ক হয় তখন বোকা সাজতে তার দ্বিধা থাকে না। লোকটিকে দেখে সুদীপের এখন সেই রকম মনে হচ্ছিল। যেন একটা মেঘ সরে গেছে এমন ভঙ্গী করছিল লোকটি।

কাল রাত্তির ঘরটিতে লোকটিকে অনুসরণ করে ঢুকল সুদীপ। রাতে যা আড়াল থাকে দিনে তা পরিষ্কার। লোকটির আর্থিক অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। সংসার চালাতে যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় তা বোঝাই যাচ্ছে। ঘরের আসবাব, রেডিওর চেহারা এবং আলনার জামাকাপড় একটি বিশেষ শ্রেণীকেই চিহ্নিত করছে। লোকটির এগিয়ে দেওয়া কাঠের চেয়ারটায় বসে সামনে তাকাল সুদীপ। শুবতী উপুর হয়ে গুয়ে আছেন বালিশে মুখ গুঁজে। এখন ওর পরনে গত রাতের শাড়িটি নেই। কিন্তু এই ঘর, আসবাব, জিনিসপত্র এবং এই লোকটির সঙ্গে ওর শোওয়ার ভঙ্গী শাড়ি এবং স্বাস্থ্য একদম বেমানান। সুদীপ যে এই ঘরে ঢুকছে তাও যেন টের পায়নি শুবতী। লোকটি বলল, 'এখন কি করা যায় বলুন তো। এই যে খিঁমুনি ঘুম ঘুম ভাব, এসবই নিশ্চয়ই বিশ্বের প্রতিক্রিয়া। ইঁদুর মারার বিষ এনেছিলাম তাই খেয়েছিল। এখনও ভাবলে আমার গায়ের লোম সোজা হয়ে যায়। মরে গেলে হাতে দড়ি পড়ত আমার। বিষটার প্যাকেটে বড় বড় অক্ষরে পয়জন লেখা আছে।'

সুদীপ অনেক চেষ্টা করল অভিনয় ঠিক রাখতে, 'ফাঁড়া যখন কেটে গেছে তখন আর চিন্তা করছেন কেন? রেস্ট নিতে দিন, ঠিক হয়ে যাবে। তবে আর যেন এমন না হয় তাই দেখবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মাথা নাড়ল, 'ক্ষমপেছেন। ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায়। আমি কি পাগল।'

সুদীপ বলল, 'দুবার। একবার বেল মাথায় পড়ে, দ্বিতীয়বার পড়ে যাওয়া বেলটা কুড়িয়ে আনতে।'

শোনামাত্র লোকটি হ্যা হ্যা করে খানিকটা হাসল। সুদীপ আড়চোখে লক্ষ্য করল গুয়ে থাকা শরীরটার পিঠ কয়েকবার কেঁপে উঠল। লোকটি বলল, 'কতক্ষণ বাদে একটু মন খুলে হাসলাম। যাক, বলছেন তাহলে এখন আর কোন ভয় নেই! ওষুধ পত্র দিতে হবে না তাহলে!' কথাগুলো বলে লোকটি উঠে বিছানার পাশে দাঁড়াল, 'শুনছ। ওগো শুনছ! দ্যাখো কে এসেছে! ও-বাড়ির দিদির খুব অসুখ বুঝলে!'

সুদীপ বলল, 'আঃ, ওকে বিরক্ত করছেন কেন? আপনি তো বের হবেন, আমি চলি।'

লোকটি বলল, 'সেই তো মুশকিল! আমি বেরিয়ে গেলে তো দরজা দিতে হবে।'

সুদীপ উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা বলুন তো—ওর

বিষ খাওয়ার দরকার হল কেন? খামোকা তো কেউ আত্মহত্যা করতে চায় না। নিশ্চয়ই একটা কারণ থাকবে।’

এবার লোকটি কুঁকড়ে গেল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘কাল থেকে আমি ভাবছিলাম কখন এই প্রসঙ্গটা শুনতে হবে। দোষ আমার। ও খুব বড় ঘরের মেয়ে। পড়াতে গিয়ে যা হয় আর কি। সবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করি। তারপর এই অভাব, ওর একটা সাধ আহুদ রাখতে পারিনি, বয়সেরও পার্থক্য, সব মিলিয়ে সুখী তো করতে পারলাম না। ওর বাপের বাড়ির লোক বলে দিয়েছে আমাকে ত্যাগ করে যদি যেতে পারে তাহলে গ্রহণ করবে! অতএব সে-দরজা বন্ধ। তারপর বাচ্চা কাচ্চাও হল না আমাদের! কম ডাক্তার দেখালাম না তো। বয়স অল্প, চঞ্চল মন, মাঝে দু-একটা ভুল করে ফেললে পাড়ার লোক কুকথা বলে। শুনে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারিনি গতকাল। তবে হ্যাঁ, কাল রাতে প্রতিজ্ঞা করেছি আর কিছু বলব না। যাতে ও সুখ পায় তাই করুক। আমাকে ছেড়ে না গেলেই হল।’

সুদীপ অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এই মুহূর্তে ওকে কর্তের মত দেখাচ্ছিল। আর তখনই যুবতী পাশ ফিরল। ধীরে ধীরে চোখ মেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বুকু পড়ে প্রণম করল, ‘কেমন লাগছে এখন? ভাল আছ তো?’

যুবতী ধীরে ধীরে মাথা নড়ল ‘ভাল’। তারপর সুদীপের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

লোকটি বলল, ‘ইনি দিদিমার বাড়িতে এসেছেন। খুব ভাল লোক। কাল এর ওষুধেই—’

সুদীপ মাওয়ার জন্যে পা বড়াল, ‘আমি চলি।’ তার আর এই অভিনয় ভাল লাগছিল না।

যুবতী বলল, ‘আপনি দাঁড়ান। নিমপাতা দেননি বলে এখন থেকে চা না খেয়ে যাবেন তা হবে না।’

সুদীপ উত্তর দিল, ‘আপনি অসুস্থ! আমার মনে হয় ওয়ে থাকলেই আপনার ভাল হবে।’

‘কিসে ভাল হবে আমি জানি। তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেবী হয়ে যাচ্ছে না?’

প্রায় ধমকের গলায় যুবতী কথাগুলো বলতেই লোকটি শশব্যস্ত হয়ে বলল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। বিকেলের মধ্যেই আমি দিদিমার ওষুধ নিয়ে আসব। খাবার দাবার সব—।’

যুবতী ওকে থামাল, ‘বিকেলের মধ্যে নয়। স্কুলে গিয়ে দু ঘন্টা ছুটি নিয়ে এবলাতেই ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এস। রাতে জ্বর হয়েছে আর তিনি তোমার ওষুধের জন্যে বিকেল পর্যন্ত বসে থাকবেন?’

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল তাই করবে। তারপর আর কথা ব্যয় না করে

পাশের দরজা খুলে বেগ্নিয়ে গেল। এবার যুবতী উঠে দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এসে বলল, 'কথা কানে যায়নি? বসুন। আমিও চা খাব।'

সুদীপ খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এই নাটকটা করলেন কেন? আর করলেনই বা তো আমাকে এর সঙ্গে জড়ালেন কেন? আপনার স্বামী মানুষ হিসাবে খারাপ নন। ওঁকে ঠকাতে আমার খারাপ লাগছে।'

'কে কাকে ঠকায়। তাছাড়া আপনি যে এসে হাজির হবেন তা আমি জানতাম না।' যুবতী জানাল।

'কিন্তু এটা আমার প্রণয়ের উত্তর হল না। আপনি কেন এমন করলেন?' সুদীপ জেদী গলায় প্রশ্ন করল।

'বেশ করেছি। আমি আজ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব ভেবেছিলাম। যাওয়ার আগে ওকে জব্দ করতে চেয়েছি। একটা মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে তাকে চিরকাল বাধ্য হয়ে ভালবাসতে হবে? তার সঙ্গে আমার মনের কোন মিল না থাকলে, তাকে অসহ্য মনে হলেও চিরকাল একসঙ্গে থাকতে হবে? কত বড় বড় লোকের সম্পর্ক তো না বনলেই ভেঙ্গে যায়, দুটো দেশের কত চুক্তি তো এক মুহূর্তেই বানচাল হয়ে যায়। তাহলে একটা মানুষকে চিরকাল কেন বাধ্য করা হবে সহ্য করতে। বাপের বাড়িতে আমি ফিরে যাব না কারণ আমি কারো কল্লুনা নিতে চাই না। এসবই তো কাল ভেবেছিলাম।' যুবতী ঠিক উত্তেজিত নয় কিন্তু সাধারণ গলায় কথা বলছিল না।

ঠিক তখনই ওপাশের দরজায় শব্দ হল। একটা চোরা গলায় ডাক ভেসে এল, 'এই, শুনেছ, এই, আমি এসেছি। আমি তৈরি হয়ে এসেছি। যাবে তো?'

যুবতী সুদীপকে বলল, 'একটা উপকার করবেন! দরজাটা খুলে ছেলটাকে বলুন আমি বিষ খেয়েছি। ও যদি এখানে দাঁড়ায় তাহলে পুলিশ ওকে ধরবে।'

সুদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কি ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনাকে কিছুই বুঝতে হবে না। যা বলছি তাই দয়া করে করবেন?'

সুদীপ কৌতূহলী হয়ে উঠল। দরজাটা খুলতেই তাকে দেখে একটি যুবক খতমত হয়ে গেল। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

যুবক বলল, 'না-মানে-কিছু নয়—।' তারপর পাশে রাখা সুট্যাকেসটা তুলে নিয়ে চলে যেতে চাইল।

সুদীপ বলল, 'এই যে মশাই, আপনি দাঁড়ান। আপনাদের কি কোথাও যাওয়ার কথা ছিল?'

যুবক মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আমাকে যেতে দিন।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? এসেছিলেন কেন?'

'আপনার এখানে থাকার কথা ছিল না।'

‘ও। শুনুন। উনি গতরাতে বিষ খেয়েছেন।’

‘অ্যাঁ।’ যুবকটির চোখ বিস্ফারিত হল। সুদীপ স্পষ্ট বুঝতে পারল ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

‘হসপিটালে আছেন। চলুন, দেখতে যাবেন না?’

যুবকটি আর দাঁড়াল না। শয়ালের ভঙ্গীতে দৌড়ে পালাল সে। দরজা বন্ধ করে ভেতরে আসতেই যুবতী বলল, ‘ধন্যবাদ। আর একবার।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘একে তাড়ালেন কেন?’

যুবতী বলল, ‘আজ ভোর থেকেই মনে হচ্ছিল চলে যাওয়াটা হয়তো ভুল হবে। শেষবার যাচাই করলাম। এ যাত্রায় আপনার জন্যে বেঁচে গেলাম আমি। নেবা উনুন থেকে গরম কড়াইতে পড়তাম আমি। দেখি কতদিন এখানে মানিয়ে থাকতে পারি। আসুন, আমার হাতের চা খাবেন না?’ যুবতীর ঠোঁটে সেই হাসি ফিরে এল।

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘না। আমার হাতে অনেক কাজ আছে।’ তারপর আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে স্বদ্ধার দরজা পেরিয়ে সেটাকে বন্ধ করল।

এবং এবার লোকটার জন্যে কষ্ট হচ্ছিল।

॥ ২৫ ॥

চারটে পিঠে বসে-নিয়ে যাওয়ার ব্যাগে প্রত্যেকের জিনিসপত্র ধরে গেল। গতকাল সুদীপ আর আনন্দ সমস্ত কলকাতা চম্বে প্রায় সব কিছুই পেয়ে গেছে। বিকেলবেলায় ওরা চারজনে ছাদের ঘরে বসে ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল। ওষুধপত্রের স্তুপ দেখে কল্যাণ খুব হেসেছিল। সুদীপও স্বীকার করেছে উত্তেজনায় পরিমাণটা বেশী হয়ে গিয়েছে। জয়িতা বলেছিল ওটা একটা মাঝারি হাসপাতালের এক মাসের রসদ। জয়িতার হাতে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের টিকিট দুটো দিল আনন্দ। কল্যাণ কখনও প্লেনে উঠেনি। স্বভাবতই সে টিকিট দুটো দেখে উত্তেজিত হল এবং বলেই ফেলল, ‘সত্যি কথা বলতে কি, আজ কাগজ পড়ার পর থেকেই মনে হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছাড়া যায়।’

আজকের কাগজের প্রথম পাতার খবর তারাই। আহত ছেলোটির কাছ থেকে স্টেটমেন্ট পাওয়ার পর পুলিশ গতকাল দুজনকে গ্রেফতার করেছে। এদের বয়স একুশের মধ্যে। কলেজের ছাত্র। এর আগে কখনও কোন অ্যাকশন করেনি। যে ধরা পড়েনি সে-ই নাকি বোমার ব্যবস্থা করেছিল। খবরের কাগজের দুটো অপারেশন এবং রেসকোর্সের ওপর হুমকির খবর পেয়ে তারা উত্তেজিত হয়েছিল। তাদের মনে হয়েছিল শুধু হুমকি দিলেই কাজ হবে না। যারা হুমকি দিয়েছিল তারা যে কাজটা করতে পারেনি তারা সেই কাজটা করে দেখাতে চেয়েছিল। মাঝারি মানের ছাত্র হওয়ায় তাদের সামনে কোন ভবিষ্যত ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলোর কাজকর্মের সঙ্গে তাদের মতের

কোন মিল নেই। কিন্তু এখন তারা দুঃখিত। ঘোড়াগুলো যে মরে যাবে তা তারা চিন্তা করেনি। আর যে দুজন প্রহরী মারা গিয়েছে তারা পলাতক বন্ধুর আক্রমণের শিকার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ স্বীকার করেছে, এই ঘটনার সঙ্গে প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। ওই দুটো ঘটনার আসামীদের ধরবার জন্যে পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশের এক মহলের সন্দেহ, আততায়ীরা পাঞ্জাবের দিকে চলে গেছে। প্রতিটি কাগজই অবশ্য কাল দুপুরের টেলিফোনের কথাটাও লিখেছেন। টেলিফোনে আক্রমণকারীরা তাদের জানিয়েছে যে, 'হেস্টিংসের ঘটনা তারা সমর্থন করে না। তারা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছে অযথা উত্তেজিত হয়ে এমন কিছু না করে বসেন যা প্রতিক্রিয়াশীল শব্দটির প্রচলিত ব্যাখ্যা অকেজো হয়ে গেছে। শ্রেণীসংগ্রামের নাম করে, মার্কস অথবা কম্যুনিজমের ইজারা নিয়ে এদেশীয় বৃজ্জোয়া এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিগির তোলাই যাদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল তারাই সীমিত ক্ষমতা হস্তগত করে জনতাকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের স্বার্থে। যে-দেশের মানুষের গড় দৈনিক আয় মাত্র কয়েক পয়সা সেই দেশে লক্ষপতিকেও এঁরা সর্বহারা বলতে দ্বিধা করেন না। আমাদের বলতে কোন দ্বিধা নেই এই নব্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পুরোন প্রতিক্রিয়াশীলদের চেয়ে অনেক বেশি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা দেশের মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর সংস্থা বা মানুষকে চূর্ণ করতে কোন হুমকির কাছে মাথা নোওয়াবো না।' সংবাদ-পত্রগুলো জানিয়েছে এই ফোনে সংবাদদাতা তাদের আগামী পরিকল্পনার কোন হৃদিশ দেননি।

আবহাওয়া খুব গরম হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। কল্যাণ টিকিট দুটো হাতে নিয়ে দেখছিল। দমদম থেকে বাগডোগরা। তার পরেই ওর মনে হল যদি এয়ারপোর্টে তাদের পুলিশ ধরে ফেলে। অথবা প্লেনে বসে থাকার সময়? তাহলে তো পালানোর কোন সুযোগ থাকবে না। কথাটা বলতে আনন্দ হাসল, 'প্লেনে তোরা অনেক সেফ। সঙ্গে এমন কিছু নিবি না যা সিকিটরিটি চেকিং-এর সময় অসুবিধা সৃষ্টি করে। কোন রকম আর্মস তোদের সঙ্গে নিয়ে তোরা প্লেনে উঠতে পারবি না। জাস্ট ট্রারিস্ট হিসেবে তোরা যাচ্ছিস। সুদীপ, তুই কখন বের হবি?'

সুদীপ ঘড়ি দেখল। 'ঘন্টাখানেক বাদে। তোরা রবীন্দ্রসদনের সামনে সাতটার সময় অপেক্ষা করবি। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। আমার জিনিসপত্র তোরা নিয়ে হাস।'

জয়িতা বলল, 'অতদূরে কেন? আমরা তো সঙ্ক্যের আগে এখান থেকে বের হচ্ছি না। তুই গাড়ি নিয়ে ট্রাম ডিপোর সামনে চলে আয়।'

আনন্দ বলল, 'সেই ভাল। কিন্তু কাল দুপুরে ফ্লাইট। তোরা অতক্ষণ কোথায় থাকবি?'

এই সমস্যাটা বড় হয়ে দেখা দিল। কোন পরিচিত নোকের বাড়িতে থাকতে সাহস পাচ্ছিল না ওরা। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। আনন্দের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল বাবার চিঠিটার কথা। বাবার বাকবীর কাছে সাহায্যের জন্যে গেলে কেমন হয়। সঙ্গে সঙ্গে মতলবটা বাতিল করল সে। যাকে কখনও দ্যাখেনি তার কাছে সাহায্য চাওয়াটাই বোকামী, যদিও বাবার চিঠির ভাষা উদ্রমহিলা সম্পর্কে একটা অন্য রকমের ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত সুদীপ পথ বাতলালো। এয়ারপোর্ট হোটেল নয়, আজ সন্ধ্যাবেলায় ওরা সোজাসুজি ডি আই পি রোডে চলে যাক। প্রায় এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ডি আই পি রোডের গায়ে একটা রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে। সাধারণত যারা ফাইট ধরবে বা ধরতে আসে তারা এই ওখানে থাকে। চার্জও বেশী নয়।

আনন্দ বলল, 'তাহলে আমরা একটু ঝুঁকি নেব। কল্যাণকে এখন কোথাও রেখে যাব না। ও জন্মিতার সঙ্গে গাড়িতে থাকবে। আমরা যদি মন্ত্রীর বাড়ি থেকে বের হতে পারি তাহলে সোজা ওই রেস্ট হাউসে গিয়ে ওদের নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

হঠাৎ কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'যদি না বের হতে পারিস? তোদের কিছু হলে?'

আচমকা একটা হিমবাতাস বয়ে গেল ঘরে। সেটাকে কাটিয়ে উঠল আনন্দই, 'তা হলে তোরা অপেক্ষা করবি না। আমরা ধরা পড়লেই যে তোদের ধরা দিতে হবে এমন আমি চাই না। সঙ্গে টাকা আছে, এয়ার টিকিট আছে, যেভাবেই হোক নিজেদের বাঁচাবি। আমাদের বাদ দিয়ে যদি তোরা একটাও অ্যাকশন করতে পারিস তা হলে সেটাও খুব মূল্যবান হবে।'

জন্মিতা জিজ্ঞাসা করল, 'বাগডোগরা থেকে কোথায় যাব?'

আনন্দ ওদের বুঝিয়ে দিল কি করা হবে, কোথায় যেতে হবে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তা হলে ওরা সেদিনই একত্রিত হবে। এখন সৌভাগ্য কতটা সেটাই দেখা যাক।

পিঠে-বগলা-ব্যাগ ছাড়াও দুটো চামড়ার ঝোলা কিনেছে সুদীপ। ঝোলটা ওয়াটার প্রুফ। তাতে যাবতীয় লড়াই-এর রসদ রাখা হয়েছে। ওইটে বহন করবে আনন্দ। সুদীপ ঘড়ি দেখল। আজ বৃদ্ধার জর কম, কিন্তু দুর্বল হয়ে আছেন। ওর একবার মনে হল বের হবার আগে বৃদ্ধার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে আসা দরকার। মায়ের কাজটা যে এ জীবনে করতে পারলো না, সেটা অবশ্য বলা যাবে না কিন্তু একটু পাশাপাশি বসলে খুশী হবেন উনি। ও নিচে নেমে গেল।

জন্মিতার কেবলই মনে হচ্ছিল কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার আগে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বাড়ির কোণে পুলিশ আড়ি পেতেছে কিনা কে জানে। রামানন্দ রায়ের অফিসে অবশ্য যাওয়া

যেত। সীতা রায় সুদীপকে বলেছিল দরকার হলে সাহায্য চাইতে। এক রাতে মা হঠাৎ অমন পাণ্টে গেল কি করে। খুব ছেলেবেলায় যে মাকে সে হারিয়েছিল তাকেই এই মুহূর্তে সে দেখতে পেল। তা সত্ত্বেও নিজেকে শক্ত করতে চাইছিল সে। কারণ সে বুঝতে পারছিল অন্য দুই বন্ধুর মনের অবস্থায় খুব ফারাক নেই। আনন্দ বা কল্যাণ এখন নিশ্চয়ই ওদের বাড়ির কথা ভাবছে।

বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলার পর সুদীপ শেষ কথাটা বলল, 'আমি আজ রাত্রে ফিরব না।'

'কেন? কোথায় যাবে?' বৃদ্ধা অবাক হয়ে গেল।

'কয়েকটা জরুরী কাজ আছে, সারতে হবে।'

'ও তাই বল। আমি ভাবলাম তুমি অবনীর বাড়িতে যাবে। দ্যাখো, বলছিলাম কি, যদিও আমার গুরু রাড়ি বাড়ি যায়—তবুও আমার গুরু রামানন্দ রায়। তা বাপ তো গুরুর মতই।'

'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।' সুদীপ উঠে পড়ল। এখন ছায়া পড়ে গেছে। আকাশে মেঘ থাকায় আলো কমে যাচ্ছে দ্রুত। সে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে উঠতে বাঁদিকে তাকাল। এখন থেকে সামনের গলির একাংশ দেখা যায় গাছপালার ফাঁকে। সেখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে এপাশে তাকিয়ে। তার ঠিক পাশেই আর একটা লোক দাঁড়িয়ে ঘাড়ি দেখছে। লোক দুটোর চেহারা দেখে সুদীপের সন্দেহ হল। এরা পুলিশের লোক না হয়ে যায় না। নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়িয়ে কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে। সে আর ভাবতে পারল না। দৌড়ে ছাদের ঘরে চলে এসে বলল, 'চটপট জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আয়। মনে হচ্ছে ওরা আমাদের খোঁজ পেয়েছে।'

'কারা?' কল্যাণের মুখ সাদা হয়ে গেল।

আনন্দ বলল, 'কি করে বুঝলি?'

'গলির মধ্যে দুটো সন্দেহজনক লোক দাঁড়িয়ে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।' নিজে একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে সে ডাকল 'চলে আয়।'

জন্মিতা বেরিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করল, 'বুড়ি আমাদের দেখতে পাবে না?'

'পেলে পাবে। এখন ওসব ভাবার সময় নেই।'

প্রায় উবু হয়ে ওরা সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে এল। উঠানের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কয়েক সেকেণ্ড সময় পাওয়া যাবে ওরা এলে। সুদীপ চারপাশে তাকাল। বৃদ্ধা তার ঘরে গুয়ে আছেন। দরজাটা এড়িয়ে গেলে তিনি দেখতে পাবেন না। ওর মনে পরল পেছনের পুকুর ধারে আর একটা পথ আছে। সেই পথেও পুলিশ এসে গিয়েছে কিনা জানা নেই। কিন্তু ওই পথ ছাড়া বের হবার কোন উপায় নেই। বুড়িকে ডিগিয়ে ওরা পেছনের দরজায়

চলে এল। সে নিচুগলায় আনন্দকে বলল, 'তোরা একটু সরে দাঁড়া। সেই বউটা এলে আমি ওর সঙ্গে ঘরের ভেতরে চলে যাব। গল্প করছি দেখলে তোরা ভেতরে ঢুকে ডানদিকের বারান্দার গায়ে একটা দরজা দেখতে পাবি। সেটা খুলে সোজা বেরিয়ে যা। আমি সাতটার সময় চৌরাস্তা নয়, ক্যালকটা হসপিটালের সামনে তোদের জন্যে ওয়েট করব।'

সে কয়েকবার দরজায় শব্দ করতে যুবতীর গলা পাওয়া গেল, 'কে!'
সুদীপ চাপা গলায় বলল, 'আমি।' বলে ওপাশের দরজা খুলল।
সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের দরজা খুলে গেল। যুবতী সেই হাসিটা ঠোঁটে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার! আমার কি সৌভাগ্য! আসুন। এতক্ষণ 'আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

'আমার কথা? কেন?' সুদীপ আড়ালে দাঁড়ানো বন্ধুদের দিকে একবারও না তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল দরজা খোলা রেখে।

ঘরে ঢুকে যুবতী বলল, 'কেন, আপনার কথা বুঝি ভাবতে নেই। আর কার কথা ভাবব বলুন? একজন প্রেমিক ছিল, বিষ খেয়েছি শুনে সে পালান। আমি না হয় সেই রাত্রে অভিনয় করেছিলাম, কিন্তু আপনি কেন অভিনয় করলেন? কেন বাঁচালেন আমাকে?'

'কেন বাঁচলাম বলুন তো।' সুদীপ আড়চোখে দেখল তিনটি মূর্তি বারান্দার কোণা দিয়ে পার হয়ে গেল। সে প্রশ্নটা করেই এমনভাবে হেসে উঠল যে খাটে বসা যুবতী অন্য দিকে খেয়াল করার অবকাশ পেল না।

যুবতী জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কি আছে! আহা!'

সুদীপ বলল, 'আসলে আপনাকে উপড় হয়ে গুয়ে থাকতে দেখে—'

এই সময় ওপাশে রুদ্ধার চিৎকার শোনা গেল, 'কে? কে ওখানে শব্দ করে?'

সুদীপ উঠে দাঁড়াল, 'এই রে, উনি বোধ হয় জানতে পেরেছেন।'

যুবতী ওর দুটো হাত ধরল। 'দাঁড়ান। আপনি যাবেন না। আমি দরজাটা বন্ধ করে আসি। আপনি যে আমার কাছে এসেছেন তা বুড়ির না জানলেই হল।'

'কিন্তু উনি যদি এখানে আসেন?'

'তাই? ঠিক আছে। আমি দিদিমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি কি হয়েছে? উনি কিছু বললে বলে দেব যে আপনাকে দেখিনি। আমার তিনি তো রাত নটার আগে ফিরবেন না। ততক্ষণে বেশ গল্প করা যাবে। বসুন।' যুবতী দরজা দিয়ে বেরিয়ে রুদ্ধার অংশে চলে যেতে সুদীপ চটপট বারান্দায় নেমে এল। ওপাশে পুরুষকন্ঠ শোনা যাচ্ছে। সুদীপ খোলা অথচ ভেজানো দরজা খুলে পুকুর ধারে চলে এল। এদিকে পায়ে চলার পথ।

পথটা কোনদিকে যাচ্ছে সে জানে না। যদি ঘুরে ওই গলিতে পড়ে তা হলেই হয়ে গেল। এদিকে মানুষজন এই শেষ বিকেলে নেই। খুব জোরে হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট্ট বাগানের ওপাশে রাস্তা দেখতে পেল সে। একটুও দ্বিধা

না করে সে বাগানটা যখন পার হচ্ছে তখন একজন মহিলাকে দেখতে পেল অর্থাৎ হয়ে দৃশ্যটা দেখছেন। ও যখন রাস্তায় পড়ে গেছে তখন তিনি চিৎকার করলেন, 'এটা কি রাস্তা?' সুদীপ কোন জবাব না দিয়ে খানিকটা হাঁটার পর একটা রিকশা পেয়ে গেল।

অবনী তালুকদারের গ্যারেজটা মোটেই বড় নয়। অর্থবান লোক হিসেবে তাঁর বেশ খ্যাতি আছে গ্যারেজে। তিনি জানেন আর সব বিষয়ে মুঠো বন্ধ করলেও গাড়ি সারায় যারা তাদের সমস্তট রাখা উচিত। নইলে খরচ বাড়বেই। ফলে খ্যাতি হয়েছে খ্যাতিরের কারণেই। সুদীপও বেশ কয়েকবার গ্যারেজে গিয়েছিল। মাতাশ্রুতে তার সঙ্গে পরিচিতি হয়ে গেছে মিস্ত্রীদের। সে যখন গ্যারেজে ঢুকল তখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। গ্যারেজের মালিক অম্বিকাবাবু ধারে কাছে নেই। হেডমিস্ত্রি ওকে দেখে এগিয়ে এল, 'কি ব্যাপার দাদাবাবু?'

'বাবা বলল গাড়িটা আবার গোলমাল করছে।'

'ও। কিন্তু আজ তো লোক কম আছে। কাল সকালে পাঠিয়ে দেব, যদি দরকার হয় এখানে নিয়ে আসব। গতবারই আমার সন্দেহ হয়েছিল বাকেরটা নিয়ে।'

'কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা। বাবার একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে। ওখানে ট্যান্ডিও পাওয়া যায় না। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।' খুব নিরীহ মুখে জানাল সুদীপ।

'গাড়ি।' মিস্ত্রী একবার চারপাশে তাকাল, 'ওই অ্যান্ডারটারটার নতুন রঙ হবে। এমনিতে গাড়ি রানিং কন্ডিশনে আছে। ওটা নিয়ে যাও, কাল সকালে আমি গিয়ে নিয়ে আসব।'

মিনিট পাঁচেক বাদে শিষ দিতে দিতে গাড়ি চালাচ্ছিল সুদীপ। অয়েল ইন্ডিকেটার বলছে এখনও কিছুটা দূর যাওয়া যাবে। সে একটা পেট্রল পাম্পে গাড়ি তোকাল। পুরো ট্যাক্স তেল ভরে নিয়ে সে ক্যালকাটা হসপিটালের দিকে যেতে যেতে খেয়াল করল তাড়াহড়োয় ভাঙ্গা ক্যামেরাটা ছাদের ঘরে ফেলে এসেছে। একটু গুম হয়ে গেল সুদীপ। একটা না একটা গোলমাল তার হবেই। ক্যামেরা ছাড়া কি ক্যামেরাম্যান হয়? সার্কুলার রোডের একটা দোকানে ঢুকে তাকে ক্যামেরা কিনতে হল। নিজের পছন্দটা বড় চড়া—নইলে এত গচ্চা যেত না।

সাতটার কয়েক মিনিট বাদেই ওরা গাড়িতে উঠে এল। জয়িতা ওর পিঠে হাত দিল, 'আমাদের খুব ভয় হচ্ছিল তোমার জন্যে। ওরা কি সত্যি পুলিশ?'

স্টার্চ দিল।

কল্যাণ বলল, 'ভাগ্যিস তুই দেখেছিলি। এই রকম প্যালপিটেশান জীবনে হয়নি

আমার। যে কোন মুহূর্তেই পুলিশের মুখোমুখি হব, হ্যাঁটছি আর মনে হচ্ছে। তারপর ডায়মণ্ডহারবার রোড পড়তেই একটা বাসে চেপে বসলাম।

‘কেউ তোদের কিছু বলেনি?’

‘না। তবে সবাই জয়িতাকে দেখছিল। ছেলে না মেয়ে বুঝতে পারছিল না।’

‘আমিও পারি না।’ সুদীপ মন্তব্য করতেই জয়িতা পেছন থেকে চড় মারল পিঠে।

আনন্দ বলল, ‘ঠিক বাড়িটার সামনে নিয়ে যাবি। তোরা দুজন পেছনে বসে থাকবি চুপচাপ। যদি দেখিস আমাদের কেউ চেজ করছে তা হলেই চার্জ করবি। যদি না ফিরি তা হলে চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে বেরিয়ে যাবি।

দশ থেকে বারো মিনিটের বেশী অপেক্ষা করবি না। সুদীপ, ‘তোরা সজে মাল আছে তো?’

‘আছে। তুই দুটো গ্রেনেড দে। ক্যামেরার ঝোলার মধ্যে রেখে দিই।’

‘ওটা আবার কোথেকে এল?’

‘কিনলাম। সেটা ছাদের ঘরে ফেলে এসেছি।’

‘কেয়ারলেস।’ মন্তব্য করল জয়িতা। সুদীপ কোন জবাব দিল না। মন্ত্রীর বাড়ির কাছাকাছি এসে সে চারপাশে তাকাল। একজন পুলিশ রাইফেল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে। আর একটা গাড়ি সামনে পার্ক করা। গাড়িটাকে তিক্কার্যক দাঁড় করিয়ে ওরা নেমে পড়ল।

সন্ধ্যার পর এই অঞ্চলের জৌলুস যেন বেড়ে যায়। মন্ত্রীর বাড়ির সামনে যদিও দোকানপাট নেই তবু রাস্তায় আলোর ফোয়ারা ছুটছে, গাড়ি রিকশাও কম নেই। কাছাকাছি কোথাও মাইকে হিন্দী ছবির গান বাজছে। জয়িতা আর কল্যাণ পেছনে বসে রইল। আনন্দ লক্ষ্য করল দুজনেই অত্যন্ত উত্তেজিত। গাড়ির কাচের মধ্যে দিয়ে জয়িতাকে মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না একটুকু। পথচলতি কারো নজর পড়বে না তাই। সামনের গাড়ির পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে তার স্বাস্থ্য ভাল। লোকটা নিশ্চয়ই ড্রাইভার। সুদীপের গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে যে ভঙ্গীতে তাতে ওর বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় গাড়িটায় কাজ চলছিল।

আনন্দ আর সুদীপ সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে এল। বেশ পেল্লাই দরজাটা বন্ধ। আনন্দ কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল। দরজার বাইরে মন্ত্রীর নাম এবং ঠিকানা স্বেতপাথরের ফলকে লেখা রয়েছে। যে পুলিশটা রাইফেল হাতে দরজার পাশ দাঁড়িয়ে ছিল, সে সতর্ক চোখে ওদের দেখেছে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করছে না। সুদীপ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘মন্ত্রীমশাই বাড়িতে আছেন?’

হ্যাঁ অথবা না লোকটার মাথা নাড়া দেখে বোঝা গেল না। উলটে সে জানতে চাইল, ‘আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে? না হলে দেখা হবে না। ভিজিটর এসেছে।’

দরজাটা খুলে গেল জবাব দেবার আগেই। সাদা প্যান্ট লাল শার্ট পরা একটা কালো লোক জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই? কোথেকে আসছেন? মন্ত্রী কি আপনাদের আসতে বলেছেন? কি নাম?'

চার চারটে প্রশ্ন কিন্তু আনন্দ তার খার দিয়ে যেতে চাইল না, 'নানুভাই কি এসে গেছে?'

এবার লোকটির গলা পাল্টে গেল, 'আপনাদের নাম?'

আনন্দ বলল, 'বলুন খবরের কাগজ থেকে আসছি। নানুভাই এখন আমাদের আসতে বলেছেন।'

লোকটি জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। সুদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাদের গাড়িটা নিরীহ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। খবরের কাগজ শোনার পর রাইফেলধারী পুলিশটা একটু সহজ হল। সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে সারাক্ষণ বকের মত দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় না আপনার? একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসতেও তো পারেন।'

লোকটার মুখে দুঃখ দুঃখ ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। তখনই আগের লোকটা ফিরে এল, 'আসুন। তবে পাঁচ মিনিটের বেশী থাকবেন না। উনি খুব ব্যস্ত।'

কার্পেটে মোড়া করিডোর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে লোকটা একটা ঘরের দরজায় ওদের পৌঁছে দিয়ে পর্দা সরিয়ে দিল। প্রথমে আনন্দ পরে সুদীপ ঘরে ঢুকল। নানুভাই একটা লম্বা গদি মোড়া ঘুরন্ত টুলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। সামনের সোফায় বসে আছেন মন্ত্রীমশাই। ঘরে আর কেউ নেই। চোকামাত্র মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত গলায় বললেন, 'কি ব্যাপার? রাইটার্সেই তো আসতে পার তোমরা। তোমাদের জ্বালায়।'

আনন্দ নানুভাই-এর দিকে মাথা নেড়ে হাসল। নানুভাই গম্ভীর গলায় বলল, 'সেদিন আমি ওদের আসতে বলেছি এখানে। একটা কাগজ যা তা লিখেছে উল্টোটা লেখা দরকার।'

'অ। বেশ। কোন্ কাগজ ভাই?' মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

আনন্দ নামটা বলল। মন্ত্রী কাঁধ নাচালেন। তারপর বললেন, 'আমি সব সময় সর্বহারার পক্ষে। পার্টি আমাকে মন্ত্রী করেছে কারণ আমি কাজ করেছি, করব। নানু নাকি আমার ডান হাত, আরে বাবা ও আমার ডান হাত হতে যাবে কেন? কিসের অভাব ওর। একজন সৎ ব্যবসায়ীর নামে কেছা রটালেই হল! আমি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। কিন্তু ভাই স্বাধীনতা মানে যা হচ্ছে বানিয়ে লেখা নয়। আসলে তোমাদের বুর্জোয়া কাগজগুলো তো গল্প তৈরী করতে ভালবাসে। তোমাদের কথা বলছি না, সুতারকিন স্ট্রীটের কাগজটাকে তো আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। যত গালগল্প খবর বলে চালায়। আর পাবলিকও হয়েছে তেমন। আমাদের

কেচ্ছা পড়তে পারলে আর কিছু চায় না। কি জানতে চাও বল ?'

আনন্দ বলল, 'আপনার সম্পর্কে অভিযোগ এই তাল্লাটে অভ্যর্থনীদের আপনি নানুভাই-এর সাহায্যে আশ্রয় দিচ্ছেন, শ্রুত তাদের নামে রেশন কার্ড বের করছেন, ভোটার লিস্টে বেআইনি ভাবে নাম তুলছেন। ব্যাপারটার মধ্যে কতখানি সত্যি আছে ?'

'এক ফোটাও না। আমার কি দরকার। এলাকার ভোটাররা আমাকে ভালবাসে। ওসব কাজ আমি করব কেন ?' মন্ত্রী বললেন, 'আর নানুভাই-এর সাহায্যে মানে ? ও কি গুণ্ডা ?'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আপনি কি এই এলাকায় সাম্প্রদায়িক জিগির বাঁচিয়ে রেখেছেন ?'

'ইডিয়ট! ভারতবর্ষ সেকুলার রাষ্ট্র। আমি যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করি সেখানে সাম্প্রদায়িক চিন্তার কোন স্থান নেই।'

'তৃতীয় প্রশ্ন, এই এলাকার নব্বুই ভাগই মানুষ চোরাচালানের ব্যবসায় লিপ্ত। তাদের মালিক হল নানুভাই। আর এই নানুভাইকে আপনি শেলটার দেন যাতে পুলিশ কিছু করতে না পারে। লোকে বলে আপনি নাকি এর একটা ভাগ পান।'

'কে বলেছে ? কোন্ শালা! প্রমাণ আছে কিছু ? তাহলে আমার পার্টি আমাকে ছেড়ে দেবে ?'

'চতুর্থ প্রশ্ন, এই এলাকায় আপনার জনপ্রিয়তা নির্ভর করেছে নানুভাই-এর মজির ওপর। তিনিই আপনাকে নির্বাচিত করেছেন। যদি আপনি নানুভাই-এর মতের বিরুদ্ধে যান তাহলে আগামী নির্বাচনে আপনার জামানত জব্দ হবে। এটা কি সঠিক কথা ?'

এবার রুমালে মুখ মুছলেন মন্ত্রীমশাই। নানুভাই চুপচাপ টুলে বসেছিল। এবার তার ঠোঁটে হাসি ফুটল। মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত বললেন, 'এ প্রশ্নের জবাব আমি কি দেব ? নানু এখানে রয়েছে, ও-ই জবাব দিক।'

নানুভাই বলল, 'না না, এটা আপনার ব্যাপার। যা ভাল মনে করেন বলে দিন।'

মন্ত্রী বললেন, 'নানু হল শোষিত মানুষের প্রতিনিধি। আমিও তাই। অতএব দুজনে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চাই। আমাদের এলাকার মানুষের জন্যে অনেক কিছু করতে হবে। যদি কেন্দ্র আমাদের সাহায্য করে তাহলে এলাকার মানুষের কোন দুঃখ রাখব না।'

আনন্দ বলল, নানুভাই নামকরা স্মাগলার। কলকাতা শহরের অনেকগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উনি বাঁধিয়েছেন। ওর সঙ্গে আপনার সংযোগ পার্টির ইমেজ নষ্ট করছে না ?'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন মন্ত্রী মশাই, 'স্টপ ইট! তোমাকে আমি পুলিশে দেব! তুমি আমার নামে নোংরামি করছ। নানু যদি ইশারা করে

তাহলে তুমি এই এলাকা থেকে জীবনে বের হতে পারবে? আমরা যা ইচ্ছে তাই করব, কার বাবার কি?’

নানুভাই এবার শান্ত গলায় বলল, ‘বড় বেগে যাচ্ছেন আপনি। শুনুন ভাই, মিছিমিছি ঝামেলা করে লাভ নেই। আপনাদের কাগজে ওই খবরের উল্টোটা লিখতে হবে। যা যা লেখার তা আপনারা ঠিক করে কাল মন্ত্রীমশাইকে দেখিয়ে নিশ্চয় যাবেন। পাঁচ হাজার চলবে?’

মন্ত্রী বললেন, ‘ফট করে পাঁচ বললে কেন? এরা কত মাইনে পায় জানি। একেই হতো।’

নানুভাই বলল, ‘আমার জবান এক। পাঁচ বলেছি পাঁচ।’

আনন্দ হাসল, ‘ঠিক আছে নানুভাই, আপনি মন্ত্রীমশাই-এর পাশে এসে দাঁড়ান। আমার ক্যামেরাম্যান ছবি তুলবে। ছবির নিচে একটা ভাল ক্যাপসন দিতে হবে।’

মন্ত্রীর মুখ দেখে মনে হল কথাটা তাঁর পছন্দ হয়নি। কিন্তু নানুভাই হেলতে দুলতে মন্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুদীপ ক্যামেরা খুলে রেডি হয়ে বলল, ‘একটু হাসুন স্যার।’

মন্ত্রী বললেন, ‘নানু, কাঁধের কাছ থেকে হাতটা সরান। পাবলিক ইমেজ নষ্ট হবে।’

নানুভাই বলল, ‘বাত একটু সমঝে বলবেন। পাবলিক ইমেজ!’ একটু বিরক্ত হয়ে নানুভাই মন্ত্রীর দিকে তাকানো মাত্র আনন্দ রিভলবারের ট্রিগার টিপল। অভাবড় শরীরটা বেঁকেচুরে পড়তে পড়তে সোফায় যখন আটকে গেল তখন মন্ত্রী মশাই শিশুর মত কঁদে উঠলেন। আনন্দের দ্বিতীয় গুলিটা মন্ত্রীমশাইকে চিরকালের জন্য থামিয়ে দিল। গুলির আওয়াজে চিৎকার চেঁচামিচি শুরু হল। আনন্দ আর সুদীপ দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে লোকটা ওদের এই ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল সে ভেতরে ঢুকেই আত্ননাদ করে উঠল। ততক্ষণে আনন্দরা কড়িডোরে চলে এসেছে। এই সময় সেই লোকটাকে রিভলবার বের করতে দেখল সুদীপ। ক্যামেরার ব্যাগ থেকে গ্রেনেড বের করে সে ছুঁড়ে দিতেই মনে হল বাড়িটা ভেঙ্গে পড়বে। দরজার বাইরে এসে ওরা দেখল পুলিশটা রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে। আনন্দ তাকে চটপট জিজ্ঞাসা করল, ‘গুলি আছে ভেতরে?’

লোকটা পুতুলের মত মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ।’

‘গুড। দৌড়ে ভেতরে যান, নইলে মারা পড়বেন। মন্ত্রী ডাকছে।’ সুদীপ চেঁচিয়ে বলা মাত্র পুলিশটা রাইফেল নিয়ে ভেতরে ছুটল। ওরা ততক্ষণে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে এসেছে। জয়িতা সামনের দরজা দুটো সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল। আর তখনই চার-পাঁচজন লোক ছিটকে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। তারা চিৎকার করছিল, ‘ডাকু ডাকু’ বলে। সুদীপ তখন মরিয়া হয়ে গাড়ি ঘোরাল। আনন্দ দেখল ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ড্রাইভার তার গাড়িতে উঠেছে। সে

ওইটুকু সময়েই তিনটে ছুঁড়ল। তার লক্ষ্য ছিল গাড়ির চাকা নষ্ট করা। এই সময় পুলিশটা রাইফেল থেকে ছুঁড়ল দরজায় দাঁড়িয়ে। ওপর থেকে ছোঁড়ার জন্যেই সম্ভবত গাড়ির ঠিক মাথায় গুলিটা লাগল।

যতটা সম্ভব স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে সুদীপ। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সামনে আসার পর সে একটু খাতস্থ হল। আনন্দ বলল, 'আস্তে চালা। আমাদের এই গাড়ির নান্দার একশটা লোক নোট করেছে নিশ্চয়ই। তার ওপর জোরে চালালে পুলিশ এমনতেই নজর করবে।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এই গাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সি নিবি?'

'না। ট্যাক্সি নিয়ে কোন লাভ হবে না। সোজা পার্ক সার্কাসের দিকে চল। বাই পাস দিয়ে গিয়ে সল্ট লেক থেকে ভি আই পি ধর।'

আনন্দকে মুহূর্তে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। তার চোখ জ্বলছিল, কন্ঠস্বর অসম্ভব স্থির।

কল্যাণ আর কৌতুহল দমন করতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ভেতরে?'

আনন্দ কল্যাণের দিকে চট করে তাকাল, 'লোক দুটোকে আমি সরাসরি গুলি করে মারলাম। দুটো ভণ্ড বদমাস, মানুষের শত্রু। জানিস, গুলি করতে আমার হাত একটু কাঁপেনি।'

'সেম টু মি।' সুদীপ হাসল, 'ছারপোকা মারতেও এর চেয়ে বেশী অস্বস্তি হয়।'

কল্যাণ জিত দিয়ে একটা শব্দ করল, 'শুধু আমিই কিছু করতে পারছি না। শালা এই হাতটা—।'

জয়িতার গলা শোনা গেল, 'আমিও কিছু এখনও করতে পারিনি কল্যাণ। আমাকে বাদ দিচ্ছিস কেন?'

আনন্দ বলল, 'করার সময় এলেই তোরা করবি। কল্যাণ, তোদের এখন আমরা ওই রেস্ট হাউসে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব। এখন থেকে তোরা খুব শাস্ত ভদ্রলোক। কোনরকম টেনসন রাখবি না। অথবা উত্তেজিত হয়ে এমন কিছু করবি না যাতে তোদের ওপর লোকের নজর পড়ে।'

কল্যাণ বিরক্ত হল, 'তুই শুধু আমাকে বলছিস কেন? আমার সঙ্গে জয়িতাও থাকছে।'

আনন্দ বলল, 'জয়িতার মাথা অনেক ঠাণ্ডা। তাছাড়া যে কোন পরিবেশেও মানিয়ে নিতে পারে। কিছু মনে করিস না, যার যা প্রশংসা প্রাপ্য তা করছি। তোদের কাছে কোন অস্ত্র আছে?'

জয়িতা হাত বাড়িয়ে রিভলভার আর গ্রেনেড এগিয়ে দিল আনন্দের দিকে। তারপর বলল, 'শুধু জামাকাপড় আর ওষুধপত্র রইল।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা উইগটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিস?'

'না। ওটা বিক্রী। দিনের বেলায় সবাই বুঝতে পারবে ওটা উইগ। আমি

ভাবছি, এয়ারপোর্টে' রিপোর্টিং টাইমে পৌঁছে যখন ভেতরে ঢুকব তখন কল্যাণের থেকে আলাদা থাকব। যেন কেউ কাউকে চিনি না। একদম বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে তবে কথা বলব।' জয়িতা জানাল।

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'শিক আছে। সুদীপ ওদের হাজার টাকা দিয়েছিস?' সুদীপ বাইপাশের খোলা রাস্তায় তখন স্পীড বাড়ানো ছিল। সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

আনন্দ বলল, 'রেস্ট হাউসের বিল মিটিয়ে টাকাটা দুটো ভাগ করে দুজনের কাছে রেখে দিস। তোদের টিকিটের নামগুলোই রেস্ট হাউসে বলবি। জামসেদপুর থেকে আসছিস, দার্জিলিং যাবি।'

ওরা কেউ কথা বলছিল না। দূরে সল্ট লেকের আলোগুলো হীরের মত জ্বলছে। ডান হাতে স্টেডিয়ামটাকে রেখে শেষ পর্যন্ত ত্রি আই পি রোডে উঠে এসে গতি কমাল সুদীপ। একটা পুলিশ ভ্যান শিক মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত ভদ্রভাবে ওরা এয়ারপোর্টের দিকে বাঁক নিল। মিনিট দশেক বাদেই রেস্ট হাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সুদীপ। আনন্দ ইশারা করতে জয়িতা একটা হাত ওর কাঁধে চুঁইয়ে বলল, 'ওড নাইট।' সুদীপ বলল, 'আমি ওয়েট করছি, বুকিং পেলি কিনা,—শিক আছে তিন মিনিটের মধ্যে না এলে বুঝব ঘর পেয়ে গেছিস।'

কল্যাণ আর জয়িতা পাশাপাশি হেঁটে গেল গেট পেরিয়ে মোরামের পথ বেয়ে। রেস্ট হাউজের সাইনবোর্ডের নিচ দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। তিনের বদলে চার মিনিট অপেক্ষা করল সুদীপ। তারপর ইঞ্জিন চালু করল।

বোলপুর স্টেশনের গায়ে যখন ওরা গাড়ি থেকে নামল তখন সকাল আটটা। পথে দুবার গাড়িটা গোলমাল করেছিল। এখন আর হাতের ছাপ মোছার কোন চেষ্টা করল না কেউ। ব্যাগগুলো নিয়ে সোজা স্টেশনে ঢুকে টিকিট কাটল নিউ জলপাইগুড়ির। পনের মিনিটের মধ্যেই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এখানে আসবে। প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছিল সুদীপের। সারা রাত বিভিন্ন রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে, অকারণে থামিয়ে, নার্ভের ওর খুব চাপ গেছে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবি?' সুদীপ মাথা নাড়ল, 'শোব। একটা জলগা চাই।'

ওরা প্রায় কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ট্রেনটা এল। ট্রেনে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সুদীপ। গাড়িটা খুব ভোরে হাওড়া থেকে ছাড়ে বলেই বোধ হয় এত খালি। গদিওয়াল্লা একটা সিটে শুয়ে পড়ল সুদীপ। ব্যাগগুলো সিটের তলায় ঢুকিয়ে জানালার কাছে বসতেই ট্রেনটা ছাড়ল। আনন্দের খুব চিন্তা হচ্ছিল কল্যাণদের জন্যে। যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে—! একবার এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলে মনে হয় ভয়ের কিছু থাকবে না। নিজেকে বোঝাল সে।

চা-ওয়াল্লা চা নিয়ে এসেছিল। সুদীপ নড়বে না জেনে এক ভাড় কিনে সামনে ডাকাতেই সে দেখতেই পেল উল্টোদিকের ভদ্রলোক কাগজ ভাঁজ করে রেখে চোখ

বন্ধ করলেন। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আপনার কাগজটা একটু দেখতে পারি?'

নোকটা মুখ নাচাতে সে কাগজটা টেনে নিল। আজ ভোরে হাওড়া স্টেশনে কিনেছেন ভদ্রলোক। প্রথম পাতায় বিশাল অক্ষরে লেখা, 'অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে মন্ত্রী নিহত। দেহরক্ষীরও মৃত্যু।' তারপর দারুণ চাকল্যকর বিবরণ ছাপা হয়েছে। 'সমস্ত রাজনৈতিক দল এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন। অনুমান করা হচ্ছে মন্ত্রীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ এই কাজ করেছে। আততায়ীরা গ্রেনেড স্টেনগান ব্যবহার করেছে। তারা সংখ্যায় সাত আটজন ছিল। গাড়ির যে নাম্বার পাওয়া গেছে তার মালিককে মধ্যরাত্রে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।' এর পাশে বন্ধ করে ছাপা হয়েছে, 'সম্প্রতি একটি কাগজে মন্ত্রী এবং তার দেহরক্ষীর নামে কিছু অভিযোগ ছাপা হয়েছিল। আততায়ীরা খবরের কাগজের রিপোর্টের ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। একথা অনুমান করা অনায়াস হবে না, প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের ঘটনার সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোন মিল থাকতে পারে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে উক্ত এলাকায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।'

আনন্দ ধীরে ধীরে কাগজটা ভাঁজ করে ভদ্রলোকের পাশে রেখে দিল। এই ভদ্রলোক যদি নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠক হন তাহলে সহজেই তাদের চিনে ফেলতে পারেন। এখান থেকে সরে বসতে হবে এমন জায়গায় যেখানে বাঙালি ধারে কাছে নেই। সুদীপটাকে তুলতে হবে, নিঃশব্দে!

॥ ২৬ ॥

আজ কলকতার প্রতিটি খবরের কাগজের হেডলাইন লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে একটি শব্দের হেরফেরে কোন ঘটনা সম্পর্কে কাগজের বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থেকে যেতে পারে। যেমন, 'নিজ বাসভবনে মন্ত্রী দেহরক্ষীসমেত নিহত।' 'দেহরক্ষী এবং মন্ত্রীর গুলি করে হত্যা।' 'মন্ত্রী নিহত, সঙ্গে দেহরক্ষী।' 'নৃশংস হত্যাকাণ্ড, উগ্রপন্থী কর্তৃক মন্ত্রী নিহত।'

গেস্টহাউসে বসে ওরা কাগজগুলো দেখছিল। কাল রাত্রে জয়িতা এক সেকেণ্ড যুমাতে পারেনি। এই গেস্টহাউসটাকে আপাত নিরীহ বলেই মনে হয়েছিল। এয়ারপোর্ট প্লেন ধরতে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে শহরে যাওয়ার আগে এখানে থেকে যাওয়ার কাজে বিমান যাত্রীরা এটাকে কাজে লাগায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে পুলিশ এসে পড়লে কিছু করার থাকবে না। পুলিশের ভয় তো ছিলই, তার ওপরে সুদীপ-আনন্দের জন্যে চিন্তাও হচ্ছিল। কোন দরকার ছিল না বোলপুর পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে গিয়ে ট্রেন ধরার অবশ্য দার্জিলিং মেল বেরিয়ে গেছে, কাঙ্ক্ষনজন্মা বর্ধমানের দাঁড়ায় না। তবু এই ঝুঁকি নেওয়াটায় দৃশ্চিন্তা হচ্ছিল। এই ঘরে টেলিফোন আছে। খুব ইচ্ছে করছিল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে। অন্তত 'বাবা আমি চলে

যাচ্ছি অনেক দূরে, হিমালয়ের কোলে' এই কথাগুলো বলতে। কিন্তু পুলিশ যদি টেলিফোনও নজরে রাখে তাহলে—। হঠাৎই জয়িতার মনে হচ্ছিল সবকটা শেকড় আজ ছিঁড়ে যাচ্ছে। যতই মাটি আলগা থাকুক না কেন এতকাল আজ সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কল্যাণ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। ওর হাতের অসুবিধে এবং আরামদায়ক বিছানা ওকে ঘুমাতে সাহায্য করেছে। এতদিন একঘরে ওরা চারজন শুয়েছে। নিশ্চিত্তে ঘুমাতেও পেরেছে। এখন সত্যিই আর এক ধরনের অস্বস্তি হচ্ছিল। এই প্রথম একজন যুবকের সঙ্গে শুচ্ছে সে। হয়তো এক বিছানায় নয় কিন্তু সারাটা রাত ঘরের আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে। জয়িতা ঘুমন্ত কল্যাণের দিকে তাকিয়ে এই চিন্তাটার জন্যে লজ্জিত হন না। সে নিজে একটি যুবতী বয়সের রমণী, এই চিন্তাটা মাথায় এসে এক ধরনের ভাল লাগা তৈরী হন। অথচ ঘুম এল না। ঘরের গায়েই যে ব্যালকনিটা সেখানে বসলে ভি আই পি রোড দেখা যায়। জয়িতা সেই রাতটার অনেক খানি ব্যালকনিতে বসে রইল। রাত যত বাড়ছে তত ছুটন্ত গাড়ির সংখ্যা কমে আসতে লাগল। একসময় সব চূপচাপ। এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই কোন প্লেন নামছে না। একটা রাত কেমন করে নিঃসাড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ হয়ে যায়, চোখের সামনে দেখল জয়িতা।

প্রতিটি কাগজে হত্যাকাণ্ডের বিশদ বিবরণ বের হয়েছে। বিশদ তো বটেই এমন অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। তবে সর্বাধিক প্রচারিত কাগজটি মন্তব্য করেছে, 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে প্যারাডাইস এবং বড়বাজারে যে দল কাজ করেছে তারাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। মন্ত্রীর নামে বিভিন্ন সময় অনেক অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু তাঁকে তাঁর দল এবং সরকার সবসময় আড়াল করে রেখেছিল। দেহরক্ষী হিসেবে থাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে সেই লোকটির নাম নানুভাই। ওই অঞ্চলে ব্যাপক স্মাগলিং হতো নানুভাই-এর নেতৃত্বে। বস্তুত নানুভাই-এর নির্দেশেই ব্যালকনিবন্ধে ভোট পড়ত, কারণ প্রতিটা পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতি নির্ভর করত নানুভাই-এর ওপর। কলকাতায় কয়েকটি সাম্প্রদায়িক ঘটনার পেছনে নানুভাই-এর হাত ছিল বলে কারো কারো অনুমান। এইরকম একটি সমাজবিরোধী কিভাবে মন্ত্রীর দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচিত হলো সেটাই বিস্ময়। হত্যাকারীদের এই কাজের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে শিকার উঠেছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল একসঙ্গে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। তারা অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছেন। ঘটনা শোনামাত্র মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে ছুটে যান। সহকর্মীর এই শোচনীয় মৃত্যুকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। রাগেই হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে তিনি আই জি এবং সি পি-র সঙ্গে জরুরী বৈঠক করেন। প্যারাডাইস এবং বড়বাজারের ঘটনার পরেও এতদিন হত্যাকারীরা ধরা না পড়ায় পুলিশ কমিশনারের অপসারণ দাবী উঠেছে। এই ঘটনা মন্ত্রিসভায় সংকট সৃষ্টি

করতে পারে। মন্ত্রীর এলাকায় যাতে কোন হাঙ্গামা না শুরু হয় তাই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

খবরগুলো পড়ার পর কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই দেখেছিস?’

জয়িতা সিগারেট ধরাল, ‘কি?’

‘কোন খবর বেরিয়েছে কিনা ওদের সম্পর্কে? যেভাবে এখন থেকে গেল ওরা!’

‘না। কাল রাত্রে তোর ঘুম দেখে অবশ্য মনে হয়নি এত চিন্তা করেছিস।’

কল্যাণ কোন জবাব দিল না। একথা ওকে বোঝানো অসম্ভব জান হবার পর সে এত আরামে থাকেনি। এমন নরম বিছানা, স্বকস্মকে টয়লেট, ভাল খাবার কোনদিন পায়নি। নিজেকে খুব সুখী মনে হয়েছে আজ সকাল পর্যন্ত।

এই খবরের কাগজগুলো আসার পর থেকেই আবার উদ্বেগ, আবার—। কল্যাণ জয়িতার দিকে তাকাল। যতই না ভাবতে ইচ্ছে করুক কিন্তু এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে জয়িতা একটি মেয়ে। তাদেরই সমবয়সী।

মেয়ে বলতে যে সব আকর্ষণীয় ব্যাপারগুলো চট করে চোখের সামনে ভাসে সেগুলো বাদ দিয়েই কিন্তু ওর অস্তিত্ব এবং তা সত্ত্বেও প্রমাণ করা যাবে না জয়িতা মেয়ে নয়। আর সে কাল গোটা রাত একটি মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে কাটাল অথচ মনে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না। নিজেকে বোঝাল কল্যাণ, ওকে

দেখলে তার কেবল জয়িতা বলেই বোধ হয়, মেয়ে বলে কোন অনুভূতি আসে না। জয়িতা নিজেই যেন তার সমস্ত নারীত্বকে আড়াল করে বসে আছে। সে ভাবনাটিকে অন্যদিকে সরাতে চাইল। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, ‘ধরা পড়লে তুই কি করবি জয়িতা?’

‘বলব শহীদ করণ মশাই, সাত আট বছর ঘানি টানতে পারব না। ফলতু ব্যাপার।’

‘তোরা সবাই কেমন সব ব্যাপার সহজ ভাবে নিতে পারিস!’ কল্যাণ নিঃশ্বাস ফেলল, ‘এই যে আজ আমরা কলকাতা ছেড়ে, পশ্চিমবাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কোনদিন এখানে ফিরব কিনা তাই জানি না।—মনটা কেমন লাগছে বুঝলি।’ কথাটা তারও, কিন্তু জয়িতা বলল, ‘আহারে, যাও না, মায়ের কাছে বসে ডু ডু খাও।’

কল্যাণ মাথা ঝাঁকাল, ‘তুই আর সুদীপ মানুষের সেন্টিমেন্ট বুঝিস না।’

‘আনন্দ বোঝে?’ জয়িতাকে হাসি খামাতে কণ্ট করতে হচ্ছিল।

হঠাৎ কল্যাণ চিৎকার করে উঠল, ‘আমি এতদিন কত কণ্ট করে পড়াশুনা করলাম, ভাল রেজাল্ট করলাম, কি লাভ হল? তিনটে অ্যাকশান করে এখন কুকুরের মত পাল্লাতে হচ্ছে। কেন? নিজেদের কণ্ট করে আমরা কার কি উপকার করলাম?’

জয়িতা উঠে দাঁড়াল, ‘তুই চিৎকার করছিস কেন?’

‘একশবার করব। তোদের কি? বড়লোকের বাড়িতে জন্মেছিস, তোরা এসব বুঝবি কেন! আমাকে টিউশনির পয়সায় চলতে হয়েছে। আমি জানি কণ্ট কাকে বল!’

কল্যাণের গলায় স্বরে বাষ্প ছিল কিন্তু সেটা উঁচু পর্দায় ধরা ছিল। জয়িতা বলল, ‘তুই আর একবার চোঁচা আমি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাব। ইউ আর আসকিং ট্রাবলস্। তোর এইসব কথা কারো কানে গেলে পুলিশ এখানে পৌঁছে যাবে। বহুৎ খুর পাবলিক তুই!’

কল্যাণ মাথা নাড়ল। যদিও তার গলা এবার নিচুতে, ‘এটাও তোর কথা নয়। সুদীপের ভাষা তুই বলছিস, দ্যাখ তোদের মধ্যে কি মিল!’

জয়িতার চোয়াল শক্ত হল, ‘কল্যাণ তুই কি বাগডোগরা যেতে রাজী হচ্ছিস না?’

কল্যাণ জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। ওরা তখনও বসেছিল ব্যালকনিতে। জয়িতা ঠিক করল ব্যাপারটা আনন্দের ওপরে ছেড়ে দেবে। সে ঘরে ঢুকে বলল, ‘শোন, আমাদের একসঙ্গে বের হতে হবে। কারণ আমরা একসঙ্গে এখানে চুকেছি। তোর টিকেট নিয়ে তুই আলাদা ফ্লাই করবি। আমার সঙ্গে বাগডোগরাতে পৌঁছানো পর্যন্ত তোর কোন সম্পর্ক নেই।’

কিছুক্ষণ কথা বলল না কল্যাণ। জয়িতা যখন তৈরী হবার জন্যে বাথরুমে চুকেছে তখন সে বলল, ‘আমি কখনও প্লেনে যাওয়া আসা করিনি।’

‘এমন কোন হাতি ঘোড়া ব্যাপার নয়। ভেতরে ঢুকে সোজা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বাগডোগরা কাউন্টারে চলে যাবি। আই সি দুশো একুশ। টিকিট এণ্ডর্স করিয়ে বোডিং কার্ড নিয়ে নিবি। সবাই যখন নিসিউরিটি চেকিং-এ যাবে তুইও যাবি। তারপর ফ্লাইট রেডি হলে প্লেনে উঠে বসবি। এত পরিশ্রম করেছিস সারা জীবন এটুকু নিশ্চয়ই জলজাত।’ জয়িতা বাথরুমে চুকে গেল। এবং তখন কল্যাণের নিজেকে খুবই পাতি বাঙালী বলে মনে হতে লাগল।

জয়িতা তার কথা রেখেছিল। কল্যাণের মনে পড়ল আনন্দের নির্দেশও এরকম ছিল। ওরা আলাদা বোডিং কার্ড নিয়ে আলাদা বসেছে। যেন কেউ কাউকে চেনে না। কল্যাণের চোখ চারপাশে ঘুরছিল। এসব জায়গায় নিশ্চয়ই পুলিশের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ করলে আর প্লেনে উঠতে হবে না। প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল তার। কেউ সংগী হলে তার সঙ্গে কথা বলে বেশ সময় কাটান যায়। কিন্তু বোডিং কার্ড নেওয়ার পর অনেক সময় চলে গেছে কিন্তু এখনও ডাক পরছে না। অনেক দূরে একটা রঙিন চেয়ারে বসে জয়িতা ‘দেশ’ পড়ছে। যেন কিছুই জানেনা এমন ভঙ্গী। দূরে একজন লোক তার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুকের ভেতরটা সিরসির করে উঠল। আতঙ্ক এতটা বাড়ছে যে কল্যাণ প্রথমবার প্লেনে উঠতে যাওয়ার উত্তেজনা অনুভব করতে পারছিল না। সে দেখল লোকটা এবার জয়িতাকে লক্ষ্য করছে। কল্যাণের মনে হল জয়িতাকে একবার

সাবধান করা উচিত। সেই সময় জয়িতা উঠল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে হাতড়ালো। তারপর অলস ভঙ্গীতে কিছুটা হেঁটে লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলল। কল্যাণ দেখল, লোকটা চটপট উঠে একটা লাইটার জ্বলে ওর সিগারেট ধরিয়ে দিল। জয়িতা এখন হেসে হেসে লোকটার সঙ্গে গল্প করছে। এবং এই গল্প করার ভঙ্গীটি ভারী মিষ্টি। একসঙ্গে ভয় এবং ঈর্ষায় আক্রান্ত হল কল্যাণ। জয়িতা যখন তাদের সঙ্গে কথা বলে তখন এই ভঙ্গীটা একদম থাকে না।

প্লেনে উঠে বসায় প্রাথমিক আড়ষ্টতা কেটে যাওয়ার পর কল্যাণ লক্ষ্য করল চারপাশে যারা বসে আছে তাদের প্রত্যেকের চেহারা ঠিকঠাক বড়লোকদের মত নয়। কেউ কেউ এমন সাধারণ যে ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানিয়ে যায় বেশি। অবশ্য পশ্চিম বাংলার এক শ্রেণীর মানুষ প্রচুর টাকা জমিয়েও নিজের পরিমণ্ডলের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেন না। অভ্যেস। ওই যে সামনের লোকটা, এয়ার হোস্টেসের বাড়ানো খালা থেকে যেভাবে এক খাবা লজ্জেস তুলে নিল তাতে লোকটিকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। কল্যাণ দেখল বেশ কিছুটা দূরে জয়িতা সেই লোকটার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত গল্প করছে। এয়ারপোর্ট থেকেই ওর দিকে একবারও তাকায়নি মেয়েটা। এখন আর রাগ নেই কিন্তু এক ধরনের কষ্ট তৈরী হচ্ছে বুকের মধ্যে। মেয়েরা কি সহজে উপেক্ষা করতে পারে! শুধু উপেক্ষা করাই নয়, সেটা বুঝিয়ে দিতে পারার পটুত্বও তাঁদের অসাধারণ। অথচ এই মেয়েটি যদি বড়বাজারে প্লেনেড না ছুঁড়ত তাহলে সুদীপের ভাষায় সে এতক্ষণে ছবি হয়ে যেত। কিন্তু সে-কারণে যে কৃতজ্ঞতা তা চাপা পড়ে যাচ্ছে ঈর্ষাপ্রসূত কষ্টে। কল্যাণ ব্যাপারটাকে ভোলার জন্যই জানলার দিকে তাকাল। মেঘের ওপর লক্ষের মত ভেসে যাচ্ছে প্লেন। সাদা মেঘের শরীরে রোদ কত রকম রঙের নকশা বুনছে। নিচের পৃথিবীটা এখন আড়ালে। কল্যাণ আবার প্লেনের ভেতরটা দেখল। চারপাশে খুব স্বচ্ছন্দ মানুষ। এখানে আর কাউকে পুলিশ বলে মনে হচ্ছে না। এমনকি জয়িতার সঙ্গে গল্প করা লোকটা হঠাৎ খুব নিরীহ হয়ে গেছে। এখন মাথার ওপর সিগারেট নেভানো কিংবা বেলট বাঁধার নির্দেশ নেই। কল্যাণ আচমকা সিট থেকে উঠে পড়ল। যদিও এয়ার হোস্টেস ছাড়া কেউ প্যাসেজে হাঁটছে না তবু সে কাঁপা পায় জয়িতার কাছে চলে এল। তারপর কথা বলতে গিয়ে ঢোক গিলল। লোকটা জয়িতার হাতের রেখা বিচার করছে। যেন ভুল করে চলে এসেছে এমন ভঙ্গী করে সে আবার নিজের সিটে ফিরে এল। যে মেয়ে বোমা ছোড়ে সে হাতের রেখা গোনাতে চায়? কল্যাণের সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছিল। সিগারেট ধরতে গিয়ে তার মনে পড়ল কেউ না ধরিয়ে দিলে এক হাতে দেশলাই জ্বালাবার কায়দাটা সে রপ্ত করতে পারেনি এখনও। আর তখনই নো স্মোकिং নির্দেশটা জ্বলে উঠল। কল্যাণ স্বস্তি পেল। ওটা না জ্বলে তাকে চেষ্টা করতেই হতো সিগারেট ধরতে।

তখন যদি তার হার হত সেটা বেশি লজ্জার। লজ্জাটা পেতে হল না। দমদমের কাছে বাগডোগরাকে এয়ার পোর্ট বলে মনে হয় না। এমন কি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুব হালকা। জয়িতাকে লক্ষ্য রেখে কল্যাণ প্লেন থেকে নেমে ছোট্ট বিল্ডিংটা চলে এল। তার একটা হাত এখনও অকেজো অন্যটা মাল বইতে হবে। এখান থেকে শিলিগুড়ি কত দূর? এসব অঞ্চলে সে কখনও আসেনি। ঘড়িতে দুটো পনের। আনন্দদের ট্রেন নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছবে চারটের পর। ওদের ওপর নির্দেশ আছে সোজা সিনক্লেয়ার নামের একটা হোটেলে গিয়ে উঠতে। কিন্তু ওদের বলতে আর যাকে বোঝাচ্ছে তিনি তো এখনও চেনার ভান করছেন না। মালপত্র খালাস করে কাঁধে স্ট্র্যাম্প বোলানো যেহেতু এক হাতে সম্ভব নয় তাই ভারি হলেও হাতেই নিল কল্যাণ। তারপরেই জানল এখান থেকে একটা বাস সোজা ওই হোটেলটাতেই নিয়ে যায়। অনুসরণ করে সেই বাসটায় উঠে বসল সে। মোটামুটি ভরতি হলে বাসটা যখন ছাড়ল তখন জয়িতা নেই। এবার উদ্বিগ্ন হল কল্যাণ। সে শুনেছে রাগ করলে মেয়েরা নাকি অন্ধ হয়ে যায়। তখন কোন যুক্তি বা সম্পর্কের কথা খেয়ালেই রাখে না। সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যতটা দেখতে পেল তার মধ্যে জয়িতার অস্তিত্ব নেই। গুম হয়ে বসে রইল সে। সুন্দর পিচের রাস্তা দিয়ে বাস ছুটছে। দুপাশে এয়ারফোর্সের ক্যান্টনমেন্ট। সাইকেলে সৈনিকরা আসা যাওয়া করছে। হঠাৎ জয়িতাকে ছাপিয়ে কল্যাণের মাথায় অন্য চিন্তা প্রবল হল। এইসব তরুণ যারা এখানে সুনির্মম পরে সাইকেলে কর্তব্য করতে যাচ্ছে তারা কি শুধুই পেটের জন্য চাকরি করতে এসেছে না দেশের প্রতি ভালবাসাও কাজ করছে?

শিলিগুড়ি শহরে ঢোকান আগেই বাঁ দিকে হোটেলটা। সুন্দর সাজানো। দেখলেই বোঝা যায় দক্ষিণা কম হবে না। আনন্দরা যে টাকা দিয়েছিল তা ওরা ভাগ করে নিয়েছিল কিন্তু ভি. আই. পি. রোডের গেস্ট হাউসের টাকা কল্যাণই মিটিয়েছিল। এখন পকেটে পড়ে রয়েছে সামান্য এবং এখানকার ভাড়াটাও অজানা। বাস থেকে নেমে ইতস্তত করল কল্যাণ। তারপর ব্যাগটাকে বয়ে রেসেপশনের দিকে এগোতেই জয়িতাকে দেখতে পেল। খুব সহজ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের পাশে। ওকে দেখে যে কায়দায় 'হাই' বলে হাত তুলল তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে পারল না। যেন কতকাল পরে দেখা হয়েছে। সেই ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে বলল, 'ওঃ, শেষ পর্যন্ত তোমাকে দেখলাম! আমি ভাবছিলাম যদি তুমি না আসো, ওই ফ্লাইটে!' তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে রিসেপশনের লোকটিকে বলল, 'ওয়েল! হি ইজ হিয়ার!'

লোকটি তার শেখা হাসিটি হাসল। নিজেরা নয়, বেয়ারা তাদের ঘরে মালপত্র পৌঁছে দিলে জয়িতা বলল, 'বা, তুই বেশ সাবালক হয়ে গেছিস তো!' বেয়ারা চলে গিয়েছিল। কল্যাণ বলল, 'এন্ডরিথিং হ্যাজ লিমিট জয়িতা। তুই আমাকে অকারণে এভাবে অপমান করতে পারিস না। আমি ওদের কাছে

সমস্ত ব্যাপারটা বলব।’

জয়িতা হাসল, ‘কি বলবি? কলকাতা থেকে পালাতে হচ্ছে বলে তোর আফসোস হচ্ছে। কেন এই অ্যাকশানে জড়িয়ে পড়লি? তাই নিয়ে আমি তোকে ঠাট্টা করেছিলাম। তুই এত জোরে চেষ্টা করেছিলি যে পুলিশ আসতে পারত; তারপর তোর সঙ্গে আমি কথা বন্ধ করেছিলাম। এই তো?’

কল্যাণ হতভম্ব হয়ে তাকাল। সে যে এতক্ষণ অভিমান এবং ঈর্ষা থেকে অসহায় হয়ে পড়েছিল এবং তার জন্যেই এক ধরনের ক্রোধ বড় হয়ে উঠেছিল আচমকা সেটা গুটিয়ে গেল। কোনরকমে সে বলতে পারল, ‘জয়িতা, আমি তোকে খুব মিস করছিলাম।’

জয়িতা কাঁধ নাচাল। তারপর বলল, ‘ঘন্টাখানেক চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে থাক, দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।’ যেন কোথাও বেড়াতে এসেছে এমন ভঙ্গী করে সে বাথরুমে ঢুকে গেল। নরম বিছানায় বসে কল্যাণের শরীরে হঠাৎ কাঁপুনি এল। সে কি খুব ভীর্ণ। খুব মেরুদণ্ডহীন? জয়িতার ভাষায় নাবালক। মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের যাবতীয় দোষ তার মধ্যে? কেন কলকাতা থেকে পালাতে গিয়ে তার মনে হল যা করেছে তার কোন মানে হয় না। মানে কি সত্যিই হয়? আর করবে বলে যখন নেমেছিল, রাজী হয়েছিল, তখন করার পর তাই নিয়ে আফসোস কেন এল মনের মধ্যে? সেটা কি কাপুরুষতার জন্যে। আর এখানেই আনন্দ-সুদীপ-জয়িতার থেকে সে পিছিয়ে! কি অভিযোগ করবে সে জয়িতার বিরুদ্ধে? গেস্ট হাউস থেকে বের হবার পর কথা বলেনি, না চেনার ভান করেছে, একা হোটলে চলে এসেছে? কিন্তু হোটলে তো এসেছে, আগে থেকে ঘর বুক করে রেখেছে। অভিযোগ টিকবে? সত্যি কি কারো বিরুদ্ধে তার অভিযোগ করার কিছু আছে? যদি কাউকে অভিযুক্ত করতেই হয় তাহলে— মুখ তুলল কল্যাণ। আর তখনই আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। এই মুখ সে কখনও দ্যাখেনি।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে ওরা শুনতে পেল জলপাইগুড়ি থেকে যে ট্রেনটা এইমাত্র এসেছে সেটা শিলিগুড়ির জংশন স্টেশনে যাচ্ছে। শিলিগুড়িতে যেতে হলে মিনিবাস অথবা রিকশা ভরসা। এই ট্রেনটাকে সবসময় পাওয়া যায় না। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঠিক সময়ে আসায় ছাড়ব-ছাড়ব ট্রেনটাকে দেখা যাচ্ছে। পুরনো আমলের ইঞ্জিন, কামরা আরও খারাপ। তবে মিনিট কুড়ি পঁচিশের বেশী যাত্রা নয়, ওরা ওতেই উঠে বসল। সুদীপ এখন ফিট। সমস্ত ট্রেনে ওরা দুজন পাশাপাশি বসেনি। এখানেও বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে এক কামরায় বসল। এবং তখনই আলোচনা শুনতে পেল। রেডিওতে খবর হয়ে গেছে। বারংবার মন্ত্রীর মৃত্যুর খবরটা বলছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার জরুরী মিটিং বসেছে আজ দুবার। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে সতর্ক করেছেন, অবিলম্বে হত্যাকারীদের ধরার জন্যে। প্রধানমন্ত্রী নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোন

করে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে এটা কোন সুগঠিত রাজনৈতিক দলের কাজ নয়। চারজন বিপথগামী তরুণ এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। তাঁর মতে বিকৃত রাজনৈতিক চিন্তার ফসল। এদের পিছনে কোন দল বা জনসাধারণের সমর্থন নেই। শুধুই ঘাতক ছাড়া কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। দুপুরের খবরে বলা হয়েছে ডায়মণ্ডহারবার থেকে আনন্দ নামে একটি যুবকের মাকে পুলিশ আরও জেরা করার জন্যে লালবাজারে নিয়ে এসেছে। ওই মহিলার স্বামী নকশালপত্নী ছিলেন। পুলিশের অনুমান চার জনের ওই দলের নেতা হল আনন্দ। মহিলাকে তাঁর ছেলের হোস্টেলে যেতে দেখা গিয়েছে। পুলিশের ধারণা হত্যাকারীরা এখনও শহরে আছে। তাদের সম্ভাব্য আস্তানা খুঁজে বের করা হচ্ছে। জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যারা ওই রকম তিনটে ঘটনা ঘটিয়েছে এবং দুটো ঘটনা ঘটিবার পরও শহর ছেড়ে যায়নি তাদের সম্পর্কে সামান্য সংবাদও পুলিশকে জানতে হবে। এরা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অনুমান করা হচ্ছে সব রকমের ভারী অস্ত্র এদের কাছে আছে।

আনন্দের মুখে কোন পল্লিবর্তন হল না। মাকে ওরা লালবাজারে নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় অত্যাচার করবে। এখান থেকে সে তার কোন প্রতিকারই করতে পারবে না। একমাত্র ধরা দেওয়া ছাড়া। কলকাতায় থাকলেও অবস্থার কোন হেরফের হত না। আর এ ব্যাপারে সহানুভূতি দেখানো সবচেয়ে বেশী অপহৃদ্য করবেন মা নিজে। যে মানুষটা সারাজীবন কারো সহানুভূতির তোয়াক্কা না করে একা সংগ্রাম করে গেল তাঁর এসবে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। তিনি স্বামীর কর্ম-কাণ্ডের শিকার হয়েছেন, পুত্রের কাজের জন্যেও নিজেকে ছিবড়ে করতে হচ্ছে। কিন্তু আনন্দ নিজেকে অপল্লিবর্তিত রাখল। হঠাৎ সে গুনল সুদীপ তার পাশের লোককে বলছে, 'এসব নকশালরা করছে না তো!'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'দূর! এসব করার হিষ্মত ক'জনের আছে। পাবলিকলি বলা উচিত নয় কিন্তু ওদের কাজকে আমি সমর্থন করি। শালা, এদেশে আইনফাইন আন্দোলন করে কিছু হবে না। ওরা প্যারাডাইস পুড়িয়েছে ঠিক করেছে। বড়বাজারে বোমা ফেলার হিষ্মত দেখিয়েছে জাল ওষুধ কারখানা ধ্বংস করে। কোন অন্যাস করেনি। নিজেদের স্বার্থে কিছু করেনি। আর মন্ত্রী হত্যা?' লোকটা সময় নিল একটু, 'এই হত্যাকাণ্ড অবশ্য বাড়াবাড়ি হলো গেছে কিন্তু মন্ত্রীমশাই সুবোধ বালক ছিলেন না।'

'সুবোধ বালক কি মশাই! রুহৎ দুনম্বর লোক ছিল। পার্টি কি করে ওকে এতদিন সহ্য করেছিল তাই বিস্ময়ের ব্যাপার! স্বনামে বেনামে যা সম্পত্তি করেছে সাতপুরুষ খেয়ে যাবে।'

আর একজন বলল, 'ওটা পার্টির ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনরকম রাজনৈতিক শিক্ষা ছাড়া ধরে ধরে মানুষ খুন করলেই হল? কি না, পাবলিকের উপকার করতে চান! রবিনহুড। এরা বিপ্লবের শত্রু।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন চিৎকার করে উঠল, 'রাখুন মশাই বিপ্লব। ওই কথাটা শুনতে শুনতে কান পচে গেল। এদেশে বিপ্লব করবে কে? আপনারা? টাটা বিড়লাকে আদর করে ব্যবসা করতে ডাকছেন, এক লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের মানুষকে গরীব বলছেন, এয়ারকন্ডিশন অফিস না হলে পার্টির মিটিং করতে পারবেন না হারা তাঁরাই বিপ্লব বিপ্লব করে চেঁচাবেন। লাস্ট লোক ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, তাঁর পরে আর কেউ নেই। এ ছোকরাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন এরা প্রমাণ করেছে এদের মেরুদণ্ড আছে। দেশটা কেল্লোয় ভরে যায়নি।'

তপ্ত আলোচনার মাঝখানে টাউন স্টেশন এল। সেখানে নেমে গেল বেশির ভাগ মানুষ। জংশন স্টেশনে এলে ওরা প্লাটফর্মে নামল। অস্বস্তি শব্দটা স্টেশনের সঙ্গে পোস্টারের মত সাঁটা। এমনকি টিকিট চেকার নেই টিকিট নেবার জন্যে। ওরা একটা তিনচাকার রিকশা নিল। সুদীপ প্রথম কথা বলল, 'মাসীমাকে অ্যারেস্ট করেছে বোধ হয়।'

আনন্দ জবাব দিল, 'শুনলাম। কালকের কাগজ দেখলে বোঝা যাবে।'

'তোর কোন চিন্তা হচ্ছেনা?' সুদীপ আনন্দের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'হচ্ছে।' একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল আনন্দ।

দিল্লী হোটেলে ওরা একটা ঘর নিল। মধ্যবিত্তদের হোটেল। খাতাম উল্টো-পাল্টা নাম ধাম লিখে ঘরে ঢুকে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এখনই বের হবি?' আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। সন্ধ্যা হোক তারপর। ওরা দুজন ঠিকঠাক এলে হয়।'

সুদীপ বলল, 'কল্যাণটাকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই। ওর মধ্যে টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত ভাল মানুষী আছে যেটা ক্যামোফ্লেজ করবে। কিন্তু জয়িতার চেহারার বর্ণনা পেলে ওকে লোকেট করতে একটা হাবা কনস্টেবলেরও অসুবিধে হবে না।'

আনন্দ বলল, 'চিন্তা করে কোন লাভ নেই। ফ্রেস হয়ে নে, তোর সঙ্গে আলোচনা আছে।'

সুদীপ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একবার ওদের হোটেলে টেলিফোন করবি?'

'না। সন্ধ্যার পরে গেলেই ভাল। তুই যাবি?'

'আপত্তি নেই। তুই যাবি না?'

'দুজনে এক সঙ্গে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। খোলাখুলি বলছি, ওরা যদি কলকাতায় ধরা পড়ে থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে এই শহরে থাকারাই বিপজ্জনক। চাপের মুখে কল্যাণ কতটা স্থির থাকবে বলা মুশকিল। আমি ওদের হোটেলে উঠতে বলেছি, শেষ মুহুর্তে পুলিশ আমাদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে পারে। এক্ষেত্রে তোর যদি যেতে আপত্তি থাকে তাহলে—' আনন্দ কথাটা শেষ করল না।

'আগেই বলেছি আপত্তি নেই।' সুদীপ উঠে পড়ল। স্নান করা দরকার।

সমস্ত শরীর বড় নোংরা হয়ে রয়েছে। গায়ে জল না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যাবে না।

সন্দের পর আনন্দ আর সুদীপ এক সঙ্গে বের হল। আনন্দ গেল রকেট বাস স্টেশনের কাছে। কাল খুব ভোরে একটা জিপ ভাড়া করতে হবে। যদি অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়া যায় তাহলেও ঘন্টা সাড়ে তিন চার লাগবে। সুদীপের সঙ্গে কথা হল যে কোন অবস্থাতেই ও রাত নয়টায় হোটেল ফিরে আসবে। সময়টা অতিক্রান্ত হলে আনন্দ নিজের মত সিদ্ধান্ত নেবে। সুদীপ একটা রিকশা নিল। মনে হয় এদিকটা যেহেতু শহরের প্রান্ত তাই ব্যাপক হারে জনবসতি গড়ে ওঠেনি। নেপালি-পাঞ্জাবি একটু বেশি চোখে পড়ছিল। শহর থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরতে হোটেলটা দেখতে পেল সুদীপ। রিকশা ছেড়ে দিয়ে সে পায়ের পায়ে হোটেল চুকতেই জমিতাকে দেখতে পেল। এ মেয়ে জমিতা না হয়ে যায় না। এখন রাত। বাতাসে গরম ভাবটা নেই। হোটেলের সামনেও লনে টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই লনে চুপচাপ পায়চারী করছে জমিতা। একা একা। সুদীপের বিরক্তি হল। মেয়েটা গর্দভ নাকি! এইভাবে লনে ঘুরে ঘুরে নিজেকে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরছে।

সুদীপ জমিতার কাছে এগোল না। সে দূর থেকে জমিতাকে লক্ষ্য করতে লাগল। মাঝে মাঝে গাড়ি চুকছে এবং বেরুচ্ছে। হোটেলের বাইরেটায় আপাতত কোন চাঞ্চল্য নেই। বোধ হয় কিছুটা ক্লাস্তি অনুভব করায় জমিতা সিঁড়ি ভেঙে বারান্দার একটা চেয়ারে বসল। আর ঠিক তখনই ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। ভাল স্বাস্থ্য, কাঁধ দুটো বেশ চওড়া, সিগারেট খেতে খেতে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অলস ভঙ্গীতে একবার জমিতার দিকে তাকাল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গাড়িতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সুদীপ লোকটার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করল। দরজাটা আবার বন্ধ করে লোকটা ফিরে দাঁড়াল। সেখান থেকেও জমিতাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যদিও আলোটা তেমন তেজ নেই তবু বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু লোকটা যদি শুধু মেয়ে দেখবার বাসনায় দাঁড়ায় তাহলে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যে ধরনের নারী শরীরের দিকে একবার তাকালে পুরুষমানুষ মাছির মত আটকে যায় জমিতা তা থেকে অনেক দূরে। ধীরে ধীরে লোকটা আবার হোটেলের সিঁড়ি ভাঙল। একটু ইতস্তত করে সোজা জমিতার সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা হাসল। জমিতা যে একটু অবাক হয়েছে বোঝা গেল। লোকটা হেসে হেসে কথা বলছে। জমিতা বারংবার মাথা নাড়ছে। হাসছে সেও। তারপর লোকটা চটপটে পায়ের ফিরে গেল তার গাড়ির কাছে। গাড়িটা যখন গেট পেরিয়ে সুদীপকে অন্ধকারে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন খুব কাছাকাছি স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এবং তৎক্ষণাৎ মনে হল এই লোকটা পুলিশ না হয়ে যায় না। ওই চোয়াল ও শারীরিক গঠন পুলিশদেরই হয়। গাড়ির নম্বরটা দেখে কিছুই মনে হচ্ছে না। সুদীপ দেখল

জয়িতা উঠে ভেতর দিকে এগোচ্ছে। সে আর দেরি করল না। মতটা সম্ভব দৌড়ে দূরত্ব কমিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়ল। রিসেপশনের লোকটা মাথা নিচু করে হিসাব করছিল। একটা দারোয়ান এসে সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল। সুদীপ গতি কমিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গী করে হাঁটতে লাগল। জয়িতাকে দোতলার সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে। কেউ তাকে কিছু বলল না বাধে হয় তার সহজ অভিব্যক্তির জন্যই। তানদিকের একটা ঘরের দরজা খুলে একবার পেছন ফিরতেই জয়িতার মুখ উজ্জ্বল হল। সুদীপ ইশারায় তাকে ভেতরে ঢুকতে বললে জয়িতার মুখে হাসিটা মুছল। ভেতরে ঢুক দরজা বন্ধ করে সুদীপ দেখল কল্যাণ শুয়ে আছে। ওকে দেখেই সে নিজের হাত বাঁচিয়ে উঠে বসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে?'

'ঠিক ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে বৈঠক শুরু হল। তুই একা একা লনে কি করছিলি?'

সুদীপের প্রশ্নটায় জয়িতার ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'হাওয়া খাচ্ছিলাম।'

'ইউ হ্যান্ড ইনভাইটেড বাম্বু। লোকটা তোকে কি জিজ্ঞাসা করছিল?'

'কোন লোকটা।'

'উঃ, একটু আগে যার সঙ্গে তুই কথা বলছিলি।'

'ওঃ! ভদ্রলোক বললেন আমাকে ওর খুব চেনা চেনা লাগছে। আমি কি বাই এনি চান্স শিলিং-এ থাকতাম। আমি না বলতে উনি বললেন, দুঃখিত আপনাদের চেহারায় ভীষণ মিল। তখন উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামটা জানতে পারি। আমি বললাম ইটস অ্যান ওল্ড ট্রিক। আপনি সোজাসুজি জানতে চাইলে পারতেন। শোনার পর চলে গেলেন। দ্যাটস অল।' জয়িতা দুটো হাত নেড়ে কথা শেষ করল।

সুদীপ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, 'প্যাক আপ। তোদের এখনই হোটেল ছাড়তে হবে। আমার বিশ্বাস লোকটা পুলিশ। তোকে দেখার পর ওর ভাব ভঙ্গী দেখে আর যাই হোক কোন রোমিওকে আমার মনে পড়েনি। হি ইজ পুলিশম্যান। আই অ্যাম সিওর, আধঘন্টার মধ্যে এখানে পুলিশ ফোর্স এসে যাবে। কুইক কুইক।'

কল্যাণ ততক্ষণে তার ব্যাগ তুলে নিয়েছে একহাতে, 'উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাইরে গেলেন হাওয়া খেতে। একেই বলে যেচে বাঁশ নেওয়া।'

'আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করিনি কল্যাণ। তোর কমপ্লেক্স থেকে এসব বলছিলি।'

'ওঃ স্টপ ইট। বলছি সমস্যা নেই।' সুদীপ জয়িতাকে খামাল, তারপর হাত লাগাল ওদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। তৈরী হয়ে জয়িতা বলল, 'হোটেলকে কি বলব? হঠাৎ কেন ছেড়ে চলে যাচ্ছি? আমরা মাত্র কয়েক ঘন্টা এখানে এসেছি।'

'আমরা কতক্ষণ হোটেলেরে থাকব সেটা আমাদের ইচ্ছে। একদিনের টাকা

ওদের দিয়ে দে। লেটস গো। কল্যাণ তোর ব্যাগটা আমাকে দে।' সুদীপ হাত বাড়াল।

কল্যাণ আপত্তি করল, 'আমিই নিতে পারছিলাম।' সুদীপ আপত্তি গুনল না। রিসেপশনের লোকটাকে জয়িতা সুন্দর বুঝিয়ে দিল। ওর ভাই খবর পেয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছে। কিছুতেই হোটেলে থাকতে দিতে রাজী নয়। সুতরাং তাদের ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। একদিনের ভাড়া মিটিয়ে দিল সে। কল্যাণ দেখল টাকাটা কম নয়। বাইরে বেরিয়ে সে বলল, 'তোর জন্য ঝামেলা হল। বেশ আরাহমদায়ক ঘর ছিল।'

যেহেতু কেউ কোন কথা বলল না তাই শব্দগুলোকে বড় ফাঁকা শোনাল। ওরা বাইরে কোন ঝিন্মা পেল না। অতএব হাঁটা ছাড়া কোন উপায় নেই। খানিক পরে দু পাশে দোকান রেখে হাঁটছিল ওরা। এটাই একমাত্র সড়ক। সুদীপের খেয়াল হল এইভাবে ওদের হাঁটা ঠিক হচ্ছে না। পুলিশ নিশ্চয়ই এই পথেই হোটেলে আসবে। সেক্ষেত্রে সামনা সামনি পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া চারজন একসঙ্গে থাকাই উচিত নয়। নিজেদের হোটেলে এদের নিয়ে যেতে সাহস হল না ওর। পুলিশ হোটেলে গিয়ে জানতে পারবে এরা হোটেল ছেড়ে গেছে। আর সময় নষ্ট করবে না ওরা। সন্দেহটা সত্যি বোঝা মাত্র পুলিশ ব্যাপক তল্লাসি চালাবে। কোন হোটেল বাদ দেবে না। সেক্ষেত্রে আনন্দ এবং তারও বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। সুদীপ চটপট সিদ্ধান্ত নিল। 'তোর রাতের খাওয়া খেয়েছিস?'

জয়িতা উত্তর দিল, 'না। এই সন্ধ্যাবেলায় কি কেউ রাতের খাওয়া খায়?' বাঁ দিকে একটা চাইনিজ খাবারের দোকান নজরে পড়েছিল। সেটা দেখিয়ে সুদীপ বলল, 'তারা ওখানে গিয়ে টিপিক্যাল খাবারের অর্ডার দিবি যাতে সার্ভ করতে বেশ সময় নেয়। আমি আর আনন্দ না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবি।'

ওরা চাইনিজ রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে সুদীপ পা বাড়াল। মিনিট পাঁচেক লাগল তার হোটেলে পৌঁছাতে। আনন্দ তখনও ফেরেনি। হোটেলের ম্যানেজারকে সে সেই মিথ্যাটাই বলল যা জয়িতা ওর রিসেপশনে বলেছিল। টাকা পরস্যা মিটিয়ে সে আবার রিকশাটা নিয়ে শহরের দিকে যেতেই দেখতে পেল তিনটে পুলিশের গাড়ি হর্ন বাজাতে বাজাতে শহর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। তিনটেতেই পুলিশ ভর্তি। আর সময় নেই। সুদীপের মনে হল ঐশ্বর টিশ্বর না থাকলেও ভাগ্য বলে একটা ব্যাপার আছে।

রকেট বাস স্টেশনের সামনে বেজায় ভীড়। কলকাতার জন্যে রকেট বাস ছাড়ছে। সুদীপ কলকাতা শব্দটা পড়তে পারল। আর তখনই বুকের মধ্যে সামান্য নড়াচড়া হল তার। এখানে আনন্দকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। দাঁড়িয়ে থাকা একটা জিপকে দেখে তার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাজিলিঙ যাবে কিনা!'

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল, ‘কাল সকাল সাতটায় যেতে পারে।’ তারপর হেসে বলল, ‘আপনি এখন যেতে চাইছেন আর একজন এসেছিল চারটের সময় যাবে বলে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আজ।’

প্রায় মিনিট পনের ঘোরার পর একটা মিষ্টির দোকানের সামনে আনন্দকে পেল। একটা নেপালি ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। সুদীপ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার? এনি প্রব্লেম?’

আনন্দ কাঁধ ঝাঁকাল, ‘কেউ ভোরে যেতে রাজী হচ্ছে না। সকাল ছটায় বেরতে হবে।’

‘এখন কেউ যাবে?’ সুদীপ প্রশ্ন করল।

‘এখন? এখন কেন? গোলমাল হয়েছে?’ সুদীপের দিকে তাকাল আনন্দ। ‘পরে বলছি। আগে চেষ্টা কর এখন যদি কেউ যায়।’

নেপালি ছেলেটি কথা শুনেছিল। সে বলল, ‘এখন যদি দাজিলিঙ যান তো বীরবাহাদুরের গাড়িতে যেতে পারেন। ওকে কাল ভোরে টাইগার হিলে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যেতে হবে দাজিলিঙ থেকে। কিন্তু সকাল ছটার আগে কেউ যাবে না।’

সুদীপ জবাব দিল, ‘তুমি বীরবাহাদুরকে খবর দাও। ভোরে যেতে না পারলে আমরা এখনই যাব।’ কথাটা শোনামাত্র ছেলেটা মাফিয়ে ছুটে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার? ও এতক্ষণ আমাকে জপাচ্ছিল যাতে বীরবাহাদুরের গাড়িটা নিয়ে এখনই রওনা হই। রাত্রে পাহাড়ে ওঠায় রিস্ক অনেক বলে আমি রাজী হইনি। কল্যাণরা কি শিলিগুড়িতে আসতে পারেনি?’

‘পেরেছে।’ সুদীপ মাথা নাড়ল। তারপর সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল। এখন পুলিশ হোটেল ছুটেছে জেনে ওর চোয়াল শক্ত হল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ‘কল্যাণ আর জন্মিতার মধ্যে কি নিয়ে লাগল?’

‘কমপ্লেক্স। অস্বস্ত জন্মিতা বলেছে তাই।’ সুদীপ কথা শেষ করা মাত্র একটা ল্যাণ্ডরোভার সামনে এসে দাঁড়াল। নেপালি ছেলেটা বলল, ‘দোশো লাগেগা।’ আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। সুদীপ বলল, ‘রাজী হয়ে যা।’

হোটেল থেকে মালপত্র গাড়িতে তুলে নিয়ে ওরা সেই চাইনিজ রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়াতেই দেখল পুলিশ জিপগুলো শহরে ফিরে যাচ্ছে। সুদীপ গিয়েছিল ওদের ডেকে আনতে। বীরবাহাদুর নামের লোকটার চেহারা প্রায় পাখির মত। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘এত রাত্রে পাহাড়ের রাস্তায় কোন ভয় নেই?’

বীরবাহাদুর বলল, ‘ভয় আছে বলেই তো রাত্রে কেউ দাজিলিঙ-এ যায় না। আমি না গেলে মালিক ফাঁসিয়ে দেবে বলেই যাচ্ছি। তবে আমি শতক্ষণ স্টিয়ারিং-এ আছি ততক্ষণ আপনাদের কোন ভয় নেই।’

নেপালি ছেলেটা ড্রাইভারের পেছনে বসে আছে। আনন্দ একটা কথা ভেবে

আশ্চর্য হল শিলিগুড়িতে কেউ নেই যে জানবে তারা আজ রাতে দার্জিলিং-এ যাচ্ছে। অবশ্য দার্জিলিং তাদের গন্তব্যস্থল নয়। ম্যাপ অনুযায়ী তাদের যুম থেকে ঘুরে যাওয়ার কথা। এই সময় সুদীপ ওদের নিয়ে ফিরে এল। গাড়িতে উঠে কল্যাণ প্রথম অভিযোগ করল, 'সবে খাবার সার্ভ করেছে এইসময় সুদীপটা টেনে আনল। পেটে এখন ছুঁচোয় ডন মারছে।'

সুদীপ হাসল, 'এখন চিকেন চাউমেন খেতে গেলে বাকি জীবন জেলের লপসি খেতে হত।'

রাত্রির অন্ধকারে শিলিগুড়ি থেকে ল্যাণ্ডরোভারটা ছুটে যাচ্ছিল শুকনার দিকে।

॥ ২৭ ॥

শুকনা পর্যন্ত গাড়ি ছুটেছিল জেট-এর গতিতে। রাস্তা ফাঁকা, দুপাশে চা-বাগান, সজ্জো পার হয়ে যাওয়ার চারখারের নিঃসাড় নির্জনতা অন্যতে ছড়ানো। সুদীপ বাসেছিল কল্যাণের সঙ্গে ড্রাইভারের পাশে, ওরা দুজন পেছনে। যেতে যেতে সুদীপ প্রথম মন্তব্য করল, 'ফ্যান্টাস্টিক।'

আনন্দ বারংবার পেছনে তাকাচ্ছিল। কোন দ্রুতগতির হেডলাইট এখনও দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য যদি পুলিশ সামান্য আঁচ করতে পারে তাহলে অফারলেসে সামনের যে কোন পুলিশ স্টেশনকে জানিয়ে দিলেই হয়ে গেল। পথ একটাই। নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছাতে গেলে এই পথেই যেতে হবে। সে চাপা গলায় একটু বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার হাওয়া খাওয়ার জন্যে হোটেলের বাইরে আসার কি দরকার ছিল! এই সব ছেলেমানুষী কি রকম বিপদ ডেকে আনে দ্যাখ?'

অন্ধকার ছিল বলে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তবু জয়িতা আনন্দকে দেখার চেষ্টা করল, 'আই অ্যাম সরি। আসলে কল্যাণটা মাঝে মাঝে এমন বোর করে। স্টিভ আই অ্যাম সরি।'

আনন্দ মুখ ঘোরাল, 'আমি জানি না সামনে কি আছে!'

কল্যাণ খোঁচাটা গায়ে মাখবে না বলে তিক করল, 'তুই রুটটা চেঞ্জ করতে পারিস না।'

আনন্দ জবাব দিল, 'পাহাড়ের সঙ্গে চালাকি করে কোন লাভ নেই।'

সুদীপ এবার বলল, 'আমার ওপর ছেড়ে দে।' তারপর হিন্দীতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাড়ি কি দার্জিলিং শহরেই?'

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, 'আপনি বাংলায় বলুন আমরা বাংলা বুঝতে পারি।'

একটু অস্বস্তি হল সুদীপের, তারপর বলল, 'সরি, আমি বুঝতে পারিনি।'

ড্রাইভার রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ, আমার বাড়ি দার্জিলিং-এ।'

'এখন ওয়েদার কি রকম?'

'টিকই আছে। লাক থাকলে টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে পারেন।'

ড্রাইভারের সঙ্গী ছোকরাটা শিস দিচ্ছিল। আনন্দ বাড়ি দেখতে গেল। শুকনা ছাড়িয়ে

যাওয়ার পর মনে হল পৃথিবীতে কোথাও মানুষ নেই। এক জমাট অন্ধকার চারপাশ দেখাল তুলে দাঁড়িয়ে। সুদীপ ড্রাইভারের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে ভাব জমাতে গিয়ে এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে। ওদের একটু আগের সংলাপ লোকটা কতটা শুনেছে অথবা শুনে কি বুঝে তা কে জানে। কপালে যা আছে তা হবে। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার পথ নেই। অসঙ্গত কিছু করলে এই ড্রাইভারই হয়তো পুলিশকে জানিয়ে দেবে তাদের ক'থা।

ধীরে ধীরে গাড়ি ওপরে উঠছে। হঠাৎ বাঁদিকে তাকালেই অজ্ঞান আলোর মালা চোখে পড়ল। যেন হীরে জ্বলছে দূরে পৃথিবীর গায়ে। সুদীপ বেশ উত্তেজিত হয়ে আবার বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক। শিলিগুড়ি, না?'

শুধু ওইটুকুই। চোখের আড়ালে চলে গেলে গাড়ির হেডলাইট ছাড়া কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই। এবং এই রাত্রে ড্রাইভার যে গাড়িতে স্বচ্ছন্দ হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে তা ওদের মোটেই কাম্য নয়। কিন্তু লোকটা প্রতিটি বাঁক নেওয়ার আগেও যেন গতি কমানোর চেষ্টা করছে না। আনন্দ বলল, 'বাঁক ঘোড়ার আগে হর্ন দেওয়ার নিয়ম নয়? ওপাশ থেকে যদি গাড়ি আসে তাহলে টের পাবে না।'

'দিনের নিয়ম রাত্রে চলে না। ওপাশ থেকে খুব জরুরী, মানে আমাদের মত না হলে, গাড়ি নামবে না। আর কোন গাড়ি যদি আসতো তাহলে বহুদূর থেকেই হেডলাইটের আলো দেখতে পেত। এখন তো গাড়ি চালানো আরাম। কোন রিস্ক নেই। একটু পরে যখন কুয়াশা নামবে তখনই ঝামেলা।' ড্রাইভারের গলা এখন বেশ স্বাভাবিক।

ভিন্দারিয়াতেও যখন কেউ পথ আটকালো না তখন মনের চাপ কমল। এবার একটু ঠাণ্ডা লাগছে। ওরা প্রত্যেকে ফুল্পিসভ পরে নিতে গিয়ে কল্যাণকে নিয়ে ঝামেলায় পড়ল। ওর প্লাস্টার করা হাতে সোয়েটার ঢুকবে না। আনন্দ একটা চাদর জয়িতার দিকে এগিয়ে দিল, 'এটা দিয়ে ওকে ভাল করে মুড়ে দে।'

বিরক্ত হয়ে কল্যাণ বলল, 'এই ল্যাঠাটাকে সরাতে হবে এবার। আমার হাত ঠিক হয়ে গিয়েছে। কোন পেন যখন ফিল করি না, তখন অসুবিধে র্নেখে লাভ কি!'

কথাটার জবাবে কিছুই বলল না কেউ। জয়িতা চাদরটা খুলে বলল, 'একটু হাত আগলা কর।' চাদর মোড়া হয়ে গেলে কল্যাণ হাসল। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ হাসির কি হল?'

কল্যাণ বলল, 'ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। শীতকালে মা এইভাবে আমাকে আলোয়ানে মুড়ে দিত। খুব বাচ্চা ছিলাম তখন।'

জয়িতা মন্তব্য করল, 'তোমর শৈশবকাল তো এখনও চলছে।'

পৌনে দুঘন্টার কাশিয়াং এসে গেল।

ড্রাইভার গাড়িটাকে পার্ক করে বলল, 'পনের মিনিটের জন্যে ডিনার ব্রেক।'

ইচ্ছে হলে খেয়ে আসতে পারেন।’

সুদীপ জাফিয়ে নামল। নেমে বলল, ‘আঃ!’

আনন্দ বলল, ‘সবার একসঙ্গে খেতে যাওয়া উচিত হবে না। ব্যাগগুলো রয়েছে তোরা যা খেয়ে আয়।’

জয়িতা বলল, ‘সবার যাওয়ার কি দরকার। সুদীপ গিয়ে কিছু নিয়ে আসুক।’

মিনিট দুয়েক বাদ সুদীপ ঘুরে এসে বলল, ‘হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যাচ্ছে গাড়িতে। এখানে এত তাড়াতাড়ি সব দোকান বন্ধ হয়ে যায় কে জানত!’

আনন্দ তাকিয়ে দেখে নিজ চারপাশে। ড্রাইভার এবং ছোকরাটা ধারে কাছে নেই। সে বলল, ‘আমরা দার্জিলিং-এ যাচ্ছি না!’

কল্যাণ প্রশ্ন করল, ‘তাহলে রাত্রে থাকব কোথায়?’

‘ঘুম-এ।’ আনন্দ বলল, ‘দার্জিলিং-এ যাওয়াটা রিস্কি হয়ে যাবে। বারবার কপাল পরিষ্কার নাও হতে পারে। সেখানকার হোটেলগুলোতে পুলিশ এর মধ্যে রুটিন ইনস্ট্রাকশন পাঠাতে পারে। তাছাড়া আমরা যেখানে যেতে চাইছি তার রুট ঘুম থেকেই। যদি এই জিপটা সুখিয়্যাপোখরী কিংবা মনোরজন পর্যন্ত পৌঁছে দিত!’

সুদীপ বলল, ‘ড্রাইভারটাকে রিকোয়েস্ট করব?’

‘কোন লাভ হবে না মনে হচ্ছে। লোকটা এতরাত্রে উল্টোপথে যাবে না। আর ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয় ওকে জানিয়ে দেওয়া উচিত নয় আমরা কোথায় যাচ্ছি!’

জয়িতা চুপচাপ গুনছিল। এবার বলল, ‘ঘুম-এ নামবি কি বলে?’

আনন্দ বলল, ‘সেটা কোন প্রব্লেম নয়। বলব টাইগার হিলে সানরাইজ দেখে কাল দার্জিলিং-এ গিয়ে হোটেলে উঠতে না উঠতেই আবার বের হতে হবে। মিছিমিছি কষ্ট করে কি লাভ!’

‘দ্যাখ?’ জয়িতা ছোট্ট মন্তব্য করল।

কাশিয়াং ছেড়ে যত ওপরে উঠছিল তত শীত বাড়ছে। তবু গাড়ির ইঞ্জিন চালু থাকায় একটা তাপ ছড়চ্ছে। আনন্দ কথা শুরু করল ‘আপনি কাল ট্র্যাবিস্ট নিয়ে কখন বের হবেন দার্জিলিং থেকে?’

‘তিনটে নাগাদ।’ ড্রাইভার জবাব দিল।

‘তাহলে ঘুমাবেন কখন? এখনই তো দশটা বেজে গেল।’

‘কি করব, ডিউটি করতে হবে। মালিককে কথা দেওয়া হয়েছে। নইলে এই রাত্রে শিডিউড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে ফিরি?’ ড্রাইভারের গলার স্বরে অশুশী ফুটে উঠল।

আনন্দ বলল, ‘আমরা তো কাল টাইগার হিলে যাব পরণ্ড ফিরে আসছি। চার ঘণ্টা হোটেলে থেকে কি হবে? তাছাড়া এগারটার সময় হোটেলে পৌঁছে তিনটেতে গাড়ি পাব?’

ড্রাইভার বলল, 'এখন তো কোন ড্রাইভারকে পাবেন না। তবে তিনটির সময় ওয়েদার ভাল থাকলে পেয়ে যেতে পারেন। আপনারা কাশিঝাং-এ থেকে গেলে ভাল করতেন। এখনই গাড়ি ঠিক করে রাখলে ওরা ভোরে আপনাদের ডেকে নিয়ে যেত।'।

যেন সত্যি বড় ভুল হয়ে গেছে এমন একটা শব্দ করল আনন্দ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাদের এখন টাইগার হিলে পৌঁছে দেবেন? শুনেছি ওখানে নাকি ট্যুরিস্ট লজ আছে।'।

'এখন? মাথা খারাপ! আমি আর কোথাও যেতে পারব না।' ড্রাইভার বেশ জোরে বলল।

এরপর অনেকক্ষণ কথা হল না। সুদীপের ঠান্ডাটা ভাল লাগছিল। আনন্দ একটু কুঁকড়ে ছিল। জমিতাকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু কল্যাণের বসার ভঙ্গী দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তার খুব শীত করছে।

হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'যুম-এ কোন হোটেল নেই?'

এবার ড্রাইভার মাথা নাড়ল, 'যুম-এ থাকলে আপনাদের সুবিধে হবে। ওখান থেকে টাইগার হিল হেঁটেও যাওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হল যুম-এ কোন হোটেল নেই। থাকবেন কোথায়? স্টেশনে থেকে যেতে পারেন যদি ঘর খোলাতে পারেন।' তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এক রাত্রের জন্যে পঞ্চাশ টাকা দেবেন?'

'কেন?' আনন্দের মনে হল লোকটা সাহায্য করতে চাইছে।

'তাহলে আমার এক বন্ধুকে বলতে পারি একটা ঘর ছেড়ে দিতে। ওর ভাই কালিম্পং-এ গিয়েছে। ঘরটা খালি আছে। যদি এক রাতের জন্যে পঞ্চাশ পেয়ে যায় খারাপ কি? ওরও লাভ হল, আপনাদেরও উপকার হল।'।

যেন স্বর্গ পাওয়ার সম্ভাবনা শুনল আনন্দ, 'দেখুন না, প্লিজ, বড় উপকার হয় তাহলে।'।

যুম স্টেশন ছাড়িয়ে একটা কার্ঠের বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়াল। এখন এখানকার কোন বাড়িতে আলো জ্বলছে না। কল্যাণের মনে হচ্ছিল তার হাড়ের ভেতরে ঠাণ্ডা ঢুক গেছে। সুদীপ বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতে রেলওয়ে স্টেশন হল যুম।'।

জমিতা প্রতিবাদ করল, 'না। কাগজে দেখেছি আর একটা স্টেশন হয়েছে কোথায়।'।

কল্যাণ দাঁতে শব্দ করে বলল, 'তোদের এখনও তর্ক করার ইচ্ছে হচ্ছে! উঃ কি ঠাণ্ডা রে বাবা। কলকাতায় এরকম ঠাণ্ডা তিনদিন পড়লে অর্ধেক পপুলেশন কমে যেত।'।

সুদীপ বলল, 'এতেই এই! ওয়াল্যাং চাঙ-এ গেলে তো খাবি খাবি।'।

কল্যাণ উত্তর দিল না। কিন্তু ওয়াল্যাং চাঙ নামক জায়গাটার তো সুদীপও কোনদিন যায়নি। কেউ চাক্ষুষ করেনি। আনন্দ বইপত্র ঘেঁটে ওটাকে

আবিষ্কার করেছে। তাই আগে থেকে সেটা সম্পর্কে ভীত হয়ে লাভ কি।
একটু বাদে ড্রাইভার ফিরে এল আর একটা লোককে নিয়ে। লোকটা নির্ঘাৎ
ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাছে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। ড্রাইভার বলল, 'এ হল
আমার বন্ধু। ওর ঘর খালি আছে। ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ঘরে আমরা চারজন থাকতে পারব?'
লোকটা হিন্দীতে বলল, 'গরীবের ঘর। দোতলায় বলে খাট নেই। ওখানে
ঠাণ্ডা লাগবে না। কিন্তু হজুরেরা কাল চলে যাবে তো?'

সুদীপ বলল, 'কাল ভোরেই চলে যাব। শুধু রাতটা কাটাতে চাই?' লোকটা
বলল, 'তাহলে ঠিক আছে। আমার ভাই কাল দুপুরে ফিরবে। তার আগে
ঘর খালি করে দিলে চলবে। টাকাটা আগে দিতে হবে কিন্তু।'

'কেন?'

'আমার এই বন্ধুর কাছে তিরিশ টাকা ধার নিয়ে ছিলাম, সেটা ওকে এখনই
শোধ করে দেব। আর আমি যে টাকা নিচ্ছি তা কাউকে বলবেন না।'

ড্রাইভারকে চুক্তি মতন টাকা দিয়ে দিলে সুদীপ। ঘড়ভাড়াও মিটিয়ে দিল।
তারপর মালপত্র নামিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করল। মাটিতে নেমে কল্যাণ
হিঁচি করে কাঁপতে লাগল। ওর চাদর পেছন দিকে খুলে গিয়েছিল। আনন্দ
সেটাকে ঠিক করে দিল। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে যেতে সুদীপ বলল,
'ড্রাইভারটা খুব চালু। এই সুযোগে টাকাটা আদায় করে নিল। ব্যাটাকে
ঘুম অবধি ভাড়া দিলে হত।' সামনেই একটা কুকুর ডেকে উঠতে লোকটা
শিষ দিল।

দরজা খুলে লোকটা ওদের নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা কাঠের সিঁড়ি দেখা
গেল। একজন মহিলা লন্ঠন হাতে নিচের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।
এত ঠাণ্ডাতো তঁর পরনে উলের সুঁউজ আর সায়ার ওপরে মোটা কাপড়
জড়ানো। লোকটা তাদের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে এল। মাঝারি
সাইজের ঘর। নিচে সতরঞ্চি পাতা। সেটা পাতার ধরনে বোঝা যায় খানিক
আগে সেখানে ছিল না। ঘরে একটা ছোট্ট ডিমলাইট জ্বলছে। লোকটা দাঁত
বের করে হাসল, 'এই হল ঘর। অসুবিধে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু এর চেয়ে ভাল
কিছু নেই। আমার ভাই স্টেশনে কাজ করে।'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতেই হবে।'

জয়িতা বলল, 'আপনাদের টয়লেটটা কোথায়?'

লোকটা টয়লেট শব্দটা বুঝতে পারল না। আনন্দ ওকে সরল করা মাত্র
সে নীচে নির্দেশ করল। তারপর মুখ বাড়িয়ে নেপালিতে কিছু বলতেই
মহিলা সারা দিলেন। লোকটি বলল, 'ওর সঙ্গে যান, নিয়ে যাবে। আমার
বউ।'

জয়িতা নেমে গেলে ওরা মালপত্র রেখে আরাম করে সতরঞ্চিতে বসল। ঘরটা
কাঠের কিন্তু ঠাণ্ডা কম। লোকটা ওদের দিকে তাকাল কিছুক্ষণ তারপর

হাঁটু মুড়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'টাইগার হিল যাওয়ার জন্যে কি জিপ দরকার ?' আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। তবে বুঝতে পারছি না ভোর তিনটের সময় উঠে যেতে পারব কিনা। যদি সকাল ছটায় বের হই তাহলে কিছু দেখতে পাব ?'

লোকটা হাসল, 'না। তবে টাইগার হিলের দিন গিয়েছে। এখন সবাই সান্দ্রাকফুতে সানরাইজ দেখতে যায়। কিন্তু সাহেবরা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে কাল খুব ভোরে উঠে ওই জানলাটা খুলে দিতে পারেন। চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবেন মেঘ না থাকলে। সাহেবরা কি কিছু খাবেন ?'

সুদীপ বলল, 'না ভাই, আমরা খেয়ে এসেছি। তোমার কাছে কমল আছে ? নইলে আবার আমাদের ব্যাগ খুলতে হবে।' সে টেবিলের ওপরে রাখা কিছু শীতবস্ত্র দেখিয়ে বলল, 'ওগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি ?'

'সাহেবরা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে করবেন।' লোকটা চোখ বন্ধ করল, 'সাহেবদের কি ড্রিক্স করার ইচ্ছে আছে ?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমরা ড্রিক্স করি না।'

'কিন্তু এই ঠাণ্ডায় ড্রিক্স শরীর গরম করে দেয়। আমার বউ আজকাল কিছুতেই আমাকে ওসব খেতে দেয় না। আপনারা এসেছেন বলে একটা সুযোগ পাওয়া যেত।'

লোকটার ধান্দা বোঝা গেল এতক্ষণে। চেহারা দেখলে খুব সুস্থ মনে হয় না। এখন ধরা যাচ্ছে সেটা লিভারের কারণে। সুদীপ বলল, 'একটু ব্রাণ্ডি হলে মন্দ হত না। আমি দুটো বোতল এনেছি ইমার্জেন্সির জন্যে। এখন খুলব না।'

এবার লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেমসাব কোন সাহেবের বউ ?'

এতক্ষণে লোকটার সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইল আনন্দ। গায়ে পড়া স্বভাবটা আর ঢাকা নেই। সুদীপ বলল, 'ও কারো বউ না। আমরা বন্ধু।'

লোকটা হাসল লাল দাঁত দেখিয়ে। 'হিন্দী ফিল্মস্টাররা এরকম হয় শুনেছি।'

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে ফেলল সুদীপ। আর সেই সময় জয়িতা উঠে এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছিস কেন ?'

সুদীপ বলল, 'তিনটে ছেলে একটা মেয়ে বন্ধু হিসেবে বাইরে এলে নাকি হিন্দী ফিল্মস্টারদের মত দেখায়। ঠিক আছে ভাই। আমরা একটু ঘুমাবো এবার।'

লোকটার ওঠার ইচ্ছে ছিল না বোধহয়। কিন্তু নীচ থেকে মহিলার ডাক এলে সে উঠল। জয়িতা সতরঞ্চিতে বসে বলল, 'হরিবল, এক্সপেরিয়েন্স। মানুষ যে এত নোংরা টয়লেট ব্যবহার করতে পারে তা আমার জানা ছিল না। খুব চেষ্টায় বমি করিনি। এখনও শরীর গুলোচ্ছে। নরক !'

সুদীপ বলল, 'আমার প্রয়োজন পড়লে আমি রাস্তায় চলে যাব।'

জয়িতা ঠোঁট কামড়াল 'ঈশ্বর তোদের শুধু সুবিধেই দেননি, চক্ষু জজ্জা বস্তুটিও দিতে ভুলে গেছেন। মেয়েদের তো হাজারটা অসুবিধে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো

হয়েছে।’

কল্যাণ চুপচাপ বসেছিল এতক্ষণ। হঠাৎ উঠে টেবিল থেকে একটা কঞ্চল এক হাতে তুলে নিয়ে শরীরে বিছিয়ে শুয়ে পড়ে বলল, ‘বাইরে কেমন ঠাণ্ডা রে?’

‘বাঘ পানাবে।’ জয়িতা জবাব দিল।

‘এ অঞ্চলে বাঘ আছে?’ সুদীপ প্রশ্নটা ছুঁড়ল।

‘আমি আর বের হচ্ছি না।’ কল্যাণ এতক্ষণে যেন উত্তাপ পেল।

আনন্দ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঘুমিয়ে পড়িস না। আমি আর একবার ডিটেনস সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে চাই।’

তিনজোড়া চোখ এবার আনন্দের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলল। আনন্দ বলল, ‘কিছুদিন আমাদের গা ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের কোথাও আমরা নিরাপদ নই। ধরা পড়লে যাবজ্জীবন তো হবেই ফাঁসি হওয়া বিচিত্র নয়।

এতদূরে পর্যন্ত পুলিশের নজর এড়িয়ে আমরা আগতে পারলাম এটা কম কথা নয় সুদীপ, দ্যাখ তো লোকটা এখনও সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে কি না!’

সুদীপ উঠল। তারপর নিঃশব্দে দরজায় গিয়ে নিচের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার ফিরে এল, ‘বুঝতে পারছি না। সম্ভবত নেই। নীচটা অন্ধকার।’

‘দরজাটা বন্ধ করে দে।’

সুদীপ দরজাটা বন্ধ করে টেবিল থেকে আর একটা কঞ্চল তুলেই বলল ‘উরেকবাস, কি দুর্গন্ধ। এই কল্যাণ, তুই ওটার তলায় শুয়ে আছিস কি করে? গন্ধ নেই?’

কল্যাণ বলল, ‘আমার নাক বন্ধ। তাছাড়া ভিথিরির পছন্দ বলে কিছু থাকতে নেই।’

সুদীপ কঞ্চলটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিয়ে ফিরে এসে সিগারেট ধরাল। আনন্দ বলল, ‘কাল ভোরে আমরা এখান থেকে বের হব। ঘুম থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে—দাঁড়া।’ আনন্দ ব্যাগ খুলে একটা ম্যাপ বের করল। ম্যাপটা মাঝখানে রেখে সে বলল, ‘রাস্তাটা সুকিয়া পোকরি মানেভজন বলে দুটা জায়গা হয়ে চলে গেছে রিম্বিক রামাম। রামামে একটা হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট হচ্ছে। এই অবধি বাস যায়। ফাস্ট বাস আমরা ঘুম থেকে ধরতে পারি সকাল আটটার। কিন্তু অতক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব না। আমাদের একটা জিপ জোগাড় করতেই হবে। আমরা নামব মানেভজনে, যদি জিপ তার বেশি যেতে না চায়। আগে ওখান থেকেই ট্রেকাররা সান্দাকফু বেড়াতে যেত। এখন শুনেছি জিপ পৌঁছে যাচ্ছে সান্দাকফু পর্যন্ত। কিন্তু তার পরে নয়। ফালুট যেতে হলে হেঁটে যেতে হয় সবাইকে। ম্যাপ বলেছে ফালুটের কাছেই নেপাল বর্ডার। সেটা পার হলেই যে গ্রাম তার নাম চ্যালথাপু। ওটা ফালুট থেকে মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে। অনেক সময় ট্যুরিস্টরা ওই গ্রামে বেড়াতে যায়। আমরা সেটা ছাড়িয়ে আরও ভেতরে ঢুকব। আপাতত আমার টার্গেট ওয়ালান্চুঙ। আরও সাড়ে ছয় কিলোমিটার ওপরে। পথ দুর্গম।

কোন সভ্য মানুষ যায় না। উনিশশো সাতান্নত্রে একজন অস্ট্রেলিয়ান ট্রেক করে ওখানে পৌঁছেছিলেন।’

সুদীপ প্রশ্ন করল, ‘পুলিস স্টেশন?’

আনন্দ ম্যাপটা ভাল করে আর একবার দেখল। যত রকম খবর সে সংগ্রহ করতে পেরেছিল সেগুলো বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে ম্যাপে লিখে রেখেছিল। দেখে টেখে সে বলল, ‘সুখিয়া পোখরিতে আছে। মানেভঞ্জে আছে কিনা জানি না। তারপর বিস্তৃত অঞ্চলে কোন থানা নেই। সেই ফাল্গুটে একটা পুলিস ক্যাম্প আছে। এই পুলিসরা মাঝে মাঝে চ্যাপখাপুতে বেড়াতে যেতে পারে কিন্তু তার ওপাশে কখনই নয়।’

জয়িতা ম্যাপটা দেখছিল, ‘ফাল্গুট কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে?’

আনন্দ বলল, ‘হ্যাঁ। মজা হল হিমালয়ের এই দিকটা এত নিরীহ যে ভারত নেপাল কেউ বড়ার সিকিউরিটি ফোর্সকে এই অঞ্চলে নিয়মিত রাখেনি। যাতায়াতের পথ নেই, জনবসতি নেই, বছরে আট মাস বরফ পড়ে থাকে, অতপর আক্রমণের ভয় নেই এইটে আমাদের সাহায্য করবে। এখন তোদের আমি শেষবার বলতে চাই, একবার আমরা ওদিকে পা বাড়ালে অনেক কষ্টকে ফেস করতে তৈরী থাকতে হবে। আমরা শুধু একটা নিরাপদ লুকানোর জায়গা চাইছি। নেপাল পুলিসের চিহ্ন নেই ওখানে। ভারতীয় পুলিস বড়ার ক্রস করে ওখানে যাবে না। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে ওখানে বেঁচে থাকতে হবে। এইটেতে যার আপত্তি থাকে সে বলতে পারে।’

কল্যাণ চুপচাপ শুয়েছিল, ‘আপত্তি থাকলে কি করা হবে?’

আনন্দ একটু থমকালো, ‘সে থেকে যেতে পারে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাওয়ার স্বাধীনতা তার থাকল। কিন্তু ধরা পড়ার পর আমাদের অস্তিত্ব জানাতে সে যেন কাল থেকে অন্তত পাঁচটা দিন সময় নেয়।’

হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। কাঠের দেয়ালের বাইরের বাতাস অদ্ভুত শব্দ তুলছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন আচমকা উধাও হয়ে গেল। প্রথমে কথা বলল জয়িতা, ‘এসব কথা উঠছে কেন তাই আমি বুঝতে পারছি না। তোরা কি যেতে চাইছিস না?’ প্রশ্নটা সে সুদীপের দিকে তাকিয়ে করল। সুদীপ কাঁধ ঝাঁকতে সে দৃষ্টিটা কল্যাণের দিকে ফেরাল।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে কল্যাণ বলল, ‘প্রশ্ন করা মানেই যদি আপত্তি জানানো হয় তাহলে আমি আর কি বলব। কথা হল, বলছিস ওখানে আটমাস বরফ পড়ে। আমরা তাহলে থাকব কোথায়?’

‘দ্যাটস দ্য প্রব্লেম।’ আনন্দ হাসল, ‘হোটেল কিংবা ধর্মশালা নেব ওয়ানালুও। একটা ছোট গ্রাম আর তার প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসী যাদের সংখ্যা বেশী নয়। ওরা নিশ্চয়ই ঘর বেঁধে থাকে। আমি তেমন বিস্তারিত জানি না। তবে গিয়ে পড়লে কি আশ্তানা জুটে যাবে না! ও নিয়ে আমি ভাবি না।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ওলালাৎ-এর উচ্চতা কত?'

'তের হাজার।' ম্যাপ দেখে সঠিক উচ্চতা জানাল আনন্দ।

শব্দদুটো শোনা মাত্র তিনটে মুখ একসঙ্গে অবাক-হওয়া-আওয়াজ উচ্চারণ করল।

কল্যাণ শেষ প্রশ্নটা ছুঁড়ল, 'আমরা 'অতদূরে পৌঁছাতে পারব তো?'

জয়িতা অবাক গলায় বলল, 'মানে?'

'পাহাড়ে ওঠার জন্যে ট্রেনিং দরকার, তা আমাদের নেই। তাছাড়া তের হাজার ফুট উঁচুতে যে ঠাণ্ডা তা সহ্য করার মত—।'

'গরমজামা আমাদের আছে।' আনন্দ বলল, 'আমরা ক্লাইম্বিং-এ যাচ্ছি না। এটা জাস্ট ট্রেকিং। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাওয়া। উঁচু নীচু পথ পড়বে এই যা। সান্দাকফু-ফালুট পর্যন্ত মেয়েরা যাচ্ছে হেঁটে কোন রকম ট্রেনিং নেই।'

'আমি ভয় পাচ্ছি তোকে কে বলল। বিস্তারিত জানতে চাওয়া মানে ভয় পাওয়া? তাহলে তো কোন কথাই বলা যাবে না।' সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চোখ বন্ধ করল।

আনন্দ ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করল, 'মাঃ এগারটা বেজে গেছে। রেডিও স্টেশন বন্ধ। আজ খবরটা শোনা হল না। জয়িতা, এখন থেকে তোর ওপর দায়িত্ব, প্রত্যেকটা নিউজ তুই শুনে আমাদের জানাবি। এবার শুনে পড় সবাই। কাল ভোরে দেখা যাক কপালে কি আছে।' আনন্দ ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল, 'এটা খুলতে হচ্ছে করছে না। ওই কম্বলগুলোয় কি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ?'

'দারুণ।' সুদীপ শব্দটা উচ্চারণ করে নিজের ব্যাগে হাত দিল। রাত যত বাড়ছে ঘুম-এ হাওয়ারা প্রবল হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা আরও ঘন হয়ে চারপাশে ঘিরে ধরেছে।

ঘুম থেকে টাইগার হিলে যাওয়ার শাট্‌ল জিপ পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু সুখিয়া পোখরি কিংবা মানেভজনের জিপ যোগার করতে ওদের সাতটা বেজে গেল। মানেভজন পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। সুদীপ ড্রাইভারকে রাজী করলেও আনন্দ খুশী হচ্ছিল না। মানেভজনের বাস পাওয়া যাবে আটটা নাগাদ। শুধু ওই অবধি পৌঁছে কি লাভ হবে!

বাসস্‌ট্যাণ্ড এলাকাটা এমন যে কোন ড্রাইভারকে অনুরোধ করলে আর পাঁচজনে তা জেনে নিতে দেয়ি করে না। সাতসকালে রীতিমতো ভিড় জমে গেল ওদের ঘিরে। প্রত্যেকেই সাহায্য করতে চায়। কিন্তু দেই সঙ্গে দাম উঠছে।

বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সুদীপের ঠিক করা জিপেই উঠল ওরা। এখন ঘুমে ঘন কুয়াশা। আকাশের গায়ে একটা ঘোলাটে পর্দা টাঙানো। নির্ঘাৎ আজ যারা টাইগার হিলে যাবে তারা আফসোস করবে। রোদের চিহ্ন নেই,

সূর্য উঠছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এই ড্রাইভারও একা নয়। তার সঙ্গী ছোকরাটা দেখতে হিন্দী ফিল্মের ভিলেনের মত। চালচলনও তাই। পোশাক দেখে অবাক হতে হয়। ভাড়াটে জিপ ড্রাইভারের হেল্লার, কিন্তু পোশাক দেখলে তা মালুম হয় না।

ঘুম থেকে বের হবার মুখে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার বিনীত মুখে জানাল যে সকাল থেকে এক গ্লাসও চা খায়নি, সাহেবরা যদি খাওয়ান তো বড় ভাল হয়। আজ ঘুম ভাঙ্গার পর তৈরী হবার সময় একটি আশাতীত ঘটনা ঘটেছিল। একটা থালায় চার গ্লাস ধূমায়িত চা নিয়ে প্রবেশ করেছিল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল সবায়ের। মুহূর্তেই গত রাতের বিরক্তটা উধাও হয়ে গিয়েছিল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও দাম নিতে চায়নি।

সুদীপ বলল, 'মন্দ হয় না আর এক গ্লাস পেলে। ঠিক আছে চা লাগাতে বল।'

ওরা দুজন নেমে গেলে আনন্দ বলল, 'হত তাড়াতাড়ি সুখিয়া পোখরি পেরিয়ে যেতে পারি তত মঙ্গল। চায়ের জন্য থামোকা সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'লোক দুটোকে হাত করতেই হবে। আমার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দে না। ভিড়ের মধ্যে কথা বলার সময় ও একবার চোখে ইশারা করেছে। মনে হয় অন্য কোন খান্দা আছে। দেখা যাক।'

এই রকম ভোরবেলায় এমন সঁাতসেঁতে প্রকৃতি ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু জয়িতার মন্দ লাগছিল না। বিদেশী উপন্যাসের পটভূমিগুলো মনে পড়ছিল ওর। ঠাণ্ডা খুব কিন্তু বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলো হালকা সোয়েটার পরে স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম করছে। কুয়াশায় ভিজে গেছে রাস্তা, বাড়ির চাল এমন কি আকাশটাও। হাতে গরম চায়ের গ্লাস পেয়ে বেশ আরাম লাগল ওর। এখন কল্যাণ আর জয়িতা সামনে বসেছে। ড্রাইভারের সঙ্গী আনন্দদের সঙ্গে পেছনে। বের হবার আগে সুদীপ আর আনন্দ অনেক কসরৎ করে কল্যাণকে পুলওন্ডার পরাতে পেরেছে। গ্লাসটার-করা হাতটাকে বাইরে রেখেছে সোয়েটারের। তাই সেই হাতটা ঝুল ঝুল করছে। কিন্তু এতে অনেক বেশী আরাম বোধ করছে কল্যাণ। প্রত্যেকের পায়ে পাহাড়ে ওঠার কেডস। বের হবার সময় কল্যাণ মন্তব্য করেছিল, 'ঠিকঠাক পোশাক থাকলে ঠাণ্ডা কোন ব্যাপারই নয়।'

সুদীপ হেসেছিল, 'এই তো বাঙালী জেগেছে, আর কোন ভয় নেই।'

রাস্তাটা চমৎকার। ঘুম পেছনে পড়ে রইল। এই সকালেও কুয়াশার মধ্যে যদিও মাঝে মাঝে ফগলাইট জ্বালতে হচ্ছে তবু প্রকৃতির চটপট পরিবর্তনটা চোখে পড়ছিল। গাছগুলোর চেহারা অনেক ঝকঝকে। পথের ধারে বেশ কিছু ফুল ফুটে আছে। হঠাৎ জয়িতা চোঁচিয়ে উঠল, 'ওই দ্যাখ

লেডি স্মিলপার।’

কল্যাণ অবাধ হস্মে জিজ্ঞাসা করল, ‘লেডি স্মিলপার? মানে?’

‘একটা ফুলের নাম। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে ছবি দেখেছিলাম।’

কল্যাণ বুঝতে পারছিল না ঠিক কোন ফুলটা লেডি স্মিলপার। তার মনে হল যতই ভাল নম্বর পাক না কেন জয়িতা তার থেকে অনেক বেশি জানে।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সে কখনও হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ পায়নি।

ড্রাইভার খুশীমুখে গাড়ি চালাচ্ছিল। এই রকম রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে সুখ আছে। বাঁকগুলো খুব আচমকা নয়। শিস থামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনারা সান্দ্রাকফু হেঁটে যাবেন?’

সুদীপ উত্তর দিল, ‘কি আর করা যাবে।’

ড্রাইভার বলল, ‘কিছুদিন আগে পর্যন্ত সবাইকে হেঁটে যেতে হত। ট্রেকিং-এর একটা আলাদা মজা আছে। এখন রাস্তা হয়ে যাওয়ায় সান্দ্রাকফু পর্যন্ত বেশির ভাগ ট্যুরিস্ট জিপে যায়। সময় কম লাগে।’

‘ফালুট?’ সুদীপ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল।

‘না। ফালুটে যাওয়ার গাড়ির রাস্তা হয়নি।’

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। গাড়ি মোটামুটি একই লেভেলে যাচ্ছে। এখনও পথে গাড়ি চলাচলের সময় হয়নি বোধ হয়। কারণ কাউকে সাইড দিতে হচ্ছে না, ওভারটেকের প্রসঙ্গ নেই। জয়িতা লক্ষ্য করল আকাশ একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। বিরাত বিরাত পাহাড়গুলো নীল চাদর মুড়ি দিয়ে পায়ের গা লাগিয়ে বসে আছে। ধ্যানগন্তীর শব্দটার মানে বোঝা যায় ওদের দিকে তাকালে। সুদীপ পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনার এই গাড়ি বোধ হয় সান্দ্রাকফু পর্যন্ত যেতে পারে না। খুব উঁচু?’

ড্রাইভার হাসল, ‘কে বলেছে যেতে পারে না। আমি তো গত বুধবার ঘুরে এলাম। ছয়শ টাকা দিয়ে দেবেন, পৌঁছে দিচ্ছি!’

‘ছ’শ?’ কল্যাণ আঁতকে উঠল।

‘ফেরার সময় খালি আসতে হবে। আপনারা তো ওখানে একদিন থেকে ফালুটে যাবেন। অতদিন তো থাকব না। তাছাড়া রাস্তা খুব খারাপ। টংলু থেকে বিকেলভঙ্গন যাওয়ার পথটা দেখলে একথা বলবেন না।’

কল্যাণ তবু বলল, ‘একটু কম করা যায় না?’

‘ঠিক আছে, পঞ্চাশ কম দেবেন। তখন বাস স্ট্যাণ্ডে বলিনি কেন জানেন? এই রোট গুলনে সবাই খেপে যেত। তাছাড়া বুধবারে গিয়েছি আবার আজ, অন্য ড্রাইভারকে কামাই করার সুযোগ দেওয়াই নিয়ম।’ ড্রাইভার হাসল।

সুদীপ বলল, ‘ঠিক আছে। যা বললেন তাই হবে। কতক্ষণ লাগবে সান্দ্রাকফু?’

ড্রাইভার দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা জনপদ দেখিয়ে বলল, ‘ওই তো সুখিয়া পোখরি।’

সুখিয়া পোখরিতে জিপ থামেনি। থামল মানেভঞ্জন-এ।

ড্রাইভার বলল, 'সাহেবরা যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এখান থেকেই চাল-ডাল কিনে নিতে পারেন। এর পরে আর দোকান নেই।'

মানেভঞ্জন একটি ছোট্ট জনপদ। রামানে হাইড্রোইলেকট্রিক তৈরি হবার পর থেকে এখানকার জনসংখ্যা বাড়ছে। ঠাণ্ডা ঘুম-এর থেকে কম। সুদীপ আর কল্যাণ ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র কিনছিল। চাল আলু মশলা থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে সব। আনন্দ সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'এত সব মিচ্চিস বইবে কে?' সুদীপের মাথায় ব্যাপারটা ঢোকেনি। এখন একটু ফ্যাকাশে হয়ে বলল, 'এ সবই তো আমাদের লাগবে। কি করা যায়?'

আনন্দ বলল, 'যা নিয়েছিস তা শেয়ার করে ক্যারি করা যাবে। কিন্তু আর নয়।'

মানেভঞ্জন থেকেই যেহেতু পদযাত্রা শুরু হত এবং এখনও যারা পায়ে হেঁটে যেতে চায় তারা এখানেই নামে বাস থেকে তাই এক শ্রেণীর লোক ওদের পেছনে লাগল। খুব নিরীহ চেহারার মানুষগুলো বলল তারা পোর্টার। ফালুট পর্যন্ত মাল বয়ে নিয়ে যাবে। ডেইলি তিরিশ টাকা আর খাওয়া। সাহেবরা না হয় পাড়ির রাস্তা হওয়ায় সান্দ্রাকফু পর্যন্ত গাড়িতে যাবেন কিন্তু ফালুট যেতে হলে তাদের সাহায্য নিতেই হবে। আর সাহেবরা যদি তাদের সাহায্য না নেন তাহলে এই অঞ্চলের শেরপারা না খেয়ে মরবে। শেরপা শব্দটি শুনে বেশ রোমাঞ্চিত হল। সে হিমালয়ের যে কোন পর্বতশীর্ষে ওঠার সময় অভিযাত্রীরা শেরপাদের সাহায্য নেন। তেনজিং নিজেও তো শেরপা। বিভিন্ন অভিযানের কাহিনীতে এদের কথা পড়ে পড়ে ওর কাছে শেরপা নামক হয়ে গিয়েছে। সুদীপ লোকগুলোর দিকে তাকাল। এদের দেখতে তার চোখে নেপালি ছাড়া কিছু নয়। সে একটি মিনিট দেখতে কিশোরকে কাছে ডাকল, 'কি নাম তোমার?' প্রশ্নটা সুদীপ যতটা সম্ভব ভাল হিন্দীতে করার চেষ্টা করল।

ছেলেটি একগাল হেসে জানাল, 'ওয়াংদে।' বলে দুবার মাথা ঝাঁকাল।

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি শেরপা?'

'জী হজোর।'

'শেরপা মানে কি?'

এবার ছেলেটি যার নাম ওয়াংদে তার একটু পরিশ্রম হল। সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে সে শেষ পর্যন্ত জানাল, 'শের মানে এন্ডারস্টের ডান দিক আর পা হল মানুষ। শেরপা মানে এন্ডারস্টের ডানদিকে যেসব মানুষ থাকে তারা।'

আনন্দ চুপচাপ গুনছিল। এবার মন্তব্য করল 'বাঃ। এই মানেটা আমি

জানতামই না। তুই কি ওকে ফালুট পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাস ? কিন্তু তারপর ? ওকে কি বলে কাটাবি ?

‘টাকা দিয়ে দিলে চলে আসবে। টাকার জন্যেই তো যাচ্ছে।’ সুদীপ নিচু গলায় কথাগুলো বলে ওয়াংদের দিকে তাকাল, ‘ঠিক হয়। চল আমাদের সঙ্গে। এই মালপত্রগুলো ওই গাড়িতে রেখে এস।’ ঘোষণা করা মাত্র ভিড়টা সরে গেল। ওয়াংদে তিনবার সেলাম করে মালপত্রগুলো নিয়ে ছুটল গাড়িটার দিকে।

সুদীপ বলল, ‘ওইটুকুনি ছেলে এত মাল নিয়ে হাটতে পারবে ?’

আনন্দ বলল, ‘সেটা ওই বুঝবে। কিন্তু দ্যাখ, যেই তুই একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলি তৎক্ষণাৎ অন্যরা পেছন ছাড়ল। ডিসিগ্নিনটা কলকাতার দেখবি না।’

সুদীপ একটু উত্তেজিত স্বরে বলল, ‘কলকাতায় আমরা কিছুই দেখি না। সবাই চোখ বন্ধ করে থাকি। একটা বাঙালি পাবি না যে আর একটা বাঙালির প্রশংসা করছে খোলামনে। ও কেন সুযোগ পাচ্ছে এই ঈর্ষায় সবার বুকে অ্যাসিড জমে যাচ্ছে।’

ওয়াংদে ফিরে এসে জানাল, ‘সাহেবরা যদি টেন্ট নিতে চান তাহলে এখনই বলুন, এরপরে ট্রান্সিটরা এলে আর টেন্ট পাওয়া হবে না।’

‘টেন্ট ?’ আনন্দ অবাক হল, ‘এখানে টেন্ট পাওয়া যায় ?’

‘আগে যেত না। কিন্তু একজন মারোয়ারি দোকানদার টেন্ট ভাড়া দিচ্ছে আজকাল। ডেইলি পঞ্চাশ টাকা। কাল বিকেলে টেন্ট জমা দিয়েছি।’ ওয়াংদে জানাল।

‘তুমি জমা দিয়েছ। কেন ? তুমি কি কোথাও গিয়েছিলে ?’

‘হ্যাঁ সাব। পাঁচ দিন আগে একটা ট্রেনিং পার্টির মাল নিয়ে গিয়েছিলাম।

সান্দাকফুতে ভির না থাকলে টেন্টের দরকার হয় না কিন্তু ফালুটে প্রয়োজন হতে পারে।’ সুদীপ হ্যাঁ হয়ে গেল। এই কিশোর পাঁচদিন ধরে পাহাড় ভেসে এসেই আবার পাড়ি দিতে চাইছে। শুধু টাকার জন্যে ? সে জিজ্ঞাসা করল, ‘টেন্ট কে বইবে ?’

‘আমি সাব।’

আনন্দের মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা শোষণের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সুদীপ জানাল ওরা সবাই ওয়াংদেকে সাহায্য করবে। ওরা মারোয়ারি উদ্রলোকের দোকানে এল। তেল নুন থেকে সবই এখানে পাওয়া যায়। বয়স হয়েছে উদ্রলোকের। প্রথমেই অনুযোগ করলেন, ‘আপনারা আমার দোকান থেকে মাল কিনলেন না। আমি মানেভঞ্জন সবচেয়ে সস্তায় দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, টেন্ট দুটো আছে। ডেইলি একশ টাকা। একদম মজবুত টেন্ট। টাঙানোর ঝামেলাও খুব বেশী নেই। তবে জমা রাখতে হবে পাঁচশো টাকা। ফিরে আসার সময় হিসেব করে ঠিক হবে ফেরত পাবেন না দিতে হবে।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ডিপোজিট নিচ্ছেন কেন? এ পথেই তো ফিরতে হবে।'

মারোয়ারি ঊর্ধ্বলোক বললেন, 'ফিরতে তো হবেই। কিন্তু টেন্ট ছিঁড়ে গেলে তো সারাই-এর খরচ দিতে হবে। ডিপোজিট না রাখলে আপনারা ফেরার সময় দিতে চান না।'

দুটো টেন্ট এমন কিছু ভারি নয়। দেখে মনে হল মজবুত। সুদীপ পাঁচশো টাকা জমা দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল। টেন্টগুলোকে পেছনে তুলে দিয়ে ওয়াংদে বলল, 'সাহেবরা যদি আমাকে দশ মিনিট সময় দেন তাহলে খুব ভাল হয়।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'একবার বাড়িটা ঘুরে আসব। কখন জানতে হবে আর মেয়ের সঙ্গে দেখা করব।'

সুদীপ ঘাড় নাড়তেই দৌড়ে উধাও হল ওয়াংদে। আনন্দ বলল, 'ওইটুকুনি ছেলে হলে কি হয় এর মধ্যে প্রেম করে বসে আছে।'

ড্রাইভার ফিরে আসছিল। সুদীপ চটপট জন্মিতা-কল্যাণকে ওয়াংদের কথা বলে ফেলল। ড্রাইভার এসে জানালো, আর দেরী করা চলবে না। তাকে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরতে হবে ঘুম-এ। সুদীপ ওকে ওয়াংদের কথা বলে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করল।

ওয়াংদে এল মিনিট পনের পরে দুটো কন্বল এবং তারই মত দেখতে একটি মেয়েকে পেছনে নিয়ে। মেয়েটির মুখ খুব বিমর্ষ। নিজেদের ভাষায় কথা বলে ওয়াংদে জিপের পেছনে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে সরল হাসল। জিপ চলতে শুরু করলে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম মেয়েটার?'

'দ্রিমিট। আমি চলে গেলে ও খুব একা হয়ে যায়।' ওয়াংদে বিষণ্ণ গলায় বলল।

সুদীপ হাসল, 'কি আর করা যাবে। তোমার যা কাজ।' প্রেমিকা সম্পর্কে কেউ এত সহজে কথা বলতে পারে শুনে ওর মজা লাগছিল।

'হাঁ সাব। ওর মা মারা যাওয়ার পর এই চলছে। ভাল ছেলেকে পাচ্ছি না যে বিয়ে দেব।' যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল ওয়াংদে। আর চমকে উঠল ওরা। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'দ্রিমিট তোমার কে হয় ওয়াংদে?'

ওয়াংদে তার কিশোর হাসি হাসল, 'আমার মেয়ে হজুর। সবাই বলে আমার মত দেখতে।'

অনেকক্ষণ ওরা কোন কথা বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সুদীপ চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'আমরা শালা ছোটলোক!'

এই রাস্তা ধরে বেড়াতে বেড়াতে নরকেও চলে যাওয়া যায়। একটু একটু করে পাহাড়ে যদিও উঠছে জিপ কিন্তু কোথাও খুব খাড়াই নেই। কিছুক্ষণ ন্যাড়া

ছিল চারখার এবার গাছ এল। রডোডেনডন আর ক্যামেলিয়াম অপরূপা হয়ে গেল পৃথিবীটা। মানেভঞ্জন থেকে যত এগোচ্ছিল তত নির্জনতা চাপা বর্ধছিল। একটিও মানুষ নেই পথে। এখন রোদ নেই আবার ঘন ছায়াও নেই। সূর্য যেদিকে সেদিকে একটা ঘোলাটে মেঘ আটকে আছে কিন্তু বাকি আকাশটা ক্লিওপেট্রার চোখের মত নীল। এই অবধি ভেবে জয়িতা থামল, তারপর প্রমত্তা ছুঁড়ল, 'আচ্ছা ক্লিওপেট্রার চোখের রঙ কি রকম ছিল?' কল্যাণ এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। চমকে জিজ্ঞাসা করল, 'কার?'

'ক্লিওপেট্রার?' জয়িতা হাতড়াচ্ছিল কোথাও বর্ণনা পড়েছে কিনা। নীল তো ভেবে বসল।

'আমি দেখিনি। সী ওয়াজ ডেজারাস ওম্যান। ধরত ছিবড়ে এরতে আর ছুঁড়ে ফেলত। আমি দেখতে চাই না। কি করে যে এই পরিবেশে ওই নাম মনে পড়ে!'

জয়িতা কোন কথা বলল না। মেঘমা থেকে ডান দিকে টংলুর পথ। জিপ বাঁ দিকে গৈরাবাসের দিকে ঘুরল। মেঘমাতে মোটামুটি একটা বসতি আছে। যদিও মানুষ কত আছে তা বুঝা মুশকিল। কালিয়ানাপোকরি পর্যন্ত কোন অসুবিধে হল না। জায়গাটা সমৃদ্ধ। না হলে এত মানুষ এখানে থাকত না। লামার দোকানে ওয়া রেকফাস্ট খেয়ে নিল। কাঁচা পরোটা আর কাঁচা আলুর বোল। সুদীপ চেষ্টা করেও পারল না। জয়িতা চেষ্টাই করল না। আনন্দ একটা খেয়ে হাত গুটিয়ে নিল। কল্যাণ কোনমতে দুটো পেটে চালান করতে পারল। ওয়াংদে খেল ছটা। চা খেয়ে আনন্দ বলল, 'একটা রান্নার বই নিয়ে এলে ভাল হত।'

কালিয়ানাপোকরি থেকেই বিভীষিকা শুরু হল। যেন স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে রাস্তাটা সোজা ওপরে উঠে গেছে। মালপত্র সমেত ওদের শরীর পেছনে গড়িয়ে যাচ্ছিল। আনন্দ শক্ত করে ব্যাগটা আঁকড়ে থাকল। জেরে আঘাত লাগলে জিপসমেত তাদের উড়ে যেতে হবে। সে মুখ ফেরাল। কল্যাণ চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ে এক হাতে সিট আঁকড়ে ধরেছে। জয়িতার মুখ রক্তগুণ্য। শুধু ওয়াংদে কখনও পা ঝুলিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে। সুদীপের মুখ বাঁ দিকে ফেরানো বলে তার প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু তার হাতের আঙুলগুলি শক্ত হয়ে আঁকড়ে ছিল সামনের রডটা। এ দিকে ক্রমশ রাস্তাটা ছোট হয়ে আসছে। আনন্দের মনে হল এখন যদি ব্রেক ফেল করে কিংবা যদি চাকাটা সামান্য ওপাশে চলে যায় তাহলে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। ড্রাইভারের দিকে তাকাল সে। লোকটার চোখে এখন রাস্তার সতর্ক। একটু যেন টেনশন। লোকটার সঙ্গী বম্বের হিরো ঘুম ছাড়া ইস্তক কোন কথা বলেনি। এখন চোখ বন্ধ করে ঢুলছে। একেই বোধ হয় কলজে হাতে করে পাড়ি দেওয়া বলে। এর চেয়ে হেঁটে গেলে অনেক আরাম হত। মাঝে মাঝে পথের কারণে ড্রাইভার যখন ব্রেক কষছিল তখন সমস্ত শরীরে যে ঝাঁকুনি

তাতে অনপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসার উপক্রম। ক্রমশ আনন্দের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। একটা তৈলাক্ত অনুভূতি ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার পেটে অস্বস্তি শুরু হল। কোনরকমে মাথা তুলে তাকাতেই দেখল সামনের পাহাড়টা যেন আরও উঁচু আর রাস্তাটা তার গায়ে সিঁড়ির মত আটকানো। সে চোখ বন্ধ করতেই বমির শব্দটা আসছে তার বাঁদিক থেকে। সুদীপের শরীর তারই দমকে বারংবার কাঁপছে। মুহূর্তে সমস্ত শরীর বিদ্রোহ করল। ওই একটি বমির শব্দ যেন তোলপাড় শুরু করল তার নিজের শরীরে। পেট মুচড়ে কিছু ছুটে আসছিল গলায়। কোনরকমে ঢোক গিলে প্রথম ধাক্কাটা সামলাল সে। এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম হচ্ছে কপালে। যেন তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে সমস্ত শরীরে। একটা তেঁকুর উঠল যাতে বিদিকিচ্ছিরি পরোটার গন্ধ। এবং তখন ওপাশে আরও দুটো গন্ধায় বমির শব্দ উঠছে। ড্রাইভার ওরকম বেচপ জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাতে পারছিল না। আনন্দ প্রাণপণে বুঝে যাচ্ছিল। সে বমি করবে না, কিছুতেই না। প্রতিটি চেউ সে ভিতরে ফেরত পাঠাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারছিল তার ইচ্ছের পায়ের তলার মাটি নরম হয়ে আসছে। টাগ অফ ওয়ারে হারবার মুহূর্তে যেমন বোঝা যায়। কল্যাণের আর্তনাদ মেশানো বমির শব্দটাই এই কাজ করল। আনন্দ আরও মনের জোর বাড়াচ্ছিল। না আমি বমি করব না। তার সমস্ত শরীরে এবার কুলকুল ঘাম। নাক ছালা করছে। জিপ স্থির হল। সুদীপ লাফ দিয়ে নিচে নামল। তারপর বলল, ‘আঃ!’ জন্মিতা এবং কল্যাণ টলতে টলতে নেমে দাঁড়াল। জিপের পেছন থেকে একটা বালতি তুলে নিয়ে ওয়াংদে ছুটে গেল পাহাড়ের আড়ালে। ড্রাইভার দাঁত বেই করে হাসল, ‘বাঙালীবাবুদের এ রকম হয়েই থাকে। তবে আপনি খুব শক্ত আছেন।’

সেই মুহূর্তে উঠে আসা চেউটা ওই কথার জন্যেই বোধ হয় সামাল দিতে পারল আনন্দ। কল্যাণ মাটিতে বসে পড়েছিল। জন্মিতা জিপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। আনন্দ নড়াচড়া করতে ভয় পাচ্ছিল। এই সময় ওয়াংদেকে আবার দেখা গেল। এক বালতি জল এনে জন্মিতাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। ওরা তাই দিয়ে কোনরকমে মুখ ধুয়ে নিল। এবার ওয়াংদে এল তার কাছে, ‘সাব, পানিতে মুখ সাফা করে নিন ভাল লাগবে।’ দেবদূতের মত দেখাচ্ছিল লোকটাকে। আনন্দ জিপ থেকে নামল। সমস্ত শরীর যেন উরল পদার্থে ঠাসা হয়ে গেছে। সে হাত বাড়িয়ে জল নিল। ঘামের ঘায়ে হাত কনকনে ঠাণ্ডা জল লাগামাত্র স্বর্গীয় আরাঁম হল। মুখ ঘাড় হাত ধুয়ে মনে হল এর চেয়ে তৃপ্ত আর কিছুতেই নেই। কিন্তু তাকে আরও পাঁচ মিনিট ব্যয় করতে হল শরীরের সবকটা অনুভূতি ফিরিয়ে আনতে। ধীরে ধীরে তৈলাক্ত অনুভূতি কিংবা পেট মোচড়ানো কমল, মনে হল শরীর জমাট বাঁধছে কিন্তু সেই সংগে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। যেন খুব বড় লড়াই শেষ সে দাঁড়িয়েছে। আর

তারপরেই আনন্দর উপলব্ধি হল সে জিতেছে, তার কয়েকটা ইন্ডিয়কে অস্ত্র সে বেশ নাড়াতে পেরেছে। এই খুশি তার আশ্ব-বিশ্বাস চট করে বাড়িয়ে দিল কয়েকগুণ। এবং তার ফলে দুর্বলতা কেটে যাচ্ছিল। সে জল্পিতাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘শরীর খারাপ লাগছে?’

জয়িতা মাথা নাড়ল। সেটা হ্যাঁ কি না তা ঠিক বোঝা গেল না। কল্যাণ খানিকটা দূরে পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে। সুদীপ বলল, ‘হরিবল! এরকম স্টিফ পাহাড়ে আমি কখনও উঠিনি। যে-কোন মুহূর্তেই অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। কল্যাণ ঠিকই বলেছে, এর চেয়ে ট্রেকিং ভাল ছিল।’

কল্যাণ বলল, ‘আমি আর জিপে উঠছি না। তোরা যা, আমি হেঁটে যাচ্ছি।’

ওয়ান্দে বাংলা বোঝে বোঝা গেল। কারণ সে এই কথার পর বলল, ‘আর মাত্র পাঁচ মিনিট। তারপর নিচে নামার পাজা। তখন আর সাহেবদের কণ্ঠ হবে না।’

কল্যাণ মাথা নাড়ল, ‘ভাল কথা। এই পাঁচ মিনিট আমরা হাঁটব।’

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার পেছনে খাড়া পাহাড়। সামনে অতলান্ত খাদ। খাদের ওপাশে আকাশটা যেন ধনুকের মত নেমে গেছে। ড্রাইভার তাড়া লাগালেও ওদের ওঠার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না। আর তখনই ওদের সামনে অদ্ভুত দৃশ্য তৈরি হল। যে মেঘটা এতক্ষণ আকাশে ঝুলছিল সেটা উড়ে যেতে লাগল। পেঁজা পেঁজা হয়ে। এবং তার আড়াল থেকে রাজেন্দ্রাণীর মত বেরিয়ে এল কাঞ্চনজঙ্ঘা। সূর্যের আলো তার শরীরে পড়ায় সোনাল রূপোয় মিশেল অহঙ্কারী সুন্দরীর মত পৃথিবীটাকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল।

ওরা চারজন নির্বাক। যেন পৃথিবীর শেষ সুরভা যেখানে অনন্তর শান্তি মেশানো ওদের চারপাশে বলয় রচনা করল। কাঞ্চনজঙ্ঘার ডান দিকে যে খাঁজটা সেখানে রোদ মাখামাখি। কিন্তু তখনই ওয়ান্দে বলে উঠল, ‘আগে গেলে এর চেয়ে অনেক ভাল দেখা যাবে।’ একটি বাক্য সবাইকে চেতনায় ফিরে আনতেই সুদীপ বলল, ‘প্রেসিয়াস! পাগল হয়ে যেতে হয়।’

জয়িতা বলল, ‘মোর দ্যান দ্যাট। আমি ওর দিকে তাকিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারি। গঠন কিরকম অহঙ্কার তাই না?’

সুদীপ বলল, ‘পৃথিবীর সুন্দরী মহিলাদের ধরে নিয়ে একে দেখাতে হয়, দ্যাখো রূপ কাকে বলে! আমি প্রেমে পড়ে গেলাম। এই প্রথম প্রেমে পড়া যায় এমন সুন্দরীর দর্শন পেলাম।’

জয়িতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, ‘সুন্দরী! তোকে কে বলল, কাঞ্চনজঙ্ঘা মেয়ে? পর্বত সবসময় পুরুষ।’

কল্যাণ উঠে দাঁড়াল, ‘মেয়ে পুরুষ বুঝি না। কিন্তু “চিও আমার হারালো”।

যেতে ইচ্ছে করছে না এখান থেকে। এমন দৃশ্য পৃথিবীতে আছে!’

ড্রাইভার আবার তাড়া দিল। মিনিট পাঁচেকের কাঞ্চনজঙ্ঘা ওদের কাছে

যেন ওষুধের মত কাজ করল। আনন্দের মনে হচ্ছে তার শরীরে আর কোন কষ্ট নেই। সব কিছু এখন তার নিয়ন্ত্রণে। এমন কি শেষ পর্যন্ত কল্যাণও সম্ভবত কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রভাবেই গাড়িতে উঠে বসল। বিকেলভঙ্গন পার হতেই কুয়াশা নেমে এল দল বেঁধে। সামনের পৃথিবীটা আড়ালে পড়ে গেছে। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছিল মাঝে মাঝেই। শেষ পনের মিনিট আবার সেই যন্ত্রণা। আবার শারীরিক বিদ্রোহ। যেন ভাসতে ভাসতে ওরা একটা বিশাল মাঠের মত জায়গার পাশ দিয়ে ওপরে উঠে এল। ড্রাইভার বলল, 'আমরা সান্দাকফুতে এসে গেছি। ওই হল পি ডব্লিউ ডি বাংলো। এপাশে ডি আই ইয়ুথ হোস্টেল। আপনাদের কোথায় রিজার্ভেশন আছে?'

আনন্দের কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। সুদীপ হঠাৎ খুব স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে বলল, 'আমাদের কোথাও রিজার্ভেশন নেই।'

'তাহলে আপনাদের পি ডব্লু ডি বাংলোর পাশে নামিয়ে দিচ্ছি। ওখানে গণেশ নামে একটা চৌকিদার আছে। দেখুন চেষ্টা করে যদি জায়গা পান।' ড্রাইভার কথা বলে একটা দারুণ দেখতে বাংলোর সামনে পৌঁছে দিল। দক্ষ্যের আগে ঘুম-এ পৌঁছাবার জন্যে যেন ভুলে তাড়া করেছে ওটাকে। ওরা যখন কৌতুহল নিয়ে চারপাশে নজর বোলাচ্ছে তখন আনন্দ শব্দ করল। এতক্ষণ শাসনে রাখা তরল পদার্থ এবার তীব্রগতিতে বেরিয়ে আসছে।

সুদীপ মস্তব্য করল, 'সাবাস। এতক্ষণ একটা ইনফেরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগছিলাম। একমাত্র পৃথক ফল হওয়া কি ভাল ব্রাদার।'

জয়িতা নিজের মনে বলল, 'এরই নাম সান্দাকফু। এখান থেকে একশ আশি ডিগ্রিতে হিমালয়কে দেখা যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সূর্যোদয় দেখার জায়গা।'

কল্যাণ বলল, 'তাতো হল কিন্তু এখানে লোকজন থাকে নাকি? ঠাণ্ডাও জব্বর।' সত্যি ধরে কাছে কোন মানুষ দেখা যাচ্ছিল না। একটা হিম হিম ভাব সমস্ত জায়গাটার ওপর মশারির মত টাঙানো দূরের বাড়ি থেকে একটা লোক বাইরে এসে দাঁড়াল এবার। আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া তার। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল সান্দাকফুর ওপর দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাড় কাঁপতে লাগল চারজনের। এখনও ব্যাগের বাকী শীত বস্ত্র বের করা হয়নি। আর এই ঠাণ্ডার কারণেই আনন্দ সুস্থ হয়ে গেল। সে এগিয়ে পি ডব্লু ডি বাংলোর দরজা ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। এই সময় চিৎকার ভেসে এল নীচ থেকে। ওরা দেখল মুড়ি দেওয়া লোকটা হাত নেড়ে কিছু বলছে। ওদের ওখানে দাঁড়াতে বলে ওয়াংদে ছুটে গেল লোকটার কাছে। কথাবার্তা বলে আবার ফিরে এসে বলল, 'গণেশের অসুখ। বাংলোয় তারা দিয়ে সে কাল দাজলিং চলে গিয়েছে। আপনারা ইয়ুথ হোস্টেলে চলুন। ওটা এখন খালি আছে।'

কাঁপতে কাঁপতে ওয়াংদেকে অনুসরণ করে ইয়ুথ হোস্টেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এই আস্তানাটির অবস্থা খারাপ।

কিন্তু খোলা আকাশের নীচে ঠাণ্ডায় দাঁড়ানোর চেয়ে সেটা চের ভাল। দরজা খোলাই ছিল। ওদের একটু দাঁড়াতে বলে ওয়াংদে একটা ঘর পরিষ্কার করল। দুটো তক্তাপোশ আছে ঘরে। দরজা বন্ধ করার পরও ঘরে হাওয়া ঢুকছে জানলার ফাঁক দিয়ে। কল্যাণ আরাম করে বসতেও পারছিল না ঠাণ্ডার চোটে। এর মধ্যে ওয়াংদে কোথা থেকে কিছু কাঠ ম্যানেজ করে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এবার ওরা চারজনই আগুনের কাছে সরে এল। খানিকবাদে ঘেন ধাতস্থ হন সবাই। সুদীপ একটা আঙুল জমিতার গালে রেখে বলল, 'তোমরা এখনটা নীল আর নাকটা লাল হয়ে গিয়েছে।' জমিতা বলল, 'ভাল করে ম্যাসেজ করে দে তো। বোধ হয় রক্ত জমে গেছে।' সুদীপ জমিতার মাথাটা এক হাতে ধরে আঙুলের ডগা দিয়ে ধীরে ধীরে ম্যাসেজ করার চেষ্টা করে বলল, 'দূর! আরও কালো হয়ে যাচ্ছে।' তারপর আগুনের ওপর হাত রেখে হাসল, 'তুই কি করে গ্রেনেড ছুঁড়েহিস ভেবে পাচ্ছিস না।' 'কেন?' জমিতা চটপট প্রশ্ন করল।

'তোমরা এত নরম চামড়া যে আমার আঙুল সিরসির করছিল।'

'যে হাত দেলেনা তেঁলে সেই তো জগৎ শাসন করে।' কথাটা বলে হাসল জমিতা।

তারপর আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু চা হলে খুব জমত, না?'

কল্যাণ বলল, 'আমার খিদে পাচ্ছে। কটা বাজে জানিস?'

সকলেই ঘড়ি দেখল। দুপুর আড়াইটেতে যে ছায়া ঘনিয়েছে বাইরে তাতে সময় ঠাণ্ডার করা অসম্ভব। আনন্দ উঠল। এইভাবে বসে থাকলে চলবে না। সে ভেতরের ঘরের পা বাড়াল। ব্যবহার হয় কিন্তু যত্ন না থাকায় অত্যন্ত জীর্ণদশা। এখানেও হাওয়া ঢুকছে তবে দুটো তক্তাপোশ রয়েছে এ ঘরেও। তৃতীয় ঘরটিতে আগুন জ্বলছে। আনন্দ দেখল ওয়াংদে এর মধ্যেই উনুন জ্বালিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করছে। তাকে দেখে ওয়াংদে কিশোর হাসি হাসল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে জলের কি ব্যবস্থা?'

'পানি চাহিয়ে?' তৎপর হল ওয়াংদে।

'না না। আমি জিজ্ঞাসা করছি।' গোকটাকে আগুনের সামনে থেকে ওঠাতে খুব খারাপ লাগছিল। এ ঘরে এসে বেচারী কল্পনটাকেও খুলে রেখেছে। এখন একটা হাফ হাতা সোয়েটার পরে কাজ করে যাচ্ছে আগুনের সামনে। ওয়াংদে জানাল, 'দশ মিনিট গেলেই একটা বোরা আছে, সারা বছর জল থাকে শুধু শীতের তিনটে মাস ছাড়া। আমি চা করেই আপনাদের বাথরুমে জল এনে দেব।'

সামান্য কটা টাকার জন্যে লোকটা এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পরিশ্রম করছে? মোটেই না। ইচ্ছে করলে ও অনেক রকম কায়দায় ফাঁকি দিতে পারত। তাদের উচিত এই লোকটাকে সাহায্য করা। কিন্তু হঠাৎ বিপরীত প্রাকৃতিক পরিবেশে নতুন এসে সক্রিয় হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। মানিয়ে নেওয়ার জন্যে

সময় দরকার।

ঠাণ্ডা খুব তবু পেছন দিক দিয়ে আনন্দ বাইরে এল। এলোপাথারি হাওয়া বইছে। সামনের উপত্যকায় ব্রহ্ম হয়ে ছোটাছুটি করছে কুয়াশারা। এই হাওয়া স্পর্শ করা মাত্র যেন রক্ত জমে যাচ্ছে। সান্দাকফুতে গোটা ছয়েক বাড়ি। আপাতত কোন মানুষ চোখে পড়ছে না। এর মধ্যেই অন্ধকার নামব নামব করছে। এখনই এখানে পুলিশের আসার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পুলিশের আসতে হলে এই রাস্তা ডিঙিয়ে আসতে হবে। সেটা খুব আরামের ব্যাপার নয়। একমাত্র যদি মিলিটারিদের পাঠান্য তাহলে ওদের কাছে পাহাড় কোন বাধাই নয়। কিন্তু প্রথম কথা খবর পেতে হবে, দ্বিতীয়ত পুলিশ মিলিটারিদের সাহায্য চাইবে কিনা এটাও অজানা। আনন্দ আকাশের দিকে তাকাল। জমাট কালো মেঘ নেমে আসছে নিচে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর অন্ধকার হয়েছিল। এর মধ্যে দুটো বালতি নিয়ে ওয়াংদে দৌড়ে চলে গেল চোখের আড়ালে। যেভাবে ঘর খাঁচি দেওয়া হয় সেইভাবে মেঘগুলো উপত্যকার আলো মুছছিল একটু একটু করে। এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও আনন্দ মোহিত হয়ে গেল। এ রকম দৃশ্যের সামনে দাঁড়ানো এক জন্মে বারংবার সম্ভব হয় না।

ঘরে চলে এসে সে একটু অবাক হল। সুদীপ চা করছে। একে দেখে বিব্রত গলায় বলল, 'অশুভ ব্যাপার। নামাতে না নামাতে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'তুই কখনও চা করেছিস?' আনন্দ অন্যান্যনক্ণ গলায় প্রশ্ন করল।

'ইয়েস গুরু। তবে এই হাই অলিটচুডে নয়। কাঠ কম আছে। ওয়াংদে গেছে জল আনতে প্রথমে। তারপর কাঠ। তুই চায়ের গ্লাসটা নে আর ওদের ডাক।' সুদীপ একটি গ্লাস এগিয়ে দিতে আনন্দ তার গায়ে উদ্ভাপ পেল। সাবধানে মুখে দিতে সে আবিষ্কার করল ওটা মোটেই গরম নয়। কয়েক পা এগিয়ে জয়িতাদের ডাকল আনন্দ। কল্যাণের গলা পাওয়া গেল। সে অনুরোধ করছে তার চা ওখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

আনন্দ বলল, 'না, যতক্ষণ কেউ অসুস্থ না হচ্ছে ততক্ষণ নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে কল্যাণ। এখানে এসে চা খা।'

কল্যাণ হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে জয়িতার পেছন পেছন এল, 'তোদের প্রাণে সামান্য দয়ামায়া নেই রে। হাতিমারা এই শীতে একটু আশ্রয় করছিলেন তাও তোদের জানায়—। এঃ, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রে!'

'এই খেতে হবে।' সুদীপ গভীর মুখে বলল, 'যে দেশের যে নিয়ম।'

ওয়াংদে জল এনেছে। ডি আই বাংলোর দারোগ্যানের কাছ থেকে কাঠও সংগ্রহ করেছে। তারপর খিচুড়ি আর ডিমভাজা রাঁধতে বসেছে। এসব করেছে পা টিপে টিপে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যার একটা ফোঁটা গায়ে পড়লে পেরেক ফোঁটার যন্ত্রণা হয়। এখন কলকাতায় ফুটবল খেলা হচ্ছে কিন্তু এখানে মধ্যরাতের অন্ধকার।

এই সময় কাহ্নাকাহ্নি কোথাও বাজ পড়ল। বারো হাজার ফুট উচ্চতা বলেই সম্ভবত তার শব্দ কয়েকগুণ বেশী শোনাগল। জয়িতা দুটো হাতে কান চাপা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তারপরই সমস্ত চরাচর ঝলসে গিয়ে গেল বিদ্যুৎ। আনন্দ কাছের জানলার পাশে চোখ রেখে বসেছিল। বারংবার একটা ছেঁড়া কাপড়ে তাকে কাচ মুছতে হচ্ছে। সে দেখল সমস্ত সান্দাকফু হঠাৎ একরে প্লেটের ছবি হয়ে মিজিয়ে গেল। এবং তখনই গুরু হল বামঝামে রুষ্টি। শৌ শৌ আওয়াজ হচ্ছে বাতাসের। কাঠের জানলাগুলো খেন সহ্য করতে পারছে না তার দাপট। হ হ করে হাওয়া তুকছে ফাঁক গলে। নিরাপদ আশ্রয় নিলেছিল বাকি তিনজনে। একটা তক্তোপোশে কল্যাণ আর সুদীপ দ্বিতীয়টায় জয়িতা। যাবতীয় শীতবস্ত্র গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে আনন্দ। এই বিকেলে শুতে তার একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

জয়িতা বলল, 'বোধ হয় প্রকৃতি আই গিন হিমালয়, প্রটেস্ট করছে।'

'কিসের প্রটেস্ট?' কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল।

'আমরা এসেছি বলে।' জয়িতা নিঃশ্বাস ফেলল, 'কেমন ভয় ভয় করছে।'

'দূর।' সুদীপ চোঁচিয়ে উঠল, 'হিমালয় আমাদের রাজকীয় ভঙ্গীতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বারো হাজার ফুট উঁচুতে এমন দারুণ ঝড়রুষ্টি, লাইটনিং ভাবা যায়।'

এই সময় ওয়াংদে এসে দাঁড়াল দরজায়। ওরা অবাধ হয়ে দেখল ওয়াংদের শরীরে শীতবস্ত্র বলতে সেই হাফ হাতা সোয়েটার। কিশোর-হাসিটি হাসল সে, 'আমার রান্না হয়ে গেছে, যদি সাহেবরা খেতে চান তো দিতে পারি।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'এই বিকেলে ডিনার? অসম্ভব। খিদে পেলে বলব।'

ওয়াংদে মাথা নেড়ে চল গেল ভেতরে। ঘরে কোন আলো নেই, ফায়ারপ্লেসের আ গুনে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাই সম্বল। হঠাৎ সুদীপ উঠে বসল, 'আচ্ছা, তোদের কি মনে হল ওয়াংদে খুব নর্মাল কথা বলল?'

আনন্দ বলল, 'একটু খেন অন্য রকম। এত শীতে হাফ সোয়েটার পরলে যা হয়।'

যতটা সম্ভব পোশাক চাপিয়ে সুদীপ নিচে নামল। তারপর নিঃশব্দে ভেতরের দিকে পা বাড়াল। উনুনের পাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে ওয়াংদে। ওকে দেখে সেই একই হাসি হাসল। এখন তার চোখ প্রায় বুজে এসেছে। হাতে দিশি মদের বোতল। সুদীপ ওর সামনে উবু হয়ে বসতে ওয়াংদে বলল, 'এখানে এলে খেতে হয়। না হলে ডগবান খুব রাগ করে। আর তার রাগ হলে ঠাণ্ডাটাকে বহুৎ বেশী বাড়িয়ে দেয়। আর এটা পেটে যাওয়া মাত্র সান্দাকফুটা মানেভুজন হয়ে যায়।' কথাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে এখন।

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি মদ ওটা?'

'ছাং। সাহেব যদি একটু মুখে দেন তাহলে আমার কথা সত্যি কিনা বুঝতে পারবেন।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না না। ওসব আমি খেতে পারব না।'

ওয়াংদে হঠাৎ খুব রেগে গেল। তার মুখ লাল ছিল, এবার যেন ফুলে উঠল। সে জোরে জোরে শরীর দোলান, 'তাহলে এখানে সাহেবের আসা উচিত হয়নি। সাম্প্রতিককালে এসে ছাং কাউকে খেতে দেখলে একটু খেতে হয়। না হলে ভগবান রাগ করবে।'

সুদীপ হাত রাড়িয়ে বোতলটা নিতেই ওয়াংদের মুখে সরল হাসি ফিরে এল। গন্ধ নিল সুদীপ। নেহাৎই পচাই বলে মনে হচ্ছে। সে আর একবার চেষ্টা করল, 'কিন্তু ওয়াংদে, আমি খেলে তোমার ভাগে কম পড়বে। তখন?'

'কোন অসুবিধে নেই। সাহেব টাকা দিলে আমি ডি আই বাংলার চৌকিদারের কাছ থেকে আরও বোতল নিয়ে আসব। ও বেশী দামে মদ বিক্রি করে।'

'এই বৃষ্টিতে তুমি যাবে কি করে?'

'চলে যাব। সাহেব চিন্তা করবেন না।' ওয়াংদের মাথা টলছিল এবার। কৌতূহল হচ্ছিল। সুদীপও বোতলটা মুখের ওপর তুলে এক চৌক গিলল। বিদ্যুতে গন্ধে গুলিয়ে উঠল শরীর। ওটা কোনমতে পেটে চালান করে দিতেই মনে হল গলা বুক জ্বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। এবং সমস্ত শরীরে একটা হাওয়া পাক খেতে লাগল। বোতলটা এগিয়ে দিল সে ওয়াংদের দিকে। হেঁট মুছে বলল, 'তুমি এটা শেষ কর। তারপর না হয় আনানো যাবে।'

ঘরে ফিরে আসা মাত্র জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে রে?'

সুদীপ হাসল, 'ওয়াংদে ছাং খেয়ে প্রায় আউট।'

আনন্দ জানতে চাইল, 'ছাং কি?'

'এক ধরনের মদ। ওর সম্মান রাখতে আমাকে এক চৌক খেতে হল।'

'যাঃ। খেতে কি রকম রে?' জয়িতা প্রশ্ন করল।

'দারুণ। তবে অন্তপ্রাশনের ভাত দেখার চান্স আছে। এখনও আমার কান গরম হয়ে আছে। এত শীতে ওটা টনিকের কাজ করে।' সুদীপ কথা শেষ করামাত্র আনন্দ দ্রুত কাচ মুহূর্তে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সর্বনাশ।'

'কি হল?' প্রশ্নটা তিনটে গলা থেকেই একসঙ্গে ছিটকে এল।

'একটা জিপ আসছে নিচ থেকে।' উত্তেজিত হল আনন্দ।

বৃষ্টির জন্যে ওরা বাইরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল না।

আনন্দ চিন্তিত মুখে জানাল, 'ভাল করে দেখা গেল না। তবে জিপটা যে ভারার গাড়ি নয় এটা পরিষ্কার।'

ঘোড়ার নালের মত রাস্তাটার বাঁক নিয়ে জিপটা দাঁড়ান পি ডবলু ডি বাংলোর সামনে। বৃষ্টির আড়াল ভেদ করে দৃষ্টি যাচ্ছিল না। বারংবার কাঁচ

পরিষ্কার করেও আনন্দ আবছা দেখছিল। জিপটা দাঁড়িয়ে আছে অন্তত শ'খানেক গজ দূরে। কেউ নামছে না। হয়তো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আর রুশ্টি ওদের ইস্তমত করান্ছে।

সুদীপ আনন্দের পেছনে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিসের গাড়ি বলে মনে হচ্ছে তোর? এখানকার পুলিসের গাড়ি কেমন তাও তো জানি না!'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি করব এখন?'

সুদীপ বলল, 'তৈরি হতে হবে। এতদূরে এসে আমরা ধরা দিতে পারি না। একটা জিপে পাহাড়ি রাস্তায় আর কটা পুলিস থাকতে পারে! আমরা চার্জ করব।'

জয়িতা লাফিয়ে নিচে নামল। তারপর আনন্দের বয়ে আনা ব্যাগটা সম্ভরণে খুলতে লাগল। বস্তাণের চোয়াল শক্ত হল, 'আমাকে একটা গ্রেনেড দে, আমি বাঁ হাতে ছুঁড়তে পারব।'

কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। সুদীপ তার নিউজবারটা বের করল। এই মুহূর্তে ভেতরের শীত বাইরের ঠাণ্ডাটাকে যেন আচমকা সরিয়ে দিল। জানালা থেকে আর একবার চোখ সরিয়ে আনন্দ বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়া ঠিক হবে কি না। এখনও কেউ জিপ থেকে নামেনি। সংঘর্ষে গেলে কারও বুঝতে অসুবিধে হবে না আমরা এই অঞ্চলে এসেছি। ওরা আরও ফোর্স পাঠাবে। জায়গাটাকে ভাল করে চেনার আগেই আমাদের কোণঠাসা হতে হবে।'

কল্যাণ ফিসফিস করে বলল, 'তুই কি করতে চাইছিস?'

'সংঘর্ষের চেয়ে পালানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'পালানো? এই রাত্রি? মানে রাত না হলেও অন্ধকার হয়ে এসেছে তো। তাছাড়া আবহাওয়া দেখতে পান্ছিস? এত ঠাণ্ডা রুশ্টি আমি জীবনে দেখিনি। বাইরে বের হলেই মরে যাব। অসম্ভব। এই রুশ্টিতে কোথায় পালানো?'

কল্যাণ আঁতকে উঠল।

জয়িতা চুপচাপ গুনছিল। তার একটা হাত বুকের ওপর দ্বিতীয়টা চিবুকে। কল্যাণের কথা শেষ হলে সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'পালিয়ে কি লাভ হবে আনন্দ? পুলিস তো সহজেই বুঝে নেবে আমরা এই তল্লাটেই আছি। আমাদের যে মাল বইছে সে-ই তো বলবে। তাছাড়া আর একটা লোক এখানে আমাদের দেখেছে। ওরা বুঝবে আমরা একটু আগে এখান থেকে পালিয়েছি। এই ওয়েদারে খুব বেশী দূরে আমরা যেতেও পারব না।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'ও ঠিকই বলছে। মনে হচ্ছে রুশ্টিটা আপাতত আমাদের বাঁচান্ছে। দেখতে পান্ছিস কিছু।'

আনন্দ খানিকক্ষণ দেখার চেষ্টা করল। ঝাপসা থেকে আরও ঝাপসা হয়ে

যাচ্ছে পৃথিবীটা। এখন তিন হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ছে না ঠাণ্ডা বাড়ছে সেইসঙ্গে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ‘অসম্ভব। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সাদা সাদা কিছু পড়ছে। বোধহয় তুম্বার।’ ‘তুম্বার?’ চিৎকার করে উঠল জয়িতা, ‘রিন্বেলি?’ সে ছুটে এল কাঁচের জানলার কাছে। তারপর এক হাতে আনন্দকে ঠেলে সরিয়ে মুখটা নিয়ে গেল কাঁচের কাছে। অনেক চেষ্টা করেও সে বাইরের পৃথিবীটাকে আবিষ্কার করতে পারল না। বেশ উত্তেজিত ভঙ্গীতে সে ঘুরে দাঁড়াল, ‘আমি তুম্বার পড়া দেখব। এত গল্প পড়েছি যে আজ চোখে দেখতে না পেলো—!’ ও দরজার দিকে পা বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল কল্যাণ, ‘এদিকের দরজা খুলিস না!’ জয়িতা ওর দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। কল্যাণ বিড়বিড় করল, ‘একেই শালা হ হ করে হওয়া চুকছে তার উপর উনি চলছেন সামনের দরজা খুলতে। প্রাণে যদি অত পুলক জাগে তো পেছনের দরজায় যাও।’ কাঁধ নাচাল জয়িতা। তারপর লম্বা পা ফেলে পেছনের দিকে চলে এল। ভেজানো দরজাটা খুলতেই নাকে পোড়া গন্ধ এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। দরজাটা বন্ধ করে সে কয়েক পা এগোতে হিহি কাঁপুনি শরীর দখল করল। কিন্তু ততক্ষণে তার চোখ বিস্ফারিত। কড়াইতে খিচুড়ি শুকিয়ে পুড়ে প্রায় কয়লা হয়ে গেছে। এখন ওই পদার্থটি পৃথিবীর কোন প্রাণী মুখে তুলতে পারবে না। উনুনের পাশে গুটিসুটি মেরে গুয়ে আছে ওয়াদে। দেখলেই বোঝা যায় তার কোন হুঁশ নেই। মাথার পাশে দিশি মদের বোতলটা কাত হয়ে পড়ে, তাতে তলানিটুকুও নেই। জয়িতা একবার ভাবল ওকে ডাকবে। কিন্তু অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে তাতে কোন লাভ হবে না। সে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে এগোল। এই দরজাটা থাকা না থাকা সমান। চিরুনির মত হাওয়া চুকছে ভেতরে। পেটে মদ এবং পাশে উনুন থাকায় লোকটার ঠাণ্ডা লাগছে না কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এখানে দাঁড়ানো অসম্ভব। জেদ চেপে গিয়েছিল যেন জয়িতার। বিদেশী অনেক উপন্যাসেই তুম্বার পড়ার কথা থাকে। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে পাহাড়, বরফ, সমুদ্র, মরুভূমি থাকা সত্ত্বেও লেখকরা শুধু শহর অথবা সমতলের গ্রাম নিয়েই ব্যস্ত। আর একটু চোখ তুলে কারো তাকানোর অবকাশ হয় না। অবশ্য জয়িতার বাংলা পড়া খুব বেশী নয়। কিন্তু বিদেশী উপন্যাস তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল বাইরে। আর দরজা খুলেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, এতক্ষণ পাওয়া রুষ্টির শব্দটা এখন শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু হাওয়ার দাপট বেড়েছে। সূচ লাগানো চাবুকের মত হাওয়া এসে আঘাত করল ওর মুখে। যন্ত্রণায় সে প্রায় লাফিয়ে ঘরে ফিরে এল। দরজাটা বন্ধ করতে করতে মনে হল হাত এবং মুখে কোন সাড়া নেই। টলতে টলতে সে উনুনের মধ্যে ঢুকে পড়ল যেন। কাঁঠ শেষ হয়ে

আসায় আঙন নেই কিন্তু উভাপ আছে। বেশ কিছুক্ষণ চেঁটার পর তার শরীরে রক্ত স্বাভাবিক হল। সে তাকিয়ে দেখল আর কাঁঠ আছে কি না। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও চোখে পড়ল না। ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে সে বন্ধদের দিকে তাকাল, 'ওয়ে পড়। পুলিশের বাবার সাধ্য নেই এই অবস্থায় এখানে হেটে আসে। তবে আজ রাত্রে কারো ভাগ্যে খাওয়া জুটবে না! থিচুড়ি পোড়া কয়লা হয়ে গেছে আর আমাদের ঠাকুর মাল খেয়ে বেহঁশ। লোকটাকে দেখে আস, কি আরামে আছে এখন, ঠাণ্ডা ফাণ্ডা টেরই পাচ্ছে না।'

সুদীপ কথাটা শোনা মাত্র উঠে দাঁড়ান, 'সেকি? সত্যি বলছিস?'

জয়িতা ওর দিকে একবার উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আনন্দকে বলল, 'একটা রাত না খেয়ে কাটালে কিছুই মনে হবে না কি বলিস।'

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র সুদীপ বেরিয়ে গেল। তারপর ঠিক তীরের মত ছিটকে এল ঘরে, 'বাপস কি ঠাণ্ডা। এখন কি হবে। ও তো আজ রাত্রে উঠে দাঁড়াতেও পারবে না। আমি যদি তখন ওকে মদ খেতে নিষেধ করতাম!'

কল্যাণ বলল, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে। না খেলে ঘুমই আসবে না।'

সুদীপ হাসল, 'তুই বরং এক কাজ কর। ধরা দিনে পুলিশরা নিশ্চয়ই খাওয়াবে। ওদের কাছে নিশ্চয়ই খাবার-দাবার আছে।'

আনন্দ কোন কথা না বলে আবার জানলায় ফিরে গেল। একটু একটু করে আলো ফুটছে। তীর হাওয়া এভারেস্টের মাথা থেকে নেমে আসা মেঘগুলোকে দাজিলিং-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটু আগে যে ঘন অন্ধকার নেমেছিল তা চটপট সরে যাচ্ছে। কিন্তু আর একটা বিস্ময়! সান্দাকফুর দৃশ্যমান অংশে সাদা তুষারের চাদর পড়ে আছে এখন। পঁজা তুলোর মত তুষার পড়ছে এখানে। এবার জিপটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল সে। ওর গায়তেও সাদাটে ভাব। অনেকটা আলো ফোটার পর সান্দাকফুর যেন ছবি হয়ে গেল। আনন্দ মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জয়িতা, তুই তুষার দেখতে পেয়েছিস?' হতাশ গলায় উত্তরটা জয়িতা জানাতেই সে ডাকল, 'চটপট চলে আস।'

শুধু জয়িতা নয়, সুদীপের সঙ্গে কল্যাণ পর্যন্ত আনন্দের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন। সুদীপ বলল, 'প্র্যাণ্ড! ভারতবর্ষে আছি বলে মনে হচ্ছে না।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'জিপটা থেকে কেউ নেমেছে?'

'এখনও নামেনি। এখন যেভাবে ওয়েদার ভাল হয়ে যাচ্ছে তাতে তাদের এখানে আসতে কোন অসুবিধে হবে না। অবশ্য এনে আমরা দেখতে পাব।' আনন্দ জানাল। জয়িতা কোন কথা বলছিল না। সে মুগ্ধ হয়ে তুষার পড়া দেখছিল। ঠিক তখনই জিপের সামনের দরজা খুলে গেল। একটা লোক লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল বাংলোর দিকে। লোকটার আপাদমস্তক মোড়া। আনন্দ নিচু গলায় ঘোষণা করল, 'লোকটা নিশ্চয়ই ড্রাইভার।'

লোকটা যে দরজা খাঙ্গা দিচ্ছে তা বোঝা গেল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে আবার ফিরে গেল জিপের কাছে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং জিপটাও নড়ল না।

আনন্দ বলল, 'ওরাও জানে না যে চৌকিদার এখানে নেই। নিশ্চয়ই ওরা এবার দরজাটার তাল ভাঙার চেষ্টা করবে। আমি শুধু ভাবছি কটা লোক আছে গাড়িটায়?' আর ঠিক তখন জিপটা সামান্য ব্যাক করে এদিকে বাঁক নিল। দুশাটা দেখামাত্র ওরা উত্তেজিত হল। কল্যাণ ছুটে গিয়ে ব্যাগ থেকে একটা গ্রেনেড তুলে নিল। আনন্দ ইশারায় ওকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করল। জিপটা এবার চোখের আড়ালে চলে গেল। ওপাশে ডি আই বাংলো রয়েছে। যদি পুলিশ হয় তাহলে ওখানে গেলো নির্যাত খুঁজে বের করবে তাদের হৃদয়। আনন্দ ঠিক করল ইয়ুথ হোস্টেলের দরজার কাছে এসে জিপ থেকে পুলিশগুলো নামামাত্র চার্জ করবে। সিদ্ধান্তটা বন্ধুদের জানাল সে। গাড়ি থেকে নামার আগে পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে। ওরা যদি ডি আই বাংলোয় থেকে যায় তো মন্দের ভালো।

'মন্দের ভাল' শব্দ দুটো পছন্দ হচ্ছিল না সুদীপের। কারণ ডি আই বাংলোর ওপাশে ঠিক কি হচ্ছে তা এখন থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে আপাতত যেটাকে ভাল মনে হচ্ছে আনন্দের সেটা একটা বিরাট মন্দের প্রস্তুতি। ওরা যদি ডি আই বাংলোতে গিয়ে খবরাখবর নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পায়ে হেঁটে এখানে আসে। নিজেকে ওই দলের অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে ভাবলে তো সে এই রকমই করত। গাড়ি দিয়ে কেউ সশস্ত্র শত্রুর মোকাবিলা করতে আসে না। সময় যাচ্ছে। এখন ক্রমশ তিকঠাক সন্ধ্যা এগিয়ে আসার কথা কিন্তু আলো আরও স্পষ্ট হচ্ছে। সুদীপ আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না। ব্যাগের ওপর রাখা কানঢাকা উইণ্ড চিটারটা তুলে নিয়ে দ্রুত পরে ফেলতেই জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাইরে।' সুদীপ গ্রেনেড এবং রিভলবারটা সঙ্গে রাখল। তারপর আনন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি একটু ঘরে আসি।'

আনন্দের কিছু বলার আগেই কল্যাণের ঠাণ্ডা গলা শোনা গেল, 'না। তুই যাবি না।'

সুদীপ অবাধ হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। যদিও সে কোন শব্দ উচ্চারণ করল না কিন্তু মুখচোখে প্রখরতা স্পষ্ট। কল্যাণ অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা চারজনেই একসঙ্গে এই ঘরে থাকব।'

'বাট হোয়াই?' সুদীপ অবাধ শুধু কল্যাণের কথা নয়, তার বলার ধরনেও।

'তাই কথা ছিল।' কল্যাণ চোখে চোখ রাখতে চাইছিল না।

'আমি বুঝতে পারছি না তুই কি বলতে চাইছিস! আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি?'

'আমি জানি না। কিন্তু পুলিশ অ্যাটাক করলে তুই সেটা প্যারিস বাইরে গেলে, আমরা পারব না। একসঙ্গে মুখোমুখি হওয়া ভাল।' কল্যাণ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। হঠাৎ মনে হল সান্দ্রাকফুর শীতল অপরাহ্নে যে ঠাণ্ডা বাতাস

সমস্ত উপত্যকায় বয়ে যাচ্ছে তার থেকে বহুগুণ শীতলতম অনুভূতি ওই শব্দগুলো থেকে ছিটকে এল।

‘ওঃ গড! ইউ ডোল্ট বিলিভ মি কল্যাণ!’ সুদীপের গলা থেকে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল। কল্যাণ কোন উত্তর দিল না। চূপচাপ ডাল হাতটায় গ্রেনেড নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ‘তোরা? তোদেরও কি একই ধারণা?’ সুদীপ আনন্দের দিকে তাকাল। আনন্দ হাসল। তার চোখ কল্যাণের ওপর ঘোরাফেরা করছিল। তারপর ধীরে ধীরে সে ওর কাছে এগিয়ে গেল, ‘আমি বুঝতে পারছি না তুই এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিস কেন?’

‘নার্ভাস!’ কল্যাণ কঁধ ঝাঁকাল।

‘অবশ্যই নার্ভাস। খুব ভয় পেলে মানুষ অনেক সময় নিজেকেও অবিশ্বাস করে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সুদীপের সঙ্গে এই ধরনের—! দ্যাখ কল্যাণ, কেউ যদি পালাতে চায় তো তাকে আমরা ধরে রাখতে পারব না। আমি এখনও বলছি ওয়েলকাম! সে ঝল্লে চলে যেতে পারে। আমরা ধরে নেব যে-কটা বাধা আমরা পেরিয়েছি সে-কটাই তার নার্ভের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ছাড়বার পর আর কোন সুযোগ কেউ পাবে না। কল্যাণ, তুই যদি ফিরে যেতে চাস তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।’ কথাটা শেষ করে আনন্দ ইঙ্গিত করল জমিতাকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে।

কল্যাণের মুখ অন্যরকম হয়ে গেল, ‘তুই আমাকে চলে যেতে বলছিস কেন?’

হাসল কল্যাণ, ‘চলে আমি যাবই বা কোথায়। সবকটা দরজা তো জেলখানার দিকেই শেষ হয়েছে। আমি ভয় পাইনা নিজের জন্যে আনন্দ, কিন্তু ওদের ওই ক্লাসটাকে আমি বিশ্বাস করি না।’ এবার সোজাসুজি সুদীপের দিকে তাকাল কল্যাণ।

‘আমাকে তুই বিশ্বাস করিস না?’ সুদীপ তখনও স্বাভাবিক হতে পারছিল না।

‘তোকে নয়, যে ক্লাস থেকে তুই এসেছিস সেই ক্লাসটাকে।’

সুদীপ এগিয়ে এল কল্যাণের সামনে, ‘এখানে আমি একাই আছি। অ্যাণ্ড লিশন আমি কোন ক্লাসের প্রতিনিধি হয়ে এখানে আসিনি। আর তাই যদি বলিস, বিখ্যাত সব মানুষ চিরকাল বলে গেছেন মধ্য বা নিশ্চিন্তরাই চিরকাল সূ বিধেবাদী। তুই নিজে যে ক্লাস থেকে এসেছিস সেই ক্লাসটারও কথা আগে চিন্তা কর। তুই সূ বিধেবাদী নস?’

‘আমি? হ্যাঁ, সূ বিধে পেলে কে না ছাড়ে বল?’

সুদীপ বুক কল্যাণের প্রাস্টার করা হাতটা খপ করে ধরল, ‘আমাকে বিশ্বাস করা দরকার নেই, আনন্দকে করতে হবে। সেটাই ঠিক হয়েছিল কলকাতায়। নইলে আমি তোকে বিরত করব। ও কে।’ সুদীপ সোজা হয়ে দাঁড়াল। কল্যাণের প্রাস্টারের রঙ এর মধ্যে বেশ নোংরা হয়ে গেছে। সুদীপ

সেদিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ওটাকে আর বেড়িয়ে কি লাভ! আনন্দ, আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরছি। অবশ্য ততক্ষণ যদি বাইরে থাকা যায়। আমার মনে হয় ওরা জিপ নিয়ে আসবে না। সাবধানে থাকবি।'

শ্লাভস দুটো হাতে গনিয়ে ও পেছনের দরজা খুলে হাঁটিতে হাঁটিতে দেখল ওয়াংদে তখনও পড়ে আছে। লোকটার নেশা না ভাঙানোই ভাল। সে দ্বিতীয় দরজাটা খুলতে সোঁ সোঁ হাওয়ার অস্তিত্ব টের পেল। একটু সময় নিল সে। ঠাণ্ডাটা সইবার অবস্থায় এলে সে চটপট বাইরে বেরিয়ে এল। এই দিকটা সান্দ্রাকফুর বাংলাগুলোর উল্টো দিকে। ওপাশ থেকে কারো নজরে আসবে না। সুদীপ দৌড়ে যেতে গিয়ে পিছনে পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে নিল। জুতোর তলায় চকচকে বারী কাচের মত ছড়ানো। শ্যাওলা পড়া উঠানের চেয়েও পিছল। একটু ঝুঁকে সে এক টুকরো বরফ তুলে নিল। এখনও পাতলা, ফিনফিনে। সে চারপাশে তাকাল। একটা পায়েরচলা পথ রয়েছে নিচে যাওয়ার। ওপাশে আর একটা চলে গেছে যেটা দিয়ে গেলেই সবার সামনে প্রকাশিত হতে হবে। প্রকাশিত, শব্দটা নিয়ে খেলল সে মনে মনে। এখন হিমালয়ের সব মুখ বোমটার আড়ালে। এমন কি কাছাকাছি পাহাড়গুলোতেও গাড় কুলাশা নেমে পড়েছে। হয়তো আরও কিছুক্ষণ পরে পায়ের তলায় সব ঘাস বরফের আড়ালে চলে যাবে। এরকম একটা অপ্রকাশিত প্রকৃতিতে কল্যাণ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এমন ভাবে যে বুকের মধ্যে এখনও পাথরটা চেপে রয়েছে। জন্মিতা ভাঙতে চায়নি, কিন্তু যেটুকু ইঙ্গিত পেয়েছিল তাতে সুদীপের মনে হয়েছে কল্যাণের হাতে মারাজক কিছু হয়নি। যা হয়েছে তা ভাল করে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধলেই চলে যেত। হাড়ে একটু চাপ আর কয়েকটা লিগামেন্ট ছেঁড়ার জন্যে যদি কল্যাণ জোর করে ডাক্তারকে দিয়ে প্রাস্টার করিয়ে নেয় তাহলে অনেক সুবিধে। ডাক্তার ঠিক কি বলেছিল তা রামানন্দ রায় এবং কল্যাণ ছাড়া কেউ জানে না। রামানন্দ মেন্নেকে কতটা কি বলেছেন সেটা জন্মিতা হয়তো ভদ্রভাষ্য বলবে না। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল, কল্যাণও আর হাতের ব্যথার কথা বলল না। ব্যাপাটায় খটকা লাগে। তখন তো যে কোন মুহূর্তে পুলিশের খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। হাতে প্রাস্টার থাকায় নিশ্চয়ই কল্যাণ খানিকটা সুবিধে পেল। তাছাড়া তারপর থেকে তো ওকে কোন ঝুঁকিতে যেতে হচ্ছে না। সুদীপ চোখ বন্ধ করল। সে কি খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে! হিমালয়ের এত ওপরে এসে এইরকম চিন্তাকে প্রশয় দেওয়ার মধ্যে কি এক ধরনের নীচতা কাজ করে না?

যেন ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যেই সুদীপ একটা সিগারেট ধরাল। কল্যাণ যতক্ষণ সরাসরি বিপদ না ডেকে আনছে ততক্ষণ ওকে বন্ধু ভাবাই ভালো। কিন্তু এদিকে সময় বেশী নেই। বড় জোর মিনিট তিরিশের মধ্যেই অন্ধকার নেমে আসবে। সুদীপ হাঁটা শুরু করল। যতটা পারে ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করতে লাগল সে। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর পি ডব্লু ডি বাংলাটা

নজরে পড়ল। এখন অদ্ভুত এক মায়াবী এক আলো নেমেছে পৃথিবীতে। বিষম শব্দটার শুরুতে যদিও বিষ তবু তাতে জ্বালা থাকে না। এই আলোয় মন আরও বিষম হয়ে যায়।

মিনিট তিনেক হাঁটার পর ও ডি আই বাংলোর সামনেটা দেখতে পেল। সবকটা দরজা বন্ধ। ওখানে কোন মানুষ আছে কি না বোঝা অসম্ভব। সেটা অবশ্য ইয়থ হোস্টেলের দিকে তাকালেও মনে হবে। সতর্ক ভঙ্গীতে সে আরও একটু এগোতে বাংলার পেছন দিকটা নজরে এল। জিপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত শ'খানেক গজ দূরে রয়েছে বাংলা। কেউ যদি খুঁটিয়ে না দেখে তাহলে সুদীপকে আবিষ্কার করতে পারবে না। অন্তত চল্লিশ গজ ফাঁকা জায়গা পার হলে একটা বড় পাথরের আড়াল পাওয়া যাবে। কিন্তু—! বাইরে যখন কেউ নেই তখন এই সুযোগটা নেওয়াই ভাল। সুদীপ দৌড়োল। দুতিনবার পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে সে পৌঁছে গেল পাথরটার আড়ালে। এইটুকু দৌড়তেই নিঃশ্বাস দ্রুত হয়েছে। নাক মুখ দিয়ে বাষ্প বের হচ্ছে। শালা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেব—মনে মনে আর একবার উচ্চারণ করল সে। তারপর একটু স্থির হয়ে বাংলোটার দিকে তাকাল। আর তখনই এ পাশের দরজাটা খুলে গেল। আপাদমস্তক ওভারকোটের মুড়ি দিয়ে একটি লোক বেরিয়ে এল। লোকটার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বলে দেয় স্বাস্থ্য ভাল। হাঁটার ভঙ্গীতে হুকুম করার চরিত্র আছে। লোকটার পিছু পিছু আর একজন বেরিয়ে এল। এই লোকটাই ড্রাইভার। তার হাতে লোহার শিক গোছের কিছ। ওরা পি ডব্লু ডি বাংলোর দিকে হাঁটছিল। সুদীপ চোখ রাখল। খানিকটা ওপরে উঠে লোকদুটো সুন্দর বাংলোর দরজায় পৌঁছে গেল। ওরা তাল্লা ভাঙছে। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর লোকটা সফল হল। তারপর দুজনেই ভেতরে ঢুকে গেল। সুদীপ ডি আই বাংলোর দিকে তাকাল। কেউ আসছে না ওখান থেকে। এবার জিপের দিকে ভাল করে তাকাতে সে শঙ্ক হল। এটার গায়ে সরকারি লেবেল লাগানো। ড্রাইভারটা দৌড়ে দৌড়ে ফিরে আসছিল। ওর গায়ে শীতবস্ত্র আছে টিকই তবে অন্য লোকটির মত নয়। ড্রাইভারটা এসেই জিপের পেছনের দিকের ঢাকনা খুলে ফেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। একভাবে এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সুদীপ আবিষ্কার করল তার গায়েও সাদাটে ভাব এসেছে। তুষার পড়ছে সমানে। এই সময় ড্রাইভারের সঙ্গে সেই লোকটা বেরিয়ে এল যার সঙ্গে ওয়াংদে কথা বলেছিল। ওদের দুর্জনের হাতেই চেলাকার্ঠের বোঝা। সেগুলোকে জিপের পেছনে ওরা তুলে দিল দুবারে। তারপর লোকটা ভেতরে চলে গেলে সুদীপ চমকিত হল। মেয়েদের পোশাক বুঝতে অসুবিধে হল না। মেয়ে দুটি লম্বা, শীতে অত্যন্ত কাবু বোঝা যাচ্ছিল। কোনরকমে দরজা থেকে বেরিয়ে এসে জিপে উঠে বসল। ড্রাইভার এবার গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল পি ডব্লু ডি বাংলোর দরজার গায়ে। মেয়ে দুটো মুরগীর মত ছটফটিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

জিনিসপত্র ভেতরে চালান করে দিয়ে ড্রাইভার বোধ হয় হুকুম মত গাড়ি নিয়ে ফিরে এল ডি আই বাংলাতে। অর্থাৎ যারা এসেছে তারা ডি আই বাংলাতে থাকতে চায়নি। সুদীপ নিঃশ্বাস ফেলল। বহুৎ বরাত জোর থাকায় তারা পি ডব্লু ডি বাংলোর দরজা খোলা পায়নি। কিন্তু একটা ব্যাপারে এখন নিশ্চিত হওয়া গেল, এরা পুলিশ নয়। অর্থাৎ আজকের রাতটা আরামে না হোক স্বস্তিতে কাটানো যাবে। এই সময় আর কোন মানুষের পক্ষে নীচ থেকে আসা সম্ভব নয়। সুদীপ এবার আড়াল ছাড়ল। তারপর স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে চলে এল ডি আই বাংলোর দরজায়। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। কয়েকবার শব্দ করার পর ওয়াংদের পরিচিত লোকটা সেটা খুলল। কোন ভূমিকা না করে ভেতরে ঢুকল সুদীপ। মনে হচ্ছিল আর মিনিট পাঁচেক থাকলেই শরীর জমে যেত। লোকটাও সেটা বুঝতে পারল। দরজা ভেজিয়ে জিজ্ঞাসা করল হিন্দীতে ‘বলুন।’

সুদীপ বোঝাবার চেষ্টা করল, ‘আমরা আজ বিকেলেই এসেছি। ইয়ুথ হোস্টেলে আছি। কিন্তু ওয়াংদে, যে আমাদের সঙ্গে এসেছে সে নেশা করে পড়ে আছে। খাবার তৈরি করতে পারেনি। এখানে কি কিছু খাবার পাওয়া যাবে? আর আমাদের কিছু কাঠ চাই। ওখানে কাঠও নেই।’

লোকটা মন দিয়ে শুনল। একটা কালি পড়া হ্যারিকেন জ্বলছে বাংলায় আর যারা আছে তাদের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল না। শীত মানুষকে চিরকালই নিস্তব্ধ করে দেয়। লোকটা এবার জিজ্ঞাসা করল, ‘সাহেবেরা তো চারজন। আমি দশখানা রুটি আর সবজি দিতে পারি। কাঠও। খাবারের জন্যে লাগবে কুড়ি টাকা আর দশ—তিরিশ টাকা, কাঠের জন্যে আরও দশ, মোট, চল্লিশ। সাহেব রাজী?’

সুদীপ যেন মুক্তি পেল। দ্রুত ঘাড় নেড়ে বলল, ‘ঠিক আছে। কিন্তু কতক্ষণ সময় লাগবে?’

লোকটা হাসল। ওর মুখে দিশি মদের গন্ধ বের হচ্ছিল ভুরভুর করে। ড্রাইভারটাও ধারে কাছে নেই। হাসি নিয়েই লোকটা বলল, ‘শিলিগুড়ি থেকে পুলিশের সাহেব এসেছেন একটু আগে। ওঁরা খাবেন ভেবে আটা মেখেছিলাম। পরে শুনলাম সাহেবরা খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ওটাই আপনাদের জন্য করে দেব। আধা ঘণ্টা টাইম চাইছি। সাহেব চলে যান আমি পৌঁছে দেব। সাহেবের কি মদ চাই? দিশি বিলিতি দুই আমার কাছে আছে।’

সুদীপ এক মুহূর্তে ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ‘বিলিতি কি আছে?’
‘রম। ছোট বোতল আশি টাকা। সাহেবের চাই?’

সুদীপ মাথা নাড়তেই লোকটা ভেতরে চলে গেল। এখানে টুরিস্টরা এলেই কি মদ খায়! ওর মনে হল মদ কিনে লোকটাকে পরস্যা পাইয়ে দেওয়াটা ভালই হল। ও ওদের টুরিস্ট ভাববে। জিপটা তাহলে পুলিশ অফিসারের। সঙ্গে

মহিলা রয়েছে যখন তখন নিশ্চয়ই অন ডিউটিতে নেই। মদের বোতলটা নিয়ে সুদীপ বলল, 'তুমি যখন খাবার দিতে যাবে তখন এর টাকাটা নিয়ে নিও। অবশ্য আমাকে যদি বিশ্বাস কর।'

লোকটা হাসল, 'বিশ্বাস তো করতেই হয়। আমাকে টাকা না দিয়ে কেউই সান্দাকফু থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। গণেশের কাছে আমি তিনশো টাকা পাই, টাকা দিচ্ছিল না, অসুখ হয়ে গেল। সাহেবরা কি এখানে এই প্রথম এলেন?'

'হ্যাঁ। ওই বাংলাটা কি খুব ভাল! তোমাদের পুলিশ সাহেব ওখানে চলে গেলেন তাই বলছি।'

'ওটা ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে তৈরি হয়েছিল। যেসব সাহেব মেয়ে নিয়ে এখানে ফুটি করতে আসেন তাঁরা সবাই চান ওই বাংলায় থাকতে। ঠাণ্ডা ঢোকে না, ভাল ফায়ার প্রেস, নরম বিছানা, কত আরাম। এই সাহেব তালো ভেঙ্গেও ঢুকে গেলো সেই আরামের জন্যে।'

'সাহেবের সঙ্গে কারা এসেছেন?'

'এদের কি কোন পরিচয় থাকে সাহেব। কেউ ওদের পাঠিয়েছে, সাহেবকে আনন্দ দিতে। কারো কারো তো একজন মেয়ে পাশে থাকলে একা লাগে তাই দুজন এসেছে।' কথাগুলো বলে হঠাৎ যেন সচেতন হল লোকটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, 'আমি কিন্তু এসব কথার একটাও বলিনি। কোথাও আমার এইসব কথা বললে আমি অস্বীকার করব। এই জনোই মা বলত ভগবান চোখ দিয়েছে দেখবার জন্যে, কান দিয়েছে শোনার জন্যে, আর মুখ দিয়েছে খাবার জন্যে। কেন যে ভুলে যাই।' আফসোসের ভঙ্গীতে কয়েকবার মাথা নেড়ে লোকটা বলল, 'কথাটা যে কেন ভুলে যাই! ঠিক আছে আমাদের দরজাটা বন্ধ করতে হবে। খাবার তৈরি করতে হবে। ঠিক আছে!'

ইঙ্গিতটা বুঝেই বেরিয়ে এল সুদীপ। বাইরের আলো আরও মরে এসেছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা। পৃথিবীর অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে দিনের চলে যাওয়া এক পলক দেখল সুদীপ। এখন সেই তেজী বাতাসটা নেই। কিন্তু কাঁপুনি দেওয়া ঠাণ্ডা উঠে আসছে পৃথিবীর গভীর থেকে, আকাশের ছাদ গড়িয়ে। মদের বোতলটা হাতে নিয়ে দৌড়াল সুদীপ। এর মধ্যে পায়ের তলার তুষারগুলো বরফের চেহারা নিয়ে নিয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষ ধরন নেওয়ার পর আর পা গিছলে যাচ্ছে না। সে ক্রমণ উঠে এল পি ডব্লু ডি বাংলোর দরজায়। পায়ের তলায় বরফ থাকলে কিভাবে দৌড়াতে হয় তার কায়দাটা আবিষ্কার করে সে আপ্ত হন। তারপর সমস্ত উৎসাহের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ঢালু হয়ে নিয়ে নিচে গড়িয়ে যাওয়া সান্দাকফুকে এই বিশেষ জায়গা থেকে এখন অপরূপ দেখাচ্ছিল। রাত আসছে নিচ থেকে কালো পোশাকে টাকা ডাইনির মত হামাগুড়ি দিয়ে। মাথা নাড়ল সুদীপ। ঠিক হল না। রাতকে কোন বাঙালি কবি কালো খামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? সান্দাকফু সেই

খামের মধ্যে ঢুকে আছে।

রঙিন বাংলোটা পৃথিবীর সব নির্জনতা নিয়ে চুপচাপ। সুদীপ দরজাটার কাছ থেকে সরে এল। প্রতিটি জানালার ভেতরে ভারি পর্দা। তিনটে মানুষ ভেতরে আছে অথচ কোন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না, কোন শব্দও! প্রথম প্রথম সুদীপ সাবধান হবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তারপর মনে হল যে লোকটা এখানে মেয়েদের সঙ্গে আরাম করছে সে নিশ্চয়ই সতর্ক প্রহরী হবে না। বাড়িটার শরীর ধরে সুদীপ পেছনের দিকে চলে এল। মূল বাংলোর পেছনেই বোধ হয় চৌকিদার-এর থাকার জায়গা। সেটা মোটেই মজবুত নয়। কাঠের নড়বড়ে দরজাটার একটু জোরে চাঁপ দিতেই খুলে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। একটা স্যাঁৎসেতে গন্ধ। মাথা চুকিয়েও ফিরে আসতে গিয়ে থমকে গেল সুদীপ। মানুষীর গলা কানে আসছে। বোধ হয় কয়েকটা বন্ধ দরজা পার হয়ে আসায় গলার শব্দ প্রায় মিলিয়ে যাওয়ার অবস্থায়। কিন্তু দুটো হাসি একত্রিত হওয়ায় তাকে চিনতে অসুবিধে হল না।

তিনবার আছাড় খেয়ে সুদীপ ইয়ুথ হোস্টেলের দরজায় মখন ফিরে এল তখন তার শরীর প্রায় নীরস্ত। বোধ হয় জানালা দিয়ে নিয়ত লক্ষ্য রাখায় আনন্দ দরজা খুলেছিল। ওর ওপর নির্ভর করে সুদীপ ঘরে ফিরে এল। ফায়ার-পেসের আশুন নিবু নিবু তবু তার ওপর হামলে পড়ল সুদীপ। জয়িতা ওর উইণ্ডচিটারটা খুলে নিতে চাইছিল, 'এটা খুল। সাদা ভূত হয়ে গেছিস।' কোন রকমে সেটা থেকে মুক্ত হাত এবং মুখে রক্ত ফিরে পাওয়ার পর সুদীপ দেখল আনন্দ মদের বোতলটা চোখের সামনে তুলে দেখছে। আশুনের পাশে বসে পড়ে সুদীপ হাসল, 'ওটা চৌকিদারের কাছ থেকে কিনতে হয়েছে। লোকটার সঙ্গে ভাব জমছিল হঠাৎ কি ঘেন হয়ে গেল। শোন, কোন পুলিশ আমাদের সন্ধান আসেনি। ওই গাড়িটা একজন শৌখিন পুলিশ অফিসারের।

তিনি দুজন উর্বশীর সঙ্গে ওই বাংলোয় এসেছেন আরাম করতে। সুতরাং কল্যাণ, তোর এবার শান্ত হওয়া উচিত।'

জয়িতা চাপা গলায় বলল, 'সুদীপ। ডোল্ট স্টার্ট দ্যাট। ও-কে!'

কথাটা শোনার পর সব থেকে স্বস্তিতে এসেছিল কল্যাণ। এবং সুদীপের খোঁটাটা সে গায়ে মাখল না। সে অনেকক্ষণ থেকে ট্রাঞ্জিস্টারে কান রাখছিল। এখনও কোন স্টেশন খোলেনি যার ভাষা সে চেনে। অজুত সব গলা আসছে কাঁটা ঘোরালে। হয়তো লাসা কিংবা পিকিং বা ওইরকম কোন রেডিও স্টেশন ধরা পড়ছে ওতে। সেটা দেখে কল্যাণকে আনন্দ বলল, 'তোকে বললাম কলকাতা এখান থেকে ধরা যাবে না। ব্যাটারি নষ্ট করছিস।'

কল্যাণ বোধ হয় ইতিমধ্যেই বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। ট্রাঞ্জিস্টারকে সরিয়ে বলল, 'তোদের খিদে পায়নি।'

জয়িতা বলল, 'পাচ্ছে, কিন্তু স্টকে হাত দেব কি না ভাবছি।'

সুদীপ বলল, 'একটু ওয়েট কর। খাবার আসছে।'

‘কোথেকে?’ জায়াতা হাসল।

‘হাসি নয়, তোদের জন্যে আর কত করব বল! খাবার আসছে, কাঠ আসছে আশুন জ্বালার জন্যে। মোট একশ কুড়ি টাকা লাগবে। রেডি করে রাখ। লোকটাকে দরজা থেকে বিদায় করতে হবে।’

‘চারজনের খাবারের দাম এখানে একশ কুড়ি?’ প্রায় চিৎকার করে উঠল কল্যাণ।

‘ওইটে সূদ্ধু।’ মদের বোতলটা দেখাল সুদীপ, ‘যে লোকটার সঙ্গে ওয়াংদে কথা বলেছিল সেই দিয়ে যাবে। মিনিট দশেক অপেক্ষা কর।’

জায়াতা ওর পাশে বসল, ‘খ্যাক্স। লোকটা অন্তত টাকার জন্যে আসবে, কি বল? তুই কখনও মদ খেয়েছিস সুদীপ?’

‘মদ।’ হাসল সুদীপ, ‘স্কুলের মেয়ের মত কথা বলিসনা। একটু আগেও তো খেলাম।’

‘ওঃ, ওই খাওয়ার কথা বলছি না। বেশ নেশা করার মতন খাওয়া, খেয়েছিস?’

‘না। চান্স পাইনি বলব না, ইচ্ছে হয়নি।’

সুদীপ কথা শেষ করা মাত্র আনন্দ বলল, ‘কারো যদি খুব ঠাণ্ডা লাগে তাহলে অল্প খেয়ে দেখতে পারিস। নেশা করার কথা মাথা থেকে তাড়া।’

সুদীপ উঠল। ওয়াংদের রেখে দেওয়া জলের জগ আর গেলাস নিল। মদের বোতলটা আনন্দ এগিয়ে দিতে সেটাকে একটু চেপ্টার পর খুলে ফেলল। তারপর গেলাসে ঢালতে গিয়ে থামল, ‘ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি জানতে পারে চারটে ছেলেরা দেশের মানুষের যারা শত্রু তাদের ধ্বংস করতে চেপ্টা করার পর মদ খেয়েছে তাহলে তারা কি ভাববে?’

জায়াতা বলল, ‘অর্ধেক মানুষ ছি ছি করবে আর অর্ধেক চূপ করে থাকবে।’

আনন্দ বলল, ‘এখানে কোন দর্শক নেই। তোর শীত করলে তুই খাবি। দ্যাটস অল।’

সুদীপ ছাগ নিয়ে মুখ বিকৃত করল, ‘কুৎসিত গন্ধ। খেলেই বমি হয়ে যাবে। পিটল আই অ্যাম ট্লাইং।’

জায়াতা বলল, ‘যদি দুনম্বরী মাল হয়। সান্দাকফুতে বিষাক্ত মদ খেয়ে উপপস্থীর মৃত্যু। খবরের কাগজে হেডিং হবে।’

সুদীপ কোন কথা না বলে জল মিশিয়ে খানিকটা মুখে ঢালল। তারপর চোখ বন্ধ করল, ‘কান গরম হয়ে যাচ্ছে, বুক জ্বলে গেল। আঃ। বেশ আরাম লাগছে এখন। তোরা খেতে পারিস।’

কল্যাণ খেল না। সে কারণ দেখাল তার ঠাণ্ডা লাগছে না। কিন্তু তার চোখ তিনজনের ওপর ঘুরছিল। ও বুঝতে চাইছিল কেউ মাতাল হচ্ছে কি না। এমন সময় জায়াতা বলল, ‘দূর। আমার যে একটুও নেশা হচ্ছে না। মনে হল ওমুখ খেয়ে গা গরম করলাম।’

কল্যাণ খুব হতাশ হল। এবং তখন তার মনে হল একটু খেয়ে দেখলে হতো। এখন আর চাওয়া যায় না। কেন যে মাঝে মাঝে স্রোত থেকে সরে দাঁড়াবার ভৃত চাপে মাথায়—। তখনই দরজায় শব্দ হল। সুদীপ উঠে সোজা পায়ে দরজা খুলে ভেতরের ঘরে চলে গেল। তারপর চিংকার করল, ‘আনন্দ টাকাটা নিয়ে আয়।’

শব্দটা শোনারাত্র টাকা বের করছিল আনন্দ। মদ পেটে যাওয়ার পর সত্যি শীতটা উবে গেছে যেন। সে বেরিয়ে এসে ওয়াংপেকে একবার দেখল। তারপর দ্বিতীয় দরজার কাছে এসে টাকাটা এগিয়ে ধরল। কাঠের বোঝা নামিয়ে খাবারের পাত্র হাতবদল করে লোকটা হাসল। একটা কথা না বলে টাকাটা নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সকালের জন্যে কিছু কাঠ রেখে ওরা ফিরে এল ঘরে। ফায়ারপ্লেসে কাঠ বোঝারটা ব্যবহার করার পর আঙন জ্বলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উত্তাপ এবং আলো উজ্জ্বল হল। ত্রিক গুনে গুনে দশখানা রুটি। আর সবজি বলতে যে বস্তুটি তাতে আর যাই থাক কোন স্বাদ নেই। ওরা দুটোর বেশী রুটি গিলতে পারল না। ফায়ারপ্লেসের আগুনের সামনে বসে দুটো করে রুটি হাতে নিয়ে একই পাত্র থেকে সবজি তুলে খাচ্ছিল ওরা। কোথাও কোন শব্দ ছিল না এতক্ষণ। শুধু কাঠ ফাটছিল আগুনে। আনন্দ বলল, ‘কিসের শব্দ হচ্ছে বলতো?’

ওরা কান পাতল। দূর থেকে একটা ডাক ভেসে আসছে। প্রথমে কুকুরের চিংকার বলে মনে হচ্ছিল। তারপর কুকুরের সঙ্গে পার্থক্যটা ধরা পড়ল। ডাকগুলো কাছে এসে থমকে গেল। না, কুকুর নয়। আরও ভয়ঙ্কর কিছু। এইসব জায়গায় শেয়াল হায়েনার আসার কথা নয়। এত উঁচুতে এবং ঠাণ্ডায় আসবে কি-করে ওরা? হঠাৎ সুদীপের মনে পড়ল তুষার-নেকড়ে কথ। ওরা সেই হিংস্র তুষার নেকড়ে নয় তো! সে উঠে দরজাটা বন্ধ আছে কিনা দেখতে গেল বাইরের ঘরে। দুটো দরজা দেখে ঘরে এসে হাতবড়ির দিকে তাকিয়ে ছুটে গেল এমন ভঙ্গীতে যে সঙ্গীরা চমকে উঠল। বিছানা থেকে ট্রানজিস্টারটা তুলে নিয়ে সে বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী শিলিগুড়ির সংবাদ পাঠকের গলা ভেসে এল, ‘মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন কেন্দ্র যদি রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে এরপর তিনি জনসাধারণের সাহায্য চাইবেন।’

প্রতিদিন যেসব বস্তাপচা সংবাদ পরিবেশিত হয় বিভিন্ন নেতার সংলাপ হিসেবে আজকের সংবাদে তার ব্যতিক্রম কিছু ছিল না।

চারজন উগ্রপন্থী সম্পর্কে আকাশবাণী নীরব রইল। অবশ্য কল্যাণ ভাবছিল যদি আগে বলে থাকে তখন ট্রানজিস্টার খোলা হয়নি। এবং তখনই নখের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ বা কারা বাইরের দেওয়াল আঁচড়াচ্ছে।

পাখিরা যেমন শব্দ ফলের খোসায় নখের দাগ রেখে যায় তেমনি হয়ত উয়ুথ হোস্টেলের একটা দেওয়ালে ক্রুদ্ধ প্রাণীদের আঁকা হয়ে আছে। ওরা ভেবে পাখিই না এটা ঠিক কোন প্রাণী! রাত্রে চোখে দেখার উপায় ছিল না। চাপা গর্জনে ফ্লোড গলছিল। এত ওপরে বাঘ আসতে পারে কি না তা-ও ওরা বুঝতে পারেনি। সকাল যখন দশটা তখন খাবা বলে দিল আর-মাই হোক প্রাণীগুলোর শরীর বিশাল নয়। ওয়াংদে পর্যন্ত যা বোঝাতে চাইল হিন্দী এবং নেপালিতে মিশিয়ে তাতে প্রাণীটির নাম আবিষ্কার করা মুশকিল হল। তবে ওয়াংদের মতে ব্যাপারটা কিছু ভয়াবহ নয়। মানুষের রক্তের গন্ধে ওদের উত্তেজনা হয় ঠিকই কিন্তু একটু ধমক দিলে পালিয়েও যায়। সাহেবরা যদি কাল রাত্রে গলা তুলে ধমকাতেন তাহলে ওরা এত সাহস পেত না।

আজ সকালে ওয়াংদে তাদের ঘুম ভাঙিয়েছে চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে। আনন্দ বিস্ময়ে লোকটার দিকে তাকিয়েছিল। একটি সরল হাসি সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে মার্জনা প্রার্থনা করতে পারে তা ওয়াংদেকে না দেখলে বোধহয় কোনদিন জানা হত না। কাল রাত্রেই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই নিয়ে খামোকা স্বামোজা করার কোন মানে হয় না। লোকটা বেশী মদ খেয়ে নিশ্চয়ই অনায়াস করেছে তাদের রাতের খাবার এবং জ্বালানী কাঠ এনে দেয়নি কিন্তু এখনও অনেকটা পথ সামনে পড়ে আছে। তবে আনন্দ তাকে সতর্ক করে দিল এরকম ঘেন আর না হয়।

সকাল দশটা অবশ্যই রওনা হবার পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। কিন্তু কাল রাত্রে ওই প্রাণীগুলোর খেমে যাওয়া এবং রাত্তির আকাশবাণীর শেষ খবর পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর যখন ঘুম এল তখন প্রায় মৃতদেহের মত পড়েছিল ওরা। এই কদিনের প্রতিনিয়ত মানসিক উত্তেজনা, শারীরিক পরিশ্রম এবং এখানকার শীতল আবহাওয়া ওদের সমস্ত সতর্কতা মুছে দিয়েছিল। এরকম ঘুম বোধহয় অনেককাল বাদে ওরা ঘুমিয়েছে। যদি ওয়াংদে না ডাকতো তাহলে সকাল দশটাতেও রওনা হওয়া যেত না। তবু ওয়াংদে বলেছে যদি জোর পা চালানো যায় তাহলে ফালুটে পৌঁছাবার আগে সন্ধ্যা নামবে না।

সকাল দশটাতেও আজ সান্দাকফু কুয়াশায় ঢাকা। সামনের পাহাড়গুলো অদৃশ্য, একফোঁটা রোদ নেই। ওপরের বাংলাগুলোর পাশ কাটিয়ে ওরা এখনও আছে। সুদীপের খুব ইচ্ছে ছিল যাতে জিপের মালিক আর ফিরে যেতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করা। কিন্তু আনন্দ আপত্তি করেছিল। এটা নিছকই ব্যক্তিহত্যা হবে। আর এই ঘটনাই পুলিশকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেবে তারা এখানে এসেছে। ওয়াংদেই সাক্ষী দেবে। গতরাতের শেষ খবরেও তাদের কথা কিছু বলেনি। তার মানে নিশ্চয়ই পুলিশ হাত গুটিয়ে নেয়নি। একজন মন্ত্রী মারা যাওয়ার পর ওরা তা করতেও পারে না। কিন্তু যেটা

সত্যি সেটা তাদের নিয়ে কোন খবর তৈরী হচ্ছে না যা পরিবেশন করা যায়।

আকাশটা মাথার ওপর অনেকটা নেমে এসেছে, পায়ের তলায় মাটি যেন অনেক উঁচুতে এইরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল হাঁটিতে হাঁটিতে। ওয়াংদে যাচ্ছে আগে আগে। তার পিঠে যে বোঝা সেটার দিকে তাকিয়ে কল্যাণের মনে হল সে মরে যেত এত উঁচুতে ওই ওজন বইতে হলে। ওয়াংদের ঠিক পেছনে ছিল সুদীপ, তারপর কল্যাণ। জগ্নিতা আর আনন্দ হাঁটিছিল শেষে, পাশাপাশি। আনন্দ বলল, 'আমরা খুব লাকি যে আজ ফালুটে কোন ট্রেকার যাচ্ছে না।'

জগ্নিতা কোন কথা বলল না। যদিও চারপাশে গভীর ফুস্ফাসা তবু তার খুব ভাল লাগছিল। গতকাল জিপে আসার সময় আর যাই হোক এইভাবে পাহাড়ের মধ্যে থাকা হয়নি। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই আরও ভাল লাগত কিন্তু এই বা খারাপ কি। স্নেলের মধ্যে হেঁটে যাওয়া। মাঝে মাঝে সামনের বন্ধুরা মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশায়। যদিও আনন্দের পরিকল্পনামত তারা ফিরে আসবে অবস্থা শান্ত হলেই, কিন্তু জগ্নিতার মনে হচ্ছিল এই পথে আর হাঁটা হবে না। হয়তো কোনকালেই কলকাতায় যাওয়া হবে না তাদের। অন্তত এই মুহূর্তে সেই কারণে তার কোন আফসোস নেই। কলকাতা তাকে কিছুই দেয়নি। ওর বয়সের নব্বইভাগ মেয়েই কোন না কোন উপায়ে জীবনটাকে ভাল লাগায়। ঈশ্বর তাকে যে শরীর দিয়েছেন তা কোন পুরুষকে বোধ হয় কোনদিন আকর্ষণ করবে না। কিন্তু উল্টো দিকে কেন হল না কিছু? সমস্ত শারীরিক অর্থে যখন সে একজন মেয়ে, তখন কোন পুরুষকে প্রেমিক হিসেবে পেতে ইচ্ছে হয়নি কেন? মাঝে মাঝে তাই নিজেকেই খুব দুর্বোধ্য লাগে জগ্নিতার।

এখন এই আকাশের মধ্যে হেঁটে যাওয়া চমৎকার লাগছিল। কাল রাত্রের পরে শীতের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের একটা সমঝোতা হয়ে গেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোথাও অনাবৃত নেই। গ্লাভস পরার পর যে অস্বস্তিটা ছিল সেটাও এখন কেটে গেছে। জগ্নিতা সামনের দিকে তাকাল। কল্যাণ একা একা হাঁটিছে। কাল রাত্রে ও সুদীপের সঙ্গে যে কাণ্ডটা করল সেটা নিয়ে আর কথা হয়নি। কিন্তু সুদীপ নিশ্চয়ই সহজে ভুলতে পারবে না। সুদীপের ওপর কল্যাণের একটা চাপা ঈর্ষা ছিল বলে অনুমান করত জগ্নিতা। অথচ ব্যাপারটার কোন প্রমাণ ছিল না। নিশ্চয় মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট বলে সুদীপ এগিয়ে যেত ওর অনেক কিছু। কিন্তু কাল কল্যাণের হঠাৎ কেন মনে হল সুদীপ পালিয়ে যেতে পারে? এত তাড়াতাড়ি যদি অবিশ্বাস চুকে যায় প্রত্যেকের মনে তাহলে বিপর্যয় আসতে বাধ্য। জগ্নিতা ভেবেছিল আনন্দ এই নিয়ে কথা বলবে। মাঝে মাঝে আনন্দটাও কেমন অচেনা হয়ে যায়। ও যেন ব্যাপারটা দ্যাখেইনি এমন ভাব করে আছে। কিন্তু আজ সকালে তো

কল্যাণ সুদীপের সঙ্গে সহজ গলায় কথা বলছে না। জন্মিতা জোরে পা চালাল। রাস্তা সমতল নয়। মাঝে মাঝে ওপরে উঠতে রীতিমত হাঁপাতে হচ্ছে। জন্মিতা কল্যাণের পাশে পৌঁছে হাসবার চেষ্টা করেই সামলে নিল। এখন তো মুখের বেশীর ভাগ ঢাকা। হাসলে কেউ বুঝতেই পারবে না। কল্যাণ জন্মিতার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। খানিকটা পথ পাশাপাশি হেঁটে জন্মিতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কেমন লাগছে?'

'মহাপ্রস্থানের পথে যাচ্ছি। তুই দ্রৌপদী, একজন পাণ্ডব মিসিং। আমি নকুল না সহদেব সেটাই বুঝতে পারছি না। কোনদিন বেঁচে ফিরে আসব বললে তো তোরা আমাকে দলবিরোধী বলবি। যত দোষ তো আমার।' কল্যাণ কথা শেষ করে মুখ ফেরাল। শেষ শব্দগুলো বেশ ভার মেশা ছিল। জন্মিতা ওর কনুই-এ হাত রাখল, 'তুই নিজেকে হঠাৎ আলাদা করে ভাবছিস কেন?'

'ভাবব না? চমৎকার! যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে আনন্দ সুদীপের পরামর্শ নিচ্ছে। অনেক সময় তো সুদীপ নিজেই আমাদের ওপর হুকুম চালাচ্ছে। আমি যে দলে আছি সেটা ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই নিচ্ছে না। যেন আমার কোন ভূমিকাই থাকতে পারে না। এসব তোর চোখে পড়ে না, না?'

'সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে তো মুশকিল হবে। ওরা তো আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না।'

'তোর কথা আলাদা।'

'আলাদা কেন?'

কল্যাণ জবাবটা দিতে গিয়েও থমকে গেল। জন্মিতা জানত ও কি বলতে পারে। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেও সে প্রকাশ করল না। জবাবটার জন্যে চাপও দিল না। পশ্চিম বাংলার বেশীর ভাগ মানুষের মনই কল্যাণের মানসিকতায় গড়া। এখনও ট্রামে বাসে উঠলে তারা বলে থাকে, ভিড় বাসে কেন যে মেয়েছেলে ওঠে! মেয়েছেলে শব্দটা শুনলেই শরীর গুলিয়ে ওঠে। শব্দটার সমস্ত শরীর জুড়ে অপমান।

সান্দ্যকক্ষুতে সঙ্কোবেলায় যে চকচকে তুমার পড়েছিল সকাল দশটায় তার হদিশ ছিল না পায়ের তলায়। কিন্তু আড়াই কিলোমিটার হাঁটার পর ওরা বরফ পেয়ে গেল। এর মধ্যেই বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল চারজনের। বড় পাথরের আড়াল দেখে ওয়াংদে স্টোভ জ্বালান। কল্যাণ বেঞ্চির মত পড়ে থাকা একটা পাথরে ধপ করে বসে পড়তেই সুদীপ বলল, 'বসিস না। বইতে পড়েছি পাহাড়ে ট্রেকিং-এর সময় বসলে আরও বেশী ক্লান্তি লাগে।'

কল্যাণ কাঁধ নাচাল। তারপর জন্মিতার দিকে তাকাল। এই তাকানো যে অর্থবহ তা বুঝতে অসুবিধে হল না জন্মিতার। কিন্তু এসবে আমল না দিয়ে ও এগিয়ে গেল সামনে। এখন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে! আঃ দারুণ। ছোটবেলা থেকে কত ইংরেজি বই-এ এই রকম হাঁটার কথা সে পড়ে আসছে।

সাইবেরিয়ার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে একজন এর চেয়ে আরও ভয়াবহ বরফের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছিল একুশ দিন। সেই বর্ণনা তার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তার সামনে এখন যে কুয়াশায় ঢাকা বরফ পড়ে আছে তাকে দেখে অবশ্য খুব নিরীহ মনে হচ্ছে।

সে ফিরে আসতেই কল্যাণ বলল, 'এখান থেকে সাপ্লাই পেনে কলকাতায় সম্ভাব্য আইসক্রিম বিক্রী করা যেত। প্রাকৃতিক আইস উইদ ক্রিম।'

সুদীপ শুনে বলল, 'তোমার কলকাতায় একটা ঘাসের দোকান খোলা উচিত ছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের গলা চড়ল, 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি না। কেউ গায়ে পড়ে আমাকে জ্ঞান দিলে আমি কিন্তু বেশীক্ষণ সহ্য করব না।'

সুদীপ অত্যন্ত অবাধ গলায় বলল, 'হোয়াটস দিস! আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে পারব না?'

'না। তোমার ঠাট্টা, তোমার হুকুম, এসব আমি মানতে বাধ্য নই।'

'ও। সারাটা পথ কিন্তু তোমার বোঝা আমিই বয়ে এলাম। ঠিক আছে, তোমার যখন কোন কমপ্লেক্স কাজ করছে তখন আর কিছুই বলব না। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই কমপ্লেক্সটা কি।'

কল্যাণ কোন জবাব দিল না। সুদীপ এগিয়ে গেল ওর কাছে, 'কল্যাণ আমার প্রশ্নের জবাব দে।'

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আনন্দ এবং কাছাকাছি জয়িতা ওদের দেখছিল। চট করে যে উত্তেজনাটা তৈরী হয়েছে তার জন্য জয়িতা ভীত হয়ে পড়ল। সে আনন্দের দিকে তাকালে আনন্দ নিষেধ করল ইঙ্গিতে কিছু না বলতে। কল্যাণ একপাশে মাথা ঘুরিয়ে বসে আছে। সুদীপ কিছুক্ষণ ওর সামনে দাঁড়াল। তারপর ডান হাত আলতো করে কল্যাণের কাঁধে রেখে বলল, 'সরি। তোকে যদি হার্ট করে থাকি তাহলে দুঃখিত।' বলে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। জয়িতা লক্ষ্য করল কল্যাণ তার বসার ভঙ্গী পাল্টাল না।

এই সময় ওয়াংদে চা দিয়ে গেল। ধোঁয়া উঠছে অথচ চুমুক দেবার পর মনে হল ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। নিজের মগে চুমুক দিয়ে ওয়াংদে বলল, 'আজ যদি ফালুটে পৌঁছাতে হয় তাহলে আর একটু জোরে পা চালাতে হবে। মনে হচ্ছে আজ রোদ উঠবে না এবং সন্ধ্যা নামবে আগেই।' ওর কথাগুলো বলল আনন্দকে। লোকটা নিজেই বুঝে নিয়েছে কারণ সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ঘড়িতে যখন তিনটে তখন জয়িতার মনে হল আর এক পা-ও হাঁটতে পারবে না। ছেলেরা কেউ কিছু বলছিল না বটে কিন্তু একমাত্র সুদীপ ছাড়া বাকী দুজনও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। এমন নয় ওরা সমস্তটা পথে বরফ পেয়েছে। কিন্তু চড়াই উত্তরাই ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে মনে হচ্ছিল

বুকের ডেতর আর বাতাস নেই, খাই থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত প্রচণ্ড বেদনা
ওষ্ঠানামা করছে। ওয়াংদে আর সুদীপ এগিয়ে গিয়েছিল। কুয়াশায় ওদের
দেখা যাচ্ছে না। আনন্দ চিৎকার করতে সুদীপের নাম পাহাড়ে পাহাড়ে
প্রতি ধ্বনিত হ'ল। কিন্তু ও পাশ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আনন্দ
কল্যাণকে বলল, 'আমার গলায় লাগছে, তুই ডাক।'

কল্যাণের অবস্থা তখন বেশ কাহিল। নাকের উগায় কোন সাড়া নেই। দাঁড়িয়ে
থাকতেও ওর কণ্ঠ হ'চ্ছিল। জয়িতা মুখের কাছে আনন্দের অনুকরণে দুটো হাত
নিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু কল্যাণকে এড়িয়ে হাত নেড়ে আনন্দ তাকে নিষেধ
করল। কল্যাণ চিৎকার করল সামনের ঘন নীল কুয়াশার দিকে তাকিয়ে
কিন্তু সুদীপের নাম ধরে নয়। ওয়াংদের সাড়া পাওয়া গেল বেশ দূর থেকে।
জয়িতা অবাক চোখে কল্যাণের দিকে তাকাল। এই সময়েও মানুষ কি করে
নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা বিস্ময়েরই ব্যাপার। আরও মিনিট দুয়েক
অপেক্ষার পর কুয়াশার আড়াল ভেদ করে ওয়াংদে বেরিয়ে এল, লোকটাকে
একটুও ক্লাস্ত বলে মনে হচ্ছে না। ওর পিঠের বোঝা যেন কিছুই নয়। আনন্দ
তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখান থেকে ফালুট পৌঁছাতে আর কতক্ষণ সময়
লাগবে?' সে বুঝে গিয়েছিল দ্রুত সময় দিয়ে মাপলে তবু এদের কাছ
থেকে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

ওয়াংদে একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'এইভাবে হাঁটলে আরও এক
ঘন্টা। কিন্তু মনে হচ্ছে ফালুটে যাওয়া আজ সম্ভব হবে না।'

কথাগুলো একই সঙ্গে বিস্মিত এবং আনন্দিত করল আনন্দকে। নিজেদের
অক্ষমতার কথা সে কিভাবে ওয়াংদেকে বলবে তাই ভাবছিল, কিন্তু ওয়াংদে
সেটাই সহজ করে দিল। বরং সে একটু কৌতূহলী হবার ভান করে জিজ্ঞাসা
করল, 'কেন? মাত্র তো এক ঘন্টার পথ বলছ।'

কল্যাণ এই সময় বলল, 'অসম্ভব। ইম্পসিবল, আমার পক্ষে আর এক পা-ও
হাঁটা সম্ভব নয়। যদি যেতে চাস তো আমাকে ফেলে তোর। চলে যা।'

ওয়াংদে বলল, 'আর আধা ঘন্টার মধ্যে মনে হচ্ছে অন্ধকার নেমে আসবে
আজ সাহেবরা খুব খারাপ সময় পছন্দ করেছেন এখানে আসার জন্যে। তাও
যদি আমরা সকাল আটটার মধ্যে বের হতে পারতাম তাহলে এতক্ষণ পৌঁছে
যেতাম। তাছাড়া ওই সাহেব আজকে আর যেতে পারবেন না।'

'কোন সাহেব?' ওয়াংদের কথাটা ধরতে পারল না আনন্দ।

'যে সাহেব আমার সঙ্গে হাঁটছিলেন। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন। জোর
কপাল নইলে খাদে চলে যেত শরীর। পায়ের চোট লেগেছে। আমি এতক্ষণ
সাহেবের পা ম্যাসেজ করছিলাম।'

আনন্দ দেখল কল্যাণ এগিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার মধ্যে। সুদীপের খবরটায় যে
উদ্বেগ তৈরী হয়েছিল সেটা আচমকা খিঁটিয়ে গেল। জয়িতাও কল্যাণের
পেছনে হাঁটছিল। এতক্ষণ মনে হ'চ্ছিল আর চলা সম্ভব নয় অথচ খবরটা

শোনামাত্র শরীরের ক্লাস্তি চাপা পড়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জন্মিতা সতর্ক করার জন্যে বলল, 'কল্যাণ বাঁ দিক ঘোঁষে হাঁট।'।

কল্যাণ কি বলল বোঝা গেল না। কিন্তু জন্মিতা চিৎকার শুনতে পেল ওর। সুদীপের নাম ধরে তিনবার ডাকল কল্যাণ। অনেকগুলো সুদীপ ছড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে। সেটা মিলিয়ে গেলে সুদীপের গলা পাওয়া গেল। সেটা লক্ষ্য করে খানিকটা খাড়াই পথ ভাঙ্গার পর ওরা সুদীপকে দেখতে পেল। রাস্তার পাশে একটা পাথরে ছেলান দিয়ে বসে আছে। ওর দুটো পা সামনের দিকে ছড়ানো। কল্যাণ বাকি অংশটুকু কোন রকমে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'খাদটা কেমন দেখা হল না। পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু পড়লাম না।' সুদীপ হাসল।

'ইয়াকি রাখ তো। কোথায় লেগেছে তোর?' কল্যাণ ওর পাশে, হাটু মুড়ে বসল।

'গোড়ালিতে। সিরিয়াস কিছু নয়। ভাঙ্গলে তো মালুম হত।'

'তোকে আমি বিশ্বাস করি না। নিজেকে নিয়েও তুই ঠাট্টা করতে পারিস। উঠে দাঁড়া।'

'কেন?'

'আমি দেখতে চাই তোর পা কতটা জখম।'

'তুই দেখতে চাস? থ্যাঙ্কস। আমি বলছি তো গোড়ালিটাই একটু মচকেছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় আমি পা বের করতে পারব না। নো, নেভার।'

জন্মিতা ওদের কথা শুনছিল। কল্যাণের এই উত্তাপ ওকে চমৎকৃত করছিল। কোন কল্যাণ সত্য এইটেই অবশ্য তার মাথায় ঢুকছিল না। কল্যাণ তার এক হাতে ততক্ষণে সুদীপকে দাঁড় করিয়েছে। ডান পায়ের ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়েছে সুদীপ কল্যাণকে ধরে। বাঁ পা সে তুলে রেখেছে খানিকটা ওপরে। তারপর ধীরে ধীরে পায়ের পাতা মাটিতে রেখে চাপ দিল। ওর মুখের দিকে তাকান জন্মিতা অভিযেসে। চোখ এবং নাক ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গোড়ালি মাটিতে রাখতে গিয়েই সরিয়ে নিল সুদীপ। শব্দ করে হাসল, 'ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে। লিডার কোথায়?'

আনন্দ আর ওয়াংদে এসে পড়ল তখনই। আনন্দ সুদীপকে জিজ্ঞাসা করল, 'পড়লি কি করে?'

'পেছল ছিল, বুঝতে পারিনি। গোড়ালিটাকে একটু রেস্ট দেওয়া দরকার।' সুদীপ পায়ের পাতা নামাল।

'ব্যথা আছে?'

'চাপ দিলে লাগছে।'

আনন্দ ওয়াংদেকে বলল, 'কি করা যায়। আমাদের এখানেই থাকতে হবে। তা'বু কোথায় টাঙাবে?' ওয়াংদে মুখ ঘুরিয়ে যেন পাহাড়টাকে জরিপ করল। তারপর বোঝাগুলো নামিয়ে দ্রুতপায়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

জয়িতা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে তা'বু ফেলে থাকা যাবে? রাতে তো আরও ঠাণ্ডা বাড়বে।'

সুদীপ হাসল, 'লাস্ট নাইট টুগেদার।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এনিওয়ে আমি চাইছিলাম না ফালুটের পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে থাকতে। ওখানেও আমাদের টেন্ট ফেলতেই হত। আর সেটা ওয়াংদের কাছে স্বজিৎপূর্ণ বলে নিশ্চয়ই মনে হত না। সুদীপের পায়ে চোট না লাগলেও এখানে থাকার জন্যে ওয়াংদেকে বলতেই হত।'

ঠিক তখনই ওয়াংদে ফিরে এল প্রসন্ন মুখে। এসে জানাল পাশেই একটা চমৎকার থাকার ব্যবস্থা আছে। সাহেবরা খীরে খীরে উঠে গেলে সে মালপত্র নিয়ে যাবে। সকাল থেকে হাঁটার পথে ওরা দুটো গ্রামের পাশ কাটিয়ে এসেছে বটে কিন্তু এই নির্জন জায়গায় মনুষ্যবসতি আছে বলে কল্পনা করা যায় না। খবরটা কল্যাণকে খুশী করল। আর জয়িতা লক্ষ্য করল প্রাথমিক যে উত্তেজনা এবং উত্তেজিত কল্যাণকে সুদীপের কাছে ছুটিয়ে এনেছিল সেটা কেটে যাওয়ার পরও আবার আগের মত শীতল হয়ে গিয়েছে সুদীপ সম্পর্কে।

জয়িতার কাঁধে হাত রেখে সুদীপ ওদের পেছন পেছন হাঁটছিল একটা পা আধঝুনিয়ে। শুধু আঙ্গুলের ডগায় যতটা ভার রাখা যায়। এতে ওর কণ্ঠ হচ্ছিল বেশ, গতিও কমে যাচ্ছিল। হঠাৎ সুদীপ বলল, 'তুই কাছে আসার পর যেন শরীরটা চাঙ্গা হয়ে গেল।'

'মানে?' সুদীপের ভর রাখার জন্যেই জয়িতা তাকে প্রায় জড়িয়ে চলছিল। 'মানুষের শরীরের উত্তাপ বোধ হয় সবার সেরা। তোর মনে হচ্ছে না!'

সুদীপের এই প্রশ্নটার কোন উত্তর দিতে পারল না জয়িতা। হঠাৎ ওর মনে হল এই মুহূর্তেও সে সুদীপের কাছে একটি মানুষমাত্র। মানুষী নয়। এবং কি আশ্চর্য, সে নিজেরও তো মোটেই উত্তপ্ত হচ্ছে না।

ঠিক ওহা বলা চলে না, পাহাড়ের শরীরের কিছুটা অংশ ভেতরে ঢুকে থাকায় মাথার ওপর বেশ ছাদ হয়ে আছে, দুপাশে চমৎকার দেওয়াল। ওয়াংদে এটাকে আবিষ্কার করেছিল এর আগেই। অন্য শেরপাদের মুখ থেকে খবর পেয়ে আরও একবার সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচবার জন্যে কয়েকজন ট্রেকারকে এখানে নিয়ে এসেছিল। মাথার ওপর জল পড়বে না, তিনদিক থেকে হু হু হাওয়া ছোবল মারবে না, এরকম জায়গায় এর চেয়ে আর কি কাম্য হতে পারে? শেষ পনের ফুট উঠতে সুদীপের কণ্ঠ হয়েছে বেশ। ওয়াংদেও হাত লাগিয়েছিল।

দিনের আলো নিবে গেছে বেশ কিছুটা আগেই। এর মধ্যে কিছুটা কায়দা করা

হয়েছে বলে আনা তাঁবুদুটো দিয়ে। একটাতে পাথরের ওপর বিছিয়ে বসেছে ওরা গা ছড়িয়ে। অন্যটা দিয়ে আনন্দ আর ওয়াংদে অনেক চেষ্টার পর সামনের খোলা দিকটা ঢাকতে পেরেছে। এখনও হাওয়া ওই দিক দিয়ে বইছে না, তেমন জোর বইলে ওটা কতরূপ থাকবে বলা মুশকিল। কিন্তু এর ফলেই জায়গাটা বেশ ঘর ঘর হয়ে গিয়েছে। একটা সঁায়াতসেতে গন্ধ থাকলেও খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ানোর চাইতে হাজারগুণ ভাল।

সমস্ত পাহাড় জুড়ে গাছ আছে, সুতরাং কাঠের অভাব নেই। কিন্তু ভিজে ভিজে সেই কাঠ আঙনকে আর তোয়াক্কা করছে না। আনন্দ তাদের আস্তানার বাইরে দাঁড়িয়ে ওয়াংদের উদ্যম লক্ষ্য করছিল। অনেক চেষ্টার পর বেচারী কিছু কাঠ থেকে ধোঁয়া বের করতে পেরেছে মাত্র। কিন্তু দুপাশে দুটো পাথর রেখে সে অন্য কেটে আনা কাঠগুলোকে সেকে নিচ্ছে যেমন করে এখনও শিকাবাব বানায়। সেই প্রবচন, যেখানেই ধোঁয়া সেখানেই আঙন এক্ষেত্রে সত্যি কিনা সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু লোকটার উদ্যম দেখে সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছিল আনন্দ। এতটা পথ হেঁটে এসেছে বোঝা কাঁধে চাপিয়ে, সবচেয়ে পরিশ্রান্ত হবার কথা ওরই। অথচ সামান্য ক'টা টাকার জন্যে এখনও যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে বিন্দু মাত্র আলস্য নেই।

‘কি তাড়াতাড়ি রাত হয়ে গেল, না?’

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে দেখল জয়িতা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটা এমনতেই রোগা, যেন আরও রোগা দেখাচ্ছে। অত গরম জামাকাপড়েও সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। আনন্দ ওর কাঁধে হাত রাখল, ‘তোমর খুব কষ্ট হচ্ছে, না? আসলে, আমরা তো এই রকম পরিবেশে ঠিক অভ্যস্ত নই, তাই।’

‘অভ্যস্ত হয়ে যাব ঠিক। ওয়াংদে কাঠ সেকছে এখন?’

‘গোটা রাত পড়ে আছে সামনে। ভেতরে কিরকম ঠাণ্ডা এখন?’

‘একই রকম। শুধু হাওয়াটাই নেই!’ জয়িতা উত্তর দিয়ে চারপাশে তাকাল। শুধু কাঠ জ্বালানোর ছাড়া কোন শব্দ নেই। এমন নিস্তব্ধ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভয় করে। জয়িতার মনে হচ্ছিল বড় রকমের কিছু হবে বলেই এখন এই খম ধরা ভাব।

ওরা ভেতরে চলে এল। মোমবাতিটা স্থির হয়ে জ্বলছে পাথরের ওপরে। আর তাকে ঘিরে কিলবিল করছে অদ্ভুত সব পোকা। বোধহয় জীবনে প্রথমবার আলো দেখে বেরিয়ে এসেছে ফাটল থেকে। কল্যাণ তার বিছানায় সোঁদিয়ে পড়েছিল চুপচাপ। সুদীপ জুতো খুলে ফেলেছে। খুব সন্তর্পণে মোজা খোলার চেষ্টা করছিল, জয়িতা এগিয়ে গেল, ‘তুই থাম, আমি খুলছি।’

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল পা এগিয়ে দিয়ে, ‘সেবা পেতে আমার কোন আপত্তি নেই। কখনও পাইনি তো, তবে দেখিস খগেনবাবুর ছেলে করে দিস না।’

‘খগেনবাবুর ছেলে?’ জয়িতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করতেই কল্যাণ সশব্দে হেসে

উঠল। সেটা সংক্রামিত হল আনন্দতেও। জন্মিতা খেপে গিয়ে বলল, 'তুই আগে রহস্যটা পরিষ্কার কর না হলে আমি হাত দেব না।'

কল্যাণ বলল, 'ওঃ মাঝে মাঝে সুদীপটা—। শোন, লোক বলে বাপের নাম খগেন করে দিস না। আর ও বলল, খগেনবাবুর ছেলে করে দিস না। অর্থাৎ এমন ব্যথা দিস না যা ওকে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। কথাটা অন্যভাবে শুনলাম বলে হাসি পেল।'

'বাট হোয়াই খগেনবাবু? তার নামটা কেন ব্যবহার করা হয়।' জন্মিতা তাঁট কানড়ান।

'তা আমি জানি না ভাই। চিরকাল শুনে এসেছি ওই নাম। হয়তো লোকটা খুব গবেট ছিল।'

সুদীপ বলল, 'কিংবা অত্যন্ত শয়তান।'

জন্মিতা মাথা নাড়ল, 'এটা কোন জোকই নয় যে এমন হাসতে হবে। আর তুই তো তোর বাবার নাম ভুলতেই চাইছিলি সুদীপ। বেশ ফুলেছে।'

শেষ দুটো শব্দ জন্মিতা বলেছিল মোজা সরিয়ে। কিন্তু তার আগের কথাগুলো সুদীপকে মোটেই আহত করল না। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে উঠে বসে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দূর! কিছুই হয়নি। আমরা তো ব্যাণ্ডেজ এনেছি।'

আনন্দ চটপট ওদের ওষুদের বাক্সটা খুলে ওপর থেকে ব্যাণ্ডেজ তুলে ছুঁড়ে দিল জন্মিতাকে। মতটা সম্ভব ভালর কাছাকাছি ব্যাণ্ডেজ বাঁধল জন্মিতা। আর তখনই তাঁবুর একটা দিক সম্ভরণে সরিয়ে আশুন হাতে ঢুকল ওয়াংদের। এর মধ্যেই সে কার্ঠে আশুন ধরাত পেরেছে। আশুনার মুখের দিকে একটা ধার ঘেঁষে তিনটে ছোট পাথরের খাঁজে সে জলন্ত কাঠ রেখে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর আবার বেরিয়ে পেল বাইরে।

এখন বেশ আলো হয়ে গেছে ভেতরে। জন্মিতা কার্ঠের কাছে এসে উবু হয়ে বসল। আনন্দ চাপা গম্ভায় বলল, 'এই লোকটা এত করছে অথচ ওকে তো কালই কাটাতে হবে। কি বলে কাটাই সেটাই এখন ভাবতে হবে।'

কল্যাণ বলল, 'কেন? কাটাৰি কেন? ও না থাকলে এখানে আমরা মরে যাব।'

আনন্দ গম্ভীর মুখে বলল, 'ও থাকলেই আমাদের মরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।'

কল্যাণ জন্মিতার দিকে তাকাল। জন্মিতা আনন্দকে বোঝার চেষ্টা করছিল। আনন্দ হাসল, 'কথাটা বোধহয় খুব উল্টো শোনাচ্ছে কিন্তু ভেবে দ্যাখ ওয়াংদেরকে না কাটাঙ্গে আমরা এখান থেকে যেতে পারব না। ও যাদের সঙ্গে সঙ্গে আসে তারা সবাই বেরিয়ে আবার মানেভঞ্জে ফিরে যায়। চারজন বাঙালি পাণ্ডববজিত জায়গায় থেকে যেতে চাইছে—ব্যাপারটা ওয়াংদের মাথায় কিছুতেই চুকবে না। সেটা খুব স্বাভাবিকও। ফলে ও ফিরে গিয়ে গল্পটাকে

ছড়িয়ে দেবে দাজিলিং পর্যন্ত। বাস আর দেখতে হবে না। এখানে আমরা একসঙ্গে প্রকৃতি আর পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে পারব না।’
কল্যাণ চুপচাপ গুনছিল, ‘তাহলে?’

আনন্দ বলল, ‘ওয়াংদেকে ভুল বুঝিয়ে কাটাতে হবে। কিভাবে কাটাবো সেটাই—।’

‘আগে ভেবে আসা উচিত ছিল। আমার মনে হচ্ছে ভুল জায়গায় এসেছি।’
কল্যাণ বলল।

‘মোটাই নয়। ম্যাপ বলছে আর কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে গেলেই নেপাল বর্ডার। বর্ডার পার হলেই গ্রাম। সেখানে ভারতীয় পুলিশের কোন এন্টিস্মার নেই। আর পুলিশ বলতে তো ওই ফালুটের ক্যাম্পের কয়েকজন। আমরা যদি আরও ভেতরে ঢুকে যাই তা হলে ভারতীয় পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যাব। অতএব জায়গা নির্বাচনে ভুল করিনি।’ আনন্দ প্রতিবাদ করল। ঠিক তখন আবার ওয়াংদে চুকল ভেতরে। ওর হাতে চায়ের মগ। প্রত্যেকের হাতে সেগুলো ধরিয়ে দিয়ে সে আবার ফিরে গেল।

সুদীপ চুপচাপ গুনছিল পা ছড়িয়ে। চায়ের মগ হাতে নিয়ে বলল, ‘আর একেই বলে আরাম।’

জয়িতার মাথায় কিছুক্ষণ থেকেই একটা মতলব ঘুরছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে সে বলল, ‘দুটো ব্যাপার করা যেতে পারে। কাল সকালে উঠে ওয়াংদের সঙ্গে একটা ঝগড়া এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে যাতে ও নিজেই রেগেমেগে আমাদের ছেড়ে চলে যায়।’

সুদীপ বলল, ‘খুব সহজ হবে না। ও যদি কল্যাণ হতো, তাই করতো। কিন্তু যার মুখে হাসি খোদাই করা আছে সে ঝগড়া করলেও হাসবে।’

কল্যাণ এবার আনন্দের দিকে তাকাল, ‘গুনলি? এর মধ্যে আমি আসছি কি করে?’ আনন্দ সত্যিই বিরক্ত গলায় বলল, ‘আঃ সুদীপ। হ্যাঁ, জয়িতা, তোর দ্বিতীয় ব্যাপারটা কি?’

জয়িতা কাঁধ নাচাল, ‘সোজা ব্যাপার। আমরা ওয়াংদেকে বলব ফালুট যাওয়ার আগে একটা নেপালি গ্রাম দেখতে চাই। ওটা যদি ওর রুটের বাইরে হয় তা হলে চাইলে এক্সট্রা টাকা দেব। ও থাকলে সুবিধে এই যে পথ চিনতে সহজ হবে। বর্ডার পার হয়ে আমরা ওকে স্পষ্ট জানিয়ে দেব। ও ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। পুলিশ তো ওখানে পৌঁছাতে পারবে না।’

কল্যাণ বলল, ‘চমৎকার। এটাই খুব ভাল প্ল্যান।’

আনন্দ ঠিক বুঝতে পারছিল না। সে বলল, ‘পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে ওয়াংদে কিভাবে রি-অ্যাঙ্ক করে তার ওপরে। পুলিশ হয় তো ওখানে যেতে পারবে না আইনত কিন্তু আমরা তো আর কলকাতায় ফিরতে পারব না। ওরা তো সবসময় লক্ষ্য রাখবে আমরা কখন ফিরি। রাস্তা তো একটাই।’

চা হয়েছিল বাইরে, কিন্তু এবার ওয়াংদে ভেতরে উনুন জ্বালানো। আজকের মেনুও খিচুড়ি। বোধহয় ওয়াংদে খিচুড়ি বানাতে স্পেশালিস্ট। তাঁগার দাঁত আরও ষারালো হচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠে আসছে রাজ্যের পোকামাকড়। মোমবাতিটা ছোট হয়ে এলেও কাঠের আগুনের আলো আছে পর্যাপ্ত। আনন্দ ঘড়ি দেখল। কলকাতায় এখন সন্ধ্যা হব হব অথচ এখানে মনে হচ্ছে মধ্যরাত। ওয়াংদে চাপা সুরে গান শুরু করল। নেপালি শব্দ কিন্তু সুরে হিন্দী ফিল্মের অবদান আছে। জয়িতা ওর পাশে বসে বলল, 'তুমি তো খুব সুন্দর গান করো।' সঙ্গে সঙ্গে ওয়াংদে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল, 'মিঠো মিঠো ইয়াদ কিসকো, ঘড়ি ঘড়ি দিনমে আয়ো, ইন্দানীকো ইয়ো রাত মা—।' গেয়েই আচমকা চুপ করে হাসতে লাগল। আর তখনই দূরে কোথাও সেই জান্তব ডাকটা শুরু হল। গতরাত্রি ওরা এই ডাক শুনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান ওয়াংদে। তার মুখ চোখ উত্তেজিত। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে সে পাঁজা করে কাঠ এনে ফেলতে লাগল ভেতরে। জিনিসপত্র যা ছিল সব নিয়ে এল এক এক করে।

আনন্দ ওর উত্তেজনা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

ওয়াংদে বলল, 'ওদের ধমক দিলে ভয় পায় ঠিকই কিন্তু কেউ কেউ তো না-ও পেতে পারে। মুশকিল হল, সারারাত জেগে বসে থাকতে হবে। ওরা দিন না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না। আগুন জ্বলে রাখতে হবে সারারাত।' কল্যাণ জানতে চাইল জন্তুলো মানুষ খায় কিনা?

ওয়াংদে বলল, 'যে কোন জন্তুর চেয়ে মানুষের মাংসই তো সবচেয়ে খেতে ভাল।'

ডাকগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ওয়াংদে তাঁবু দিয়ে তৈরী দরজার দুপাশে কাঠ জ্বালল। এই আগুন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ওদের সাহস হবে না। লোকটা সকাল বেলায় খুব তাচ্ছিল্য করেছিল বটে কিন্তু এখন মোটেই তা মনে হচ্ছে না।

খিচুড়ি ফুটছে। তার গন্ধেই আরাম এবং ঘুম আসছিল। আর সেসব ছাপিয়ে আচমকা ভয় ওদের গ্রাস করল। ডাকটা এবার খুব কাছাকাছি। হয় তো মুখ বার করলেই মুখোমুখি হতে হবে।

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ওয়াংদে, ওদের সংখ্যা কত?'

ওয়াংদে বলল, 'এক ডজন, দুই ডজনও হতে পারে।'

ওরা তিক করল ভয় পাওয়া নয়, ভয় দেখাতে হবে। সুদীপ উঠতে চাইছিল কিন্তু আনন্দ বাধা দিল। রিভালভারটা তিক করে ও জয়িতাকে বলল টর্চ দিতে।

তাঁবুর একটা পাশ সরিয়ে আনন্দ মাথা বের করতেই জন্তুলোকে দেখতে পেল। বাইরে ওয়াংদে যে আগুন জ্বলেছিল তা নিবিয়ে আসেনি। যদিও তেজ নেই বললেই চলে তবু তারই আলোয় ওদের দেখা যাচ্ছিল। বেশ কিছুটা

তফাতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে বসে আছে বেশ কয়েকটা। ওদের দেখতে নেকড়ে মত কিন্তু আরও বীভৎস চেহারা। আনন্দকে দেখে যেটা উঠে দাঁড়ান আর দাঁতগুলো ওই আধা-অন্ধকারেও চকচক করছে। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ শুরু হল। যেন সামনেই শিকার দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়েছে ওরা। আনন্দ একেবারে সামনেরটাকে লক্ষ্য করে ট্রি গার টিপল। টপ করে জম্বুটা পড়ে গেল মাটিতে। আর শব্দটা হাজার গুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে। চকিতে আর যারা ছিল তারা উধাও হয়ে গেল অন্ধকারে। জয়িতা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘আলো জ্বালবো?’

আনন্দ বলল, ‘না থাক। মনে হচ্ছে ধারে কাছে নেই।’

তাবুটাকে আবার তিকঠাক করে ওরা ভিতরে আসতেই কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, ‘দেখলি?’

আনন্দ বলল, ‘হ্যাঁ। মনে হচ্ছে নেকড়ে। বিগ সাইজ। একটা মরছে। কিছুক্ষণ বিরক্ত করার সাহস পাবে না। আমাদের একসঙ্গে ঘুমালে চলবে না। ঘন্টা তিনেক সবাইকে পাহারা দিতে হবে। জয়িতা সুদীপ আমি কল্যাণ। ঠিক আছে।’

হঠাৎ প্রত্যেকের নজরে পড়ল ওয়াংদে আতঙ্কিত চোখে আনন্দের রিভালভারের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখে হাসি নেই। চোখাচোখি হতে মুখ নামিয়ে নিল ওয়াংদে। ওরাও এ নিম্নে আর কথা বলল না। বোবাই যাচ্ছিল জম্বুটাকে মারা ওয়াংদে পছন্দ করেনি।

ভোরবেলায় পাহারায় ছিল কল্যাণ। আনন্দ যখন ওকে উঠিয়ে শুতে যায় তখন বাইরে একমাত্র বাতাসের ছাড়া কোন শব্দ নেই। কাঠের আগুন নিবে এসেছিল। কিন্তু কাঠকয়লার দপদপানি উত্তাপ ছুঁচ্ছে। ঠিক তার পাশেই গুয়েছিল ওয়াংদে। বাঁ হাতে রিভালভার ধরে বসে বসে চুলছিল কল্যাণ। হঠাৎ তাকিয়ে দেখল ওয়াংদে নেই। সে চারপাশে চোখ বোলাল। প্রথমে ভাবল ওয়াংদে হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছে। প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষা করার পর সে উঠল। ধীরে ধীরে তাবুর মুখ সরিয়ে দেখল অন্ধকার পাতলা হয়ে গিয়েছে। ওয়াংদের কোন চিহ্ন নেই। রিভালভার রেখে সে টচ জ্বালালো। কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই এমন কি আনন্দ যে জম্বুটাকে মেরেছিল তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ নার্ভাস হয়ে সে সঙ্গীদের ঘুম ভাঙ্গাল।

জয়িতাই আবিষ্কার করল ওয়াংদে চুপচাপ চলে গিয়েছে। কারণ তার সঙ্গে যে পুঁটুলিটা এনেছিল সেটা নেই। ওরা ভেবে পাচ্ছিল না লোকটা কেন না বলে চলে গেল। গতরাত্রে আনন্দ গুলি করার পর থেকে লোকটা একটাও কথা বলেনি। খিটুড়ি রান্না করে সবাইকে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়েছিল। ওরা অনুমান করেছিল জম্বুটাকে গুলি করার সঙ্গে ওর এই মন খারাপ জড়িয়ে

আছে। কিন্তু এই কারণেই যে না বলে চলে যাবে তা অনুমানে ছিল না। আলো ফুটলে আনন্দ আর জয়িতা তাঁবু সরিয়ে বেরিয়ে এল। সারা রাতের জেমা হিম এখন সর্বত্র। যেখানে জন্তুটা পড়েছিল সেখানে এখনও চাপ রক্ত। আর একটু এগোতে খানিকটা রক্তমাখা হাড় দেখতে পেল ওরা, অর্থাৎ মৃত সঙ্গীকে সাবাড় করেছে ওরা। জয়িতা কয়েকবার ওয়াংদে নাম ধরে ডাকল। লোকটা কি মানেভঞ্জে ফিরে যাবে একা একা শুধু জন্তুটাকে মারা হয়েছে এই অপরাধে। তারপরেই মনে হল ও তো ফালুটেও যেতে পারে। এই রাস্তায় কেউ বন্দুক নিয়ে আসে না। ওদের চালচলন দেখে কি সন্দেহ হয়েছে ওয়াংদের? ও কি ফালুটের পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়েছে খবর দিতে? মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা তৈরী হয়ে নিল। সুদীপের পায়ের ফোলা এখন কম। ভাঙ্গেনি তাতে সে নিশ্চিত। ব্যাণ্ডেজ বাধা অবস্থায় জুতোয় পা ঢোকানো সম্ভব হলে দেখা গেল সে গোড়ালি উঁচু করে চলতে পারছে। ওয়াংদে যে মাল বইছিল তা যতটা পারে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল ওরা। আপাতত যেটা অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে তা ফেলে যেতে হল। জয়িতা লক্ষ্য করল কল্যাণ তার ডান হাত কাজে লাগাচ্ছে। এখন যেন প্লাস্টারটাই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘন্টাখানেক হাঁটার পর ওরা দূরে কিছু বসতি দেখতে পেল। ওটাই যে ফালুট তাতে সন্দেহ নেই। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। ওরা আর একটু এগোতেই বাঁ দিকে একটা পায়ের চলা পথ পেয়ে গেল। ফালুটকে এড়াতে ওরা সে পথ ধরল। বোঝা পিঠে নিয়ে ওদের হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল। রাস্তাটা সরু এবং পাহাড়ের শরীর ঘুরে ঘুরে এগিয়েছে। সুদীপ বারে বারে পিছিয়ে পড়ছিল। প্রায় ঘন্টা তিনেক যাওয়ার পর যখন আবার কুয়াশা নেমে এল হ হ করে তখন ওরা একটা কাতরানি শুনতে পেল। পথের পাশের একটা পাথরের আড়ানে লোকটা শুয়ে আছে। বেশ বয়স্ক নেহাতি দেপালি কিংবা হোপচা। ওদের দেখে অবাক হয়ে তাকাল।

আনন্দ তাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

লোকটা উত্তর দিতে পারল না। শুধু ইঙ্গিতে দূরের পাহাড় দেখাল। জয়িতা আবিষ্কার করল লোকটার শরীর বেজায় গরম। অর্থাৎ জ্বর ওকে কাবু করেছে এবং একটি বিশাল গলগণ্ড রয়েছে ওর। ওরা দুজনে কোনমতে লোকটাকে তুলে ধরল। এই সকালে লোকটা এখানে কি করে এল বুঝতে পারছিল না ওরা। লোকটা ওদের কোন কথাই বুঝতে পারছে না মনে হল। কিন্তু আনন্দ আর জয়িতা যখন ওর দুটো হাত কাঁধে নিয়ে হাঁটা শুরু করল তখন ও যেন কৃতজ্ঞ হল। বারবার সামনের দিকে পথ নির্দেশ করতে লাগল উদ্ভেজিত হয়ে।

সুদীপ যেন নিজের মনে বলল, 'ওর না আমাদের, কপালটা কার ভাল বুঝতে পারছি না।'

মাঝ রাতের পর আকাশে যদি কালো মেঘ না জমে, যদি হাওয়ারা ঝাঁটিয়ে নিলে যায় ভারী কুয়াশাদের তাহলে রাত ফুরোবার আগেই আলোর নাটক শুরু হয়ে যায় সামনে। তাপল্যাঙ যেন প্রসারিত হাতের তালুর মত। মাইলের ব্যবধান আছে কিন্তু সেই আলো বিপ্রান্তি আনে দূরত্ব সম্পর্কে। প্রথমে কালোয় নীলে মিশেল আকাশটার বুক ফুটে ওঠে একটা আলোর বিন্দু। সেখানে নজর যেতে না যেতে তার রঙ হয় টকটকে লাল। এক চোখো ডাইনীর মত খানিক স্থির থেকে হঠাৎ সেটা সঙ্গী তৈরী করে নেয় বেশ কিছুটা দূরে। তারপর দুই থেকে তিন এমনি করে সংখ্যা বাড়ে। আর সেইসঙ্গে রঙের চেহারা বদলে যায়। লাল ক্রমশ হালকা হতে শুরু করে। তখনও অন্ধকারের পর্দাটা টাঙানো। যা ছিল বিন্দুতে সীমাবদ্ধ তা গড়িয়ে পড়ে তালুতে। লাল, পাতলা নীল এক সময় কাঁচা সোনায় পরিণত হয়। সেই মুহূর্তে অন্ধকার উখাও। একশ আশি ডিগ্রিতে সূর্যদেব প্রকাশিত হবার মুহূর্তে বিন্দুগুলো এক একটা চুড়ো হয়ে যায়। মাকালু, এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নেৎসে, নুপটসে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অহংকার প্রায় পাশাপাশি উদ্ধত অথচ সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিকে তাকালে মায়ালুরা পর্যন্ত পরস্পরের অস্তিত্ব ভুলে যায়। চুড়োর বরফগুলো তাদের চেহারা পাণ্টে ফেলে খুব অল্প সময়ে। যেন এক রঙে বেশীক্ষণ সাজা ওদের ধাতে নেই। বিয়ের কনের সাজ খুলে ফেলে ক্রমশ সাদাটে চাদর ওদের গায়ে জড়িয়ে নেয়। রোদ ওঠে আর তারই সঙ্গে ধৈর্য আসে কুয়াশারা এবং সাদা মেঘ। ওই চুড়োর গায়ে লেগে না থাকলে যারা নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। ক্রমশ এই মেঘদের আড়ালে আবড়ালে হঠাৎ উঁকি মারা ছাড়া মাকালু এভারেস্টের আর কিছু করার থাকে না। সঙ্গী হয় অন্য চুড়াগুলোও। পৃথিবীর দৃষ্টিতে কতটা কু আছে তা ঈশ্বর জানেন, মেঘগুলো যেন সব সময় ওদের আড়ালে রাখতে ব্যস্ত থাকে।

ফালুট থেকে চ্যাঙথাপু মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। ভারত বর্ষের সীমা পেরিয়ে এইটেই নেপালের প্রথম গ্রাম। ম্যাপ একথা বলছে বটে কিন্তু দুই সরকারের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ সেখানে নেই। যা কিছু ভারতীয় তা যেন ফালুটেই শেষ হয়ে গেছে। আর তিন কিলোমিটার বলতে যে স্বল্প দূরত্ব মনে আসে সেটা অতিক্রম করার সময় শরীরের কণ্ঠে তিরিশ মনে হওয়া বিচিত্র নয়। যারা অভ্যস্ত তাদের ক্ষমতা ধর্তব্যে আনা হচ্ছে না। চ্যাঙথাপু থেকে আরও সাড়ে ছয় কিলোমিটার উত্তরে ওয়ালান্গ চাঙ। ওয়ালান্গ চাঙে বাবে বলেই ওরা পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা পৌঁছে গেল তাপল্যাঙে। যে গ্রামে বিদেশী এসেছিল কবে কেউ সঠিক মনে করতে পারে না। হিমালয়ের ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া আর তাপল্যাঙে দাঁড়ানো এক ব্যাপার। সান্দাকফু থেকে যে সূর্যোদয় দেখা তাতে সব আছে কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দেখলে যেন

হিমালয়ের নিঃশ্বাস ঘাড়ে এসে লাগে। ওরা যখন এখানে পৌঁছেছিল তখন বরফ ছিল না। বছরের তিনমাস এখানকার মাটিতে হাওয়া, কপাল থাকলে রোদ লাগে। সেই তিনমাসে রডোডেনড্রন আর ক্যালেনিয়া নিচ থেকে তের হাজার ফুট ওপরে ফুলের উৎসব বসায়। ডুগুডুগু আর গুন্ডুক শাকের চাষ শুরু হয় যতটা সম্ভব বেশী পরিমাণে। গুন্ডুক রোদে শুকিয়ে রাখা হয় নাকি নয় মাসের জন্যে। যা কিছু চাষাবাদ তা তো এই সময়েই সেরে নিতে হবে। তাপল্যাণ্ড এবং একই চরিত্রের গ্রামগুলোর মানুষ তাই খেটে নেয় এই তিনমাসে। প্রসারিত হাতের তালুর মত এই গ্রামের জমিতে চাষের মাটি বড় কম। অরূপণ প্রকৃতির শক্ত মুঠো খুলে খুলে পরিবারভিত্তিক যে স্বল্প জমি তাই বারো মাসের খিদে মেটায়। গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছে কিছু জঙ্গল। আর তারপরেই তুম্বারের পাকাপাকি চাতাল যার শেষ কোথায কেউ জানে না এখানে। তিন মাসের প্রায় শেষ পর্বে ওরা এসে হাজির হয়েছিল এখানে।

ওয়াল্যাং চাঙে আসতে গেলে চ্যাওথাপু ডিপোতেই হয়। সেটাই নিয়ম। কিন্তু পাহাড় যেমন পথ দেয় পথ কেড়েও নেয়। মানুষটির হাশ আসছিল আর মাগিছিল। খুব দ্রুত এগিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ আনন্দর মনে ওয়াংদে সম্পর্কে ভীতি ছিল। লোকটা যে বিশ্বস্ত তা না ভাবার কোন কারণ নেই। অথচ চুপচাপ ভোরের অন্ধকারে যেভাবে মিলিয়ে গেল তার সঙ্গে ওর চরিত্র মিলছে না। গতরাত্রে জন্তুগুলোকে গুলি করে মারা ওর কোন কারণে পছন্দ হয়নি। এখানে যারা বেড়াতে আসে তারা সঙ্গে বন্দুক আনেও না। আনন্দর অস্পষ্ট ধারণা এই দুটাই ওকে ভীত করেছে। হয়তো জন্তুটাকে মেরে ওর কোন সংস্কারে আঘাত দেওয়া হয়েছে। আর এই পরিণতিতে যদি ওয়াংদে ফালুটের পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে জানায় বন্দুকধারীরা এই অঞ্চলে এসেছে তাহলে একটা কৌতূহল তৈরি হবেই। অতএব যতটা দ্রুত এই অঞ্চল ছাড়ানো যায় তত মঙ্গল কিন্তু এই অসুস্থ মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে কত দ্রুত চলা সম্ভব। ওরা চাইছিল যে কোন একটা লোকালয়ে পৌঁছে যেতে। সুদীপের পক্ষে বেশীক্ষণ একনাগারে হাঁটাটাও বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ঠিক তখনই উঠে আসতে লাগল কুয়াশারাসোঁ সোঁ করে। হিমালয়ের খাদগুলোর রহস্য নিয়ে ওরা সমস্ত পৃথিবী আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনহাত দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এরমধ্যে জয়িতা একবার হেঁচট খেল। আনন্দর প্রথমে মনে হয়েছিল আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত ওদের অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু ওয়াংদের আতঙ্কটা যেহেতু তাড়া করে আসছিল তাই সে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটাই নিয়েছিল। আর এই করতে গিয়েই ওরা পথ ভুল করল। লোকটা হাঁটছে ঘোরের মধ্যে। আনন্দ তাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছিল গ্রামের পথ কোন্ দিকে? সে কথা বুঝে কিংবা না বুঝে ঘাড় নেড়েছিল। বিড়বিড় করে কিছু বলেও ছিল।

এবং এই করতে গিয়ে ওরা একসময় চ্যাওথাপুর পথ ছেড়ে আরও ডান দিকে সরে এসেছিল। পথ বলে এতক্ষণ যেটাকে মনে হচ্ছিল সেটা ইয়াকের যাওয়া আসায় পথ তা ওদের বোঝা সম্ভব হয়নি। প্রায় ঘন্টা তিনেক যাওয়ার পর প্রথম জয়িতা বসে পড়ল। এই সময় ওদের অনেকটা উঁচুতে উঠতে হয়েছে। পিঠের বোঝা, হাতের ওজন এবং এই লোকটিকে প্রায় টেনে আনার খবল ওদের প্রাণ ছিবড়ে করে ফেলেছিল। তখনও চোখের সামনে মানুষের বসতির চিহ্ন নেই। খাড়া পাহাড়, পায়ের তলায় স্যাঁতসেঁতে পাথুরে জমি আর লেডি স্লিপার এবং কুইন জিকটোরিয়ার সমারোহ যা এখনও ঘোলাটে কুয়াশায় ওড়না জড়িয়ে রয়েছে—এছাড়া আর কোন কিছু চোখে পড়ছে না।

আনন্দ ততক্ষণে জ্বলটা ধরতে পেরেছিল। কিন্তু কিভাবে সেটা সংশোধন করা যায় তা তার জানা ছিল না। চ্যাওথাপু পৌঁছাতে এত সময় লাগার কথা নয়। তিন কিলোমিটার পথ যত ধীরেই তারা আসুক আসা যাওয়ার পথ যখন একটা রয়েছে তখন মানুষের অস্তিত্বের কিছু নমুনা তো পাওয়া যাবেই। রাস্তা যত খাড়াই হোক সেসব কিছুই নজরে আসছে না। লোকটা এখন উবু হয়ে বসে আছে। কল্যাণ তাকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করছে তার গ্রাম কোথায়? লোকটা মাঝে মাঝে চোখ খুলছে আর সেটা বন্ধ করছে। কোন কথা বলার ইচ্ছে বা শক্তি তার নেই। কল্যাণ উঠে দাঁড়াল। আনন্দের কাছে এগিয়ে বসল, 'এ ব্যাটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না! অনেক মানবতা এতক্ষণ দেখিয়েছি, আর নয়। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'চ্যাওথাপু। তিন কিলোমিটার রাস্তা।' আনন্দ ওর পথ হারাবার আশঙ্কাটা বলতে গিয়েও পারল না। ইচ্ছে শক্তির শেষটুকু নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। খারাপ কথা শোনানোর কোন মানে হয় না। বরং পথ খুঁজতে হবে।

কল্যাণ বলল, 'তিন? মনে হচ্ছে তিনশো কিলোমিটার হেঁটেছি।'

সুদীপ মন্তব্য করল, 'পাহাড়ে গুনেছি এইরকম মনে হয়।'

পড়ে যাওয়ার পর জয়িতা চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। সে এবার বলল, 'আমার মনে হয় দুজন যদি এগিয়ে গিয়ে দ্যাখে কাছাকাছি মানুষ আছে কি না তাহলে ভাল হয়। এই মালপত্র নিয়ে আর হাঁটতে পারছি না। তাছাড়া ওই লোকটাও আর পারবে কত মনে হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ একমত হল, 'জয়িতা ঠিকই বলেছে। এখানে এই পাহাড়ের আড়ালে ওরা তিনজন অপেক্ষা করুক। আনন্দ চল আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখি।'

আনন্দেরও মনে হয়েছিল প্রস্রাবটা ভাল। কিন্তু কল্যাণ আচমকা এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠল কিভাবে তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত ওদের বিশ্রাম করতে দিলে সে কল্যাণকে নিয়ে এগোল। খানিকটা হেঁটে কল্যাণ বলল, 'এত ওপরে উঠেছি তবু পায়ের তলায় বরফ দেখছি না কেন বলতো? অথচ সাম্প্রদায়িক কাল সন্ধ্যাবেলায় বরফ পড়েছিল।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ওগুলো বরফ নয়। বৃষ্টির পরে পাতলা তুষার পড়েছিল। এখানে এখন আর বৃষ্টিকে ডাকিস না। তোর ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'না। এই হাতটাতে তো একটুও না। যদি সমস্ত শরীরে প্রাণটার করে আসতাম—' হাসল কল্যাণ। হাঁটার সময় কল্যাণ যতটা সম্ভব লক্ষ্য রাখছিল পথের উপর। এখানকার পাহাড়ের চেহারা সর্বত্র এক। কোন রাস্তার নিশানা নেই। সুদীপের কাছে ফিরে আসাটা গোলমালে হয়ে যেতে পারে। মিনিট তিরিশেক পাহাড় ভাঙ্গার পর পথ ফুড়িয়ে গেল। সামনে খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে। এইটে অতিক্রম করা তাদের সাধ্যে কুলাবে না। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় চ্যাওথাপু?'

'বুঝতে পারছি না। পথ নিশ্চয়ই একটা আছে।' আনন্দ অসহায়ের মত চারপাশে তাকাল।

'সত্যি বলতো, চ্যাওথাপু বলে কোন জায়গা আছে কি না?'

'নিখোঁ কথ্য বলে আমার কি দ্রাভ। ম্যাপে এই জায়গাটার নাম আমি পড়েছি।'

ওরা আরও ডানদিকে এগিয়ে গেল। ঘড়িতে সময় চলছে। সাড়া দিন পেটে কিছু পড়েনি। অসম্ভব দুর্বল মনে হচ্ছিল নিজেদের। মাথার ওপর সূর্য আছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। সামনের পাহাড়ের প্রাচীর যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টার পর ওরা পাহাড়কে দুটুকরো অবস্থায় দেখল। যেন ইংরেজী ডি অঙ্করের মত কেউ পাহাড়ের অনেকটা তুলে নিয়েছে। কল্যাণ সৈদিকে এগোচ্ছিল। পাথরের ওপর পা রাখতে ভরসা হচ্ছিল না। বোবাই যায় এইখানে অনেক কাল মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। ফলে সঁয়াতসেঁতে শ্যাওলা পাথরগুলোর ওপর জেঁকে বসে আছে। সে কল্যাণকে নিষেধ করল। যদি চ্যাওথাপুর লোকজন এই পথে যাওয়া আসা করত তাহলে এমনটা হত না। অর্থাৎ এইটে যাওয়ার পথই নয়।

ঠিক সেই সময় একটা পাথরের শব্দ কানে এল ওদের। যেন পাহাড় থেকে কোথাও পাথরটা গড়িয়ে পড়ল। এখন হাওয়া নেই। সাপের মত কুম্ভাশারা বৃকে হেঁটে চুপচাপ ধুরে বেড়াচ্ছে। কোন পাখি ডাকছে না, ভেজা গাছগুলোয় পোকামাকড়ও ডাকছে না। শব্দটা যেটা পাথর গড়ানো বলে মনে হল সেটা খুব কাছে না হলেও ওদের কানে এল। কিন্তু দুজনেই প্রথমে, ওটা নিয়ে মাথা ঘামাননি। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি করবি? আমার মনে হয় আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে যাওয়া উচিত। চ্যাওথাপুর রাস্তা এদিকে নয়।'

ফাল্গুনের পুলিস-ফাঁড়ির কথা মনে থাকা সত্ত্বেও এর বিকল্প প্রস্তাব আনন্দের মাথায় এল না। দেখাই যাচ্ছে এগানোর পথ বন্ধ। সে বিড়বিড় করে বলল— পথ ভুল করেছে। আর তখনই পায়ের শব্দ কানে এল। খুব দ্রুত যেন দৌড়ে

গেল কেউ। সে চট করে ঘুরে দাঁড়াল। কল্যাণ চমকে বলল, 'কোন জন্তু মনে হচ্ছে। আওয়াজটা এ দিকেই হল মনে হচ্ছে।'

আনন্দরও তাই ধারণা। হিমালয়ের এই অঞ্চলে ঠিক কি কি জন্তু থাকতে পারে সে সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে বাঘ যে থাকবে না এটা বোঝা যায়। এত ঠাণ্ডা আর বরফ ওদের থাকতে ভাল লাগবে না। কিন্তু পায়ের শব্দটা স্পষ্ট কানে বেজেছে। হঠাৎ কল্যাণ নিচু হয়ে একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল গাছপালা লক্ষ্য করে। এবং তখনই তিনটে মানুষ বেরিয়ে এল যেন আকাশ ফুঁড়ে। আফ্রিকার অডিযানের ওপর তোলা সিনেমাগুলোতে এমন দৃশ্য দেখা যায়। এই লোকগুলোও যেন অনেকক্ষণ তাদের লক্ষ্য করছিল। পাথর ছোঁড়ামাত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনজনের শরীরে শক্তি আছে, শীতবস্ত্র যা আছে তাতে বোধ হয় ওদেরই চলে যায় কিন্তু প্রত্যেকের বাঁ হাতে একটি ধারালো এবং বাঁকা ছুরি। তিনজনেই ওদের দিকে দৃষ্টি রেখেছে অনড়ভাবে। আনন্দরও স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই তিনটে মানুষ যে নেপালি নয় অথচ হিমালয়ের বাসিন্দা তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এদের চোখ-মুখ বেশ হিংস্র দেখাচ্ছে, ধরে থাকা ছুরির হাতের শিরাগুলো টানটান। কল্যাণ দৃশ্যটা দেখামাত্র অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। সে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইল এ রকম আরও মানুষ ইতিমধ্যে এসে পড়েছে কি না। সেই সময় তিনজনের একজন চিৎকার করে উঠল হার একটা শব্দও ওরা বুঝতে পারল না। এদের গলার স্বর বোধ হয় জড়ানো এবং জাল্‌ব ধ্বনি মেশানো। আনন্দ কথা বলল। যতটা সম্ভব সহজ ভঙ্গীতে সে হিন্দীতে বলল, 'তোমরা কারা? এভাবে ছুরি নিয়ে আমাদের সামনে এসেছ কেন?'

লোক তিনটে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর ওদের একজন সেই একই ভাষায় মুখ বিকৃত করে আকাশে ছুরি নাচিয়ে চিৎকার করে উঠল। আনন্দ বলল হিন্দীতে, 'আমি তোমাদের কোন কথা বুঝতে পারছি না।'

তিনজন আবার নিজেদের মধ্যে কিছু বলল চাপা গলায়। তারপর ওদের একজন একটা পাথর মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছোঁড়ার ভঙ্গী করে নেপালিতে বলল, 'তোমরা এটা ছুঁড়ে! তোমরা আমাদের মারতে চেয়েছ। তোমাদের নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য খারাপ।'

আনন্দ শব্দগুলোর অর্ধেক বুঝতে পারল। এরা নেপালি নয় এবং নেপালি ভাষা ব্যবহার করছে যাতে আনন্দরা বুঝতে পারে। সে মাথা নাড়ল, 'আমরা জানতাম না ওখানে মানুষ আছে। আমরা তোমাদের শত্রু নই যে মারতে চাইব। আমরা ভেবেছিলাম কোন জন্তুজানোয়ারি ওখানে আছে।'

সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের খান্দাটা কি? এখানে এসেছ কেন? এদিকে কোন মানুষ আসে না। নিশ্চয়ই তোমরা ভাল মানুষ নও।'

'আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমরা কি এখানে থাক?'

'আমরা একজনকে খুঁজছি। সেই লোকটা আমাদের গ্রামের সর্বনাশ করে

পালিয়েছে। কাল থেকে সমস্ত গ্রাম তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমরা যে পথে এসেছিলে সেই পথে ফিরে যাবে। নইলে—।’

হুমকিটা গায়ে মাখল না আনন্দ। এদের বোঝানো যায় তিনটে ছুরিকে একমুহুর্তেই শ্বশ্ব করার মত ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু বন্দুক দেখিয়ে কোন কাজ হবে না। লোকগুলো ওদের ফিরে যাওয়ার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। হঠাৎ কল্যাণ বলল, ‘আমরা যে লোকটা বয়ে নিয়ে আসছি এরা তার খোঁজ করছে না তো?’

খটকা লাগল আনন্দর। লোকটা বাইরে থেকে আসছে, না ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। সে হিন্দীতে বলল, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ আমাদের সঙ্গে আসবে?’

‘কেন?’ লোকটা বোধ হয় এবার নিচু গলায় সঙ্গী দুজনকে প্রশ্নাবটা নিজের ভাষায় বেঝাল।

‘আমরা একটা লোককে পেয়েছি। সে খুব অসুস্থ। প্রায় ফালুটের কাছাকাছি মাটিতে পড়েছিল লোকটা। আমরা ওকে যত্ন করে নিয়ে এসেছি। তোমরা এসে দেখতে পার ঠিক ওকেই খুঁজছ কিনা।’ আনন্দ কথাগুলো বলে কল্যাণকেই ইঙ্গিতে হাঁটিতে বলল। ওরা যে পেছনে আসবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এগোচ্ছিল আনন্দ। খানিকটা দূর নামার পর কল্যাণ প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, ‘ওরা আসছে। পেছন থেকে ছুরি মারবে না তো?’

‘ছুরি কেন মারবে?’ আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল না।

‘কি জানি বাবা! দেখতে যেমন, এখানে ক্যানিবারা থাকে কিনা ঈশ্বর জানেন!’ কল্যাণের কথা শেষ হওয়ামাত্র অট্টহাস্যে ভেঙ্গে পড়ল আনন্দ। এভাবে সে কোনদিন প্রাণ খুলে হাসে নি। হাসিটা যেন পেটের ভেতর থেকে ছিটকে উঠেছিল। কল্যাণ এমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারল না। এবং তিনজন অনুসরণকারী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ওই শব্দ যেহেতু পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তাই আনন্দ কোনমতে নিজেকে সংবরণ করা মাত্র নিচ থেকে সুদীপের চিৎকার ভেসে এল। বোধ হয় সে কারণ জিজ্ঞাসা করছে। আনন্দ বলল, ‘তোমরা মাথায় এটা কি করে ঢুকল?’

‘তাই বলে এইরকম হাসার কোন মানে হয় না।’ কল্যাণকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল।

কয়েক পা হাঁটার পর আনন্দর মনে হল পেছনে পদশব্দ নেই। সে মুখ ফিরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কল্যাণও সেটা লক্ষ্য করে বলল, ‘কি ব্যাপার?’

আনন্দ ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। লোক তিনটে সুদীপের গলা শুনে বিম্বাভ হয়েছে। ওরা বোধ হয় ভয় পাচ্ছে প্রকাশ্যে যেতে। সে কল্যাণকে কথা না বলে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। আশেপাশে যে শব্দ হচ্ছে তাতে একথা স্পষ্ট অনুসরণকারীরা ফিরে যায়নি। শুধু তারা বোধ হয় প্রকাশ্যে আসার

খুঁকি নিতে রাজী নয়।

অনেকটা সময় লাগল ওদের সুদীপের কাছে পৌঁছাতে। সুদীপ দাঁড়িয়েছিল। জয়িতা একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে। সেই লোকটা গুয়ে রয়েছে চোখ বন্ধ করে। খুব দ্রুত আনন্দ সুদীপকে ঘটনাটা বলল। ওরা লোকটির চারপাশে চলে আসতেই মাথার ওপরে শব্দ হল। আনন্দ সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করল 'তোমরা কি এই লোকটিকেই খুঁজছ ?

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটাল। তারপর ওপরের পাথরের গায়ে একটা শরীর খীরে খীরে এগিয়ে এল, 'হ্যাঁ। লোকটাকে খুঁজে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। তোমরা চলে যাও।'

'কিন্তু আমাদের আপাতত যাওয়ার জায়গা নেই। আমরা তোমাদের গ্রামে যেতে চাই।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। এই লোকটাকে আমি খুঁজছিলাম, পেয়ে গেছি, এবার তোমরা তোমাদের ধান্দার যাও, ওকে নিয়ে আমরা গ্রামে ফিরে যাবো।'

'তোমাদের গ্রামের নাম ওয়ালাং চাও ?'

'না। আমাদের গ্রাম থেকে চারঘণ্টার পথ। তোমরা এখন থেকে ওয়ালাং চাও যেতে পারবে না। যে পথ দিয়ে এসেছিলে সেদিকেই ফিরে যাও। এই লোকটা বেঁচে আছে তো ?

সুদীপ জবাব দিল, 'আছে। আমি ওকে ওষুধ দিয়েছি।'

আনন্দ বলল, 'আমাদের এই সঙ্গীরা হাঁটিতে পারছে না। ওর পায়ে লেগেছে। তোমরা আমাদের আজকের রাতটা তোমাদের গ্রামে থাকতে দেবে।'

'তোমরা কারা জানি না। অপরিচিত মানুষকে গ্রামে থাকতে দেওয়ার নিয়ম নেই।'

'আমরা খারাপ মানুষ নই। তাহলে এই অসুস্থ মানুষটাকে কষ্ট করে বয়ে আনতাম না। তাছাড়া আমরা চারজনই পুরুষ নই। একজন মহিলাও আমাদের মধ্যে আছে।'

লোকটা যেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'মহিলা আছে তো কি হয়েছে! তাজব ব্যাপার!'

জয়িতা কথাটা বুঝতে পেরে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, 'সাবাস তুইও শেষ পর্যন্ত আমাকে ক্যাপিটাল করে সিমপ্যাথি পেতে চাইছিলি। কিন্তু ওদের কাছে ছেনেমেয়েদের কোন প্রভেদ নেই। তাই তো চাই।' কথা শেষ করে সে উঠে এগিয়ে গেল। সেই পড়ে যাওয়ার সময় সম্ভবত চোট পেয়েছিল জয়িতা কারণ হাঁটার সময় বোঝা গেল সে খোঁড়াচ্ছে। একেবারে পাথরটার সামনে পৌঁছে সে লোকটাকে বলল, 'আমরা ফিরে যেতে পারব না। আজকের রাতটা তোমাদের গ্রামে আমরা থাকতে চাই। সন্ধে হতে আর দেরি নেই, তোমরা আমাদের মরে যেতে বল ? কি রকম মানুষ তোমরা ?'

ওর বলার ভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল যে লোকটা চট করে জবাব দিতে পারল না। সে ধীরে ধীরে আড়ালে ফিরে গেল। সুদীপ বলল, 'সমানে হুকুম করে যাচ্ছে লোকটা একটা ছুরি হাতে নিয়ে। এটা সহ্য করা যায় না। দেব নাকি ঠাণ্ডা করে?'

আনন্দ শ্রুত বলে উঠল, 'না। কল্পনো না। সহ্য কর। মনে হয় আখেরে কাজ দেবে।'

সুদীপ বলল, 'কিন্তু এই অসুস্থ মানুষটাকে বয়ে এনে ধরিয়ে দেব? অন্যায় হবে না?'

আনন্দ জবাব দিল, 'ও যদি সত্যি অপরাধী হয় তাহলে অন্যায় কিসের? নিশ্চয়ই একটা বিচার করবে ওরা। এখানে থাকলে তো রাত নামলেই মরে যাবে। তাতে কি ওর ভাল হবে?'

লোকটা আবার উদয় হল, 'তোমরা ওর কাছ থেকে সরে দাঁড়াও। যে জিনিসটার খোঁজ করছি তা যদি ওর সঙ্গে থাকে তাহলে তোমাদের আমরা গ্রামে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তোমরা যদি বেইমানি কর তাহলে কাউকে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।'

আনন্দ ইঙ্গিত করতে সবাই লোকটাকে ছেড়ে সরে এল। এত যে কথাবার্তা চলছে তা লোকটার কানে ঢুকলই না। প্রায় মৃতদেহের ভঙ্গীতে শুয়ে আছে লোকটা। ওরা বেশ কিছুটা দূরত্বে চলে আসা মাত্র দুটো মানুষ লাফিয়ে নামল ওপাশের পাহাড় থেকে। প্রথম লোকটি তখনও ওপরে দাঁড়িয়ে। দুটো লোক সন্তর্পণে কাছে এসে মানুষটিকে দেখল। তারপরই একজন প্রচণ্ড ষুণ্ণ এক দলা খুতু ছড়িয়ে দিল লোকটার মুখে। দ্বিতীয়জন তখন ওর জামা কাপড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়েছে। তন্নতন্ন করে খুঁজছে সে। তারপর নিরাশ হয়ে মুখ তুলে পাথরের ওপর দাঁড়ানো লোকটাকে কিছু বলল। লোকটা এবার ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা ওর কাছ থেকে কোন জিনিস নিয়েছ?'

আনন্দ মাথা নেড়ে না বলতে যাবিছিল কিন্তু জয়িতা তাকে থামিয়ে দিল হাত তুলে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি খুঁজছ ওর কাছে?'

'একটা কালো পাথরের মূর্তি। আমাদের দেবতা। যেদিন থেকে আমাদের গ্রাম জন্মেছিল সেদিন থেকেই ওই দেবতা আমাদের সঙ্গে আছেন। এই লোকটা চ্যাওথাপুতে যায় প্রায়ই। সেখান থেকে মতলব নিয়ে এসে ওর নোংরা হাত দিয়ে আমাদের দেবতাকে ছুরি করে পালিয়েছিল। তবে ও চ্যাওথাপুতে যায়নি। কিন্তু সেই মূর্তি আমাদের চাই।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'একটু আগে আমি ওর কাছে একটা পুঁটলি পেয়েছি। তাতে মূর্তিটা আছে কিনা আমি খুলে দেখিনি।' সে এগিয়ে গেল শায়িত মানুষটির মাথার দিকে। সঙ্গে মানুষটির পাশে দাঁড়ানো লোক দুটো ছুরি দুটো শঙ্ক করে তুলে ধরল। সেদিকে নজর না দিয়ে জয়িতা পৌঁছে গেল যে পাথরটায় সে বসে ছিল একটু আগে তার পাশে। তারপর পাথরের খাঁজ থেকে

একটা নোংরা পুঁটলি বের করে চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে সেটা খুলতে লাগল। এবং সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল ইঞ্চি দশেকের একটা পাথরের মূর্তি। তেল চুকচুকে কালো পাথরের মূর্তিটি নিখুঁত শিল্পকর্ম নয় এবং কোন দেবতার তা অবয়ব দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। মূর্তিটিকে দেখা মাত্র ওপরে দাঁড়ানো লোকটি দুহাত মাথার ওপর তুলে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছুরি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ দুটো অনেকটা ঝুঁকে প্রণাম জানিয়ে উল্ভাসিত মুখে এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল জন্মিতা, 'না। এই মূর্তি আমি তোমাদের হাতে দেব না। তোমরা যে সত্য কথা বলছ তার কোন প্রমাণ নেই। ওই লোকটা দোষী কিনা তাও আমরা জানি না। এটা যখন দেব মূর্তি তখন নিশ্চয়ই পুরোহিত আছে। আমি তোমাদের গ্রামে পৌঁছে সেই পুরোহিতের হাতে একে তুলে দেব।' ওপরে দাঁড়ানো লোকটা চিৎকার করল, 'আমি মিথ্যা কথা বলছি? দিয়ে দাও মূর্তি নইলে এখনই তোমার শরীর থেকে রক্ত বের হবে।'

ঠিক তখনই সুদীপ রিভলভারের ট্রিগারে চাপ দিল। শব্দটা মেঘগর্জনের চেয়েও জোরালো ঠেঁকল। ওপরে দাঁড়ানো লোকটা ভয় পেয়ে বসে পড়ল। এগিয়ে আসা লোক দুটো ভয় পেয়ে পেছনে লাফ দিতেই অসুস্থ মানুষটির ওপর গড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ মানুষটি গোঁ গোঁ করে উঠে বসার চেষ্টা করল। সুদীপ চিৎকার করল, 'তোমরা এতক্ষণ আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে। কিন্তু এরকম অস্ত্র আমাদের অনেক আছে। আমি তোমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়িনি। শোন, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না। ও যা বলেছে সেটাই ঠিক। তোমাদের কথা সত্যি প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ওই মূর্তি আমরা দেব না।'

ওপরের এবং নীচের লোকগুলো যেন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো বন্দুকের গুলি ওরা শুনেছে কিন্তু আওয়াজ এই প্রথম কানে ঢুকল ওদের। কি করবে ওরা বুঝতে পারছিল না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আনন্দ এগিয়ে গেল, 'শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক চাই। তোমরা আমাদের বন্ধু বলে মনে কর। আমি কথা দিচ্ছি গ্রামে পৌঁছেই মূর্তিটিকে আমরা দিয়ে দেব। আজকের রাতটা কাটিয়ে যদি তোমরা চাও তাহলে কাল সকালে আমরা কোথাও চলে যাব। কোন ক্ষতি তোমাদের করা হবে না। এখন এই লোকটাকে নিয়ে তোমরা গ্রামে ফিরে চল।'

ওপরের লোকটা বোধ হয় পরিস্থিতি বুঝতে পারল। সে নির্দেশ দিতেই একজন ওপাশের জঙ্গলে ঢুকে দ্রুত হাতে একটা শস্ত গাছের ডাল কেটে নিয়ে এল। তারপর ওই ডালের সঙ্গে অসুস্থ মানুষটাকে বেঁধে নিয়ে দুজনে ডালটাকে বঁধে তুলে নিল। আনন্দের মনে পড়ল ডালমগুহারবারের গ্রামে এভাবে মৃতদেহ ঝুলিয়ে আনতে দেখেছে সে। ওরা নিজেদের জিনিসপত্র আবার তুলে নিচ্ছিল। জন্মিতা আবার পুঁটলিটা বেঁধে নিয়ে নিজের ব্যাগের দিকে এগোতে ওপরের লোকটা চিৎকার করে নিষেধ করল। খানিকটা ঘুরে নিচে নেমে এসে সে

জন্মিতার জিনিসপত্র অবলীলায় কাঁধে তুলে নিল। বোঝা গেল দেবমূর্তি জন্মিতার সঙ্গে থাকার এইগুলোর বোঝা সে নিজে নিল। কল্যাণ সেটা লক্ষ্য করে নিজের বোঝার একটা ছোট অংশ লোকটার দিকে এগিয়ে ধরল। একটু রুশ্ট চোখে দেখলেও শেষ পর্যন্ত সে কল্যাণকে হতাশ করল না।

সম্ভবত অসুস্থ মানুষটিকে নিয়ে চলার কারণেই ওরা গতি বাড়ানিচ্ছিল না। ফলে জন্মিতার হাঁটতে সুবিধে হচ্ছিল। প্রথমে যাচ্ছে লোকদুটো, মাঝখানে ওরা, শেষে তৃতীয় লোকটি বোঝা নিয়ে তাদের অনুসরণ করছে।

আনন্দ লক্ষ্য করল ওরা পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে না। যদিও সর্বত্র পাহাড়ের পাঁচিল তবু ওরা আরও ডানদিক ধরে উঠছে। সে খানিকটা পিছিয়ে এসে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বল ভাই তোমার নাম কি?'

'পালদেম!' লোকটা মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল।

'আমরা ওয়ালান্ড চাঙে যাব ভেবেছিলাম। তোমাদের গ্রামের নাম কি?'

'তাপল্যাঙ।'

'যে দেবতার মূর্তি আমরা দেখলাম সেটা কার? দেবতার নাম কি?'

পালদেম জবাব দিল না। যেন সে কথা বলতে চাইছে না। আনন্দ আর জেদাজেদি করল না। ওরা সমানে উঠে যাচ্ছিল। কোন পথ নেই। অথচ এরা কি অন্যায়সে পথ করে নিচ্ছে। সারাদিন অতুণ্ড থাকার শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুদীপ মোটামুটি ভাল রাখছে, কিন্তু জন্মিতা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল। একটা ঘোরের মধ্যে ওঁরা হেঁটে যাচ্ছিল। আর তখনই হাওয়া বইতে শুরু করল। সেই হাওয়ার টানে বাঁক বেঁধে কুম্ভারারা উঠে আসছিল ওপরে। গরম পোশাক থাকা সত্ত্বেও যেন হাঁড়ে কাঁপুনি লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে এতক্ষণের বেড়ে ওঠা ক্লান্তিটা যেন চাপা পড়ল। কল্যাণ বলল, 'জন্মিতা, তুমি মাঝখানে থাক। এই কুম্ভার আড়ালে তোর কাছ থেকে মূর্তিটা ছিনিয়ে নিয়ে ওরা পালাতে পারে।'

কল্যাণের কথার উত্তরে কেউ কথা বলল না। এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও প্রত্যেকের বুক থেকে গরম নিঃস্বাস বেরিয়ে আসছিল দ্রুত। আরও মিনিট পনের চলার পর ওরা উপত্যকাটা দেখতে পেল। এবং তখনই পালদেমের গলা শুনতে পেল, 'আমরা এসে গেছি। ওই বাঁকটা পার হলেই আমাদের গ্রাম।'

হঠাৎ যেন নতুন রক্ত বইতে শুরু করল শিরায়। উদ্যমটা এসে গেল পদক্ষেপে। মিনিট পাঁচেকের পর ওরা গ্রামটাকে দেখতে পেল। যে পাহাড়টাকে ওপাশে অশুভ্য বলে মনে হয়েছিল তারই খাঁজে ওরা দাঁড়িয়ে দেখল নেহাতই গ্রাম, পাহাড়ি ঘর বাড়ি। পাহাড়ের গায়ে টুকরো জমিতে চাষ হয়েছে। বাড়িঘরগুলোর স্বাস্থ্যদ্যর চিহ্নমাত্র নেই। গ্রামের শেষেই বরফের পাহাড়। তার সাদাতে দেওয়াল এখানে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট।

ওরা মিচে নামতে না নামতে কিছু মানুষ বেরিয়ে এল উপত্যকায়। সঙ্গে সঙ্গে পালদেম চিৎকার করে কিছু বলল। সেই চিৎকারটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে।

যারা ক্ষেতে ফসল কাটছিল, যারা অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, তারা ছুটে আসতে লাগল এদিকে। একটা পাগলামির লক্ষণ ফুটে উঠল জনতার আচরণে। ওরা ওপরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এই গ্রামে শ' তিনেকের বেশী মানুষ থাকতে পারে না। আনন্দ পালদেমকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা ওইভাবে ছুটে আসছে কেন?' 'দেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বলে খুশি হয়েছে সবাই।' 'কিন্তু ওই খুশীর চাপে আমরা মরে যাব। তুমি এগিয়ে গিয়ে ওদের থামাও।' জিনিসপত্র রেখে পালদেম চালু পথ বেয়ে দুহাত তুলে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে গেল। প্রায় উন্নত জনতা এবার আচমকা চুপ করে গেল। আনন্দ সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। তারপরে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে পুরোহিত কে আছে?' কথাটার অর্থ কারো বোধগম্য হল না। অনেক চেষ্টার পর পালদেম মানে ধরতে পেরে চিৎকার করল, 'কাহন, কাহন।' তারপরেই ভিড় ঠেলে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। তাঁর পরনে আমাদের পোশাক। আনন্দ ইঙ্গিত করতেই জয়িতা ধীরে ধীরে তাঁর সামনে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে মূর্তিটি বের করে এগিয়ে ধরল। পরিতৃপ্ত মুখে শ্রদ্ধা সহকারে কাহন সেটিকে গ্রহণ করতেই জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। ওরা সেই দিনের শেষ প্রহরে প্রথম পা দিয়েছিল তাপল্যাঙে।

॥ ৩২ ॥

দেবতার মূর্তি নিয়ে কাহন গেলেন মন্দিরে। পাহাড়ের গায়ে অনেকটা আধা-ওহার চেহারার মন্দির। এই বিকেলে তার ভেতরে ঘন ছায়া থাকায় সবটাই দৃশ্যমান নয়। তাপল্যাঙের মানুষ এখন খুশীতে উগমগ। কেউ লাফাচ্ছে কেউ অকারণে চিৎকার করছে। ওরা চারজন দেখল এরই ফাঁকে সেই অসুস্থ লোকটিকে চোখের আড়ালে সরিয়ে নিলে যাওয়া হল। লোকটা ওই মূর্তি চুরি করে যখন পালিয়েছিল তখন বিচারে শাস্তি যা হবে তা কল্পনা করতে অসুবিধে হল না।

এখন চোখের সামনে যে মানুষগুলো হইচই করছে তাদের পিছন থেকে দেখলে নেপালি বলে কিছুতেই মনে হবে না। ওরা বাঙালিদের থেকেও লম্বা। মুখে মঙ্গোলিয়ান ছাপ স্পষ্ট। অনেকটা তিব্বতীদের সঙ্গে সিক্কিমিজ চেহারার মিশলে এই রকম চেহারা হয়। অথচ ওরা নেপালির কাছাকাছি ভাষায় কথা বলে। মানুষগুলো অবশ্যই দরিদ্র, এদের পোশাকে অবশ্য সেটা স্পষ্ট। পাহাড়ি মানুষের একটা মজবুত শারীরিক গঠন থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল নিয়মিত আহারের সংস্থান হয় না। অথচ দেবতার মূর্তি পাওয়ার পর থেকেই এদের উচ্ছ্বাস দেখার মত। সেখানে কোন আড়ম্বর্ততা নেই। এই সময় ওরা লক্ষ্য করল কিছু কিছু মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। বিস্মিত চোখ মেলে তারা দাঁড়িয়ে আছে দূরে, কাছে আসছে না কেউ। রুমশ

ভিড়টা এদিকে বাড়তে লাগল। আনন্দরা পা ছড়িয়ে বসেছিল। অত্যন্ত ক্লান্তিতে বোধহয় খিদে চলে যায়। আনন্দ এবার গ্রামের মোড়লকে আশা করছিল। সেই লোকটা এসে নিশ্চয়ই খুব জেরা করবে। করুক। কিন্তু এখন তাদের একটা আশ্রয় চাই। চোখের সামনে ছড়ানো পাহাড়ের গায়ে যে কাঠের বাড়িগুলো সেখানে কি খালি ঘর আছে? কারণ মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী যে বাসস্থান আশা করা যায় তা চোখে পড়ছে না। আনন্দ একটি লোককে এগিয়ে আসতে দেখল। কাছাকাছি হতে পালদেমকে চেনা গেল।

পালদেম বলল, 'অন্ধকার নেমে এলে অসুবিধে হবে। তোমরা আজ যেখানে থাকবে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি চল। এখানে অন্ধকার নেমে এলে কেউ যাবের বাইরে যায় না। তোমরাও নিয়মটা মেনো।'

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'নিয়মটা হয়েছে কেন? অন্ধকারে বাইরে কি হয়?'

পালদেম মাথা নাড়ল, 'কি হয় আমরা জানি না। তবে আমাদের বামঠাকুর্দার। যেত না, আমরাও যাই না।'

পালদেম আরও জানাল মালপত্র ওরা এখানেই রেখে যাক, গ্রামের লোক পৌঁছে দেবে। কথাটা ওদের খুশী করলেও আনন্দ বিশেষ ব্যাগটা সঙ্গে নিল। কারণ যারা বহন করবে তারা যদি সচেতন না থাকে তাহলে বিচ্ছেদারণ অসম্ভব নয়। ওরা পালদেমের পেছনে হাঁটছিল। গ্রামবাসীরা কাছে আসছে না। বেশ দূরত্ব রেখে ওরা অনুসরণ করছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে পালদেম বলল, 'এই গ্রামে কখনও বিদেশীদের রাত কাটাতে দেওয়া হয়নি। যেহেতু তোমরা আমাদের উপকার করেছ নিজেদের অজান্তে হলেও আর একজন মেয়ে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে তাই তোমাদের থাকতে দিচ্ছি আমরা। কিন্তু কাল সকালেই চলে যাবে তোমরা। ওয়ালং চাওে যাওয়ার পথ আমি তোমাদের চিনিয়ে দেব।'

ওরা কিছুটা তালুতে নেমে আবার উঠতে লাগল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'এই গ্রামের প্রধান কে? তুমি?'

পালদেম মাথা নাড়ল, 'এখানে কোন প্রধান ট্রধান নেই। আমাদের নিজস্ব রীতিনীতি আছে, আমরা সেইমত চলি। কেউ যদি সেই নিয়ম না মানতে চায় তাহলে তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়। আসলে আমরা খুব গরীব মানুষ। গরীব মানুষদের আবার প্রধান থাকে নাকি!'

গ্রামের ঠিক শেষ সীমায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ওদের নিয়ে এল পালদেম। পাহাড়ের গায়ে কাঠ গুজে এটিকে তৈরী করা হয়েছিল। অবশ্য বাড়ি বলতে যা বোঝায় তার ধারে কাছে নয় আস্তানাটা। কাঠের মেঝে ভেঙে গেছে। দেওয়ালটার অনেকখানি ফাঁক। তবে ছাদটা সম্ভবত অটুট আছে। কোন আসবাব নেই, কিন্তু একটা বোঁটকা গন্ধ সমস্ত ঘরে চেপে বসে আছে। সুদীপ দেখে শুনে বলল, 'এখানে থাকার চেয়ে তাঁবু টাঙিয়ে থাকা ঢের ভাল। কি গন্ধ, বাপরে বাপ!'

আনন্দ বলল, 'বাইরে তাঁবুতে শুলে ঠাণ্ডা সহ্য হবে না। একবার জোরে বাতাস বইতে শুরু করলেই টের পাবি। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। এখানেই কোনমতে কাজ চালাতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল এখানে কোন বাথরুম বা ল্যাট্রিন নেই। স্নান করার প্রসঙ্গ ওঠে না এই ঠাণ্ডায়। কিন্তু ও দুটোর জন্যে—'

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছিল তখন ওদের মালপত্র পৌঁছে গেল। দুটো লোক অবলীলায় ওইসব ওজন বয়ে নিয়ে এল অথচ তাদের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। কল্যাণ পালদেমকে বলল, 'এখানে জল পাওয়া যাবে কোথায়? আমরা বাঙালিরা খুব জল খাই।'

পালদেম কল্যাণকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। সেখান থেকেই দেখা যায় একটা ছোট জলের ধারা নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের শরীর বেয়ে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঘরে কে থাকত?'

'কেউ না। গ্রামের কারো অসুখ হলে এই ঘরে এসে থাকে। আবার বিয়ের পর যতদিন নতুন ঘর তৈরী না করতে পারে ততদিন এই ঘরে তাদের থাকতে দেওয়া হয়। তোমরা অতিথি বলে এই ঘরে থাকতে দেওয়া হল। ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি। তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আমার বাড়ি থেকে তোমাদের খাবার দিয়ে যাবে। আমরা খুব গরীব। ভাল খাবার দিতে পারব না। সত্যি বলতে কি, তোমাদের এক বোনা খাওয়াচ্ছি বলে আমাদের একজনের চার বেলায় খাওয়া কমে যাবে।' পালদেম যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। তখনও অন্তত জনা কুড়ি ছেলেমেয়ে খানিকটা দূরে বসে এই বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। পালদেম তাদের চিৎকার করে কিছু বললেও কোন প্রতিক্রিয়া হল না।

কল্যাণ পালদেমকে ডাকল, 'শোন, তোমাদের খাবার কমে যাবে না। আমরা তোমাকে টাকা দিচ্ছি।'

'টাকা? এখানে টাকা দিয়ে কি হবে? টাকা দিয়ে জিনিস পাওয়া যায় চ্যাঙথাপুতে। সেখানে যেতে গেলে অনেক বামেলা। তাছাড়া অতিথিদের কাছ থেকে টাকা নিলে লোকে আমায় বলবেটা কি! ও হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে কি তোমরা কিংবা ছাং আছে? যদি দরকার হয় তাহলে সেটা পাঠিয়ে দিতে পারি।'

পালদেম প্রস্তাবটা জানাতে সুদীপ বেরিয়ে এল, 'হ্যাঁ, ওগুলো দিলে তো খুব ভালই হয়।'

পালদেম চলে গেলেও দর্শকরা নড়ল না। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'জিনিস দুটো কি রে?'

'মদ। একদম দিশি মতে তৈরী।' সুদীপ নীচে নামল। ওপাশে খুব দ্রুত কুয়াশা নেমে আসছে। হিমালয়ের কোন চূড়া দেখা যাচ্ছে না। যেন ভালুকের মত সন্ধ্যা নেমে আসছে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কল্যাণ চিৎকার করল, 'এই মদ খাবি ? হাই অউটিচুড়ো ড্রিক করলে হার্ট অ্যাটাকড্ হয়, জানিস না।'

'তাহলে এরা কেউ বেঁচে থাকত না।' কথাটা বলে কাছে যেতে বাচ্চাগুলো উঠে দাঁড়াল। ওদের সঙ্গে যে দুজন বয়স্ক রয়েছে তাদের দিকে তাকাতে গলগণ্ড দেখতে পেল সুদীপ। বেশী বয়স্কজনের গলায় ফুটবলের মত ঝুলে আছে। দ্বিতীয়জনের বোধ হয় সবে শুরু হয়েছে। বাচ্চাগুলোর প্রত্যেকের পা খালি। এবং সেগুলো ফেটে এমনভাবে শক্ত হয়ে গেছে যে দেখলে শিউরে উঠতে হয়। তারপরেই সুদীপের চোখ পড়ল মেয়েটার ওপরে। মুখের একপাশ থেকে বিশ্রী ঘা প্রায় গলা পর্যন্ত নেমেছে। মাঝে মাঝে রস গড়াচ্ছে তা থেকে। অথচ মেয়েটির মুখের গড়ন খুব মিষ্টি। অন্য পাশটায় তাকালে মুগ্ধ হতে হয়। কিন্তু মুখ ফেরালেই বীভৎস ক্ষত মেয়েটিকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। অথচ মেয়েটি এমন সরল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে যে ওই ক্ষতের কষ্ট ওকে পীড়া দিচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সে আঙুল তুলে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মুখে ওটা কি হয়েছে ?'

ব্যবধান বড় জোর বারো ফুটের, প্রায়টা শোনামাত্র মেয়েটির চোখের কৌতূহল উড়ে গেল। এবং সেই সঙ্গে অন্য বাচ্চাদের হাসির শব্দ কানে এল। সুদীপ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিন হয়েছে ওটা ?' এবার মেয়েটি এমনভাবে মুখ ফেরাল যাতে ক্ষত না দেখা যায়। একটি বাচ্চা নেপালিতে বলে উঠল তড়বড় করে। সুদীপ কথাগুলোর পুরোটা বুঝতে না পারলেও অনুমান করল বাচ্চাটা ক্ষত সম্পর্কেই বলছে এবং সেই বলার মধ্যে বেশ ঠাট্টা মেশানো রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাচ্চারাও হেসে উঠল শব্দ করে। মেয়েটি কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারপর চিৎকার করে বাচ্চাগুলোকে ধমক দেবার চেষ্টা করল। বাচ্চারা হঠাৎ তাকে ঘিরে নাচতে লাগল ছড়া কাটতে কাটতে। মেয়েটি যখন কেঁদে ফেলেছে তখন সুদীপ মর্মান্ধার করল। বাচ্চারা বলছে, 'পাহাড় থেকে ভালুক এসে ওর মুখে চুমু খেয়েছে।'

সুদীপ এগিয়ে গিয়ে খপ করে মেয়েটার হাত ধরে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে এস।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বেকেচুরে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল। সেটায় সক্ষম হতে না পেরে সে মাটিতে বাসে পড়ে পরিষ্কারি চিৎকার শুরু করল। দৃশ্যটা দেখে অন্য বাচ্চারা ঠাট্টা বন্ধ রেখে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে শুশুিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুদীপের জেদ চেপে গিয়েছিল। নিজের পায়ের ব্যথা সামলে সে মেয়েটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু মেয়েটা প্রায় স্তম্বে পড়ার ভঙ্গী করতে তা সম্ভব হচ্ছিল না। এই চিৎকার চেষ্টামেচিত্তে আনন্দরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। জন্মিতা নেমে এল কাছে, 'ওকে ধরেছিস কেন ? কি করেছে ও ? ছেড়ে দে সুদীপ ওকে। ইস, ওর মুখে কি হয়েছে ?'

পুরুষের পোষাকে মেয়েলি গলা গুলে মেয়েটি এক মুহূর্ত স্থির হল। তখনও

তার হাত সুদীপের মুঠোয় ধরা। সুদীপ বলল, 'এরকম বীভৎস যা কোথাও দেখেছিস। এখনই ওষুধ না পড়লে মেয়েটা মরে যাবে।'

'তা ঠিক, কিন্তু ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তুই ওষুধ দিবি ধরে বেঁধে!' জয়িতা খেপে গেল, 'আমরা এখানে একটা রাত কাটাতে এসেছি। ওদের জন্যে আমাদের না ভাবলেও চলবে।'

ঠিক তখনই একটি মহিলার পিছু পিছু আরও কয়েকজনকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সবাই চীৎকার করছে। ওদের ভঙ্গী দেখে সুদীপ হাত ছেড়ে দেওয়া মাত্র মেয়েটি ছিটকে সরে গিয়ে দৌড়তে লাগল। মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী হয়ে মহিলা তার দলবল নিয়ে ছুটে এল। ওরা চিৎকার করে যে দ্রুত কথা বলছে তা যে গলাগালি এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। পারলে মহিলা যেন সুদীপকে মেরেই ফেলে। জয়িতা ওকে আটকাবার চেষ্টা করছিল। আনন্দ সুদীপকে বলল, 'চটপট ঘরে চলে যা। ব্যাপারটার অন্যরকম মনে হয়েছে ওদের কাছে।'

আরও লোক ছুটে আসছে দেখে কল্যাণ বারান্দায় যেতে বলল সুদীপকে। নবাবগতদের মধ্যে পালদেমকেও দেখা গেল। সে উত্তেজিত মহিলার কাছে অভিযোগ শুনে আনন্দের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই লোকটা এতটুকু বাচ্চার হাত ধরে টানছিল কেন? ও তো এখনও বাচ্চা, মেয়েও হয়নি। তোমাদের সঙ্গেই তো একজন মেয়ে আছে তাহলে এই মতলব হল কেন?'

আনন্দ পালদেমের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজেকে সংবরণ করল। এখন সব চিৎকার থেমে গেছে। জমে ওঠা জনতা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে একটা বিহিতের জন্যে। আনন্দ লক্ষ্য করল পালদেমের মুখের চেহারা পাল্টে গেছে। অপমানিত এবং নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে তাকে এখন। উত্তেজিত পালদেম বলল, 'তোমাদের কাছে বন্দুক আছে বলে ভেবেছে যা হচ্ছে করবে? ওই বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকাওনি? ঘাটা গলা ছাড়িয়ে গেলেই ও মারা যাবে। এর আগে ওই অসুখে তিনজন মারা গেছে। এসব দেখেও তোমাদের ইচ্ছে হল?'

জয়িতা এগিয়ে এল পালদেমের সামনে, 'তোমরা ওকে জুল বুঝেছ! মেয়েটা ওরকম বীভৎস ঘা-এ কপট পান্থ দেখেই আমাদের বন্ধু ওকে ডেকেছিল ওষুধ দেওয়ার জন্যে। ওইটুকুনি বাচ্চার অন্য কোন ক্ষতি করার মত মতলব ওর নেই। ওষুধ দিলে যদি মেয়েটার উপকার হয় তাহলে ও মারা যাবে না। এখানে আমাদের কথা আর কে বুঝতে পারে জানি না। কিন্তু ওই বাচ্চাটা ভয় পেয়ে না বুঝে চিৎকার করেছে। আমি তো একটা মেয়ে, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো!'

'ওষুধ? বাজে কথা? যারা প্রাণ-হত্যা করার জন্যে বন্দুক রাখে তাদের কাছে ওষুধ থাকবে কেন? এসব এখন তোমরা বানিয়ে বলছ। তোমরা, শহরের লোকেরা অত্যন্ত ধান্দাবাজ।'

এবার আনন্দ কথা বলল, 'তুমি আমাদের যা ইচ্ছে ভাবতে পার। কিন্তু আমাদের কাছে যে ওষুধ আছে তা দিলে ওই মেয়েটি ভাল হয়ে উঠতে পারে। আজেবাজে কথা না বলে তুমি ওর মাকে জিজ্ঞাসা কর যে আমাদের ওষুধ দিতে দেবে কিনা!'

আনন্দের গলার স্বরে এমন একটা কতৃৎ ছিল যে পালদেম কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর সে মহিলার কাছে এগিয়ে গেল। মহিলা তখন মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল। পালদেম তাকে সব কথা বলে চুপ করে দাঁড়াল। মহিলা প্রথমে দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল। আনন্দ সুদীপকে বলল ওষুধের বাস্কাটা বারান্দায় নিয়ে আসতে। পালদেম এবার আনন্দের কাছে এসে বলল, 'ওর মা রাজী হচ্ছে না। বলছে ওষুধ লাগলে ওর মেয়ে আজ রাগ্রেই মরে যাবে।' আনন্দ বলল, 'কি অদ্ভুত কথাটা। তুমি তো বুঝতে পারছ ব্যাপারটা। ওকে বল, ওষুধ না লাগলে তো মেয়েটা আর বেশীদিন বাঁচবে না। আমরা ওর শত্রু নই ও কথা বল। না হলে প্রথমে যে ধারণা তৈরী হয়েছে সেটাই মনে থেকে যাবে।'

পালদেম বলল, 'তাও আমি বলেছি। ও বলল আজ রাগ্রে মরার চেয়ে যে ক'দিন বেঁচে থাকে সে কদিনই লাভ। তোমরা ওর হাত ধরে টেনে ভাল করোনি। এখন কেউ বিশ্বাস করছে না তোমাদের অন্য কোন মতলব ছিল না। মেয়েটিকে ওর বাবার মত ছাড়া ওষুধ দিতে মা পার্ঠাবে না।'

'ওর বাবা কোথায়? তাকে ডাকো।' আনন্দের মনে হল এ ব্যাপারে একটি পুরুষকে বোঝানো চের সহজ। মেয়েটির মা-এ ওষুধ না দিতে পারলে ওদের ধারণা পাল্টাবে না। তার ফলে আর কোন সাহায্য এই গ্রামে পাওয়া অসম্ভব হবে

পালদেম বলল, 'আপনাদের কি দরকার গায়ে পড়ে মানুষের উপকার করার। এখানে যাতে রাত কাটিয়ে চলে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

এই সময় মহিলা চিৎকার করে কিছু বলতে আরম্ভ করল। আনন্দ দেখল একটি কিশোর গম্ভীর মুখে এগিয়ে আসছে এবং মহিলা তার উদ্দেশ্যেই কথা বলছে। কিশোর কোমরে হাত দিয়ে ওদের কথা শুনল। তারপর চট করে ঘুরে আনন্দের দিকে তাকাল। তারপর তার গলায় আওয়াজ উঠল। বোঝা যাচ্ছিল সে পালদেমকে গালাগালি করছে। বোধহয় অক্রান্ত হতেই পালদেম আত্মরক্ষার জন্যে পাল্টা গলা তুলল। কিছুক্ষণ এইরকম চলার পর পালদেম বলল, 'ওরা কেউ তোমাদের কথা বিশ্বাস করছে না। কিভাবে ওই মেয়েটির মুখের ঘা সারাতে চাইছ তোমরা? ওর শরীরে হাত না দিয়ে যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে—।'

'আমরা ওই শরীরে হাত দেব না।' আনন্দ চটপট ওকে থামিয়ে বলল, 'ওর ভাইকে বল কাছে নিয়ে আসতে।'

পালদেম বলল, 'কাকে ভাই বলছ? ছেনেটি মেয়েটার বাবা। না জেনে কোন

কথা বলতে যেও না।’ তারপর সে চিৎকার করে কিশোরের উদ্দেশ্যে কিছু বলল। আনন্দ এতটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

জয়িতা এগিয়ে এল পালদেমের কাছে, ‘কি যা-তা বলছ! ওইটুকু ছেলে ওই মেয়ের বাবা? ওরা তো নির্ভাৎ ভাইবোন!’ পালদেম এবার হাসল, ‘দেখাচ্ছে বটে তাই কিন্তু এটাই সত্যি। ওরা মা মেয়ে আর এই ছেলেটা হল মেয়েটির মায়ের স্বামী। আমাদের কাছে ব্যাপারটা অবাক হওয়ার নয়। যে দেশের যা নিয়ম।’

জয়িতার মুখে কথা নেই। সে কোন বিশ্বাসেই কাছাকাছি আসতে পারছে না। মহিলার বয়স যদি পঁয়ত্রিশও হয় ছেলেটা যে ষোল পার হয়নি তাতে সে নিঃসন্দেহ। অবশ্য পাহাড়ি ছেলেদের বয়স চট করে ধরা মুশকিল কিন্তু এক্ষেত্রে ওকে যুবক ভাবাই যাচ্ছে না।

দেখা গেল পালদেমের কথা শুনে মেয়েটিকে নিয়ে তার মা খানিক এগিয়ে এসে বসেছে। আনন্দ জয়িতাকে নির্দেশ দিতে সে এগিয়ে গেল। জয়িতা কাছে গিয়ে বলল, ‘তুমি ভয় পেও না। আমরা তোমার উপকার করতে চাই।’ কিন্তু খুব একটা প্রতিক্রিয়া হল না। শুধু মহিলার মুখে এবার একটু হাসি ফুটল। জয়িতা দেখল ক্ষত বেশ পুরোন এবং তা চামড়ার নিচেও বিস্তৃত হয়েছে বলে তার বোধ হল। আনন্দের কথায় সুদীপ স্টোভ জ্বেলছে। এই গ্রামে আসা মাত্র যে কাণ্ডটা ঘটল তার আতঙ্ক এখনও তাকে ছেড়ে যায়নি। মনে হচ্ছিল লোকগুলো তাকে মেরেও ফেলতে পারে। অথচ সে মেয়েটার অবস্থা দেখে—। পাশের ঘরটা থেকে আনা জল গরম করতে গিয়ে তার এবার আরাম লাগছিল। এই ঠাণ্ডায় স্টোভের আগুন খুব আরামদায়ক।

গরম জল হয়ে গেলে জয়িতা খানিকটা তুলো তাতে ভিজিয়ে মেয়েটির মাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে। এখন সমস্ত গ্রামের মানুষ হমড়ি খেয়ে দেখছে কাণ্ডটা। পালদেম আরও বিশদ করে বলার পর মহিলা গরম জলে ভেজানো তুলোটা নিয়ে মেয়েটার ক্ষত-এর ওপর চেপে ধরতে সে পরিব্রাহি চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিল মহিলা। দেখা গেল মেয়েটির তুলোয় চাপা জায়গাটা সাদা হয়ে গেছে। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল। মেয়েটি আর কিছুতেই রাজী হচ্ছে না, তার মাকে কাজ করতে দিতে। জয়িতা প্লাভস খুলল। তারপর মেয়েটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, ‘আমাকে হাত দিতে দাও। যদি একটুও ব্যথা লাগে তাহলে তুমি চলে যেও।’ মেয়েটি তীব্র দৃষ্টিতে জয়িতাকে দেখছিল। জয়িতা ওর মাথার প্রায় জট পাকানো চুলে হাত বুঝিয়ে দিল। পালদেম জয়িতার কথাটা অনুবাদ করে দিলে মেয়েটির চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হল। এবার জয়িতা আবার গরম তুলো তুলে খুব আলতো করে ক্ষতের ওপর বোলাতে লাগল। মেয়েটি কাঠ হয়ে বসেছিল যন্ত্রণার আশংকায়। কিন্তু গরম জলের সংস্পর্শে

এবং জয়িতার সতর্ক আঙ্গুল তাকে একটু একটু করে আরাম দিচ্ছিল। সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কিন্তু বারংবার তুলো সেখানে ডোবাতে তার ঝুপ পাশ্বে গেল। অন্তত সোয়া ইঞ্চি ময়লা পুরু হয়ে আটকে ছিল বিরাট ক্ষতের ওপর। গরম জলে ধোওয়া হয়ে গেলে ক্ষতের চেহারা পাশ্বে গেল। কানো হলদেতে মেশা ক্ষতের বদলে এখন পুরোটা লাল দগদগে হয়ে গেল। জয়িতা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'সাধারণ ঘা না রে। পাস বেশী নেই। কি ওষুধ দেব?'

আনন্দ একটা টিউব এগিয়ে দিল বাক্স থেকে। এই মলম ঘা শুকিয়ে দেওয়ার কাজ খুব শুর্ত করে। কিন্তু আনন্দ অবাক হচ্ছিল জয়িতাকে দেখে। ওরকম ক্ষতে কি অবলীলায় হাত দিচ্ছে জয়িতা। মেয়েটা যেন ঘেন্না শব্দটার সঙ্গে কখনই পরিচিত নয়। একটু একটু করে মলমটা মেয়েটার ক্ষতের সর্বান্তে ভাজ করে লাগিয়ে দিল জয়িতা। মেয়েটি এখনও চুপ করে বসে আছে চেখ বন্ধ করে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ব্যাণ্ডেজ করতে তো অসুবিধে হবে। অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে।'

সুদীপ জয়িতার কাজ দেখছিল, 'ব্যাণ্ডেজের দরকার নেই। ওকে বুঝিয়ে দে যেন ধুলো না লাগায়।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। খোলা রাখবি না। আলতো করে ব্যাণ্ডেজ কর। ব্যাপারটা ওদের চোখের আড়ালে রাখা দরকার। ওর চিকিৎসা হচ্ছে এমন মানসিক স্বস্তি দেওয়া দরকার।'

জয়িতা জমাট তুলো ক্ষতের ওপর বিছিয়ে তার ওপরে ব্যাণ্ডেজ করতে লাগল। গলায় অসুবিধে হল না কিন্তু বিপাক হল মুখের কাছে এসে। শেষ পর্যন্ত মুখের অনেকটাই ঢাকা পড়ল। এবার দর্শকদের মধ্যে হাসি শুরু হল। মেয়েটিকে এখন চেনা যাচ্ছে না এইটেই আলোচ্য বিষয়। রমণী মেয়েটিকে প্রথমে করতে সে মাথা নেড়ে না বলল। আনন্দ এবার দুটো ক্যাপসুল দিল পাজদেমের হাতে।

মেয়েটিকে অনেক জোরজবরদস্তি করে একটা তখনই খাইয়ে দেওয়া হল। ঝিড়ীমাটি জালামী ভোরে ঘুম থেকে উঠে খাওয়ারে বলল কিছু খাবার খাওয়ার পর। তার ভয় হচ্ছিল যার পেটে কোনদিন ওষুধ পড়েনি তার কি প্রতিক্রিয়া হয় কে জানে। তার হাঁছে সঙ্গেও ডোজ কমিয়ে দিল সে। পাজদেম মারফৎ মেয়েটিকে বারংবার সতর্ক করে দেওয়া হল কোন অবস্থাতেই ব্যাণ্ডেজ হাত না দেয়। যেন ওটা খুঁশে ফেললেই মেয়েটি মরে যাবে। ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার পর মহিলাকে খুব অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল। মা হিসেবে বোধ হয় সে বুঝতে পারছিল যা করা হল তাতে তার মেয়ের উপকারই হবে। ভিড় এখন মেয়েটিকে ঘিরে। সবাই ওর ব্যাণ্ডেজ আঙ্গুল ছোঁয়াতে চাইছে আর সে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল কয়েকজন বৃদ্ধ এবং মাতব্বর ব্যক্তিকে নিয়ে কাহন এগিয়ে আসছেন। পৌঁছে কাহন ঘটনাস্থলে মেয়েটির মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সে

গড়গড় করে বলতে লাগল। কাহ্নের মুখে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের অনেকগুলো ভাঁজ ফুটে উঠল। তিনি ঝুঁকে মেয়েটির সঙ্গে কথা বললেন। মেয়েটি বাঃবাঃ মাথা নাড়তে আরম্ভ করল। তারপর কাহ্ন পালদেমকে প্রশ্ন করল জড়ানো গলায়। পালদেম সেটা আনন্দকে শোনাল, 'কাহ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, কেন মেয়েটির মুখ তেঁকে রাখা হয়েছে? এটা কি কোন মন্ত্রের কারণে?' জয়িতা হেসে ফেলতে আনন্দ তাকে হাত তুলে থামাল। তারপর বলল, 'ওতে তাড়াতাড়ি অসুখ সারে।'

পালদেম সেটা জানিয়ে দিতে কাহ্ন আবার প্রশ্ন করলেন। সেটা পালদেম জানালো, 'কাহ্ন জিজ্ঞাসা করছেন তোমাদের সঙ্গে আসা ওই লোকটির হাতেও কি এই রকম ঘা হয়েছে?'

কল্যাণ চুপচাপ শুনছিল। প্রমত্তা শোনাঃমাত্র তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'যাঃ শালা!'

আনন্দ কল্যাণের ব্যাপ্যরটা বলল। কাহ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর কিছু একটা ঘোষণা করে সদলে ফিরে গেলেন। পালদেম বলল, 'কাহ্ন হুকুম দিয়েছেন—যতক্ষণ না মেয়েটির মুখ থেকে ওটা না খোলা হচ্ছে ততক্ষণ তোমাদের নিয়ে কি করা হবে তা পরে চিন্তা করবে গ্রামের মানুষ।' আনন্দের মুখে হাসি ফুটল। সে বলল, 'কাহ্নের আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু তুমি বলেছিলে এই গ্রামে কোন মোড়ল নেই। মোড়লকে তোমরা কি বল?' 'পালা। না নেই। কাহ্ন পালা নয়। কিন্তু কাহ্ন আমাদের ধর্ম বাঁচিয়ে রাখেন। তাই আমাদের জীবন সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা আমরা শুনি। তোমরা এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করো না। সে রকম হলে তোমাদের বিপদ হবে আর আমিও ছাড়া পাব না! তোমাদের সঙ্গে যে বন্দুক আছে তা আমি গ্রামের লোকদের বলে দিয়েছি।' পালদেম চলে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কোন মানুষ আর এখানে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এই সময় হাওয়া শুরু হল। সান্দাকফুতে যে বাতাস ওরা পেয়েছিল তার থেকে অনেক ধারালো, এত গরম জামা প্রায় ভেদ করে ফেলেছে। ওরা চটপট ঘরে ফিরে এল। মোমবাতি জ্বলে আনন্দ আর সুদীপ প্রথমে হাত লাগাল ফাঁকগুলো ঢাকতে। মোটামুটি ভদ্রস্থ করার পরও ঘর থেকে গন্ধটা দূর হল না। সুদীপ আবার স্টোভ জ্বলেছে। চায়ের জল গরম করার সমস্ত ওরা স্টোভটাকে ঘিরে বসল। কল্যাণ বলল, 'অতিরিক্ত স্মার্ট' হলে কি হয় তার প্রমাণ আজ সুদীপ দিল। আর একটু হলে গণধোলাই-এ প্রাণ বেরিয়ে যেত।'

সুদীপ বলতে গিয়েও বলল না। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেরোসিন তেল কতটা আছে?'

সুদীপ বলল, 'আর একবার ভরা যাবে।' ওকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

আনন্দ বলল, 'সুদীপ কাজটা না করলে কাল সকালে ওরা আমাদের চলে যেতে

বাধা করতো। এখন ভাগ্যগুণে ক'দিন সময় পাওয়া গেল। 'মেয়েটার ব্যাণ্ডেজ ত্যাগ করে খোলা হবে না।'

কল্যাণ আঁতকে উঠল, 'তুই এখানেই থেকে যাবি নাকি? আমাদের তো ওয়ালাং চাওে যাওয়ার কথা।'

আনন্দ উত্তর দিল, 'ওয়ালাং চাও যে ফুল ছড়ানো হবে তা তোকে কে বলল? যে কোন নতুন গ্রামে গেলে সৈখানকার মানুষদের সঙ্গে ভাব জমাতে হয় থাকতে গেলে! এটা এখানে শুরু হয়েছে।'

কল্যাণ বলল, 'শুরু হয়েছে? ওরা প্রথমে আমাদের মারতে এল, তারপর শাসিয়ে গেল। আর তুই বলছিস—?'

'ঠিকই বলছি। এই গ্রামটার নাম আমি ম্যাপে দেখিনি। আমাদের পক্ষ এখানে থাকারটাই সুবিধেজনক। এর আগে কোন বিদেশী এখানে রাত কাটায়নি। খুব কম মানুষের চ্যাওথাপু পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত আছে। আমাদের খবর ফালুটের পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছাতে সময় লাগবে। আর পৌঁছালেও তারা তাদের এজিন্সারের বাইরে আসবে বলে মনে হয় না। আমরা বিদেশী রাষ্ট্রে রয়েছি এখন।' সুদীপের বাড়ানো চাঙ্গের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে চুমুক দিগ আনন্দ। দিগে বলল, 'আঃ অমৃত।'

কল্যাণ চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল, 'চিনি লাগবে।'

ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ কাটাল। চা বিস্কুট খাওয়ার পর খিদেটা যেন আরও চাঙ্গিয়ে উঠেছে। স্টোভ নিবিয়ে ফেলার পর ঠাণ্ডাটা আরও বেড়ে গেল। কার্ঠের দেওয়ালে বাতাসের শব্দ হচ্ছে। কান পাতলে মনে হয় যেন বুনো মোষ তেড়ে আসছে। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল আচমকা, 'আমরা কবে ফিরে যাবি?'

আনন্দ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়!'

কল্যাণ বলল, 'কলকাতায়। আমরা চিরকাল এখানে থাকতে আসিনি।'

আনন্দ অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'যাব। তবে এখনই নয়।'

কল্যাণ বলল, 'এখানে থাকলে আমাদের পুলিশের ভয় থাকবে না, জেলে যেতে হবে না। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা থাকলে তো মরেই যেতে হবে। পুলিশ যদি সমস্যা হয় তাহলে আমরা চুপচাপ কলকাতায় ও সব না করে থেকে যেতে পারতাম।'

আনন্দ বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখ কল্যাণ। তুই জয়িতার কাছে আফসোস করেছিসি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিস বলে। আমরা সবাই জানতাম যা করেছি তা করে দেশের অবস্থা পাল্টানো যায় না। কিন্তু আমরা নাড়া দিতে চেয়েছিলাম। সাধারণ মানুষ যদি আমাদের কাজ-কর্মে খিলারের আনন্দ পায় সেটা আমাদেরই অক্ষমতা। কিন্তু এসব আমরা জেনে গুনেই করেছিলাম।

তোকে কেউ জোর করেনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে না। কলকাতাকে একটু শান্ত হতে দে। ধরা পড়লে আমাদের তো কিছুই করার থাকবে না। ধর যদি কলকাতায় ধরা পড়তাম তাহলে আজ বিকেলে

এই মেয়েটির চিকিৎসা হত না। এভাবে সমস্যা বাড়িয়ে দিস না।’
কল্যাণকে এসব কথা শোনার পরও খুব সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল না। সে ঠাট্টার
গলায় বলল, ‘অসুখে সেবা করাই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে ওসব করার কি
দরকার ছিল, মাদার থেরেসার সঙ্গে কাজ করলেই তো হতো।’

হঠাৎ জয়িতা প্রমত্ত করল, ‘তুই তো বেশ বড় কথা বলছিস। আজই যদি আমরা
কলকাতায় ফিরে গিয়ে কোন অ্যাকশন করি এবং সেটা করতে গিয়ে আমাদের
একজন মারা যায় এবং সেই সম্মানে তাকে সম্মানিত করি তাহলে তুই
রাজী আছিস?’

কল্যাণ বলল, ‘আমাকে কেন?’

জয়িতা বলল, ‘দেন স্টপ ইউ। খামোকা মেজাজ নষ্ট করে দিচ্ছিস। সুদীপ
ভাত রাঁধবি? হেঁড়ি খিদে পেয়ে গেছে।’

বিকেলের ঘটনার পর সুদীপ খুব চুপচাপ হয়ে গেছে। এখন বলল, ‘নৌ
প্রবেম!’

আনন্দ মনে করিয়ে দিল, ‘পালাদেম খাবার দিয়ে যাবে বলেছে।’

জয়িতা বলল, ‘তাহলে ওয়েট কর! আচ্ছা এরা কি খায়? সোস’ অফ
ইনকাম কি?’

আনন্দ বলল, ‘চাষ দেখলাম। পাহাড়ে আর কত ফসলই বা হবে? গ্রামের
বাইরে যায় না। বোঝাই যাচ্ছে অবস্থা খুব খারাপ। এখানকার জন্মলে
ফলটলও হয় বলে মনে হয় না। মুরগী আর ছাগল দেখেছি। আমি জানি
না এরা কিভাবে বেঁচে আছে!’

ওই সময় পালদেম এল। একটা পাজেই খাবার এনেছে সে। বোঝা যাচ্ছে
ঠাণ্ডায় তারও কাঁপুনি আসছিল। জয়িতা খাবার নিয়ে তাকাল। মারাশুক
দেখতে কয়েকটা রুটি আর তরকারি। তরকারিটা কিসের তা বুঝতে
পারল না সে। কোন কথা না বলে পালদেম চলে গেলে ওরা খাবার নিয়ে
বসল। আলু বলে যা মনে হয়েছিল তা যে আলু নয় মুখে দিয়েই মালুম
হল। এত কুৎসিত স্বাদ ওরা কখনও পায়নি। রুটি ছিঁড়তেই কণ্ট হচ্ছিল
এবং তাতে মোটা মোটা দানা রয়েছে। জয়িতা লক্ষ্য করল মন্তব্য করতে
করতে সবাই খাবারটা শেষ করল। কল্যাণ বলল, ‘এই খেলে আর
বাঁচব না।’

আনন্দ বলল, ‘কাল থেকে নিজেরাই চেষ্টা করব।’

হাওয়ার তেজ আরও বাড়ছিল। এখন ঝড়ের মত শোনাচ্ছে। শীত থেকে
বাঁচার জন্যে ওরা ব্যাগের ভেতরে ঢুকে গেল। জয়িতা এবার ট্রাজিস্টারটা
বের করল। মোমবাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারে সে স্টেশন ধরার
চেষ্টা করছিল। তিব্বত না চীন বোঝা যাচ্ছে না। হংকং কিনা তাই বা
কে জানে। কোন ভারতীয় স্টেশন সে ধরতে পারছিল না। শুধু একটার পর
একটা দুর্বোধ্য ভাষার গান বেজে যাচ্ছিল। এবং হঠাৎই সে বাংলা শব্দ শুনতে

পেল। বাংলা শব্দ কিন্তু বলার ধরন অন্যরকম। কলকাতা কিংবা ঢাকা নয়। তারপরেই কানে এল বি বি সির সংবাদপাঠকের পরিচয়। আন্তর্জাতিক খবর দেওয়ার সময় স্টেশনটা হঠাৎ উবে গেল। নিজেদের কথা শোনার সুযোগ নেই বলে সে রেডিওটা অফ করল। এই সময় কল্যাণ বলল, 'আনন্দ কাল আমার হাতের গয়নাটা খুলে দিবি?'

আনন্দ বলল, 'দেব।'

আম তখনই ঝড়ের শব্দের সঙ্গে আর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার মিশে গেল। যেন দূরে এভারেস্টের গায়ে কেউ কাঁদছে থেমে থেমে। সেটা কাল্লা না আর্তিনাদ তা টের পাওয়ার উপায় নেই অবশ্যই। কিন্তু সেই অপ্ৰাকৃত শব্দ ওদের নিঃসাড় করে দিল।

।।৩৩।।

প্রথম চোখ মেলল জয়িতা। কয়েকমুহূর্ত একটু অগোছালো, কোন কিছুই যেন ঠিক মাথায় আসছে না, তারপর খেয়াল হল। বাতাসের শব্দ নেই কিন্তু মনে হচ্ছে তার নাক অসাড় হয়ে গেছে। ওটা আছে এমন অনুভূতিও নেই। একদম চাপা দিয়ে শোওয়ার অভ্যেস নেই, দম বন্ধ হয়ে আসে বেশিফণ থাকলে। কল্যাণটা কি আরামে ঘুমাচ্ছে। বাকি দুজনেরও জেগে থাকার কোন সন্ধান নেই। অথচ এখন, জয়িতা ঘড়ি দেখল, সকাল আটটা বাজে। এ ঘরে এখনও আবছায়া। কাল সারারাত মড়ার মত ঘুমিয়েও ক্লাস্তি জড়িয়ে আছে। জয়িতার ঘুম ভাঙ্গার কারণটা তাকে ঘেরা-উত্তাপের বাইরে আনল। ঘরের ভেতরই প্রচণ্ড কাঁপুনি লাগছে, বাইরে গেলে কি হবে। অথচ বাইরে যেতে হবেই। ছেলদের যে সুবিধেগুলো তারা ঈশ্বরের হাত দিয়ে করিয়ে নিয়েছে সেখানেই তাদের হার।

আপাদমস্তক তেকে বাইরে আসতেই সিঁটিয়ে দাঁড়াল সে। এখন হাওয়া নেই। রোদও নেই। মাটিতে ভিজ়ে শিশির যেন জমে আছে। ওপাশের হিমালয় সাদা বরফের ঢুড়ো নিয়ে যেন সম্যাসীর মত চুপচাপ। সাদা দাড়ির মত কিছু খুঁচরো মেঘ ঢুড়োর গায়ে গায়ে ঝুলছে। চট করে যেন সব শীত উধাও। জয়িতার আফসোস হচ্ছিল। কতবার শোনা সেই গল্পটা মনে পড়তেই রাগ হয় নিজের ওপর। সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙল না কেন? সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে থেকে আকাশের সাজগোজ দেখতে দেখতে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঈশ্বর দর্শনের আরাম তাকে কালকে পেতেই হবে।

সে মুখ ফেরাল। কোথাও মুরগী ডাকছে কিন্তু এছাড়া কোন প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না। তাপল্যাণ্ডের মানুষেরা এখনও ঘরের বাইরে বের হয়নি। ছোট ছোট ঘরগুলো কাঠ এবং গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি। শীতকালে নিশ্চয়ই প্রচুর বরফ পড়ে, বরফ ঝড়ি হয়, পাহাড় বলে ঝড়ও ওঠে কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ঘরগুলো কি করে টিকে থাকে? যদিও গ্রামটা একটা পাহাড়ের

আড়াল নিয়ে তৈরী তবু ঘরগুলোর দিকে তাকালে তো আস্থা রাখা যায় না। জয়িতা প্রায় দৌড়ে ঘরের পেছনে চলে এল। ওপাশে সেই ঝরনা থেকে জল পড়ছে। কোনরকমে একটা আড়াল তৈরি করে নিয়ে সে ভারমুক্ত হয়। এবং তারপরেই সে অস্বস্তিটা টের পেল। মাসের একটি বিশেষ সময়ে এই অস্বস্তিটা শুরু হয়। দিন দুয়েক থাকে যন্ত্রণাটা। তিনদিন ক্রমাগত রক্তপাতের পর যন্ত্রণাটা কমে আসে। জয়িতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আচমকা সে তিন বন্ধুর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ মাইল দূরে সরে এল। এসব কথা মেয়েদেরই। তার প্রথম অভিজ্ঞতার পর সীতা রায় এমনভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যেন এটা অত্যন্ত গোপন ব্যাপার। ছেলেদের দৃষ্টি এবং কর্ণের সীমানায় আনা উচিত নয়। যদিও সীতা রায় মুখে বলেননি তবু ভঙ্গীতে মনে হয়েছে এটা মেয়েদের ওপর অপিত অপরাধ। রামানন্দ রায়কে বলার প্রয়োজন নেই, শোভনও নয়। যতই সে সমস্ত সংস্কার বেড়ে ফেলতে পারুক ওই বয়সে ঢোকানো মায়ের মানসিকতা বোধ হয় এ জন্মে ত্যাগ করা সম্ভব হবে না। অথচ এখানে কোন আড়াল নেই। একই ঘরে তিনজন পুরুষের সঙ্গে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে। মুখ ফুটে না বললে, নিজেরই বিপদ। এবং সেটা বলা মানে স্বীকার করে নেওয়া আমি তোমাদের থেকে আলাদা, যথার্থই মেয়ে। পৃথিবীর নিয়মটাই প্রকৃতি অনুকরণ করেছে এক্ষেত্রে। যাদের সুবিধে ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য কোন কৃপণতা নেই কিন্তু যাদের মধ্যে বাধা তাদের আপাদমস্তক বেড়ি পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

অন্তত দুদিন নিশ্চিত, অবশ্য ঠাণ্ডার জন্যে যদি নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে। ঘরের দিকে ফিরে আসতে আসতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ছেলেদের যেটাকে সুবিধে বলে ভাবা হয়ে থাকে, সেটা তারা সহজ করে নিয়েছে বলেই তো। কাল রাত্রে ঠাণ্ডায় ওরা বাইরে আসেনি। দরজা থেকেই অন্ধকারে শরীরের ভার কমিয়েছে। কিন্তু সেটা ছিল প্রত্যক্ষ চোখের আড়ালে, কিন্তু ঘটনাটা বোধের মধ্যে ঘটলেও ওইটুকু আত্রুর কারণেই ওরা সহজ ছিল। এই সুবিধে যদি ওরা আদায় করে নিতে পারে তাহলে শুধু মেয়ে বলেই সে সঙ্কোচ করে নিজেকে কণ্ট দেবে? ওরা যা যা করছে তার কোনটা সে কম করছে? পরিশ্রম বৃদ্ধি এবং শিক্ষায় সে তো পিছিয়ে নেই। নারী স্বাধীনতার ব্যাপারটা তার কাছে হাস্যকর। তথাকথিত আরোপিত নারীত্বমুক্তিই মেয়েদের কাম্য হওয়া উচিত। বিশেষ এই কণ্টের দিনগুলোর জন্যে সে দায়ী নয়। উপায় নেই বলে তাকে সহ্য করতে হবে। কিন্তু এটা তার লজ্জা হবে কেন? সে পরিষ্কার বলতে পারে আমি অসুস্থ, তোমরা আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও। জয়িতার মনে হল আমাদের অধিক সমস্যা। বলতে না পারার জন্যে বেড়ে তীব্র এবং ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু একবার বলতে পারলে সেটার আর কোন ওজন থাকে না। মায়ের শেখানো বুলি এবার বেড়ে ফেলতেই হবে।

'তোমার কি হয়েছে?' প্রশ্নটা শুনে জয়িতা চোখ তুলে তাকাল। সুদীপের মুখ ভাঙ্গ করে দেখা যাচ্ছে না পোশাকের প্রাবল্যে কিন্তু চেহারার আদলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

জয়িতা পাথটা প্রথ করল, 'কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে কেন? আমার চেয়ে আমার ব্যাপারটা দেখছি তুই বেশী বুঝতে পারছিস।'

সুদীপ ঝগল, 'মাঃ বাবা। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। মুখ গোমড়া করে মাথা নামিয়ে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস দেখে মনে হল তোর শরীর খারাপ, তাই প্রশ্নটা করলাম। কিন্তু তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছু চেপে থাকছিস। তোর ওপর কল্যাণটার ইনফ্লুয়েন্স পড়ছে এবার। কমপ্লেক্স ঝেড়ে ফেল জয়।'

'আমার কোন কমপ্লেক্স নেই। কল্যাণকে তুই পছন্দ করিস না এই কথাটা বার বার বোঝাস কেন?' জয়িতা উঠে এল।

'ওই নাকিকান্না আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। জেনে শুনে বাঁপ দিয়ে প্রতি পায়ে নাকিকান্না কাঁদছে। আমাদের উচিত ছিল ওকে কলকাতায় রেখে আসা। তুই লক্ষ্য করিস ও মনে মনে আমাকে ঈর্ষা করে।' সুদীপ বলতে বলতে নেমে গেল নিচে। তারপর জয়িতা এবং বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অবলীলায় ভারমুক্ত হল। সেদিকে তাকিয়ে জয়িতার জেদটা আরও বাড়ল। সম্প্রদায়, সঙ্কোচ, গুপ্ততা, আড়াল, মেয়েলি জগৎ, শালীনতা শব্দগুলো ছেলেরাই তৈরী করে নিজেদের সুবিধে মতন কোন এককালে, মেয়েদের মধ্যে তুর্কিয়ে নিশ্চিত হয়েছে। আর মেয়েরা তার বোঝা টেনে চলেছে। আসলে মেয়েদের শত্রু হল মেয়েরাই। নিজেদের কাঁচের বাসন করে রেখেই তাদের ভূষিত। অন্তত আমাদের দেশের মেয়েদের বটেই। ফাঁপা বেলুনের মত সম্প্রদায় শব্দটাকে আঁকড়ে ধরে বড় হচ্ছে মরে যাচ্ছে। অথচ প্রতি পায়ে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে যে অসম্মান তার কথা ধর্তব্যে আনছে না। একটি নারী তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বামীত্বের লাইসেন্স পাওয়া পুরুষটির দ্বারা ধর্মিতা হলে সম্প্রদায় হলে বসে এদেশে মনে করে না, কিন্তু শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করেও যাবে অথচ কোন অবস্থায় পথ চলতে গিয়ে কারো বাড়িতে নক করে বলবে না, আপনার টয়লেট ব্যবহার করতে চাই। ওটাতে সম্প্রদায় থাকবে না বলে শৈশবে তাকে বোঝানো হয়েছে এবং সেই বোঝা সে টেনে বেড়াচ্ছে। মেয়েদের এসব সংস্কার মতটা না তাদের নিজেদের জন্যে তার চেয়ে বহুগুণ ছেলেরা খুশী করতে।

'সূর্য উঠে গেছে, না?' সুদীপ কাছে এসে দাঁড়াল।

'তোমার জন্যে বসে থাকবে?' জয়িতা সহজ হতে চাইল।

খোঁচাটা গায়ে মাখল না সুদীপ। চারপাশে নজর বুলিয়ে বলল, 'জায়গাটা দারুণ না রে?'

'কাল আর একটু হলো তোর এই দারুণ বেরিয়ে যেতে!'

'ছাড়! আমি বাচ্চা মেয়েটার উপকার করতে গেলাম আর তার বদলে—!'

মানুষ কত সহজে ভুল বোঝে। কিন্তু ভাবছি অন্য কথা। এই লোকগুলো এখানে বেঁচে আছে কি করে ?

সুদীপের প্রশ্ন শুনে জয়িতা আবার বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। এখানে ফসল ফলানোটাই কঠিন ব্যাপার। যা ফলে তাতে সারা বছর চলে না। মুরগী, পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া আছে। তাই খেয়ে ফেললে তো হয়ে গেল! জঙ্গলে ফল হয় বলেও মনে হয় না। কোনরকম ব্যবসা বাণিজ্য কেউ করে না, শহর তো দূরের কথা। চ্যাঙথাপুতেও যাওয়া আসা নেই। তাহলে ?—সুদীপ বলল, 'এই লোকগুলো বেশীদিন বাঁচবে না। কাল যে মেয়েটাকে আমরা ওষুধ দিলাম তার মায়ের স্বামীকে দেখেছিস? ভাবা যায়? মহিলাটি বিধবা হবার পর স্বেচ্ছায় একটি কিশোরকে বিয়ে করেছিল একথা অনুমান করা যায়। ব্যাপারটা ভাল করে জানতে হবে।' সুদীপ হাসল।

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'জেনে তোর কি লাভ ?'

মাথা নেড়ে কৌতূহলের গলায় সুদীপ বলল, 'এই গ্রামে মনে হচ্ছে পুরুষদের ডিম্বাণ্ড আছে।'

জয়িতা হেঁট কামড়াল, 'মেয়েটার যা না শুকোলে ওরা আমাদের শেষ করে দেবে।'

এই সময় আনন্দের গলা ভেসে এল 'সুদীপ, জয়িতা তাড়াতাড়ি ভিতরে আয়।'

ওরা ভেতরে ঢুকে দেখল আনন্দ বিভ্রান্তের মত চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

আনন্দ ওদের দিকে তাকাল, 'ব্যাগটা নেই। অথচ কাল বিকেলে ওইখানে রেখেছিলাম।'

কোন ব্যাগটার কথা আনন্দ বলছে বুঝতে অসুবিধে হল না। সুদীপ জিনিসগুলো উল্টোপাল্টে দেখল। তারপর বলল, 'আশ্চর্য! কে নেবে এখান থেকে!'

কল্যাণ তখনও ঘুমাচ্ছে। সুদীপ চট করে যেখানে গিয়েছিল তার কাছে পৌঁছে হাতড়ালো, 'আরে, আমার রিভলভারটাও নেই। অস্ত্র ত কাণ্ড!'

আনন্দ বলল, 'আমারটাও পাচ্ছি না। যে গ্রেনেড এবং গুলির বাক্স নিয়ে গিয়েছে সে আমাদেরগুলো বাদ দেয়নি। একটা লোকের মুখই মনে পড়েছে। পালদেম!'

'ও কেন নেবে? এসব ব্যবহার করতে ও জানে না। তাছাড়া আমার জামাকাপড় এবং টাকার ব্যাগটায় হাত দেয়নি। শুধু বেছে বেছে আর্মস নিয়ে গেল?' সুদীপ হতভম্ব।

'ও প্রথম থেকেই ভয় পেয়েছিল আমাদের হাতে ওসব দেখে। ওগুলো থাকলে আমাদের ক'জা করা যাবে না ও জেনেছিল! এখন কি করা যায়?' আনন্দকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

সুদীপ বলল, 'কিছু করার নেই। যে নিয়েছে সে চাইলে ফেরৎ দেবে না।'

মুশকিল হল, পুলিশ এলে আমাদের আর লড়াই করার উপায় থাকল না। কি ঘুম ঘুমিয়েছি, একটু টের পেলাম না। ওটাকে ডাক তো। এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে সহ্য করতে পারছি না।’

এই সময় চোখ মেলায় কল্যাণ, ‘কটা বাজেরে? খুব খিদে পেয়েছে।’
আনন্দ বলল, ‘ওঠ। কাল রাত্রে এই ঘরে চোর এসেছিল। আমাদের রিভলবার ওগি, গেনেড নিয়ে গেছে। তোর ব্যাগে যে রিভলভারটা রাখতে দিয়েছিলাম সেটা আছে কিনা দ্যাগ।’

কল্যাণ শুদ্ধাক করে উঠে বসে ব্যাগ হাতড়াল। নিজের বিছানা দেখল। তারপর অদ্ভুত গলায় বলল, ‘নেই।’

সুদীপ বলল, ‘এবার পেট ভরে খাও সবাই তুঁটো জগন্নাথ হয়ে। নিজের গালে নিজে চড় মারতে ইচ্ছে করছে।’

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর আনন্দ বলল, ‘এ নিয়ে ভেবে আর কি হবে? আমরা এমন ভাব দেখাব যেন কিছুই হয় নি। কেউ চুরি করেছে বলে জানি না। এই ঘটনায় আমরা বিন্দু মাত্র নার্ভাস হইনি। তাহলেই চোর অবাধ হবে। কিছু আমাদের কাছে এখনও রয়ে গেছে। ওরা অস্ত্রের ব্যবহার জানে না। শুধু ভয় হচ্ছে গেনেডগুলো না ফাটিয়ে বসে।’

ওরা যখন কথা বলছিল তখন জন্মিতা ধীরে ধীরে হাত নিজের কোমরের ওপর নিয়ে এল। সে আঙুলের চাপ দিতেই শক্ত হল। কোমরের কাছে রিভলভারটা রয়ে গেছে। আনন্দ তাকে দেওয়ার পরই সে কোমরে রেখেছিল। চোর বোধহয় মেয়ে বলে তার কোমরে হাত দিতে সাহস পায়নি। সে রিভলভারটার আদল আঙুলে অনুভব করে হাত সরিয়ে নিল। থাক তার কাছে যে একটা অস্ত্র বেঁচে আছে সেটা এখন বলার দরকার নেই। এবং তখনই তার মনে হল এই মুহূর্তে সে তার তিন পুরুষবন্ধুর চেয়ে অনেকটা বেশী সুবিধেজনক অবস্থায় আছে।

টাখেয়ে ওরা চারজন বাইরে বেরিয়ে এল। একটু আগে আকাশ যেটুকু পঙ্কিম ছিল এখন আর তা নেই। দলে দলে কুয়াশা উঠে আসছে নিচের খাদ থেকে। ওরা চারজন নিচে নেমে আসছিল। দুটো পাহাড়ের কোলে এই গ্রাম। বসন্ত হাওয়া যেদিক দিয়ে তেজী হয়ে আসে সেদিকটাই পাহাড় আটকে রেখেছে। আনন্দ বলল, ‘চল গ্রামটাকে ভাল করে দেখে আসি। ওরা চুরি করুক আর যাই করুক গত রাত্রে এখানেই আশ্রয় পেয়েছি আমরা, খাবারও দিয়েছে। এখন থেকে চলে যেতে হলে চট করে কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাবে জানি না।’

কল্যাণ বলল, ‘কেন, ওয়ালাওচুও আমাদের যাওয়ার কথা ছিল।’
আনন্দ জানাল, ‘উপায় না থাকলে সেখানেই শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাই আমাদের পক্ষে বেশী নিরাপদের।’
এখন গ্রাম জেগেছে। বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা ঘর এবং ক্ষেতের সংলগ্ন কাজে

নেমে পড়েছিল। তারা এখন ওদের দিকে অবাধ চোখে তাকিয়ে আছে। একটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে হঠাৎ সুদীপের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ল। এই ঠাণ্ডাতেও ওদের পা খালি, মাথা এবং মুখে কোন আবরণ নেই। গায়ের রঙ টকটকে লাল হবার উপক্রম। এই মেয়ে দুটোর গলগণ্ড নেই। সুদীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়ে দুটো হেসে যাচ্ছে সমানে আর সেই সঙ্গে সম্ভবত মন্তব্য ছুঁড়ছে। হঠাৎ ওপাশ থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ ধমকে ওঠায় ওরা চুপ করল। কিন্তু সুদীপের মনে হল নিঃশব্দে ওরা হাসছে। চারজনের মধ্যে ওকে বেছে নেওয়ার কারণটা সে অনুমান করতে পারল। সেই ওই বালিকার হাত ধরে টেনেছিল এই গল্পটাই বোধ হয় ওকে হাস্যকর করেছে এদের কাছে। কিন্তু শুধুই কি হাস্যকর। ভাষ্য অবোধ্য হলেও মেয়েদের ডঙ্গিতে যে নিজস্ব ভাষা থাকে তা পৃথিবীর সব দেশেই এক। সেটা যে অন্য কথা বলছে।

কল্যাণ ডাকল, 'কি হচ্ছে কি? আর একটা ঝামেলা বাধাবে দেখছি।' সুদীপ হাসল। তারপর বন্ধুদের সঙ্গী হয়ে বলল, 'মাথা খারাপ, আমি ঝামেলার ধারে কাছে নেই।'

ক্রমশ ওদের পেছনে একটি দুটি করে বাচ্চা জমে গেল। কাটা তরমুজের মত গাল নোংরা পোশাক এবং সমস্ত শরীরে অভাব খোদাই হয়ে আছে ওদের অথচ ঠোঁটে হাসি নিয়ে পেছন পেছন ঘুরতে উৎসাহের অভাব নেই। আনন্দ বলল, 'এককালে সাহেবরা কলকাতার গলিতে হাঁটলে এই দৃশ্য দেখা যেত। মানুষগুলো কিভাবে বেঁচে আছে দেখেছিস?'

'মিনি ভারতবর্ষ। আর অবাধ হওয়ার কিছু নেই। খোঁজ নিলে দেখবি এখানেও একজন জোতদার বা ধর্মযাজক আছেন যিনি শোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। ওই কাহন না কি বলে সে-ই হয়তো তাই।'

সুদীপ বলতে বলতে থেমে গেল। কয়েকজন যুবক ওপরে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে ওদের ওপর নজর রাখছে। হয়তো এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি কিন্তু তাদের ঘর থেকে বের হবার পরই ওরা পাহারা দিয়ে চলেছে। সুদীপ বন্ধুদের কিছু বলল না। তার ধারণা ভুল হলে আর একটা রসিকতার সামনে দাঁড়াতে হবে।

পুরো গ্রামটা ঘুরতে ঘন্টাখানেক সময় লাগল। অবশ্য পাহাড়ের অন্য ভাঁজে ঘর-বাড়ি থাকলে সেটা অজানা থাকল। জায়গা বেশি নয় কিন্তু বারংবার চড়াই ভেঙে ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। খোলা একটা জমি পেয়ে ওরা চারজন বসে পড়ল। বাচ্চাগুলো খানিক দূরত্ব রেখে থেমে গিয়ে ওদের লক্ষ্য করছে। মাথার ওপর কুয়াশা ঝুলছে। রোদ নেই এক ফোঁটা। কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তোদের কি খিদে পায় না? আমার নাড়িভূঁড়ি জ্বলছে কলকাতাতেও এমন খিদে পেত না।'

জয়িতা বলল, 'তুই এক কাজ কর। আমাদের আস্তানায় ফিরে গিয়ে যে

খাবার আছে তাই দিয়ে কিছু একটা বানিয়ে ফেল। আমরা আসছি। ইচ্ছে করলে ভাতও রাঁধতে পারিস। খুব সোজা।’

সবাই ভেবেছিল কল্যাণ প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াল। তারপর দিক ঠিক করে হাঁটিতে লাগল। বসে থাকা বচ্চারা কল্যাণকে চলে যেতে দেখে কেউ কেউ পিছু নিল। কল্যাণ খানিকটা হেঁটে বাচ্চাগুলোকে ধমকালো, ‘কি চাই? আমরা কি আজব চীজ? ভাগ!’

তার গলায় যে কাঁথ ছিল তাতে বাচ্চারা ধমকালো কিন্তু সরল না। দুবার পথ গোলানোর পর শেষ পর্যন্ত সে আস্তানাটায় পৌঁছাতে পারল। পৌঁছে দেখল পালদেম আর একটি কিশোর সেখানে বসে আছে। পালদেমকে দেখেই কল্যাণের মেজাজ বিগড়ে গেল। এই লোকটাই ওদের অস্ত্র চুরি করেছে? পালদেম মুখোমুখি হওয়া মাত্র জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমরা কি গ্রাম দেখতে বেরিয়েছ?’

‘হ্যাঁ। কিছু একটা করতে হবে তো। তোমাকে আমি একটা প্রস্ন করব!’

‘নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে তোমাকে জানাচ্ছি কাল রাত্রে তোমাদের ওইসব বাজে জিনিসগুলো আমি নিয়ে গেছি। ওগুলো তোমাদের সঙ্গে থাকলেই অমথা ভয় দেখাবে। যেদিন তোমরা এই গ্রাম ছেড়ে যাবে সেদিন সব ফেরত পাবে। এখানে তো আর ওসবের দরকার হচ্ছে না!’

পালদেম যে সোজাসৃজি স্বীকার করবে তা কল্যাণের অনুমানে ছিল না। সে এটা শোনার পর আর কি বলতে পারে! ঘরে ঢুকে ব্যাগ খুলে সে চাল আর আলু বের করল। হঠাৎ তার মনে হল স্টোভ ধরলে তেল শেষ হয়ে যাবে। পাথরের মধ্যে কাঠ ছেলে উনুন তৈরী করলে কেমন হয়! সে আবার বাইরে আসতে পালদেম জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার বন্ধুরা কি এখনই ফিরবে?’

‘হ্যাঁ। কোন দরকার থাকলে আমাকে বলতে পার।’ নিজেকে বেশ গুরুত্ব দিতে চাইল কল্যাণ।

‘ওর মেয়ে কাল সারারাত ঘুমাতে পারেনি। ওই ঘা হওয়ার পর এমন কখনও হয়নি। আমরা সবাই খুব ভয় পাচ্ছি। যদি মেয়েটির কিছু হয় তাহলে তোমরা মারা পড়বে। কেন ঘুমাননি?’

পালদেম বেশ কড়া গলায় প্রশ্ন করতে কল্যাণ একটু থিতুনে গেল। মেয়েটা ঘুমাননি? মারা গেলেই হয়ে গেল আর কি! সে কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, ‘আমি ঠিক জানি না। আনন্দ এসব বোঝে। এখন মেয়েটা কি করছে?’

‘এখন ঘুমাচ্ছে মরার মত। ওর মা তাই খোঁজ করতে পাঠিয়েছে। সকালে কি যেটা খেতে দিয়েছ তা খাওয়াবে? ভেবেচিন্তে বনো।’

পালদেম প্রশ্ন করতে কল্যাণ মুখ তুলে তাকাতে ওদের আসতে দেখল। সে বলল, ‘ডাক্তারবাবু আসছে, ওকে আসতে দাও, যা বলার ওই বলবে।’

দূর থেকে আনন্দ পালদেমকে কল্যাণের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল। ওরা সঙ্গে

সঙ্গে স্থির করেছিল চুরির ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলবে না। কাছাকাছি এসে সুদীপ হাত তুলল, 'আরে পালদেম, কি খবর? তোমাকে খুঁজেছি। কাল রাতে চিৎকার করে কে কাঁদছিল বলতো। বাপরে বাপ!'

পালদেমের মুখ গভীর হয়ে গেল। সে প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে কল্যাণকে ইশারা করল ব্যাপারটা জানাতে। আনন্দ লক্ষ্য করল আজ ওর ব্যবহারে বেশ কতৃদ্ধ এসে গেছে। কল্যাণ তাদের জানাল ব্যাপারটা। আনন্দ একটু চিন্তা করে বলল, 'এখন যখন ঘুমোচ্ছে তখন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যেটা দিয়েছে তা এবার অর্দ্ধেক করে খাইয়ে দাও। তোমরা মিছিমিছি চিন্তা করছ, মেয়েটা ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু কান্নাটা কিসের?'

পালদেম বলল, 'ওটা পাহাড়ের দানোর। মাঝে মাঝেই গ্রামের কাছে এসে ওইভাবে কাঁদে। আর যখনই দানোটা এমন করে তখনই গ্রামের কেউ না কেউ মরে যায়। কাহন আজ পূজা শুরু করেছে তাই।'

জয়িতা বিস্মিত, 'দানো? দৈত্য? তোমাদের ওই পাহাড়ে বরফের মধ্যে দৈত্য থাকে? পাগল!'

সঙ্গে সঙ্গে মুখ শক্ত হয়ে গেল পালদেমের, 'যা জানো না তা নিয়ে ঠাট্টা করো না। তুমি মেয়েছেলে বলে আমি কিছু বললাম না, এরা কেউ পাগল বললে আমি ছাড়তাম না?'

সুদীপ ঠাট্টা করল, 'মেয়েছেলে? মেয়েছেলেদের তুমি পাতা দাও না?'

'না। মেয়েছেলেকে আমরা বিছানা আর বাচ্চা তৈরির ক্ষেত্রে হিসেবে ব্যবহার করি। আমাদের এখানকার নিয়ম হল চাষের জমি পাহাড়ে থেকে ছিনিয়ে নাও, বরফের জন্য মকাই, কোদো জমিয়ে রাখ আর পেট ভরে ছাং খেয়ে মেয়েছেলের কাছ থেকে আনন্দ পাও।' পালদেম হাসল লাল দাঁত বের করে।

আনন্দ জয়িতার মুখ দেখে বুঝতে পারছিল ও এখনই রাগে ফেটে পড়বে। সে হাত বাড়িয়ে জয়িতাকে স্পর্শ করল, 'রাগ করে কোন লাভ নেই। ও এখন যা ইচ্ছে তাই বলতে পারে। এখানকার সত্যিটাও আমরা জানি না। কিন্তু পালদেম, তোমাদের ওই দৈত্যটাকে কেউ চোখে দেখেছে?'

'অনেকবার। ওর মুখ কেউ দেখতে পায় না কিন্তু শরীর দেখেছে অনেকেই। তবে যারা দেখেছে তাদের শরীরে রোগ ঢুকে যায়। আমাদের এখানে অনেকের গলায় যে অসুখ সেটা ওর জন্যে। ও কাঁদলে সেই কান্না আমাদের গলায় ফুলিয়ে দেয়। কাল তোমরা এলে আর ও কাঁদল। আমরা মেয়েটার জন্যে ভয় পাচ্ছি তাই।' পালদেমকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। মনে হল ও পূর্ণ বিশ্বাস থেকেই কথা বলছে।

'কিন্তু দৈত্যটা দেখতে কেমন?' কল্যাণ বেশ কৌতুহলী গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'গায়ে বড় বড় লোম, বিশাল চেহারা। কখনও চার হাত পায় কখনও দুই

পায়ের হাঁটে। সব সময় বরফের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। ঝড় বৃষ্টি ঠাণ্ডাতেই ওদের আরাম হয়। আমি ওর পায়ের ছাপ দেখেছি। এত বড় বড়। মাঝে মাঝে ওরা সবচেয়ে উঁচু বরফের পাহাড়ের ওপরেও উঠে যায়।’

‘কি করে বুঝলে?’

‘পাহাড়ে চুড়োটা কালো হয়ে যায় আর পৃথিবী তখন কাঁপতে থাকে থর থর করে।’

অনেক কণ্ঠে হাসি চাপল সুদীপ। বলল, ‘তোমরা পাহাড়ি ভাল্লুককে দেখেছ?’

ব্যঙ্গের হাসি ফুটল পালদেমের মুখে, ‘আমাকে ভালু চেনাতে এসো না। এই দানোদের তিনজন মাঝে মাঝে এখানে আসে। যখন চলে যায় তখন খুব জোরে শিস বাজায়। কাল ওরা শিস দেয়নি, মানে, এখনও এই এলাকাতেই আছে।’

কল্যাণ বলল, ‘ইয়েতি। ওটা নিশ্চয়ই ইয়েতি।’

সুদীপ ধমকালো, ‘ভাগ! ইয়েতি বলে কিছু নেই। হিলারি সমস্ত হিমালয় চম্বেছেন একটা ইয়েতির সন্ধানে। কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি শুধু পায়ের ছাপ ছাড়া। ওটা পরে পাহাড়ি ডাফ্লুকের বলে মনে করা হয়েছে। ফালতু সংস্কার। কিন্তু পালদেম, আমরা তোমাদের ওই দানোকে মেরে ফেলতে পারতাম যদি তোমরা কাল আমাদের অস্ত্র চুরি না করতে।’

সুদীপ আচমকা এই প্রসঙ্গে আসায় আনন্দ আর জন্মিতা পালদেমের প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করল। পালদেম মাথা নাড়ল, ‘তোমরা যাতে এখানে কোন খুনোখুনি না করতে পার তাই এই কাজ করতে হয়েছে। দানো আমাদের সঙ্গে বহু যুগ থেকে আছে।’

এতক্ষণ কিশোর চুপচাপ শুনছিল। সে কিছু বলতেই পালদেম জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাদের কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল অত অস্ত্র নিয়ে? তোমাদের মতলব ভাল নয় বলে মনে হচ্ছে।’

আনন্দ বলল, ‘আমরা খারাপ লোক নই। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদের বয়স বেশী নয়?’

‘তাতে কিছু এসে যায় না। তোমরা কি ডাকাতি করে পালিয়ে এসেছ?’ পালদেমের চোখে সন্দেহ।

‘না। আমরা ডাকাত নই। তোমাদের কোন ক্ষতি আমরা করব না।’

‘কি আছে। মেয়েটার কি হয় তা আগে দেখা যাক।’ পালদেম কিশোরকে ইশারা করতেই সে রওনা হচ্ছিল। জন্মিতা তাকে থামাল, ‘দাঁড়াও। বিছানা হওয়া ছাড়াও মেয়েদের অনেক কাজ থাকে। ওকে বলে দাও আমি ওর সঙ্গে যাব মেয়েটাকে দেখতে।’

পালদেম বেশ বিস্মিত, ‘তুমি ওর বাড়িতে যাবে?’

‘হ্যাঁ। কেন, তোমাদের কি আমার সম্পর্কেও শুয় আছে? ও কেন রাগে

যুমায়নি দেখতে চাই।’

জয়িতা কথা শেষ করে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর ফাস্ট এইডের ব্যাগটা নিয়ে নেমে এল, ‘ওকে বলে দাও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।’

খানিকটা ইতস্তত করে পালদেম ছেনেটাকে কথাগুলো জানাতে সে অবাক হয়ে জয়িতাকে দেখল। আনন্দ বলল, ‘কেন যাচ্ছিস বুঝতে পারছি কিন্তু সাবধানে থাকিস। বেশী দেরী করিস না।’

জয়িতা কোন কথা না বলে ছেনেটিকে অনুসরণ করল। পালদেমের কথাগুলো শোনার পর থেকেই তার শরীর ঘিনঘিন করছিল। সেই মুহূর্তে ইচ্ছা হয়েছিল লোকটাকে গুলি করে মারে। তার কাছে যে আর একটা রিভলভার আছে তা কেউ জানে না। কিন্তু পালদেমকে মেরে ফেললে এই গ্রামে বাস করা যাবে না। আর একটা রিভলভার কতক্ষণ পুরো গ্রামটাকে ঠেঁকিয়ে রাখতে পারে! সমস্ত যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে কি কৌশলে যুদ্ধ করা হচ্ছে তার ওপরে। এর বদলা সে নেবেই। জয়িতা তার সামনে হেঁটে যাওয়া ছেনেটাকে লক্ষ্য করল। বেশ বিভ্রান্ত হয়ে ও হাটছে। ওর শরীরের গড়ন বলে দিচ্ছে কিছুতেই কুড়ির কাছে পৌঁছাতে পারে না। অথচ ও ওই বাজিকার বাপ এবং শেষ যুবতীর স্বামী। কি করে সম্ভব? এখানে কি মেয়েদের চেয়ে ছেনেটাকে কম? সে অনেক কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক করে পেছনে তাকাল। তাদের আস্থানা বা বন্ধুদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জয়িতা হিন্দীতে ছেনেটিকে জিজ্ঞাসা করল, ‘এই যে ভাই, তোমার নাম কি?’

ছেনেটি মুখ তুলে তাকাল। ওর পরিষ্কার সরল মুখে হাসি ফুটল। তারপর দুবার নিচু গলার সে উচ্চারণ করল, বাই, বাই! জয়িতা বুঝল ও ভাই শব্দটাকে ধরতে পেরেছে। পথ চলতে ওয়াংদের কাছে শেখা শব্দ ব্যবহার করল সে, ‘তিমরো নাম?’

‘দুগদুপ।’ নিজের বুকে হাত রেখে ছেনেটি বলল, ‘মেরো নাম।’ এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হল না জয়িতার। তার মনে হল কান খাড়া করে শুনলে আর ওরা যদি একটু ধীরে কথা বলে তাহলে অনেক কথাই বোঝা যেতে পারে।

ক্রমশ ওরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারপাশে কৌতূহলী মেয়েপুরুষের ভিড়। এমন হতশ্রী চেহারা সত্ত্বেও মানুষের স্বাভাবিক রুত্তিগুলো ওরা আঁকড়ে আছে। পেছন পেছন মেয়েরা আসছে আর দুগদুপকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। দুগদুপ যেন হঠাৎ নিজেকে বেশ ক্ষমতাবান মনে করেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা নিচু দরজার ঘরের সামনে উপস্থিত হল। অতক্ষণে গতকালের সেই রমণীটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে মুখে বিস্ময়। দুগদুপ তাকে জড়িয়ে কিছু বলল। জয়িতা সেই শব্দাবলীর মধ্যে শুধু পালদেমের নামটাই বুঝতে পারল। রমণীটি মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে ভেতরে যেতে ইশারা করতে জয়িতা নিচু হয়ে পা বাড়াল। ঘরটা মাঝারি। কাঠ বাঁশ আর বড় খঁটি দিয়ে শক্ত করে তৈরি। ঘরটির মাঝখানে একটা পাটিশন। মেয়েটি শুয়ে আছে

পার্শ্বের এপাশে একটা মাচার ওপরে। ওর শরীরের তলায় গরম বস্ত্র এবং বিছানা হিসেবে যা ব্যবহার করা হচ্ছে তার চেহারা দেখে আঁতকে উঠল জয়িতা। মেয়েটা তার ওপরে নিশ্চিত্তে ঘুমাচ্ছে। ঘরে আরও মেয়ে বাচ্চা ঢুকছিল। সেদিকে খেয়াল না করে জয়িতা মেয়েটার কপালে হাত রাখল। যদিও খুবই সামান্য ব্যাণ্ডেজের বাইরে খোলা রয়েছে কিন্তু তাতে কোন উদ্ভাপ পেল না সে। অর্থাৎ মেয়েটার জ্বর আসেনি, শরীরে কোন অ্যালার্জি বের হয়নি। যদিও ওর হাতে পায়ে চর্মরোগের চিহ্ন ছড়িয়ে। সে দেখল ব্যাণ্ডেজের অনেকখানি ভিজে গেছে। যা-এর রস গড়িয়ে ভিজিয়েছে ব্যাণ্ডেজ। অথচ গতকাল যখন ওকে দেখেছিল তখন কোন রস গড়াচ্ছিল না। গতরাতে ওর না ঘুমানোর কারণ সে বুঝতে পারল। ময়লায় শক্ত হয়ে জমে থাকা আচ্ছাদনটা সরে যাওয়ায় ঘা নরম হয়ে রস গড়াচ্ছে। এটা অবশ্যই ভাল লক্ষণ। কিন্তু আজ আবার ব্যাণ্ডেজ পাল্টে ওষুধ লাগানো দরকার। কিন্তু কাল ওরা বলে গেছে যে ব্যাণ্ডেজ খুললে যদি দেখা যায় ওটা বেড়ে গেছে তাহলে—! নরম থাকে ওদের বেড়ে যাওয়া বলেই মনে হবে। হোক, তবু যা করার উচিত তা করবে বলে ঠিক করল জয়িতা। কিন্তু মেয়েটার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। সে ইশারায় রমণীটিকে বলল ভিড় সরিয়ে দিতে। জয়িতা যেভাবে মেয়েটিকে পরীক্ষা করছিল তাতে নিশ্চয়ই আন্তরিকতা দেখতে পেয়েছিল রমণীটি। তাই সে এবারে চিৎকার করে ঘরের সবাইকে বের করে দিয়ে কিশোরটিকে কিছু নির্দেশ দিল। জয়িতা দেখল কিশোর-স্বামী বাইরে পাহাড়ায় থাকল।

চিৎকার চেঁচামেচিতে মেয়েটির ঘুম ভাঙলে সে কিছু শব্দ বিড় বিড় করে পাশ ফিরে আবার শুলো। রমণীটি ছুটে এল তার কাছে। উদ্বিগ্ন হয়ে দেখল। তারপর জয়িতার দিকে তাকিয়ে হাসল। জয়িতা হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলল, ‘কোন ভয় নেই।’ রমণীটি সেটা বুঝতে পারল না। জয়িতা হিন্দীতে ডর শব্দ উচ্চারণ করে হাতের ইশারায় বাকিটা বোঝাল। এবার ইশারায় কথা বলা শুরু হল। দেখা গেল অসুবিধে হচ্ছে, বারংবার বিভিন্ন কায়দায় বোঝাতে হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষ বুঝতে পারছে। এই ঘরটা দুগদুপের দাদার। সে মারা গেছে এক বছর আগে। গ্রামের নিয়ম মেনে ছোটভাইকে বিয়ে করতে হয়েছে রমণীকে। পাশের খোপে তারা শোয়। রমণী তিনবার ক্ষেতি শব্দটা উচ্চারণ করার পর জয়িতা বুঝতে পারল জমি যাতে ভাগ না হয়ে যায় তাই এই ব্যবস্থা।

সে জিজ্ঞাসা করল হিন্দীতে এবং ইশারায়, ‘ছেলের বয়সী একটা ছোকরাকে স্বামী হিসেবে তোমার কেমন লাগছে?’

রমণী হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর চটপট জামা সরিয়ে কাঁধের কাছটা জয়িতার সামনে আনল। নগ্ন সাদা চামড়ায় দাঁতের দাগ স্পষ্ট। মেয়েটি খুব গর্বের সঙ্গে সেখানে আঙ্গুল বুলিয়ে তঁাটে ছোঁয়ালো শব্দ করে।

জয়িতা হতভম্ব হয়ে বাইরে দাঁড়ানো দুগদুপের দিকে তাকাল। ওই সরন নির্দোষ কিশোরকে ওই ভূমিকায় সে কল্পনাও করতে পারছিল না। আর এই সময় মেয়েটি চোখ মেলে উঠে বসতেই জয়িতা এগিয়ে গেল। মেয়েটির হাত দুটো হাতে জড়িয়ে ধরতেই সে লজ্জা পেয়ে হাসল। জয়িতা এবার ওর কপালে হাত বোলালো। স্নেহ বড় সংক্রামক, মেয়েটি আক্রান্ত হল।

॥ ৩৪ ॥

যতটা সাহস এবং উৎসাহ নিয়ে জয়িতা মেয়েটিকে দেখতে এসেছিল, ব্যাণ্ডেজ খোলার পর সেটা দূর হয়ে শরীর গোলানো অনুভূতি তৈরী হল। তার মনে হচ্ছিল বমি হয়ে যাবে। অত্যন্ত ভেপসে গিয়েছে ঘা, ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও আজ দুগন্ধ বের হচ্ছে। গতকাল কিন্তু গন্ধটা এমন ছিল না অথবা থাকলেও পাওয়া যায়নি। এখন আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ, গলা। দাঁতে দাঁত চেপে ঘা পরিষ্কার করতে লাগল জয়িতা। মেয়েটির মা উদ্ভিন্ন মুখে পাশে দাঁড়িয়ে। আঙুলে তুলো নিয়ে ঘা স্পর্শ করার সময় প্রথমে অশ্রুটি প্রবল হয়েছিল ধীরে ধীরে সেটা মিলিয়ে গেল। নতুন করে মলম বুলিয়ে আবার ব্যাণ্ডেজ করল জয়িতা। পুরোনটাকে কোনরকমে মুড়ে নিয়ে সে মেয়েটির মাকে ওষুধ খাওয়াতে ইঙ্গিত করে বেরিয়ে এল বাইরে।

ঘরের বাইরে তখনও ভিড়। সবাই জয়িতার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে। সে বেরিয়ে আসামাত্র কয়েকজন চুকে গেল ভেতরে। জয়িতা আর দাঁড়াল না। হন হন করে সে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে যখন একদম একা, পাহাড়ের একটা রাস্তার শেষে দাঁড়িয়ে, তখন ব্যাণ্ডেজটার কথা খেয়াল হল। সেটাকে খাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতেই পেট গুলিয়ে উঠল। হাঁটু মুড়ে বসে জয়িতা বমি করতে লাগল। এই ঠাণ্ডাতেও কপালে ঘাম জমছিল। শরীরে সেই তৈলাক্ত অনুভূতি।

মিনিট পাঁচেক পরে যখন বমিটা বন্ধ হল তখন শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জয়িতা একটা বড় পাথরের ওপরে শরীর এলিয়ে দিল। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ পড়ে রইল সে। এবং তখনই তার মনে হল এই পৃথিবীতে সে এখন একা। একটিও মানুষের কাছে কিছু আশা করার নেই। যখন সে কলেজে পড়ত, কলকাতায় ব্যস্ত থাকত তখন এই চিন্তাটা এমনভাবে তাকে পীড়িত করেনি। সীতা রায় অনেক দূরের মানুষ, রামানন্দ রায়ের জন্যে তার হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। এই কান্না ঠিক রামানন্দ রায় না নিজের জন্যে তা সে জানে না। সচেতন মানুষ হিসেবে রামানন্দ রায়কে অপস্থন্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে, ঘোমা করারও। কিন্তু কন্যা হিসেবে হঠাৎ সে রামানন্দ রায়ের অভাব বোধ করতে লাগল। হয়তো কঠিন তবু ওই যে দিনে একবার এসে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, এন্তরিথিং অলরাইট, সেইটে করার আর কেউ রইল না। জয়িতার মনে হচ্ছিল, একটি মানুষ জীবনে সব কিছু পেতে

পারে তার ক্ষমতা দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে কিন্তু একটু স্নেহ করতেন? সেই সময় সে কোন গুরুত্ব দেয়নি, বরং ধান্দা বলেই মনে হয়েছে। আজকে কেউ তাকে এসে ওই গল্পাভেও কথা বলবে না। চোখ খুলে ঘোলাটে আকাশটাকে দেখতে দেখতে ক্রমশ এইসব চিন্তার বাইরে বেরিয়ে এল জয়িতা। গভীর মেজাজের মেঘগুলো যেন নাকের ডগায় ঝুলছে। এখানে ওই আকাশটা কত কাছে। যেন হাত বাড়ালেই নাগালই পাওয়া যায়। চুপচাপ শুয়ে রইল জয়িতা।

ট্রাজিস্টারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল কল্যাণ। উনুন তৈরী করা হয়েছে পাথর সাজিয়ে তাতে কাঠ জ্বলছে। যতটা না আগুন তার চেয়ে বেশী ধোঁয়া। সুদীপ মত পাল্টে খিচুড়ি বসিয়ে দিয়ে বলল, 'একটা রান্নার বই কিনে আনলে হত। আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল সোল বছর বয়সে। জয়িতা তা থেকে অনেক বড় হয়েও রান্নার র জানে না। আজকালকার মেয়েদের কাছে তুই কোন কিছু আশা করতে পারিস না।'

আনন্দ কথাগুলো শুনে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। কয়েকটা নেহাৎই বাচ্চা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জলজল চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে। আনন্দ লক্ষ্য করল ওদের দৃষ্টি উনুনটার দিকে। চোখেমুখে ক্ষুধা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই গ্রামের মানুষগুলোর বেশীর ভাগই সারা বছর আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে। হয়তো কোন কোন দিন খেতেই পায় না। কিন্তু এই অবস্থার সঙ্গে ওরা এমন অভ্যস্ত যে খুব একটা মাথা ঘামায় বলেও মনে হচ্ছে না। কোন সরকারি সাহায্য এখানে পৌঁছায় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ কিছু জিনিস নিয়ে পাহাড়ি পথ ভেঙ্গে যে টাকা রোজগার করতে যায় না এমন হতে পারে না। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে যে পোশাক আছে তা তাহলে এল কোথেকে? পালদেমকে প্রশ্নটা করেছিল সে। পালদেম বলেছে প্রত্যেক বছর দুটো লোক খচ্চরের পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে এই গ্রামে আসে। তারা টাকা নেয় না কিন্তু সেগুলোর বিনিময়ে জিনিসপত্রই নিয়ে থাকে। গ্রামের লোকেরা পোশাক, নুন, চিনি এবং চাল কিনে থাকে এইভাবে। ব্যাপারটা হয়তো ঘটে থাকে কিন্তু নিজের প্রয়োজনে মানুষ গ্রাম থেকে বেরিয়ে যোগাযোগ করবে না এ অসম্ভব। যে লোকটা ওদের দেবতার মূর্তি চুরি করে পালানিছিল সে নিশ্চয়ই এই গ্রামের লোক। তার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, পালদেম কিন্তু কিছুই বলতে চায়নি। পৃথিবীর কিছু মানুষ একটি দুর্গম পাহাড়ি গ্রামে প্রায় জন্মের মত জীবন-যাপন করছে এবং তা নিয়ে কারো মাথা ঘামাবার দায় নেই। চুপচাপ ভাবতে ভাবতে আনন্দের মাথায় দ্বিতীয় চিন্তা চলকে উঠল। সে বন্ধুদের দিকে উত্তেজিত হয়ে তাকাল। কল্যাণ এখনও কানে ট্রাজিস্টার চেপে স্টেশন ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুদীপ উনুনে বসানো পাত্রটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আনন্দ উঠে বাচ্চাগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেই ওরা সরে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আনন্দ বন্ধুর মত হাসতে চেষ্টা করল। বাচ্চাগুলো সেই হাসি ফিরিয়ে দিল না।

আরও তিন পা এগিয়ে গিয়ে হাত মুখ তুলে খাবার ভঙ্গী করেই দূরের জ্বলন্ত উনুনটাকে ইঙ্গিতে দেখাল। বাচ্চাগুলো খানিকটা খতমত হয়ে ওর দিকে তাকাল। এবার কারো কারো মুখে হাসি ফুটে উঠল। দুজন একসঙ্গে মাথা নেড়ে জানাল তারা খেতে সম্মত। আনন্দ হাত তুলে তাদের আশ্বস্ত করল। তারপর ফিরে এল বন্ধুদের কাছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কি?' আনন্দ বলল, 'আরও সাত আট জনের জন্যে খিচুড়ি করতে হবে। দেখে মনে হল ওরা ক্ষুধার্ত।'

কন্যাণ ট্রাঞ্জিষ্টারটা বন্ধ করে বলল, 'মাথা খারাপ নাকি! যা স্টক আছে তা আমাদেরই বেশী দিন কুলোবে না, তার ওপর দানছত্র করলে এখনই না খেয়ে মরতে হবে।'

আনন্দ হেসে বলল, 'যখন এগুলো শেষ হয়ে যাবে ভখন কি খেয়ে থাকবি?'

কন্যাণ উত্তর দিল না প্রথমে। তারপর চূপচাপ উঠে ঢুকে গেল ঘরে।

সুদীপ বলল, 'অত খিচুড়ি একসঙ্গে রান্না করার জায়গা নেই। একটু খিচুড়ি একবার খাইয়ে ওদের ভালবাসা পাওয়া যাবে বলে তোর মনে হচ্ছে? ইম-পসিবল। মেয়েটার কিছু হলে আমাদের টুকরো করে ফেলবে ওরা।'

'জানি না। তবে একদল ক্ষুধার্ত ছেলের সামনে বসে খেতে পারব না আমি।'

'একদল? তুই ভেবেছিস ওই কটি ছেলেই ক্ষুধার্ত? খবর পেলে সমস্ত গ্রাম চলে আসবে খেতে।'

'খাবে। আমাদের সঙ্গে যা আছে তাই ওদের খেতে দেব।' আনন্দ নিঃশব্দ মুখে উত্তর দিল।

সুদীপ উঠে দাঁড়াল, 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'মাথা আমার ভাল আছে সুদীপ। আমি এই লোকগুলোর সঙ্গে একটু ভাব করতে চাই।'

'হোয়াট ফর? এরা আমাদের কোন উপকারে আসবে না। দেখনি না, পালদেম কি কাণ্ডটা করল!'

আনন্দ আকাশের দিকে তাকাল। তার মাথায় যে চিন্তাটা এসেছে সেটাকে গুছিয়ে বলার মত সে কোনও ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। বলতে গেলেই নিজের কাছে কেমন খেলো মনে হচ্ছে। ওরা এর মধ্যে একটা মতলবের গন্ধ খুঁজে পেতে পারে আর সেই মতলবকে সমর্থন করবে এমন ভাববার কোন কারণ নেই।

খিচুড়ি হয়ে গিয়েছিল। সুদীপ তাড়াতাড়ি পাত্রটাকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে গেল। আনন্দ দেখল বাচ্চাগুলো আরও কয়েক পা এগিয়ে এসেছে। ওদের প্রত্যেকের মুখে আকাঙ্খা স্পষ্ট। তখনই ড্রাম বাজার শব্দ কানে এল। সে অবাক হয়ে দেখল বাচ্চাগুলো পনকে পিছন ফিরে ছুটে লাগল উল্টো দিকে। আনন্দ দূরেও কিছু লোককে ছুটে যেতে দেখল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল সমস্ত গ্রামে ড্রামের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শব্দ শুনেই

সুদীপ বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আওয়াজ রে ?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'বুঝতে পারছি না। সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে ওই পাশে যাচ্ছে।'

সুদীপ ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'মেয়েটা মরে গেল না তো। জয়িতা কোথায় ? মেয়েটা মরে গেলে আর দেখতে হচ্ছে না। এদিকে তো কেউ নেই, পাল্লাবি ?'

আনন্দ বলল, 'জয়িতাকে ফেলে পাল্লাতে পারব না। আর পালিয়ে যাইব বা কোথায় ? তার চেয়ে চল দেখে আসি ব্যাপারটা। কল্যাণকে ডাক।'

কল্যাণ পিছনেই ছিল। সে গলা তুলে বলল, 'আমি আগ বাড়িয়ে ধরা দিতে পারব না। জলন্ত উনুনে এসে পড়লাম কড়াই এড়াতে গিয়ে। পুলিশকে বলতে পারতাম, আইনের আশ্রয় নিতে পারতাম কিন্তু এখানে সে সব—। পাল্লাতে হলে পাল্লা, আমি রাজী আছি।' শেষ কথাগুলো সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

সুদীপ জিজ্ঞেস করল, 'পুলিসকে কি বলতিস ? আমার হাত ভাঙা ছিল, আমি একটাও খুন করিনি, গুলিও ছুঁড়িনি। অতএব আমি অপরাধী নই এই তো ? চন্দ, আনন্দ, যা হবার হবে, আগে ব্যাপারটা দেখেই আসা যাক।' সুদীপ নেমে হাঁটিতে লাগল।

কল্যাণ খানিকটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে চিৎকার করল, 'তোরা ঘুরে আয়, আমি এইসব পাহারা দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি আসতে চেষ্টা করিস।'

সুদীপ যেতে যেতে বলল, 'আমি কল্যাণকে বিশ্বাস করি না, ও আমাদের ফাঁসিয়ে দিতে পারে।'

আনন্দ হাসল, 'কার কাছে ? এখানে নিজেরাই যদি নিজেদের গলায় ফাঁস পরাই তাহলে অন্য কথা।'

ড্রামের আওয়াজ বারছিল। যত এগোচ্ছে তত জায়গাটা জনমানবশূন্য ঠেকেছে। ছেলেবুড়ো সবাই দৌড়াচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ওরা মন্দিরটার কাছে পৌঁছে গেল। সমস্ত গ্রামের মানুষ জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। কাহন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা চিৎকার করে যেন সমর্থন জানাল। এবার ওরা লোকটাকে দেখল। দুটো হাত পিছু মোড়া করে বাঁধা। এরপর আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে, পিছনে দুটো লোক হাত বাঁধা লোকটিকে নিয়ে। পালদেমাও ওই দলে রয়েছে।

সুদীপ ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের জন্যে নল্ল, মৃতি চুরি করা লোকটাকে বোধ হয় শাস্তি দেবে আজ। কি শাস্তি দিতে পারে ?'

আনন্দ কোন কথা বলল না। একটা গোল ড্রাম ধরে রেখেছে দুটো লোক, আর তার মাঝখানে তালে তালে পিটিয়ে যাচ্ছে মিছিলের একটা লোক। ওরা সোজা পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উঠছিল। আনন্দ সুদীপকে ইশারা করল বাঁ দিকে সরে আসতে। আড়ালে আড়ালে খানিকটা দূরে যাওয়া মাত্র জয়িতাকে

দেখতে পেল সুদীপ। একটা বড় পাথরের ওপরে বসে জয়িতা বসে চারপাশে তাকাচ্ছে। ওদের দেখে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের আওয়াজ হচ্ছে রে?'

সুদীপ বলল, 'শাস্তির। তুই এখানে কি করছিলি?'

জয়িতা কাঁধ নাচাল। যেন সেটাই উত্তর হয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কার শাস্তি?'

আনন্দ বলল, 'মূর্তিচোর লোকটার। ওরা ওকে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়োতে। এদিক দিয়ে গেলে মনে হয় আড়াল থেকে দেখা যাবে।'

একেবারে চূড়োয় ওঠার পর ড্রামের আওয়াজ থামল। গ্রামের সমস্ত মানুষ এখন চুপচাপ। কাহন চারপাশে তাকিয়ে পালদেমের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেই সে বক্তৃতা শুরু করল।

সুদীপ বলল, 'যে করেই হোক এদের ভাষাটা তাড়াতাড়ি শিখতে হবে। পালদেমটা মনে হচ্ছে, নেতা।'

জয়িতা বলল, 'এখানে সবাই রাজা। মনে হচ্ছে লোকটাকে মেরে ফেলবে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'দূর। একটা মূর্তি চুরির জন্যে ওরা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে নাকি!'

পালদেম বক্তৃতা চালাচ্ছিল।

জয়িতা বলল, 'অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মানুষকে নরকেও নিয়ে যেতে পারে। ওরা যদি লোকটাকে মেরে ফেলতে চায় তাহলে কি আমরা বাধা দেব?'

সুদীপ নিঃশ্বাস ফেলল, 'ইমপসিবল। খালি হাতে কিছু করতে যাওয়া বোকামি হবে।'

বক্তৃতা শেষ করে পালদেম চিৎকার করে কাউকে ডাকতেই একটি যুবতীকে দেখা গেল এগিয়ে যেতে। যুবতী সুগঠনা, দূরে থেকেও বোঝা যাচ্ছে সে রাপসী এবং সেই বিষয়ে সে বিশেষ সচেতন। পালদেমের সামনে গিয়ে যুবতী মাথা নিচু করে দাঁড়াতে কাহন তাকে প্রশ্ন করল একটার পর একটা। যুবতী যেই উত্তর দিচ্ছে অমনি মূর্তিচোর চিৎকার করে যেন প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। কিন্তু তার চিৎকার ডুবে যাচ্ছে জনতার চিৎকারে। বেশ কিছুক্ষণ এই চলার পর পালদেম কাহনকে ইশারা করল। আনন্দ চোখের পলক ফেলার আগেই দেখল ওরা লোকটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। সামান্য শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করার সুযোগ পেল না লোকটা, শরীরটা যেন পাক খেতে নেমে যেতে লাগল নিচে। কয়েক হাজার ফুট তলায় পাথরের ওপরে যখন আছড়ে পড়বে তখন এই গ্রামের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ওরা তিনজন শুরু হয়ে দেখল গ্রামবাসীরা নিচে নেমে যাচ্ছে। এখন কেউ কোন কথা বলছে না। অনেকটা শোক-মিছলির মতো দেখাচ্ছে শুধু অজুত আওয়াজ বের হচ্ছে ড্রাম থেকে। অনেকটা বিজয়া দশমীর ঢাকের বোলের মত।

জয়িতা বলতে পারল শেষ পর্যন্ত, 'কি নুশংস!'

সুদীপ বলল, 'কোন বিচার হল না, আজপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেল না লোকটা, পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে মেরে ফেলা হল। জানতে হবে সিদ্ধান্তটা কে নিল!'

জয়িতা বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ! ফিরে চল।' তারপর নামতে নামতে বলল, 'আমরা যখন নানুভাই আর মন্ত্রীকে খুন করি তখনও নিশ্চয়ই কেউ কেউ বলেছে কি নৃশংস। আমরাও অবশ্য বিচার ব্যবস্থার সুযোগ দিইনি ওদের।'

সুদীপ ক্ষেপে গেল, 'কার তুলনা করছিস। ডাইরেক্টর ইনফ্লুয়েন্স অফ কল্যাণ! যারা বিচার ব্যবস্থাকে কংজা করে রেখেছে ক্ষমতার জোরে, যারা ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করবে সেই পুলিশ পারচেজড যেখানে ওদের সুযোগ নিতে দেওয়া মানে সম্মানে বেরিয়ে আসতে বলা। আজ অবাধি কটা কমিশনে বা ক্রিমিনাল কেসে অপরাধী চিহ্নিত করা হয়েছে বলতে পারিস। খোদ পুলিশের এক কর্তা মারা গেল কনস্টেবল সমেত অথচ অপরাধী ধরা পড়ল না। যাকে সাজানো হল সে মারা গেল লকআপে। সঞ্জীব তীর্থঙ্করের কেসটা ডাব? এখানে তো তেমন সমাজ ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় যত্ন নেই?'

'রাষ্ট্রীয় যত্ন নেই, সমাজ ব্যবস্থার কথা জানলি কি করে?'

মনে হয়। নইলে লোকটার বউ ওর বিরুদ্ধে অন্তত কথা বলত না। বউটাকে দেখে তোর দুঃখী মনে হয়েছে? শালা, 'মেয়েছেলে...'

সুদীপকে শেষ করতে দিল না জয়িতা, 'নো মোর, তোর ওপর কল্যাণের প্রভাব কম নয়।'

ওরা নিচে নেমে হাটিতে লাগল আস্তানার দিকে। আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার ঘা কেমন দেখলি? কোন উন্নতি হয়নি?'

জয়িতা বিশদ বলল। আনন্দ বলল, 'স্তিক আছে, গুড সাইন।'

আস্তানায় এসে ওরা দেখল কল্যাণ নেই। কিন্তু সেই বাচ্চা কটা দাঁড়িয়ে আছে। সুদীপ বলল, 'আনন্দ তুই কি ফ্যাচাং বাখালি বল তো! ওরা তোকে দেখে আপনজনের মত হাসছে।'

আনন্দ জয়িতাকে বলল, 'আমি ওদের খাওয়াবো বলেছিলাম। ওরা ক্ষুধার্ত।'

জয়িতা বলল, 'আমিও। আমাকে কে খাওয়াবে?'

আনন্দ হেসে ফেলল, 'সবাই মিলে খাওয়ানো যাক সবাইকে।'

সুদীপ বলল, 'স্তিক আছে, আমি আবার উনুন ধরাচ্ছি কিন্তু তুই বাচ্চাগুলোকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে খাওয়া। নইলে মেম্বার বেড়ে যাবে পিলপিল করে।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের জন্যে যেটা রাখলি সেটা দিয়ে দিতে বলছিস?'

কাঁধ বাঁকাল সুদীপ, 'কি আর করা যাবে!' তারপর জয়িতাকে বলল, 'আগের খিচুড়িটা খুব খুর হয়েছিল। এক্সপেরিয়েন্স মেকস এ ম্যান এফিসিয়েন্ট।'

এবার দারুণ রাঁধব। তুমি পটের বিবি হয়ে বসে থাকবে তা চলবে না, এসো হাত লাগাও।’

জয়িতা হেসে ফেলল, ‘একটা মানুষের মৃত্যু দেখেও তুই ঠাণ্ডা করছিস! পটের বিবিরা শুনেছি খুব সুন্দরী হয়। যেমন পটেশ্বরী বউঠান। আমি গবিত করছি।’

আনন্দ বাচ্চাগুলোকে দেখছিল। সুদীপ যাকে ধুর রান্না বলেছে তাই ওরা খাচ্ছে পরম তৃপ্তি নিয়ে। ঘরের মধ্যে সসপ্যানটাকে মাঝখানে রেখে ওরা কয়েক সেকেণ্ডে শেষ করে ফেলল খিচুরি। কিন্তু ওই পরিমাণ ওদের কিছুই হয়নি বোঝা গেল। তবু প্রতিটি মুখেই এখন খুশীর ছাপ। আনন্দ এবার ইঞ্জিত করল পাত্রটাকে ধুয়ে আনতে। শবে সপ্তে দুজন ওটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাকিরা আর কিছু করার নেই বুঝতে পেরে একে একে উঠে দাঁড়ালো। আনন্দ চেষ্টা চালাচ্ছিল ওদের সঙ্গে কথা বলার। বাচ্চাগুলো লজ্জা পাচ্ছিল, নিজেদের মধ্যে হাসছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওদের দুই সঙ্গী পাত্র নিয়ে ফিরে এলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আনন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং তথাকথিত সামাজিক চেহারার যে পরিবর্তন অধিকাংশ মানুষ মনে মনে কামনা করেন অথচ অংশ নেন না সক্রিয়ভাবে ওরা সেখানে আঁচড় কাটতে চেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সেটা আঁচড়ও ছিল না। একটা মধুচক্রের মারফত মুনাফাখোরকে ধ্বংস, জাল ওষুধের কারবার বন্ধ করা অথবা অসৎ মন্ত্রীকে খুন করলে অত বড় দেশের কোন উপকার করা হয় না। তার ধারণা ঘটনার মধ্যে দাঁড়িয়ে যত তীব্র ছিল বেরিয়ে এসে সেটাই এখন পানসে ঠেকছে। যে দেশের প্রতিটি মানুষকে বাঁচতে হয় কোন না কোনভাবে অসৎ হয়ে অথবা অসৎ ছায়ার সঙ্গে ভাল রেখে সেখানে ওই ঘটনা কোন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যদি সৃষ্টি করে তা অত্যন্ত সাময়িক। হয়তো এতদিনে আরও দশটা জাল ওষুধের কারখানা তৈরী হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষমাত্রই চাইবে অন্যের ওপর দিয়ে বাড়টা থাক, আমি যেন নিরাপদে থাকি। তা ছাড়া দেশের সিস্টেমটাই এমনভাবে তৈরী যে কয়েকটা রাজনৈতিক দল, কিছু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যা করবে মিলেমিলে তাই মেনে নেবে সাধারণ মানুষ। এই মেলামেশাটা যদিও আপাতচোখে দেখা যায় না ফলে কৃত্রিম রেবারেধি ছড়িয়ে দেওয়া যায় সহজেই। ব্যক্তিহত্যা অথবা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে ধ্বংসের মধ্যে ব্যক্তিগত আনন্দ থাকতে পারে কিন্তু তা করে গণজাগরণ সম্ভব নয়। বস্তু ভারতবর্ষে সেই ঘটনাটি আদৌ যাতে না ঘটে তার জন্যে ডান এবং বামপন্থীরা সূচতুর চেষ্টা চালিয়ে বেশ স্থিতাবস্থায় এসে গেছে। এই ভাবনা যদি সত্যি হয় তাহলে সবচেয়ে বেশী প্রতিক্রিয়া হবে কল্যাণের। সে নিশ্চয়ই জানতে চাইবে এখন করণীয় কি? সে কেন আগে থেকে খতিয়ে দ্যাখেনি? আনন্দ ছটফট করছিল। তিন তিনটে ঘটনা ঘটান পর ওরা হিমালয়ে বসে আছে। দেশে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার খানিকটা

আন্দাজ নিয়েই এসেছিল কিন্তু সেটা এখন কোন অবস্থায় তা জানা যাচ্ছে না। তবে পুলিশ ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, ধরা পড়লে খুনের দায়ে খুন হতে হবে এবং অধিকাংশ মানুষ সেটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে। যদি অন্ততপক্ষে একশজন লোক—

এই সময় সুদীপ ডাকল, 'আনন্দ একবার বাইরে আয়।'

আনন্দ দরজায় এসে দৃশ্যটা দেখল। কল্যাণ দৌড়ে পাহাড় থেকে নামছে আর তার পিছনে ও পাশে কয়েকজন যুবক। যেভাবে জন্তকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয় ওরা কল্যাণকে সেইভাবেই নিয়ে আসছে। আন্তানার কাছে পৌঁছে কল্যাণ ধপ করে বসে পড়ল। আনন্দ ছুটে গেল কাছে, 'কি হয়েছে?' কল্যাণ কোন কথা বলতে পারল না। সে হাঁপাচ্ছে, এই শীতেও তার শরীর ঘামে ভেজা।

এই সময় পালদেমকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। পিছু ধাওয়া করে আসা যুবকের কাছে ঘটনাটা শুনে পালদেম এগিয়ে এসে কল্যাণকে দেখল, তারপর আনন্দকে প্রশ্ন করল, 'ওকে তোমরা কোথায় পাঠিয়েছিলে? আমি বলেছিলাম এই গ্রাম ছেড়ে তোমাদের না যেতে, তোমরা শুনলে না!'

আনন্দ কল্যাণের দিকে তাকাল। সে চোখ বন্ধ করে তখনও নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। আনন্দ বলল, 'ওকে আমরা কোথাও পাঠাইনি। মনে হয় ও পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল।'

'না।' পালদেম প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ও আমাদের শত্রু পক্ষের গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। আমাদের লোক ওকে দেখা মাত্রই দৌড়াতে আরম্ভ করে। অপরাধী ছাড়া কেউ পালানোর চেষ্টা করে না। তোমাদের বলে দিচ্ছি এই ঘটনাটা যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে।'

আনন্দ এবারে অবাঁক। কল্যাণ পালানো চলে? কাউকে কিছু না বলে? কিন্তু ওর সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। সে পালদেমকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে তোমাদের শত্রু পক্ষ আছে?'

'আছে। মাঝে মাঝেই ওরা আমাদের ওপর হামলা করে।'

'কেন?'

পালদেম প্রশ্নটা শুনে এবার হাসল, 'ওদের যখন খাবার দরকার হয় অথবা মেয়ের প্রয়োজন হয় তখন চলে আসে। শত্রুতা কয়েক পুরুষ ধরেই চলছে। মেয়েটা কি ভাল হয়ে যাবে?'

শেষ প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন জন্মিতার উদ্দেশ্যে।

ওরা নির্বাঁক হয়ে বসে ছিল। উত্তরে জন্মিতা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

পালদেম বলল, 'তাহলে তোমাদের মঙ্গল। শোন, আর কদিনের মধ্যে জোর রপ্তি হবে। তারপর বরফ পড়বে এখানে। একবার বরফ পড়া শুরু হলে আর পালানো ছেঁটে যাওয়া আসা করা অসম্ভব। তোমরা তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে সারিয়ে তোল।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'আমরা চেষ্টা করছি। আমি কথা দিচ্ছি এখন থেকে কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। যদি কেউ করে তাহলে সে নিজের দায়িত্ব করবে। আর একটা কথা, তোমাদের বেশীর ভাগ মানুষের গলাতে যে রোগ হয়েছে তার ওষুধ আমাদের কাছে আছে। যদি চাও আমরা দিতে পারি।' পালদেমের মুখে আশ্বাস ফুটে উঠল, 'এসব বলে তুমি সুবিধে চাইছ? আমার ছেলে দুদিন ধরে শুয়ে আছে। তাকে তুমি সারিয়ে দিতে পারবে কালকের মধ্যে?'

আনন্দের বুক কাঁপুনি এল, কিন্তু সে যুঁকি নিতে রাজী হল, 'কি হয়েছে তোমার ছেলের?'

'কথা বলছে না, সমস্ত শরীর আগুনের মত গরম আর মাঝে-মাঝে শরীর কাঁপছে।'

আনন্দের বর্ণনা শুনে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। গ্রামে তাদের পাশের বাড়ির শিশুটির একই উপসর্গ হয়েছিল। প্রায় কাল্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল তখন। ডাক্তার এসে বলেছিলেন ওটাকে তরকা বলে। তিনি শরীর থেকে সমস্ত গরম কাপড় খুলে ফেলে মিনিট দশেক ধরে জল ঢালতে বলেন। তাতে শিশুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে জ্বর এবং খিঁচুনি না হবার ওষুধ দিলে সে ভাল হয়ে ওঠে। পালদেমের ছেলের একই অসুখ হয়েছে কি না সে বুঝতে পারল না। তাছাড়া শিশুর জন্যে যে ওষুধের প্রয়োজন তা তাদের সঙ্গে নেই। খিঁচুনি বন্ধের ওষুধ আনার কথা, ভাবারও কোন কারণ ছিল না। সঙ্গে জ্বরের ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ছেলের বয়স কত?'

'পাঁচ।'

আনন্দ ভেতরে ঢুকে ওষুধের বাক্স খুলল। এই সময় জয়িতার গলা পেল সে, 'তুই যাবি?'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ। একটা চান্স নেওয়া যাক। ওয়ান-থার্ড ট্যাবলেট দিলে কাজ হবে বোধ হয়।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কলাগ কি পালাতে চেয়েছিল?'

আনন্দ বলল, 'ওটা ওকেই জিজ্ঞাসা কর। কেন যে এমন বোকামি করে।' সে ওষুধ নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জয়িতা বলল, 'আমি তোর সঙ্গে যাব?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। সুদীপ আর কলাগ অন্তত এই মুহূর্তে একা থাকুক আমি চাই না।'

পালদেমের পাশে হাঁটছিল আনন্দ। সেই সময় টিপটিপ বৃষ্টি নামল। আনন্দ বলল, 'তোমরা শেষ পর্যন্ত নোকটাকে মেরে ফেললে? অন্য শাস্তি দেওয়া যেত না?'

'সবাই চাইল। ওর বউ পর্যন্ত বলল এমন স্বামীর ঘর করতে চায় না।'

আনন্দ রমণীটিকে মনে করল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের ছেলেমেয়ে নেই?'
'না। আমাদের গ্রামে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা এমনিতেই কম। লোকটার কোন
ভাইও নেই যাতে বউটা বিয়ে করতে পারে। এখন ওকে নিয়ে আবার সমস্যা
দেখা দেবে।' পালদেম বলল।

'আবার কেন?'

'এর আগে মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল আমাদের শত্রুরা।
অনেকে বলে ওরও নাকি যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। এসো।'

পালদেমের ঘরে নিচু হয়ে ঢুকল আনন্দ। দুজন রমণী ছেলেটির পাশে বসে
ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। পালদেম ঢুকেই তাদের ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গে
চুপ করে গেল ওরা। পালদেম বলল, 'আমার ছেলে। ওকে দেখে যদি মনে
কর সারাতে পারবে তাহলেই হাত দাও। নইলে ফিরে যেতে পার।'

আনন্দ দেখল বাচ্চাকে অনেক কিছু চাপা দেওয়া সত্ত্বেও বারংবার কাঁপছে।
মুখ টকটকে লাল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'অসুখ হচ্ছে তোমরা কি কর?'

পালদেম বলল, 'কাছন এসে মস্তপড়া শেকড় দিয়ে যায়। এবার তাতে
কমেনি। তা ছাড়া ওর শরীরে পাহাড়ের দানোটা এসে তোকার পর থেকে
আমি আর কাছনকে ডাকিনি।'

'পাহাড়ের দানো?' হতভম্ব হয়ে গেল আনন্দ।

'নইলে ওর শরীর অমন করবে কেন? গ্রামের লোকজন যদি জানতে পারে
তাহলে দানোটাকে মারবার জন্যে ছেলেটাকেই পুতে দেবে মাটিতে।'

চাপা সরিয়ে ছেলেটার নগ্ন শরীরে হাত দিতে অবাধ হয়ে গেল আনন্দ।
প্রচণ্ড উদ্ভাপ, ঠিক কত জ্বর বোঝা যাচ্ছে না। তবে চারের কম তো নয়ই।
ঘাড় শক্ত। চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে তার কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। কিন্তু
এখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হল সঙ্গে অন্তত কিছু ওষুধ আছে, এদের তো তাও
নেই। ডায়মণ্ডহারবারের গ্রামের শিশুটিরও ঘাড় এমন শক্ত ছিল। কিন্তু
এই ঠাণ্ডায় যদি জল তাললে নিমোনিয়া হয়ে যায়? হলে হবে, কিন্তু এ ছাড়া
তো সে কোন রাস্তা জানে না। পালদেমকে দিয়ে জল আনিয়ে সে নিজের
হাতে ন্যাকড়া ডিজিয়ে তাই দিয়ে ছেলেটির শরীরে জল বোলাতে শুরু করল।
মিনিট দশেক পরে ওর মনে হল ছেলেটার ঘাড় নরম হচ্ছে। একটু একটু
করে খিঁচুনি কমছে। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা চোখ মেলল একবার তারপর
ঘুনিয়ে পড়ল। আনন্দ বুঝল ওর আরাম হচ্ছে। শরীরটা পরিষ্কার করে
মুছিয়ে দিয়ে দিয়ে ও ট্যাবলেট তিন টুকরো করল। টুকরোটা গুঁড়ো করে নিয়ে
জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছেলেটার মুখে জোর করে ঢেলে দিল সে। ঘরের তিনটে
মানুষ চুপচাপ তার কাজ দেখছিল।

পালদেম বলল, 'দানোটা বোধ হয় ওর শরীর থেকে বেরিয়েছে, না?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'তুমি আমার বন্ধুদের বল খেয়ে নিতে। আমাকে এখানে
বসে থাকতে হবে নইলে তোমার দানো আবার ফিরে আসতে পারে।'

পালদেম বলল, 'আমি তোমার খাবার এখানে এনে দিচ্ছি। তুমি উঠো না।'

আনন্দ বাচ্চাটার কপালে হাত রাখল। জ্বর সামান্য কমেছে বলে মনে হল। সে একমনে প্রার্থনা করছিল ওষুধটা যেন জাল না হয়, যেন কাজ দেয়।

॥ ৩৫ ॥

ঠায় সাত ঘন্টা এক জায়গায় চুপচাপ বসে রইল আনন্দ।

তার চোখের সামনে একটু একটু করে বাচ্চাটা সহজ হচ্ছে, জল এবং ওষুধ যে কাজ করছে তা জানার পর থেকেই এক ধরনের উত্তেজনা যেন নেশার মত পেয়ে বসেছিল তাকে। পরে সে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। শরীরের লক্ষণ বিচার করে অসুখের স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়। বিশেষজ্ঞরা তা চিকিৎসকদের জন্য করে গেছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক বুঝে নিয়ে ওষুধ দেওয়া হয়। মানুষ শরীরের জটিল জগতের গোলমালে জায়গাটায় ঠিক ওষুধ পড়লেও যে সব সময় প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হবে এমন ভাবার কারণ নেই। কারণ, সব মানুষই এক নিয়মে চলে না। যদি ওষুধে চমৎকার কাজ করে তাহলে সেই মুহূর্তে চিকিৎসক প্রায় ইন্টারের সমতুল্য হয়ে যান রোগীর চোখে। আর সাফল্যের আনন্দ তাকেও উৎসাহিত করে। কিন্তু যদি ওষুধ মাথা ঠোঁকে তাহলে তাঁর অবস্থা হয় অত্যন্ত করুণ। হাতড়াতে হাতড়াতে কোনরকম ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলে তখন। অর্থাৎ মানুষের শরীরের কর্মকাণ্ড চোখের আড়ালে রেখেও প্রখর অনুমান শক্তির সাহায্যে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে একটা দেশের অসুখ সারাবারও চেষ্টা চলেছে। কিন্তু মুশকিল হল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুমান ভুল হয়ে যাওয়ায় ওষুধ কোন কাজেই লাগে না। বিশেষজ্ঞরা মানুষের মুক্তির যেসব ফর্মুলা তৈরি করে দিয়েছেন তাও ওই শরীরের মতই দেশে দেশে একইভাবে কাজে লাগে না। সেদিন যেভাবে বাচ্চাটার ঘাড় নরম হয়েছিল, একটু একটু করে জ্বর কমেছিল এবং সাত ঘন্টার পরে সহজ হয়ে হেসেছিল সেইভাবে যদি একটা দেশকে সুস্থ করা যেত!

পালদেম ওর হাত চেপে ধরল। ওর মুখ চোখে কৃতজ্ঞতা। পালদেমের স্ত্রী একটা পোড়াটে মোটা রুটি আর জল এনে সামনে রাখল। খবরটা চারপাশে ছড়িয়েছে। এর আগে পালদেম আস্তানা থেকে আনন্দের অংশের খিচুড়ি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেটা ছোঁয়া হয়নি। এখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বোধ করল সে। কাল রাত্রের রুটির অভিজ্ঞতায় ওই ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে যাওয়া খিচুড়ি অনেক শ্রেয়। কিন্তু পালদেমের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে রুটি তুলে নিল। সত্যিই অখাদ্য কিন্তু বালির অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চাটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আনন্দ পালদেমের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল দিনের চিহ্ন কোথাও নেই। পালদেমের ঘরে দিনরাত এখন কাঠের আগুন জ্বলছে। কেরোসিনের ব্যবহার

এই গ্রামে নেই। কিন্তু লাতির গায়ে এক ধরনের ছাল শক্ত করে জড়িয়ে সেটাকে মশালের মত ব্যবহার করা হয়।

কনকনে ঠাণ্ডায় আনন্দ আর পালদেম হাঁটছিল। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'সেই মেয়েটা কেমন আছে এখন?'

পালদেম জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই মারা যাবেনি। তাহলে জানতে পারতাম।'

আনন্দ বলল, 'পালদেম, আমরা যদি এখানে কিছুদিন থাকি তাহলে তোমাদের আপত্তি হবে?'

কথাটা শুনে পালদেম অবাক হয়ে বলল, 'এখানে থাকতে যাবে কেন? এখানে খুব কষ্ট!'

'জানি। কষ্ট পৃথিবীর সব জায়গায় আছে তবে এক এক রকম। আমি কথা দিচ্ছি আমাদের কাছ থেকে তোমাদের কোন বিপদ আসবে না।'

আনন্দের কথায় কোন জবাব দিল না পালদেম। চুপচাপ তাকে আন্তানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বলল, 'আমার ছেলের জন্যে তুমি যা করেছ তা আমি মনে রাখব।' তারপর চলে গেল।

দরজায় শব্দ করতে সুদীপ সেটা খুলল, 'কেমন আছে?'

'ভাল। কিছু খেতে দিবি। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।' আনন্দ ভেতরে এসে নিজের বিছানায় সোঁপিয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করল। সে টোকাকর সময় দেখেছিল এই ঘরেও ওই মশাল জ্বলছে। জয়িতা নেই। কল্যাণ শুয়ে আছে। সুদীপ এসে ডাকতেই আনন্দ চোখ খুলে চমকে উঠল, 'এ কিরে!'

তার সামনে খানিকটা শক্ত খিচুরি আর একটা মুরগীর ত্যাং সম্ভবত পোড়ানো। সুদীপ বলল, 'স্মাকড চিকেন। পালদেমের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিল মুরগীটা। একটু ধোঁয়ার গন্ধ হয়ে গেছে ওরু কিন্তু টেস্ট দারুণ। বাপের জন্যে এমন রাখব কে ভেবেছিল।'

খাবার শেষ করে তুপ্ত আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'জয়িতা কোথায়?'

'ও সেই মেয়েটার কাছে গিয়েছে। তোরা দুজন যা আরম্ভ করেছিস!'

'কিন্তু ওখান থেকে এত রাত্রি একা ফিরবে কি করে?'

'বিকেনে আমি গিয়েছিলাম খবর নিতে। বলল, রাত হয়ে গেলে ওখানেই থেকে যাবে। মেয়েটার যা আমি দেখেছি। কিস্যু করার নেই। কেন যে ছাই আগে বাড়িয়ে উপকার করতে গেলাম।' সুদীপ ট্রানজিস্টার বের করল। আনন্দ দেখল কল্যাণ চোখ বন্ধ করে মড়ার মত পড়ে আছে। সকালে ও পালাতে চেয়েছিল। রাগের বদলে ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছিল আনন্দের। কিন্তু এখন কিছু বলতে যাওয়া মানে সেটা খুব বানানো শোনাবে। হয়তো সেটা ওর ভালও লাগবে না। ঠিক তখনই কিছু বিচিত্র শব্দ বের করার পর অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলায় খবর শুরু হল, জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি একযোগে বিটেনের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারকে আজ হিথেরো এয়ারপোর্টে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, তার

সরকার ব্যাপারটি নজরে রেখেছেন। আমাদের নয়াদিল্লিস্থ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সে দেশের সংসদে ঘোষণা করেছেন, যে কোন বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকে তার সরকার কঠোর হাতে দমন করবেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, গোথাল্যাণ্ডের দাবী মানার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যে চারজন বিপথগামী তরুণকে দায়ী করেছেন। এরা এখন ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছে বলে তাঁর কাছে খবর আছে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এবার আসুন আপনাদের নিয়ে যাই লণ্ডনের বই মেলায়। শব্দটাকে কমিয়ে দিয়ে সুদীপ চিৎকার করল, 'শুনেছিস প?'

আনন্দ নিলিপ্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোন স্টেশন রে?'

'ভয়েস অফ আমেরিকা অথবা বি বি সি। হ্যাঁ বি বি সি।'

'যাক, আমরা তাহলে আন্তর্জাতিক সংবাদ হয়ে গেলাম।' আনন্দ আবার চোখ বন্ধ করল।

'তাতে কোন স্বর্গী পাওয়া গেল।' আচমকা কল্যাণ কথাগুলো বলে উঠতেই দুজন ওর দিকে মুখ ফেরাল। কল্যাণ বলল, 'ওরা এখন টের পেয়ে গেছে আমরা এখানে এসেছি। এটা এমন একটা জায়গা যে পালিয়ে বাঁচার রাস্তা খোলা নেই। এখন ওরা আমাদের গলা টিপে মারবে। উঃ!'

অদ্ভুত শোনাচ্ছিল ওর গলা। আনন্দ উঠে বসল, 'ওরা এখনও জানে না আমরা কোথায় আছি।'

'সেই আনন্দেই থাক। ওয়াংদে নিশ্চয়ই ফিরে গিয়ে সব বলে দিয়েছে। আমি এখন কি করি।'

সুদীপ এবার কথা বলল, 'কাল পালদেমকে বলব তোকে ফালুটের পথে পৌঁছে দেবে?'

'তা তো বলবিই। আমাকে মেরে ফেলতে তোরা চাইবিই।'

'কেন?' আনন্দ বিস্মিত হল। তাদের কেউ এই রকম কথা বলছে ভাবতে পারছে না সে।

'আমি তোদের সঙ্গে সুর মেলাতে পারছি না। আমি ওষুধপত্র জানি না, কোন ফালতু কাজ করতে চাইছি না, আমার জন্যে তোদের খাবার নষ্ট হচ্ছে। সুদীপ আর জয়িতা অবস্থাপন্ন, তুই মধ্যবিত্ত আর আমি বিত্তহীন। আমাকে তোরা পাত্তা দিবি কেন?' শেষের দিকে কল্যাণের গলার স্বর অন্যরকম শোনাল। যেন আর একটু হলোই তার পক্ষে কেঁদে ফেলা অসম্ভব নয়।

সুদীপ বলল, 'তুই মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছিস কল্যাণ। তোর সম্পর্কে কেউ কিছু ভাবছে না। আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছি, আমরা কেউ কারো শত্রু নই। তুই ঘুমিয়ে পড়।'

আনন্দ কোন কথা বলছিল না। তার মনে পড়ল হোস্টেলের একটি ছেলের

কথা। ও এসেছিল রায়গঞ্জ থেকে। খুবই গরীব। কারো সঙ্গে কথা বলত না। কলেজ ছাড়া কোথাও যেত না। দুবেলা খাবার ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ার সামর্থ্য বোধ হয় ছিল না। কিন্তু সব সময় মনে করত অন্যান্য ছেলেরা বোধ হয় তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। মনে মনে ব্যাপারটা বানিয়ে নিয়ে সে ক্রমশ এমন কমপ্লেক্সে ভুগতে শুরু করল যে বেচারার পড়াশুনাটাও হল না। এই ছেলেটার সঙ্গে কব্যাণের কথাবার্তা মিলে যাচ্ছে। অক্ষমতা মানুষকে অভিমান দেয় কিন্তু অভিমান কি সব সময় আত্মহননে সাহায্য করে? কিভাবে কল্যাণকে সাহায্য করা যায়?

এই সময় রুষ্টি শুরু হল। রুষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা বাড়ছিল। ওরা আর কেউ কথা বলছিল না।

আনন্দরই ঘুম ভাঙল প্রথমে। মশালটা নিবে গেছে। ঘর অন্ধকার। শুধু মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজ কানে আসছে না। অর্থাৎ রুষ্টি থেমে গেছে। এই ঠাণ্ডায় শরীর বাইরে বের করা কঠিন ব্যাপার কিন্তু তলপেটের চাপ বাড়ায় আনন্দকে বের করতে হল। হাতড়ে হাতড়ে সে দরজার কাছে পৌঁছে গেল। সেটা খুলতেই মনে হল সমস্ত শরীর জমে যাবে। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে সে ভারমুগ্ধ হল। তারপর ছুটে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ বিস্ফারিত।

সূর্য উঠছে। আকাশ এখন পরিষ্কার। সমস্ত চরাচরে অন্ধকারের পাতলা মশারি এখনও টাঙানো। কিন্তু পর্বতশৃঙ্গের (এই শব্দটি ছাড়া আনন্দের ওই মুহূর্তে অন্য কিছু মনে হল না) ওপর সূর্যের আলো পড়েছে। সূর্যটাকে কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শৃঙ্গগুলোর খেলা চলেছে মারাত্মকভাবে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই অনেক আগে। এখন শেষ মুহূর্ত, একটুবাদে তিনি প্রকাশিত হবেন। শৃঙ্গগুলো লক্ষ্য করল আনন্দ। চ্যামলাও, বারুণৎসে, নাপটসে, লোৎসে, মাকালু, ছোমালল এবং সবার পেছনে মহান উন্নত এভারেস্ট। সমস্ত রেঞ্জটা সাদা কমলায় মাখমাখি। আনন্দ চিৎকার করে বন্ধুদের ডাকল। ওদের উঠতে যত সময় লাগছে তত আলোর রঙ পালটাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সুদীপ এসে দাঁড়িয়ে বলল 'আঃ!'

আনন্দ দেখল কল্যাণ আসেনি। সে দ্রুত ভেতরে ঢুকল। কল্যাণ জেগেছে কিন্তু এখনও চুপচাপ শুয়ে আছে। আনন্দ ওর হাত ধরল, 'উঠে পড়। কি দারুণ সূর্যোদয় হচ্ছে!'

'তাতে আমার কি।' নিলিপ্ত গলায় বলল কল্যাণ।

'সেটা না দেখলে বুঝবি না। আমি তোকে হকুম করছি উঠতে।'

যেন বাধ্য হল কল্যাণ। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যের মুখ দেখা যেতেই কল্যাণ আচমকা শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সুদীপ এবং আনন্দ চমকে উঠল। নিজেকে দ্রুত সামলে নিতে চাইছিল কল্যাণ।

তারপর যেন একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গীতেই বলল, 'কি অদ্ভুত সুন্দর না!'

ওরা কেউ জবাব দিল না। হতচ্ছগ শৃঙ্গুলো সাদা না হয়ে যায় ততচ্ছগ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সুদীপ আনন্দকে বলল 'আমাদের একবার জঙ্গিতার খোঁজ নেওয়া উচিত।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। কল্যাণ তুই সুদীপের সঙ্গে গিয়ে দেখে আয়। আমি চা করছি।'

ওরা চলে গেলে আনন্দ কাঠের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। যতই ঠাণ্ডা বাড়ুক সেটাকে শরীর তিক সইয়ে নিতে পারে সময় পেলে। এবং তখনই আনন্দের নজরে পড়ল কাছাকাছি সব উঁচু জায়গা সাদাটে হয়ে গেছে এমনকি ঘাসের ওপরে ও কুচি কুচি বরফ। অর্থাৎ কাল রাত্রের বৃষ্টির পরে এই কাণ্ডটি ঘটেছে। শীত আসছে। ক্রমশ সমস্ত চরাচর সাদা বরফে ঢেকে যাবে। সময় বেশী নেই যা করবার এখনই করতে হবে। কিন্তু কিভাবে সেটাই প্রশ্ন।

আর তখনই তার নজরে পড়ল দুটো মানুষ এগিয়ে আসছে। ওদের হাঁটার ভঙ্গী স্বাভাবিক নয়। একটু কাছাকাছি হতে সে বুঝল দুজনের একজন নারী, পুরুষটিকে সে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। আনন্দ অপেক্ষা করল। হাত দশেক দূরে পৌঁছে ওরা দাঁড়াল। পুরুষটি সোজা হতে পারছে না। বোঝাই যাচ্ছে লোকটা বেশ অসুস্থ। নারীটি হাত নেড়ে আনন্দের দিকে তাকিয়ে অনর্গল কিছুর বলে পুরুষটিকে দেখাল। ওদের পায়ের তলায় ঘাসে কুচি কুচি বরফ অথচ পুরুষটি সেখানেই বসতে চাইছে দেখে আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করল বারান্দায় উঠে আসতে। ওরা কৃতজ্ঞভঙ্গীতে এগিয়ে এসে বসে পড়ল। এবার আনন্দ বুঝল দুজনেরই বেশ ব্যস হয়েছে। সমস্ত শরীর ছেঁড়া গরম কাপড়ের আড়ালে থাকায় এতচ্ছগ বোঝা যাচ্ছিল না। রুদ্ধ মাথা গুঁজে বসে আছে। মাঝে মাঝে তার শরীর কেঁপে উঠছে। রুদ্ধ দুহাত তুলে আনন্দকে অনুনয় করছিল।

ভাষা বুঝতে না পারলেও বস্তু্য জানতে অসুবিধা হল না। ফাঁপরে পড়ল আনন্দ। রুদ্ধের কি হয়েছে সে বুঝতে পারছে না। বা বুঝলেও কোন্ ওষুধ দেওয়া উচিত এবং তা সঙ্গে নাও থাকতে পারে। সে হাঁটু মুড়ে বসে রুদ্ধের কপালে হাত রাখল, না জ্বর নেই কিন্তু শরীর কাঁপছে। এবং তখনই তার গলগণ্ডি নজরে এল। ওই কারণেই শরীর অসুস্থ কিনা কে জানে? পেটের যন্ত্রণাও হতে পারে কারণ মাঝে মাঝেই রুদ্ধের মুখ কুঁচকে যাচ্ছিল। বারংবার কানে ঘষার পর অচেনা শব্দও চেনা হয়ে যায়। আনন্দ রুদ্ধকে ইঙ্গিত করল রুদ্ধকে ওইয়ে দিতে। তারপর ঘরে ঢুকে ওষুধের বাস্কাটার দিকে সে কিছুচ্ছগ তাকিয়ে থাকল। নিজেকে ভীষণ নির্বোধ মনে হচ্ছিল। এক্ষেত্রে ওষুধ দিলে যদি বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়? চিকিৎসার এজ্জিম্যার একমাত্র চিকিৎসকের। কিন্তু এক্ষেত্রে সে কি করতে পারে? বোঝাই যাচ্ছে পালদেমের ছেলের সুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে ওরা অনুপ্রাণিত হয়েছে। আনন্দ একটা অ্যান্টিবায়োটিক

ট্যাবলেট এনে রুদ্ধার হাতে দিয়ে খাইয়ে দিতে বলল। এমন কি তাকে ট্যাবলেটটাকে কাগজমুক্ত করে জলের ব্যবহারের কথাও বলতে হল। ওদের ওখানে রেখে সে ভিতরে ঢুকল। কেরোসিন পোড়াতে আর সাহস হচ্ছে না। সে আবার বাইরে বেরিয়ে এসে উনুনটার সামনে কেটলি রাখল। কাঠ নেই। আশেপাশে তাকাল আনন্দ। সুদীপ গতকাল কোথায় কাঠ পেয়েছিল। এই সময় রুদ্ধা বারান্দা থেকে নেমে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসল। পৃথিবীর সর্বত্র বোধ হয় স্নেনহের হাসি একরকম হয়। রুদ্ধা হাত নেড়ে যা বলল তার মানেটা বোধ হয় এই রকম তুমি সরে যাও যা করার আমিই করছি। কৃতজ্ঞ আনন্দ উঠে এল ওপরে। রুদ্ধ চুপচাপ শুয়ে আছে। তার চোখ খোলা। কিন্তু শরীর কাঁপছে না আগের মত। নিজেকে একটি প্রতারক বলে মনে হচ্ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিন্দুমাত্র না জেনে আগ বাড়িয়ে সাহায্য করার ফল হাতে পাওয়া যাবে। হয়তো যা দরকার তার বিপরীত ওষুধ রুদ্ধকে দেওয়া হল। ও মারা গেলে এখন তাকেই নিমিড়ের ভাগী হতে হবে। সে রুদ্ধের পাশে বসল। তারপর কপালে হাত রাখল। ধীরে ধীরে রুদ্ধের মুখে হাসি ফুটল। অজপ্র শিরা ওঠা কাঁপা হাতে রুদ্ধ আনন্দের হাত ধরল। কে বলে শুধু মৌবনেই উত্তাপ থাকে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক বাড়তে লাগল। এখন আকাশ পরিষ্কার। রোদ আছে কিন্তু তার তেজ নেই। ওদের আস্তানার সামনে এখন অন্তত সত্তরজন মানুষ। প্রত্যেকেই অসুস্থ। প্রত্যেকেই ওষুধ চায়। অথচ কেউ কথা বলছে না। এই রকম মুক অসুস্থ মানুষদের মুখোমুখি হয়ে ওরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। জয়িতাকে নিয়ে সুদীপরা ফিরে এসেছিল এর আগে। মেয়েটির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। জয়িতার খারণা যা ওর পাঁজরার ভেতরে চলে গেছে। বড় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ছাড়া ওই মেয়েটিকে বাঁচানো মুশকিল। ওরা যে ওষুধ দিচ্ছে তাতে ওপরে ওপরে কাজ হচ্ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই বিকট যা নিয়ে মেয়েটি কি করে এতদিন হেঁটে চলে বেড়াতো। সুদীপের যুক্তি হল ওটা অনেকটা ক্যান্সারের মত। বেশ আছে, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। যেই বায়োগ্যাসি করা হল, খোঁচানো হল অমনি দুন্দাড় করে বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রোগী বিছানায়, মন্ত্রণার শুরু।

ওরা চা খেয়েছে। রুদ্ধাকেও দিয়েছে। রুদ্ধা এখন ষুমাচ্ছে। রুদ্ধা মাঝে মাঝে দেখে যাচ্ছে তাকে। তার মুখের উদ্বেগ এখন অনেকটা কমে গেছে। আনন্দের আনা আটা হাতে মেখে সে তালি দিয়ে রক্তির আকারে নিয়ে গিয়ে উনুনের ওপর ফেলে দিচ্ছে শেকার জন্যে। আর এইসব কাজ রুদ্ধা করছে আনন্দিত হয়েই। তার পাশে আরও কয়েকটি মেয়ে জিড় করেছে। তারা অবশ্য সুদীপদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্যসহযোগে হাসছিল। সেই হাসি উঁচুতে উঠলে রুদ্ধার গলায় ধমক বাজছিল। কিন্তু চারজনের লক্ষ্য ওদিকে ছিল না।

এতগুলো মানুষ অসুস্থ হয়ে চূপচাপ বসে থাকবে অথচ—।

আনন্দ পালদেমকে বলল, ‘আমাদের কাছে এত ওষুধ নেই, কি করি বলতো ? তাছাড়া প্রত্যেকের এক এক রকম রোগ। সব রোগের কি ওষুধ হবে তাও আমরা জানি না।’

পালদেম বলল, ‘আমি ওদের দুবার বলেছি কিন্তু কেউ কথা শুনতে চাইল না। এদের ধারণা তোমরা দেবদূতের মত এখানে এসেছ এবং ওদের সারিয়ে তুলতে পার।’

‘মিথ্যে কথা। আমরা চিকিৎসার কিছুই জানি না।’ অকপটে বলল আনন্দ।

পালদেম হাসল, ‘একথা কেউ শুনবে না। তোমরা আমার ছেলেকে সারিয়েছ।’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘কিন্তু আমাদের বন্ধু বলছে মেয়েটিকে বাঁচানো হয়তো সম্ভব হবে না।’

পালদেম চূপ করে গেল। ওর মুখ খুব শক্ত দেখাচ্ছিল। আনন্দ বলল, ‘ওর কিছু হলে তো তোমরা আমাদের ছাড়বে না। কেন আর বিপদ বাড়াবো বল।’

পালদেম সমস্ত নিল কথা বলতে, ‘মেয়েটার মা বলেছে তোমাদের বন্ধু যা করেছে তার তুলনা নেই। কিন্তু মেয়েটার মরণ ঘা হয়েছে। এদের কি বলবে এখন ?’

আনন্দ চূপচাপ লোকগুলোকে দেখল। জয়িতা বলল, ‘ফালনু এক্সপেরিমেন্ট করে ওদের বিপদ বাড়িয়ে লাভ নেই। লেট দেম সাফার ইন দেয়ার ওন ওয়ে।’

হঠাৎ দ্বিতীয় একটা পথ দেখতে পেল আনন্দ। সে পালদেমকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাদের কেউ ফালনুট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে আমাদের।’

‘ফালনুট! ফালনুটে আমরা কেউ কখনও যাইনি। কেন ?’

‘রাস্তাটা তো চেনো। তোমরা আমাদের ওই পর্যন্ত পৌঁছে দিলে আমরা চেষ্টা করব দার্জিলিং যেতে! দার্জিলিং-এর কোন ভাল ডাক্তারকে যদি প্রত্যেকটা লোকের অসুখের বর্ণনা দেওয়া যায় তিনি নিশ্চয়ই কোন ওষুধ দরকার বলে দেবেন। সেগুলো কিনে ফালনুটে ফিরে এলে তোমাদের লোক আবার পথ চিনিয়ে এখানে আসবে। এ কাজের জন্য বড় জোড় সাতদিন সময় লাগতে পারে। কিন্তু লোকগুলোর অসুখে ঠিকঠাক ওষুধ পড়বে।’

আনন্দ উত্তেজিত ভঙ্গীতে কথাগুলো বলতে পালদেম ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকাল, ‘তোমরা কজন হবে ?’

আনন্দ বলল, ‘একজন।’ সে প্রশ্নটায় সন্দেহের গন্ধ সহজেই পেল।

মাথা নাড়ল পালদেম, ‘ঠিক আছে।’

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল চারজন। চারটে কাগজে আনাদা করে প্রতিটি মানুষকে পালদেমের সাহায্যে জিজ্ঞাসা করা হল, তার কি কষ্ট হচ্ছে ? রোগের উপসর্গ কি, বাথা কোথায়, জ্বর আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় আড়াই

‘ঘন্টা লাগল সব জেনে নিতে। পালদেম তাদের বলে দিল সাতদিন পরে ওষুধ পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ শুঙ্কনের পর তারা তালু পথ বেয়ে চলে গেল যে যার ঘরে। এই সময় রুদ্ধা এসে দাঁড়াল আনন্দের সামনে। রুদ্ধের দিকে হাত বাড়িয়ে সে অভিমানের সুরে কিছু বলে আনন্দের হাতের কাগজটি দেখাল। হোস ফেলল আনন্দ। তারপর পালদেমের সাহায্যে রুদ্ধকেও জেরা করে করে উত্তরগুলো লিখে নিতে রুদ্ধা খুশী হল।

আজ পালদেম এবং রুদ্ধা ওদের সঙ্গে খেল। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পালদেম বলল, ‘সামনের চাঁদের পর এখানে রোজ বরফ পড়বে। তখনই হবে মুশকিল।’

‘মুশকিল কেন?’ জন্মিতা প্রশ্ন করল।

‘প্রত্যেক বছর এই সময় ব্যাপারী আসে খচ্চর নিয়ে। এ বছর এখনও এল না ওরা। ওদের কাছেই শীতের জন্যে জিনিসপত্র পাই আমরা।’ পালদেম উঠে দাঁড়াল, ‘তোমাদের মধ্যে কে যাবে বাইরে?’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘আমি।’

‘তাহলে এখনই রওনা হও। আমি একটি ছেলেকে দিচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। সে অল্প অল্প হিন্দী বলতে পারে। আমার ছেলের অসুখ না হলে আমি নিজেই যেতাম।’

‘এখন রওনা হলে ফালুটে পৌঁছাবার অনেক আগেই রাত নামবে না?’

‘নামুক। পাহাড়ে রাত কাটানোর জায়গা পাবে। দেরী করে কি লাভ!’ পালদেম যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল, ‘আমি মিনিট পনেরর মধ্যে ওকে নিয়ে আসছি।’

সুদীপ এবার কথা বলল, ‘দার্জিলিং-এ যাচ্ছিস। কতটা রাস্তা হাঁটিতে হবে খেয়াল আছে।’

‘এছাড়া কোন উপায় নেই।’ আনন্দ উঠে কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে নিল। সেই সঙ্গে টেন্টটাও। নিয়ে বলল, ‘মানে শুঙ্কনের মারোয়াড়ি দোকানদারটা তো আমাকে ছিঁড়ে খাবে টেন্টের জন্যে। দুটোই নিয়ে নিই কি বল?’

সুদীপ বলল, ‘দুটো টেন্টের দাম আর কত হবে? ওগুলো আমাদের কখন লাগবে ঠিক নেই। তুই বরং দাম দিয়ে দিস।’

সুদীপ আর জন্মিতা আর একটা লিস্ট তৈরি করল। যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিস ফেরার সময় আনতে বলল। সুদীপ আনন্দের হাতে পনের হাজার টাকা দিল, ‘টাকাটা সাবধানে নিয়ে যাবি। একা যাচ্ছিস, সঙ্গে অল্প নেই।’

কল্যাণ এতক্ষণ চুপচাপ ওদের লক্ষ্য করছিল। এবার উঠে দাঁড়াল, ‘আনন্দ তোর যাওয়ার দরকার নেই, আমি দার্জিলিং-এ যাব।’

তিনজনেই চমকে উঠল, আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই যাবি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু—।’

‘কিন্তু কি? আমি কোন কাজ করতে পারি না। যা করার তোরাই করবি? চমৎকার। এতটা অপদার্থ ভাবার কোন কারণ নেই। আমিই যাচ্ছি।’ কল্যাণ উঠে নিজের জিনিস গুছিয়ে নিল।

সুদীপ বলল, ‘কিন্তু কল্যাণ—।’

‘না, সুদীপ, আমি পালানো না। পালিয়ে যাইব বা কোথায়? এখনকার অসুস্থ মানুষদের জন্যে কিছু করতে পারলে আমার ভাল লাগবে।’ সে নিজের হাতটা তুলে ধরল, ‘এটা কেটে দে।’

কল্যাণের হাতের প্লাস্টার এখন কালো হয়ে বেন চামড়ার সঙ্গে মিশে গেছে। ওদের নজরেও পড়ত না আলাদা করে। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে সেটাকে কাটতে অনেক সময় লাগলো। নীরন্তু সাদা হাত বেরিয়ে এলে কল্যাণ সেটা ঘুরিয়ে দেখল। কোন কোন জায়গার ঘা-এর মত হয়ে গেছে। প্লাস্টারটা তুলে সে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ‘ওটার মধ্যে ছারপোকার বাসা হয়ে গিয়েছে।’ এমন সময় পালদেম একটা অল্পবয়সী ছেলেকে নিয়ে ফিরে এল। বোঝা যাচ্ছে ছেলেটি যতটা সম্ভব তার সেরা সাজ পড়ে এসেছে। তার পিঠে একটা কিছু দড়ি দিয়ে বাঁধা। আনন্দ শেখবার চেষ্টা করল, ‘কল্যাণ, এখনও ভেবে দ্যাখ।’

‘ভাবনার কিছু নেই। তোরা তো আমাকে একটাও বোমা ছুঁড়তে দিলি না। মানুষ না মারতে পারি মানুষ বাঁচাবার কাজে লাগি। আমি সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসব, টাকাটা মেরে দিয়ে পালিয়ে যাব না, কথা দিচ্ছি—।’ কল্যাণকে খুব সিরিয়াস, খুব স্থির মনে হচ্ছিল।

জয়িতা এবার কাছে এগিয়ে এল, ‘কল্যাণ, তোর নেচার আমি জানি, তুই এই কন্সট সহ্য করতে পারবি না। ওটা তোর কাজ নয়।’

‘ভাগ।’ কল্যাণ জিনিসপত্র তুলে নিচ্ছিল।

জয়িতা বলল, ‘তাছাড়া পুলিশ আমাদের জন্যে ওয়েট করছে। ধরা পড়লে কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছিস? তুই একটু চিন্তা করে দ্যাখ।’

‘ও! আনন্দ গেলে পুলিশ জামাই আদরে দার্জিলিং-এ খেতে দেবে, না? আসলে তোরা আমাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিস! আমিতো কথা দিয়েছি, বিশ্বাস কর না।’

অতএব আনন্দ কল্যাণকে সুদীপের টাকাটা দিয়ে দিল। নিস্ঠগুলোও সে নিয়ে নিল। পালদেম জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি যাচ্ছ না কেন?’

আনন্দ বলল, ‘আমাদের এই বন্ধু যাচ্ছে বলে। ছেলেটাকে বলে দাও যেন সন্দের মধ্যে একটা ভাল আস্তানা খুঁজে নেয়। ও যদি দার্জিলিং পর্যন্ত যায় তাহলে ভাল হয়।’

‘না। আমরা কেউ বড় শহরে যাই না। সান্দাকফুর কাছে ওকে ছেড়ে দিয়ে

ছেলেটা অপেক্ষা করবে সাতদিন। আমরা পাহাড়ের মানুষ ঠিক থেকে যেতে পারি পাহাড়ে। তোমার বন্ধুকে বলে দাও যেন সাতদিনের মধ্যে ওই জায়গায় ফিরে আসে।’

নতুন করে বনার কিছু ছিল না। কিছু চাল ডাল আলু সঙ্গে নিল কল্যাণ। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চালু পথে নামল। ওরাও সঙ্গ নিল। খানিকটা দূরে যাওয়ার পর দেখল গ্রামের অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে পথের ওপরে। ছেলেটির মা এসে গায়ে হাতে হাত বুলিয়ে খানিকটা কথা বলে নিল। জগিতার মনে হল সবাই জানে কল্যাণ কেন যাচ্ছে। প্রত্যেকেই চাইছে ওরা নিরাপদে ফিরে আসুক। এই সময় কাহ্নকে দেখা গেল দুজন শিষ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে। ওদের দাঁড় করিয়ে দুমিনিট মালা ঘুরিয়ে মন্ত্রপাঠ করে কাহ্ন সশিষ্য নীরবে ফিরে গেল।

ওরা এগিয়ে চলল সেই জায়গা পর্যন্ত যেখানে এসে প্রথম দিন ওরা গ্রামটাকে দেখতে পেয়েছিল। জগিতার কেবলই মনে হচ্ছিল কল্যাণের সঙ্গে তার এই শেষ দেখা। শেষ পর্যন্ত সবাই যখন দাঁড়িয়ে পড়ল তখন ওরা দল ছেড়ে এগোল। হঠাৎ জগিতা একা দৌড়ে কল্যাণের কাছে পৌঁছাল, ‘সাবধানে যাাস।’

‘তুই ভাল থাকিস জয়ী।’ কল্যাণ ওর গালে আঙুল রাখল এক মুহূর্ত। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল পাহাড় ভেঙে। কয়েক পলকের মধ্যে ওরা চোখের আড়ালে চলে গেলে জগিতা আবিষ্কার করল তার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হল কল্যাণকে রিভলভারটা দিয়ে দিলে হত। কিন্তু সেই সময় একটা উল্লাসের চিৎকার উঠল জনতার মধ্যে।

জনতার থেকে আলাদা একা দাঁড়িয়ে জগিতা দেখল দূরে সাদা পাহাড়ের পটভূমিতে কয়েকটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে। বিন্দুগুলো গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

॥ ৩৬ ॥

মানুষগুলো নেমে যাচ্ছে নিচে তাড়াহড়ো করে। এই গ্রামে যাওয়া আসার পথ তাহলে দুটো। একটা দিয়ে তারা এসেছিল, কল্যাণরাও গেল। দ্বিতীয়টি ওই বিন্দুগুলো ব্যবহার করছে। এখন অবশ্য আর ঠিক বিন্দু নেই। কয়েকটা জন্ত এবং মানুষ যে গ্রামে আসছে বোঝা যাচ্ছিল। আনন্দ চিৎকার করে জগিতাকে ডাকল, ‘এই জয়, চটপট চলে আয়।’

যেদিকে মানুষের চল এগোচ্ছে তার বিপরীত দিকে যাচ্ছিল সুদীপ আর আনন্দ। নেমে আসতে কখনই অসুবিধে হয় না যদি ব্যালেন্স ঠিক রাখা যায়। জগিতা ওদের ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছিস? কারা আসছে বল তো?’

আনন্দ হাঁটছিল এখন। জনতাকে দেখা যাচ্ছে না এখন থেকে। বলল, ‘কেউ না কেউ আসছে, তবে যেই আসুক আমাদের দেখে নিশ্চয়ই অবাক

হবে। এমনও হতে পারে নেপাল সরকারের অনুমতি নিয়ে পুলিশ আসছে আমাদের উদ্দেশ্যে। তাই যতক্ষণ ব্যাপারটা না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ আড়ানে থাকাই উচিত।’ ওরা গ্রামের মধ্যে হাঁটছিল।

সুদীপ বলল, ‘পুলিস দেখে এত আনন্দিত পৃথিবীর কোন দেশের মানুষ হয়নি বলেই জানি। আমার মনে হচ্ছে এরা সেই লোক যারা শীতের আগে এখানে ব্যবসা করতে আসে।’

আনন্দ বলল, ‘তাই। কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে তো ক্ষতি নেই।’

এই সময় জয়িতার আবার মনে হল আনন্দ কিভাবে সতর্ক হবে? কোন অস্ত্র সঙ্গে নেই যে আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করতে পারবে? একমাত্র তার কাছেই— কিন্তু না, এখনও ওদের কিছু বলার দরকার নেই।

আশ্চর্য্য পেঁছে জয়িতার আবার কল্যাণের কথা মনে পড়ল। আজ ও থাকবে না। দলের সবচেয়ে ভীতু, আশ্রয়খোজা দুর্বলচিত্তের ছেলে সবচেয়ে সাহসী হবার জন্যে বেরিয়ে গেল। মানুষ কখনও কখনও এমন বিপরীত আচরণ করে থাকে বলেই তাকে দুর্বোধ্য বলা হয়। কিন্তু জয়িতারও সংশয় আছে কল্যাণ শেষ পর্যন্ত দাজিলিং-এ পেঁছাতে পারবে কিনা। ও যদি ঘুম থেকে কলকাতা ফিরে যায় তাহলেও যেমন অবাধ হওয়ার কিছু নেই, তেমনি মাথা গরম করে মানেভঞ্জে কোন নাটক করে ফেলাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই কণ্ট ও সহবে? একা?

সুদীপ বলল, ‘আমি আজ মাল খাব, তোমাদের কারো আপত্তি আছে?’

আনন্দ অবাক হল, ‘মাল! মাল কোথায় পাবি?’

সুদীপ হাসল, ‘স্টকে আছে। তোরা ভুলে গেছিস।’

জয়িতা মুখ ফেরাল, ‘হঠাৎ এত মধুর বাসনা?’

সুদীপ চোখ বড় করল, ‘যাচ্চলে! তুই বাংলা বলছিস? কি হল মাইরি! খাবি?’

জয়িতা উত্তর দিল না। সে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, ‘এখানে বসে থাকলে আমরা নিরাপদ? কে এল দেখা দরকার। আমি যাচ্ছি, তুই আসবি?’

সুদীপ বলল, ‘দেখাদেখিতে আমি নেই। তোরা ঘুরে আয়।’

যতটা সম্ভব আড়াল রেখে ওরা এগোচ্ছিল। আনন্দ বলল, ‘জয়ী, আমরা যেন কেমন অলস হয়ে যাচ্ছি। কাজ না করলে যা হয়। সুদীপ কেন মদ খাবে না তার যুক্তি তো আমি-পেলাম না।’

তিনটে লোক আর ছটা খচ্চর। জন্তুগুলো মালপত্রের আড়ালে পড়ে গেছে প্রায়। তিনজনের মুখে হাসি। ওদের দেখলে সিকিমিজ কিংবা টিবেটিয়ান বলেই মনে হবে। কারণ নেপালিরা অত লম্বা হয় না, নাকের গড়ন মোটেই চ্যাপটা নয়। গ্রামবাসীরা ওদের স্বাগত জানাচ্ছিল। যে মানুষটির বয়স হয়েছে তাকেই নেতা বলে ভাবতে অসুবিধে হল না। ছোট্ট যে মার্গটি এই গ্রামের মাঝখানে সেখানে চলে এল লোক তিনটে। বুদ্ধ সবাইকে কুশল জিজ্ঞাসা করছে হাত

নেড়ে। অন্তত সেইরকম মনে হল এদের কাণ্ড দেখে। আনন্দ জয়িতাকে বলল, 'গ্রামে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল। কে বলবে একটু আগে লোকগুলো ওম্বুধের জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এই তিনটে লোক আসছে কোথেকে?'

জয়িতা উত্তর দিল, 'দার্জিলিং থেকে। নইলে জিনিসপত্র পাবে কোথায়? সামনে যাবি?'

আনন্দ বলল, 'না। আর একটু অপেক্ষা করা যাক।' এই সময় দেখা গেল কাছন আসছে তার সাকরেদদের সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ আর তার দুই সঙ্গী নতজানু হয়ে কাছনকে শ্রদ্ধা জানাল। ব্যাপারটা কাছনের খুব পছন্দ হয়েছে বলে মনে হল মুখ দেখে। এই সময় রুদ্ধা উঠে গিয়ে বোঁচকা খুলে একটা ঠোঙা খুলে চাল মুঠোয় নিয়ে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক সোৎসাহে সাধুবাদ দিয়ে উঠল যেন।

কয়েকটা কথা বলার পর কাছন ফিরে গেল। আনন্দ বলল, 'যাক, লোকগুলো পাসপোর্ট পেয়ে গেল। সর্বত্র ঘুম দেবার এই প্রথাটি রয়েছে। এখন যত ইচ্ছে ব্যবসা করতে পারবে।'

জয়িতা বলল, 'গ্রামে চোকার সময় আমাদেরও ভেট দেওয়া বোধ হয় উচিত ছিল। যে দেশের যা নিয়ম। আমাদের মেজাজ সব জায়গায় চলবে কেন?'

এই সময় আগন্তুকরা বিশ্রাম শেষ করে কাজ শুরু করল। খচরগুলোর পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে খুলতে লাগল ওরা। তারপর মোটামুটি দোকান সাজিয়ে ফেলল। একটা জায়গায় প্রচুর জামা প্যান্ট শাড়ি থেকে শুরু করে গরম চাদর কোট সোয়েটার স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আর একটা জায়গায় চাল ডাল নুন থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনীয় কিছু না কিছু রয়েছে। কেনাবেচা শুরু হয়ে গেল। একটা ছাগল দিয়ে শার্ট-প্যান্ট আর শাড়ি পেল একজন। শার্ট প্যান্টকে খুব নতুন বলে মনে হল না এবং শাড়িটিও বেশ সাধারণ। বিনিময় প্রথায় প্রচণ্ড লাভ করছে ব্যবসায়ীরা। দুর্গম অঞ্চলে জিনিসপত্রগুলো অনেক কষ্ট করে ওরা নিয়ে এসেছে এটাই যদি একমাত্র যুক্তি হয় তাহলে ওরা যা ইচ্ছে চাইতেই পারে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছায় তা দেখবার জন্যে ওরা অপেক্ষা করবে বলে স্থির করল।

হাঁটার সময় শরীরের উত্তাপ বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই ঠাণ্ডা কমে যায়। কিন্তু কল্যাণ গরম জামা খোলার কথা চিন্তা করছিল না। প্রাথমিক উদ্যমের পর তার হাঁটার গতি কমে এসেছিল। এখন চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। ঘন কুম্ভার দলবেঁধে আসা যাওয়া করছে। তার সঙ্গী বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হাঁটছিল। চড়াই ভাঙ্গতে যেখানে তার জিত বেরিয়ে আসার উপক্রম সেখানে ছেলেরা মুখ ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে হেসেছে। ক্রমশ দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন ছেলেরা দাঁড়িয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। ও যে কতটা হিন্দী বোঝে তা

ইতিমধ্যে জেনে গেছে কল্যাণ। একটা কথা চারবার বললে তবে যদি ও সেটা আন্দাজ করতে পারে। লক্ষ্যহীন হাঁটায় কোন তাড়াহুড়ো থাকে না। কিন্তু এখন তার কেবলই মনে হচ্ছে অনেকটা পথ সামনে পড়ে আছে। ফালুটের রাস্তা পর্যন্ত কোন চিন্তা নেই। কিন্তু তারপরে প্রতি মুহূর্তে পুলিশের চোখ এড়াতে হবে। অবশ্য ওই রাস্তায় পুলিশের থাকার কথা নয়। ভারতবর্ষের পুলিশের দায় পড়েনি ওই পাণ্ডব বজ্রিত পথে বারো তের হাজার ফুট পায়ের হেঁটে উঠে এসে টহল দেবে।

মুশকিল হল ও যখন বিশ্রামের জন্যে কোথাও বসতে চাইছে তখনই ছেনেটা বিরক্ত হচ্ছে। অনর্গল, নিজের ভাষায় কিছু বলে আকাশে হাত তুলে সম্ভবত সূর্য দেখাচ্ছে। একটি শব্দ ওর ঠোঁটে নেগেছে, 'জনদি।'

কেন জনদি তা কল্যাণ জানে। ছেনেটা চাইছে অন্ধকার হবার আগেই এমন কোথাও পৌঁছাতে যেখানে রাতের আস্তানা আছে। কিন্তু পাহাড় ভাঙতে যে ইতিমধ্যে তার পায়ের ব্যথা শুরু হয়েছে সেটা প্রকাশ করা যায় না। ওর মনে হল সুদীপরা আরাম করে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তাটাকে বাতিল করল। তাকে দার্জিলিং-এ পৌঁছাতেই হবে। একটি ভাল ডাক্তারের সঙ্গে বসে প্রেসক্রাইব করাতেই হবে। তারপর ওষুধগুলো গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে। এবং এটা না করলে সে বন্ধুদের—না এটা করার পর সে এমন করবে যেন কিছুই করেনি। জ্ঞান হবার পর সে জেনেছে অন্য ছেনেময়েরা তাদের বাবামায়ের কাছ থেকে যে সাহায্য পায় তা সে পায়নি। তাকে নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করতে হয়েছে। এবং সেটা করতে গিয়ে এককালের সব চিন্তা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে। অন্যের জন্যে কোন ভাল কাজ করার কথা মাথায় আসেনি অথবা সুযোগও পাওয়া যায়নি। এই প্রথম একা সম্পূর্ণ একা সে ওইরকম একটা কাজ করতে যাচ্ছে। কাজটা শেষ করতেই হবে। অবশ্য এটাও যদি নিশ্চয়মধ্যবিত্ত মানসিকতা হয় তাহলেও সে খুশী।

এই পথেই ওরা এসেছিল কিন্তু এখন পথটাকে সে মোটেই চিনতে পারছে না। যদি এই ছেনেটা সঙ্গে না থাকে তাহলে তার পক্ষে গ্রামে ফেরাও অসম্ভব। এবার ছেনেটা ভাঙ্গা হিন্দীতে যা বলল তার অর্থ, আপনি যদি এইভাবে হাঁটেন তাহলে আর কখনও ফিরে আসতে পারবেন কিনা সন্দেহ। অতএব কল্যাণ আবার পা চালাল। তার মনে পড়ল আসার সময় গুহার বাইরে হিংস্র জন্তুদের অস্তিত্ব ছিল। একটাকে গুলি করে মারাও হয়েছিল। এখন তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। তাছাড়া রাত্রি এখানে যে জন্তুর কান্না শুনতে পাওয়া যায় তার দর্শন পাওয়াও অসম্ভব নয়। ছেনেটাকে জোর পাল্লায় সে অনুসরণ শুরু করল। এখন শুধু অন্ধের মত হেঁটে যাওয়া।

চূপচাপ তিন পেগ ব্যাপ্তি খেয়ে মেজাজী লাগছিল বেশ। বিলিতি ছবিতে সুদীপ দেখেছে কেউ জল দিয়ে মদ খায় না। তাপন্যাও যে ঠাণ্ডা বিলেতে নিশ্চয়ই

তার চেয়ে বেশী নয়। অতএব সুদীপ বিলিতি কায়দা অনুসরণ করেছিল। ফলে খুব দ্রুত তার মাথায় বিপরীত চেউ বইতে শুরু করল। ব্র্যাণ্ডির বোতলটা হাতে নিয়ে সে দরজায় এসে দাঁড়াল। সে খুশী হল এই ভেবে তার হাশ আছে। নইলে ওইটুকু আসতে যে তিনবার পা টেলেছে তা টের পেত না। মাতালদের কোন জ্ঞান থাকে না। তিন পেগ ব্র্যাণ্ডি খেলে কেউ মাতাল হয় না। অবশ্য সে তো আন্দাজে টেলেছে। এই গ্লাসের কতটায় এক পেগ হয় তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন কিন্তু তার যে মনে হচ্ছে তিন পেগ সেটাই যথেষ্ট। আনন্দ কোথায়? সে চোখ মেলে সামনের উপত্যকায় কাউকে দেখতে পেল না। আবছা মনে পড়ল কেউ এসেছিল এই গ্রামে। তারা কারা? যদি পুলিশ হয় তাহলে এখানে বসে থাকা উচিত নয় এই বোধটুকু মাথায় ঢুকে গেল। কিন্তু সেইসঙ্গে সুদীপের মনে দুঃখ এল। সে মদ খেয়েছে বলে আনন্দরা তাকে ত্যাগ করে গেল? সে নেশা করে না জেনেও? এত কনজারভেটিভ হবে কেন ওরা? দেশের জন্যে যারা কাজ করে তাদের কেন সম্মানী হতে হবে? জম্মিতাটাও কেন আনন্দের সঙ্গে চলে গেল? দুঃখটা ভারী হয়ে উঠতেই সুদীপের বুক থেকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। তার মনে হল আপাতত কোথাও লুকিয়ে থাকা দরকার।

সুদীপ ধীরে ধীরে নামতে চাইছিল কিন্তু তার পা দ্রুত চলছিল। তিক কোন নিদিষ্ট লক্ষ্য ছিল না কিন্তু সে গ্রামের উল্টো দিকে নেমে যাচ্ছিল। একটা পায়ে চলা পথ পেয়ে সে খুশী হল। তার ডান হাতে এখনও বোতলটা সযত্নে ধরা যদিও সে ও ব্যাপারে সচেতন ছিল না। একসময় খেয়াল হতে সে মুখ ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিন্তু আস্তানাটা চোখে পড়ল না। কয়েকটা পাথর ডিঙিয়ে সে খুব সাবধানে এগোচ্ছিল। এবং তখনই জলের শব্দ কানে এল। তার মনে হয় সে ভুল গুনছে। এখানে নদী কোথায় যে জলের শব্দ হবে। তিন পেগ ব্র্যাণ্ডি খেয়েই শেষ পর্যন্ত নেশা হয়ে গেল? অথচ শব্দটা কানে নেগেই আছে। সুদীপ খুব সন্তর্পণে এগোল। এবং গাছপালা ও পাথরের আড়াল শেষ হলে সে জল দেখতে পেল। প্রথমে তার মনে হল এটা মরীচিকা। তারপরেই খেয়াল হল মরীচিকা শুধু মরুভূমিতে দেখা যায়। অতএব ওই যে হাত পনের চওড়া তীব্র জলের ধারা নীচে নেমে যাচ্ছে সেটা সত্যি। তার ঝরনা শব্দটা মনে পড়ায় খুশী হল। পাহাড়ি ঝরনার ধারে বসে সুরা হাতে জীবন কাটিয়ে দেবার কথাটা কে যেন বলেছিল? কোন কবি? তার এখানে আসা উচিত। এইখানে।

একটা পাথরে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল সুদীপ। আর তখনই তার মনে পড়ল কল্যাণের মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটা কমে গেল সুদীপের। দার্জিলিং-এ যেতে প্রচণ্ড কষ্ট হবে কল্যাণের। এখন আর জিপ নেই। টানা সাড়ে তিনদিন হাঁটলে তবে দার্জিলিং। অথচ সাতদিনে ফিরে আসবে বলে গেছে। এম্পসিবল। তোর যাওয়ার কি দরকার ছিল? না, আমি

মানুষ মারতে পারিনি বলে মানুষ বাঁচাতে চাই। এটা একদম লোয়ার মিডলক্লাস সেন্টিমেন্ট। হিরো হবার জন্যে একেবারে হেঁদিয়ে মরছিল শালা! কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্যাণ ইজ কল্যাণ। সঙ্গে থাকলে মাঝে মাঝেই অস্বস্তি আসে, দূরে চলে যাওয়ায় এখন মোটেই স্বস্তি হচ্ছে না। আচ্ছা, কল্যাণ যদি আর না ফিরে আসে? সুদীপের হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। এবং সেই সঙ্গে তার মনে হল কান্নাটা প্রকাশ করা উচিত নয়। তাহলে নেশা হয়ে গেছে প্রমাণিত হবে। কিন্তু ওই পালদেম লোকটাকে টাইট দেওয়া দরকার। চুরি করে সমস্ত মাল নিয়ে গিয়েও কেমন দাঁত কেলিয়ে বারংবার আসছে। মালাগুলো ফেরত না পেলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। সুদীপ আর একবার বোতলের মুখ খুলল। তারপর বিলিতি ছবির হিরোর মত খানিকটা গলায় ঢাললো। এখন আর বুক জ্বলছে না। তবে চোখের সামনে নদীটা মাঝে মাঝেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওর মনে হল একটু শুয়ে পড়লে কেমন হয়। মাথাটা বড় হালকা লাগছে। সে কোনরকমে পাথরের ওপর শরীর বিছিয়ে দিতেই আরাম বোধ করল। চোখ বন্ধ করতেই হট করে চলে গেল কলকাতায়। কেউ একজন তার দিকে এগিয়ে আসছে। খুব সন্তর্পণে। তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। এবার মুখটা সামান্য ঝুঁকল। সুদীপ হেসে বলল, ‘মা, তুমি কেমন আছ?’

যে এসেছিল সে তার ভাষা বুঝতে পারল না। কিন্তু যখন দেখল সুদীপ আর চেতনায় নেই তখন লোভীর মত খপ করে বোতলটা তুলে নিল হাতে। তার লাল গালে আরও রক্ত জমল প্রথম তৌঁক পেটে যাওয়া মাত্র।

ব্যাপারীরা আজ রাত্রে এই গ্রামেই থেকে যাবে, ওদের দেখে সেই রকম মনে হচ্ছিল। প্রাথমিক কেনাবেচা শেষ হবার পর গ্রামের মানুষ হমড়ি খেয়ে পড়েছে জিনিসপত্র দেখার জন্যে। প্রত্যেকের ইচ্ছে কিছু না কিছু কেনার। প্রয়োজন যে রয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু বিনিময়ে যা দিতে হবে তা দেওয়ার সঙ্গতি সবার নেই। আনন্দ্রা অনেকক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। পালদেম দাঁড়িয়ে আছে দূরে। সে একটা ছোট জামা কিনেছে মুরগীর বিনিময়ে। সুভীর জামাটার দাম সাত/আট টাকার বেশী হবে না। আনন্দ এবং জগিতা ত্তিক করল ওরা কখনই ওই লোকগুলোর সামনে যাবে না। এরা নিশ্চয়ই কাল চলে যাবে এখন থেকে।

আনন্দ আড়াল থেকে সরে এসে রাস্তায় দাঁড়াতেই একটি বাচ্চাকে দেখতে পেল। ওই হট্টগোলের মধ্যে বাচ্চাটা যাচ্ছে না কিন্তু তার যে যাওয়ার এবং জিনিস কেনার খুব ইচ্ছে তা স্পষ্ট। সে আনন্দকে দেখামাত্র প্রথমে শঙ্কিত হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। আনন্দ ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর দূরে দাঁড়ানো পালদেমকে দেখিয়ে ডেকে আনতে ইশারা করল। এটা বুঝতে বাচ্চাটার সময় লাগল কিছুটা এবং তারপর দৌড়ে চলে গেল পালদেমের কাছে।

আনন্দ দেখল পালদেম বাচ্চাটার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে এদিকে তাকাল। ওখান থেকে সম্ভবত লক্ষ্য করা সহজ ছিল না তাদের অস্তিত্ব। পালদেম উঠে এলে আড়াল দূর হতেই বলল, 'ও তোমরা! কি ব্যাপার?'

আনন্দ বলল, 'এদের কথাই তুমি বলেছিলে বুঝতে পারছি। একটা মুরগী দিয়ে ওই জামা কিনলে? তোমাকে তো ওরা ঠকিয়ে দিল!'

'কি করব! ওরা বলছে জিনিসপত্রের দাম নাকি কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। আমার যে ছেলের অসুখ সে বায়না ধরেছে একটা জামার। অথচ কত কিছু দরকার ছিল, দাম শুনে—' পালদেম নিঃশ্বাস ফেলল। ওকে খুব করুণ দেখাচ্ছিল, 'দেখি, যাওয়ার সময় যদি দাম কম করে!'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা টাকা দিয়ে জিনিস কিনতে পারো না?'

'টাকা? টাকা কোথায় পাব?'

'কোন্ টাকা এখানে চলে? নেপাল না ভারতের?'

'সব টাকাই এখানে চলে। চ্যাংথাপু ওয়ালাংচাঙে ইণ্ডিয়ান টাকাই সবাই নেয়।'

কথাটা শুনে আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা মালপত্র কোথায় কেনে? দাজিলিং—?'

পালদেম বলল, 'না। বর্ডার থেকে কিনে ওরা সবকিছু এনে জমা করে চ্যাংথাপুতে। তারপর গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতে যায়।'

'ধর, যদি ওদের সব জিনিস বিক্রি হয়ে যায় তাহলে কি আজ ওরা ফিরে যাবে?'

প্রশ্নটা শুনে পালদেম আকাশের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে ওরা কি করবে।'

আনন্দ বলল, 'আমরা এখানে আছি ওরা জেনেছে?'

'না।' পালদেম দ্রুত মাথা নাড়ল।

'বেশ, তাহলে তুমি মিনিট দশেক পরে আমাদের ওখানে চলে এস। দরকারি কাজ আছে।' আনন্দ কথা শেষ করে জয়িতার সঙ্গে পেছন ফিরল।

খানিকটা যাওয়ার পর জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'মনে হচ্ছে তোর মাথায় কোন মতলব এসেছে, কি ব্যাপার?'

আনন্দ বলল, 'টাকাটা এখনও সুদীপের, তাই ওর সঙ্গে কথা বলে নেওয়া দরকার। শোন, আমার ইচ্ছে ওই মুরগী ছাগলগুলো ওদের কাছ থেকে প্রথমে কিনে নিই। একটা মুরগীর দাম দশ টাকা পড়বে এখানে। ছাগলের দাম জানি না পালদেমকে বলব ব্যবসায়ীরা বিনিময়ে যা যা পেয়েছে তা খুব দরাদরি করে সব কিনে নিতে। তারপর বাকি যা মাল থাকবে সেগুলো টাকা দিয়ে কিনবে পালদেম। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা শুধু টাকা নিয়ে এখান থেকে ফেরত যাবে, জিনিসগুলো নিয়ে নয়।'

জয়িতা বোঝবার চেষ্টা করল, ‘কিন্তু তা থেকে দুটো সমস্যা তৈরি হবে। প্রথমত, ব্যবসায়ীরা খুব অবাক হবে। ওরা দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসায় আছে। কখনও গ্রামের লোক টাকা দিয়ে জিনিসপত্র কেনে না। ওরা যা এনেছে তার দাম কয়েক হাজার তো হবেই। এত টাকা এই গ্রামের মানুষ কোথায় পেল নিশ্চয়ই জানতে চাইবে ওরা। তাই না?’

আনন্দ বলল, ‘জানতে নিশ্চয়ই চাইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়াটা তো এদের ইচ্ছেয়।’

জয়িতা হাসল, ‘দ্বিতীয় সমস্যা হবে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে। আমাদের টাকায় ওগুলো কিনে নেওয়ার পর মুরগীর ছাগল এলাচের মালিক কে হবে? ব্যবসায়ীরা যা বিক্রি করতে পারেনি সেই মালপত্র কে ব্যবহার করবে?’

আনন্দ সরল গলায় বলল, ‘গ্রামবাসীরা। মুরগী ছাগল কেউ ফেরত পাবে না। ওগুলো এই গ্রামের পশু হিসেবে থাকবে কোন ব্যক্তিগত মালিকানা নয়। আর যারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সঙ্গতির অভাবে কিনতে পারেনি তাদের মধ্যে জিনিসগুলো বিলি করে দেওয়া হবে।’

জয়িতা চমকে তাকাল, ‘তোর কথায় অন্য রকম গল্প পাচ্ছি আনন্দ।’

আনন্দ এবার উত্তেজিত হল, ‘হ্যাঁ। আমি তোর, তোদের সাহায্য চাই। এই গ্রামটার সঙ্গে সভ্য জগতের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। লোকগুলোর ক্রয়ক্ষমতা কম। দারিদ্রসীমার অনেক নিচে বাস করে। ধর্ম আছে কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা নাগপাশের মত নয়। সবচেয়ে চমৎকার ব্যাপার এদের কেউ শোষণ করছে না, এরা শোষিত হচ্ছে নিজেদের অজ্ঞতার দ্বারাই। অর্থাৎ, কেউ হয়তো এদের শোষণ করে কিছু পাওয়া যাবে না জেনেই খাবা বাড়ায়নি। কাছন নিশ্চয়ই গ্রামের প্রধান তবে তাকে আমার জোতদার বলেও মনে হচ্ছে না। লোকগুলো প্রেফ অভোসে সংস্কার আঁকড়ে ধরে এই গ্রামে পড়ে আছে আধমরা হয়ে। সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ রাজনীতির নোংরা বাতাস পর্যন্ত এদের মানুষ বলে গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃত অর্থে এরাই মাটির ডেলার মত। আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করতে ভালবাসি এবং ভারতবর্ষের মাটিতে যা কোনদিনই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না সেই স্বপ্ন এদের নিয়ে দেখতে অসুবিধে নেই। আমার বিশ্বাস বছর দশেকের মধ্যে এই গ্রামের মানুষদের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পূর্ণ অধিকার দেওয়া সম্ভব। একটা কিছু কাজ করতে চেয়েছিলাম জয়িতা, আর না, এই কাজটাই করি।’

জয়িতা মুখ তুলে তাকাল, ‘আমি তৈরি। কিন্তু আমরা কিভাবে তা করব? আজ সমস্ত জিনিস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ওদের লোভ বাড়িয়ে দেওয়া হবে না? ওরা ভাববে আমরা ওদের চিকিৎসার টাকা দেব, জিনিসপত্রের দাম দিয়ে দেব, একটা মামার বাড়ি মার্কা ব্যাপার পেয়ে আরও অলস হয়ে যাবে না?’

আনন্দ বলল, ‘অলস হতে দেব না আমরা। কিন্তু এই বরফ পড়ার সময়টা

আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আমাদের নিজেদের বেঁচে থাকার রসদ যোগাড় করতে হবে। এই এক বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে দেবে সামনের বছর। এখনও ওরা আমাদের সন্দেহ করছে, বিশ্বাস উৎপাদন করতে সব সময়ই সময় লাগে।’

আস্তানায় এসে ওরা সুদীপকে পেল না। কিন্তু নাকে মদের গন্ধ এল। বোঝা গেল সুদীপ ওই ঘরে বসে মদ খেয়েছে। ব্যাপারটা আনন্দকে উম্ব করছিল কিন্তু জম্বিতা তাকে বলল, ‘এগুলো এড়িয়ে যা। সব সময় একটা ছেলে বিশেষ করে সুদীপের মত ছেলে একই নিয়মে চলবে তা আশা করা যায় না। তা ছাড়া তুই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিস এখানে আসার পর থেকেই ওর কথাবার্তা চলচলনের মধ্যে আগেকার ছটফটে বেপরোয়া ভাবটা ছিল না বললেই চলে। এখানে একদম চুপ চাপ বসে থাকাটাও ওর কাছে শাস্তির মত। একটু ব্যাঙি খেলে দোষ কি!’

আনন্দ বলল, ‘তুই ওর হয়ে এত কৈফিয়ৎ দিচ্ছিস কেন? আমি নিশ্চয়ই ওর সমস্যা বুঝতে পারছি না। তবু সব কিছু যদি একটা সীমার মধ্যে থাকে তাহলেই ভাল।’

অনেক খরচ হয়েছে কিন্তু এখনও যা সুদীপের কাছে রয়ে গেছে তা পর্যাপ্ত বলে মনে হল ওদের। আজকের ঘটনার পর এই টাকা সাবধানে রাখতে হবে। সেদিন পালদেমের নজরে এটা পড়েনি কিংবা হয়তো পড়লেও নেয়নি। তাই যদি হয় লোকটাকে সং বলে মনে করতেই হবে। আনন্দরা সুদীপের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। সুদীপের পাতা নেই। শেষ পর্যন্ত জম্বিতা গুণে গুণে হাজার পাঁচেক টাকা বের করল।

কিছুক্ষণ বাদেই পালদেম হাজির হল। প্রস্তাব শুনে সে প্রথমে হতভম্ব। এত টাকা যে এদের কাছে আছে এবং সেটা এইভাবে খরচ হবে তা বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। অবাক গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, ‘এতে তোমাদের কি লাভ?’

জম্বিতা উত্তর দিল, ‘তোমার ছেলেকে সারিয়ে আনন্দের কি লাভ হয়েছে?’

প্রথমটা শোনামাত্র পালদেম কেঁদে ফেলল। ওকে বোঝাতে কিছুটা সময় লাগল। ওকে এও বলে দেওয়া হল আগে বিক্রিত মুরগী ছাগল কিনে নেবে দর করে। তারপর অবিক্রিত জিনিসগুলো। যদি ওই লোকগুলো আরও জিনিস বরফ পড়ার আগে এই গ্রামে নিয়ে আসতে চায় তো আনতে বলবে। কোথেকে টাকা পেয়েছে তা জানাবে না পালদেম। আর কিনে নেওয়া মুরগী ছাগল আপাতত তার বাড়িতেই রেখে দেবে।

ব্যবসায়ীরা এমন অবাক বোধ হয় কখনও হয়নি। ওরা ইচ্ছে করেই মুরগী ছাগলের দাম কমিয়ে বলেছিল কেনার সময়। সেই টাকায় এখন বিক্রি করতে বাধ্য হল। ওরা বারংবার জিজ্ঞাসা করছিল কোথায় পালদেম টাকা পেল। প্রশ্নটা গ্রামবাসীদেরও। কিন্তু পালদেম সুন্দর অভিনয় করল।

ব্যবসায়ীরা টাকা নিয়ে যত শীগগীর সম্ভব আবার জিনিস নিয়ে আসবে বলে গ্রাম ছাড়ল।

আনন্দরা আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপার দেখছিল। হঠাৎ ওরা লক্ষ্য করল সেই বাচ্চাটা যেন ওদের কিছু বলতে চেষ্টা করছে। ওরা তাকাতেই বাচ্চাটা বিপরীত দিকে দৌড়াতে লাগল ইশারা করে। কিছু একটা ঘটেছে এই অনুমানে ওরা ক্রমশ চালু পথ দিয়ে বাচ্চাটার পেছনে পেছনে চলে এল ঝরনার কাছে। সেখানে আরও কয়েকটা বাচ্চা হি হি করে হাসছে। সুদীপ চিৎপার হয়ে পড়ে আছে জ্ঞান হারিয়ে। আর তার পায়ের ওপর মাথা রেখে বেহুঁশ একটি যুবতী। ওদের পাশেই বোতলটা যাতে এক ফোঁটা মদ নেই। আনন্দ যুবতীটিকে চিনতে পারল। যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এ তার স্ত্রী। বাচ্চাগুলো এদের দুজনকে ঘিরে হাততালি দিয়ে নাচছে তখন।

॥ ৩৭ ॥

সুদীপের মাথায় ব্যাপারটা কিছুতেই ঢুকছিল না। সে মদ খেয়েছিল ঠিক মদ খেয়ে আস্তানা ছেড়ে বেরিয়েও ছিল কিন্তু ওই মেয়েটা কি করে তার পায়ের ওপর এসে পড়েছিল? কখন ঘটেছিল ব্যাপারটা? মদের বোতলটা মেয়েটা পেল কি করে?

সেই সঙ্গে তার খুব আফসোসও হচ্ছিল। সে নিশ্চয়ই পুরো বোতল খেতে পারে নি। ওটায় যা ছিল তা মেয়েটা যদি শেষ করে না দিত তাহলে আর এক দিন— এই পর্যন্ত ভাবার পর সুদীপের মনে হয়েছিল মদ ততক্ষণই খাওয়া উচিত যতক্ষণ জ্ঞান ঠিক থাকে। তাহলে শীতবোধ থাকে না, বরং এক ধরনের মজা পাওয়া যায়।

বারান্দার দেয়ালে চেঁস দিয়ে বসেছিল সে। এখনও মাথার ভেতরটা দপদপ করছে। এটাকেই বোধ হয় হ্যাঙওভার বলে। সে দেখল জয়িতা আর একটা বাচ্চা—মুরগীগুলোকে খাওয়াচ্ছে। শুধু মুরগী নয়, ছাগল আছে। এদের চেহারা সমতলের মত নয়। স্বাস্থ্য বেশ ভাল। সে জয়িতার দিকে তাকাল। আজ সকালে ঝর বইয়ে দিয়েছে জয়িতা। অবনী তালুকদার তাকে ওইভাবে শাসন করার সাহস পায়নি কখনও। মেয়েরা গালাগালি ব্যবহার না করেও কি করে কলজেচেরা শব্দ ছুঁড়তে পারে কে জানে? গতকাল যদি এই গ্রামের মানুষ তাকে পুঁতে ফেলত তাহলে কিছু বলার ছিল না। সে নাকি এই মানুষগুলোর কাছে তাদের ভাবমূর্তি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। যারা দেশের বস্তাপচা সিস্টেমের প্রতিবাদ করতে ঝর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল তাদের একজন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে একটা মেয়েকে নিয়ে, ভাবা যায়? যেহেতু তাদের পোশাক ঠিক ছিল এবং মদ খাওয়া নিয়ে এদের কোন নাক কোঁচকানো ব্যাপার নেই তাই এ যাত্রায় রক্ষে পেয়েছে সুদীপ। কিন্তু মেয়েটা যদি কল্যাণ ফেরার আগেই মারা যায় তা এ সবই ওরা ব্যবহার করবে।

জন্মিতা সমানে বকে গিয়েছিল। মানুষের রুচি এত নিচে নেমে যায় কি করে। যেখানে ওরা চেষ্টা করছে একটা কিছু করার দেখানে সে মদ খাওয়া পছন্দ করল? ওই মেয়েটাকে জুটিয়ে। এই সুদীপকে তো সে কখনো জানত না। মেয়েদের সম্পর্কে এই দুর্বলতা তার মনে লুকিয়ে ছিল? এই শব্দবর্ষণ চুপচাপ শুনে গিয়েছিল সুদীপ। সে লক্ষ্য করেছিল আনন্দ তাকে কোন কথা বলেনি। একটু আগে পালদেমের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অল্প কথায় জানিয়ে দিয়েছিল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিভাবে সমস্ত জিনিসপত্র ওরা কিনে নিয়েছে। এই ছাগল মুরগী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তখন তাদের সম্পত্তি যা এই গ্রামের মানুষদের কাজে লাগবে।

এখন সকাল। কিন্তু রোদ ওঠেনি। তবে শীত বাড়ছে। পা ছড়িয়ে বসেছিল সুদীপ। সকালে ওর ভাগ্যে চা জুটেছে। এক নাগাড়ে কথা শুনিয়েও জন্মিতা তাকে চা খাইয়েছে। সে দেখল জন্মিতা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে। অথচ দুজন দুজনের ভাষা স্পষ্ট বুঝছে না কিন্তু বলার চেষ্টায় খামতি নেই। জন্মিতাকে মেয়ে বলে কোনদিনই মনে হয়নি তার। এখানে আসার পর কারোর তো গান করা হয়নি। ফলে জন্মিতার চেহারায় মেয়েদের বাকি কোমলতাটুকুও উধাও। ও শালা তো উঠেটা পাল্টা বলবেই। যেন বিবেকের কাজ করে মাঝে মাঝে। পৃথিবীতে যারা বিপ্লবের জন্যে জীবন দিয়েছে তারা কি কখনও মদ খায়নি? হ্যাঁ, মদ খেয়ে হুশ হারানোটা অবশ্য অন্যান্য হয়ে গিয়েছে কিন্তু মদ খাওয়াটা যে অন্যান্য এটা সে মানতে পারে না। এবং তখনই তার মেয়েটার কথা মনে পড়ল। সে মেয়েটাকে দ্যাখেনি। তাকে যখন ওরা এখানে তুলে এনেছিল তখন তার জ্ঞান ছিল না। সে নিশ্চিত যে জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটা তার কাছে আসেনি। তাজ্জব ব্যাপার! জন্মিতাকে বোঝানো যাবে না যে মেয়েটা নিশ্চয়ই তাকে তাকে ছিল। সে বেহুশ হয়ে পড়েছে দেখে বোতলটা হারিয়েছিল। কিন্তু একেবারে তার গায়ের ওপরে পড়বে কে ভেবেছে? আচ্ছা মেয়েটাকে দেখতে কেমন? খুব হিন্দমতওয়ালী বলে মনে হচ্ছে। সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল মেয়েটাকে দেখতে। গ্রামের লোকেরা নিশ্চয়ই মেয়েটাকে শাস্তি দেয়নি। দিগে জন্মিতা বলত। সে ইচ্ছেটা চেপে রাখতে পারল না। বসে বসেই ডাকল, 'এই জন্মিতা, শোন!'

জন্মিতা একটু থমকে গেল। তারপর আবার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে লগল।

সুদীপ বিরক্ত হল, 'কি রে শুনতে পাচ্ছিস না?'

জন্মিতা আবার কথা থামল, 'আগে তোর খোঁয়াড়ি ভাঙুক তারপর কথা বলিস।'

'আমি এখন ঠিক হয়ে গিয়েছি। ব্যাপারটা তুলে যেতে পারছিস না?'

'কি বলতে চাইছিস?'

'মেয়েটা কেমন দেখতে রে?'

‘মানে?’ জমিতার গলার স্বর চড়ায় উঠল। ওর চোখ ছোট হয়ে এল।
‘বাঃ, একটা মেয়ে আমার পায়ের ওপর উপড় হয়ে রইল আর আমি তাকে
দেখব না?’

‘পালদেমকে জিজ্ঞাসা কর, ও তোকে চিনিয়ে দেবে। সুদীপ, তুই কি চাস?’
‘কি চাস মানে?’

‘তুই এখানে প্যারাডাইসের বিকল্প জীবন খুঁজছিস?’

সুদীপ কোন উত্তর দিল না। সে উঠে নিচে নেমে এল। মাথার ভেতরটা এখনও
দপদপ করছে। আর এক কাপ চা পেল হতো। কিন্তু নিজে বানিয়ে খেতে
ইচ্ছে করছে না। সে কোমরে হাত রেখে জন্তগুলোকে দেখল। মালিকানা
বদল হয়েছে কিন্তু ওদের কোন ড্রুফ্রপ নেই? যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক
আমরা আমাদের মত আছি এমন ভাব। গতকালই খুঁটি পুঁতে কিছুটা জায়গা
ঘিরে ওদের আটকে রেখেছে আনন্দ। মাথার উপরে খুবই পলকা ছাউনি।
মুরগীগুলোর জন্যে একটু আলাদা ব্যবস্থা। সারারাত এই ঠাণ্ডায় কাটিয়েও
ওরা মরে যায়নি। আজ একটাকে কাটলে কিরকম হয়! এই সময় বুক
চিড়িয়ে বসা একটা মুরগী কোঁক কোঁক করে ডেকে উঠতেই বাচ্চা মেয়েটা
চঞ্চল হল। তারপর চটপট ঘোরার মধ্যে ঢুকে যেতেই মুরগীটা অত্যন্ত আপত্তি
জানিয়ে সরে দাঁড়াল। খপ করে মাটি থেকে একটা ডিম তুলে ছুটে ফিরে এল
মেয়েটা। এনে হাত খুলে জমিতাকে দেখাল। জমিতা হাতে তুলে ডিমটাকে
দেখল। সুদীপ এই প্রথম চোখের সামনে মুরগী ডিমপাড়া দেখল। সে খুব
সিরিয়াস গলায় বলল, ‘ডিমটা মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বল।
তাহলে আমরা আর একটা মুরগী পাব।’

কথাটা শুনে জমিতা বাচ্চাটার কাঁধে হাত বুলিয়ে ডিমটা ফিরিয়ে দিয়ে ইশারায়
জানাল সে ওটা নিয়ে যেতে পারে।

সুদীপ হাঁটছিল। ওই মুহূর্তেই সে জমিতার সামনে থেকে সরে এসেছে। এখন
যা বলবে জমিতা ঠিক তার উল্টোটা করবে। একা একা হাঁটতে তার রোক
চেপে যাচ্ছিল। সে কোন অন্যায় করেনি। খামোখা এরা তার সঙ্গে খারাপ
ব্যবহার করছে। হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ ঢালু পথ বেয়ে সেই ঝরনার কাছে
পৌঁছে গেল। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাতে
তার আবছা আবছা মনে পড়তে লাগল। সে এই ঝরনা দেখেছিল। মেয়েটা
তাহলে এখানে কোথাও লুকিয়েছিল। সে ভাব করে তাকাল। একটা মেয়ে
কোন খামোখা এখানে লুকিয়ে থাকতে যাবে। হয়তো কোন কাজে সে এখানে
এসেছিল। আজও যদি কোন কাজ, সেই কাজটাই পড়ে যায়! কোন ভিত্তি
নেই কিন্তু সুদীপের মনে হল অপেক্ষা করলে মেয়েটার দেখা পাওয়া যাবে।
সে পাথরটার আড়ালে চুপচাপ বসে পড়ল। ঠিক পায়ের সামনে দিয়ে স্রোত
নামছে নিচে। পাথরের ধাক্কা খেয়ে জল ছিটকে উঠছে ওপরে। সুদীপ হাত
বাড়িয়ে জল স্পর্শ করল। যতটা ঠান্ঠা বলে ভেবেছিল ততটা নয়। সে মুখে

চোখে ঘাড়ে জল বোলাতে বেশ আরাম লাগল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল একইভাবে। শুধু জলের শব্দ, কোন পাখির গলাও নেই। ঠাণ্ডা বোধ হয় পাখিরাও ডাকে না। আর এই নিস্তব্ধতায় সুদীপের চোখ বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু সেই সময় যেন পাতা মারানোর অথবা মানুষের কথা বলার আওয়াজ তার কানে প্রবেশ করল। খুব চাপা গলায় কেউ কথা বলছে। যেন সতর্ক করে দিচ্ছে একে অন্যকে। সুদীপ চোখ খুলে চারপাশে তাকাল। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কাছাকাছি মানুষ আছে। সুদীপ আরও কিছুক্ষণ স্থির বসে রইল। যারা কথা বলছে তারা নিশ্চয়ই সামনে আসবে।

কিন্তু তারপরেই সব চূপচাপ। একমাত্র জলের শব্দ কানে এল। সুদীপ উঠল। পাথরের আড়ালে আড়ালে কিছুটা এগোতেই সে থমকে দাঁড়াল। একটা লোক ঝরনার ওপাশে নিজেই যতটা সম্ভব লুকিয়ে রেখে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ দেখার পর মুখ ফিরিয়ে নিচে কাউকে কিছু বলল। তারপর আবার মুখ তুলতেই সুদীপের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

একটু হতভম্ব ভাব, তারপরেই বাট করে আড়ালে চলে গেল মূর্তিটা। এবং সেইসঙ্গে দ্রুত পায়ের আওয়াজ ওপাশের পাহাড়ে মিলিয়ে গেল। লোকটার ভাবভঙ্গী খুবই সন্দেহজনক। চেহারাতেও বিশেষত্ব আছে। সরল দুটো গোর্ফ মুখের দুপাশে অনেকটা ঝুলে আছে। সুদীপের ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে অনুসরণ করে। কিন্তু ঝরনাটা পার হবার কথা চিন্তা করে সে থমকে গেল। তাছাড়া ওই লোকটা একা ছিল না। একা একা পাগল কিংবা প্রেমে পড়া মহিলা ছাড়া কেউ কথা বলে না। এই অবস্থায় ঝরনা পার হতে পারলেও অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কিন্তু ওরা কারা? এই গ্রামের কেউ লুকিয়ে দেখবে কেন? তাকে দেখামাত্র পালাবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া এই কদিনে গ্রামের যত মানুষ দেখেছে তাদের কারো অমন ছুঁচলো বোলা গোর্ফ চোখে পড়েনি। ব্যাপারটা অবশ্যই সন্দেহজনক।

সুদীপ ধীরে ধীরে গ্রামে উঠে এল। এখন হেঁটে গেলে গ্রামের মানুষ আগের মত অবাধ হয়ে তাকায় না। কিন্তু তাদের দেখার মধ্যে যে কৌতূহল নেই তাও বলা যায় না। সুদীপকে দেখে বাচ্চা ছেলে আঙুল তুলে দূরের একটা বাড়ি দেখাল। খানিকটা যেতেই সে আনন্দ আর পালদেমকে দেখতে পেল। আনন্দের মুখ গজ্জীর। পালদেমও অন্যদিকে তাকিয়ে। এই সময় কাহন ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পালদেমকে কিছু বলতেই সে মাথা নাড়ল নিঃশব্দে। সুদীপ সামনে দাঁড়াতেই আনন্দ মুখ তুলে ওকে দেখল, 'মেয়েটাকে আর বাঁচানো গেল না। মনে হচ্ছে লাস্ট স্টেজ। আমি খুব ভুল করেছি।' 'কি ভুল?' সুদীপ নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'ওকে প্রথম দিনেই এদের দিয়ে দাঁজলিং-এ পাঠানো উচিত ছিল। এই কদিনে তো পৌঁছে যেত। হসপিটাল ট্রিটমেন্ট পেলে হয়তো বেঁচে যেত।'

‘ওরা দাজিলিঙে যেত না। এই গ্রামে মৃত্যু নিশ্চয়ই নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু যারা কখনই গ্রামের বাইরে যায়নি তাদের দাজিলিঙে অসুস্থকে নিয়ে যাওয়া সংস্কারে আটকাবে।’ কথাটা বলে সুদীপ দরজার দিকে তাকাল। সেখানে মোটামুটি ছোট ভীড়। সেই ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল মেয়েটির মা। এবার তার চোখ পড়ল সুদীপের ওপর। পড়ামাত্র তার চোখ জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের পাশে রাখা একটা মোটা ডাল তুলে তীব্র চিৎকার করে সে ছুটে এল সামনে। কিছু বোঝার আগে সে আঘাত করল সুদীপকে। একটা হাত তুলে কোন রকমে ডালটা ধরলে সুদীপের মনে হল তার আঙুলগুলো বোধহয় ভেঙে গেল। পাগলের মত মহিলা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল খালি হাতে সুদীপের ওপর। সেই সঙ্গে চিৎকার আর কান্না চলছিল। পালদেমরা ওকে জোর করে সরিয়ে না নিলে কি হত বলা যায় না। কারণ সুদীপ এতটা হকচকিয়ে গিয়েছিল যে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শোক থেকে জন্ম নেওয়া ক্রোধ মহিলার শরীরে হাতির শক্তি এনে দিয়েছিল! সে এটুকু বুঝতে পেরেছিল আশেপাশের বেশীর ভাগ মানুষের সহানুভূতি রমণীটি পাচ্ছে। অতএব পাল্টা আঘাত করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হবে। রমণীটিকে ওরা যখন খানিকটা দূরে নিয়ে গেল তখন তার বিলাপ শুরু হল। ভাষা বুঝতে না পারলেও মেয়েটির চলে যাওয়ার সম্ভাবনার জন্যে তাকে দায়ী করা হচ্ছে অনুমান করল সে। এখন রাগ করে কোন লাভ নেই। সুদীপ নিজের মুখে হাত দিল। প্রচণ্ড জ্বলছে। এবং সেই সঙ্গে সে কয়েক ফোঁটা রক্ত আঙুলে উঠে আসতে দেখল। এবার পালদেম এগিয়ে এল, ‘মেয়েটা হয়তো এমনিতেই মরত কিন্তু গ্রামের সবাই মনে করবে তোমরা যদি না খোঁচাতে তাহলে ও আর কিছুদিন বেঁচে থাকত। তবে যতক্ষণ না ওর প্রাণ বের হচ্ছে ততক্ষণ কিছু করার নেই। কাছন এখন প্রার্থনা করবেন ওর জন্যে।’

কিন্তু সুদীপের মনে হল পালদেম বলছে এখন নিজেদের প্রার্থনা কর। মেয়েটি মরে গেলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না বলে যে হুমকি দেওয়া হয়েছে তা এখনও প্রত্যাহার করেনি ওরা। সে আনন্দের দিকে তাকাল। আনন্দ কোন কথা বলছে না। তাকে যে আক্রমণ করল রমণীটি তা দেখেও আনন্দ এক চুলও নড়েনি।

এই সময় কাছনের দুই শিষ্য ঘন্টা বাজাতে বাজাতে যাত্রা শুরু করল। কাছনের পিছু কিছু সমবেত জনতা উঠে যাচ্ছিল মন্দিরের দিকে। সুদীপ অবাক হয়ে দেখল আনন্দ ওদের সঙ্গ নিয়েছে। গভীর মুখে পালদেমের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। ক্রমশ ভিড় সরে গেল। সুদীপ দেখল রমণীটি তখন ঘরের সামনে উঁবু হয়ে বসে আছে। সে কিছু না ভেবে এগিয়ে হিন্দীতে বলার চেষ্টা করল, ‘আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, আমি আপনার মেয়ের উপকার করতে চেয়েছিলাম।’

রমণীটি চোখ তুলল। যেন সে সুদীপকে দেখল না, দেখতে পেল না। তারপর আবার মুখ নামিয়ে নিল। সুদীপ আর দাঁড়াল না। নিজেকে হঠাৎ খুব ফালতু বলে মনে হচ্ছিল তার।

দার্জিলিং শহরের বাসস্ট্যাণ্ডে যখন কল্যাণ নামল তখন তাকে দেখে যে কেউ বলে দিতে পারত পুরো হিমালয়টা হেঁটে এসেছে। রিম্বিকের নিচে বাসে ওঠার পর থেকে সে ঘুমিয়েছে আর এই ঘুম তার ঘোর আরও বাড়িয়েছে। তাপল্যাং থেকে ফালুট, ফালুট থেকে সান্দাকফু হয়ে বিকেভঞ্জন পর্যন্ত হেঁটে আসার সময় অনেকবার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করেছিল ওর। কুঁচকি পর্যন্ত পা ফুলে ঢোল, শরীরে আর রক্ত নেই, দুটো রাত পাহাড়ের খাজে হিমে জমে থাকা। তারপর বিকেভঞ্জন থেকে ঢালু পাহাড়ী জঙ্গল দিয়ে একা একা প্রায় গড়িয়ে রিম্বিকে চলে আসা। যা হিসেব ছিল তার চেয়ে একটা দিন বেশী লাগল কিন্তু কল্যাণের মনে হল সে ছিবড়ে হয়ে গিয়েছে।

নিচুমানের একটা হোটেলে পেটভর্তি ভাত খেয়ে সে সারা দুপুর ঘুমল। বিকেলে যখন তার হুঁশ ফিরল তখন সমস্ত শরীরে বেদনা। বিছানা ছাড়ার বিন্দুমাত্র বাসনা হচ্ছিল না। কল্যাণের মনে হল এইভাবেই যদি সারাজীবন শুয়ে থাকা যেত। ছেলেটা যেমন বলা হয়েছিল, সান্দাকফুর কাছেই রয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। ওই রকম একটা জায়গায় কি করে একটা মানুষ কাটাতে পারে তা তখন খেয়াল হয়নি, এখন মনে হল তাকে যদি কয়েক লক্ষ টাকাও দেওয়া হয় সে থাকত না। ওরকম বীভৎস ঠাণ্ডা সে কখনও কল্পনা করেনি। তাই ওকে ছেড়ে আসার সময় সে আনন্দের নির্দেশ অমান্য করেছে। টেন্ট এবং খাবারদাবারের সবটাই দিয়ে এসেছে ছেলেটাকে। ছেলেটা কৃতজ্ঞ হয়েছে কিন্তু সে নিজে বেঁচেছে। যেখানে নিজের শরীরের ওজনই শতুতা করছিল সেখানে ওই বোঝা বইবার কোন ক্ষমতা আর অবশিষ্ট ছিল না। অনেকগুলো আতঙ্ক ছিল অবশ্য কিন্তু তখন মনে হয়েছিল ছেলেটিকে না দিয়ে দিলে মাঝপথে তাকেই ওসব ফেলে যেতে হত। সান্দাকফু থেকে রিম্বিকে পৌঁছতে পুরো দিন লেগে গিয়েছিল। ওই সময় কিছুই খায়নি সে খাবার না থাকায়। যদি পথ ভুল হত, যদি রিম্বিকের ইয়ুথ হোস্টেলে জায়গা না পাওয়া যেত তাহলে আর দার্জিলিং-এ জীবনে পৌঁছানো যেত না। দু নম্বর বামেলা ছিল মানেভঞ্জনের সেই ব্যবসায়ীকে নিয়ে যে তাদের টেন্ট ভাড়া দিয়েছিল। ওয়াংদের কাছে খবর পেয়ে লোকটা মিশচয়ই ওৎ পেতে আছে। ফালুটের রাস্তায় ওঠার পর থেকেই সে অবশ্য আশংকা করেছিল যে কোন মুহূর্তে ভারতীয় পুলিশকে দেখতে পাবে। ওরকম নির্জন সরু পাহাড়ি পথে পুলিশের সামনে পড়লে দুটো হাত আকাশে তুলে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। অথচ কিছুই হল না। একটা লোকও তাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। রিম্বিকের ফরেস্ট অফিসার তাকে ট্রেকার বলেই ভেবেছেন এবং মিনিবাসটা যখন মানেভঞ্জে থামল তখন

পেছনের সিটে বসে কল্যাণ চোখ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে বসেছিল। অনেক লোক নামল উঠল, ব্যবসায়ী গাড়িতে তল্লাস করতে উঠেছিল কিনা জানা নেই কিন্তু কেউ তাকে টেনে নামায়নি।

আজ হোটেলের ঠাণ্ডা জলেই স্নান করেছে কল্যাণ। এবং তখন নিজেকে দেখে সে আঁতকে উঠেছে। সমস্ত শরীরে গুঁড়ি গুঁড়ি অ্যালার্জি, পায়ে ফোকা, চুলে এত আঁঠা যে আঙুল পর্যন্ত ভাল করে ঢুকছে না। কঙ্কলের তলায় শুয়ে কল্যাণের মনে হল এখন পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ আরাম করছে, প্রত্যেকে সামান্য সুখের জন্যে একটুও স্বার্থত্যাগ করতে রাজী নয় যেখানে সেখানে মুখের মত এইভাবে কষ্ট যন্ত্রণা সংগ্রহ করার কোন মানে হয় না। এবং তখনই তার মনে হল সে নিজে মুখদের সেরা। কি দরকার ছিল ডাঁট দেখিয়ে আগ বাড়িয়ে দার্জিলিং-এ আসার জেদ ধরার। আনন্দ আসছিল, আসতো। আর এসে হাড়ে হাড়ে বুঝত। নিজেকে হিরো প্রমাণ করতে গিয়ে এখন মাগুনল দিতে হচ্ছে। মাগুনলই, না হলে এখন বিছানা ছাড়তে এত কষ্ট হবে কেন? তাছাড়া শরীরের ব্যথার সঙ্গে মনে হচ্ছে জ্বর আসছে।

কল্যাণ চোখ বন্ধ করতেই সুদীপকে দেখতে পেল। ওখানে একটাই কষ্ট-খাবারের। কিন্তু ওছাড়া সুদীপ নিশ্চয়ই বেশ আরামে আছে। আচ্ছা, জন্মিতাটা শেষ মুহূর্তে অমন ছুটে এল কেন? জন্মিতার ভাব বেশী সুদীপের সঙ্গে। কিন্তু ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল তাকে যেন কিছু বলতে চেয়েছিল। সাত দিন। সাত দিনে ফিরতে বলা হয়েছে তাকে। অসম্ভব। এবং ফেরাব কথা মনে হতেই সে স্থির হয়ে গেল। ওই পথে অত ঠাণ্ডায় এবং সজ্যাতাবিজিত পর্বতে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে বিছানার এই আরাম ছেড়ে? কেন? কল্যাণের মনে তীব্র অনিচ্ছা জন্মাল। সাতদিনের চারটে দিন শেষ হয়ে গেছে। নিদিষ্ট সময়ে পৌঁছানো যাবে না। এমনও হতে পারে সেই মেয়েটি মারা গেছে, সাত দিনের মধ্যে সে ওষুধ নিয়ে না ফেরায়। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী ওদের মেরে ফেলেছে। আর এই অবস্থায় সে যদি ফিরে যায় তাহলে জ্বলন্ত কড়াই-এ পা বাড়ানো। জেনে শুনে কেউ ফাঁদে পড়ে!

আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে থাকার পরে কল্যাণ আবিষ্কার করল তার ঘুম আসছে না। অথচ ক্লান্তি চেপে বসেছে সমস্ত শরীরে। যতক্ষণ হেঁটেছে ততক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, এখন আরাম পাওয়া মাত্র সবকিছু ঝিকল হতে বসেছে। নিজের জন্যেই একটা কিছু ওষুধ দরকার। কোনমতে উঠে বসল সে।

বাস থেকে নেমে দালালের সঙ্গে এই হোটেলের আসার সময় খানার সামনে দিয়ে আসতে হয়েছিল। কয়েকটা অস্ত্রধারী দাঁড়িয়েও ছিল সেখানে। কিন্তু কেউ কিছু বলেনি তাকে। এখন কি দার্জিলিং শহরে তাদের খোঁজ চলছে না? একটা খবরের কাগজ পেলে হত। আসবার সময় পথে একটা ওষুধের দোকান চোখে পড়েছিল। কোনরকমে পোশাক পরে দরজায় তাল দিলে কাঁধে

ব্যাগটা নিয়ে বের হজ কল্যাণ। অনেকদিন বাদে চটি পরায় মনে হচ্ছে ফুলের
 ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পায়ের ফোকাগুলো অবশ্য জানান দিচ্ছে। সে
 বাইরের ঘরে আসতে একটা গলা শুনতে পেল, 'খুব ঘুম হজ ডাক্তারবাবু।'
 সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। এবার ডাকটা জোরে এল, 'ও ডাক্তারবাবু!'
 এবং তখনই কল্যাণের মনে পড়ল হোটেলের খাতায় সে ওই নামটা লিখিয়েছে।
 অতএব ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে হাসতে হল, 'ওহো বলুন।'
 'কি ভাবছিলেন মশাই!' ম্যানেজার চশমার ফাঁকে তাকালেন।
 'না শরীরটা খারাপ। একটা কিছু ওষুধ কিনব বনে বেরিয়েছি।'
 'দার্জিলিং-এ এসে শরীর খারাপ করে ফেললেন। খুব হেঁটেছেন?'
 'আঁ!' কল্যাণ চমকে উঠল।
 'আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি ট্রেক করে এলেন। কোনদিকে?
 সান্দ্রাকফু?'
 'হ্যাঁ।' কল্যাণ আর কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না।
 'ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন কেন? আমার এখানে চুরিচামারি হয় না মশাই।'
 'কাঁধে ব্যাগ বওয়া আমার অনেকদিনের অভ্যাস।'
 'অ। কিন্তু অমন আলপটকা ওষুধ খাচ্ছেন কেন? একজন ডাক্তার দেখিয়ে
 প্রেসক্রাইব করিয়ে নিন। আজকাল সবাই যেন ডাক্তার হয়ে গেছে। বিদেশ
 বিজু'ই-এ বড় অসুখ বাধানোর কোন মানে আছে? সোজা বেরিয়ে হলুদ
 একটা বাড়ি দেখতে পাবেন। সেটা ছাড়িয়ে ডান হাতে হরেশ্বরকৃষ্ণ ডাক্তারের
 চেম্বার। আমার কথা বলবেন, যত্ন করে দেখবে।'
 অতএব কল্যাণ বেরিয়ে এল, এখনও দার্জিলিং-এ সন্ধ্যা হয়নি। রাস্তায় কিছু
 পর্যটকের আনাগোনা। হাটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল কল্যাণের। কিন্তু পা
 বাড়িয়ে ক্রমশ ভাল লাগা শুরু হল। জিপের হেল্পার চিংকার করে আগামী
 কাল টাইগার হিলে যওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে। দার্জিলিং-এর ওপরে মেঘ নেই,
 ফলে পাখাগুলো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে এখন থেকে। শহরটাকে ছবির মত
 মনে হচ্ছে। সে এই প্রথম দার্জিলিং-এ এল। শহরটাকে ঘুরে দেখার
 লোভ হচ্ছিল তার। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছিল কেউ না কেউ তার দিকে
 তাকাচ্ছে। আর কিছু না হোক প্রচুর টাকা আছে তার কাছে। আচ্ছা, এখন
 যদি কোন বাস ধরে সোজা নিউ জলপাইগুড়িতে চলে যাওয়া যায়! তার পরে
 ট্রেন ধরে কলকাতা। যাওয়া মাত্র কি তাকে অ্যারেস্ট করবে? কলকাতার
 বদলে যদি কানপুরে যাওয়া যায়? সঙ্গে যা টাকা আছে তাতে বেশ কিছুদিন
 সময় পাওয়া যাবে একটা চাকরি খুঁজে পাওয়ার। কথাটা মাথায় আসামাত্র
 স্থির হয়ে দাঁড়াল সে। জীবন মানে যদি এই তাহলে তো সেটা কলকাতায়
 বসেই পাওয়া যেত। কোন প্রয়োজন ছিল না এত ব্যামেলা তৈরি করার।
 হাটতে হাটতে ক্রমশ কল্যাণের মনে একটা জেদ চেপে বসেছিল। কিছুই
 হবে না তার। কেউ তাকে ধরবে না। পুলিশ জানে তারা নেপালে আশ্রয়

নিয়েছে। এবং তখনই তার জন্মিতার মুখ মনে পড়ল। সে আনন্দকে খামিয়ে দায়িত্বটা নেবার পর জন্মিতার ঠোঁটে কি হাসি ফুটেছিল? সুদীপ নিশ্চয়ই ভাবছে এই সুযোগে কল্যাণ হাওয়া হয়ে যাবে। না। যাই হোক না কেন ওষুধগুলো নিয়ে তাপল্যাণ্ডে ফিরে যেতেই হবে। এবং এই যাওয়াটা তাকে চিরকাল বাকি তিন জনের থেকে আলাদা প্রতিপন্ন করবে। তবে যাওয়ার সময় আর হাঁটা নয়। সান্দ্রাকফু পর্যন্ত একটা জিপ ভাড়া করবে সে। জিপ ছাড়া-মালপত্র বইবার প্রস্তুত না।

হঠাৎ কল্যাণের খেয়াল হল ম্যানেজারের নির্দেশিত হলুদ বাড়িটা সে ছাড়িয়ে এসেছে। সে আর একটু এগোল। রাস্তাটা এখন থেকে খাড়াই উঠেছে। কিন্তু উঁচুতে উঠতে বিন্দু মাত্র ইচ্ছে করছিল না তার। সে আর একটু হাঁটা মাত্র নিরিবিলি জায়গায় চলে এল। ক্রমশ আলো নিবে আসছে। এখানকার শীতকে আর শীত বলে মনেই হচ্ছে না। এপাশে কোন দোকান-পাট নেই। দুধারে বাগানওলা বাড়ি। এবং একটি বাড়ির নেমপ্লেটে ডাক্তারের নাম দেখতে পেল। ডক্টর এস-কে দস্তিদার। এই লোকটা কিসের ডাক্তার? কল্যাণ থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত। তারপর গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। পর্দা ঢাকা দরজার ওপাশে আলো জ্বলছে। কল্যাণ ডাকল, 'ডাক্তারবাবু!' ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, 'কে? ভেতরে আসতে পারেন।'

পর্দা সরিয়ে কল্যাণ দেখল একজন রক্ত সাহেবী প্যাটার্নের মানুষ টেবিলে বসে সানডে পড়ছিলেন। চোখ তুলে ইঙ্গিত করলেন বসতে। চেয়ার টেনে কল্যাণ বসে বলল, 'আমি এই শহরে নতুন। অসুস্থবোধ করছি, নেমপ্লেটটা দেখে এলাম।'

'আ আমি তো রিটার্নার করেছি। আজকাল প্রাকটিস করি না। তবে নিজে থেকে কেউ এলে— বলুন কি প্রব্লম? আমার ফি কিন্তু বত্রিশ টাকা।' কল্যাণ তার অসুস্থির কথা জানাল। ডাক্তার নাড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, 'অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে এমনটা হয়েছে। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি। তবে আপনাকে সার্জেন্ট করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে নেমে যেতে।' রক্ত ডাক্তার প্যাড টেনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম?'

'ভাস্কর দস্তিদার!'

'অ্যা? বাঃ, আপনিও দস্তিদার।' ওষুধের নাম লিখে ডাক্তার বললেন, 'আপনি আমাকে বরং পঁচিশ দিন। সেম টাইটেল।'

কল্যাণ প্রেসক্রিপশনটা দেখল। তারপরে সেটাকে ভক্তি করে পকেটে পুরে ব্যাগ খুলল, 'আপনাকে আমি আর একটু বিরক্ত করব।'

'কি ব্যাপার?'

'আমি একটা গ্রাম থেকে আসছি। সেখানকার মানুষ খুব অসুস্থ। আমি তাদের অসুস্থতার বিবরণ লিখে এনেছি। এক এক জন সম্পর্কে শুনে আপনি নাশ্বার দিয়ে প্রেসক্রাইব করে যান। সেইমত ওষুধ কিনে আমি

পৌছে দিয়ে আসব।’

‘হোয়মাট ডু য় মিন? আমি রোগী দেখলাম না আর প্রেসক্রাইব করব?’

‘হ্যাঁ। কারণ ওদের ওষুধ দরকার।’

‘ক’জন রোগী?’

‘অনেক। নিন, শুরু করছি।’

‘পার পেশেষ্ট বত্রিশ করে লাগবে।’

‘এই যে পঁচিশে স্তিক হল।’

‘সেটা আপনার জন্যে! তাছাড়া আমি সব ডিটেলস না জেনে—’

‘যেটুকু জানছেন তাতেই লিখতে হবে।’ কল্যাণের চোয়াল শক্ত হল, ‘কেউ কথা না শুনলে আমার মাথা খুন চেপে যায়।’

ডাক্তার বিড়বিড় করলেন, ‘এ কি অন্যান্য জুলুম। কলকাতার সেই চারটে ছেলে মেয়ে কি আপনাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?’

এবার হেসে ফেলল কল্যাণ, ‘না। কাদের কথা বলছেন আমি জানি না কিন্তু আপনার প্রেসক্রিপশন আমার দরকার।’ সে রোগ বৃত্তান্ত পড়া শুরু করল।

॥ ৩৮ ॥

কল্যাণ যখন ডাক্তারের গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামল তখন দার্জিলিং-এ চমৎকার সন্ধ্যা নেমে গেছে। দরজা পার হওয়ামাত্র ঝুপ করে আলো নিবে গেল গোটা শহরের আর হিম বাতাসের সঙ্গে একটা কালো আলখাল্লা নেমে এল শহরটার শরীরে। এবং এই অন্ধকারটা তাকে স্বস্তি দিল। জীবনে সম্ভবত এই প্রথমবার অন্ধকারকে স্বাগত জানাল।

অনেকটা সময় কেটেছে বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে। একটার পর একটা অসুখের বর্ণনা, যার মধ্যে অবশ্য অনেকগুলো একরকম, পড়তে পড়তে কাহিল হয়ে পড়েছিল সে নিজেই, অতএব ডাক্তারের তো কথাই নেই। ভদ্রলোক বারংবার জিজ্ঞাসা করছিলেন এই অসুখগুলো যাদের তাদের সে কোথায় পেল? এগুলো তো মূলত পাহাড়ি মানুষের অসুখ। তিনি নিজে কখনও চিকিৎসা করেননি কিন্তু জানেন যে খুব উঁচুতে যেসব পাহাড়ি গ্রাম আছে সেখানে এই ধরনের রোগ হয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে কল্যাণের যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা কম। ঔষুধের নামগুলো লেখার সময় তিনি মাঝে মাঝে নেপালি শব্দ উচ্চারণ করেছেন ইচ্ছে করেই। ভদ্রলোক স্পষ্ট বুঝে গেছেন যে কল্যাণ নেপালি জানে না। এটা জানার পর থেকেই ভদ্রলোক মাঝে মাঝেই থমকে গেছেন, প্রশ্নও করেছেন। কিন্তু কল্যাণের উত্তরের মধ্যে এমন একটা জেদ ছিল যে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে শেষ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। পকেট থেকে টাকা বের করে ওঁর দাবী মতন দক্ষিণা মিটিয়ে দিয়েছিল কল্যাণ। ভদ্রলোক বোধহয় এটাও আশা করেননি। কিন্তু কৌতূহলী মানুষমানুষই বিপজ্জনক। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কল্যাণের মনে হল আনন্দর সমস্ত পরিকল্পনায় একটা ফাঁক

থেকে যাচ্ছে। একজন ডাক্তারের কাছে এতগুলো অসুখের ওষুধ চাওয়ার কথা ওর মাথায় না আসলে সন্দেহ জন্মাতো না। ও যেমন বলেছে সে তেমনই করেছে। দার্জিলিং শহরে ঘুরে ঘুরে ডাক্তার খুঁজে বের করে সাত-আটটা করে অসুখের প্রেসক্রিপশন নেওয়ার কথা অবশ্য আর নিজের মাথাতেও আসেনি আর এনে সেটা কতটা সম্ভব হত, তাতেও সন্দেহ আছে। অতএব এই পরিকল্পনাটা নিয়ে আনন্দ ভুল করেছে। তাছাড়া এই ডাক্তারও একটা ভুল ধরিয়ে দিল। ওষুধগুলো পেটে পড়ামাত্র রোগীরা সেরে যাবে, এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কোন কোন রোগীর অন্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেই সময় হাতের কাছে ডাক্তার না থাকলে নতুন ওষুধ দেওয়া সম্ভব হবে না। এতে রোগীর অন্য বিপত্তি ঘটতে পারে। কোন কোন অসুখ দীর্ঘদিনের এবং তার চিকিৎসাও সময়সাপেক্ষ। ডাক্তার নিয়মিত তাকে না দেখলে প্রথম ওষুধে তেমন কাজ হবে বলে মনে হয় না। অতএব আনন্দের এই পরিকল্পনাতেও ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কল্যাণের মনে হল অনেক কিছু তারা বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে। স্পষ্ট প্রতিবাদ করে ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সমস্যা এড়ানো সম্ভব হত। কিন্তু তাহলে অন্য দুজন তাকে পাতি মধ্যবিত্ত বনত। পাতি মধ্যবিত্তরাই নাকি প্রতি পদে পদে বাগড়া দিয়ে থাকে। এখন অবশ্য এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। ওকে যেমন করেই হোক ওষুধ নিয়ে ফিরতে হবে। কিন্তু যে ব্যাপারটা তাকে চিন্তিত করছে সেটা হল ডাক্তার সম্ভবত এতক্ষণে তার সম্পর্কে একটা তথ্য জেনে গিয়েছেন। একেবারে শেষ দিকে ডাক্তারের যে দুজন আত্মীয় আত্মীয়া ভেতরে ঢুকেছিল তাদের একজন তার দিকে তাকিয়ে যেন চমকে উঠছিল। ব্যাপারটা যদি ঠিক হয় তাহলে কথাই নেই। ডাক্তার এতক্ষণে পুলিশকে জানাবে তার হদিশ। মেয়েটি কি প্রেসিডেন্সিতে পড়ে? নিশ্চয়ই কলেজের সমস্ত মেয়ে এবং ছেলে তাদের ঘটনা জেনে গিয়েছে! এই মেয়েটি যদি ওখানকার ছাত্রী হয় তাহলে ওরও না জানার কথা নয়। অতএব তাকে সতর্ক হতে হবে। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা মোরের কাছে চলে এল। এখন সামনে অস্ত্রুত দৃশ্য। সমস্ত পাহাড় জুড়ে জমাট অন্ধকারে টিমটিমে হ্যারিকেনের প্রায় অদৃশ্য আলো ভৌতিক মেজাজ এনেছিল। আচমকা আবার আলো জ্বলে উঠতেই মনে হল ধাপে ধাপে ঝকঝকিয়ে চুমকি বসানো শাড়ি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কল্যাণ চারপাশে তাকাল। রাস্তায় লোকজন কম। দোকানপাট এখনও অবশ্য খোলা। চটপট কোন দোকান থেকে ওষুধ নিতে হবে। তারপরই মত পাল্টে সে স্থির করল একটা নয় একাধিক দোকান থেকে ওষুধ নেবে যাতে দোকানদারের সন্দেহ না হয়। ওষুধ ছাড়া বন্ধুদের ফরমায়েশও আছে। সেগুলোও নেওয়া দরকার। দার্জিলিং-এ পৌঁছানোর পর যে ভয়টা সঙ্গে ছিল সেটা এখন আরও জোরদার। ম্যালের রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে সে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে জনা দশেক

রোগীর জন্যে ওষুধের অর্ডার দিতেই কাউন্টারে বসা লোকটি হাঁ করে তাকে দেখল। লোকটি নেপালি। জিজ্ঞাসা করল, 'এত ওষুধ আপনি একসঙ্গে নেবেন?' প্রশ্নটা হিন্দীতে। উত্তরটা ঘাড় নেড়ে জানাল কল্যাণ। দাম মেটানোর পর সে বুঝতে পারল হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া আপাতত সম্ভব কিন্তু সত্তরজনের হলে নয়। সে একটা বড় চটের খলে কিনে ওষুধগুলো সেটায় ফেলে সুদীপের সিগারেট কিনল। তিনটে দোকান থেকে ওষুধ নেওয়ার পর দেখা গেল আরও সমান ওষুধ তাকে কিনতে হবে। এতক্ষণে বাঁপ বন্ধ হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এইভাবে ঘুরে কিনতে গেলে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া দার্জিলিং-এর আর কোথায় ওষুধের দোকান আছে তা কে জানে। আগামীকাল দিনের বেলায় এই শহরে থাকার ঝুঁকি নিতে চায় না সে। ক্রমশ ভয়টা আতঙ্কের চেহারা নিয়ে যেন তাকে তাড়া করছিল। লাডেন লা রোডের বাঁকে সে একটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়াল। এখন দোকানে ভিড় নেই। কাউন্টারে একজন প্রৌঢ়া মহিলা। তিনি কিছু লিখছেন। সাইনবোর্ড এবং মহিলাকে দেখে সে নিঃসন্দেহ হল ইনি বাঙালী। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে কল্যাণ ভেতরে ঢুকতেই মহিলা চোখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন!'

কল্যাণ ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে কাউন্টারে হাত রাখল, 'আমার অনেক ওষুধ চাই এবং এখনই!'

ভদ্রমহিলার চোখে বিস্ময় ফুটল। কিন্তু—সেই অবস্থায় হাত বাড়ালেন, 'প্রসক্রিপশন!' ডাক্তারের লেখা কাগজটা এর মধ্যে কয়েক টুকরো হয়েছে। বাকিটা কল্যাণ এগিয়ে দিতে মহিলা কল্যাণের মুখের দিকে একবার তাকালো তারপর সেটা নিয়ে র্যাক থেকে ওষুধ নামাতে লাগলেন। কল্যাণ চুপচাপ দেখছিল। ভদ্রমহিলার মুখ দেখে এখন বোঝা যাচ্ছে না ওঁর মতলবটা কি! দোকানটা ফাঁকা কিন্তু বেশ বড়। সঙ্গে যদি একটা গ্রেনেড অথবা রিভলভার থাকতো তাহলে জোর পেত সে। এইভাবে চোখে সন্দেহ ফুটিয়েও আর প্রশ্ন না করে উনি ওষুধ নামাচ্ছেন। ব্যাপারটা কি? সে সতর্ক চোখে লক্ষ্য করছিল। ওপাশেই একটা টেলিফোন আছে। সেটার দিকে নজর যেতেই আচমকা এমন বেজে উঠল যে হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে চলে এল কল্যাণের। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে রিসিভারটা তুলে বললেন, 'ইয়েস!'

কল্যাণ কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ফোনটা যদি পুলিশের হয়? যদি থানা থেকে সতর্ক বার্তা পাঠানো হয়? ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ হাঁ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার ওষুধ নামাতে শুরু করলে কল্যাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মিলিয়ে মিলিয়ে ক্যাশমেনো লিখে টাকার অঙ্কটা উচ্চারণ করলেন ভদ্রমহিলা। কল্যাণ চটপট সেটা বের করে কাউন্টারে রাখতে গুণে নিয়ে ব্যালেন্সটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি। তারপর ওষুধগুলো কাউন্টারে রেখে গলে হাত রেখে দাঁড়ালেন। কল্যাণ চটের খলিতে ওষুধগুলো চালান করল।

এই শীতেও তার মুখে ঘাম জমেছে। হঠাৎ ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতজন মানুষ অসুস্থ?'

'অনেক। সত্তরজনের ওষুধ নিচ্ছি।' বলে সে দোকান থেকে নামতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা তাকে ডাকলেন, 'আপনি দার্জিলিং-এ কোথায় উঠেছেন?'

'উঠেছি মানে? আমি তো এখানেই থাকি।'

'না থাকেন না। এই শহরের সবাইকে আমি চিনি।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'কিছু না। মনে হচ্ছে পাহাড়ি মানুষদের উপকার করতে যাচ্ছেন। একটু আগে থানা থেকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এরকম কেউ এলে তাকে আটকে রাখতে। যাদের জন্যে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন তারা যেন ওষুধটা পায়।' কল্যাণের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে কোনরকমে প্রশ্ন করল, 'আপনি হঠাৎ এমন সহযোগিতা করলেন কেন? মানে, করার তো কোন কারণ ছিল না।'

'না। কিন্তু সত্তরজনের মধ্যে দশজনও যদি ওই ওষুধে সুস্থ হয় তাদের জীবনের দাম আপনার চেয়ে দশগুন বেশি, তাই না? আপনি যেখানে উঠেছেন সেখানে না ফিরলেই বুদ্ধিমানের কাছ করবেন। আচ্ছা—!' কথাটা সেখানেই শেষ করে ভদ্রমহিলা ভেতর দিকে ফিরলেন। কল্যাণ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কেমন একটা ঘোর লাগল তার। এই মহিলা কি স্বাভাবিক আচরণ করলেন? কথাটা মাথায় আসতেই তার হাসি পেল। সে নিজেই কি স্বাভাবিক আচরণ করছে? সম্বন্ধে ফিরতেই সে দ্রুত হাঁটতে লাগল। ব্যাগটা বেশ ভারী হয়ে গেছে এর মধ্যে। কিন্তু তার তো হোটেল ফেরা দরকার। নিজস্ব জিনিসপত্র সবই পড়ে আছে সেখানে। দার্জিলিং-এ নিশ্চই কয়েকশ হোটেল আছে। তাদের সবাইকে সতর্ক করা বা গিয়ে হৃদিশ নেওয়ার সময় কি পেয়েছে পুলিশ? কিন্তু ভদ্রমহিলার কথাগুলো কানে সেঁটে আছে এখনও। না, আর কোন বুঁকি নেবে না সে। এই ওষুধগুলো যাদের জন্যে তাদের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে।

কিন্তু হোটেল না ফিরলে আজকের রাত সে কোথায় কাটাবে? দার্জিলিং-এ আকাশের তলায় গুলে আর ওষুধগুলো পৌঁছাতে হবে না। নতুন কোন হোটেলোও ওঠা এখন সোজা থানায় যাওয়ার সমান হবে। স্টেশনের সামনে পৌঁছে খুব অসহায় বোধ করছিল কল্যাণ। কি করবে সে বুঝতে পারছিল না। তার একবার মনে হল যা হবার হোক হোটেলের ফিরে যাবে। সেখানে তার জিনিসপত্রের মধ্যে শীতবস্ত্রও রয়েছে যেগুলো শরীরে না থাকলে সান্দাককু পার হওয়া অসম্ভব। ঠিক সেই সময় একটা পুলিশের জিপ বেশ জোরে সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে সিদ্ধান্ত পাল্টালো।

জিপ ভাড়া করে যদি দার্জিলিং ছাড়তে হয় তাহলে তাকে বাজারের দিকে যেতেই হবে। সেখানেও যে পুলিশ ওৎ পেতে নেই তা কে বলতে পারে।

তাছাড়া এত রাত্রে কোন ড্রাইভার যেতে চাইবে কিনা সন্দেহ আছে। কল্যাণের মনে হল যদি ঘুম পর্যন্ত যাওয়া যেত তাহলে অনেকটা স্বস্তি হত। এই মুহূর্তে দার্জিলিং শহরটা এড়ানোই প্রয়োজন। ঘুম থেকে দার্জিলিং কত মাইল? সে আর কিছু না ভেবে স্টেশনটাকে ডান দিকে রেখে হাঁটিতে লাগল। শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছাতেই তার পায়ে ব্যথা শুরু হল। শরীরটা ভীষণ ভারি মনে হচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে খিদে। এই অবস্থায় তার পক্ষে বেশী দূর যাওয়া সম্ভব নয়। কল্যাণ পিছন ফিরে শহরটাকে দেখল। সে হেরে যাচ্ছে। অসম্ভব! তাকে প্রমাণ করতে হবে সুদীপ বা আনন্দের চেয়ে তার ক্ষমতা মোটেই কম নয়, কল্যাণ আবার হাঁটিতে লাগল। মাঝে মাঝে ওপর থেকে গাড়ি নামছে নিচের দিকে, নিচ থেকেও উঠছে। অর্থাৎ রাত্রেও গাড়ি চালানো বন্ধ হয় না। গাড়ির আলো দেখা মাত্র সে পথ থেকে সরে কোন একটা আড়াল বেছে নিচ্ছে। ক্রমশ তার শরীর আরও ভারি হয়ে এল। কল্যাণ আর পারল না। তার মনে হচ্ছিল একটু ঘুমিয়ে নিলে সে ঠিক হয়ে যাবে। এই সময় সে একটা শুকনো ঝরনার পাশে চালা দেখতে পেল। সম্ভবত রাস্তা সারাই-এর কাজের সময় শ্রমিকরা এই চালা করেছিল আচমকা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। চারটে খুঁটির ওপর ওই আচ্ছাদনের তলায় পৌঁছাতে বেশ কয়েকটা পাথর তাকে ভিঙিয়ে যেতে হল। ঘোরের মধ্যেই সেটুকু পেরিয়ে বড় পাথরের ওপর শরীরটাকে ছেড়ে দিল সে। আর তখনই চেতনা উধাও।

কালিয়াপোকরিতে যখন সে ট্রেকার থেকে নামল তখন বিকেল। সুকিয়্যাপোকরি থেকে কালিয়াপোকরি পর্যন্ত এই ট্রেকারগুলো যাত্রী নিয়ে যাওয়া আসা করে মাঝে মাঝে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সে নিজেকে বেশ হালকা বোধ করেছিল প্রথমে। খিদে ছাড়া অন্য অনুভূতি ছিল না। তার ওষুধের ব্যাগ এবং টাকাগুলোও কেউ নিয়ে যায়নি। অতএব কল্যাণ আবার হাঁটিতে শুরু করেছিল। এবং তার পরেই টের পেল বুক লাগছে। একটু রোদ উঠতেই কাশি শুরু হল। তারপর শীত শীত ভাবটা আসতে মনে হয়েছিল ঠাণ্ডার জন্যে এমন মনে হচ্ছে। সকাল হতে ওই পথে প্রচুর গাড়ি চলছিল। কল্যাণকে মাঝে মাঝেই সেই কারণে লুকিয়ে পড়তে হচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল তার ঠাণ্ডা লেগেছে। এবং সেই ঠাণ্ডা তার শরীরে জ্বরও আনতে পারে। কেনা ওষুধ থেকে হাতড়ে হাতড়ে সে একটা ওই ধরনের ট্যাবলেট বের করে ঝরনার জলে মুখে পোরার পর একটু স্বস্তি হল। সে যখন সুকিয়্যাপোকরি-দার্জিলিং বাসটা দেখতে পেল তখন রোদ বেশ চড়েছে। সুকিয়্যাপোকরিতে বেশ বড় একটা বাজার আছে। সেখানে বাস থেকে নেমে সে পেট ভরে পুরি তরকারি খেয়ে নিল। পেটে খাবার পড়ার পর তার স্বস্তি হল এবং বেশ ঘুম পাচ্ছিল। সেই সময় কালিয়াপোকরির ট্রেকারটা

পেয়ে যেতে সে তার এককোণে উঠে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পুরো রাস্তাটা কিভাবে এসেছে তা সে জানে না। কালিয়াপোকরিতে যখন পৌঁছাল তখন সূর্য নেই, সময় তিনটে। আকাশে মেঘ। ট্রেকারটা থেকে নেমে সে যখন চারপাশে তাকাচ্ছে তখন একটা সিড়িঙ্গের মত লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাবেন? সান্দাকফু?'

উত্তরটা পেয়ে গিয়ে কল্যাণ মাথা নেড়েছিল। লোকটাকে হিন্দীতে কথা বলছিল। সে বলল, 'এখন যদি হাঁটতে শুরু করেন তাহলে সান্দাকফু পৌঁছাতে পারবেন না। একটু পরেই রাত হবে। রুষ্টি নাগবে। এখানে যদি থাকতে চান তো আমার বাড়িতে থাকতে পারেন। কুড়ি টাকা দিতে হবে। সকালে উঠে রওনা হয়ে যেতে পারেন।'

কল্যাণের মনে হল যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া গেল। লোকটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা কাঠের বাড়ির কাছে চলে এল। লোকটা ঘরের দরজা খুলে তাকে বিশ্রাম করতে বলে বেরিয়ে গেল রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করতে। কল্যাণের মনে হচ্ছিল এবার শুয়ে পড়লেই হয়। এই বাড়িতে দুটো ঘর। আর কোন লোকজন নেই। সে উঠে ভেজানো দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠল, দেওয়ালে দুটো খাকি শার্ট প্যান্ট ঝুলছে। পাশেই একটা টুপি। মুহূর্তে সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই লোকটা নির্ঘাত পুলিস। কালিয়াপোকরিতে নিশ্চয়ই পুলিসের চৌকি আছে। সে দ্রুত বাইরের ঘরে ফিরে এসে ব্যাগটা তুলে নিল। তারপর চুপচাপ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে চারপাশে নজর বুলিয়ে হাঁটতে শুরু করল। লোকটাকে কাছে পিঠে দেখা যাচ্ছে না। কুড়িটা টাকা রোজগারের নোভে কেউ একজন অচেনা মানুষকে খোলা বাড়িতে রেখে বেরিয়ে যায় না। কল্যাণ নিঃসন্দেহ লোকটা পুলিস এবং তাকে সন্দেহ করেছে। এখন তার যে চেহারা হয়েছে তাতে চট করে চেনা মুশকিল। কিন্তু ওই ট্রেকার থেকে সে-ই একমাত্র প্যাসেঞ্জার নেমেছে যে বাঙালি। যারা সান্দাকফু বেড়তে যায় তাদের কাছে যেসব জিনিসপত্র থাকে তাও তার কাছে নেই। একটা বড় খলি হাতে গাড়ি থেকে নেমে ইতস্তত করতে দেখে লোকটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নিলেছে। তার মানে তাদের সম্পর্কে খবর এ অঞ্চলেও এসে গিয়েছে।

একটু একটু করে কল্যাণ এগিয়ে যাচ্ছিল। কিছু লোক এই পথ ধরে হাঁটছে। এরা যাবে দিকেভজন। শীত বাড়ছে। এর আগেরবার যাওয়ার সময় দিকেভজন কয়েকটা ঘরবাড়ি সে দেখেছিল। ওই অবধি পৌঁছাতেই রাত হয়ে যাবে। আর এখানে খোলা আকাশের তলায় রাত মানে নিশ্চিত মৃত্যু। দ্রুত পা চালাচ্ছিল কল্যাণ। সুকিয়াপোকরির খাওয়া আর গাড়িতে বসে পুরোটা পথ ঘুমিয়ে শরীর এখন অনেকটা তাজা। যদিও বুকে সদির ভাবটা বেশ জমাট। এটা জ্বালাবে। হামার বাড়ির সামনে দিয়ে শ্বে কালিয়াপোকরি ছাড়িয়া নির্জন পাহাড়ে নেমে পড়ল। অন্তত আলো ছড়ানো পাহাড়ে,

গাছেদের বুক। পৃথিবীটা আচমকা অমৌকিক সুন্দরী হয়ে উঠেছে সেই আলো মেখে। কল্যাণের মন ভরে গেল সেদিকে তাকিয়ে। তার হাঁটার উৎসাহ বাড়ল। এবং সেই কারণেই সে গলা খুলে রবীন্দ্রনাথের একটা গান প্রায় নিজের সুরে গাইতে লাগল চেঁচিয়ে। আশেপাশে যারা হাঁটিছে তারা খুশির চোখে তাকাল। যে মানুষ গান গায় তার সম্পর্কে লোকে চট করে খারাপ ধারণা করতে চায় না।

স্তিক ঘন্টাখানেক চলার পর থেকে চিৎকারটা ভেসে এল। এখন আলো প্রায় নিবে এসেছে। দিকেভঞ্জন চোখের সামনে। ঘন কুয়াশা পাক খাচ্ছে পথের ওপর। চিৎকার শুনে পিছন ফিরল কল্যাণ। গোটা ছয়েক লোককে কয়েকশ ফুট নিচুতে দেখা যাচ্ছে। তারা চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব দ্রুত ওপরে আসতে। এবং চকিতে এত দূরে দাঁড়িয়েও কল্যাণের নজরে এল মানুষগুলোর পরণে খাফি পোশাক এবং হাতে বন্দুক। ওরা অত নিচে থেকেও নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পেয়েছে নইলে চিৎকার করে থামতে বলত না। কল্যাণ এবার মরীয়া হল। সঙ্গীরা দেখল গান বন্ধ করে সে ঝোলা নিয়ে দ্রুত গা চালাচ্ছে। এখনও ওরা অনেকটা নিচে আছে। পাহাড়ি পথ ঘুরে আসতে যে সময় লাগবে তাতে সে দুরত্ব বাড়াবার সুযোগ পাবে। কিন্তু সে যখন কুয়াশার জগলে পড়ে গেল তখন অন্ধ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোন্টা পথ কোন্টা নয় তা ঠাণ্ডর করা অসম্ভব। শীত এখন হাড়ে, কাঁপুনিটা দুটো কারণেই হতে পারে।

দিকেভঞ্জে পৌঁছে মনে হল কলজেটা বুক থেকে বেরিয়ে আসবে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বোঝাটা সঙ্গে না থাকলে আরও দ্রুত যাওয়া যেত। কিন্তু এখন এটাই তার সম্মান। কল্যাণ পিছন দিকে তাকাল। এখন অন্ধকার মাটিতে এবং সেই সঙ্গে চাপ কুয়াশা। যারা আসছে তারাও তাকে চট করে খুঁজে পাবে না। কিন্তু দিকেভঞ্জে থাকা চলবে না। সামান্য ওই কয়টা ঘরবাড়ি যেই তাকে আশ্রয় দিক ওদের পক্ষে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। টললে টলতে কল্যাণ আবার হাঁটিতে লাগল। কুয়াশা কিংবা অন্ধকারে তাও কোন খেয়াল নেই। পায়ে চলার পথ একে বেকে উঠে গেছে। হাঁটিলে শরীরে উত্তাপ বাড়ে! কিন্তু পথ এবার এমন খাড়াই যে তাকে বারংবার দম নিতে হচ্ছিল। এখন আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। ক্রমশ সে অনেকটা ওপরে উঠে এল। আর তখনই সর্বান্তে একটা তৈলাক্ত অনুভূতি চোখের সামনে সবকিছু ব্যাপসা হয়ে যাচ্ছিল। একটা পাথরের গায়ে ধপ করে বসে পড়ল সে ঝোলাটাকে পাশে রেখে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত এখন তীর যন্ত্রণা। কল্যাণ চোখ বন্ধ করল।

কতরূপ এইভাবে পড়েছিল সে জানে না। হঠাৎ স্রোতের বিপরীতে গিয়ে সে উঠে বসল। আর তখনই অশুভ দৃশ্য দেখল। দৃষ্টি এখনও তার পরিষ্কার নয়। কিন্তু মনে হল আশেপাশে কোথাও কুয়াশা নেই। সমস্ত আকাশটা

চকচকে জ্যোৎস্নায় নিকানো। আর তারই উপচানো আলোয় পাহাড় বনানী মাখামাখি। দেখতে দেখতে বুকের ভেতর একটা আনন্দ জন্ম নিল যা তার হৃৎপিণ্ডের গায়ে নরম আদর ছড়িয়ে দিল। এবং তখনই নিচে চিৎকারটা গুনতে পেল সে। অর্থাৎ অনুসরণকারীরা হাল ছাড়েনি। যে সময়টা কল্যাণ পেল সেটা দিকেভঞ্জনর বাড়ি বাড়িতেই তল্লাশ চালানোর জন্যেই। কল্যাণ উঠল। না, সে ধরা দেবে না। ওষুধগুলো তাকে পৌঁছে দিতেই হবে। শরীর টলছে কিন্তু সে এগোল। মুশকিল হল পথটা যেন আকাশে উঠে গেছে। আর একটু এগোলে সোজা চাঁদের ঘরে পৌঁছানো যাবে। একটা পা ফেলার পর এখন অন্য পা-কে টেনে আনতে হচ্ছে এগোতে। চিৎকারটা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু তার মানে এই নয় অনুসরণকারীরা ফিরে গিয়েছে। কল্যাণ পিছন ফিরে তাকাল। এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় যে কেউ দূর থেকে মানুষ চিহ্নিত করতে পারবে। কুলাশারা এখন নিচে নেমে গিয়েছে। তার সামনে আর আড়াল বলে কিছু নেই। যেটুকু সামর্থ্য ছিল তা উজার করে কল্যাণ যখন অপেক্ষাকৃত সমতলে উঠে এল তখন ওর অপূষ্ট শরীর আর তার রোগা হাড়গুলো কাঁপছে। এবং সেই সময় সে লোকগুলোকে দেখতে পেল। শিকার দেখতে পেয়ে ওরা এবার হই চই করতে করতে এগোচ্ছে। সামনের খোলা মাঠ জ্যোৎস্নায় ভাসছে। দূরে কয়েকটা বাড়ি। ওঃ, কল্যাণ চিনতে পারল, এই হল সান্দাকফু।

আর তারপরেই তার মনে পড়ল। তাপল্যাও থেকে যে ছেলেটা তার সঙ্গী হয়েছিল সে অপেক্ষা করে আছে একটু এগোলেই। ওর কাছে পৌঁছে গেলে নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে। আর কিছু না হোক এই ওষুধগুলো ওর হাতে তুলে দেওয়া যাবে। ভাবনাটা মাথায় আসামাত্র শরীরে উদ্যম ফিরে এল। মুহূর্তে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গেল সে। ঘোড়ার নালের মত রাস্তার শেষে পৌঁছানো মাত্র সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লোকগুলো এবার ওপরে উঠে এসেছে। দূরত্ব এখন কয়েক মিনিটের। সমস্ত সান্দাকফু আজ নিশ্চুপ। কোন রকমে ওপরে রাস্তায় উঠে আসামাত্র গুলির আওয়াজ হল।

থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্যে কল্যাণ। এবং তারপরেই ওর শরীরে অলৌকিক শক্তি ভর করল। পিছনের মানুষগুলো হিন্দীতে চিৎকার করছে, যদি সে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে গুলি শরীরে বিঁধবে। কিন্তু সেসব কথা ওর কানে যাচ্ছিল না। নীচে পড়ে রইল সান্দাকফু। এল সে ফাল্গুনের রাস্তায়। এই মুহূর্তে তার শরীরে কোন শীত বোধ নেই, কোন ক্লান্তির কণ্ট নেই, একটা তীব্র জেদ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর তখনই সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল গুলির আওয়াজে। কাঁধে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করার আগেই সে ছিটকে পড়ল মাটির ওপরে। হাত থেকে বোলাটা পড়ে গেল মাটিতে। চোখ বন্ধ করে যন্ত্রণাটার সঙ্গে লড়াই করল কল্যাণ। এক হাতে কাঁধটা চেপে ধরতেই গরম স্রোত তার কনুই-এ নেমে এল। দ্বিতীয় গুলিটার শব্দ

কানে আসতেই সে পেছনে ফিরে চাইল। যারা গুলি করেছে তারা কাছাকাছি এসেও সামনে আসছে না। কল্যাণ হাত বাড়িয়ে বোলাটা আঁকড়ে ধরল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে সে যখন আরও কিছুটা পথ এগিয়েছে তখনই গলাটা শুনতে পেল। মুখ ফেরাতে সে অস্পষ্ট সেই ছেনেটার মুখ দেখতে পেল। ছেনেটা নেমে এসেছে পাশের পাহাড় থেকে। ওকে দেখা-মাত্র আছড়ে পড়ল কল্যাণ। ছেনেটা তাকে দুহাতে টানছিল। কিন্তু কল্যাণ সামান্য শক্তি পাচ্ছিল না ওর ডাকে সাড়া দেবার। সে কোন রকমে বোলাটাকে দেখিয়ে বলতে পারল 'নিয়ে যাও। ওষুধ। ওদের বলো আমি পেরেছি। জলদি ভাগে।' আর কথাটা উচ্চারণ শেষ করা মাত্র এক দমক উঠল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল রক্ত। কল্যাণ সেই জ্যোৎস্নায় নিজের শরীরের রক্ত দেখল। লাল, কি লাল। পৃথিবীর সব মানুষের রক্ত কি লাল? ওই যে যারা তাকে গুলি করেছে তাদেরও? সে চোখ তুলল আকাশে। এখন যেন কিছুই ভাবতে পারছে না সে। চাঁদটাকে অসম্ভব বড় দেখাচ্ছে। কিন্তু সে পেরেছে। ওষুধগুলোকে পৌঁছে দিতে পেরেছে। কিন্তু ছেনেটা দাঁড়িয়ে নেই তো! ঘাড় ঘুরিয়ে সে বোলা বা ছেনেটিকে না দেখতে পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। ক্রমশ তার মুখ একটা তৃপ্ত মানুষের হয়ে গেল। আমি পেরেছি। সুদীপ, তোদের মত মানুষ মারতে পারিনি কিন্তু মানুষকে বাঁচাবার রসদ আনতে পেরেছি। দ্বিতীয়বার রক্ত বেরিয়ে আসতে সে সচেতন হল। ওরা কেউ ওপরে উঠে আসছে না কেন? ওরা কি তাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে চায়? নাকি ভয় পাচ্ছে যদি তার কাছে অস্ত্র থাকে? চিন্তাগুলো ছন্নছাড়া হয়ে আসা যাওয়া করছিল। পাথরে ঠেস দিয়ে বসতে আরাম হল। তারপর সে চিৎকার করে উঠল, 'কইরে শালা, আয়, এগিয়ে আয়, আমাকে মেরে ফ্যাল।' শেষের দিকে তার গলা জড়িয়ে গেল এবং কোন শব্দ বের হল না। হঠাৎ জন্মিতার মুখ ভেসে উঠল কল্যাণের সামনে। সে মুখ তুলে চাঁদটাকে দেখতে পেল। হঠাৎ সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'জয়ী, আমি জিতু নই। জয়ী আমি আমি—।' সেইসময় আবার গুলির শব্দ হল।

কল্যাণ বক্রুণার চোখে নিচের দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে কাঁধ চেপে উঠে দাঁড়াল। সে সোজা হতে পারছে না। সমস্ত শরীর খরখর করে কাঁপছে। টলতে টলতে সে চলে এল পাহাড়ের বিপরীত দিকে যেখানে অতলান্ত খাদ। কল্যাণ চোখ তুলল। আহা, চাঁদের মুখটা অত শ্রুত পাশ্চৈতন্য কেন? ক্রমশ সেটা ক্ষয়্যাটে, রক্তশূন্য মায়ের মুখ হয়ে গেল। কল্যাণ তার বাঁহাত আকাশে বোলাল। মা। চাঁদটা তার মা হয়ে যাচ্ছে। যে মাকে সে কখনই নিজের করে পায়নি। এখন সেই মা তার সামনে। কি করণ দেখাচ্ছে। কল্যাণ হেসে ফেলল, মা, আমি পেরেছি। জয়ীকে বলে দিও। আর তখনই তার শরীরটা আকাশে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল। তীব্র শব্দ পাহাড় কাঁপাল বুকের খাঁচাটা যেন চুরমার। কল্যাণ শেষবার দেখতে পেল অনেকগুলো শরীর

ছুটে আসছে সোল্লাসে। সে শেষবার মাকে দেখবার জন্যেই সম্ভবত চাঁদের দিকে মুখ ফেরাতে যেতেই শরীরটা গড়িয়ে পড়ল খাদে। ছুটে আসা মানুষগুলো দেখল অসাড় শরীরটা শূন্য ভেসে নিচের অতল খাদে নেমে যাচ্ছে। আর চন্দ্রদেব তার শরীরটাকে আলোকিত করার শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

॥ ৩৯ ॥

গত রাত হাওয়ার রাত ছিল। পালদেম বলেছিল বরফ পড়ার আগে হিমালয় হাওয়ারদের পাঠায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে বীভৎস আওয়াজ। রাগী জন্তুর গোঙানি। অথচ বৃষ্টি নেই। আকাশ ঘোলাটে। সেখানে চাপ মেঘও নেই। কিন্তু একটি নখ লক্ষ্য হয়েছে। শীত বাড়ছে হ হ করে। কাঠের ঘরে নিরাপদ বিছানায় গুয়েও মনে হচ্ছিল উত্তাপ চাই।

আনন্দ চুপচাপ পড়েছিল। দ্বিতীয়বার ব্যাপারীরা ঘুরে গেল এই গ্রাম থেকে। ওরা অবশ্য তাদের হদিশ পায়নি। কিন্তু তাপল্যাণ্ডের মানুষ কি করে এত টাকা হাতে পেল তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে। পালদেম শেখানো উত্তর বলেছে, চারজনের এক অভিশ্রমীদল এই গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল তাই দিয়েই কেনাকাটা করছে ওরা। উত্তরটা ওরা কতটা বিশ্বাস করেছে সেটা বোঝা যায়নি। কিন্তু প্রচুর জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো রাখা হয়েছে গ্রামের আর একটি খালি ঘরে। সেইসঙ্গে আছে গৃহপালিত সেইসব জন্তু যা গ্রামবাসীর ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করেছিল। আজ বিকেলে বন্ধুদের কাছে আনন্দ তার পরিকল্পনা খুলে বলেছে; জয়িতা উৎসাহিত হয়েছে। একটা অবহেলিত বলা যায় সভ্যতার ছোঁয়াচর্বিজিত গ্রামের মানুষদের একত্রিত করে বাঁচার পথ খুঁজে দেওয়া মানে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মানে নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া। সারা বছর এরা হয় আধাপেটা, নয় অভুক্ত থাকে। সবচেয়ে আগে এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেটা সশ্রমিলতভাবে। কেউ কম বা বেশী নয়। রান্না হবে একত্রে। এর ফলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা নিকট সম্পর্ক তৈরী হবে। এ বছরের ব্যবস্থা না হয় সুদীপের আনা টাকায় হয়ে যেতে পারে কোনরকমে, কিন্তু আগামী বছর থেকে নিজেদের জন্যে প্রতিটি মানুষকে কাজ করতে হবে। চামের ব্যবস্থায় আধুনিক সাহায্য নিতে হবে, ডেলারি এবং পোলট্রি ফার্ম পুরো গ্রামের জন্যে তৈরী করতে হবে। আর সেই সব জিনিস দার্জিলিং না হোক গৈরাবাস অথবা মানেভজনের বাজারে পৌঁছে দিয়ে তার বিনিময়ে দরকারী জিনিস আনতে হবে। এদের নিজস্ব লেখ্যভাষা আছে কি না জানতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দী এবং ইংরেজী শিখতে হবে। অর্থাৎ সুস্থভাবে বাঁচতে হলে একা কিছু করা যাবে না, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাটতে হবে। এই বোধ ওদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। অবশ্য এর জন্যে বিশ্বাস অর্জন করা দরকার।

বিদেশী সিঙ্ঘায়ী মানুষকে চট করে কেউ বিশ্বাস করে না। তবু এখন যেন ওরা তাদের সঙ্গে অনেক সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছে। ওই যে মেয়েটি যে যুক্তার দরজায় পৌঁছে গিয়েও কোন অজ্ঞাত কারণে এখনও মরে যায়নি তার জন্যে কেউ দায়ী করছে না এখনও। মরে গেলে কি হবে তা কে বলতে পারে। যাই হোক, এই গ্রাম ছাড়ার আপাতত কোন ইচ্ছে তার নেই। প্রথম কথা, পুলিশের রাইফেল এত দূরে পৌঁছাবে এমন সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত, আকৈশোর যে বাসনা ছিল তা সম্ভব হবে এমন সম্ভাবনা নেই। বাবাও যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন তা একাত্তরেই মুখ খুবড়ে পড়েছে। সে ভেবেছিল দেশের যারা শত্রু তাদের আঘাত করার শিক্ষা জনসাধারণকে দিলে তারা উদ্দীপ্ত হবে এগিয়ে আসতে। মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষের মানুষ ভেতরে ভেতরে সমস্ত সিস্টেমটার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে বক্ষিত হওয়ায় রুগু হয়ে উঠেছে শুধু তার প্রকাশের দরজা খুলে দিতে পারলেই লাভান্ধ্রিত বইবে। কিন্তু কলকাতায় থাকাকালীন তার কোন প্রতিক্রিয়া সে দেখতে পায়নি। অবশ্য ওরা চলে আসার পর কিছু হয়েছে কি না তা জানা নেই। হলে অন্তত বিবিসি-র খবরে তার কথা শোনা যেত। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে সে সবই ভস্মম যি ঢালা হয়েছে। কিন্তু বিখ্যাত গ্রন্থগুলো পড়ে তার তো মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হটাতে বিপ্লব দরকার। বিপ্লবের পরে মানুষকে তার অধিকারের জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। অর্থাৎ বিপ্লব উদ্দেশ্য নয়, ওই নয়। সমাজ ব্যবস্থাই আসল লক্ষ্য। সেই কাজ তো এখানেও শুরু করা যেতে পারে। এখানে তাদের চোখে কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অস্তিত্ব চোখে পড়ছে না। কাছনকে কোনভাবেই, এমন কি সামান্য জোতদার বলেও ভাবা যাচ্ছে না। এদের শত্রু অজ্ঞতা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে অশিক্ষার ফসল দারিদ্র। কিন্তু এদের পক্ষে সবচেয়ে যে মূল্যবান সম্পদ তা হল রাজনীতির ধোঁয়াটে বিষ এখনও চেপে বসেনি। সামান্য পিছিয়ে নিলে গেলে পৃথিবীর আদিম যুগের মানুষের জীবনযাত্রায় এদের পৌঁছে দেওয়া যায়। অতএব এই মাটির ডেলাগুলো নিয়ে স্বপ্নের মূর্তি তৈরী করা যায়। বাধা যা আসবে তা ওদের অজ্ঞতা থেকে। এর মধ্যে আনন্দ কয়েকটি শব্দ শিখে ফেলেছে। এ ব্যাপারে জয়িতা তার থেকে এগিয়ে আছে। ও এখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলতে পারে। ভুল করে কিন্তু সেই ভুলটা ওদের মজা দেয়। নিরাপদ বিছানায় শুয়ে আনন্দ এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করে। কল্যাণটা ফিরে এলেই ওরা ওদের অনেক কাছে এসে যাবে।

নিরাপদ বিছানায় শুয়ে জয়িতারও ঘুম আসছিল না। হাওয়া বইছে কিংবা বেড়ে যাওয়া ঠাণ্ডার জন্যে নয় ওর শরীর এবং মনে অস্বস্তি কাজ করছিল। সময় এসে গিয়েছে। কলকাতায় থাকতে এই ব্যাপারটা কোন শুরুই পেল না। সে স্থির করে নিল যে প্রয়োজনে বন্ধুদের বলবে। এই কদিনে তাপল্যাণ্ডের মানুষদের সঙ্গে মিশে সে অনেক কিছু জেনেছে। ব্যাপারটা অজুত! এই

পাহাড়ি মানুষেরা সুদীপ আনন্দের সঙ্গে দূরত্ব রেখেছে, তার সঙ্গে রাখেনি। বোধহয় মেয়েরা খুব চট করেই বিশ্বাস কিংবা আস্থাযোগ্য হতে পারে। জয়িতা কৌতূহলী হয়েছিল এখানকার মেয়েরা তাদের ওই সমস্যার সমাধান কিভাবে করে তা জানতে। জানার পর শিউরে উঠেছিল। অল্পবয়সীরা সেই কয়দিন প্রায় ঘরের বাইরে যায় না। স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে সবার আড়ালে থেকে যায়। কার লেখা মনে নেই, জয়িতা পড়েছিল বাংলাদেশের মেয়েরাও এক সময় ওই একই জীবনযাপন করত। ওই কদিন বিছানায় শুতো না, মাথায় তেল দিত না। তারও আগে ঘর ছেড়ে বের হতো না। নিজেদের অণ্ডুচি মনে করত। এখনও পূজোপার্বণে বাংলাদেশের মেয়েরা যোগ দিতে চায় না। এ হীনমন্যতা বোধ কি কারণে তা কেউ ভাবেনি। যেন প্রকাশ্যে বললে সেটা অশ্লীলতার পর্যায়ে চলে যাবে। িদিন পাল্টেছে কলকাতায়। এখানকার বয়স্ক মেয়েরা যেভাবে নিজেদের সামলায় তা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বোধহয় সেই কারণেই এদের অসুখবিসুখ অনিবার্য ঘটনা। সে নিজে না হয় কিছুদিন সামলে নিতে পারত কিন্তু তাই বা কদিন সাহায্যে আসতো? একটা উপায় বের করতেই হবে।

ওদিকে সুদীপের নাক ডাকছে। আনন্দ চুপচাপ। সুদীপটাকে জয়িতা আজকাল ঠিক বুঝতে পারছে না। সারাক্ষণ এত কি ভাবে? গ্রামের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার প্রবণতা ওর মধ্যে। কিন্তু এখনও এখানকার ভাষা শেখার ইচ্ছে ওর নেই। গ্রামটা ছোট। মানুষগুলো সরল। আর যে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল লেগেছে জয়িতার সেটা হল পুরুষরা মেয়েদের পর্দাসনসীন করে রাখেনা। বরং বলা যায় মেয়ে পুরুষ সমান তালে কাজ করে, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সমান অধিকার আছে। শুধু বিবাহের বেলায় তাদের পরিবারের নির্দেশ মানতেই হয়। অথচ বিবাহের আগে যে ঘোঁনাভ্যাস নেই এমন নয়। সেটা সবাই জানেও কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না যতক্ষণ না সন্তানসন্তবা হচ্ছে কেউ। কিন্তু এখানকার মেয়েদের মধ্যে নানা ব্যাপারে যে সংস্কার তা মূলত অজ্ঞতা থেকেই। এদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে হলে ওই অজ্ঞতা দূর করতে হবে। দ্বিতীয়ত শারীরিক কারণে এদের অনেকেই সন্তানসন্তবা হতে পারছে না। নারীপুরুষ নিবিশেষে গলগণ্ড রোগের ব্যাপক শিকার হচ্ছে। এইটে বাদ দিয়েও তাপল্যাণ্ডের মানুষগুলো যারা এখনও আধা আদিম যুগে বাস করছে তাদের জীবন বিপ্লব পরবর্তী স্বপ্নের সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়ার অবাধ সুযোগ রয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টে যাওয়ার যে স্বপ্ন নকশালরা দেখেছিল, সি পি এম মুখে বললেও কাজে যার উল্টো করেছে, চে ওয়েভারা অথবা মাও কিংবা হো চি মিন যে স্বপ্ন দেখতেন সেই কাজ এখানে করা সম্ভব। কয়েক কোটি না হোক কয়েক শ' মানুষকে জীবনের স্বাদ এবং স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়ে স্বনির্ভর করলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা

অর্থপূর্ণ হবে। এই ব্যাপারে সে একমত আনন্দের সঙ্গে। জয়িতা চোখ বন্ধ করতেই কল্যাণের মুখটা দেখতে পেল। কল্যাণের ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। বুকটা অবশ্য কাউকে না কাউকে নিতেই হত। কিন্তু কল্যাণ যদি ধরা পড়ে যায়? পুলিশ যদি কল্যাণের পরিচয় জানতে পারে তা হলে মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। জয়িতা জানে কল্যাণ বাঁচতে বড় ভালবাসে। এবং আর একটা জিনিস ইদানিং সে কল্যাণের মধ্যে লক্ষ্য করছিল। তার সঙ্গে ব্যবহারে যেন পরিবর্তন এসেছিল। কিরকম চোখে মাঝে মাঝে তাকাত কল্যাণ। এবং তখনই তার মনে হত সে যে মেয়ে এটা কল্যাণের দৃষ্টিতে এসেছে। ভাল লাগত না, অস্বস্তি বাড়ত। কিন্তু ওইটুকু ছাড়া আর কোন প্রিটেনশন বা বুজরুকি কল্যাণের ছিল না। বরং বুকি দিয়ে সব কিছু সামলে নেবার ক্ষমতার অভাব বড় চোখে পড়ত। সেই কল্যাণ দাজিলিং-এ নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। কিন্তু পৌঁছবার পর কতটা বোকামি করল তার ওপর নির্ভর করছে ওর ফিরে আসা। সুদীপটা তো প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, 'ও শালা ফিরবে না। ঠিক হাওয়া হয়ে যাবে।' সুদীপ কল্যাণকে, ঠিক কল্যাণ নয়, ওই ক্লাশটাকেই অবিশ্বাস করে। হঠাৎ আনন্দ কথা বলল, 'জয়ী, জেগে আছিস?'

জয়িতা নড়ল না। বলল, 'হা'

আনন্দ বলল, 'আজ রাতে মেয়েটা মরে যাবে। তারপর কি হবে কে জানে?'

জয়িতা বলল, 'আমি কল্যাণের কথা ভাবছি।'

আনন্দ বলল, 'কল্যাণ পালাবে না। ও আসবেই। কাজ নয় পরশু। কিন্তু জানিস, আমাদের মধ্যে কেউ যদি ডাক্তার হত তা হলে এখানে আরও ভাল কাজ করতে পারতাম।'

জয়িতা প্রশ্ন করল, 'কল্যাণ ফিরবেই এই বিশ্বাস হল কেন তোর?'

আনন্দের হাসি শোনা গেল অন্ধকারে, 'মধ্যবিত্ত বলে। মধ্যবিত্তরা সব সময় পালায়। কিন্তু বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পেলে সেটা মরে না যাওয়া অবধি হাতছাড়া করে না।'

ঠিক সেই সময় চিংকারটা উঠল। যেন কেউ প্রচণ্ড আহত হয়ে কাঁদছে। কান্নাটা গোঙানি বললে কম বলা হয়, কারণ কোন মানুষ অত জোরে গোঙাতে পারে না। এখানে আসার পর আজ দ্বিতীয় রাত ওই গোঙানিটা হচ্ছে। আনন্দ উঠে বসল। বাতাসের দাপট ছাপিয়ে কান্নার শব্দ হচ্ছে। আনন্দ বলল, 'মানুষের নয়, অসম্ভব। এটাই পালদেমের দানো।'

জয়িতা বলল, 'বাইরে বেরিয়ে দেখবি? হেঙি তাঁঙা কিন্তু।'

'দেখবি। ইম্পসিবল। পালদেম যাই বলুক এ দানব নয়। দানব বলে কিছু নেই। হিঙ্গারী সাহেব পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেও কোন জন্তুর হদিশ পাননি। এরা যাই বলুক তার পেছনে কোন সত্যি নেই।' আনন্দ উঠে শীতবস্ত্র জড়িয়ে নিচ্ছিল। জয়িতা ওকে অনুসরণ করল। কান্নাটা এখনও

একটানা চলছে। ঘরে মোমবাতি জ্বালানো আনন্দ। শিখাটা কাঁপছে। এই সময় সুদীপ মুখ তুলল, 'কি ব্যাপার? চললি কোথায়?' আনন্দ বলল, 'একবার দেখব বস্তুটি কি। এত জোরানো গলা কার?' সুদীপ আবার গুয়ে পড়ল, 'নেই কাজ তো খই বাছ।'

ওরা আর কথা বাড়াল না। দরজা খরখর করছিল। কোনমতে সেটা খুলে বাইরে দাঁড়াতে একসঙ্গে ঠাণ্ডা এবং হাওয়ার চাপ পড়ল শরীরে। বাইরে ঘন অন্ধকার নয়, একটা পাতলা আলো আঁধারে মিশে অদ্ভুত পরিবেশ তৈরী করেছে। আকাশে মেঘ আছে কিন্তু তার আড়ালে চাঁদও রয়েছে এটা বোঝা যায়। ওরা দুজনই কাঁপছিল। কান্নাটা ভেসে আসছে উত্তরের পাহাড় থেকে। কিছুক্ষণ একটানার পর কিছুক্ষণ যেন জিরিয়ে নিচ্ছিল। সমস্ত তাপন্যাও এখন চুপচাপ। কোন প্রাণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা ঢালু জমি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। আনন্দ বলল, 'দৌড়ো। দৌড়লে ঠাণ্ডা কম লাগবে।' ওরা উত্তরের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই পায়ের তলায় বরফ পেল। এর মধ্যে এখানে বরফ পড়তে শুরু করেছে। আর দৌড়ানো যাচ্ছে না। এর পরেই খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের ওপরে বরফ ছিলই, এখন তা নেমে এসেছে অনেক নিচে। আর এখানে আসার পরই চিংকার অথবা কান্না থেমে গেল। ওরা যত এগিয়ে এসেছিল তত স্পষ্ট হচ্ছিল কোন মানুষ নয়, এ আওয়াজ কোন জন্তুর গলা থেকে বের হচ্ছে। সম্ভবত জন্তুটি ওদের পেখতে পেয়েছিল এবং সে কারণেই চুপ করেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ বলল, 'নাঃ ফিরে যাই চল।'

জন্মিতা বিরক্ত হল, 'এলি কেন? যেন তোর জন্যে চিড়িয়াখানার খাঁচায় বসে থাকবে ইয়েতি।'

ওরা চুপচাপ এগিয়ে আসছিল। শরীরের যেসব অংশ বাইরে বেরিয়ে আছে সেখানে কোন সাড়া নেই। এখন আর কোন আওয়াজ আসছে না উত্তরের পাহাড় থেকে। সমস্ত চরাচর নিস্তরক। ওরা যখন মাঝামাঝি তখন আনন্দ হাত বাড়িয়ে জন্মিতাকে থামতে বলল। গোটা আটক লোক ওপাশের পাহাড় থেকে নেমে আসছে নিঃশব্দে। ওদের লক্ষ্য অবশ্যই গ্রাম এবং প্রত্যেকেই সশস্ত্র। ওঁদের চলাফেরা দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন গোপন মতলব হাসিল করতে ওরা এসেছে। আনন্দরা দাঁড়িয়েছিল একটা বড় পাথরের আড়ালে। পাথরটা হাওয়ার দাপট সামলাচ্ছে। একেই পাতলা অন্ধকার তার ওপর ওরা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে চট করে আগলুকদের দৃষ্টি পড়ার কথা নয়। আনন্দ ফিসফিসিয়ে বলল, 'আর একটু লক্ষ্য করা যাক।'

আটজনের দলটা প্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওপাশ থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠতেই ওরা থমকে দাঁড়াল। কুকুরটাকে শান্ত হবার সময় দিল। তারপর দলটা দুটো ভাগে দু পাশ দিয়ে এগোতে লাগল। একটা ভাগ চলল

কাহ্ননের মন্দিরের দিকে আর একটা গ্রামের ভেতরে। ওরা যখন আর দু'জনের সীমায় রইল না তখন আনন্দ বলল, 'মনে হচ্ছে পাশের গ্রামের মানুষ। পালদেম এদের কথাই বলছিল। এরা তাপল্যাঙের কোন ক্ষতি করতে এসেছে। গ্রামের লোকদের সতর্ক করে দিতে হবে। চল।'

জয়িতা বলল, 'দাঁড়া। তাড়াহুড়া করিস না। আগে দেখা যাক ওরা কি করে।'

আনন্দ প্রতিবাদ করল, 'না। তারপর সামলানো যাবে না।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'যাবে। আমার কাছে রিভলভার আছে।'

আনন্দ এই পরিবেশেও হতভম্ব হয়ে গেল। 'এতদিন বলিসনি কেন?'

জয়িতা বলল, 'বলার কোন কারণ ঘটেনি তাই। এবার এগিয়ে চল।'

হাঁটা শুরু করতে আনন্দ ওর দিকে বারংবার তাকাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, 'তোরটা পালদেম নিয়ে যেতে পারেনি?'

জয়িতা বলল, 'পারলে আমার কাছে থাকত কি করে।'

ঠিক এই সময় একই সঙ্গে দু'জায়গায় চিৎকার শুরু হল। মন্দিরের চিৎকার থেকে গেল আচমকা। আর গ্রামের ভেতর থেকে দুটো মানুষ একটা শরীরকে কাঁধে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। মন্দির থেকেও চারটে লোক নেমে এল। সেই চিৎকার চেষ্টামেচি এবার সমস্ত তাপল্যাঙে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে ঘর ছেড়ে।

কিন্তু মাঝরাতে ঘুম আচমকা ভেঙ্গে যাওয়ার, হাওয়ার দাপট এবং শীতের প্রাবল্যে মানুষগুলো সচল হবার অনেক আগেই আটটা লোক কাজ সেরে দূরত্ব বাড়িয়েছিল। কি ঘটনা ঘটেছে তাই নিয়ে যখন বোঝাবুঝির পাল্লা চলেছে তখন কয়েকজন ভেঙে আসছিল লোকগুলোকে ধরতে। কিন্তু তারা নিরস্ত্র সশস্ত্র হানাদারদের সামনে এসে আর এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। ঠিক তখন পাহাড়ের ওপাশে যে পথ দিয়ে হানাদাররা ঢুকেছিল সেখানে ঢাক জাতীয় বাজনা বেজে উঠল। বোঝা গেল হানাদাররা একা নয়, তাদের মদত দেবার জন্যে আরও অনেকে অপেক্ষা করছে। নিজেদের লোক কাজ হাসিল করে ফিরে আসছে দেখে তারা যে উল্লাসিত সেটা চিৎকারে বোঝা গেল। আনন্দ বলল, 'আমরা পালদেমদের সাহায্য করব জয়ী। ওদের কোন দামী জিনিস চুরি যাচ্ছে। তুই আমাকে রিভলভারটা দে। গুলি আছে তো ওতে?'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর ছুটে গেল খোলা জায়গায় যে পথ দিয়ে আটটা লোক এখন এক হয়ে ছুটে আসছে। প্রথম যে লোকটা ওদের লক্ষ্য করল সে চিৎকার করে উঠতেই দলের বাকীরা এইদিকে তাকাল। ওরা কাউকে কাঁধে ঝুগিয়ে আনছিল। একজনের দুটো হাত বৃকের পর। বাকি পাঁচজন অস্ত্র ঘুরিয়ে এদের পাহারা দিতে দিতে এগিয়ে আসছিল। এই সময় দূর থেকে সুদীপের চিৎকার শুনে এল, 'জয়ী সরে যা।'

জয়িতা একবার মুখ ঘুরিয়েই ফিরিয়ে নিল। সুদীপ তাদের আস্তানার সামনে

এসে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ চিৎকার করল সেই সময়ে। তার গলার স্বরে হানাদারেরা এবার থমকালো। ওদের হাতের অস্ত্র বলতে যা দেখা গেল তা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ব্যবহার করা হত। দুটি নিরীহ মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে মনে করায় ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে তেড়ে এল সেই অস্ত্র উঁচিয়ে। জয়িতা তখন শূন্যে গুলি ছুঁড়ল।

হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা বহুগুণ বেড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো থমকে গেল। পেছনে পাহাড়ের উল্লাসও থেমে গেল। ততক্ষণে সুদীপ ছুটে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জয়িতার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু বকতে গেল কিন্তু জয়িতা তাকে হাত নেড়ে নিষেধ করল। হানাদাররা সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে উল্টো পথ ধরার চেষ্টা করছিল কিন্তু জয়িতা দ্বিতীয়বার গুলি করতে তারা থেমে গেল। গুলিটা লেগেছে সামনে দাঁড়ানো হানাদারটির পায়ের কাছে মাটিতে। কিছুটা মাটি তার ফলে ছিটকে উঠেছে। ওরা ব্যাপারটা বোঝার পর যেন পাথর হয়ে গেল।

জয়িতা যে উত্তেজিত এবং অত্যন্ত নার্ভাস তা তার গলার স্বরে বোঝা গেল, ‘পালদেমকে ডাক।’ তার হাত সামনে প্রসারিত, কালো রিভলভারটা সামান্য কাঁপছে সেই হাতে। দু দুবার শব্দ হওয়ার পর হানাদাররা এখন পাথরের মত চুপচাপ। সম্ভবত এ জীবনে তারা এমন শব্দ শোনেনি। দুই থেকে তিনে দাঁড়ানো অন্য চেহারার মানুষরা যে শব্দ করছে তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় ওরা কি করবে বুঝতে পারছিল না। শুধু হানাদার নয়, দূরে দাঁড়ানো তাপাল্যাণ্ডের মানুষরাও শব্দ শোনার পর বোবা হয়ে গিয়েছিল। এই কদিন যাদের তারা সাধারণ চোখে দেখেছে প্রতিদিন লক্ষ্য রেখেছে যাতে না পালিয়ে যায় তাদের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে যে অন্ধ ছিল তা স্পষ্ট হওয়ার তারাও চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এই সময় সুদীপ চিৎকার করল ‘পা-ল-দে-ম’। তার সঙ্গে গলা মেলান আনন্দ। আর এই চিৎকারটা হওয়ামাত্র যার দুটো হাত বুকের ওপর সে আচমকা দৌড়তে শুরু করল। জয়িতা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর লোকটার পা লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু তার হাত কাঁপছে। গুলি সম্ভবত সাত হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল। মরীয়া হয়ে সে দ্বিতীয়বার গুলি করা মাত্র লোকটা আছাড় খেয়ে পড়ল। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। শুধু গুলির শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার পরেও কানে সঁটে আছে। এবার জয়িতা নিজেই চিৎকার করল, ‘পা-ল-দে-ম’!

তারপরে সেই মৃতিটাকে পেছনের ভিড় ছেড়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। খুব ভীরু পালিয়ে আসছে পালদেম। যেন তার আসার মোটেই ইচ্ছে নেই। হানাদারদের দলটাকে অনেকটা এড়িয়ে খানিকটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। জয়িতা তাকে বলল, ‘লোকগুলোকে মাটিতে বসে পড়তে বল।’ পালদেম সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গলা তুলে হুকুমটা জানিয়ে দিতেই পাঁচজন পুতুলের মত মাটিতে বসে পড়ল। তাদের ভূতগ্রস্তর মত দেখাচ্ছিল। কাঁধে মানুষ নিয়ে যে লোক

দুটো দাঁড়িয়েছিল তারা সময় নিল। যাকে ওরা কাঁধে তুলেছিল তার মুখ বাঁধা। কিন্তু হাত পাখোলা। তা সত্ত্বেও এই সময় পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ করেনি। মাটিতে নামিয়ে দেওয়ার পর মেয়েটি সোজা হয়ে বসল খানিকটা তফাতে। সাতজন লোক তখন বসে দূরে পড়ে থাকা লোকটিকে দেখছে। সম্ভবত শব্দের ক্ষমতা চাক্ষুষ করে আরও কাঁহিল হয়ে পড়েছে তারা। জন্মিতা পালদেমের সামনে এগিয়ে গেল, 'আমরা তোমাদের বন্ধু। এরা এই গ্রামে কি করতে এসেছিল?'

পালদেম বলল, 'ওরা আমাদের দেবতার মূর্তি চুরি করেছে। ওই যে লোকটা মাটিতে পড়ে আছে ওর কাছে আছে মূর্তি। আর এরা ওই মেয়েটাকে নিয়ে যেতে এসেছিল।'

জন্মিতা জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কারা?'

'পাশের পাহাড়ে ওদের গ্রাম। আমাদের শত্রু। বহু বছর ধরে ওদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া। আমাদের দেবতার ওপর ওদের খুব লোভ। আমাদের মেয়েদের ওপরেও। আমরা ফসল তুললে ওরা হানা দেয়। সাধারণত ওরা এ সব করে বরফ পড়লে। এবার ওরা আগেই সাহস দেখাল।' কথা বলতে বলতে এতক্ষণে পালদেমকে উত্তেজিত দেখান।

জন্মিতা বলল, 'তুমি কি চাও আমরা তোমাদের ওদের হাত থেকে বাঁচাই?'

'হ্যাঁ। আমি গ্রামের লোকদের বলছি ওদের বেঁধে ফেলতে।'

'না। তুমি আমাদের বন্ধু বলে ভাবতে পারোনি। অথচ তোমাদের আবার বলছি, আমরা বন্ধু বলেই মনে করি। তুমি চোরের মত আমাদের সমস্ত অস্ত্র চুরি করেছিলে কিন্তু এটা পারোনি। আর পারোনি বলেই আজ তোমাদের দেবতা এবং গ্রামের মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম। আমি চাই এখনই তুমি আমাদের অস্ত্রগুলো ফেরত দেবে। যাও, চটপট কাজ করো।'

পালদেম হাঁ হয়ে তাকিয়েছিল।

জন্মিতা চিৎকার করল, 'তোমার একার বোকামির জন্যে গ্রামের সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমি চাই না। এই ছোট্ট অস্ত্র দিয়ে আমরা বেশীক্ষণ লড়তে পারব না। আমি যা বলছি তা প্রত্যেকের ভালোর জন্যই বলছি। সুদীপ ওর সঙ্গে যা।'

সুদীপ এগিয়ে যেতেই পালদেমকে নড়তেই হল। ওরা যাচ্ছে ঝরনার দিকে। দৃশ্যটা এখন এই রকম। লোকগুলো এবং মেয়েটি বসে আছে নির্বাক হয়ে। গ্রামের মানুষগুলো দূরে দাঁড়িয়ে। পিছনে উল্লাস নেই। হাওয়া বইছে। কিন্তু শীত যে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে তা কারো খেয়ালে নেই। আনন্দ এগিয়ে গেল দূরে পড়ে থাকা লোকটার কাছে। পাশে দাঁড়িয়েই সে বুঝতে পারল লোকটা মরেনি। ওর শরীর কাঁপছে। এমন কি রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সে লোকটাকে টেনে তুলতেই কোন রকমে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। গুলি তার গায়ে লাগেনি

কিন্তু ভয়ে লোকটা কুঁকড়ে উঠেছে। ওর দুটো হাতে দেবতার সেই মূর্তিটা। সন্তর্পণে সেটি তুলে নিয়ে আনন্দ চিৎকার করল, ‘কাহন কাহন’। জনতার মাঝখান থেকে কাহন তার শিষ্য সমেত বেরিয়ে এলেন। তাঁকেও খুব নাভাস মনে হচ্ছিল। আনন্দ তাঁর হাতে মূর্তি দিতে তিনি আশীর্বাদ করলেন। গ্রামের মানুষরা তখন খুশীতে চিৎকার করে উঠল। আনন্দ কাহনকে বোঝাতে পারল এই লোকগুলোকে বেঁধে ফেলতে হবে, এখনই কাহন, সেই নির্দেশটা দেওয়ামাত্র কাজ শেষ হয়ে গেল।

আনন্দ এগিয়ে এল জয়িতার কাছে, ‘দু দুটো গুলি ছুঁড়েছিস কিন্তু একটাও গায়ে লাগেনি। প্লিজ একথা বলিস না যে তুই ইচ্ছে করে গুলি গায়ে লাগাসনি।’ জয়িতা হেঁচকি কামড়ালো, ‘গুলি ছোঁড়ায় আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু এই লোক-গুলোকে তুই বাঁধতে বললি কেন? এদের শাস্তি দিলে দুই গ্রামের শত্রুতা কোনদিন মিটবে না।’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘ঠিক বলেছিস, তাহলে কি করা যায়?’

সেই সময় সুদীপ আর পালদেম ফিরে এল। সুদীপের হাতে একটা বড় টুকরি। কাছে এসে বলল, ‘মালগুলো ঠিক আছে কিনা কে জানে। পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রেখেছিল। মেয়েটা কে? ওকে বেঁধেছে কেন? ওতো এই গ্রামের মেয়ে।’

পালদেম মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ তার পাশে গিয়ে বসল, ‘ভুল বুঝো না, আমরা কোন শত্রুতা করব না। কিন্তু এগুলো তোমাদের উপকারেই লাগবে।’

পালদেম মাথা নাড়ল কিন্তু সহজ হল না। জয়িতা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘ওই মেয়েটিকে বেঁধেছ কেন? ওকে তো এরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল।’

‘এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ওকে ওই গ্রাম চায়। কিন্তু আমরা ওখানে মেয়ে দেব না। ওকে ওরা মুখ বেঁধেছিল কিন্তু হাত পা বাঁধেনি। তবু ওরা যখন নিয়ে আসছিল তখন ও কোন প্রতিবাদ করেনি। দোষ আছে ওর। ওর শাস্তি ভয়ানক।’

‘ভয়ানক কেন?’

‘ও বেইমানি করেছে। ওর স্বামী নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। স্বভাব মন্দ। ও অন্য গ্রামে গেলে ওর জমি নিয়ে যাবে। এ হতে পারে না।’

‘কেন? গ্রামের কোন ছেলে ওকে বিয়ে করবে না?’

‘না। কেউ যেচে নিজের সর্বনাশ করতে চায় না।’

জয়িতা বলল, ‘ঠিক আছে, এখন কোন শাস্তি দিও না। এই দলের মধ্যে কে নেতা তা ওদের জিজ্ঞাসা করো তো!’

পালদেম বলল, ‘ওই যে ডানদিকের সবচেয়ে বড় চেহারার লোকটা ওই নেতা।’

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘ও কি তোমাদের ভাষায় কথা বলে?’

‘হাঁ। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত গোঁয়ার।’

জয়িতা এগিয়ে গেল লোকটার সামনে। লোকটা মাথা নামিয়ে বসেছিল। জয়িতা সামনে এসে দাঁড়াতে চোখ তুলে তাকাল। লোকটার বয়স তিরিশের নিচে। স্বাস্থ্য যে কোন পাহাড়িদের চেয়ে ভাল। নাক বেশ উঁচু। চোয়াল শক্ত হল লোকটার। চোখাচোখি হতেই চোখের দৃষ্টি পাল্টানো। লোকটা সত্যিই গোঁয়ার।

জয়িতা তার অল্প জানা শব্দ ব্যবহার করল, ‘তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। পালদেম এর বাঁধন খুলে দাও। তুমি আমার সঙ্গে এদিকে এস।’

বন্ধুদের উপেক্ষা করে সে সোজা আস্তানার দিকে হাঁটিতে লাগল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল পালদেম বাঁধন খুলে দেবার পরও লোকটা নড়ছে না। সে আস্তানার সিঁড়িতে বসে তাকাল। মেঘ সরছে। চলে পড়া চাঁদের শরীর থেকে একটু একটু করে জ্যোৎস্না বের হচ্ছে। দূরের লোকগুলোকে বাপসা দেখাচ্ছে এখান থেকে। এবং সেই বাপসা অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটি সুগঠিত মানুষ ধীরে ধীরে আসছে তার দিকে।

লোকটি সামনে এসে দুটো পা ঝষৎ ফাঁক করে দাঁড়াল। তার ভঙ্গীতে এখনও স্বাভাবিকতা আসেনি কিন্তু ধীরে ধীরে যে স্বভাব ফিরে পাচ্ছে তা বোঝা যায়। লোকটা অবশ্যই জেদী। ওর তাকানো, শরীর দেখলে এমনি সময় কথা বলতে সাহস পেত না জয়িতা। কিন্তু এখন ক্ষমতার চাবি তার হাতে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার নাম কি?’

লোকটির ঠোঁট একবার কুঁচকে উঠল। তারপর চোখ না সরিয়ে জবাব দিল, ‘রোলেন।’

জয়িতা একটু অবাধ হল। নামটার মধ্যে বিদেশী বিদেশী গন্ধ। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমরা এখানে চুরিডাকাতি করতে এসেছ কেন?’

রোলেন কোন জবাব দিল না। বুনো গুয়োরের মত মাটিতে পা ঘষল।

জয়িতা সেটা লক্ষ্য করে বলল, ‘তাপল্যাণ্ডের দেবতাকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?’

‘এরা গতবার আমাদের ফসল লুট করে নিয়ে এসেছিল। ওই দেবতাই ওদের সৌভাগ্যের প্রতীক।’

‘তোমরা দুই গ্রামের মানুষ একই ভাষায় কথা বল, পাশাপাশি থাকো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ কি? তোমরা কেউই আরামে থাকো না।’ জয়িতার নিজের কাছেই কথাগুলো জ্ঞান জ্ঞান শোনালো।

রোলেন হাসল। ছোট চোখ গোল মুখ সন্তোষ হাসিটা বেশ মোলায়েম। বলল, ‘ওরা এখন বড়লোক। টাকা দিয়ে খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে জিনিস কেনে। তোমরা ওদের বড়লোক করে দিয়েছ। বরফ পড়লে আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়।’

জয়িতা বুঝলো এরা সব খবর রাখে। অথচ দুই গ্রামের মধ্যে মুখ দেখাদেখি

সম্পর্ক নেই। সে বলল, 'আমাদের কাছে তাপল্যাণ্ডের মানুষও যা তোমরাও তাই। আমরা চাই পাহাড়ের মানুষ সুখে থাকুক। তোমাকে একটা অনুরোধ করব, রাখবে?'

'কি অনুরোধ?'

'এখন কিছুদিন তোমরা এই গ্রামে হামলা করো না। তোমাদের মোড়ল কে?'

'কাহনের কথা আমরা শুনি।'

'বেশ, তোমাদের কাহনকে আমাদের কথা বল। আমরা তোমাদের গ্রামেও যেতে পারি। এই গ্রামের মানুষ যে সব সুবিধে পাবে তোমরাও তাই পাবে। শুধু তার বদলে আমাদের কথা শুনতে হবে। রাজী?'

রোলেন কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমরা ভেবে দেখব।'

'ওই মেয়েটাকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'ওর শরীরে ভাল বাচ্চা হবে। ওর স্বামীর বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না।'

কিন্তু আমাদের গ্রামে স্বাস্থ্যবান মানুষ আছে। তা ছাড়া গ্রামে বাচ্চারও অভাব।'

'তোমাদের সঙ্গে যেতে ওর ইচ্ছে আছে?'

'তাই তো মনে হয়।'

'কিন্তু ওকে নিয়ে গেলে ওর জমিও তো তোমরা দাবী করবে!'

'তা তো করবই।'

'আপাতত ওকে এখানে রেখে যাও। তোমরা সবাই যেতে পারো এখন। কিন্তু মনে রেখো এখানে আর হামলা নয়। আমরা তোমাদের সঙ্গে ঝামেলা করতে চাই না। তোমরা তোমাদের গ্রামে ফিরে যাও।'

জয়িতার কথাগুলো লোকটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা আমাদের শান্তি দেবে না?'

'না। ওরা ফসল চুরি করেছিল বলেই তোমরা এসেছিলে। শোধবোধ হয়ে গেছে।'

লোকটা একবার আকাশে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল সঙ্গীদের দিকে। সঙ্গীরা কথা শুনে চৌঁচিয়ে উঠল। জয়িতার নির্দেশে পালদেম ওদের বন্ধন মুক্ত করে দিলে ওরা পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি বসেছিল চুপচাপ। জয়িতা তাকে বলল, 'তুমি ঘরে ফিরে যাও।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না, আমি ঘরে যাব না।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'জানি না। গ্রামের কোন পুরুষ আমাকে নেবে না। ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তোমরা বাধা দিলে কেন? আমি এখন কি করব!'' কেঁদে ফেলল মেয়েটি। জয়িতা ওর কাঁধে হাত রাখল। 'তুমি একজন মানুষ। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।'

ছিঁটতে সরে গেল মেয়েটি। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আমি একটা

মেয়ে । জীবনে যদি একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষ না পেলাম তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কি !’

॥ ৪০ ॥

জয়িতা হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল । তার মনে হল সে বোধ হয় সব কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছে না । কোন মেয়ে প্রকাশ্যে এই রকম আকাঙ্ক্ষা নির্লজ্জ ভঙ্গীতে জানাতে পারে ? আনন্দ এবং সুদীপ এগিয়ে এসেছিল । গ্রামের লোকরাও ভিড় করে দাঁড়িয়েছে এখন । বন্দীদের ছেড়ে দেওয়াতে ওদের মুখে স্পষ্টতই অসন্তোষ । কিন্তু এখন এই যুবতীকে নিয়ে কি করা যায় সেটাও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে । আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘ও কি বলছে রে ? ওরা কি ওকে অসম্মান করেছে ।’

জয়িতা কোন উত্তর দিল না । ওর শরীর যিন যিন করছিল । মেয়েটাকে তার হঠাৎ খুব কুৎসিত বলে মনে হল । যেন একটা আকাঙ্ক্ষা ওর সমস্ত সৌন্দর্যের ওপর কাঁদা ছড়িয়ে দিয়েছে । সে কোনরকমে জিজ্ঞাসা করতে পারল, ‘তোমার এমন কথা বলতে লজ্জা করছে না ?’

‘লজ্জা করবে কেন ? আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি ? আমি কি তোমার মত মেয়ে হলেও ছেলে সঙ্গে থাকি ?’ প্রশ্নটা স্বাভাবিক গলায় নয় ।

ওর ভীর্ণ কণ্ঠ যেন সমস্ত চরাচরে ছড়িয়ে পড়ল । আর সেটা কানে যাওয়া মাত্র জয়িতার শরীরে যেন হিমালয়ের বাতাস ঢুকে পড়ল । তার কাঁপুনি এল । কোনরকমে পালদেমের দিকে তাকিয়ে সে বলতে পারল, ‘একে তোমরা বোঝাও ।’

তারপর যেন শীতলতা অতিক্রম করতেই সে জোরে জোরে পা চালাল । সুদীপ এবং আনন্দ তো বটেই, গ্রামের তাবৎ মানুষ অবাঁক হয়ে ওর যাওয়াটা দেখল । এই যাওয়াটা যে স্বাভাবিক নয় তা প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট কিন্তু কারণটা নিয়ে কেউ একমত হতে পারত না । আনন্দ দেখল জয়িতা তাদের আস্তানার ভেতরে ঢুকে গেল । সে পালদেমকে বলল, ‘অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার তোমরা গুয়ে পড় ।’

পালদেম এগিয়ে গেল গ্রামবাসীদের কাছে । ওরা নিচু গলায় কথা বলল কিছুটা সময় । তারপর পালদেম ফিরে এসে বলল, ‘ওদের ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজ করা হয়নি । আমাদের ভয় হচ্ছে ওরা আবার আক্রমণ করতে পারে চোরের মত । এখন আর সামনা-সামনি আসবে না তোমাদের জন্যে । তাছাড়া ওরা আমাদের দেবতাকে নোংরা হাতে স্পর্শ করেছে । এই অন্যান্যের জন্যেও ওদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল ।’

আনন্দ বলল, ‘শাস্তি দিলে অপরাধ আরও বেড়ে যেত । তোমরা নিশ্চয়ই চাও শাস্তিতে বসবাস করতে । ওরা যদি আবার আক্রমণ করে তাহলে আমরা কোন দয়া দেখাবো না । আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখো তোমরা ।’

পালদেম তার গ্রামবাসীদের এই কথা জানালে তারা ধীরে ধীরে ঘরে ফিরতে লাগল। এখন আকাশে চমৎকার জ্যোৎস্না। ও-পাশে পাহাড়ের গায়ে ঘেন রূপোর ঢল নেমেছে। আনন্দরা দাঁড়িয়েছিল। দেখা গেল সমস্ত মানুষ চলে যাওয়ার পরেও মেয়েটি মাটি থেকে ওঠেনি। দুটো হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে চুপচাপ বসে আছে। সুদীপ তাকে ডাকল, 'এই যে, তুমি এখানে বসে আছ কেন?'

মেয়েটি কোন জবাব দিল না। তার বসার ভঙ্গীতে এক ধরনের অসহায়তা থেকে উদ্ভূত জেদ প্রকট হচ্ছিল। সুদীপ চিৎকার করে পালদেমকে ডাকল। পালদেম ফিরে যাচ্ছিল। বন্দী মুক্তির কারণে সে যে সন্তুষ্ট নয় তা বোঝা যাচ্ছিল। ডাক শুনে সে পেছনে ফিরে তাকাল। সুদীপ চিৎকার করে বলল, 'এই মেয়েটা যে এখানে পড়ে রইল।'

পালদেম নিরাসক্ত গলায় বলল, 'তাতে আমার কি?'

হঠাৎ মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'আমার কি, আমার কি!'

সুদীপ চাপা গলায় আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'পাগল হয়ে গেল না কি? তার-পর পালদেমকে ইশারায় ডাকল। নিতান্ত বাধ্য হয়েই পালদেম ফিরে এল। সুদীপ বলল, 'একে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

পালদেম বলল, 'কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামের লোকের খারণা ওর প্রশ্ন না পেলে ওরা এখানে আসতো না।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'খারণার প্রমাণ তো নেই।'

'প্রমাণ আছে। ওকে যখন ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তখন একটুও চিৎকার করেনি সাহায্যের জন্যে। তারপরেও তর হ'শ হয়নি জোকে অপমান করছে।' পালদেম জানাল।

'জো! সুদীপ অবাক হল, 'জো কে?'

'যে আমাদের সম্মান বাঁচাল। তোমাদের বন্ধু।'

সুদীপ এবার হো হো করে হেসে উঠল, 'বাঃ সুন্দর নাম দিয়েছ তো। জয়িতা থেকে জো।'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু পালদেম, এভাবে পড়ে থাকলে তো ও মরে যাবে ঠাণ্ডায়। তোমরা ওকে অন্য গ্রামে যেতও দেবে না, আবার গ্রামেও জায়গা দিতে চাইছ না, এটা কি রকম ব্যাপার?'

হঠাৎ পালদেম বলল, 'এটাই এই গ্রামের নিয়ম। ও থাকবে নিজের মত। ষতদিন গ্রামের কোন ছেলে ওকে বিয়ে না করছে ততদিন ও কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না। অবশ্য যেহেতু ও একবার সংসার করেছে তাই বিয়ে না করলেও কেউ যদি স্বীকৃতি দেয় তাহলেও একই কথা হবে। এসব ও জানে। তাই নিজে থেকে ফিরে যাচ্ছি ঘরে। আমি চলি।'

ওকে চলে যেতে দেখে আনন্দ মন্তব্য করল, 'ভাগ্যিস বলেনি এটা আমাদের গ্রামের ব্যাপার, তোমরা নাক গলিও না।'

সুদীপ বলল, 'এখন আর বলবে না। মালপত্তর হাতছাড়া হয়ে গেছে তো। কিন্তু একে নিয়ে কি করা যায়?'

আনন্দ কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটার সামনে দাঁড়াল, 'তুমি ঘরে ফিরে যাচ্ছে না কেন?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল। কিন্তু কিছু বলল না। আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওই গ্রামে যেতে চাও?'

মেয়েটা এবার মুখ তুলে তাকাল। এখন তার চোখে জল। ঠোঁট কাঁপছে। কোন রকমে বলল, 'ওরাও আর আমাকে নেবে না। আমি মরে যেতে চাই। আমার কেউ নেই, কেউ নেই।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে মরবে?'

মেয়েটা হাত তুলে দূরের পাহাড় দেখাল, 'ওই ওখান থেকে লাফিয়ে পড়ব।'

সুদীপ বলল, 'ওটা কালকে করলে হয় না? আজকের রাতটা একটু ভাল করে ঘুমিয়ে নাও।'

মেয়েটা এবার উঠে দাঁড়াল, 'আনাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ, না? ঠিক আছে, আমি মরে দেখাচ্ছি।' কথা শেষ করেই মেয়েটা পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল।

আনন্দ উত্তেজিত হল, 'সর্বনাশ, ও সত্যি সত্যি অত্যাহত্যা করতে যাচ্ছে সুদীপ' ইনস্যানিটি গ্রো করেছে। ওকে থামা। কেন যে ইয়ার্কি করিস।'

সুদীপ হকচকিয়ে গিয়েছিল। এবার সে-ও ছুটল। খানিকটা উঁচু পথ ভ্রামতেই তার হাঁফ ধরে গেল, কিন্তু এই নির্জন হিম জ্যোৎস্না রাত্রে একটা মেয়ে পৃথিবীতে আর থাকতে চাইছে না শুধু তার রসিকতার কারণে এই বোধ তাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটা কোনদিকে তাকাচ্ছে না। সুদীপ ক্রমশ দূরত্বটা কমিয়ে আনছিল। এই পথের শেষেই খাদ। সেখানে বাঁপিয়ে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রায় বাঁপিয়ে পড়ে সে মেয়েটির হাত ধরল। স্পর্শ পাওয়ামাত্র তীব্র চিৎকার করে মেয়েটি ঝটকা মারল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। সুদীপ প্রথমে টালমাটাল হল। মেয়েটির শরীরে ভাল শক্তি আছে। ওর নখের আঘাতে তার মূখ জ্বলছে। মুহূর্তের জন্যে আলগা হয়েছিল মেয়েটি। এবং সেই সুযোগে আবার ছুটতে চাইল। আক্রমণ, বিশেষত নখের জ্বালায় মাথায় আঙন জ্বলে গেল সুদীপের। সে প্রচণ্ড জোরে মেয়েটিকে আঘাত করল। মেয়েটি টলে গেল, তারপর হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল পাথরের ওপরে যেখান থেকে খাদের দূরত্ব খুব বেশী নয়। চাঁদের ত্রিক নিচে দাঁড়িয়ে সুদীপ নিজের মুখে হাত বোলাচ্ছিল। তার গালের চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরা এখনও বন্ধ হয়নি। শালা, মেয়েটার উপকার করতে গিয়ে এই হল। নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। সেই সময় আনন্দের গলা কানে এল, 'মেরে ফেললি নাকি? অত জোরে মারতে আছে?'

'জান দিস না। দ্যাখ, আমার মুখের কি অবস্থা করেছে। নেকড়ে মাইরি,

পাহাড়ি নেকড়ে।' সুদীপ ঝাঁপিয়ে উঠল।

আনন্দ ওর মুখের দিকে তাকাতে জ্যোৎস্নায় রক্ত দেখল। সে একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'চটপট ঘরে গিয়ে ডেটল লাগা। মানুষের নখের বিষ, তার ওপর!' সে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। ঝুঁকে দেখল ওর নিঃশ্বাস পড়ছে। কিন্তু চেতনা নেই। আঘাত বোধ হয় বেকায়দায় হয়ে গেছে। এখন যদি মেয়েটার কিছু হয় তাহলে গ্রামবাসীরা উল্টে তাদের দায়ী করবে। সুদীপটা এখানে আসার পর থেকে হচ্ছে বা অনিচ্ছায় একটার পর একটা ঝামেলা বাধাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দ উষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এটা কি করলি? এত জোরে কাউকে মারতে আছে? এ মেয়েটা মরে গেলে কি হবে?'

'ওতো মরতেই যাচ্ছিল।' সুদীপ এগিয়ে এল কাছে, 'ঠিক আছে তুই যা, আমি দেখছি।'

আনন্দ কাঁধ ঝাঁকাল। সে আর দাঁড়াল না। আর একটা নতুন ঝামেলা আসছে কিন্তু তার কিছু করার নেই। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'মেয়েটার জ্ঞান ফিরলে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে আসিস। রাত শেষ হতে চলল।'

সুদীপ কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটার মাথার পাশে একটা পাথরে বসল। এখন তার আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগছে। সে একরার ঘাড় ঘুরিয়ে আনন্দের চলে যাওয়া দেখল। একটু ঝুঁকে সে মেয়েটার গালে চড় মারতে লাগল আলতো করে, 'আয়ি আয়ি মেয়েটা, উঠে পড়।' বেশ খানিকটা চেঁচামেচির পর চোখ মেলল মেয়েটা। দু'টি স্বচ্ছ হাতেই সে আতঙ্কিত হয়ে গিয়ে অবাক হল। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে আলুল তুলে সে সুদীপের মুখটাকে দেখতে চাইল। সুদীপ হঠাৎ ওলটানো, 'এ তোমারই দান খুকী। এবার ঘরে যাও।'

বাংলায় বলার জন্যেই সম্ভবত মেয়েটা কিছু বুঝতে পারল না। সুদীপ এবার তাকে হাত ধরে দাঁড় করাল। উঠে দাঁড়িয়েই মেয়েটা আবার কান্না শুরু করল। একটু নাভাস গলায় সুদীপ তাকে বলল, 'শোন, আত্মহত্যা করা খুব কাজের ব্যাপার নয়। কার জন্যে নিজেকে মারছ? পৃথিবীটা কি ভাল, একে ছেড়ে যেতে হয়! ওই দ্যাখ, মাথার ওপর কি সুন্দর চাঁদ! তুমি একে আর দেখতে পাবে মরে গেলে? অবশ্য এখানে আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে আর খাদে ঝাঁপ দিতে হবে না, এমনিতেই পৃথিবী ছাড়তে হবে। তার চেয়ে আজ রাত্রে তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। চল।' এসব কথা সুদীপ বলছিল হিন্দীতেও নয়, কিন্তু মেয়েটা যেন তার অর্থ বুঝতে খুব চেষ্টা করছিল। এবং তার হাতের ইঙ্গিত বুঝে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। সুদীপ ওর কাঁধ ধরে টানতে মেয়েটা সম্মোহিতের মত হাঁটতে লাগল। পুরোটা পথ কেউ কোন কথা বলল না। গ্রামের ভেতর ঢুকে সুদীপ ভাসা শব্দ ব্যবহার করে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ঘরটা কোথায়?' মেয়েটা এবার চারপাশে তাকাল। তারপর একটা খোলা দরজা আলুল তুলে দেখাল। সেই দরজার কাছে ওকে

পৌছে নিয়ে সুদীপ ফিরল। যেন হঠাৎ বিরাট একটা বোঝা তার মাথা থেকে নেমে গেল। অত্যন্ত হালকা পায়ে সে চাঁদ মাথায় নিয়ে হাঁটতে চোখ তুলল ওপরে। তারপর স্মৃতি থেকে শব্দ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল, 'এইখানে/পৃথিবীর এই ক্রান্ত এ অশান্ত কিনারায় দেশে/এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে। তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই/তাদের হৃদয়ে কোন সভাপতি নেই, শরীর বিবশ হলে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের/কংগ্রেসের মত কোনো আশা হতাশার কোলাহল নেই।'

আস্তানায় ফিরে এসে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আনন্দ প্রায় চিৎকার করে বলছে, 'তোদের জন্যে আমি পাগল হয়ে যাব জয়িতা। একজন দাজিলিং-এ গেল তো গেলই। আর একজন এমনভাবে মেয়েটাকে মেরেছে যে মরে গেলে আর দেখতে হবে না। তারপরে তুই-ও-!'

'আমি কি?' জয়িতার গলা তীক্ষ্ণ, 'আমি তোর কি অসুবিধে ঘটানাম?'

'এই ঠাণ্ডায় তুই আমাকে বাইরে যেতে বললি। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করতে নিজেই যাচ্ছি। ব্যাপারটা কি তা জানবার প্রয়োজন বোধ করছি না। হঠাৎ যে কি খামখেয়ালিপনা শুরু হল সবার!'

'তুই অমথা উল্টোপাল্টা ভাবছিস।'

'অমথা? ও। তোর যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন থাকে সেটা বলতে পারতিস। প্রশ্ন করলে যা হোক জবাব দিলে কি হয়? উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং হেয়ার। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হোক চাই না।'

'শ্রিক আছে। আমি নিজে কিভাবে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তুই ভুলে গেছিস আমি একটা মেয়ে। আই অ্যাম হ্যাভিং মাই পিরিওড্। এই ঘরে সবার সামনে—!' জয়িতার গলাটা খেমে গেল।

'যাচ্লে! এটা নিয়ে এত ভাবনা করার কি আছে! এতক্ষণ বলতে কি হচ্ছিল! তোর না এখনও এইটিন সেঞ্চুরিতে থেকে গেলি। এটা অন্তত তোর কাছে আশা করিনি।'

'তুই এমন গলায় বলছিস যেন আমার হাত কেটে গেছে!'

'তার বেশী কি! শোন, ওই ব্যাগটা এখানে আনার পর খোলা হয়নি। ওটা তোর প্রয়োজনে লাগবে। আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'কি আছে ওতে?'

'তোার প্রয়োজনীয় জিনিস।'

'মাই গড! তুই এসব এনেছিস? কখন আনলি?'

আনন্দের গলা শোনা গেল না। কিন্তু দরজা খোলার শব্দ হল। জয়িতার চিৎকার কানে এল, 'আনন্দ, তুই খুব ভাল, খুব। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।'

আনন্দকে দেখা গেল! 'থাক আর ন্যাকামো করতে হবে না। ছেলে বলেই ভেবে এসেছিস এতদিন, বন্ধু বলে নিতে পারিসনি!' তারপরেই আনন্দ সুদীপকে

দেখতে পেল। সুদীপ চুপচাপ সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়েছিস?'

সুদীপ নীরবে ঘাড় নাড়ল। আনন্দ এগিয়ে এল, 'এই নে, আচ্ছা দাঁড়া, মুখ তোল, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।' সুদীপ দেখল আনন্দের হাতে ডেটল আর তুলো। সে ঠোঁট কামড়ালো। হঠাৎ তার শরীর সমস্ত জলকণা বুকের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। প্রাণপণে নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করছিল সে। আনন্দ ডেটলে ভেজানো তুলো মুখে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁদছিস! এত জ্বলছে?' সুদীপ কোন কথা বলল না। অনেক কণ্টে সে নিজেকে অতিক্রম করতে পারল। তারপর ছাউনির তলায় পা ভাঁজ করে বসল। আনন্দ বসতে বসতে বলল, 'বা ঠাণ্ডা, আমার স্কিন ডিজিজ না হয়ে যায়! নাক-টাক সবার ফেটে গেছে।'

সুদীপ কিছু বলল না। ওর কথা বলতে খুব ভয় হচ্ছিল। জ্যোৎস্না ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আসছে। চাঁদের যেন আর সে তেজ নেই। সুদীপ লক্ষ্য করল আনন্দ জয়িতার ব্যাপারটা বলল না। একই বয়সী, অথচ এই মুহূর্তে সুদীপের মনে হল আনন্দ অনেক এগিয়ে আছে। সে এইভাবে কথা বলতে পারত না জয়িতার সঙ্গে।

আনন্দ বলল, 'আর ক'দিনের মধ্যে বরফ পড়বে। আমরা তো কেউ কখনও বরফের মধ্যে থাকিনি। বই-পড়া বিদ্যেগুলো কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু এ বছর খুব দেরি হয়ে গেলেও, এর মধ্যে বৃষ্টি, মতটা পারি গুছিয়ে নিতে হবে যাতে লোকগুলো বরফের সময় কিছুটা আরাম পায়।' সে যেন কিছু ভাবছিল, 'সুদীপ, কাল তুই একটা কাজ করিস। এই গ্রামে ঠিক কটা পরিবার আর পরিবার পিছু মানুষের সংখ্যা কাউন্ট করে নিস। সেই বৃষ্টি আমাদের একটা হিসাব করতে হবে। এই গ্রামটার চেহারা একদিন পাল্টে দিতে হবে সুদীপ। প্রত্যেকটা মানুষ যেন বৃষ্টিতে পারে সে জন্মেছে শুধু মরে যাওয়ার জন্য নয়।'

আনন্দের স্বরে উত্তেজনা ছিল। সুদীপ ওর দিকে তাকাল। আনন্দের বাবা নকশাল রাজনীতি করতেন। আনন্দ একদিন বলেছিল ওর প্রপিতামহ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের শরিক ছিলেন, জেলও খেটেছেন। ওর রক্তে অনেক বিশ্বাস অবিশ্বাস মেলামেশি হয়ে নিজস্ব চেহারা তৈরি করে নিয়েছে। গোটা ভারতবর্ষের চেহারা ফেরানোর কথা অনেকেই ভাবে। কিন্তু সেটা ভাবনার পর্যায়ে থেকে যায়। বৃজেন্সাদেব বাঁচার তাগিদে যারা আঁতাত করে তাদের ওরা গালাগাল দিয়ে থাকে। তত্ত্বের বাঁধা পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই সংশোধনবাদের গালাগালি কপালে জোটে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে বিপ্লবটাকে দেখিয়ে দেয় না। নিজের নিজের নিরাপদ রুতে বাস করে কম্যুনিজমের তত্ত্বটাকে কপচে যাওয়ার মধ্যে একটা বিপ্লবী চরিত্র প্রকাশ করাই এদের একমাত্র মুক্তি। এখ সব চিন্তা শুধু রোবট তৈরী করার বিশ্বাসী,

মানুষ সৃষ্টিতে নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে আনন্দ তারপর তারা অবশ্যই ব্যতিক্রম। এই দেশে ব্যক্তি হত্যা বা অস্ত্র ব্যবহার করে কখনও বিপ্লব আসবে না। বিপ্লব আসতে পারে ভালবাসা যদি প্লাবনের মত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। একটা গ্রাম, একেকটা গ্রাম, সেই গ্রামগুলোর সমষ্টি একটা জেলা, সেই জেলাগুলোর সমষ্টি একটা প্রদেশ এবং প্রদেশগুলো একত্রিত হয়ে গেলে পুরো একটা দেশ যখন একসঙ্গে হাত মেলাবে তখনই বিপ্লব। এই গ্রামে কোন মধ্যবিত্ত নেই। উচ্চবিত্ত থাকার প্রসঙ্গই উঠে না। অনেক মানুষ আছে এইখানে। ‘স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝরে/এরা তবু মৃত নয়।’ জীবনানন্দের লাইনগুলো গুন-গুন করল সে আনমনে।

সেটা কানে যাওয়া মাত্র আনন্দ মুখ ফেরাল, ‘বাঃ। একটা পদ্য বল তো।’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘না। কবিতার কথা মনে হলেই উল্টো-পাল্টা লাইন মাথায় আসছে। তুই বল।’

আনন্দ মাথা নাড়ল। তারপর দরাজ হল, ‘তোমাকে দেখার মত চোখ নেই তবু/গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই তুমি/আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।/কোথাও শান্তনা নেই পৃথিবীতে আজ/বহুদিন থেকে শান্তি নেই—’ কে আসছে।

শেষ শব্দ দুটো যেন কবিতারই মনে হয়েছিল সুদীপের। চোখ তুলতে দেখল মার্চ ভেঙ্গে উঠে আসছে কেউ। এত রাত্রি, বলা যায় রাত শেষের রাত্রি, ওই রকম ক্লান্ত পায়ে কে আসে? সুদীপ বলল, ‘বুঝতে পারছি না।’

পেছন থেকে জয়িতার গলা ভেসে এল, ‘থামলি কেন আনন্দ?’

ওরা মুখ ফিরিয়ে দেখল, জয়িতা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। মৃত জ্যেৎস্নায় তাকে যেন অশরীরী বলে মনে হচ্ছে। আনন্দ বলল, ‘কেউ আসছে। কল্যাণ নয় তো!’

সুদীপ বলল, ‘দূর। ওই হাঁটা ছেনেদের হতেই পারে না।’

জয়িতা টিপ্পনি কাটল, ‘আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা-বিশেষজ্ঞ আছে।’

সুদীপ মাথা নাড়ল, ‘বাংলাও বলতে পারিস না? ওই শব্দটার মানেও জানিস না।’

এই সময় মেয়েটিকে ওরা দেখতে পেল। সুদীপ বলে উঠল, ‘একি রে। এ যে আবার ফিরে এল।’

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুই কেসটা দ্যাখ তো।’

জয়িতা এগিয়ে এল বারান্দার কোণায়। মেয়েটি ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘আমি ও ঘরে একা থাকতে পারব না।’

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘কেন? তোর সঙ্গে কে থাকত এতদিন?’

মেয়েটা উত্তর দিল না কথাটার। গৌজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জয়িতা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গে এতদিন কে ছিল বললি না, কিন্তু কেন থাকতে পারবি না সেটা বল।'

'আমার ভয় করছে।'

'ভয়! কেন ভয় করছে? তুই তো বেশ ওদের সঙ্গে চলে যাচ্ছিলি না!'

'সেই জন্যেই তো ভয় করছে। গেলামও না, আবার গ্রামের কোন পুরুষও আমার কাছে এখন ঘেঁষবে না। এই সুযোগে দানোটা পাহাড় থেকে নেমে আসবে। দানো যে মেয়ের ওপর—'

'দানোটা কে?'

'পাহাড়ে রাত হলে কেঁদে কেঁদে ডাকে, শোননি তোমরা?'

'তাহলে তুই কি চাস?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। এখানে।'

হঠাৎ জয়িতার গলা শীতল হল, 'না। তোমার এখানে থাকা চলবে না। ঠিক আছে, তোমার যদি ওখানে একা গুতে ভয় করে তাহলে আমি থাকব তোমার সঙ্গে। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তার ভয়ে তোমার দানোর বাবাও কাছে আসবে না।' তারপর আনন্দের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যদি ওর ঘরে থাকি তোদের অপত্তি আছে?'

'উইদ প্রেজার।' সুদীপ বলল, 'এতে তোমার প্রাইভেসিও থাকবে। কিন্তু মেয়েটা মনে হচ্ছে আমার প্রেমে পড়েছে। কেমন ঘুরে ঘুরে আমার দিকে তাকাচ্ছে দ্যাখ।'

জয়িতা কথা না বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সুদীপ মেয়েটাকে বলল, 'তুমি আমায় কি করছ দ্যাখো! গ্রামের অন্য কেউ হলে তোমাকে মেরেই ফেলত।'

মেয়েটা বাকমকিয়ে হাসল, 'গ্রামের কেউ হলে আমাকে বাঁচাতেই যেত না।'

এই সময় জয়িতা তার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল, 'আনন্দ, সুদীপটাকে বারণ কর। ও বেড়ালটাকে মাছ দেখাচ্ছে। মানুষকে প্রভোক করা একই অপরাধ!'

ঠিক তখনই চিৎকার উঠল। কান্নাটা আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। ওরা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে সেই নারীকণ্ঠের বিলাপ শুনছিল। ক্রমশ সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের ঘরে কন্ঠ পরিষ্কার হল। এই সময় সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি বলে উঠল, 'যাঃ, মরে গেল!'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র বিছানা ফেলে রেখে জয়িতা দৌড়তে লাগল। আনন্দ একবার ঘরের দিকে তাকাল। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কে মরেছে রে?'

আনন্দ বলল, 'মনে হয় সেই বাচ্চা মেয়েটা। তুই এখানে থাক। ঘরে মালপত্রগুলো আছে। তাছাড়া ওরা এখন তোকে দেখুক তা আমি চাই না।'

বলেই সে ছুটল। সুদীপ খুব নার্ভাস হয়ে গেল।

এখন অবশ্য তাদের কাছে অস্ত্র আছে। কিন্তু ওই মেয়েটা যদি মরে যায় তাহলে গ্রামের মানুষেরা ছেড়ে দেবে না বলে শাসিয়ে রেখেছে। তার মনে হল অস্ত্রগুলো হাতের কাছে রেখে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তারপরেই সে মত পাল্টালো। সে বাচ্চা মেয়েটার কোন ক্ষতি করেনি। উপকার করতে গিয়ে যদি লোকে তুল বোঝে তো তার কিছু করার নেই। দেখাই যাক, কি হয়। মেয়েটা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি গেলে না?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না।'

মেয়েটি হাসল, 'না গিয়ে ভালই করেছ। ওরা তোমাকে দেখলেই ক্ষেপে যেত। বউটার তো আর বাচ্চা হবে না। পনের বছরের স্বামী এতদিন ছেনের মতন ছিল।'

'তুমি যাও না।' সুদীপ মেয়েটিকে এড়াতে চাইল এবার।

'না বাবা। আমি মৃত্যু দেখতে পারি না। ভীষণ ভয় লাগে।' মেয়েটি উদাস গলায় বলল।

'ভয় লাগে অথচ নিজে তো মরতে যাচ্ছিলে।' সুদীপ খিঁচিয়ে উঠল।

মেয়েটি কিছু মনে করল না। সুদীপের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল।

জন্মিতা দেখল বেশ ভিড় জমে গেছে এর মধ্যে। মেয়েটির মা পাগলের মত মাথা ঠুকছে। বোঝা গেল একটু আগেই ওর প্রাণ বেরিয়ে গেছে। জন্মিতাদের দেখে ভিড় আলগা হল। ওরা সেই পথে ঘরে ঢুকে দাঁড়াল। মেয়েটির কিশোর স্বামী মাথা নেড়ে জানাল মরে গেছে। এবার মহিলার নজর পড়ল ওদের দিকে। জন্মিতা ভেবেছিল সে নির্ঘাৎ একটা কাণ্ড করবে। কিন্তু কিছুই না করে আশ্চর্য জনকভাবে কান্নাটা খামিয়ে দিল। জন্মিতা এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল। এখন কিছুই করার নেই। আনন্দ বাইরে বেরিয়ে এল। তার মনে হল উপস্থিত জনতা তাকে লক্ষ্য করছে। পালদেম ধারে কাছে নেই। সম্ভবত ও কোন অপরিণয় ব্যাপারের মুখোমুখি হতে চায় না। কাউকে ডেকে নিজেদের অপরাধহীনতার কথা বোঝানোর চেষ্টা করাও বুঝা। সে ঠিক করল পরিস্থিতি স্বেমন হবে তেমন করা যাবে। ভেতর থেকে আর কান্না ভেসে আসছে না। হঠাৎ যেন থমথমে হয়ে গেল চারপাশ। আজ তাপল্যাণ্ডের মানুষ যুমাতে পারছে না। আঙন জ্বলে উঠেছে চার পাঁচ জায়গায়। সেগুলো ঘিরে বসে আছে সবাই। অন্ধকারে কোন মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গেলে ভোরের জন্যে জেগে বসে থাকতে হয়। কারণ চোখ বন্ধ করলেই মৃতরা ডাক দিতে পারে সঙ্গী হওয়ার জন্যে।

এই সমস্ত কাহ্নকে আবার নেমে আসতে দেখল আনন্দ। গভীর মুখে দু'জন অনুচরকে নিয়ে কাহ্নন এগিয়ে যাচ্ছেন ঘরের দিকে যেখানে মৃত মেয়েটি শুয়ে রয়েছে। আনন্দের সামনে দিলে তিনি যখন যাচ্ছিলেন তখন সে নীরবে

মাথা নাড়ল। কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া হল না কাহনের মধ্যে। এবার পাদদেমনকে দেখা গেল। কোন একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে সে নিশ্চলই বসেছিল, কাহনকে দেখে এগিয়ে এল। দু'জনে চাপা গলায় কিছু বলল। তারপর দু'জনেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। মুহূর্তের জন্যে আনন্দর মনে হল এই অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষদের বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে ওরা লাফিয়ে পড়তে পারে তাদের ওপরে। এবং কাহন যদি নির্দেশ দেন ধর্মের নামে তাহলে তো কথাই নেই। বন্দুকের সঙ্গেও হয়তো খালি হাতে লড়ে যেতে চাইবে। অতএব এখন থেকে আপাতত আস্তানায় সরে যাওয়াই উচিত। রাতের অন্ধকারে মানুষের মুখ যতই অচেনা হয়ে যাক দিনের আলোয় তার মোকাবিলা করা সহজ। সে চিৎকার করে জগ্নিতাকে ডাকল। এবং তার এই চোঁচিয়ে কথা বলায় গ্রামবাসীরা তো চমকে তাকালই, তার নিজের কানেও অত্যন্ত ককঁশ ঠেকল।

জগ্নিতা বেরিয়ে এল বিস্মিত মুখে। চারপাশে তাকিয়ে আনন্দকে লক্ষ্য করল। তারপর দ্রুত দূরত্বটা কমিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরকম অসভ্যের মত চিৎকার করছিস কেন?'

আনন্দ বলল, 'আই অ্যাম সরি। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের এখানে থাকাটা উচিত হবে না।'

'কেন? তোকে কেউ কিছু বলেছে?' জগ্নিতা যেন তখনও বিরক্ত।

'না। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। পালদেম তো সামনেই আসেনি। ওরা বলেছিল মেয়েটা মরে গেলে আমাদের ছাড়বে না। আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।' আনন্দ চারপাশে তাকাল।

জগ্নিতা মাথা নাড়ল, 'ওরা আমাদের ভয় করছে। আমাদের হাতের অস্ত্রর শক্তি ওরা বুঝেছে। উপায় ছিল না, কিন্তু এভাবে ভয় বাড়তে আরম্ভ করলে আমাদের কখনই ওরা বিশ্বাস করতে পারবে না। এই গ্রামে আমরা চিরকালই বিদেশী হয়ে থাকব। ওরা ভয়ে তোর সঙ্গে কথা বলছে না।'

'তোর সঙ্গে বলছে? তোরই হাতে রিভলভার ছিল।' আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'প্রথমে করেনি। কিন্তু মেয়েটার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেই যেই আমার চোখে জল এসে গেল তখন আবার কাঁদতে শুরু করেছি।'

'মহিলা তোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল?' জগ্নিতার কথা অবিশ্বাস্য ঠেকল আনন্দর কাছে।

'শোক বড় বিচিত্র অনুভূতি। ধরাবাঁধা ব্যাখ্যায় তাকে ধরা যায় না। মেয়েটির শেষকৃত্য হবে সূর্য ওঠার মুহূর্তে। সেই অনুষ্ঠানে আমরা অংশ নেব। তুই সুদীপকে ডাক।' কথাটা শেষ করে জগ্নিতা আবার ভেতরে ঢুকে গেল। আনন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার নিজেকে একজন টিপিফ্যান মধ্যবিত্ত বলে মনে হল। অতিক্রম করতে চায় সে কিন্তু এক একটা

শেকড় এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে—। কাকে দোষ দেবে সে এ জন্যে ? এখানে আসার পর জয়িতা যতটা সহজ এবং খোলা মনে এগোচ্ছে ততটা সে কেন পারছে না ? আনন্দ হাঁটিতে শুরু করল। শিক্ষাই মানুষকে শিক্ষিত করে। একটু একটু করে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাই তো আসল কথা। আন্তানায় ফিরে সুদীপকে সে বাইরে দেখতে পেল না। আনন্দ একটু বিস্মিত হল। তারপর ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারে মুখ বাড়ান, 'সুদীপ ?' সুদীপের গলা ভেসে এল, 'বল !' 'ও। তুই শুয়ে পড়েছিস। ওঠ !' 'আবার উঠতে হবে কেন ? সারাটা রাত এভাবে জেগে থাকা যায় ?' 'মেয়েটাকে সূর্যোদয়ের সময় সৎকার করা হবে। আমাদের তিনজনের সেখানে থাকা উচিত।' 'আমাকে দেখলে ওরা খেপে যাবে না ?' 'যেতে পারে, আবার নাও পারে।' 'তাহলে ?' 'রিঙ্ক নিতে হবে।' 'আমি সঙ্গে মাল নিয়ে যাব।' 'না। সেটা আরও শত্রুতা বাড়াবে। মেয়েটা কোথায় ?' 'ও-পাশে শুয়ে আছে।' 'আঁ, এই ঘরে ?' 'তাছাড়া ঠাণ্ডায় যাবে কোথায় ? ও একটু বেশী বকে, কিন্তু মনটা ভাল।' 'এর মধ্যে মনের খবর নিয়ে ফেলেছিস।' 'বাজে বকিস না। প্রেম ট্রেম আমার দ্বারা হবে না।' সুদীপ উঠে একটা মোমবাতি জ্বালানো, 'মোমবাতির স্টক শেষ হয়ে আসছে।' 'অনেক কিছুই শেষ হয়ে আসছে।' 'আনন্দ ! আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি দলের স্বার্থের ক্ষতি না করে তাহলে তোদের কিছু বলার নেই। শুধু উটকো মন্তব্য করিস না।' সুদীপ আবার পোশাক চড়িয়ে নিচ্ছিল। আনন্দ দেখল মেয়েটা খানিকটা দূরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। এই ঠাণ্ডায় কোন মানুষ ওইভাবে শুয়ে থাকতে পারে বিছানা ছাড়া ? সে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, 'ওঠো।' সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে তুমি ছিস কেন ?' 'এই ঘরে ওকে একা রেখে যেতে পারি না।' মেয়েটি খতমত হয়ে উঠে বসল। সুদীপ তাকে ইশারায় ডাকল বেরিয়ে আসতে। কোন প্রতিবাদ না করে মেয়েটি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এল। আনন্দ লক্ষ্য করল, মেয়েটি সুদীপের পেছনে পেছনে হাঁটছে। ব্যাপারটা তার ভাল লাগল না কিন্তু কোন মন্তব্য করল না সে।

ভোর হতে আর দেরী নেই। আকাশে স্বর্গীয় রঙের খেলা শুরু হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় বরফ আরও নিচে নেমে এসেছে। এই সময় ওরা চিৎকারটা শুনে পেল। ওপাশের পাহাড় থেকে চিৎকার করতে করতে মানুষটা নেমে আসছে। আনন্দরা তখন গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। দৌড়তে দৌড়তে মানুষটা কাছে আসতে প্রথমে চিনতে পারেনি আনন্দ। ছেলেটা একটা অগ্নিকুণ্ডের সামনে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে থেকে পালদেম ছুটে এল তার কাছে। ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। প্রায় সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। আগুনের কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা চলল কিছুক্ষণ। কেউ যেন একটা পাত্রে খানিকটা তরল-পদার্থ এনে ওর মুখে ঢেলে দিল। একটু ধাতুস্ত হয়ে ছেলেটা কথা বলতে শুরু করল জড়িয়ে জড়িয়ে। খানিকটা শোনার পর পালদেম চমকে আনন্দের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটির এক হাতে তখনও বিরাট বোলাটা ধরা। পালদেম সেটাকে ছড়িয়ে নিল আস্তে আস্তে। পালদেমের দৃষ্টি অনুসরণ করে আনন্দ কাছে যাওয়া মাত্র ছেলেটি আচমকা কাঁদল।

পালদেম মুখ নিচু করল। তারপর বলল, 'তোমাদের বন্ধুকে পুলিশ মেরে ফেলেছে।'

বুকের মধ্যে ধক্ করে লাগল আনন্দর। তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। কল্যাণ নেই? কল্যাণ! সে কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

পেছন থেকে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? পালদেম কি বলল?'

পালদেম বলল, তোমাদের বন্ধু আমাদের বন্ধু। না হলে সে আমাদের জন্য ওষুধ আনতে যেত না। ওষুধ এনে এই ছেলেটির হাতে পৌঁছে দিতে পারত না।

হঠাৎ ছুটে এল সুদীপ ছেলেটির সামনে দু'হাতে তাকে খামছে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? কল্যাণের কি হয়েছে?'

ছেলেটি কোন কথা বলতে পারল না। কোন রকমে বোলাটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল। সুদীপ সেখানে চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেল। রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। সে পাগলের মত বোলা খুলতেই প্রচুর ওষুধ এবং সিগারেটের প্যাকেট দেখতে পেল। সব কিছুই রক্তের ছোঁয়ামাথা। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুদীপ। গ্রামের মানুষগুলো পাথরের মত মাথা নিচু করে চারপাশে দাঁড়িয়ে। আনন্দ কোন কথা বলতে পারছে না। তার চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সে কল্যাণের মুখটাকেই কল্পনা করতে পারছিল না। এই সময় জমিতার গলা পাওয়া গেল, 'পালদেম, কাহন বলছেন আর দেরী করা যাবে না।'

পালদেম তার দিকে তাকাল। সুদীপ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'জয়ী, কল্যাণ মরে গেছে। আমি-আমি-ওকে—!'

জমিতার মুখ অগ্নিকুণ্ডের আলোয় ঈশ্বরীর মত মনে হচ্ছিল। সে আনন্দর দিকে

তাকাল। তারপর গ্রামের মানুষদের বলল, 'আমাদের এক বন্ধুর কথা তোমরা শুনে। এসো, এই সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বাচ্চা মেয়েটির শরীর সংকালের জন্যে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের বন্ধুর আত্মাকেও নিয়ে যাই। ও তোমাদের জন্যে একটা কাজ করতে গিয়েছিল। তোমাদের আপত্তি আছে।'

সবাই মাথা নাড়ল, 'না। না। না।' শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল হিমালয় পর্যন্ত।

হঠাৎ সুদীপ বিড় বিড় করল, 'জয়ী, তুই মানুষ?'

'হ্যাঁ মানুষ।' জয়িতা কান্নাটা সামলালো, 'কল্যাণ এখানে আমাদের পায়ের তলায় মাটি দিয়ে গেল। শহীদের জন্যে কাঁদব কেন? আমি গবিত।'

১৯৭০

॥ ৪১ ॥

এখন দুপুর। কিন্তু আকাশে সূর্য আছে কিনা চোখ তুললে বোঝা যাচ্ছে না। হাওয়া বইছে। তার দাঁতের ধার আরও তীব্র। পাহাড়ে পাহাড়ে বরফ যেন হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামছে। সুদীপ বাইরে বেরিয়ে এসে চুপচাপ বসে ছিল। শিশ বাজছে বাতাসে। গাছের মাথাগুলোর ঝুঁটি যেন নেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। খোলা চোখে বসে থেকেও অবশ্য সুদীপ কিছুই দেখছিল না। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছে, মাথায় টিপটিপানি। শুধু এই ক্লান্তির জন্যেই সম্ভবত ঘন্টা তিনেক ঘুমিয়েছিল ও। এখন বুকের মধ্যে যে চাপ তাতে ঘুম কোন উপকার করেছিল বলে মনে হচ্ছে না। ধারে কাছে আনন্দ নেই। জয়িতাও।

সুদীপ চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের মুখটা ভেসে উঠল। কালিয়াকোকরি থেকে কল্যাণ ছুটে এসেছিল সান্দাকফু ছাড়িয়ে সেই পর্যন্ত যেখানে ছেন্নেটি ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। যে ছেন্নে প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ প্রকাশ করত, সাহস দেখানো যার স্বভাবে ছিল না সে—! সুদীপ মাথা ঝাঁকাল। একমাত্র ওর সঙ্গে কল্যাণের লাগত। কল্যাণকে সে কি পছন্দ করত? কিন্তু এখন এমন লাগছে কেন? মৃত্যুভয় ওরই বেশী ছিল। সব সমস্ত দূরকম মানসিকতায় দুর্ভাগ কল্যাণ। শেষ খেলায় একলা জিতে গেল। চোখ বন্ধ অবস্থায় সুদীপ কল্যাণের চলে যাওয়াটা দেখল। জয়িতার গালে আঙুল ছুঁইয়ে কেমন চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটা শুরু করেছিল কল্যাণ।

আশ্চর্যের ব্যাপার জয়িতা কাঁদেনি। জয়িতাকে কাঁদতে দ্যাখেনি সুদীপ। কাল রাতে একসময় আনন্দ ডুকরে উঠেছিল। উঠেই চুপ করে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘরে সেই শব্দটা সুদীপকে খুব শান্তি দিয়েছিল।

একটা মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে কোন কিছুই আটকে থাকে না। কেউ একুশ বছর বয়সে পুঞ্জিসের গুলিতে মারা যান কেউ সত্তরে রোগে মারা পড়ে। যদিদিন প্রাণ তদিন সব চোখের সামনে, যেই শরীরটা গেল অমনি অস্তিত্বের বিলোপ। কারো কারো স্মৃতি কিছু বছর, কয়েক বছর অথবা শতাব্দী মনে

রাখে মানুষ। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষকে তিনমাসেই বিস্মরিত হয় মানুষ, যারা থেকে গেল। হেসে ফেলল সুদীপ। কেউ থাকে না। যাওয়ার জন্যে অপ্রস্তুত থাকে। মা এখন কোথায়? একটাই তো জীবন আর তার সময়টাও বড় অল্প অথচ মানুষ ভাবার সময় কয়েক শতাব্দী ধরে নিজেকে ছড়িয়ে ভাবে। কল্যাণ তবু যাওয়ার আগে কিছু ওষুধ পৌঁছে দিয়ে গেল। তার পরে যে মানুষগুলো যাবে তাদের থাকার সময়টা যাতে একটু স্বস্তিতে কাটে তারই ব্যবস্থা করে গেল। এইটুকুই বা ক'জন করতে পারে! সাবাস কল্যাণ। এই প্রথম আমি তোর কাছে হারলাম। সুদীপ যেন নিজের অশ্রুস্তি চাকতেই উঠে দাঁড়াল। তারপর কনকনে জলে মুখ এবং হাত ভেজাল। এর মধ্যেই মুখের চামড়া ফেটেছে। চুলে আঠালো ভাব। হাতের দিকে তাকালে বোঝা যায় চর্মরোগ হতে বেশী দেরী নেই। কেমন ঘিনঘিনে ভাব চলে এল। সুদীপ ঠিক করল সে স্নান করবে। যতই ঠাণ্ডা হোক, সমস্ত শরীরে জল ঢালবে। সে চলে এল আশানার ভেতরে। দুটো সাবান ছিল। অনেক হাতড়ে হাতড়ে তার একটাকে বের করল। দ্বিতীয় সেট জামা প্যান্ট বের করল সে। অনেক দিন এগুলো শরীরে সঁটে রয়েছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বিচ্ছিরি গন্ধ বের হচ্ছে। অভিযে কি না করতে পারে মানুষ!

প্রথমে ভেবেছিল জল গরম করে নেবে। তার পরেই আর একটা জেদ বড় হল। কোন দরকার নেই, যতই ঠাণ্ডা হোক ঝরনার জলেই স্নান করবে সে। গরম জামা প্যান্ট আর সাবান তোয়ালে নিয়ে সুদীপ হেঁটে এল ঝরনার পাশে। এখন কোন মানুষ নেই। অদ্ভুত আদুরে ভঙ্গীতে জলেরা বয়ে যাচ্ছে। জলের শরীরে ছায়া জমলে তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখায়। একটু বেঁকে যেখানে জল গর্তের মধ্যে পড়েছে সেইখানে অকস্মাৎ উদাম হয়ে নেমে পড়ল সুদীপ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে তীব্র কনকনানি, যেন ফাৎপিণ্ড পর্যন্ত অসাড়। কাঁপুনি আসছিল বেদম, তবু মাথা ডোবাল সুদীপ। শরীর বড় বিচিত্র। সে শীতলতা থেকেও উত্তাপ আহরণ করতে জানে। ধীরে ধীরে আরাম পেল সে। সমস্ত শরীরে কাল দাগ জন্মেছে বিন্দু বিন্দু করে। সাবান ঘষে তৃপ্ত হল। তারপর হাত বাড়িয়ে ময়লা জামা প্যান্ট জলে এনে তাদের একটা সুরাহা করল। কিন্তু জল থেকে উঠতেই সমস্ত গায়ে কদম ফুটল, সুদীপের মনে হল সে মরে যাবে। তাড়াতাড়ি পরিষ্কার জামা প্যান্ট এবং গরম জামা প্যান্টে নিজেকে মুড়ে নিয়েও সে দাঁতের বাজনা থামাতে পারছে না। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতেই সে লাফাতে লাগল। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র উপকার হল না। এবং তখনই তার হাঁচি শুরু হল। নাক দিয়ে জল গড়িয়ে আসতেই সুদীপের খেয়াল হল তার নিউমোনিয়া হতে পারে। এই পাহাড়ে একবার ওই অসুখ করলে আর দেখতে হবে না। শুধু রোগে ভুগে মরে যাওয়া—সে দৌড়াতে লাগল। আশানায় পৌঁছে সে চটপট কয়েকটা ট্যাবলেট পেটে চালান করে দিল। কিন্তু এই দৌড়োবার সুবাদেই শরীর থেকে শীতভাবটা দূর হয়ে গেল। হঠাৎ বেশ

ঝরঝরে লাগল নিজেকে। ভেজা জামাপ্যান্টগুলো বারান্দায় ছড়িয়ে দিয়ে সুদীপ নেমে এল। অনেকদিন ব্যথা শরীর হালকা লাগছে। ঘুম থেকে ওঠার পর যে চিন্তাগুলো জেঁকে বসেছিল তারা এখন সরে দাঁড়িয়েছে। সুদীপ দু'পকেটে হাত চুকিয়ে হাঁটতে লাগল বড় বড় পা ফেলে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ওদের। শুধু ওরা নয়, গ্রামের বেশ কিছু মানুষ সঙ্গে রয়েছে। যারা ঠিক সঙ্গী হয়নি তারা দূর থেকে লক্ষ্য করছে। গাছের লম্বা লম্বা শক্ত ডাল কাটছে কেউ কেউ। অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা চালা ঘর তৈরী হচ্ছে। খুঁটিগুলো গোল করে পুঁতে মাটি থেকে হাত তিনেক উচুতে সেই ডাল বিছিয়ে মাচা তৈরী করে তার ওপর ছাউনি ফেলা হবে। সুদীপ কাছে পৌঁছবার আগে জম্বিতা দুটি মেয়ের সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল। সে কাছে পৌঁছতে আনন্দ বলল, 'তুই একবার চেক করবি?'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি?'

'যাদের ওমুখ দেওয়া হয়েছিল তাদের কি কি রি-অ্যাকশন হচ্ছে! অবশ্য খারাপ কিছু হলেও আমাদের হাত বন্ধ। ভাল হচ্ছে কিনা তাই দ্যাখ!' তারপর গলা পাতে জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি রে, তুই স্নান করেছিস মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আর সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'দেখিস অসুখ বাঁধিয়ে না বসিস। আমি রোলেন আর জনা ছয়েক লোককে জোর করে পাঠানাম চ্যাংথাপুতে চাল ডাল কিনে আনতে। পুরো স্টকটা এখানে থাকবে।'

'ওরা যেতে চাইল?'

'পালদেম না রাজী করালে যেত না।'

'জম্বিতা কোথায় গেল?'

'ও মেয়েদের সঙ্গে বসছে। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক দেম আণ্ডারস্টি্যাণ্ড।' কথা শেষ করে আনন্দ অন্যদের সঙ্গে আবার হাত লাগাল। সুদীপ কয়েক মুহূর্ত ওদের দিকে তাকাল। এখন এই কাজের সময়ে আনন্দের মনে নিশ্চয়ই কল্যাণের কোন অস্তিত্ব নেই। সে শুধু সমস্যাগুলো নষ্ট করেছে গুমরে থেকে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে আর কেইবা দিনের জন্যে হা হতাস করে। কাছে দাঁড়ানো একটি রুদ্ধকে সে কোনমতে বোঝাতে পারল কি করতে চায়। রুদ্ধটি সোৎসাহে তাকে নিয়ে গেল প্রথম বাড়িটায়। কোন গৃহপালিত পশু নেই, দরজা হাট করে খোলা। রুদ্ধটির চেষ্টামেচিত্তে যে রুদ্ধা সমস্ত শরীরে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এল কাঁপতে কাঁপতে, তার চোখে ইতিমধ্যে ছান্না নেমেছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর এখন কেমন আছে?'

মাথা কাঁকাল রুদ্ধা। বিড় বিড় করে কিছু বলল। রুদ্ধ এগিয়ে গিয়ে তার মুখের কাছে কান রাখল। তারপর ফিরে বলল, 'ওর খুব খিদে পাচ্ছে বলছে।'

‘খায়নি কেন?’ প্রশ্নটা করা মাত্র সুদীপের খেয়াল হল সে নিজেও আজ কিছু খায়নি।’

বুদ্ধ বলল, ‘জঙ্গলে যেতে পারেনি। হাটতে কষ্ট।’

সুদীপের মনে হল সঙ্গে কাগজ কলম আনার দরকার ছিল। প্রত্যেকের রুস্তান্ত আলাদা করে তার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। ঘরে ঘরে ঘুরতে ঘুরতে ওর মনে হল এখানেও তিনটে শ্রেণী রয়েছে। একদল সারা বছর মোটামুটি খেতে পায়। তাদের চাষের জমিতে যে ফসল ফলে তাতে কুলিয়ে যায়। এদের গৃহপালিত পশুপাখির সংখ্যাও কম নয়। খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে নেয় এরা। দ্বিতীয় শ্রেণী থাকে প্রায় আধপেটা খেয়ে। সারা দিনে শুধু স্ক্রোবেলায় এদের খাওয়া। আর একদল যাদের সংখ্যাই বেশী বছরের বেশীর ভাগ সময় তারা নির্ভর করে থাকে আশেপাশের জঙ্গলের ওপর। সেই জঙ্গলে এক ধরনের উদ্ভিদ এদের প্রাণধারণে সাহায্য করে। শাক পাতা ছাড়া শেকড়ও এদের কাছে উপাদেয় খাদ্য। এই শ্রেণীর মানুষের মধোই চর্মরোগের প্রাবল্য বেশী। এদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় অপুষ্টি কাকে বলে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, এই মানুষগুলোই সবচেয়ে বেশী কুঁড়ে এবং বিমোতে ভালবাসে। যে মানুষগুলোকে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল তাদের সতুর ভাগই এখন ভাল আছে। অথবা অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এদের কাছে গিয়ে আপ্লুত হল সুদীপ। দুহাত ধরে মানুষগুলো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। একটি পরিবার পোড়া রুটি এবং শাক সেদ্ধ না খাইয়ে ছাড়বে না। এখন আর সুদীপের বমি পায় না। সে পা মুড়ে বসে খাবারটা খেল। এই পরিবারে প্রৌঢ় প্রৌঢ়া এবং একটি রোগগ্রস্ত সন্তান। তাকেই ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গী বুদ্ধ জানাল এই প্রৌঢ়ের হাতে যে মদ তৈরী হয় তেমন গ্রামের আর কেউ তৈরী করতে পারে না। প্রৌঢ় যেন লজ্জিত হল। দুহাত নেড়ে প্রতিবাদ করল, ‘না না কথাটা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, আমার বাবার হাত ছিল খুব ভাল। তার মদ ঠাণ্ডা হলে যে গন্ধ ছড়াত তাতে মৌমাছিও ছুটে আসত। আমি তার কিছুই নিতে পারিনি। আমার বাবার ছেলে হিসেবে ছেলেবেলায় কোনদিন অসুখে ভুগিনি আর আমার ছেলেকে দ্যাখো!’ কিন্তু ওষুধ পেতে পড়ার পর ছেলেটার উপকার হয়েছে। জীবনে ওষুধ বস্তুটির সঙ্গে পরিচয় ছিল না ওর। পাতার রস বা শেকড়বাটা খেয়ে এসেছে এতদিন। প্রৌঢ় বলল, ‘তা সবাই যখন বলেছে তখন আপনি আমার হাতের সেবা গ্রহণ করুন।’ মাচার তলা থেকে প্রৌঢ় একটা মোটা বাঁশের চোঙা টেনে নিয়ে এল। এ তল্লাটে বাঁশ গাছ চোখে পড়েছে কিনা মনে করতে পারছিল না সুদীপ। কিন্তু চোঙাকে যেভাবে কোটেকুটে তিকঠাক করা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এর পেছনে অনেক স্বপ্ন রয়েছে। মদ ঢালা হল ছোট ছোট আরও কয়েকটা চোঙায়। সেগুলোকে বিয়ারের জাগের মত দেখতে। বুদ্ধ বোধ হয় এরই আশায় ছিল এতক্ষণ, এবার প্লনকিত হল। রুটি তরকারি খাওয়ার পর সুদীপের পেট ঠাণ্ডা হয়েছিল। সেদিন মদ খাওয়া নিয়ে বন্ধুরা

তেনন কিছু বলেনি কিন্তু আনন্দ বা জয়িতা যে খুশী হয়নি তা বোঝা গিয়েছিল । কিন্তু এই ঘরে বসে ওদের অপমান করা অন্যায্য হবে । পানীয়টি রিভিন কিন্তু বড় তরল । সুদীপ চোঙাটি ধরল । তীর গন্ধ বের হচ্ছে, কলকাতার ছেলেরা ঘাটশিল্পায় বেড়াতে গেলে মছয়া খায় শখে, তার চেয়ে বেশী কি হবে ? গন্ধটার মধ্যেই অবশ্য ঝিমঝিমে ভাব আছে । সে সতর্ক হয়ে চুমুক দিল । সঙ্গে সঙ্গে মনে হল জিত প্রায় অসাড় এবং কন্ঠনালীতে সূর্য গড়িয়ে নামছে । সে চোখ বন্ধ করল । বুক থেকে নামা মাত্র সমস্ত শরীর অসাড় । প্রৌঢ় বলল, 'আস্তে আস্তে খেতে হয় এই জিনিস ! এই গ্রাম কেন, আশেপাশের কেউই এই জিনিস তৈরি করতে জানে না । অবশ্য বিলিতি মদের কাছে এটা কিছু নয় !'

সুদীপ মাথা নাড়ল । কিন্তু কথা বলতে গিয়ে মনে হল জিতটা কেমন হয়ে যাচ্ছে । বিলিতি মদের তুলনায় এ জিনিস হাজার গুণ জোরালো তাই বোঝাবার জন্যে সে সময় নিল । মিনিট পাঁচেক পরে ধীরে ধীরে সাড় ফিরে আসতে লাগল । সুদীপ ঠিক করল আর খাবে না । কিন্তু পানীয়টির জোরালো গন্ধ তাকে এমন টানছিল যে দ্বিতীয়বার চুমুক না দিয়ে পারল না । এবার সাড় ফিরে আসতে আরও কম সময় লাগল । ক্রমশ তার মনে হতে লাগল একটার পর একটা চেউ যেন শরীরে পুরে পুরে নিচ্ছে । আর চেউগুলো পা থেকে গলা পর্যন্ত খেলে যাচ্ছে । তার মাথাটা পরিষ্কার আছে কিন্তু অশুভ্রুত এক সুখানুভূতি সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । বন্ধ সেখানেই শুয়ে পড়ছে । যেন হঠাৎ পাওয়া সুযোগ হাতছাড়া না করার অন্যে সে খুব দ্রুত খাচ্ছিল । প্রৌঢ় তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'শরীর খারাপ লাগছে না তো ?'

সুদীপ বলল, 'না ।' শব্দটা তার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে কানে পৌঁছাল না । প্রৌঢ় বলল, 'এখন শুধু মাথা ঘাড়ের ওপর সোজা করে রাখুন । ব্যস । দেখবেন, পৃথিবীটা আপনার হুকুমে চলবে ।'

সুদীপ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে । পা টলছে । চোখের সামনে সব কিছুই আঁকা বাঁকা । একেই কি মাতাল হওয়া বলে ? দূর ! মাতাল হলে সে এসব টের পাচ্ছে কি করে ? তার মাথা তো পরিষ্কার আছে । সে কথাটা মনে পড়তেই যতটা সম্ভব আকাশের দিকে মাথা রাখল । সে টিপসি হয়েছে । নেহাতই টিপসি । হাসল সুদীপ । তবে এই অবস্থায় আনন্দের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না । সে ছোট ছোট পায়ের হাঁটতে লাগল । এবং তখনই তার মনে হল এখন সব ভোর হচ্ছে । আকাশের গায়ে অন্ধকার সেঁটে আছে এখনও । কয়েক মুহূর্ত বাদেই ডুল ভাঙল । সে এসেছিল দিনের বেলায় । তাহলে এখন ভোর হবে কি করে ? নিশ্চয়ই দিনটা ফুরিয়ে গেছে, সন্ধ্যা হচ্ছে । কিন্তু আনন্দ রাগ করবে কেন ? সে তার কাজ ঠিকমত করেছে । কাজের শেষে একটু ফুর্তি করা হয় তাহলে অন্যায্য হবে কেন ? চিন্তাটা মাথায় আসামাত্রা মিলিয়ে গেল । কি ব্যাপার ? কোন কিছুই বেশীক্ষণ মাথায় আটক থাকছে না কেন ? সুদীপ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে চাইল তার নিজের কোন দুঃখ আছে

কিনা। সে রকম কিছু মনে পড়া দূরে থাক, কোন কষ্টদায়ক ঘটনার কথাই মনে পড়ল না। সমস্ত শরীরে শুধু ভাললাগা অনুভূতি চেটেই হয়ে দুলছে। এই সময় পেছন থেকে একটা চিৎকার শুনে অনেক কণ্ঠে সে আকাশের দিকে মাথা রেখে পেছন ফিরল। একটা লোক ভেঙ্গে চুরে তার কাছে আসছে এগিয়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটা মারামারি করতে আসছে। কাছাকাছি হতে সে বৃদ্ধকে চিনতে পারল। এখন বৃদ্ধ কিছুতেই সোজা হতে পারছে না। দুহাত বাড়িয়ে যেন সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে আসছে।

সুদীপ হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধকে ধরল। একটা অবলম্বন পেয়ে বৃদ্ধ যেন কৃতার্থ হয়ে অনেক কণ্ঠে শরীর সোজা করল। তারপর হঠাৎই কাঁদতে লাগল। সুদীপ বেদম ঘাবড়ে গেল। সে বৃদ্ধকে কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগল কাঁদবার কারণ কি? কিন্তু তার কথাগুলো যে বঁকেচুরে যাচ্ছে তা টের পাচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ প্রমত্তার উত্তর প্রমের মাধ্যমে জানাল 'তুই কবে মরে যাবি?' সুদীপ বলল, 'ও এই ব্যাপার।' সে এবার মনে করতে চেষ্টা করল কবে মরে যাবে? তারপর ভেবে টেবে না পেয়ে জানাল, সে মরবে না।

বৃদ্ধ বারংবার মাথা নাড়তে লাগল তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে, 'না। তুই, তোরা মরে যাবি। মরে যাবি বলেই তোরা স্বর্গ থেকে আমাদের গ্রামে এসেছিস।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'দূর! বাজে কথা। আমি মরব না।'

'মরবি। আমাদের উপকার করতে এসেছিস বলেই মরে যাবি।' বৃদ্ধ আবার কান্না শুরু করল, 'তোদের একজন যেমন আমাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরে গেল।'

কথাটা মাথায় ঢুকতে সময় লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সুদীপের শরীরে একটা সিরসিরানি জন্ম নিল। কল্যাণটা মরে গেছে। পুলিশ ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কল্যাণ যদি মরতে পারে তাহলে সে মরবে না কেন? কিন্তু! সুদীপ হঠাৎ বেশ জোরের সরিয়ে দিল বৃদ্ধকে, পড়ে যেতে যেতে বৃদ্ধ কোনরকমে বসে পড়তে পারল। সুদীপ আর দাঁড়াল না। অন্ধকার নেমে আসা গ্রামের পথে বৃদ্ধ তখনও কেঁদে চলেছে। পথটা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সামনে আশেপাশে অনেক মানুষ কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে। বুকের মধ্যে একটা কষ্টবোধ কিন্তু ঠিক কি কারণে কষ্টটা এল তা সুদীপের এখন খেয়াল নেই। হঠাৎ তার কানে চিৎকার চেঁচামেচি পৌঁছাল। দুজন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ঝগড়া করছে। সুদীপ মুখ তুলে চারপাশে তাকাল। তারপর আওয়াজটা যেদিক থেকে ভেসে আসছিল সেদিকে চলল। কয়েকজন মানুষ চুপচাপ ঝগড়া দেখছিল। তারা সুদীপকে দেখামাত্র বেশ সন্ত্রমে সরে দাঁড়াল। নিজের ওপর কোনরকম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, সুদীপ টলতে টলতে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলোটা ছুটে এল। ইনিয়রে বিনিয়রে অনর্গল কিছু বলে যাচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি এসে দাঁড়াল সামনে। সে যে অত্যন্ত রুদ্ধ তা বোঝা যাচ্ছিল। সুদীপ একটু একটু করে চিনতে পারল ওদের। এই অসমবয়সী স্বামী-স্ত্রীটির কন্যাবিয়োগ হয়েছে

ক'দিন আগে। হঠাৎ এক ধরনের অপরাধ বোধ চেপে বসল তাকে। সে যদি মেয়েটার উপকার করতে না যেত— তার মনে হল এদের বাগড়া খামিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য। একটা হাত উপরে তুলে সে কোনরকমে বলতে পারল, 'চুপ চুপ। কেউ কথা বলবে না, আমি বাগড়া খামিয়ে দেব।'

ছেলেটা বলল, 'আমি কিছুতেই এই ঘরে ওর সঙ্গে থাকব না। কিছুতেই না।' মহিলা বলল, 'কত বড় আত্মপর্দা, এইটুকু থেকে বুক পিঠে করে মানুষ করেছি আর তোমরা সবাই দ্যাখো, মুখে মুখে তর্ক করছে। আমি কাছনের কাছে যাব।'

সুদীপ বলল, 'অ্যাই চোপ। আমি যখন বিচার করছি তখন তুমি ওকে বকবে না।'

আশেপাশে দাঁড়ানো মানুষদের কেউ কেউ বলল, 'আহা চুপ করো না, একটু গুনতে দাও।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ ঠিক। আমরা কেউ গুনি না, সবাই শুধু বলে যাই।' তারপর ছেলেটার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রব্লেমটা কি?' ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারল না দেখে সে বিরক্ত হল। বিড় বিড় করে বলল, 'এর চান্স গেল।' সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে বকছ কেন?'

মহিলাটি উত্তর দিল, 'কেন বকব না। আমি ওর স্ত্রী, কাছন আমাদের বিয়ে দিয়েছে। অথচ মেয়েটা মরে যাওয়ার পর থেকে ও আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে চাইছে না। ও বলুক আমার অপরাধটা কি? আমি কি ওকে রেঁধে খাওয়াই না? আমি কি চাষ করি না? আমি কি গুন্ড্রক রেখে দিইনি বরফের জন্যে?'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ছেলেটিকে, 'ও যা বলছে তা সত্যি?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

সুদীপ এবার হাসল, 'তাহলে বাবা তোমার অন্যায্য হয়েছে। বিচার শেষ যে তোমার সেবা করবে তার কথা তোমাকে গুনতে হবে। কি আমি ঠিক বললাম কিনা?'

একজন লোক বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন তবে ওর কথাটাও অন্যায্য নয়।'

'কি কথা? এই, তোমার কি কথা আছে?' সুদীপ বিরক্ত হল।

ছেলেটা উত্তর দিল না। লোকটা বলল, 'ও বলছে বউ এর সঙ্গে এখন গুতে পারবে না। ওনে ওর শরীর খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন ঘুম পায় দুর্বল লাগে। আর ভাল করে গুতে পারে না বলে ওর বউ নাকি ওকে খুব গালাগালি দেয়। এইটে অবশ্য খুব ন্যায্য কথা।'

সুদীপের মাথায় সমস্যাটা ঢুকল না। সে ছেলেটার দিকে তাকাল। ছেলেটা বলল, 'আমি তো বলেছি বড় হয়ে গেলে শোব।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা চাপা গলায় শব্দ করল, 'ইশ! উনি বড় হতে হতে আমি

বুড়ি হয়ে যাব না? তার বেলায়? আসলে এ ছোঁড়ার অন্য বাচ্চা মেয়ের ওপর নজর আছে। তোমরাই বল, এতদিন আমি কিছু জোর করিনি। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছে আমি চাইতেই পারি। পারি না?’ অনেকেই মাথা নাড়ল।

এই সময় একটা লোক এসে ঘোষণা করল, ‘কাছন বলেছে ছেনেটাকে তার বউ-এর সঙ্গেই গুতে হবে। তবে যদি এতে তার আপত্তি থাকে তাহলে পালার কাছে দুজনে যেতে পারে। পালার বা বলবে তাই করতে হবে।’

এই গ্রামে একজন পালার আছে। কিন্তু তার ভূমিকা খুব জোরালো নয়। পালার ওপর দায়িত্ব গ্রামের মানুষদের দেখাশোনা করার। অনেকটা মোড়লের আদল। পালারদেহ হল সম্পর্কে বর্তমান পালার ভাইসো। এই গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি পালারই হলেও এখন চোখে কম দ্যাখে, কানে কম শোনে। কাছনের উপদেশ কানে যাওয়ামাত্র অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল সুদীপ। এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয় ওই কথাগুলো তাকে ছোট করতে বলা। সে দু হাত ছড়িয়ে বলল, ‘ও! আমি তাহলে তোমাদের মধ্যে নেই। যা ইচ্ছা কর।’

দু’তিনজন তাকে বোঝাতে গেল কিন্তু সেসব কথা কানেই তুলল না সুদীপ। তার পা থেকে বুক পর্যন্ত অনেকগুলো ঢেউ পরপর দুলাছিল, এখন তারা ছিটকে উঠছে ওপরে। যেন ফেনা ছুঁড়ে দিচ্ছে মস্তিষ্কে। দ্রুত অনেকটা একা চলে এসে সে মুখ খুবড়ে পড়ল অন্ধকারে। পড়ে চুপচাপ গুয়ে রইল।

ঠিক সেই সময় আনন্দ এবং জয়িতা পালারদেহের সঙ্গে কথা বলছিল। এই গ্রামের যা চাষযোগ্য জমি তা রয়েছে বিভিন্ন পরিবারের দখলে। এ ব্যাপারে মালিকানার কোন কাগজপত্র নেই, কাউকেই খাজনা দিতে হয় না। কয়েক পুরুষ ধরে সবাই জেনে এসেছে কোনটা কার জমি। অভাবের তাড়নায় কোন কোন পরিবার নিজস্ব জমির কিছুটা আর একজনকে বিক্রি করেছে কখনও। না হলে এখন কারো জমি বেশী কারো কম হবে কি করে। ইয়াক আছে একমাত্র কাছনের দখলে। মুশকিল হল ইয়াকদের বংশ লোপ পেতে চলেছে। পরপর পাঁচটি ইয়াকসন্তান পুরুষ হয়েছে। মকাই, কোদো, ডুং ডুং গুন্ডুক ছাড়া এক ধরনের আতপ চালের চাষ হয় যা থেকে চমৎকার শেলফটি তৈরি করে নেয় ওরা। এই আতপের ফলন নির্ভর করে বর্ষার ওপর। এ বছর বীজধান যা ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও মাটি থেকে গাছগুলো যেন মাথা চাড়া দিতেই চায়নি। না, কোনরকম সারের ব্যবহার এই গ্রামের মানুষ জানে না। যে জমি ফসল কমিয়ে দেয় সেই জমির ওপর ঈশ্বরের দয়া নেই মনে করে একটা চাষ বন্ধ রাখে।

পালারদেহ বলল, ‘তোমরা যা বলছ তা তাপলাঙের সবাই মানবে বলে মনে হয় না। অন্তত যারা সারা বছর মোটামুটি খেতে পারে তারা কেন অন্যের সঙ্গে নিজেরটা ভাগ করবে?’

আনন্দ বলল, ‘আমরা তাদের বুঝিয়ে বলব এ থেকে তারা কি উপকার পাবে।

আচ্ছা, আমাদের এখানে কি তেমন কোন মানুষ আছেন যিনি প্রতিবাদ করতে পারেন ?’

নতুন তৈরী তিনটে মাচার একটায় ওরা বসেছিল। মাটির তিন হাত ওপরে কাঠ বিছিয়ে সমান্তরাল মেঝে করে নেওয়া হয়েছে। মাথার ওপরেও ছাউনি, চারপাশের দেওয়ালগুলো এখনও ছিদ্রহীন হয়নি। রাতের বাতাস হু হু করে ঢুকে মাঝখানে জ্বলে রাখা মশালের আশুন কাঁপিয়ে যাচ্ছে সামনে। বুদ্ধ পালা এখানে এসে দুহাত চোখের ওপর আড়াল করে দেখে টেখে বলেছিল ‘ছেলেবেলায় আমাদের সুদকেরিঘর এরকম ছিল। তবে আরও ছোট। শুধু যার বাচ্চা হতো সে আর বাচ্চার মাইলিআমা যেতে পারত সে ঘরে।’ তারপর আলোচনা শুরু হতেই সেই যে পালা দুচোখ বন্ধ করে ঝিমোতে লাগল এখনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আনন্দের প্রবলতা শোনার পর কয়েকজনের মুখে অস্বস্তি দেখা গেল। পালদেমের ভেনা বসেছিল খানিকটা তফাতে। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় সব সময় কোন মতলব ভাঁজছে। পালদেম তাকেই জিজ্ঞাসা করল, ‘ভেনা, তুমিই কিছু বল। তোমার জমির ফসল অন্য লোককে খেতে দেবে ?’

‘কেন দেবে ?’ সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, ‘আমার বাগ ঠাকুদা আমার জন্যে জমি রেখে গেছে আর আমি পাঁচ ভূতে সেটা বিলিয়ে দেব ? তোমার বহিনীকে জিজ্ঞাসা কর সে রাজী কিনা ! এই সাথীরা হয়তো লোক খারাপ নয়। কিন্তু আমার তাউজি, জাহান, আমা কিছুতেই রাজী হবে না।’ জয়িতা চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, ‘পালদেমের বহিনীকে তুমি বিয়ে করেছ ?’

লোকটা মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ। আমি ওর ভেনা।’

‘তাহলে তোমার বউ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। মেয়েটা খুব ভাল।’

‘যে কেউ তার ইচ্ছে মত ভাল হতে পারে তাতে আমার কথার কোন হেরফের হবে না।’

আনন্দ বলল, ‘ঠিক আছে, প্রথমে দেখা শাক গ্রামের কটা পরিবার নিজের মত খাবতে চায় ?’

ভেনা জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাদের মতলবটা কি ? গ্রামের লোকগুলোকে নিয়ে কি করতে চাও ?’

পালদেম জবাব দিল, ‘ভেনা, এই ভাবে কথা বল না। ওরা চাইছে এই গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ যেন না খেয়ে থাকে। তাই দশটা পরিবার এক জায়গায় এই রকম এক একটা ঘরে ওঠা বসা করবে। তাদের খাওয়া দাওয়া একসঙ্গে হবে। সেই দশটা পরিবার যাতে ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করতে পারে তার জন্যে সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের নতুন সাথীরা বুদ্ধি দেবে আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে যাতে সবাই সুখে থাকে।’

ভেনা জিজ্ঞাসা করল, ‘তাতে সাথীদের কি লাভ ? ওরা কেন এসব করবে ?’

প্রশ্নটা শোনামাত্র সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এবং একসময় সব জোড়া চোখ এসে পড়ল আনন্দ আর জয়িতার ওপরে। জয়িতা হাসল, 'ভেনা, মানুষ কি সবসময় নিজের লাভের জন্যেই সব কাজ করে? আমা তার বাচ্চাকে বড় করে কোন লাভের জন্যে?'

ভেনা র্তোঁট উল্টালো, 'হাতে সে বুড়ি হলে খাবার পায় তাই।'

'ও। বুড়ো বাউকে যে তোমরা যত্ন কর কিসের আশায়! সে তো তোমাদের জমি দিয়ে এখন ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। কি লাভ তোমাদের তাকে সেবা করে?'

'এটা একটা কথা হল? বাউ হল আমার আত্মীয়।'

'ঠিক। আমরা যদি মনে করি পৃথিবীর কণ্ট পাওয়া নিঃস্ব মানুষেরা আমাদের আত্মীয় তাহলে তাদের জন্যে যখন কিছু করব তখন মনে হবে নিজের জন্যেই করছি।' জয়িতা হাসল।

হঠাৎ হাসি উঠল। যে হাসছে সে হেসেই থেমে গেল। সবাই মুখ ঘুরিয়ে দেখল লা-ছিরিও গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে। পালদেম জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ হাসির কি হল লা-ছিরিও?'

'হাসির কথা হলে হাসব না?' লা-ছিরিও শান্ত গলায় বলল, 'মাঝে মাঝে এই রকম কথা না বললেই নয় যা আমরা বুঝতে পারি না? পৃথিবীর কণ্ট পাওয়া নিঃস্ব মানুষ! ধ্যৎ! তারা কারা? কোথায় থাকে? যাদের আমরা দেখিনি তাদের গল্প শুনে কি শিক্ষা হবে? তার চেয়ে আমাদের কথা বল। আমরা খেতে পাই না, পরতে পাই না। আমাদের কণ্টটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়।'

অনেকেই মাথা নাড়ল, 'ঠিক ঠিক, লা-ছিরিও ঠিক বলছে।'

পালদেম লা-ছিরিওকে চোখের কোণায় দেখল। না খেতে পেলেও স্বাস্থ্য ভাল। একটু বেশী কথা বলে। এর আগে দুবার ওর সঙ্গে পালদেমের লেগেছিল। তরুণদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ছোকরা। কিন্তু এই মুহূর্তে ছোকরা মিথ্যে বলেনি কিছু। জয়িতা বলল, 'তুমি পুরো ঠিক বলেনি। তোমার কণ্ট দূর হতে পারে যখন তুমি জানবে তোমার মত কণ্ট পাওয়া মানুষ কি করে তাদের সুখের সন্ধান পেয়েছে সেটা জানলেই পথটা তোমার সামনে খুলে যাবে।'

আনন্দ বাধা দিল, 'এই প্রসঙ্গ পরে আলোচনার জন্য থাক। ভেনা আমাদের কোন লাভের উদ্দেশ্য নেই। ভারতবর্ষের পুলিশ আমাদের খুঁজছে। সে-দেশে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করছে। অনেকে অনেক রকম ভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার জন্যেই সফল হয়নি। আমরা দেশের মানুষকে নাড়া দিতে চেয়েছিলাম বলে পুলিশ আমাদের খুঁজছে।'

হঠাৎ আনন্দকে খামিয়ে দিয়ে লা-ছিরিও বলে উঠল, 'লোকগুলো যখন

অল্প তখন তাদের খুন করে সমস্যাটা মিটিয়ে নিলেই হয়।’

জয়িতা চট করে ছেলের দিকে তাকাল। আনন্দ বলল, ‘তাদের শক্তি অনেক। আমরা সেই চেষ্টাই করেছিলাম। তবে যারা আসল শক্তিমান তাদের ছুঁতে পারিনি। এখন বুঝছি এই রকম দুদিনে খুন করে সমস্যার সমাধান হবে না। যদি অভাবী মানুষেরা নিজেদের অভাব দূর করতে একসঙ্গে এগিয়ে না আসে তাহলে এদের খুন করেও কোন লাভ হবে না। যেকথা বলছিলাম, পুলিশ আমাদের ধরতে এখানেও আসতে পারে। আমরা তোমাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম। কিন্তু এসে দেখলাম তোমাদের অবস্থা ভারতবর্ষের অনেক মানুষের মতই। কিন্তু এখানে সেই অর্থে কোন শোষণ নেই। তোমাদের ক্ষতি করেছে তোমাদেরই অজ্ঞতা। শিক্ষিতদের শত্রু অনৈক্য। সেটা তোমাদের মধ্যেও হয়ত আছে। আমরা চেয়েছি তোমাদের এই গ্রামটার চেহারা পালটে দেব যাতে কেউ কখনও অভুক্ত না থাকে, অজ্ঞতায় না মরে। আর এই দুশ্চিন্তা যদি আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই পাহাড়ে একটা নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে। সেইটেরই আমাদের লাভ ভেনা।’

ভেনা মাথা নাড়ল, ‘এসব ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমি আমার জমির ফসলের ভাগ কাউকে দেব না ব্যস।’

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘আর কজন ভেনার মত একই চিন্তা করছে?’

খানিকটা গুঞ্জন উঠল। শেষপর্যন্ত এক এক করে জনা ছয়ক মানুষ ভেনাকে সমর্থন করল। অর্থাৎ সাতটি পরিবার একাই চলতে চায়। আনন্দ পালদেমকে বলল, ‘গ্রামের সবাই তো এখানে আসেনি। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে মতামত নাও। যারা আমাদের সঙ্গে আসতে না চাইবে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যদি কখনও তারা বুঝতে পারে যে এতে ক্ষতি হবে না তাহলে তারা নিজেরাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমরা প্রত্যেক সক্ষম এইরকম আলোচনা করব। বরফ পড়ার আগেই অনেক কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।’

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে সাবই যখন বেরিয়ে আসছে তখন পালদেম বলল, ‘আমার ছেলে তো একদম ভাল হয়ে গেছে। তোমরা আমার ঘরে রুটি খাবে?’

আনন্দ বলল, ‘বাঁচালে। এখন আবার চালেডালে ফোটাতে হত।’

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘সুদীপ কোথায় রে?’

আনন্দ উত্তর দিল, ‘জানি না। দুপুরে ওকে বলেছিলাম যাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাদের চেক করতে। তারপর আর দেখা পাইনি।’

জয়িতা বলল, ‘তুই একবার আস্তানাটা ঘুরে আয়। বোধ হয় ওখানেই আছে। আমি আমার নতুন ঘর থেকে এখনই আসছি।’

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই তাহলে ওখানেই পাকাপাকি থাকবি ঠিক করলি?'

জয়িতা বলল, 'পাকাপাকি কিনা জানিনা। তবে ওই মেয়েটার জন্যে আমার ওখানে থাকা দরকার।'

পালদেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা দুজন দুদিকে হাঁটিতে শুরু করল। জয়িতা গ্রামের মেয়েদের কথা ভাবছিল। সারাটা দিন ওদের সঙ্গে কাটিয়ে অদ্ভুত নাড়া খেয়েছে সে। প্রায় প্রত্যেকই নিজেকে পুরুষের সম্পত্তি বলে জাহির করতে ভালবাসে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ। ঠেংগতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জয়িতা। ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে মেয়েটির গলা, 'এত খেয়েছ কেন? এত খেলে পুরুষ মানুষের সব শক্তি দানো কেড়ে নেয়। আরে আরে, এই তুমি উঠছো কেন?'

॥ ৪২ ॥

চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। চোখের সামনে কোন দৃশ্য নেই। ঘরের কোণে তিন পাথরের মধ্যে যেটা জ্বলছিল সেটা শেষ পর্যায়ে। অন্ধকারকে ঘোলাটে করে দেওয়া ছাড়া তার কোন ভূমিকা নেই। শব্দগুলো কিন্তু থামছিল না। একজন বেরোয়া, অন্যজন সমানে তাকে শান্ত করে চলেছে। জয়িতা যে দরজায় তাও খেয়াল নেই দুজনের।

মাচার ওপর সুদীপকে চেপে ধরে রেখেছে মেয়েটা। জয়িতা আরও একটু এগোল। সুদীপ গোঙাচ্ছে। তার হাত যে দুর্বল তা বোঝা যাচ্ছে এখন, নইলে ওরা মেয়েটির শরীরে অমন নেতিয়ে পড়ে থাকত না। মেয়েটি তার দিকে পেছন ফিরে বসে। হঠাৎ জয়িতার মনে হল এই সুদীপকে সে চেনে না। সুদীপের মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু চট করে জয়িতার কালীঘাটের গটে আঁকা ছবির কথা মনে পড়ল। বাবু বেশ্যাবাড়িতে যাবেনই, সতী সাধ্বী স্ত্রী মাতাল স্বামীকে দু হাতে আটকে রাখতে চেষ্টা করছেন। এখনই যেন সুদীপ উঠে লাথি মেরে ফিটনে চেপে বউবাজারে রাত কাটাতে যাবে। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করল জয়িতা। সে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল 'কি হচ্ছে?'

মেয়েটি মুখ ফেরাল, ফিরিয়ে হাসল, 'ও তুমি দ্যাখো না, বেচারি মাতাল হয়ে গিয়েছে!'

জয়িতা এবার সোজা সুদীপের পাশে এসে দড়াল, 'সুদীপ!'

সুদীপের মাথাটা নড়ল। যেন আবছা সে বুঝতে পারল। তারপর জড়ানো গলায় বলল, 'কল্যাণ?'

'তোর লজ্জা করছে না? ছি সুদীপ ছিঃ। তুই এখানে এসেছিস মদ খেয়ে মাতলামি করতে?'

সুদীপ উঠতে গেল। তার দুটো হাত শক্তি সংগ্রহের জন্যে মেয়েটির শরীর এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে রাগে জমিতার শরীর রি রি করে উঠল। সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। বিন্দুমাত্র সংকোচ বা লজ্জা সেখানে নেই। জমিতা আর দাঁড়াতে পারল না।

অন্ধকারে সমস্ত মার্চটা সে ডিঙ্গিয়ে এল, কিন্তু বাবে এল তা সে নিজেই জানে না। চোখের সামনে সুদীপের ভঙ্গীটা ঘেন সঁটে আছে। নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের সঙ্গে সে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিচিত। সুদীপ যা করছে তা সে ইচ্ছায় করছে না। কিন্তু-কিন্তু!

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতেই আনন্দ চমকে তাকাল। জমিতার দিকে তাকিয়েই সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? তোর চেহারা এরকম হয়েছে কেন?'

দরজাটা বন্ধ করে সুদীপের বিছানায় বসে পড়ল জমিতা। এই মুহূর্তে তার কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। আনন্দ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ কোথায়?'

ঠোঁট কামড়াল জমিতা। তারপর বলল, 'আছে, ভালই আছে।'

'ভাল আছে মানে? কি হয়েছে বল তো? সুদীপ তোকে অপমান করল নাকি? গেল কোথায় সে?'

'ও মেয়েটির ঘরে আছে।'

'তোর ঘরে বল!'

'আমার ঘর আর হল কোথায়!'

'ওখানে কি করছে ও!'

'মাতাল অবস্থায় সুদীপ মেয়েটির সঙ্গে কি করছে তা দেখার জন্যে তুই আমাকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে বলবি না। আমি ভাবতে পারছি না, বিশ্বাস কর!' মুখ ফেরাল জমিতা।

আনন্দ চুপ করে গেল। সে জমিতার মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ জমিতা চিৎকার করে উঠল, 'আনন্দ, আমরা এসব করবার জন্যে এখানে আসিনি!'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু সুদীপ মদ গেল কোথায়? ওর সঙ্গে তো মদ নেই। মেয়েটি খাইয়েছে?'

কাঁধ নাচাল জমিতা, 'হতে পারে। যারা মদ খায় তাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমি আমার বাবা মাকে কখনই বিশ্বাস করতে পারিনি এই কারণে।'

হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কি শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেছে?'

জমিতা অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গীতে বলল, 'আস্ক দেম। আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ!'

ওর বলার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলল আনন্দ, 'তুই বোধ হয় বেশী উত্তেজিত

হচ্ছিল।’

‘তুই হাসছিস আনন্দ? আমার উত্তেজনাকে তোর বেশী বলে মনে হচ্ছে!’ জয়িতা যেন আনন্দকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, ‘আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম সুদীপ মাতাল। মেয়েটি ওকে জড়িয়ে ধরে উঠতে নিষেধ করছে। আমার গলা শুনে সুদীপ মেয়েটিকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল! এর পরে আমি উত্তেজিত হবো না?’

‘কিন্তু তা সত্ত্বেও তুই জানিস না ওদের সম্পর্কটা কি? মেয়েটি ওকে মদ খাইয়েছিল কি না অথবা ওরা ঘনিষ্ঠ হচ্ছে কিনা, তাও তো কল্পনায় দেখছিস? অতএব সুদীপের কণ্ঠের কথা না বলে অথথা উত্তেজিত হয়ে মাথা গরম করার কোন মানে আছে?’

‘আমি এ সব সহ্য করতে পারি না। অসম্ভব।’ মাথা নাড়ল জয়িতা।

‘কেন?’

‘বিকজ আই ডোন্ট লাইক ইট। শুধু শরীরের জন্যে দুটো নারী পুরুষ একত্রিত হলে ঘোমা ছাড়া আর কিছু জন্ম নেয় না। আমাকে বোঝাতে আসিস না।’

আনন্দ হাসল, ‘তোর প্রকাশটা বড় বেশী উগ্র হয়ে যাচ্ছে!’

জয়িতা সপাটে মুখ ফেরাল, ‘কি বলতে চাইছিস?’

আনন্দ বলল, ‘এই মহিলাটির স্বামী মৃত, তাকেই সুদীপের পাশে বেহঁশ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, একেই পাশের গ্রামের মানুষ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, এই মেয়েটির সঙ্গে একটা সমঝোতা করে তুই একসঙ্গে আছিস—গ্রামের নোকজন কেউ ওর ব্যাপারে চিন্তিত নয়। সুদীপ প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে। ওই আচরণ যদি আমাদের কাজের কোন ক্ষতি না করে তা হলে কিছু বলার নেই। এটা ওর ব্যাপার, ওদের ব্যাপার।’

মাথা নাড়ল জয়িতা, ‘তোর এই মহাপুরুষের মত কথাবার্তা আমি টনারেট করতে পারি না। আমরা এখানে এসে যদি এ সব করি তা হলে কলকাতা কি দোষ করেছিল। কেন আমরা প্যারাডাইস পোড়াতে গিয়েছিলাম? কল্যাণের জীবন দেওয়াটা কি নিরর্থক?’

‘না, মোটেই না। কিন্তু পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীরা কি ব্যক্তি জীবনে প্রেম ভালবাসার মর্যাদা দিতেন না? লেনিন কি রোবট ছিলেন?’

‘চমৎকার। এই ঘটনাকে কি তুই প্রেম ভালবাসা বলছিস? সুদীপের স্ট্যাটাস-ওর মানসিকতা, শিক্ষার সঙ্গে মেয়েটির কয়েক লক্ষ মাইলের ফারাক। এমন কি ওরা পরস্পরের ভাষাও বোঝে না।’

‘কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভালবাসার একটা নিজস্ব ভাষা আছে।’

‘রাবিশ।’

‘বেশ। অনেকক্ষণ থেকে তাকে যে কথাটা বলতে চাইছিলাম সেটাই বলি। প্রেমহীন শারীরিক সম্পর্ক যদি ওদের হয়ে থাকে তাহলে আমি সেটা সমর্থন

করি না। কিন্তু লক্ষ্য করে দ্যাখ, ব্যাপারটা আমাকে যতটা না ভাবাচ্ছে, তোকে তার চেয়ে অনেক বেশী বিচলিত করছে। কেন?’

‘কেন মানে? আমার রুচিতে লাগছে বলে।’

‘তাই কি?’

‘তুই কি বলতে চাইছিস?’

‘তুই সুদীপের বন্ধু। মেয়ে হিসেবে তুই আরও বেশী কাছাকাছি। ব্যাপারটা তোর ইগোতে ঘা দিয়েছে।’

‘মোটাই না। তুই কি মনে করিস আমি সুদীপের সঙ্গে—’

‘আমি কিছুই মনে করি না। ছেলে প্রেমে পড়লে বাবা যতটা না চটে মা তার চেয়ে বেশী ক্ষেপে যায়। কেন? অনেকটা সেইরকম ধর। মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছিস। ছেড়ে দে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, পালদেমের ওখানে চল।’ আনন্দ বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হল।

জয়িতা বলল, ‘তুই কিন্তু আমাকে আজ অপমান করলি আনন্দ।’

‘মোটাই না। আমি শুধু বলতে চেয়েছি সুদীপের ব্যাপারটা তোর আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়।’

আনন্দ ওর হাত ধরল। জয়িতা কিছু বলল না। কিন্তু দুশাটা যেন সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল যে নোংরামির প্রতিবাদ করার জন্যে ওরা এতদূর আসতে বাধ্য হল সেই নোংরামিই সুদীপের মধ্যে এসেছে। এবং সেই মুহূর্তে মেয়েটিকে কি ভীষণ অহঙ্কারী মনে হচ্ছিল। জয়িতা নিজের ভাবনাটা ঘোরাতে চাইল। আনন্দের ইঙ্গিত যদি সত্য নয়? না, সে তো জানত সুদীপকে ভালবাসেনি। তাহলে?

বাইরে বেরোতেই ঝাপটা লাগল হাওয়ার। এবং খোলা আকাশের নিচে পা দিতেই যেন কুচি কুচি পাথরের টুকরো শরীরে বিঁধতে লাগল। জয়িতা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই আনন্দ বলল, ‘মুখ নিচু করে দৌড়ো। মনে হচ্ছে বরফ পড়ছে।’

বরফ পড়ছে। অথচ আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই। যেন হিমালয়ের কোল থেকে আঁগলা করে বরফ তুলে বাতাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে তাপল্যাণ্ডের ওপরে। ওরা টলতে টলতে দৌড়তে লাগল। শীত এখন সর্বাস্থে। এবং এই পরিবর্তিত প্রাকৃতিক অবস্থা জয়িতার মন থেকে সুদীপ সংক্রান্ত ভাবনাটাকে চাপা দিয়ে দিল। তার গাল জ্বলছিল।

পালদেমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মনে হল এ যাত্রায় বাঁচা গেল। ঘরের ঠিক মাঝখানে আঙন জ্বালিয়ে ওরা বসে আছে। যথেষ্ট উত্তাপ এখানে। আনন্দ আঙনের শরীরে প্রায় নিজের শরীর ঠেকিয়ে বলল, ‘বাইরে কি বরফ পড়ছে?’

পালদেম বলল, ঠিক বরফ নয়। কাল সকালে ধুম থেকে উঠে দেখবে মাটি চকচকে কাঁচের তলায় ঢাকা পড়ে। রোদ উঠলেই অবশ্য গলে

যাবে। কিন্তু এটা হয় বরফ পড়ার ঠিক আগে। তুমি কখনও বরফ পড়া দ্যাখোনি, না?’

প্রমত্তা জয়িতার দিকে তাকিয়ে। জয়িতা মাড়া নেড়ে না বলল। সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল পালদেমের বউ। কোন মানুষ বরফ পড়া দ্যাখেনি এটা যেন তার বিশ্বাসে আসছে না। এমন কি ওদের ছেলেটাও হাসি হাসি মুখ করে আছে, হয়তো কিছু না বোঝেই।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘সাতদিন সময় পাওয়া যাবে?’

‘তা যেতে পারে। কিন্তু বরফ পড়া মানে ঘরে বসে থাকা তা নয়। আমরা তো এই করেই বছরের পর বছর বেঁচে আছি।’ পালদেম আঙুনটা খুঁচিয়ে দিচ্ছিল।

আনন্দ বলল, ‘কিন্তু আমি চাইছি যারা বয়স্ক, অশক্ত বা শিশু তাদের জন্যে একটা ব্যবস্থা করে রাখতে। শেষ পর্যন্ত তোমার ভেনার সঙ্গে গ্রামের কটা পরিবার যোগ দিতে পারে বলে মনে হয়?’

‘অন্তত দশ বারোটা তো বটেই। তবে যাদের জমি বেশী নেই কিংবা থাকলেও চলে না তারা এসে তোমাদের প্রশংসা করেছে এইরকম একটা রাস্তা ভাবতে পারার জন্যে।’

‘কিন্তু ওই দশ বারোটা পরিবারের হাতেই কি বেশীর ভাগ জমি?’

‘অনেকটা। কিন্তু ওদের জমি চাষ করে দিই তো আমরা। এবার যদি আমরা আমাদের জমি বা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাহলে ওরা বিপদে পড়বে।’ পালদেম হাসল, ‘তাছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। ওরা তোমাদের ভয় পাচ্ছে।’

‘ভয়? কেন?’ আনন্দ অবাক হল। কারো আচরণে তার একথা মনে আসেনি।

‘তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে যার ভয়ে পাশের গ্রামের মানুষরা পালিয়েছে।’

আনন্দ কাঁধ ঝাঁকাল। এই জিনিসটা সে কখনই চায় না। সে বলল, ‘যারা মনে করে আমরা ভয় দেখিয়ে তাদের দলে টানবো তারা ভুল করছে। তুমি ওদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও।’

জয়িতা বলল, ‘পালদেমকে দিয়ে না বলিয়ে আমরাই যদি ওদের সঙ্গে কথা বলি তাহলে ভাল হয়।’

আনন্দ আপত্তি করল, ‘না। সে ক্ষেত্রেও ওরা ভাবতে পারে আমরা প্রকারান্তরে ভয় দেখাচ্ছি।’

আলোচনা চলছিল। পরিবারগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করে এক একটা কমিউনিটি কিচেন গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি কিচেনের জন্যে বরফের সময়টা মেপে খাদ্যবস্তুর ব্যবস্থা করা হবে। যারা বরফের সময়ে নিজের ঘরে থাকতে চায় তারা থাকবে কিন্তু বাকিদের জন্যে যে বিশেষ ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে আঙুন এবং অন্যান্য সুবিধা মাতে থাকে সেদিকে নজর দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে জ্বালানি হিসেবে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও কাঠ জঙ্গল থেকে এনে চেরাই করে রোদে শুকিয়ে তৈরি করে রাখা হবে। এইসঙ্গে যুবকদের নিয়ে একটা দল তৈরি করা হবে যাদের উপর দায়িত্ব থাকবে বরফের সময় যে কোন বিপদের মোকাবিলা করার। ভালুক এবং নেকড়ে ছাড়া কোন পশুর দেখা সে সময় পাওয়া যায় না। এই গ্রামের মানুষ তাই শিকার করে পেট ভরায়। বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আনন্দ এই শিকার বন্ধ করতে চাইল না। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামের মানুষদের আয় বাড়াবার জন্যে ডেয়ারি, পোলট্রি, জঙ্গল থেকে এলাচ সংগ্রহ করে জমানো থেকে শুরু করে চামষাগ্য জমিগুলোর অবস্থার উন্নতি করিয়ে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপারটা পালদেমের কাছেও অভিনব। একটা আঙ্গুল যেটা ধরতে পারে না, একটা হাত সেটা স্পন্দে পারে। কিন্তু কাছনকে কোনভাবে বিরত করতে চাইল না আনন্দ। এই মানুষটি যখন প্রচলিত অর্থে শোষক নয় তখন তাঁর প্রতি গ্রামের মানুষদের বংশানুক্রমে যে শ্রদ্ধা রয়েছে সেখানে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় হবে। কাছন যতক্ষণ নিলিপ্ত ততক্ষণ তাঁকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। ওরা যখন খাওয়া শেষ করল তখনই বাইরে শব্দ হল। পালদেম দরজাটা খুলতেই ছেলেগুলোকে দেখতে পেল। তারা প্রত্যেকে ভারী ভারী বস্তাগুলো পিঠে করে এই কুচি বরফের মধ্যে পাহাড় ভেঙ্গে এইমাত্র এল। আনন্দ ওদের ঘরের ভেতর ডাকল এবং জয়িতা লক্ষ্য করল এটা পালদেম পছন্দ করল না। বোবাগুলো নামিয়ে ছেলেগুলো আঙনের সামনে বসতে পেরে যেন বেঁচে গেল। পালদেম দাঁড়িয়েছিল আনন্দের পাশে। আনন্দ চাপা গলায় বলল, ‘মনে রেখ ওরা তোমার কথায় এতদূর গিয়েছে। আর ওরা যা বয়ে নিয়ে এসেছে তা গোটা গ্রামের উপকারে লাগবে।’

পালদেম একই গলায় বলল, ‘কিন্তু আমার বউ ব্যাপারটা মানতে পারছে না।’

‘ওকে বুঝিয়ে বলো পরে।’ আনন্দ আড়চোখে পালদেমের বউকে দেখল। হঠাৎ বাচ্চাকে নিয়ে বেশী ব্যস্ত সে।

আঙন পেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হবার পর ওরা পালদেমকে গল্প শোনাত্তিল। দোকানদার ওদের কাছে অত টাকা দেখে কিরকম ঘাবড়ে গিয়েছিল। এর আগে খচ্চরওয়ালারাও নাকি বলেছে এখন তাপল্যাঙের মানুষের কাছে প্রচুর টাকা এসেছে। ওরা সবাই উৎসটা জানতে চাইছিল। কিন্তু ওরা যে গল্প বলেছে তা হল একজন ডাকাত তাপল্যাঙের কাছে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল, এইসব টাকা তার কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে। কথাগুলো কেউ কেউ বিশ্বাস করলেও যারা করেনি তারা অন্য কিছু খুঁজেও পায়নি। কিন্তু ওখানে থাকতেই ওরা একটা কথা শুনতে পেয়েছিল যার জন্যে দোকানদার তাদের গল্পটাকেই সমর্থন করেছিল। একটা পুলিশ বাহিনী নাকি চ্যাংথাপুর কাছে পৌঁছে

গিয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই আসছে সেই ডাকাতটির সম্বন্ধে। কিন্তু চ্যাংথাপু থেকে যারা ওয়াল্যাংচুও এসেছে তারা শুনেছে যে একটা ডাকাত নয়, অনেক ডাকাত এই তলাটে লুকিয়ে আছে। আর তাপল্যাঙের লোকজন যে টাকা পেয়ে গেছে এ খবরও খচরওয়ালাদের কাছ থেকে পুলিশেরা জানতে পেরেছে। কথাটা শোনামাত্র ওরা রওনা হয়ে পড়েছিল। ওদের বিশ্বাস পুলিশ এনে দোকানদারও তাদের কথা বলবে।

আনন্দর চোয়াল শক্ত হল। এই পুলিশ দল নিশ্চয়ই ফালুটের ফাঁড়ি থেকে আসছে না। যাই হোক, ভারতীয় পুলিশের কাছে এখন খবরটা চাপা নেই। তারা মরিয়া হয়ে ওদের ধরবার জন্যে বাহিনী পাঠাচ্ছে এখানে। কল্যাণের মৃত্যু বোধ হয় ওদের টনক নড়িয়েছে। কিন্তু আর যাই হোক এই তলাটে পুলিশরাও তাদেরই মত নবাগত। এক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধে ধরা দেওয়ার কোন প্রসঙ্গ নেই। এবং যারা এতদূরে তাদের ধরতে আসছে তারা নিশ্চয়ই জেলে বসিয়ে খাবার খাওয়াবে না। আর সেভাবে জীবন কাটাবার চেয়ে মরে যাওয়া চের ভাল।

আনন্দ জয়িতাকে ডাকল, 'চল, উই মাস্ট বি রেডি।'

জয়িতা ভাবছিল, ওর গলার স্বর শুনে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে?'

'ওরা কখন এই গ্রামে পৌঁছাবে জানি না। কিন্তু তার আগে আমাদের সতর্ক হতে হবে যাতে আচমকা ধরা না পড়ি। সুদীপটাকে তুলতে হবে। এই সময় মাল খেয়ে আউট হয়ে পড়ে রইল।' আনন্দকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। মাথা নাড়ল জয়িতা, 'না আমরা যুদ্ধ করব না।'

'সেকি!' আনন্দ হতভম্ব, 'তুই ধরা দিতে চাইছিস?'

'না।' জয়িতা বলল, 'আমি কিছুই করতে চাইছি না। আমার মনে হয় ওদের মুখোমুখি না হওয়াই ভাল। সরাসরি মোকাবিলা মানে, অসম যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, ওরা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবে। তৃতীয়ত, এ যাত্রায় যদি আমরা জিতেও যাই তবু পরিত্রাণ পাবো না। ওরা আরও বড় বাহিনী নিয়ে ফিরে আসবে। একটা সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আনাড়ি হাতে লড়াই করা মানে আত্মহত্যা করা। মরে গেলে তাপল্যাঙের মানুষের জন্যে যা করতে চাইছি তা তুই করবি কি করে?'

কথাগুলো হচ্ছিল বাংলায় যা পালদেমের বোবার কথা নয়। কিন্তু সে মন দিয়ে শুনছিল। জয়িতা খামতে সে বলল, 'আমাদের এই গ্রামে পুলিশ কখনও আসেনি। এরা যা বলছে তা যদি সত্যিই হয় তাহলে আর দেরি নেই তাদের এখানে আসতে। তোমাদের একটা কথা বলি, গ্রামের কোন মানুষই চাইবে না এখানে লড়াই হোক। তোমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়ে না। তোমাদের সঙ্গে লড়াই-এ গ্রামের মানুষের যে ক্ষতি হবে না তা কে বলতে পারে! তাছাড়া লড়াই-এ এক পক্ষকে হারতেই হয়। তোমরা হারলে এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা ঠিক হল সব বেঠিক হয়ে যাবে। তোমরা তোমাদের

ঘরে ফিরে যাও। আমি পালার সঙ্গে কথা বলে দু' তিন জনকে নিয়ে আসছি।'

বেরিগে যাওয়ার সময় আনন্দ ছেলেগুলোকে বলল বস্তাগুলো কোথায় রাখতে হবে। এখন পায়ের তলায় কুচি বরফ জমাট হতে চলেছে। হাওয়া বইছে। তবে সেই হাওয়ায় বরফ ভেসে আসছে না বলে কণ্ঠটা কম হচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আনন্দ। তারপর জয়িতাকে বলল, 'তুই আস্তানায় যা, আমি সুদীপকে দেখে আসি। ওকে যে করেই হোক তুলতে হবে।'

জয়িতা বলল, 'তুই ঐসব পারবি না।' সে আর কথা না বাড়িয়ে মেয়েটির ঘরের দিকে রওনা হল। সমস্ত শরীর খরখরিয়ে কাঁপছে। দাঁতে দাঁতে এক নাগাড়ে শব্দ বাজছে।

আনন্দ দরজাটা ঠেলেতে কোন মানবিক আওয়াজ শুনতে পেল না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'সুদীপ!'

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। জয়িতা ভেতরে ঢুকে পড়ল। আনন্দ দাঁড়িয়েছিল। এই সময় অন্ধকারে জয়িতার গলা শোনা গেল, 'ওরা এ ঘরে নেই।'

'সেকি রে?' আনন্দ অবাক। একটা পরিপূর্ণ মাতাল এমন অবস্থায় বাইরে যাবে কেন?'

জয়িতা ফিরে এল, 'আমি বুঝতে পারছি না। সুদীপের কোন হ'শ ছিল না নিজের চোখে দেখেছি।'

'কিন্তু কোথায় ওর খোঁজ করি বল তো? পালদেমের সাহায্য চাওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।'

ওরা চুপচাপ প্রায় ছুটে আসছিল। জয়িতা রহস্যটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। ওর মনে এতক্ষণ যে অস্বস্তিটা নখ বসান্নিছিল আচমকা সেটা জরাগ্রস্ত হয়ে ভয়ে রূপান্তরিত হল। যদি পাশের গ্রামের মানুষরা এমন রাতের সুযোগে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে আসে এবং সুদীপকে খুন করে কোথাও ফেলে যায়? অসম্ভব নয়। কারণ সেই ঘটনার পর ওরা বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ওই সময় এমন মাথা গরম না করলে এই ঘটনাটা ঘটত না। সুদীপ যাই করুক, এমন সোজা মনের ছেলে সে দ্যাখেনি। সোজা কিন্তু বেহিসাবী। আর শেষটাই ওর কাজ হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত।

আস্তানার বারান্দায় উঠে আনন্দ বিস্মিত। ভেতরে আগুন জ্বলছে। এবং সেই সঙ্গে একটি নারী কন্ঠে অবোধ্য ভাসার সুর খেলা করে যাচ্ছে। সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়ের প্রথম দিকের সিনেমার একটি হিট গান যা কিনা তিক এই রকম মেলোডিয়াস। সে ধীরে ধীরে দরজাটা ঠেলেতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। মেয়েটি আগুনের পাশে উঁব হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে গান গাইছে। আর তার সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সুদীপ। আগুনটাকে ওরাই জ্বালিয়েছে। কথা না বুঝলেও সুর মানুষের মনে ভাষা তৈরি করতে পারে যদি তা আন্তরিক

হয়। সুখ এবং দুঃখের প্রান্তে এমন একটা অনুভূতি আছে যার প্রকাশ একটাই সুরে সম্ভব। এই গান শুনে আনন্দ বুঝতে পারছিল না মেয়েটি দুঃখী না সুখী!

জয়িতা এগিয়ে যেতেই মেয়েটি গান থামিয়ে চমকে মুখ তুলল। তারপর সরল হাসল। আনন্দ দেখল, জয়িতার মুখে আঙনের আভা লেগেছে। সে চটপট জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কখন এসেছ এখানে?'

মেয়েটির একটা হাত সুদীপের বুকের ওপরে তখনও। সেই অবস্থায় বলল, 'অনেকক্ষণ।' তারপর জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি চলে আসার পর ও আর আমার ঘরে থাকতে চাইল না।'

হঠাৎ জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওর কাছে ঠিক কি চাও?'

'আমি?' মেয়েটি মাথা নীচু করল এবার, তারপর চুপ করে বসে রইল।

জয়িতা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'না, চুপ করে থাকলে চলবে না। তুমি-সুদীপ—। আমি জানতে চাই সুদীপ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে কি না? আর তাই করে থাকলে সেটা তোমার প্রশ্নেই হয়েছে। ব্যাপারটা তোমাকে বলতে হবে।'

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। জয়িতা এখন যে গুছিয়ে কথা বলতে পারছে না তা সে বুঝতে পারল। জয়িতা জানতে চাইছে সুদীপ মেয়েটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে কি না। কোন মেয়েকে এরকম প্রশ্ন সরাসরি করা যে অস্বস্তিকর তা এই মুহূর্তে জয়িতাও ভুলে গিয়েছে। সে এগিয়ে গিয়ে সুদীপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দু হাত ঝাঁকাতাই সুদীপ চোখ মেলল। চোখ দুটো এখন টকটকে লাল। প্রথমে মনে হল সুদীপ চিনতে পারছে না। মেয়েটি বলল, 'ওকে ঘুমতে দাও। ঘুমালে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ও এখানে কি করে এল? মনে হচ্ছে হেঁটে আসেনি।' মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'আমি নিয়ে এসেছি।'

জয়িতা মেয়েটিকে ভাল করে দেখল আবার। সুদীপকে বয়ে নিয়ে আসার শক্তি ও ধরে?

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ তোমাকে কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি হাসল, 'ও বলেছে এখন থেকে আমরা বন্ধু।'

আনন্দ উঠে এল জয়িতার কাছে। তারপর নিচু গলায় বাংলায় বলল, 'মাথা গরম করিস না। মনে হচ্ছে মেয়েটা ইনোসেন্ট। তবে পালদেমরা ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে বুঝতে পারছি না।'

জয়িতা সুদীপের দিকে তখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। ওর ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছিল। এমনতেই এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অন্যদের মত তার ঠোঁটেও এখন ফাটল এবং সামান্য ক্ষতের চিহ্ন তবু এই বিকৃতিটা ধরা পড়ল। জয়িতা অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'মানুষ কেন মদ খায় যদি এই অবস্থা হয়!'

এই সময় দরজায় শব্দ হল। আনন্দ গলা তুলে আসতে বললে পালদেমরা

এল। ওরা দুজন, পালদেম আর লা-ছিরিও। মেয়েটিকে দেখে পালদেমের মুখ গভীর হয়ে গেল। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, ওদের দেখামাত্র মেয়েটি আঙনের সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। পালদেম আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি এখন এই ঘরেই থাকে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। আমাদের এই বন্ধু অসুস্থ, তাই ওকে নিয়ে এসেছে।'

লা-ছিরিও বলল, 'ওর খুব নেশা হয়ে গিয়েছে।'

পালদেম মেয়েটিকে দেখল, 'ওর সামনে তোমরা কথা বলতে চাও? আমি ওকে বিশ্বাস করি না, যতদিন ও আবার বিয়ে না করে।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ে করার সঙ্গে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি সম্পর্ক?'

পালদেম উত্তর দিল, 'আমাদের এখানে নিয়ম প্রত্যেক যুবতী মেয়ের স্বামী থাকবে। স্বামী হল তার চরিত্রের চারপাশে বেড়ার মতন। নাহলে পাপের চুকতে দেবী হয় না।'

'বাজে কথা।' জয়িতা চোঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে তো তোমরা আমাকেও বিশ্বাস করো না।'

'তুমি বাইরে থেকে এসেছ। আমাদের নিয়ম তোমার ক্ষেত্রে খাটে না।'

'এসব তোমরা নিজেদের সুবিধেমত তৈরি করে নিয়েছ। একটা মেয়েকে বা পুরুষকে বিশ্বাস করা যায় তার কাজের মধ্যে দিয়ে।' জয়িতা শক্ত গলায় জানাল।

'বেশ। ওর কাজই কি বিশ্বাসের যোগ্য? স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করত। বাচ্চা হয়নি বলে স্বামীকে দোষ দিত। মানলাম লোকটা খারাপ ছিল। কিন্তু হাজার হোক স্বামী। সে মরে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে ও অন্য গ্রামের মানুষের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল কেন?'

'তোমরা ওকে একঘরে করে রেখেছিলে তাই।'

'তোমাদের এই বন্ধুর সঙ্গে ওর এত ভাব, ওর মতলব কি তা জানো?'

'জানি না। জানতেও চাই না। যতক্ষণ ওর কাজের জন্যে গ্রামের অন্য মানুষগুলোর ক্ষতি না হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের নাক গলাবার কোন মানে হয় না।' জয়িতা কথা শেষ করতে আনন্দ ওর দিকে সবিষ্ময়ে তাকাল। এতক্ষণ জয়িতা মেয়েটিকে সহ্য করতে পারছিল না। অথচ এখন ওরই হয়ে সমানে লড়ে যাচ্ছে। তারপরই খেয়াল হল, জয়িতা সমর্থন করছে একটি কোণঠাসা মেয়েকে। বিশেষ এক মেয়েটিকে নয়। সে বলল, 'এ সব কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।'

লা-ছিরিও জয়িতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তোমাদের ধরতে পুলিশ আসছে? আমি কখনও পুলিশ দেখিনি। ওরা কি খুব নিষ্ঠুর?'

জয়িতা ছেলের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। এই সারল্যের ~~কি জুলাই~~ হবে সে ?

পালদেম আবার মেয়েটিকে দেখল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'পুলিস এই গ্রামে হামলা করলে আমরা বিপদে পড়ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের সাহায্য করছি কারণ তোমরা আমাদের ভাল চাইছ। এখানে পুলিস বেশীদিন থাকতে পারবে না। বরফ পড়ার আগেই ওরা চলে যেতে বাধ্য হবে। ততদিন তোমরা পাহাড়ে লুকিয়ে থাকবে। লা-ছিরিও তোমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে বাইরের লোক কখনই পথ চিনিয়ে না দিলে পৌঁছাতে পারবে না। দিনের বেলায় এই গ্রাম ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ গ্রামের সব মানুষই যে মুখ বন্ধ করে থাকবে এমন নাও হতে পারে। পুলিস যদি জিজ্ঞাসা করে তোমাদের কথা আমরা অস্বীকার করব না। কিন্তু বলব তোমরা চলে গেছ। অস্বীকার করে যে লাভ হবে না তা বুঝতেই পারছ। তোমাদের আপত্তি আছে?'

আনন্দ বলল, 'না। কিন্তু যেখানে আমরা লুকিয়ে থাকব সেখানে থাকা যাবে তো?'

'কষ্ট হবে। তবে একটা চমৎকার গুহা আছে উত্তরের পাহাড়ে। সেখানে আগুন জ্বাললেও কেউ টের পাবে না! শুধু পাহাড়ি ভানুকের আর দানোর ভয় ছাড়া কিছু নেই।'

'ঠিক আছে। ওদের আমরা সামলে নেব।' আনন্দ বলল।

অতএব স্থির হল ভোরের আগেই বেরিয়ে পড়া হবে। এই ঘরে যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে তার কিছুটা পালদেমের কাছে রেখে বাকিগুলো ওরা সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে যাবে লা-ছিরিও। আনন্দ আর জয়িতা ছড়ানো সংসার গোছাতে লাগল। পালদেম জানাল পুলিস গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ারাত্র সে খবর পাঠাবে ফিরে আসতে। আনন্দ তাকে বুঝিয়ে দিল গ্রামের মানুষদের নিয়ে তাকে কি কি করতে হবে। পালদেম চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত জিনিস গোছানো শেষ হলে হঠাৎ জয়িতা ডুকরে কেঁদে উঠে সামলে নেবার চেষ্টা করল প্রাণপণে।

আনন্দ দেখল জয়িতা কল্যাণের পড়ে থাকা জিনিসগুলোর ওপর হাত রেখেছে।

॥ ৪৩ ॥

রোবট দ্যাখিনি জয়িতা স্বচক্ষে তবে যা বর্ণনা পড়েছে তার সঙ্গে এই মুহূর্তের সুদীপের কোন তফাৎ নেই। ও হাঁটিছে যে ভঙ্গীতে সেটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

অনেক সাধ্য-সাধনার পরও যখন সুদীপের চেতনা পরিষ্কার হল না তখন লা-ছিরিও একটা গাছের পাতা এনেছিল। ওই শেষ রাতের ঠাণ্ডায় শরীরে তেমন শীতবস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও ওরা যেভাবে চলাফেরা করে সেটা অভ্যেসের ফসল হতে পারে কিন্তু গাছপালা হাতড়ে পাতা খুঁজে আনা কম কথা নয়। সুদীপের মুখের ভেতর পাতাটা পুরে দিয়ে চোয়ালে দুহাতের চাপ দিয়ে সেটাকে

নাড়াতে বাধ্য করেছিল লা-ছিরিও। পাতার রস পেটে যাওয়া মাত্র বমি হয়েছিল সুদীপের। সেই বমির রঙ দেখে চমকে উঠেছিল ওরা। কোন মানুষ এমন ঘন কালো রঙের বমি করতে পারে ওরা জানত না। বোধ হয় শরীরের অস্বস্তিটা সামান্য কমতেই আরও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সুদীপ। বোঝা যাচ্ছিল এখন ওর ঘুম দরকার। কিন্তু তাপল্যাঙে ঘুমিয়ে থাকার ঝুঁকি ওই সময় নেওয়া আর মৃত্যুকে ডেকে আনা একই ব্যাপার। আনন্দ সুদীপের মাথাটা দুহাতে তুলে প্রায় আর্তনাদ করেছিল, 'সুদীপ, উই আর ইন ট্রাবল, পালাতে হবে এখনই।' সুদীপ চোখ তুলেছিল। হয়তো কথাগুলো বুঝতে পেরেছিল। কারণ সে উঠে বসতে চেষ্টা করেছিল। জয়িতা তার অন্যদিকটা ধরে তোলার চেষ্টা করার পর সে কাটা গাছের মত টলমল করতে লাগল। ওর নিজস্ব শক্তির এক ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

সেই সময় মেয়েটি এগিয়ে এল। কোন কথা না বলে সুদীপের শরীরটা নিজের পিঠে তুলে নিল সে। জয়িতা হতবাক। সুদীপ বেশ স্বাস্থ্যবান অথচ মেয়েটি অবলীলায় তুলে নিল ওকে। সে শুনল লা-ছিরিও বিড় বিড় করে কিছু বলল। সেটা প্রশংসার না নিন্দার তা অবশ্য বোঝা গেল না।

ওরা যাত্রা শুরু করেছিল গুকতারা চোখে রেখে। বের হবার আগে সমস্ত ঘরটা জরিপ করে নিয়েছিল যাতে ওদের কোন স্মৃতিচিহ্ন না থাকে। লা-ছিরিও আর জয়িতা সামনে, সুদীপকে নিয়ে মেয়েটি মাঝখানে আর শেষে আনন্দ। ওরা যখন তাপল্যাঙ, থেকে বেরিয়ে এল তখন কোন মানুষ জেগে নেই। এমন কি কুকুরগুলো পর্যন্ত আর চিৎকার করছে না। আলো জ্বলছে না কোথাও। আর ঠাণ্ডা এখন হায়েনার দাঁতের চেয়েও ধারালো। আনন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারল ওর নাকের ডগা ফাটছে। ইতিমধ্যে যা ফেটেছিল তাতেই ভয় হচ্ছিল রস না গড়ায়। সেখানে হাওয়া লাগায় এখন আরো জ্বালা করছে।

ওরা যাচ্ছিল আরও উত্তরে। পায়ের তলায় এখন রীতিমত কাঁচ-বরফ। চাপে মচমচিয়ে ভাঙছে। ওরা এখন নামছে ঢালুতে। ফলে বেশী শক্তি খরচ হচ্ছে না। আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। ওর মাথাটা মেয়েটির কাঁধের ওপর এতক্ষণ নেতিয়ে ছিল। এই পাহাড়ি পথে অতটা ওজন নিয়ে মেয়েটা ঝুঁকি হেঁটে যাচ্ছে। কেন? কি দরকার এত কষ্ট করার? ওর মনে হল জয়িতা যে বেগে গিয়েছিল তার পেছনে এই কারণটা ছিল। মেয়েটি মানসিকভাবে সুদীপের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। যতদূর মনে পড়ে কোন মনস্তাত্ত্বিক লেখেননি শুধু শরীরের প্রয়োজনে বা আপাত ভাল লাগায় কোন মানুষ আর একজনের জন্যে এত কষ্ট করে না। সুদীপকে বাঁচাবার তাগিদ আছে মেয়েটার। আর এইভাবে জড়িয়ে পড়াটা জয়িতার পছন্দ নয়।

লা-ছিরিও আর জয়িতা দাঁড়িয়ে পড়ল চড়াই-এর মুখে এসে। ভোর হচ্ছে। যদিও সূর্যদেবের কোন হদিশ নেই কিন্তু মাকালুর চূড়াটা রঙ পালটাচ্ছে। ওপাশে চ্যামল্যাঙের মাথায় সিদুঁর জমল। লোৎসকে দেখা গেল তার পরেই।

যেন হাতের মূর্তায় ওরা। ঠিক সেই কোথেকে একটা সাদা মেঘের খাবা লুকিয়ে ফেলল এন্ডারস্টকে। জাগব জাগব করেও বেচারার জাগা হল না। এই সময় মেয়েটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল সুদীপকে। খানিকটা টলমল করে সে স্থির হল। জয়িতা মালপত্র নামিয়ে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল তার কাছে, 'কেমন লাগছে এখন? বেটার ফিল করছিস?' সুদীপ কথা বলতে গেল কিন্তু ওর ঠোঁট দুটো শুধু নড়ল। শেষপর্যন্ত সে স্থির হয়ে দাঁড়াল ঠিক পুতুলের মত।

লা-ছিরিঙ তাড়া লাগান, 'জনদি চল। এই পাহাড়টা ভাল করে আলো ফোটান আগেই পেরিয়ে যেনে হবে।'

আনন্দ মুখ তুলে পাহাড়টা দেখল। খুব উঁচু নয় কিন্তু মাথা তুলে দেখতে গেলে ঘাড় ব্যথা হলে যায়। সে বলল, 'ওকে নিয়ে এতটা উঁচু পেরোবো কি করে?'

লা-ছিরিঙ বলল, 'ওকে যে বয়ে এনেছে এতটা সেই নিয়ে যাবে। চল চল। সোজা উঠতে হবে না, ভেতরে ভেতরে রাস্তা আছে। গ্রাম থেকে এই জায়গাটা চেষ্টা করলে দেখা যায়।' সে জিনিসপত্র আবার তুলে নিল। ওরা হাঁটা শুরু করতেই কাণ্ডটা ঘটল। লা ছিরিঙকে অনুসরণ করে সুদীপ হাঁটিতে লাগল। প্রথম দিকে সে টানমাটান হচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে উঠল। পুতুল কিংবা রোবটের মত দেখতে লাগছিল ওকে তখন। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তেই সে পড়ে যাবে। শরীর বাঁক নিচ্ছে না। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। তার দুটো হাত শরীরের দুপাশে শক্ত হয়ে ঝুলছে। ওর দিকে তাকালেই মনে হয় পৃথিবীর কোন কিছু সম্পর্কেই সে ভাবছে না। শুধু তার কাজ হেঁটে যাওয়া, সে তাই হাঁটিছে। মেয়েটি ঠিক ওর পেছনে। বোধ হয় সতর্ক নজর রাখছে ও সুদীপের ওপর। জয়িতার খুব ইচ্ছে করছিল সুদীপের সঙ্গে কথা বলতে। এই সুদীপের সঙ্গে পরিচিত ছটফটে সুদীপের কোন মিল নেই। আর এটাই অত্যন্ত অস্বস্তির। চলতে চলতে লা-ছিরিঙও সুদীপকে ঘুরে ঘুরে দেখল। এবার সে জয়িতাকে বলল, 'তোমাদের এই বন্ধু খুব তাড়াতাড়ি ভাল হবে না। ওকে নিয়ে ওপরে উঠতেও অসুবিধে হবে।' জয়িতা উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল, 'কি জন্যে তোমার মনে হচ্ছে ও তাড়াতাড়ি ভাল হবে না?'

'আমি যে পাতাটা খাইয়েছিলাম সেটা পেটে গেলে নেশা কেটে যেতে বাধ্য। ওর উপকার হয়েছে কিন্তু—'

'কিন্তু কি?' জয়িতার মনে হচ্ছিল লা-ছিরিঙ অকারণে রহস্য তৈরি করতে চাইছে।

'আমাদের একটা পাহাড়ি মদ আছে। অল্প খেলে ঠিক আছে। বেশী খেলে সেটা সোজা মাথার মধ্যে চলে যায়। যতদিন সেটা মাথার মধ্যে থাকে ততদিন কোন কিছু চিন্তা করার শক্তি থাকে না। মদের দানো এসে তার মাথায় বসে

থাকে। অনেকেই তখন পাগল হয়ে যায়। কিন্তু তোমার বন্ধু যখন বিড়বিড় করছে না তখন পাগল হবে না। হার যা হবার তা তো হবেই। এই নিয়ে চিন্তা করার কি আছে।’ লা-ছিরিও হাসল।

মনে মনে শিউরে উঠল জয়িতা। এ রকম কেস সে শুনেছে। তবে তা তো ড্রাগসের কল্যাণে হয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না, হাত পা কাঁপে। কিন্তু মস্তিষ্ক অসাড় হওয়ার ফলে পুতুলের মত চালচলনের কথা তো শোনেনি। ওর মনে হল লা-ছিরিও ঠিক বলছে না অবশ্য ওর বানিয়ে বলেই বা কি লাভ! ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল জয়িতার। ওদের সঙ্গে এখনও প্রচুর ওষুধ আছে। কিন্তু এই রোগের উপশম করার কোন ওষুধ নেই। বৃকের ভেতরটা কেমন কাঁপছিল জয়িতার। সে আবার লা-ছিরিওের দিকে তাকাল। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন চোখাচোখি হতেই সরল হাসল ছেলেটা। জয়িতা এবার হাঁপাতে লাগল। ওরা অনেক এগিয়ে এসেছে। পিঠের এবং হাতের বোঝা এখন আরও ভারি বোধ হচ্ছে। দম নেবার জন্যে জয়িতা দাঁড়িয়ে পড়তেই লা-ছিরিও বলল, ‘সকাল হয়ে গেছে, আমাদের এখনও একঘণ্টা হাটতে হবে।’

এই পথে মানুষ যাতায়াত করে না। জন্তু জানোয়ারের কথা বলা যাচ্ছে না কিন্তু গৃহপালিত পশু চোখে পড়ছে না। সরু পথটা এখন খাড়াই। নিচের বন্ধুদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। লা-ছিরিও আবার বলল, ‘তোমার যদি অসুবিধে হয় তাহলে আমার কাঁধে কিছু জিনিস দিতে পার।’ জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর আবার চলা শুরু করল। একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে পা ফেলতে রীতিমতো কষ্ট করতে হচ্ছে। এবং তখনই তার চোখে পড়ল সামনেই বরফ। প্রথম সূর্যের আলো এখনও পড়েনি কিন্তু তার আভায় নীলাভ হয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস্তিটা চট করে কমে গেল। সব কিছু ভুলে গেল জয়িতা। বরফে পা রাখা মাত্র গোড়ালি সামান্য বসে যাচ্ছিল এবং খানিক বাদেই আশপাশের কোথাও আর পাহাড় কিংবা পাথর দেখা গেল না। সর্বত্র সাদা তুষার ছড়ানো।

তাপল্যাঙে আসার পর অনিয়মিত আহার, মারাত্মক ঠাণ্ডা এবং উদ্বেগ জয়িতার শরীরে বিস্তার ছাপ ফেলেছে। সে কখনই স্বাস্থ্যবতী ছিল না কিন্তু দুর্বলতার কারণে নিজেকে আরো মনে হচ্ছে ইদানীং। তার মুখের খোলা চামড়ায় শীতের ছাপ হাঁসের পায়ের মত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিজেকে একটি বিশেষ আদর্শে নিবেদিত মনে করায় প্রতিনিয়ত বাঁচার শক্তি খুঁজে পেত। ব্যক্তিগত ভাল লাগা বা নিজের জন্যে আলাদা করে কিছু চিন্তা করা আর হয়ে উঠত না। কিন্তু এখন মুহূর্তে হিমালয়ের তুষার ধবল প্রান্তরে যেই প্রথম সূর্যের কচি আলো পড়ল তখনই সে তড়িতাহত হয়ে গেল। চোখের সামনে এক অপরূপ দৃশ্য হার বর্ণনা মানুষের মাথায় চট করে আসে না। সোনালী সাদায় মেশা-মেশি বরফের ওপর দাঁড়িয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। আজন্ম কলকাতায় মানুষ জয়িতার বরফ সম্পর্কে যা কিছু ধারণা বই এবং চলচ্চিত্র থেকে। এক ধরনের

রোমাণ্টিক মানসিক-অভিযান চলত তার সেই সব দৃশ্য দেখা বা পড়ার সময়। আজ তার চোখের সামনে বাস্তব বরফ, এই বরফ ক্যাপ্টেন কুককে মেরে ফেলেছিল। এই সময় লা-ছিরিও জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমাদের সিগারেট খাবে?'

বিহ্বল মুখ ফেরাল জয়িতা। লা-ছিরিওকে দেখে মনে হল যেন আকাশ থেকে ঈশ্বরপুত্র নেমে এলেন। কোন মলিনতা নেই ওর হাসিতে। ঠিক এই সময় নিজেদের খুব ছোট সংকীর্ণ বলে বোধ হল তার। কলকাতায় প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি নারী অনুক্ষণ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে বিশ্বাসী হয়ে থাকে। শহরসভ্যতা যে মেকী মানসিকতা তৈরি করে দেয় জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের মুহূর্তে তার থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নেই। ব্যতিক্রম যারা হতে চায়, যারা মানুষের সঠিক জায়গার খোঁজ দিতে বন্ধপরিকর তাদের হতে হয় পাগল, নয় রাজনৈতিক মতলববাজ করে চিহ্নিত করে দেয় পেশাদারী রাজনৈতিক দলগুলো। আর লক্ষ লক্ষ মূর্খ সেই সব বাণী গপগপিয়ে গেলে। সৌন্দর্যের আর এক নাম যে সারল্য এটা শহরের মানুষ আজ বিস্মরিত।

'এই সিগারেট শরীর গরম করে।' লা-ছিরিওর হাতে পাকানো সিগারেট? বরং বিড়ি বনাই ভাল। সিগারেট শব্দটা ও শিখল কখন কিভাবে এ নিয়ে মাথা ঘামাল না জয়িতা। হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। তারপরে একটা কাণ্ড দেখল। পকেট থেকে দুটো চ্যাপটা পাথর বের করল লা-ছিরিও। চটজলদি সে দুটো ঘষে আঙনের ফুলকি বের করছিল সে। সেই ফুলকি কয়েকবারের চেষ্টায় বিড়ির মুখে ঠিক লাগিয়ে নিল। গলার শিরা ফুলিয়ে টানতেই তা থেকে ধোঁয়া বের হল। চোখ বন্ধ করে প্রথম আরামটা শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল লা-ছিরিও। জয়িতা তার হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে নিজেরটা ধরাল। একটা তিতকুটে স্বাদ। সকালে কিছু পেটে না পড়া এবং রাত্রি জাগরণের অবসাদে শরীর এই বিড়ির ধোঁয়া নিচ্ছিল না। কিন্তু জোর করে কয়েকটা টান দেবার পর আর এক ধরনের মাদকতা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। উষ্ম হল শরীর। সে হাসল। দোকানের বিড়ি সিগারেটের সঙ্গে এই হাতে পাকানো সিগারেটের পার্থক্য হল ওইটেই। সেই সঙ্গে একটা নেশা ধরানো গন্ধ। হয়তো যে গাছের পাতা থেকে এটি বানানো তা-ই নেশার কাজে ব্যবহৃত হয়। হোক, কিন্তু এই মুহূর্তে তার শরীর বেশ তরতাজা লাগছে। সে লা-ছিরিওকে হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

লা-ছিরিও ওদের যে গুহাটার সামনে নিয়ে এল সেখানে পৌঁছতে হলে পৃথিবীর সেরা পুলিশদের তাপন্যাণ্ডের মানুষের সাহায্য লাগবে যারা জায়গাটা জানে। গুহার মুখে পৌঁছবার পর লা-ছিরিও ওদের একপাশে সরে দাঁড়াতে বলল। তারপর জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে দলা দলা বরফ তুলে ছুঁড়ে মারতে

নাগল গুহার ভেতরে চিৎকার করে। সেই চিৎকার অনেকগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। তারপরই মা-ভালুকটাকে দেখা গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে সেটা বেরিয়ে এল বাইরে। হিমালয়ের ভালুকের গল্প পড়েছিল জয়িতা। চোখের সামনে দেখে তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। লা-ছিরিও শুধু কয়েক পা সিঁড়িয়ে এসেছে মাত্র, কিন্তু তার হাতের লাঠি, হাতে মালপত্র বেঁধেছিল আসার সময় এখন সমানে মুরছে আর সেই সঙ্গে অন্তত আক্রমণাত্মক শব্দ বের করছে মুখ থেকে। ভালুকটা কয়েকবার দাঁত বের করে এই স্পর্কার প্রতি তার প্রতিবাদ জানাল। বাচ্চা দুটো মায়ের শরীর ঘেঁষে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছায় মা এবং বাচ্চারা ওপাশে নেমে গেল। এবার লা-ছিরিও শান্ত হল। সে জয়িতাকে বলল, 'এই গুহাটাই সবচেয়ে ভাল। এখানে দানো চুকবে না।'

'কেন?' জয়িতার পুরো ব্যাপারটা এখন মজাদার লাগছিল। 'যেখানে ভালুক থাকে সেখানে দানো আসে না। দুজন দুজনের খুব শত্রু।' সে এবার নির্ভয়ে চলে গেল গুহার ভেতরে। মিনিট দশেকের মধ্যে গুহাটা বেশ বাসযোগ্য হয়ে গেল। নিচে একটা টেন্ট পাতা হল। তার ওপর জিনিষপত্র বিছিয়ে আনন্দ আর লা-ছিরিও দ্বিতীয় টেন্টটা দিয়ে গুহার মুখটা আড়াল করার চেষ্টা করতে লাগল। ভেতরে বরফ নেই কিন্তু ভালুকের বোটকা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। গুহাটা বেশ বড়, শেষ দিকে আলো চুকছে না। এবং সবচেয়ে আরামের যেটা তা হল এখানে ঠাণ্ডা অনেক কম। আনন্দরা যখন গুহার মুখটার পর্দার মত আড়াল ঝোলাতে পারল তখন বাতাসের পথ বন্ধ হল কিন্তু অন্ধকার বাড়ল।

এবার জয়িতা তাকাল সুদীপের দিকে। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে সে। এই খাড়াই পথটা ওকে বেয়ে নিয়ে এসেছে মেয়েটা। এখন দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁটুগেড়ে বসে হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। ও না থাকলে সুদীপকে এখানে নিয়ে আসা অসম্ভব ছিল। জয়িতা সুদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সুদীপের চোখের মণি স্থির। কিছু দেখছে বলে মনে হচ্ছে না। সে ধীরে ধীরে সুদীপের গালে হাত রাখল, 'সুদীপ!'

কোন সাড়া এল না সুদীপের কাছ থেকে। জয়িতার বুকের কাঁপাটা গলায় উঠে আসছিল। সে আবার ওর চোখের কাছে আঙ্গুল নিয়ে গেল। এবার চোখের পাতা বন্ধ হল। হঠাৎ আবেগে শরীর কাঁপানোর জয়িতা দুহাতে সুদীপকে জড়িয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখল। এতটা পথ আসার সময় সে মেয়েটির কাছ থেকে যা জেনেছে তাতে সুদীপের মস্তিষ্কের অসাড়াটা খুব অল্পে দূর হবে বলে মনে হয় না। কল্যাণটা চলে গেল, সুদীপ যদি এভাবে একেজো হয়ে যায় তাহলে রইল তারা দুজন। কাজের পরিধি বিরাট অথচ মানুষ কম। পালদেমকে বোঝালে বুঝতে পারে কিন্তু নিজে থেকে কিছু করার

ক্ষমতা ওর নেই। সুদীপকে যে ভঙ্গিতে জয়িতা জড়িয়ে ধরছে তা স্বাভাবিক সময়ে হতো না। কন্যাণের একটা ধারণা ছিল জয়িতা সুদীপকেই বেশী পছন্দ করে। এমন কি ওর সঙ্গে সুদীপের প্রণয় সম্পর্ক খুঁজে বার করতে চেষ্টা করত না। এসব ভাবনা কখনও আনন্দের মাথায় আসেনি। কিন্তু এখন ওই ভঙ্গি চোখের সামনে দেখে আনন্দের বারংবার কন্যাণের কথা মনে পড়ছিল। কন্যাণ দৃশ্যটা সহ্য করতে পারত না।

ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটল। ওরা কেউ পর্দাটার দিকে নজর দেয়নি। প্রত্যেকের দৃষ্টি তখন সুদীপ জয়িতার ওপরে। এমন সময় ঠিক ঘাড়ের পেছনে জান্তব চিৎকার আর মেয়েটির আর্তনাদ একই সঙ্গে শোনা গেল। চকিতে কয়েক পা সরে এসে আনন্দ দেখল মা ভালুকটা বীভৎস দাঁত বের করে মেয়েটিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। আনন্দের মস্তিষ্ক এবং হাত এক সঙ্গে কাজ করল। রিডলবারটা বের করে সজাগ রেখেছিল সে গুহার মুখে ভালুকটাকে দেখার পর। সেইটাই কাজে লাগল। শব্দটা ভয়ঙ্কর ভাবে গুহাটাকে কাঁপাল। প্রথম গুলিটা ভালুকটার প্রথম পায়ে লাগতেই সে আহত হয়ে মেয়েটার কাছ থেকে সরে এল। খুব অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েও মেয়েটি যেন নড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। আহত ভালুকটা এবার পেছনের দুই পায়ে ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লা-ছিরিঙের উদ্দেশ্যে এগোতেই দ্বিতীয় গুলিটা সরাসরি বুকে লাগল। একটা পাহাড়ের মত কাঁপতে কাঁপতে ভালুকটা লুটিয়ে পড়ল গুহার মুখে। পড়ার সময় টেন্টটাকে ছিঁড়ে নিয়ে এল শরীরের নিচে। শব্দটা এখন বহুগুণ। যেন সমস্ত পাহাড়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আনন্দ চিৎকার করে সবাইকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলল। পর্দাটা তোঁ ছিলই না, ভালুকটার শরীর ডিঙ্গিয়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। আনন্দ যার ভয় পেয়েছিল তা হল না। বিদেশী সিনেমায় দেখেছিল এই ধরনের শব্দ আলাগা পাথর বা বরফ নড়িয়ে ধ্বংস নামায়। কিন্তু এখানকার পাহাড় শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরও ঠিকঠাক আছে। ধাতস্ত হবার পর জয়িতার খেয়াল হল সুদীপ বের হয়নি। এবং তখনই মেয়েটা ছুটে গেল ভেতরে। কান্নাটা শুনতে পেল সবাই। সুদীপ কাঁদছে। জয়িতা ওদের বাইরেই অপেক্ষা করতে বলে নিজে এগিয়ে গেল। গুহার মধ্যে যেখানে সুদীপ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই হাটু মুড়ে বসে রয়েছে এখন। আর সেই অবস্থায় ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। মেয়েটি এখন তার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে। এই কান্না তাকেও অবাক করেছে। কিন্তু সে কোন কথা বলছে না। স্পর্শও না। জয়িতার সমস্ত শরীরে কদম ফুটল। সুদীপ কাঁদছে যখন তখন ওর অসাড় হওয়া মস্তিষ্ক এখন কাজ করছে। তার মানে ও আবার স্বাভাবিক হতে চলেছে। হয়তো ওই তীর শব্দ ওর চেতনা স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল, 'সুদীপ, অ্যাঁ সুদীপ, কি হয়েছে তোর?'

সুদীপের কান্নাটা অকস্মাৎ থামল। তারপর সেই অবস্থায় চুপচাপ বসে

রইল। জয়িতা এবার আনন্দের গলা শুনল, 'ওকে এখন ডিস্টার্ব করিস না জয়ী। বরং ও যদি ঘুমাতে পারে তাহলে ভাল হয়। সুদীপ, তুই কি ঘুমাবি? বিছানা ঠিক করে দেব?'

সুদীপ কোন জবাব দিল না। তার বসার ভঙ্গিরও পরিবর্তন হল না। মেয়েটি তখনও পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। আনন্দ দেখল লা-ছিরিও প্রাণপণে চেষ্টা করছে ভালুকটাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে। কিন্তু তার একার শক্তিতে সেটা অসম্ভব। ভালুকটার দিকে তাকালে বোঝা যায় এর বয়স বেশী নয়। লা-ছিরিও তার নিজস্ব ভাষায় জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু বলতেই মেয়েটি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে গেল। ওই জানোয়ারটার শরীরে হাত দিতে জয়িতার ঘেমা করছিল। তাছাড়া সুদীপের ব্যাপারটা তার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। ও যদি চেতনা ফিরে পেয়ে থাকে তাহলে এখন সাড়া দিচ্ছে না কেন?

সুদীপের বিছানাটা বের করে সে এক পাশে বিছিয়ে দিয়ে সুদীপকে ডাকল, 'সুদীপ, আয়।' মাথা নাড়ল সুদীপ। মুখে কিছু বলল না। ভঙ্গিও পাল্টানো না। আর এতেই খুশী হল জয়িতা। অন্তত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ও। অর্থাৎ স্বাভাবিক হবে এক সময়। বুকের ভেতর জমে থাকা পাহাড়টা যেন আচমকা সরে গেল জয়িতার। সে দেখল ভালুকটাকে ওরা অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছে। লা-ছিরিও কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে চিৎ করা ভালুকের বুকের চামড়া কাটতে লাগল। এখন গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। জয়িতা চোখ বন্ধ করে এখন সমস্ত শরীর গোলাতে লাগল। সারারাত জেগে, ভোরে এই পরিশ্রম করে এখন সমস্ত শরীরে বমি-ভাব ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ খুব অসুস্থ মনে হল নিজেকে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোন রকমে বাইরে এসে ভালুকটার বিপরীতে গিয়ে পেটে হাত রেখে বমি করল। শুধু তেতো জল ছাড়া আর কিছু বের হল না। ওরা সবাই ভালুকটাকে নিয়ে ব্যস্ত এখন। দমক আসছে জয়িতার কিন্তু মুখ থেকে কিছুই বের হচ্ছে না। এবং এখানে আসার পর সম্ভবত এই প্রথম তার হিমবাতাস ভাল লাগল। মুখের খোলা ফাটা জায়গাতেও তার স্পর্শ অনেক রমণীয় মনে হচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে নিজের শরীরটা ঠিক করে নিতে চেষ্টা করেছিল। বমি ভাবটা কমে এলে সে চোখ মেগল। চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ। তার ওপর কচি কলাপাতার মত রোদের চাদর বিছানো। সুন্দর যেন সুন্দরতর হয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল জয়িতা। এবং হঠাৎ তার মনে হল কিছু একটা নড়ছে ওপাশের বরফের তিপির গায়ে। জিনিসটা স্তিক বোঝা গেল না। কিন্তু নিশ্চয়ই কোন প্রাণী রয়েছে আশেপাশে। এই জায়গা খুব নিরাপদের নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। জম্বুটা ঠিক কি প্রকৃতির তা দেখার জন্যে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। জয়িতা ওহার পাশে পাথরের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে বসতে গিয়ে দেখল সেটা অসম্ভব। অতএব বাধ্য হয়ে সেখানেই বসে পড়ল।

অন্তত সতের হাজার ফুট উঁচুতে ওরা এখন। তাপল্যাও থাকতে থাকতে ঠাণ্ডা

অনেকটা সহ্যের মধ্যে এসে গেছে। কলকাতায় বসে এই পরিবেশে থাকার কথা কল্পনাতেই আসত না। জন্মিতার হঠাৎ মনে পড়ল সে অনেককাল নিজের মুখ দ্যাখেনি। আফনার কথা মনেই ছিল না তার। কতকাল স্নান করা হয়নি এবং সেটা হয়নি বলে অসুবিধে যে খুব হচ্ছে তাও নয়। অথচ কলকাতায় স্নান না করে একটা দিন কাটানোর কথা সে কল্পনা করতে পারত না।

জন্মিতা চোখ তুলল। তামল্যাও, বারুণৎসে, নুপৎসে, লোৎসে, এভারেস্ট, মাকালু, ছোমোলুও এখন চোখের সামনে। দু'একটা পেঁজা মেঘ ছাড়া কোন আড়াল নেই। এত সুন্দর তবু সুন্দর শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুক কাঁপে। একেই কি ভয়ঙ্কর সুন্দর বলে? কে জানে! পৃথিবীর কোথাও কোন অশান্তি নেই, শুধু স্থির হয়ে থাকা, সময় মুঠোয় নিয়ে বসে থাকা। শুধু অনন্ত নিসঙ্গতায় হৃদয় খুঁয়ে নেওয়া।

আনন্দের ডাকে চমক ভাঙল। পেছন থেকে আনন্দ বলল, 'কিরে ধ্যান শুরু করে দিলি। উঠে আয় চা হয়ে গেছে।' চা শব্দটা শোনা মাত্র শরীরে একটা আরাম এল যেন। জন্মিতা কৃতজ্ঞ চোখে আনন্দকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল সে ফিরে গেছে। সে উঠে এল।

গুহার সামনে ভালুকটার অস্তিত্ব নেই। শুধু তার বিশাল চামড়াটা পরিষ্কার করে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। গুহার মুখেই চাপ চাপ মাংসের স্তূপ তিক করছে লা-ছিরিও। ওকে দেখে সরল হাসল সে, 'পুরো গ্রামের মানুষ একবেলা এটা খেতে পারবে।'

'তোমরা ভালুকের মাংস খাও?' হতভম্ব হয়ে গেল জন্মিতা।

'কেন নয়? ভালুকের মাংস পাওয়া কত কষ্টের তা তো জানো না।'

'খেতে কেমন?'

'চমৎকার। তুমি কখনও খাওনি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল জন্মিতা। লা-ছিরিও বলল, 'আজ খেয়ে দেখো, মজা লাগবে।'

জন্মিতা মনে মনে বলল, রক্ষা কর। তারপর গুহাতে ঢুকতেই মেসেটা এক পাত্র চা এগিয়ে দিল। জিভে সেটা ঠেঁকাতে মনে হল এর নাম অমৃত। সে চেষ্টা করে আনন্দকে বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কয়েকটা বিস্কুট এখনও পড়ে আছে, খাৰি?'

'না থাক।'

'থাক কেন? ওটা তো শেষ হবেই।' আনন্দ গুর হাতে বিস্কুট ধরিয়ে দিল।

তারপর চাপা গলায় বলল, 'সুদীপ চা খাচ্ছে। যদিও এখনও নর্মাাল হয়নি। ওকে বুঝতে দিস না যে আমরা চিন্তিত।'

জন্মিতা সুদীপের দিকে তাকাল। সুদীপ এখনও গুহার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার চোখ খোলা কিন্তু কোনদিকেই দৃষ্টি নেই। চায়ের পাত্র

পাশে রয়েছে। সেখানেই ওর হাত। মেয়েটি গুহার এক কোণে মাংসগুলো রাখছিল। জঙ্গিতা চট করে আনন্দর দিকে তাকান, 'ভালুকের মাংস কে খাবে?'

আনন্দ বলল, 'বেশীর ভাগটাই গ্রামের মানুষের কাছে দফায় দফায় নিয়ে যাবে না-ছিরিঙ। কিছুটা আমাদের জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।'

'ইস্! তুই ওই মাংস খাবি?'

'খেতে খারাপ লাগলে খাবো না। আগে থেকে নাক সিটকোবার কি আছে। আমরা অনেকদিন মাংস খাইনি। মুখের স্বাদ পাল্টাবার জন্যে একটা চেষ্টা করা দরকার, বঝলি!' আনন্দ চা শেষ করল।

'অসম্ভব!' আমার দ্বারা হবে না। আমি ওই মাংস খেতে পারব না। জঙ্গিতা তীর প্রতিবাদ করল। ওর গলার স্বর এতটা জোরে উঠেছিল যে আনন্দ লক্ষ্য করল সুদীপের মুখ এপাশে ফিরল। যেন কিছু বোঝার চেষ্টা করল। তারপর আগের অবস্থায় ফিরে গেল।

চা শেষ করে লা-ছিরিঙ স্তূপ করে রাখা মাংসের কয়েকটা থেকে দুটো ঘাড়ে তুলে নিল। লাটির দুটো প্রান্তে ঝুলিয়ে নেওয়া বাঁকের মত দেখাচ্ছিল। সে জঙ্গিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি কোন খবর থাকে তাহলে আজই ফিরে আসব নইলে আগামীকাল। তোমরা কেউ নিচে নেমো না।'

আনন্দ বলল, 'পালদেমকে বলবে জঙ্গল থেকে কাঠ কাটা যেন আজ বন্ধ না হয়। ঘর তৈরির কাজ যেমন চলছিল তেমন চলবে।'

ওরা চলে যাওয়া দেখতে দেখতে আনন্দর মনে হল ওই ওজন কাঁধে নিয়ে তার পক্ষে তিন পা হাঁটা অসম্ভব ছিল। এখনও যে মাংস পড়ে আছে তা নিয়ে যেতে ওকে দুবার নিচে নামতে হবে। মেয়েটা এখন বরফ দুহাতে তুলে সেই পড়ে থাকা মাংস চাপা দিচ্ছে। এই ঠাণ্ডায় পচনের কোন আশঙ্কাই নেই। হয়তো জম্বুদের চোখ যাতে ওগুলোর ওপরে না পড়ে তার জন্যেই বরফ দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে।

কিছু কাঠ দরকার। রাত্রি নিশ্চয়ই এখানে ঠাণ্ডা বাড়বে। তাছাড়া স্টোভের শেষ তলানিটুকু আর নষ্ট করা উচিত হবে না। রান্না এবং উত্তাপ দুটোই কার্ঠে করতে হবে। জন্মের প্রয় নেই। বরফ গলিয়ে সেটা পেতে হবে। বড় একটা দা সঙ্গে নিয়ে আনন্দ হাটতে লাগল। বরফ ভেদ করে যে গাছ এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলো বেশ ভেজা এবং পাতাও নেই বললে চলে। জায়গাটা এমন যে লুকোবার কোন উপায় নেই। অবশ্য বিপদ আসতে পারে একমাত্র নীচ থেকে। আর সেটা এলে নিশ্চয়ই গ্রামের মানুষ আগেভাগে জানাবে। মাথার ওপর যদি হেলিকপ্টার আসে তাহলে গুহার ভেতরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। একটু নিচের দিকে এসে আনন্দ একটা বাঁকড়া গোছের গাছ দেখতে পেল। এর শরীরে এখনও পাতা আছে তবে বরফে মাখামাখি হয়ে আছে গাছটা। আনন্দ ডাল কাটতে শুরু করল।

গাছটা খুব বেশী লম্বা নয়। তাছাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে বলেই অনেকটা নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। নির্জন পাহাড়ে গাছ কাটার শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ কয়েকটা ডাল কাটার পরেও আনন্দের মনে হচ্ছিল এটা দু'দিনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আজ আবহাওয়া পরিষ্কার আছে এখনও, কিন্তু কতক্ষণ থাকবে তা ঈশ্বর জানেন। অন্তত দু'দিনের ব্যবস্থা করে রাখা দরকার। মাঝে মাঝে সে হাঁপিয়ে পড়ছিল কিন্তু তার জেদ কমছিল না। যখন তার মনে হল অনেক হয়েছে তখনই ভাবনা শুরু হল। এত কে ওপরে বয়ে নিয়ে যাবে! গাছ কাটতে কাটতেই অনেকটা শক্তি খরচ হয়ে গেছে। সে জিরোতে সময় নিল। এখান থেকে নিচের দিকে তাকালে কিছুই দেখা যায় না। জঙ্গল দেওয়ালের কাজ করছে।

এই সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল আনন্দ। আর দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল। মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে পাঠালো তোমাকে?'

মেয়েটি হাসল, 'শব্দ শুনে চলে এলাম। কিন্তু এই শব্দ তো মার থেকেও শোনা যাবে!'

কথাটা মাথায় আসেনি আনন্দের। সে অবিশ্বাসে তাকাল নিচের দিকে। গ্রাম এখান থেকে অনেক দূরে। অবশ্য শব্দের গতির কথা সে জানে তবে—

মেয়েটি বলল, 'ওটা আমাকে দাও, কিভাবে কাটতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।'

খানিকটা কাৎ করে দা চালাল মেয়েটি। শব্দটা মৃদু হয়ে গেল কিন্তু কাজ হচ্ছিল বেশী। আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আর কাটার দরকার নেই। এখন এগুলো নিয়ে যাওয়াই কষ্টকর হবে।'

মেয়েটি বলল, 'ডালগুলো টুকরো করে বাঁধতে হবে।'

সেই কাজেই লেগে গেল সে। হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে এত কষ্ট করছ কেন?'

মেয়েটি হাত না খামিয়ে জবাব দিল, 'আর কিছু করার নেই বলে।'

চারপাশে রক্তের গন্ধ। অতবড় একটা জন্তু মরে গিয়েও বাতাসে নিজের অস্তিত্ব ছড়িয়ে দিয়েছে। জন্মিতা গুহার ভেতরে ঢুকল। সুদীপ বসে আছে একা।

মেয়েটা একটু আগেই বেরিয়ে গেল। জন্মিতা সুদীপের সামনে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'সিগারেট খাবি?'

সুদীপ তাকাল। তার বুক কেঁপে একটা নিঃশ্বাস বের হল। জন্মিতার কণ্ঠটা ফিরে এল। তার মনে হচ্ছিল সে কিছুতেই আর সুদীপের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে রে সুদীপ?'

সুদীপ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর জড়ানো গলায় কিছু বলতে চাইল। কথাগুলো স্পষ্ট নয়। জন্মিতা দেখল কাঁপা পায়ের সুদীপ এগিয়ে যাচ্ছে বাইরে। ওর ইচ্ছে করছিল সুদীপকে জড়িয়ে ধরতে। আর ইচ্ছেটা হওয়ামাত্র সে ছুটে

গেল সামনে। দুহাতে সুদীপকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'কথা বল। টেল মি এনিথিং, এনি ড্যাম ওয়ার্ড।'

সুদীপ হাঁপাচ্ছিল। ওর শীতে ফাটা মুখ করুণ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ জয়িতা স্থির হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সুদীপের গালে ঠোঁট রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'সু-দী-প!'

সুদীপ বলল, 'ঠিক ঠিক আ-ছি!'

জয়িতা দুটো হাত সরিয়ে নিয়ে দেখল সুদীপের ঠোঁটে হাসি এল কি এল না? মুক্ত হয়ে সে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর বরফের ওপর দুটো পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। জয়িতা চুপচাপ গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুদীপকে দেখতে লাগল। ওর সমস্ত চেতনায় একটা সুখ ছড়িয়ে পড়ছিল, সুদীপ কথা বলেছে। স্নেহাবেই হোক বলেছে।

আর তখনই সে চমকে উঠল। দুটো নুদুস নাদুস ভালুকের বাচ্চা গুড় গুড় করে এগিয়ে আসছে সুদীপের কাছে। এরাই মায়ের সঙ্গে গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ভয় পেলেও সে বুঝতে পারল বাচ্চা দুটো এত শিশু যে ওদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। বরং ওদের ভাবভঙ্গি এবং হাঁটা দেখ মজা লাগছিল তার। বাচ্চা দুটো খানিকটা দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। তারা সুদীপকে লক্ষ্য করছিল। কুঁই কুঁই শব্দ করে নিজেরা সম্ভবত সুদীপ সম্পর্কে কিছু বলাবলি করে নিল। তারপর দ্বিধাভরে এগিয়ে গেল সুদীপের পাশে। সুদীপের গায়ের কাছে এসে ওরা স্থির হতে জয়িতা সবিম্বয়ে দেখল পরম আদরের দুটো হাত ওদের গায়ে স্পর্শ রাখল। আর বাচ্চা দুটো যেন আশ্রয় পেয়ে সুদীপের শরীরে মুখ গুঁজল।

॥ 88 ॥

দুপুর না গড়াতেই এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। চাপ কুয়াশা, মেঘ আর কনকনে ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু জয়িতার মনে হল গুহার ভেতর যে আরাম তা তাদের আশ্রয় ছিল না। এখানে অন্তত চোরা হাওয়ার কামড় নেই। তাঁবুটা পায়ের তলায় বিছিয়ে রাখা সত্ত্বেও স্যাঁত সেতে ঠাণ্ডা উঠছেই। কিন্তু আঙন জ্বালার পর চমৎকার ওম ছড়িয়েছে গুহাতে। ভালুকটার নির্বাচন সঠিক ছিল। ওকে উৎসাহ না করলে এই গুহার দখল পাওয়া যেত না। পৃথিবীর নিয়মই এ রকম।

জয়িতা মেয়েটিকে দেখছিল। লা-ছিরিও কিংবা পালদেম ওর সম্পর্কে সন্তুষ্ট নয়। অথচ রোগেন বলেছিল ও নাকি বাচ্চা তৈরী করার পক্ষে উপযুক্ত। এখনও এই মানুষেরা মেয়েদের একটি বিশেষ প্রয়োজনের সামগ্রী মনে করে। পালদেমরা কেন সেই সম্মান একে দিচ্ছে না সেটা অবোধ। তার মনে পড়ল লা-ছিরিও অত্যন্ত বাধ্য না হলে ওর কথা বলেনি। এখন মেয়েটি পাথরের উনুনে মাংস সেদ্ধ করছে। ভালুকের মাংস। মাঝে মাঝে সে

তাকাচ্ছে সুদীপের দিকে। সুদীপ তার বিছানায় পা ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে। এবং তার শরীর মুখ ডোবানো ভালকের বাচ্চা দুটোর দেহ তিরতিরিয়ে কাঁপছে। আনন্দ চোখ বন্ধ করে শুয়ে। এই গুহার কেউ কেউ কোন কথা বলছে না এখন। জয়িতা উঠল। সে উঠতেই আনন্দ চোখ মেলল; 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'মাংসের গন্ধটা অসহ্য মনে হচ্ছে।'

'অনভ্যাস।' আনন্দ এমন গলায় কথা বলল যেন ওই মাংস সে দীর্ঘদিন ধরে খাচ্ছে।

আড়াল সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল জয়িতা। এবং চোখের সামনে বরফ পড়া দেখল। কুয়াশাগুলো উধাও। ঝুর ঝুর বরফ মাটিতে জমা হচ্ছে। বসন্ত মাটি বলে কিছুই আর চোখে পড়ছে না। ঠাণ্ডাটা যেন সামান্য কমছে। তার খুব মজা লাগছিল। মাথার ওপর পাথরের আড়াল। সেটা ছেড়ে বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। সাহসও হচ্ছিল না।

লা-ছিরিঙ আজ ফেরেনি। তাপল্যাঙে পুলিশবাহিনী পৌঁছেছে কিনা কে জানে। কিন্তু এটা তাদের জানা উচিত ছিল। যারা তাপল্যাঙ পর্যন্ত আসবে তারা জানাবেই ওখানে তারা ছিল। শোনার পর হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। আর যদি সত্যি সত্যি হৃদিস পেয়ে যায় তাহলে তাদের পালাবার পথ থাকবে না। অস্বস্তিটা বেড়ে গেল ওর। রাত হয়ে গেলে এখান থেকে বের হওয়া আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার হবে। জয়িতা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। যদি লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামে পৌঁছানো যায় তাহলে রাজের আগে এখানে ফেরা যাবে না। এবং এই সময় সে একটি তীর শিস্ শুনল।

চমকে চারপাশে তাকাল। তুষারপাতের জন্যেই বেশী দূর দৃষ্টি যাচ্ছে না। কিন্তু ওই শিস্ যেদিক থেকে ভেসে এল সেই দিকটা লক্ষ্য করল সে। তার পরেই কুকুরের ডাক শুনতে পেল। কুকুরটাকে সঙ্কেত করার জন্যেই সম্ভবত শিস্ বেজেছিল। কুকুরের ডাকটা এখন স্পষ্ট, খুবই কাছাকাছি। পুলিশ কি শিকারী কুকুর নিয়ে উঠে আসছে। এই সময় তার পেছনে শব্দ হতেই সে আনন্দকে দেখতে পেল। চিন্তিত মুখে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম না ?'

'হ্যাঁ। আমি বুঝতে পারছি না এখানে কুকুর আসবে কোথেকে? পুলিশ নয়তো ?'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র আনন্দ ভেতরে চলে গেল। তার পরেই ফিরে এল রিভলভার নিয়ে। চাপা গলায় বলল, 'শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমরা অনেক বেটার জায়গায় আছি।'

ওরা প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। যতটুকু দেখা যাচ্ছে কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। যেই আসুক তাকে প্রথমে ওই খোলা জায়গায় পা রাখতে হবে।

কুকুরের ডাকটা এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন তার স্বর বদলে গেল। এখন ওই ডাকে উদ্বেজনা। এবং তার পরেই ওরা উত্তেজিত কুকুরটাকে দেখতে পেল। ওপর থেকে নেমে এল খোলা জায়গাটায়, ওর মুখ গুহার দিকে ফেরানো, অনর্গল ডেকে চলল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। জয়িতা রিভলভারে হাত রেখেছিল। কুকুরটার দাঁত সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দ্বিতীয়বার শিসটা শুনতে পেল। শিস শোনার পর আবার ওপরে ছুটে গেল কুকুরটা। আনন্দ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘ওপর থেকে নামছে কি করে? পুলিশ এলে তো নিচ থেকে আসার কথা!’

এবং তখনই প্রথমে কুকুর তার পর ওর মালিককে দেখতে পেল ওরা। ছেঁড়া গরমজামায় মতটা সম্ভব শরীর চেকে লোকটা ধীরে ধীরে খোলা জায়গায় এসে ক্লান্ত ভঙ্গীতে গুহার দিকে তাকাল। কুকুরের গলা থেকে গর্গো গর্গো শব্দ বের হচ্ছে। লোকটা টলছিল। এবার মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিল। ও আর একটু এগোলেই জয়িতাদের দেখতে পাবে। ওর হাতে একটা লাঠি আর ছোট পাত্র। পাত্রটিকে সে অত্যন্ত যত্নে আঁকড়ে আছে। সে আবার শিস দিতে কুকুরটা সোৎসাহে তেড়ে এল গুহার দিকে। একদম মুখোমুখি হয়ে ও জয়িতাদের দেখতে পেল। পেয়েই ছুটে গেল মালিকের কাছে। তার আচরণে আচমকা পরিবর্তন এসে গেছে যেন বুঝতে পারল লোকটা। সে লাঠিতে ভর করে কয়েক পা এগোতেই দেখতে পেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটা। আনন্দের মনে হল লোকটা অসুস্থ। যে কোন মুহূর্তে বরফের ওপর গড়িয়ে পড়তে পারে। সে পা বাড়াল। কুকুরটার চিৎকার বেড়ে গেল তাই দেখে। মুখোমুখি হয়ে আনন্দ বলল, ‘প্রথমে ওটাকে চুপ করতে বল। এখানে কুকুর ডাকুক আনরা চাই না!’

লোকটা অন্য ধরনের শব্দ করল জিভে। সেটা শুনে কুকুরটা যন্ত্রের মত থেমে গেল। এবার আনন্দ লোকটার দিকে স্পষ্ট তাকাল। সমস্ত শরীরে সাদা তুষার লেপেট রয়েছে। তেঁটি নাক এখন একদম সাদা। এই অবস্থায় ও কি করে হেঁটে আসছে?

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কে?’

লোকটা হাত নেড়ে নিচের দিকটা দেখাল। ও নাড়ল লাঠি ধরা হাতটা। পাত্রটিকে সে ওই অবস্থায় সামান্য নাড়াচ্ছিল না। আনন্দ বুঝল এ তাপল্যাণ্ডের একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ওর যা অবস্থা এখন যদি হাঁটা শুরু করে তাহলে তাপল্যাণ্ডে পৌঁছাতে পারবে না। শেষ শক্তিরুকুও এখন ফুরিয়ে যাওয়ার মুখে। ‘তুমি যদি আগুনের পাশে বসতে চাও তাহলে গুহার আসতে পার।’ হাত বাড়িয়ে দেখাল আনন্দ।

লোকটার হেঁটে কাঁপল। চোখ বড় হল। তারপর কোন রকমে উচ্চারণ করল, ‘ভালু!’

শব্দ বুঝল আনন্দ। ‘ভালু নেই। আনরা মেরে ফেলেছি।’

ওইটুকু পথ আসতে লোকটার অনেক সময় লাগল। গুহার মধ্যে তুকে আঙুন দেখে তার চোখ বিস্ফারিত হল। নিজের শরীর আঙুনের পাশে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেও কিন্তু সে হাতের পাত্রটি সম্পর্কে সচেতন ছিল। জয়িতা দেখল সুদীপের শরীরের মধ্যে ভালুক বাচ্চা দুটো মিশে যেতে চাইছে কুই কুই শব্দ করতে করতে। কুকুরটার লক্ষ্য ওরাই। এক একবার তেড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসছে সে মালিকের কাছে। আনন্দ লোকটাকে বলল, 'ওকে সামলাও।'

লোকটা আবার শব্দ করল। কুকুরটা এবার আঙুনের কাছে ফিরে এসে জিভ বের করে নোভী চোখে বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটাকে দেখামাত্র মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে বিস্ময়। সেটা লক্ষ্য করে জয়িতা ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের গ্রামের মানুষ?'

ঘাড় নাড়ল মেয়েটা, 'না। রোলেনদের গ্রামে থাকে। ও বেঁচে আছে!'

'কেন' ওর কি হয়েছিল?' এবারের প্রশ্নটা আনন্দের।

'ওর পায়ের দিকে তাকাও, দ্যাখো ওর পায়ের অবস্থা।' মেয়েটা যেন বিস্ময়ের শেষ সীমায়। জয়িতা চমকে উঠল। এই বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছে কিন্তু লোকটার পায়ের কোন জুতো নেই। আঙ্গুলগুলো বেঁকে বেঁকে ফুলে দুটো পা এখন গোল হয়ে গিয়েছে। অনেকটা হাতের পায়ের আকার নিয়েছে ওদুটো। মাঝে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রয়েছে।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার পায়ের এই অবস্থা কি করে হল?'

লোকটা তখন সমস্ত শরীরে উত্তাপ নিচ্ছে। যেন মরুভূমির মাঝখানে পথ হারানো মানুষের সামনে জল ধরে দেওয়া হয়েছে। ওর চোখ বোজা ছিল। আনন্দের প্রশ্ন যেন কানেই ঢুকল না। মেয়েটা এবার চিৎকার করে নিজস্ব ভাষায় জড়ানো গলায় কিছু বলতেই লোকটা চমকে চোখ মেলল। মেয়েটাকে যেন সে এখানে দেখবে ভাবতে পারেনি। একগাল হেসে সে জড়ানো গলায় উত্তর দিল। মেয়েটি এবার জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও পেরেছে, ও পেরেছে।'

'কি পেরেছে ও?'

মেয়েটি বলল, 'ডান দিকের যে পাহাড়, সেই পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে জল এনে যদি কোন অসুস্থ মানুষের মুখে বুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার অসুস্থ সেরে যাবেই। ওর মা বাঁচবে না বলে ও সেই জল আনতে বেরিয়েছিল। এর আগে অনেকেই প্রিয়জনকে বাঁচাবার জন্যে ওখানে গিয়েছে জল আনতে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একজন ফিরেছিল, কিন্তু অস্তত দশজনের পর ওকে আমি ফিরতে দেখলাম। ও ভগবানের দেখা পেয়েছে।' কথাগুলো বলার সময় মেয়েটির মুখে একটা উজ্জ্বল আলো খেলা করে যাচ্ছিল।

লোকটা হাসল। তারপর সন্নেহে নিজের পায়ের ওপর হাত বোলল। বোঝা যাচ্ছে ওখানে কোন সাড় নেই ওর। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওই

পাহাড়ের ওপর উঠেছিলে ?

পরম তৃপ্তিতে মাথা নাড়ল লোকটা। তারপর উচু করে পাহাড়টা দেখাল। আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। এদিকের পাহাড়গুলোর সবচেয়ে নীচু শৃঙ্গ অশুভ সতের হাজার ফুট। সেই অবধি কোনরকম আধুনিক হাতিয়ার ছাড়া একটা লোক নগ্ন পায়ে হেঁটে উঠতে পারে তা সে কল্পনা করতে পারছিল না। বোঝাই যাচ্ছে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ওর পা বেঁকে গেছে। এবং এ জীবনে আর সে নিজের পা ফিরে পাবে না। ওর হাতের আঙ্গুলগুলোও স্বাভাবিক নয়, নাকের ডগায় বেশ বড় ঘা। জয়িতা চাপা গলায় বলে উঠল, 'অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি না। ও চেষ্টা করতে পারে কিন্তু ওপরে উঠতে পারে না।'

আনন্দ বলল, 'সত্যি অবিশ্বাস্য কিন্তু এরা মিথ্যে কথা বলে না। অন্ধ বিশ্বাস মানুষকে কি শক্তি দেয় তার গল্প পড়িসনি? খোঁড়া পাহাড় ডিঙায়!'

'কিন্তু ওই বরফ গলিয়ে মুখে মাথালে কারো অসুখ সারবে? তাহলে তো প্রতি বছর এভারেস্ট ক্লাইম্বাররা ফিরে এসে হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে তুলতে পারত। ওঃ, ধর্ম মানুষকে কিভাবে এক্সপ্লয়েট করে দ্যাখ।' জয়িতা ক্লিপ্ত হয়ে উঠছিল।

'যা হোক, এক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নেই। শুধু বিস্মিত হওয়া ছাড়া।' আনন্দ বলল।

লোকটা ততক্ষণে সেন্ন হয়ে আসা মাংসের দিকে নজর দিয়েছে। ইঙ্গিতে সেটা দেখাচ্ছেও। মেয়েটা খানিকটা তুলে একটা ডিসে এগিয়ে ধরতেই কুকুরটাও চিৎকার করে উঠল। ওর দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে লোকটা মাংস গিলতে লাগল প্রাণপণে। মেয়েটা উঠে খানিকটা কাঁচা মাংস কুকুরটার সামনে রাখতে সেও একই ভঙ্গীতে খেতে শুরু করল। একটু অপরাধীর ভঙ্গীতে মেয়েটি বলল, 'আমি না হয় আজ মাংস খাব না।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'যারা ওপরের পাহাড় থেকে জল নিয়ে ফিরে আসে কাছন পর্যন্ত তাকে সম্মান দেখায়। আমি আমার ভাগটা ওকে দিয়ে দিলাম।' মেয়েটি জানাল।

'খান। তোমাকে আর স্যাক্রিফাইস করতে হবে না।' জয়িতা মন্তব্য করল। বোধ হয় অদ্ভুত ছিঙ্ক লোকটা। কারণ দ্বিতীয়বার নেওয়ার পরও যেন তার চাহিদা কমছিল না।

কিন্তু সে জাতিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা বাঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল।

তারপর পাহাড়ি সন্থে বুকের কাছে নিয়ে এসে কুকুরটাকে শিশ দিয়ে ডাকল।

আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

লোকটা হাত বাড়িয়ে নিচের দিকটা দেখাল। ওর মুখ এখন প্রায় স্বাভাবিক শুধু নাকের কাটা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। আনন্দ চমকে উঠল, 'এখন তো বাইরে অন্ধকার, তুমি গ্রামে পৌঁছাবার আগেই মরে যেতে পার।'

লোকটা চটপট মাথা নাড়ল। তারপর পাহাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ভগবান আমাকে

বাঁচিয়ে রাখবেন।’ ওর গলার স্বর জড়ানো কিন্তু শব্দগুলো বুঝতে পারল ওরা।

আনন্দ এবার মেয়েটিকে বলল, ‘ওকে পাগলামি করতে নিষেধ কর। এতক্ষণ যা করেছে করেছে, এই রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যেন ও গ্রামে ফিরে যায়।’

মেয়েটি খানিক ইতস্তত করে লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই লোকটি মাথা নাড়ল, ‘আমার মা মরে গেছে কিনা জানি না। কিন্তু মনে হয় এই জল যখন আনতে পেরেছি তখন ভগবান নিশ্চয়ই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটা রাত দেরি করলে ভগবান ওকে নিয়ে নিতে পারে। আমি যাচ্ছি।’

হঠাৎ মেয়েটা তাকে ডাকল। লোকটা মুখ ফেরাতে গলায় অনেক আকৃতি নিয়ে বলল, ‘আমাকে একটু জল দেবে? এই একটুখানি।’

লোকটি সজোরে মাথা নাড়ল, ‘না। এই জল কেউ চাইতে পারে না।’

‘আমি জানি। তবু তুমি দয়া কর। ওখান থেকে একটুখানি দিলে তোমার মায়ের জন্যে কম পড়বে না।’

মেয়েটি প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলছিল এবার।

হঠাৎ লোকটির খেয়াল হল যেন, ‘তুমি এখানে কেন? এরা কারা?’

‘এরা আমাদের বন্ধু। এদের খুব শক্তি। বিরাট ভালুক মেরেছে যার মাংস তুমি খেলে। ওই যে, তাকিয়ে দ্যাখো, ওর জন্যে একটু জল দাও। নাহলে ও কখনও ভাল হবে না।’ মেয়েটি হাত উঁচু করল।

লোকটা সুদীপের দিকে তাকাল। কিন্তু তার সামান্যও দয়া হল না। সে আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও উধাও। মেয়েটা তখন দরজায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিল। জয়িতা তাকে ধমক দিল, ‘সুদীপের জন্যে জল চাইবার কি দরকার ছিল?’

‘নইলে ও বাঁচবে না, ভাল হবে না। কেউ কি কখনও শুনেছে ভালুক বাচ্চা মানুষের শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে! ওর মধ্যে দানোটা বোবা হয়ে ঢুকে পড়েছে। ভগবানের দয়া ছাড়া সেটা বের হবে না।’

মেয়েটা হতাশ গলায় কথাগুলো বলল।

আনন্দ জয়িতাকে ইশারা করল চুপ করতে। তারপর বাংলায় বলল, ‘ওর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যদি আমাদের কোন ক্ষতি না করে তাহলে এই নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু লক্ষ্য কর ও সুদীপ সম্পর্কে সত্যি ইন্টারেস্টেড। শুনেছি ভালবাসাবাসি না হলে মেয়েরা ছেলেদের সম্পর্কে এতখানি সচেতন হয় না।’

জয়িতা সুদীপ, মেয়েটি এবং সবশেষে আনন্দের দিকে তাকাল। তারপর চাপ গলায় বলল, ‘মাঝে মাঝে তুইও ন্যাকাদের লাইনে গিয়ে দাঁড়াস কি করে তা বুঝি না।’

লা-ছিরিও মাংস নিয়ে আসার পর গ্রামের মানুষ বেশ খুশী। ভালুকের মাংস অনেকদিন তারা খায়নি। তার পরেই প্রথম উঠল ভালুকটা কত বড় ছিল? আরও মাংস পাহাড়ে আছে জানার পর সেটা আনবার জন্যে একটা দল তৈরী হয়ে গেল। লা-ছিরিও প্রথমে রাজী হয়েছিল তারপর তার মনে পড়ল এরা গেলে গুহার মানুষদের অস্তিত্ব জেনে যাবে। সে অনেক বুঝিয়ে ওদের আটকাতে পারল। গুহার সামনেই মাংস আছে এই সংবাদটা জানাল না। লোভ মানুষকে সব সময় বিপথগামী করে। সে আড়ালে ডেকে নিয়ে পালদেমকে সব রুত্তান্ত জানাল। অত বড় একটা ভালুককে যারা মেরে ফেলতে পারে অনায়াসে তারা কেন পুন্সিসের ভয়ে লুকিয়ে আছে তা তাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। তবে একথা ঠিক, ওরা এই গ্রামের উপকার করতে চায়। যতদিন ওরা সেটা করবে ততদিন ওদের সঙ্গে সহযোগিতা না করার কোন কারণ নেই। পালদেম লা-ছিরিওকে উপদেশ দিয়েছিল সেদিনই পাহাড়ে ফিরে না যেতে। কারণ উৎসাহী গ্রামবাসী তাকে অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু ওই চারজনের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত কিনা সে বুঝতে পারছিল না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সে লা-ছিরিওকে নিয়ে কাহ্নের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কাহ্ন তখন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। পালদেম এবং লা-ছিরিও তাঁর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। কাহ্ন চোখ নামালেন। পালদেম বলল, 'আমরা বিদেশীদের সাহায্য করছি। কিন্তু কতখানি সাহায্য করা উচিত?'

কাহ্ন বললেন, 'যতক্ষণ ওরা আমাদের শত্রুতা না করছে। দু দুবার আমাদের দেবতা ওদের সাহায্যে ফিরে এসেছেন। আমরা এই ঋণ নিশ্চয়ই শোধ করব।'

পালদেম বলল, 'কিন্তু ওদের কাজকর্ম অনেকের পছন্দ হচ্ছে না। বরফের সময় যাতে সবাই ভাল থাকে তার জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। আমরা এভাবে কখনও ভাবিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের কথা শুনলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

'কোন ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত কথা শুনব।' কাহ্ন কথাগুলো বলে মুখ ফেরালেন, 'এই অসময়ে মনে হচ্ছে আরও কিছু বিদেশী আসছে। বিদেশী মানেই যে সন্দেহজনক মানুষ এই ধারা অবশ্য এখন আমাদের ঠিক ততটা নেই। তোমরা যাও, ওদের অভ্যর্থনা কর।'

ওরা দুজনেই সোজা উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল। যে পথে ব্যাপারীরা আসে সেই পথেই ছোড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। অন্তত গোটা দশেক ছোড়া। কোন পদাতিক নেই। ওদের চলার গতি আছে। ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই ওদের দেখতে পেয়েছে। বিন্দুর চেয়ে সামান্য বড় এখন। কিন্তু তাতেই গ্রামে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। অনেকেই ভাবল ব্যাপারীরা এবার দলে ভারি হয়ে

এচুর জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসছে। কিন্তু পালদেম চাপা গলায় বলে উঠল, 'পুলিস। ওরা বোধহয় পুলিস।'

লা-ছিরিও দেখার চেষ্টা করছিল, 'আমরা কি করব এখন?'

কাহ্ন বললেন, 'হতক্ষণ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হচ্ছি ততক্ষণ আমরা ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব।'

এখন ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দলে দুজন বিদেশী, তারাই আগে আগে আসছে। পেছনের মানুষেরা যে পাহাড়ের তা মুখ দেখেই বোঝা যায়। গ্রামের মুখে পৌঁছে ওরা সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে গতি রোধ করল। গ্রামবাসীরা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে আগন্তুকরা ব্যাপারী নয়। কি করা উচিত ওরা যেন বুঝতে পারছিল না। মন্দিরের চত্বর অনেকটা উঁচুতে বলে পালদেমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ওদের। অস্বারোহীদের একজন চিৎকার করে বলল, 'এই গ্রামের পাল্লা কোথায়?'

গ্রামবাসীরা ঠেলাঠেলি করে বুদ্ধকে এগিয়ে দিল সামনে। পাহাড়ের একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করল 'তুমি এই গ্রামের পাল্লা। তুমি বল, এই গ্রামে কোন বিদেশী আছে কিনা!'

পাল্লা জড়ানো গলায় কিছু বলতে তাকে ধমকে উঠল লোকটা, 'ভাল করে কথা বল।'

পাল্লা এবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। প্রত্যেকের শরীরে একই রকমের পোশাক। প্রতিটি ঘোড়ার শরীরে অস্ত্র বাঁধা। বিদেশী জিজ্ঞাসা করল, 'তারা কোথায়?'

পাল্লা হাত বাড়িয়ে একটা দিক নির্দেশ করতে লোকটা বলল, 'তুমি আমাদের পথ দেখাও।'

পালার পক্ষে দ্রুত হাঁটা এখন অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সে এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছিল এই লোকগুলো সুবিধের নয়। এই সময় একজন পাহাড়ি অস্বারোহী চিৎকার করে বলল, 'আমরা পুলিস। তোমাদের এখানে তিনজন ডাকাত লুকিয়ে আছে। এরা খুব খারাপ লোক। অনেক মানুষ খুন করে এরা এখানে এসেছে তোমাদের খুন করবে বলে। এদের কাছে অস্ত্র আছে। এদের ধরিয়ে দিলে তোমরা নিজেদের উপকার করবে।' কথাগুলো বলে লোকটা প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে তাকাল।

গ্রামবাসীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কেউ নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিল না। পাল্লা যখন হাঁটিতে শুরু করেছে তখন অস্বারোহীরা এগোতে লাগল। আর তখনই একজন গ্রামবাসী চাপা গলায় বলে উঠল, 'মানুষ যারা খুন করে তাদের চেহারা ওরকম হয় না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'ওরা খামোকা মিথ্যে বলবে কেন! এখানে আসতেও তো কষ্ট হয়েছে।'

এখন অস্বারোহীদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গীতে ওরা

এগোচ্ছে। তাই দেখে লা-ছিরিঙের হাসি পেয়ে গেল। ওরা যদি জানতে পারে মাদের খোঁজে এসেছে তারা এখন ওহায় আছে এবং সেখানে পৌঁছাতে হলে পায়ে হেঁটে উঠতে হয় তাহলে কি করবে ?

আস্তানাটা ঘিরে ফেলল ওরা। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেল ওর ভেতরে কেউ নেই। বিদেশী অফিসার পালার কাঁধ চেপে ধরল। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত মনে হাঙ্গুল লোকটাকে, 'মিথ্যে কথা বললি কেন ? কোথায় ওরা ?'

পালা খর খর করে কাঁপছিল, 'আমি জানি না। আমি জানি না।'

'তুই এই গ্রামের মোড়ল আর তুই জানিস না ? সত্যি কথা বল নইলে মেরেই ফেলব।'

পালার কাঁধে সম্ভবত যন্ত্রণা হাঙ্গুল, 'আমি জানি না।' বলতে বলতে সে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে সজোরে আঘাত করল লোকটা। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল পালা। লা-ছিরিঙের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তখনই তার হাত মুঠোয় নিল পালদেম, 'চুপ করে থাক। মাথা গরম করিস না।'

এই সময় ভেতর থেকে দুজন বেরিয়ে এল, 'ওরা এখানে ছিল স্যার। এখানে অনেক জিনিস পড়ে আছে যা এই এলাকার মানুষ ব্যবহার করে না। এই খালি ব্র্যান্ডির বোতলটা দেখুন আর সিগারেটের প্যাকেট, ইনট্যাক্ট।'

অফিসার পড়ে থাকা পালার শরীরটার দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালেন। তারপর কয়েক পা এগিয়ে ভীত গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিলেন। পালদেম আশঙ্কিত হয়ে দেখল লোকটা তার ভেনা। অফিসার ভেনাকে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কবে এখান থেকে গিয়েছে।'

ভেনার গলার স্বর কাঁপল, 'বোধ হয় আজই। কারণ কাজ রাত্রেও ওরা এখানে ছিল।'

'কোথায় গিয়েছে ?'

'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।'

'শোন, আমি সত্যি কথা জানতে চাই। তোমাদের মুখ দেখতে এতটা পথ আমি কষ্ট করে আসিনি। যে করেই হোক ওই তিনটে লোককে আমরা চাই।'

ভেনা তো বটেই গ্রামবাসীরা কোন উত্তর দিল না। অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা এখানে কি করত ? তোমাদের সঙ্গে কথা বলত ?'

ভেনা অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, 'না।'

অফিসার তার মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে গেল, 'তাহলে অত টাকা কে দিল ? তোমরা দুটো গল্প চালু করেছ। অভিশাস্ত্রীরা তোমাদের দিয়ে গিয়েছে আর এখানে একটা মরে মাওয়া ডাকাতের কাছে তোমরা টাকা পেয়েছ। এবার সত্যি কথা বল।'

ভেনা এক পা সরে গেল, 'আমি জানি না। যা কিছু ব্যাপার সব পালদেম জানে।'

‘পালদেম। পালদেম কে? ডাকো তাকে।’

মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে পালদেম নিজের নামটা মুখে মুখে সজোরে উচ্চারিত হতে শুনল। সে খানিকটা অসহায়ের মত নিচের দিকে তাকাল। তারপর লা-ছিরিঙকে বলল, ‘আমার যদি কিছু হয় তাহলে ওদের খবর দিস। তুই কখনও সামনে যাস না। আমি যাচ্ছি।’

পালদেমকে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে পালদেম মাথা দোলানো।

‘ওরা কোথায়?’ দাঁতে দাঁত ঘষলেন অফিসার।

‘জানি না। সকালে উঠে দেখেছি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।’

‘কেন?’

‘ওদের একজন মরে গেছে জানতে পেরে কাল থেকে নিজেরা পরামর্শ করছিল।’

‘কি করে জানল!’ এখান থেকে অনেক দূরে ঘটনাটা ঘটেছে।’

‘আমি সেটা বলতে পারব না।’

‘কত টাকা দিয়েছে তোমাকে?’

‘অনেক। তাই দিয়ে আমার ব্যাপারীদের কাছ থেকে শীতের জন্যে জিনিসপত্র কিনেছি।’

‘কোথায় যেতে পারে ওরা?’

পালদেম চারপাশে তাকাল। তারপর কল্যাণ যে পথে চলে গিয়েছিল সেই পথটা দেখাল, ‘ওই দিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে ফালুটে যাওয়ার।’

অফিসার নির্দেশ দিতেই ছয়জন অস্বারোহী সমস্ত গ্রামটার মধ্যে ছড়িয়ে গেল। একটু বাদেই চিৎকার চোঁচামেচি উঠল। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পালদেম আর ভেনাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। সমস্ত গ্রামটা লগুঙু করে তল্লাশ শেষ করে অস্বারোহীরা ফিরে এসে বলল, ‘ওরা এখন গ্রামের মধ্যেই নেই। কিন্তু এখানে বেশ জমিয়ে বসেছিল ওরা। কয়েকটা এমন ধরনের বড় ঘর বানানো হয়েছে যা পাহাড়ের কোন গ্রামে নেই।’

বিরক্ত অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঘর কেন?’ প্রশ্নটা পালদেমের উদ্দেশ্যে।

‘যাতে বরফের সময় এখানে বুড়োদের কষ্ট না হয়।’ ওনা উত্তরটা দিল।

অফিসার পালদেমের সামনে এসে দাঁড়ালেন, ‘আমার মনে হচ্ছে তুমি জানো ওরা কোথায় আছে?’

‘আমি জানি না।’

বলা মাত্র রিভলভারের বাঁটি দিয়ে ওর মুখে আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে মুখ চেপে ধরল পালদেম। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল এখন। আগুলের ফাঁক দিয়ে হাতে গড়িয়ে পড়ছিল। অফিসার তাঁর সঙ্গীদের বললেন, ‘ওকে সঙ্গে নিয়ে চল। তাই দেখে যদি গ্রামের লোক হাতিশ না বলে দেয় তাহলে ওকে আর বেঁচে এখানে ফিরতে হবে না।’ একজন পাহাড়ি

অস্বারোহী পালদেমের কোমরে দড়ি বেঁধে দিল। পালদেম অসহায়ের মত ওপরে চারপাশে তাকাচ্ছে। দূরে দাঁড়ানো ভীত গ্রামবাসী, পাশে মুখ নিচু করে থাকা তার ভেনা এবং ওপরে দাঁড়ানো কাছনকে সে চূপচাপ দেখল। অফিসারের নির্দেশে একজন অস্বারোহী চিৎকার করে জানাল, 'তোমরা যদি না জানাও ওরা কোথায় আছে তাহলে এই লোকটাকে আমরা মেরে ফেলব।'

কোন সাড়া এল না। অফিসার আবার নির্দেশ দিতেই লোকটা জানতে চাইল, 'এর বউ কোথায়?'

এই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে পালদেমের বউ বেরিয়ে এল।

লোকটা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্বামী মরে যাবে তুমি চাও?'

হঠাৎ মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, 'কেন তোমরা ওর ওপর অত্যাচার করছ?'

'কারণ তোমরা বলছ না যাদের আমরা চাই তারা কোথায়?'

পালদেমের বউ বলল, 'আমি জানি না। আর জানলেও বলতাম না।'

অফিসার হতভম্ব হয়ে পড়লেন, 'তোমার স্বামীর জীবন বাঁচাবে না?'

'যারা আমার ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে তাদের সঙ্গে বেইমানি করব না।'

পালদেমের বউ-এর কথা শেষ হওয়া মাত্র গ্রামবাসীদের মুখে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। অফিসার চমকে তাকালেন। এই প্রথম গ্রামের মানুষেরা অসন্তোষ জানাচ্ছে। অবশ্য তিনি ভীত হলেন না। এতগুলো মানুষকে খালি হাতে কব্জা করার মত অল্প তাঁর সঙ্গে আছে। কিন্তু এই গ্রামের কাছাকাছি উগ্রপন্থীরা আছে জানা সত্ত্বেও তিনি খালি হাতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছিলেন না।

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার পর অফিসার ঠিক করলেন পালদেমকে মুক্তি দেওয়া উচিত হবে না।

আবার এই বিচ্ছিন্ন গ্রামে রাত কাটানো ওদের পছন্দ হচ্ছিল না। পালদেমকে নিয়ে গেলে আজ না হোক কাল এরা খবর পেয়ে দেবেই।

অস্বারোহীরা ফিরে যাচ্ছিল। পেছনে কোমরে দড়ি বাঁধা পালদেম টলতে টলতে উঠছিল। আর তার পেছনে গ্রামবাসীরা। তাদের গলায় কান্না। গ্রামের সীমানা ছাড়ানোর পরই মেঘগুলো নেমে আসতে লাগল দ্রুত। মুহূর্তে সমস্ত চরাচর অন্ধকার হয়ে গেল। অস্বারোহীরা তাদের গতি বাড়াবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ওপর থেকে একটা বড় পাথর গড়িয়ে এল তাদের সামনে। ছোড়াগুলো চিৎকার শুরু করল। পাথরটা আঘাত করল ডানদিকের একটা ছোড়ার শরীরে। আহত হয়ে মুখ খুবড়ে পড়ল সেটা। মেঘ এবং অন্ধকারে অস্বারোহীরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অফিসার কয়েকবার ফাঁকায় ওলি চালালেন। এবার একটার পর একটা পাথর পড়তে লাগল।

আরও দুটো ঘোড়া আহত হল তাতে। পালদেম দড়ি বাঁধা অবস্থায় পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। পাথর গড়াবার পর থেকে নিচের গ্রামবাসীরা আর উঠছে না। আহত ঘোড়াদের আরোহীরা তখন নিচে দাঁড়িয়ে। তাদের একজন ছুটে গেল সামনে। তার পরেই ফিরে এসে চিৎকার করল, 'স্যার, ওকে ছেড়ে দিন। নইলে আমরা এখান থেকে বের হতে পারব না।'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কারা?'

লোকটি জবাব দিল, 'দেখতে পাচ্ছি না। তবে সমস্ত পাহাড় জুড়ে পাথর আছে, ঠেলে দিলেই হল। একজনের পোশাক দেখতে পেয়েছি। সে উগ্রপহী নয়।' অফিসার দাঁতে দাঁত ঘষলেন। তার হকুমে পালদেমের কোমর থেকে দড়ি খুলে দেওয়া হল।

অফিসার চিৎকার করলেন, 'ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া যাবে?' একজন উত্তর দিল, 'চেষ্টা করতে পারি স্যার।'

'তাহলে এই ঘটনাটার কথা ভুলে যাও। সবাই জানবে আমরা উগ্রপহীদের হাতিশ পাইনি। ওদের বল আমরা বন্দী নিয়ে যাচ্ছি না।'

কথাটা জানানো হতেই পাথর গড়ানো বন্ধ হল। আহত ঘোড়াগুলোকে কোন মতে হাঁটিয়ে দলটা যখন অদৃশ্য হল তখন চারধার চুপচাপ। অন্ধকার আরও ঘনানো। হতভম্ব পালদেম তখনও দাঁড়িয়ে। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের উপরে একটি শরীর অস্পষ্ট দেখা গেল। তার পর তার গলার চিৎকার ভেসে এল, 'মেয়ে বন্দুকবাজকে বলো আমরা তার খণ শোধ করলাম।'

পালদেম কথা বলতে পারছিল না। এবার তার পেছনে লা-ছিরিঙের গলা শোনা গেল, 'লোকটা কে বুঝতে পারছ?'

পালদেম মাথা নাড়ল, 'হঁ'। রোলেন।'

॥ ৪৫ ॥

সারারাত ঘুমোতে পারেনি জয়িতা। না, শীত কিংবা বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ নয়, স্নেহ ভালুক বাচ্চাদের কুঁই কুঁই ডাক কানের পর্দা থেকে অস্বস্তিটা মুছতে দিচ্ছিল না। প্রথম দিকে আনন্দ ওই ডাকটা খামাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিল কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ও দুটোর খিদে পেয়েছে এবং তরল কিছু না পেলে ওদের ক্ষুধার্ত থাকতেই হবে। এখন পর্যন্ত চিবিয়ে খাওয়া অভ্যাস তৈরী হয়নি।

দ্বিতীয়ত, গুহায় আগুন জ্বলছিল, উত্তাপ ছিল। যে যার নিজের নিরাপদ বিছানায়, গুহেও পড়েছিল, শুধু মেরেটির শোওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সে প্রথম দিকে আগুনের পাশে বসেছিল। পায়ের তলায় বিছানো তীব্র কাপড় এরমধ্যেই স্যার্সেঁতে হয়ে গেছে। মনে মনে ওর জন্যে একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছিল জয়িতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভেবে আশ্রয় হয়েছিল যে ঠাণ্ডার সঙ্গে ওদের লড়াবার ক্ষমতা আছে। মাঝরাতের পর যখন হাওয়ারা পাহাড়

কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, গুম গুম শব্দ হচ্ছে চার ধারে, নিবে আসা আগুনের শরীরেও যেন হিম ঢুকে পড়েছে তখন সে চমকে উঠেছিল। মেয়েটি শুয়ে আছে সুদীপের শরীর ঘেঁষে। নিরাপদ বিছানায় ঢুকে থাকায় সুদীপের শরীরে ঠাণ্ডা কম লাগছে এবং তাকে জড়িয়ে কিছুটা উত্তাপ নেওয়ার চেষ্টা করছে মেয়েটা। ডালুকের বাচ্চাদুটো সম্ভবত স্থানচ্যুত অথবা ক্ষিদের কারণে সুদীপের আশ্রয় ছেড়ে কাঁপা পায়ের ঘুরছে গুহার মধ্যে। নিবস্ত আগুনের কাছে পৌঁছে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেপে থাকছে।

মেয়েটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল জয়িতা। কোন সঙ্কোচ অথবা আড়নেই। ক্রমশ গুর দুটো হাত সুদীপকে জড়িয়ে ধরল। যেন এই করলেই সে শীতের হাত থেকে পরিভ্রাণ পাবে এমন মনে হচ্ছিল। খানিক তাকিয়ে জয়িতা মুখ ফিরিয়ে নিল। সে দ্বিতীয় অঙ্গস্তির অস্তিত্ব টের পেল। এবার কানে নয়।

অথচ সুদীপের কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে আছে শিশুর মতন। যদিও মেয়েটিকে ঠিক মা বলে মনে হচ্ছে না। সুদীপের মুখ অবশ্য জয়িতা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। নরনারীর আলিঙ্গন মানেই যে অবখারিত যৌনতা এমন ভাবার কারণটা দূর হতে সম্ভব লাগল। দুটো শরীর পরস্পরের উত্তাপ নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে সেটাকে সে কি বলবে? কিন্তু তার মনে হচ্ছিল মেয়েটি অনেক সহজ। এতদিন সুদীপকে জেনেও সে কোন হিমের রাতে এইভাবে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারত না। অথচ মেয়েটি সামান্য পরিচয়ে যৌনতাহীন আলিঙ্গনের তাপ নিতে পারছে। ঘুম এল না জয়িতার। এবং তখনই তার মনে হল মেয়েটি আনন্দের দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করেনি। তার যা কিছু করার সুদীপকে নিয়েই করছে। এই মুহূর্তে সুদীপ জড়তাক্রান্ত। শুধু শারীরিক প্রয়োজন হলে মেয়েটি আনন্দকে উদ্ভুদ্ধ করার চেষ্টা করত। মেয়েটি অবশ্যই সুদীপের সম্পর্কে দুর্বল হয়েছে। একেই কি ভালবাসা বলে? বুকোর ভেতর জমে ওঠা অঙ্গস্তিটা এবার টনটনানির পর্যায়ে চলে গেল।

সকালে রোদ উঠল না, সূর্যের হৃদিশ নেই। গুহার বাইরে মুখ বের করে আতঙ্কিত হল ওরা। একটা ময়লা আলো নোতিয়ে রয়েছে বরফের ওপরে। কাল সারারাত প্রচুর তুষারপাত হয়েছে এখানে। যে গাছগুলোর ন্যাড়া ডাল গতকাল দেখা গিয়েছিল সেগুলো এখন সাদায় সাদা। বীভৎস আকাশটা নেমে এসেছে যেন মাথার ওপরে। আর থম ধরে আছে চৌদিক।

শরীরের বাড়তি ভার কমিয়ে ফেলতে যেদিকে আনন্দ গেল তার বিপরীতে পা ফেলল জয়িতা। একটু আগেই সুদীপকে নিয়ে মেয়েটি বেরিয়েছিল। ওদের দিকে পেছন ফিরেছিল সুদীপ, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি মেয়েটি ওর প্যান্টের বোতাম খুলে জলবিয়োগ করতে সাহায্য করেছে। আজ সকালে কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা মাথায় আসেনি। যেমন করে একজন নার্স তাঁর

ভূমিকা পালন করেন সেইভাবে মেয়েটি কর্তব্য করছে বলে মনে হয়েছিল। সুদীপের হয়ে গেলে মেয়েটি ওর পাশেই বরফের ওপর বসে পড়ে ভারমুক্ত হল। এটাই জয়িতার নার্ভে ধাক্কা মারল। গতকালও মেয়েটি একটা আঁরু রেখেছিল। আজ সেটিও বজ্রিত হয়েছে। অথবা এখন ওই ভালুকছানা এবং সুদীপের মধ্যে তার কাছে কোন ফারাক নেই। কিন্তু ও জানত পিছনে গুহার মুখে আনন্দ এবং জয়িতা দাঁড়িয়ে আছে। ও যখন সুদীপকে ধরে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এল তখন মুখে কোন অন্যান্যবোধ নেই। অনেকটা আড়ালে এসে জয়িতা চারপাশে তাকাল। পাহাড়ের চূড়োগুলো এখন দেখা যাচ্ছে না। ঘোলাটে হয়ে আছে সব কিছু। নিজেকে মুক্ত করার মুহূর্তে তার মনে হল মেয়েটির ওপর রাগ করার কোন মানে হয় না। এই মুহূর্তে সে ধরে নিয়েছে কোন মানুষ আশেপাশে নেই। একটি পুরুষ যা পারে একটি মেয়ের পক্ষে তা শোভনীয় নয় তাই আজন্ম জেনে এসেছে। সেই কারণেই নির্জন জায়গা বেছে নেওয়া। কিন্তু এটাও তো এক ধরনের দুর্বলতার প্রকাশ। মেয়েটি ধরে নিয়েছে সে কোন অন্যান্য কাজ করছে না, কোন অশালীন দৃশ্য তৈরী হলে যে দেখছে সেই তৈরী করে নিচ্ছে তখন তার বাধা কোথায়? ছেনেদের বেলায় যা স্বাভাবিক তা মেয়েদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু হবে কেন? এ সবই মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে রক্তে মেশা সংস্কার। এই মেয়েটি অন্তত অনেক স্বাভাবিক। জয়িতা চারপাশে তাকাল। একটা রাত কেটে গেল গুহার মধ্যে চারপাশে বরফ রেখে। আর এখানেও সে বয়ে চলেছে কলকাতার মানসিকতা।

হঠাৎ বাঁ দিকে মুখ ফেরাতেই সে চমকে উঠল। যেন বিশাল বরফের চেউ পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামছে নীচে। জয়িতা দৌড়তে লাগল আতঙ্কিত হয়ে। তার মনে হচ্ছিল সমস্ত পাহাড় এমন গলছে। আর তখনই হাওয়া উঠল। সে যখন গুহায় পৌঁছাল তখন আকাশে ধূন্ধু মার কাণ্ড। ঘনঘন বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। আর ক্ষুদ্র ঝাঁড়ের মত বরফ মেশানো বাতাস আছড়ে পড়ছে গুহার বাইরে। ওদের তাঁবুর কাপড় দিয়ে বানানো গুহার আড়ালটা খরখরিয়ে কাঁপছে। যেহেতু পাহাড় আড়াল করে আছে এবং বাতাসের মুখ এদিকে নয় তাই ওটা এখনও টিকে আছে কোনমতে। ভেতরে ঢুকে জয়িতা দেখল আনন্দ জল গরম করছে। সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বাইরে প্রলয় হচ্ছে।' আনন্দ জয়িতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তোরা চেহারাটা যা হয়েছে না! একদম শ্বেত ভালুক।'

জয়িতা নিজের দিকে তাকাল একবার তারপর চিৎকার করে বলল, 'বোকার মত কথা বলিস না। আমরা যে কোন মুহূর্তে বরফচাপা পড়তে পারি। মনে হচ্ছে পাহাড়টা নেমে আসছে।'

আনন্দ বলল, 'কিছু করার নেই। বাইরে বের হলে যখন মৃত্যু অনিবার্য তখন এখানে থাকটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের এবার চায়ের নেশাটাও ছাড়তে হবে, পাতা ফুরিয়ে আসছে।'

শরীরের ওপর জমে যাওয়া বরফগুলো বোড়ে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এরকম ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছিস ?'

'কী করব ?' চা চামল আনন্দ, 'মেয়েটা বলল গ্রামে বরফ পড়ার ঠিক আগে নাকি প্রতি বছর এই রকম কাণ্ড হয়। এর পরে বিজার্ড বইবে। তুই ভাবতে পারিস বাঙালির ছেলে বিজার্ডের মুখোমুখি হচ্ছে ?'

'বাইরে বের হলে খিলটা টের পাবি।'

'সেই জন্যেই ভেতরে বসে আছি। নে, চা খা। ব্লেকফাস্ট কাম লাঞ্চ মাংস।' চামে চুমুক দিতে বিশ্বাস হল মুখ। চিনি কম আর কষা হয়েছে পদার্থটা। কিন্তু তবু গরম পানীয় বলে কথা, জয়িতা নিজেই একটা আরাম বানিয়ে নিচ্ছিল। প্রত্যেককে চা দেওয়ার পর আনন্দ ভালুকছানা দুটোকে নিয়ে পড়ল। একদম নেতিয়ে পড়েছিল ওরা, গরম চা মুখে পড়তে প্রথমে প্রতিবাদ, তার পরে গোপ্রাসে গিলতে লাগল। জয়িতা বাচ্চাদুটোকে দেখছিল। পেট ভরে খাওয়ার পর ওদের মুখে চমৎকার আরাম। দুজন দুজনের শরীরে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল এবার। আনন্দ বলল, 'পশুর সঙ্গে মানুষের এখানেই প্রভেদ। মানুষ অল্পে সম্ভল্ট হবার মনটা হারিয়ে ফেলেছে।'

দুপুরের পর থেকেই আকাশ পরিষ্কার। এমন কি মোলায়েম একটা আলো ফুটল পৃথিবীতে। দেখা গেল বরফ জমেছে প্রচুর। ন্যাড়া গাছগুলোর অনেককেই আর দেখা যাচ্ছে না। আকাশে ছিঁটে ফোঁটাও মেঘ নেই। এমন কি চোখ মেলতেই মাকালু ঝকমকিয়ে উঠল। কিন্তু যেপথে ওরা এসেছিল এবং যে পথে লা-ছিরিং ফিরে গিয়েছিল সেই পথটাই নেই। আনন্দ বলল, 'স্বাক, এ যাত্রায় বাঁচা গেল। মনে হয় লা-ছিরিঙ খবর নিয়ে আসতে পারে এবার।'

জয়িতার কথাটা ভাল লাগল না। বলল, 'ওর জন্যে অপেক্ষা না করে আমরা যদি নেমে যাই তাহলে সন্ধ্যার আগে গ্রামে পৌঁছাতে পারব। গ্রামে ঢুকেই বুঝতে পারব পুলিশ এসেছে কি না।'

'যখন বুঝবি তখন কিছু করার থাকবে না হয়তো। রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না।'

'তুই ক্রমশ কেমন ভীতু হয়ে যাচ্ছিস।' জয়িতা বিরক্ত গলায় বলল।

আনন্দ চোখ তুলে তাকাল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমরা চারজন এখানে এসেছিলাম। একজন পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। আর একজন বেঁচে থেকেও অকেজো। এই অবস্থায় আর একটা দুর্ঘটনা ঘটাবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া আমরা তো জলে পড়ে নেই।'

আনন্দ খুব একটা ভুল বলছে না। কিন্তু জয়িতার মনে হল এরকম কথা সেই সব মানুষেরাই বলে থাকে যারা উদ্যম হারিয়ে ফেলে। সে বলল, 'কিন্তু এইভাবে আটকে থেকে আমরা বি. করতে পারি। পুলিশ গ্রামে এসে আমাদের কথা জানতেই পারবে। বলা যায় না, হয়তো এর জন্যে আমাদের কাছাকাছি মানুষদের ওপর ওরা অত্যাচারও করতে পারে। আমাদের মনে হয় যতদূর সম্ভব

নেমে গিল্পে একটু হদিশ নেওলা যাক । বিপদ বুঝলে ফিরে আসব ।’
আনন্দ এবার দোনমনা করল, ‘এত বরফের মধ্যে সুদীপকে নিয়ে নামা
যাবে ?’

‘সুদীপ ওই মেয়েটার সঙ্গে এখানেই থাক । যদি ফিরে আসি তো ভাল, নইলে
লা-ছিরিও নিশ্চয়ই ওকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবে । মেয়েটি তো ওকে যত্ন
করছে বেশ ।’

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল । গতরাতে মেয়েটির ব্যবহার তারও চোখে
পড়েছে । সুদীপের যা অবস্থা তাতে মেয়েটির এই ব্যবহার তার কাছে
দৃষ্টিকটু মনে হয়নি । কিন্তু এখন মনে হল জয়িতা বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক
সহ্য করতে পারছে না । ও বুঝতে পারছিল না মেয়েরা কেন এত অসহনীয়
হয়ে ওঠে একটি পুরুষকে ঘিরে ? বিশেষ করে যার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক নেই
এমন পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়ে ঘনিষ্ঠ হলেও সেই দৃশ্যের কাছাকাছি থাকাটা
তাদের কাছে কেন অস্বস্তির হয় ! শেষবার সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল,
‘কিন্তু আমরা চলে গেলে ভালুকটালুকও তো আসতে পারে । গুহাটার কথা
নিশ্চয়ই পাহাড়ি জন্তুদের জানার কথা ।’ এইটে মাথায় আসেনি । জয়িতা
এক মুহূর্ত ভাবল । তারপর সোজা গুহায় ফিরে গেল । সুদীপ বসে আছে ।
আর মেয়েটি গুনগুন করে ওকে গান শোনাচ্ছে । জয়িতাকে দেখে মেয়েটি থেমে
গেল । সে সরাসরি সুদীপের দিকে চলে এল, ‘কেমন আছিস সুদীপ ?’

সুদীপের চোখের পাতা পড়ল । জয়িতার মনে হল ওর মাথায় একটা কিছু
এসেছে নইলে মুখ অমন উজ্জ্বল হতো না । ঠোঁট ফাঁক হল সুদীপের ।
তারপর অনেক কষ্টে কিছু বলল । কিন্তু সেই শব্দগুলো বোধগম্য হল না
জয়িতার । সে মেয়েটির দিকে ফিরল, ‘আসরা একবার গ্রামের দিকে যাওয়ার
চেষ্টা করছি । যদি পৌঁছতে না পারি, তাহলে ফিরে আসব । পারলে ওরা
আসবে তোমাদের নিয়ে যেতে । ঠিক আছে ?’

মেয়েটি মাথা নাড়ল । কতটা সে বুঝতে পারল তা অনুমান এল না । জয়িতা
শেষ প্রশ্নটা উচ্চারণ করল, ‘কিন্তু কোন জন্তু জানোয়ার এলে কি করবে
তোমরা ?’

মেয়েটি এক মুহূর্ত চিন্তা করল । তারপর ঊর্ধ্বে সুদীপের বিছানার নীচ থেকে
একটা লাঠি বের করে সামনে রাখল । জয়িতা বুঝল কিছু করার নেই । ওর
হাতে রিভলভার দিয়ে যাওয়া যায় না । এই তুষারঝড়ের পর কোন পাহাড়ি
জন্তুর আবির্ভাব হবে বলে মনে হয় না, ওই লাঠি যে কোন কাজেই লাগবে
না তা এই মেয়েটি কি জানে না !

জয়িতা আবার বাইরে বেরিয়ে এল । আনন্দের সঙ্গে ভালুক ছানা দুটা এবার
খেলা করছে । ব্যাপারটা চোখে পড়া মাত্র চিড়বিড়িয়ে উঠল মন । ‘এটা কি
খেলার সময় ?’

ওকে দেখতে পেয়ে আনন্দ চিৎকার করল ‘কি ঠিক করলি ?’

‘আমি একাই যাব।’ জয়িতা শক্ত গলায় বলল।

‘আর ইউ ম্যাড?’ আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল।

জয়িতা মাথা মাড়ল, ‘ভেবেচিন্তেই বলছি। লা-ছিরিও আর পালদেমকে আমাদের সাহায্য করার জন্য পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে। সে ক্ষেত্রে কে খবর দেবে আমাদের?’

‘কোন পুলিশ? ইণ্ডিয়ান পুলিশ ওদের অ্যারেস্ট করতে পারে না।’

‘এই নির্জন পাহাড়ে আইন কতটা সক্রিয় আমার সন্দেহ আছে। নেপালি পুলিশ সঙ্গে থাকতে পারে।’

আনন্দ এক মুহূর্ত কিছু ভাবল। তারপর নীচু গলায় বলল, ‘শ্রিক আছে, যা। আমি সুদীপকে এইভাবে ছেড়ে যেতে পারছি না।’

বেশ সাহস নিয়ে নামা শুরু করল জয়িতা। মাঝে মাঝেই হাঁটু ডুবে যাচ্ছে নরম বরফে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আনন্দ অথবা গুহা চোখের আড়ালে চলে গেল। এখন নির্জন সাদা পাহাড়ে সে একা। কোথাও কোন শব্দ নেই। এমনকি একটি পাখিও কোথাও ডাকছে না। খুব সাবধানে জয়িতা কমলারঙের রোদ গায়ে মেখে পা ফেলছিল। পাথর এবং তার খাঁজগুলো এখন বরফের আড়ালে। সামান্য অসাবধানতা যে বিপদ ডেকে আনবে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। কিছুক্ষণ নামবার পর সে হাঁপাতে লাগল। এমন একটা বরফশূন্য জায়গা নেই যেখানে বসে জিরোতে পারে। যে পথ দিয়ে ওরা উঠে এসেছিল সে পথ উধাও। হাতে পায়ে যাচাই করে জয়িতা নামছিল। এখন তাকে পথ করে নিতে হবে! এবং তখনই তার পতন হল। যে বরফকে তার শক্ত মনে হয়েছিল তা তাকে টেনে নিয়ে গেল অনেকটা নীচে। কোনও রকমে দুটো হাতে ভর রেখে নিজেকে সামলালো সে। খরখর করে কাঁপছে বুক। আর একটু ওপাশে পড়লেই এই জীবনে উঠে দাঁড়াতে হত না। যেখানে পড়েছিল সেই বরফের ওপরে বসে রইল সে কিছুক্ষণ। এখান থেকে নামার জায়গা নেই। কিন্তু নীচের জঙ্গলের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। সেখানেও সাদাটে তুষার জড়ানো। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর শরীর ধাতস্থ হল। একমাত্র হাঁটু এবং কনুইতে ব্যথা ছাড়া অন্য অঙ্গস্তি নেই। সে উঠে দাঁড়াল। এখনও সবুজের কোন চিহ্ন নেই। ক্যাপ্টেন স্কট অথবা হান্ট এইরকম বা এর চেয়ে বীভৎস বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। সেইসব কাহিনী পড়ার সময় যে উদ্বেজনা আসতো তার বিস্ময়কর এখন নেই। বরং একটা শীতল ভয় ছড়িয়ে পড়েছে মনে—যদি আরও বরফ পড়ে, যদি এখান থেকে বের হতে না পারে। ডান দিকে একটি চাতালের মত বরফ রয়েছে দেখতে পেল সে। ওটা শক্ত না নরম তা এখান থেকে বোঝা অসম্ভব। কিন্তু ওইটে ছাড়া কোন রাস্তা নেই। জয়িতা ইতস্তত করল খানিক। তারপর মরিয়া হয়ে লাফ দিল। শূন্য থেকে শরীরটা চাতালে পড়ার পর পাদুটো যখন অতলে তলিয়ে গেল না তখন হাসি ফুটল তার মুখে। এপাশে একটা পথ বের হতে পারে। সাবধানে

এগোতে সে চমকে উঠল। এবং নিজের অজান্তে একটা আর্তনাদ ছিটকে বেরল শরীর থেকে। দুহাতে মুখ ঢাকল জয়িতা। এখন তার সমস্ত শরীরে শীত ছাড়ানো কম্পন। খানিকটা সময় যাওয়ার পর চোরের মত আঙ্গুল সরিয়ে আবার সামনের দিকে তাকাল। লোকটা পড়ে আছে পা ছড়িয়ে। দুটো চোখ খোলা। নিঃসাড়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডানহাতের মূঠোর আটকে আছে পাত্রটি। যে পাত্র জল নিয়ে এসেছিল সে পর্বতশৃঙ্গ থেকে অসুস্থ মাকে সুস্থ করার বাসনায়। এই মানুষটির সঙ্গে গতকাল তারা কথা বলেছিল। এর জেদে বিস্মিত হয়েছিল, আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছিল। কিন্তু যে অত বড় পর্বত থেকে নেমে আসতে পারল সে এখানে মরে পড়ে থাকবে কেন? তারপরেই জয়িতার মনে পড়ল কুকুরটার কথা। লোকটির সঙ্গে ওরই তো থাকার কথা। কিন্তু কোথাও কুকুরটার হৃদিস সেল না সে। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। পাহাড়ি কুকুরের বিশ্বস্ততার গন্ধ সে অনেক পড়েছে। লোকটা পড়ল কি করে তা বুঝতে পারছে না জয়িতা। কিন্তু ওর মৃত্যু যে পতন থেকেই হয়েছে তা স্পষ্ট। মাথার পেছনে অনেকটা রক্ত ছড়িয়ে আছে এখনও। রক্ত জমে গেলে বীভৎস দেখায়?

জয়িতা দ্রুত মৃত্যুর গন্ধ এড়িয়ে যেতে চাইল। সে ওই মানুষটির জন্যে কিছুই করতে পারে না। এবং তখনই তার নজর গেল পাত্রটির ওপর। প্রাণ বের হবার মুহূর্তে লোকটি সতর্ক ছিল যাতে ঐ পাত্রটি ঠিক থাকে। সে ধীরে ধীরে পাত্রটি লোকটির আঙ্গুলের বাঁধন থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। ঠাণ্ডায় জমে ওগুলো এখন লোহার মত শক্ত। অনেক কষ্টে পাত্রটিকে মুক্ত করে সে আবার এগোল। হঠাৎ তার মনে হল এখন দায়িত্ব দুটো। নিজের শরীরকে ঠিক রাখার সঙ্গে এই পাত্রটিকে মৃতের মাগের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে হবে। এইভাবেই হয়তো এক জীবনের আধো শেষ কাজ আর এক জীবন এগিয়ে নিয়ে যায় শেষ করতে। অতএব তার গন্তব্য তাপল্যাও নয়, পাশের গ্রামে তাকে যেতে হবে। রোলেন বলে লোকটাকে সে কথা দিয়েছিল তাদের গ্রামে যাবে। কিন্তু তারপর পালদেমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় আর সময় পাওয়া যায়নি। নীচের দিকে বরফ অপেক্ষাকৃত কম। মাঝে মাঝে পাথরের মুখ দেখা যাচ্ছে। সাবধানে হাঁটছিল সে। এখন গাছের মাথার কাছাকাছি নেমে এসেছে সে। দিনের আলো রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সন্ধ্যা হতে খুব বেশী দেরী নেই। ঠিক তখনই সন্মিলিত সারমেয়ধ্বনি কানে এল। জয়িতা দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচ থেকে কুকুরগুলো ডাকতে ডাকতে উঠে আসছে। তাহলে কি পুলিশ কুকুর নিয়ে উঠে আসছে তাদের সন্ধানে। বাঁ হাতে কোমরের রিভলভারটার হাত দিতে গিয়ে চমকে উঠল সে। সেটা কোমরে নেই। অথচ বের হবার আগে সেটা কোমরেই ছিল। নতুন একটা ভয় আক্রমণ করল তাকে। কোথায় গেল রিভলভারটা। সে যখন পা পিছলে নীচে পড়েছিল তখনই কি ছিটকে গেছে সেটা? হঠাৎ খুব অসহায় বোধ করতে লাগল জয়িতা। হঠাৎ

কামড়ে নিজেকে সামলালো। এখন তার পক্ষে আর ওপরে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শরীরের সমস্ত শক্তি খরচ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পুলিশের কুকুর নির্ঘাত্ত তাকে খুঁজে বের করবে। এদের হাত থেকে কোনভাবেই পরিণাম নেই। জম্বিতা চট করে চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর কোনরকমে একটা ষড় পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকোল। এবং তখনই দুটো কুকুরকে দেখতে পেল। ডাকতে ডাকতে তারা উপরে উঠে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। সন্দেহের চোখে পাথরটার দিকে তাকাল। একজন খানিকটা এগিয়ে এসে ডাকতে লাগল। আর দ্বিতীয়জন নেমে গেল নীচে। অর্থাৎ সে ধরা পড়ে গেছে। কুকুরটার বীভৎস দাঁতের দিকে তাকিয়ে সিরসির করে উঠল শরীর। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যু চের ভাল। কেন যে সে আনন্দের কথায় অবাধ্য হল। আর তখনই দলটাকে উঠে আসতে দেখল। ওদের দেখতে পাওয়া মাত্র শরীরে প্রাণ ফিরে পেল জম্বিতা। না, এরা পুলিশ নয়। গ্রামবাসীরা উঠে আসছে কুকুর নিয়ে হয়তো তাদেরই খুঁজতে। কিন্তু এত লোকের ভেতাদের খুঁজতে আসার কথা নয়। পালদেমরা তো ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে চেয়েছিল? তবু আশান্বিত হয়ে জম্বিতা আড়াল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্র কুকুরগুলো চিৎকার দ্বিগুণ করে লাফাতে লাগল। যারা উঠেছিল তারা সম্ভবত জম্বিতাকে ওখানে দেখতে পাবে ভাবতে পারেনি। এইসময় শিস বাজল। বাজতেই যখন কুকুরগুলো বাধ্য হল তখন জম্বিতা গতকালের কুকুরটাকে দেখতে পেল। সে অনেকটা পিছিয়ে কাতর গলায় ডেকে যাচ্ছে। এমনকি শিসের আদেশও তাকে থামাতে পারেনি। এক মুহূর্ত চুপচাপ, তারপর জঙ্গলটা থেকে লোকটাকে বের হতে দেখল জম্বিতা। শক্ত শরীরে বিশ্বাসের পা ফেলে এগিয়ে আসছে সামনে। কাছাকাছি হতেই জম্বিতা চিনতে পারল, রোলেন। তাহলে এরা তাপল্যাণ্ডের মানুষ নয়। পাশের গ্রামের লোক কুকুর নিয়ে ওপরে উঠছে। রোলেন সামনে দাঁড়িয়ে মাথা একবার ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে কি করছ জানতে পারি কি?'

জম্বিতা মুখ উঁচু করে ওপরের দিকে তাকাল একবার, তারপর বলল, 'আমি ওপর থেকে নেমে আসছি।' রোলেন কি বুঝল সেই জানে, মাথাটা দুবার নাড়াল। এই অভ্যাস পাহাড়ি মানুষের মধ্যে প্রায়ই দেখতে পাচ্ছে জম্বিতা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা দল বেঁধে কোথায় যাচ্ছে?'

রোলেন জবাব দিল, 'আমাদের গ্রামের একটি ছেলে তার মায়ের জন্য ভগবানের জল আনতে পাহাড়ে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। সে ফেরেনি কিন্তু তার কুকুরটা ফিরে এসেছে। ওর ভাবভঙ্গীতে বুঝতে পারছি লোকটি খুব কাছাকাছি আছে। হয়তো অসুস্থ, হয়তো হাঁটতে পারছে না। কুকুরটা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

জম্বিতা ঠোঁট কামড়াল। তারপর দুঃখিত গলায় বলল, 'আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। সে বেঁচে নেই।'

‘কি বলছ তুমি ? তাকে দেখতে পেয়েছ ? অত ওপর থেকে আসছ ?’

‘হ্যাঁ। আমরা ওপরে একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম পুলিশ হয়তো আমাদের খোঁজে গ্রামে আসতে পারে। গতকাল লোকটা জল নিয়ে আমাদের গুহায় নেমে এসেছিল। ওই কুকুরটাও সঙ্গে ছিল। ও খাওয়া-দাওয়া করে আবার রওনা হয়েছিল বিকেলে। আজ একটু আগে ওর মৃতদেহ দেখতে পেলাম আমি। এখান থেকে খানিকটা ওপরে গিয়ে খুঁজলেই তোমরা পেলে যাবে ওকে।’ জয়িতা মুখ তুলে দেখার চেষ্টা করেও ঠিক হদিশ পেল না জায়গাটার। রোলেন চিৎকার করে খবরটা সঙ্গীদের জানিয়ে দিতেই একটা হতাশ শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হল। কিন্তু কেউ কাঁদল না।

রোলেন বলল, ‘ওর দেহ আমাদের তুলে আনা কর্তব্য। আজ পর্যন্ত অনেকেই ভগবানের জল আনতে পাহাড়ে উঠেছে কিন্তু খুব কম মানুষই ফিরে আসতে পেরেছে। ও যখন এতটা ফিরতে পেরেছিল তখন বোঝা যাচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদ ছিল ওর সঙ্গে।’

হঠাৎ জয়িতার মনে পড়তে পাল্টা তুলে ধরল, ‘এইটে ওর হাতে ছিল মৃত্যুর মুহূর্তেও। এইটে করে যে জল এনেছিল তা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল সে।’

সঙ্গে সঙ্গে রোলেনের চোখমুখ পাল্টে গেল। পরম বিস্ময়ে সে পাল্টার বরফ দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল। সে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল দলটার মধ্যে। একটি মৃত্যুশোককে ছাপিয়ে যে খুশী বড় হয়ে উঠতে পারে একটি প্রাপ্তির সংবাদে তা জয়িতার জানা ছিল না। হঠাৎ সমস্ত দলটা নতজানু হয়ে বসল জয়িতার সামনে। মাথা নীচু করে রোলেনও তাদের সঙ্গে বসে মৃদু স্বরে কিছু আওড়ে গেল। এই মুহূর্তে নিজেকে যেন ঈশ্বরীর মত মনে হচ্ছিল জয়িতার। পৌরাণিক ইংরেজি ছবিতে এমন দৃশ্য দেখেছে সে। বোঝাই যাচ্ছে এরা এই পবিত্রজলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। কিন্তু তার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না।

প্রার্থনা শেষ হলে রোলেন সঙ্গীকে নির্দেশ দিল। কুকুরগুলো নিয়ে দলটা ওপরের দিকে রওনা হতে রোলেন বলল, ‘তোমাকে এবার আমাদের গ্রামে যেতে হবে।’

‘কেন ?’ জয়িতার কপালে ভাঁজ পড়ল।

‘ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া ওই জল কাহনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তোমাকে। তুমি ওই মৃত মানুষটিকে প্রথম দেখেছ। ওই জল তুমি ওর কাছ থেকে না নিয়ে এলে হয়তো আমরা কোনদিন খুঁজে পেতাম না।’

জয়িতা মাথা নাড়ল। এ ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই। পাশের গ্রামে পৌঁছালে তাপল্যাণ্ডের খবর জানা যাবে। সে রোলেনের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। এখন পথ অনেক সহজ। কিন্তু বরফ ছড়ানো সর্বত্র। এই দুটো রাতের মধ্যে প্রকৃতি এমনভাবে চেহারা পাল্টে ফেলবে কে জানত।

হঠাৎ রোলেন বলল, ‘তোমাদের কাছে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও পুলিশকে ভয় পাও ?’ জয়িতা শক্ত হল। তার কাছে যে অস্ত্র নেই সেই কথাটা মনে এল কিন্তু

পুলিসের কথা তো রোলেনের জানার কথা নয়। সে কোন উত্তর দিল না। রোলেন খানিক চুপ করে থেকে নিজের মনেই বলে যেতে লাগল, 'গতকাল পুলিশ এসেছিল তোমাদের ধরতে তাপল্যাও। খুঁজে না পেয়ে পালদেমকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তাপল্যাওের লোক এমন ভেড়ু যা যে চুপচাপ সেটা দেখছিল। আমরা পাহাড় থেকে পাথর ফেলে ওদের তাড়িয়ে দিলাম। কাল থেকে তো বরফ নেমে গেছে। মনে হয় বরফ গলার আগে আর ওরা এদিকে আসতে সাহস পাবে না।'

'পালদেমের কি হয়েছে?' জয়িতার গলায় উদ্বেগ।

'ওকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। তোমরা পালিয়ে গেলে কেন? পুলিশদের লড়াই করে হারিয়ে দিতে পার না অথচ ওই সব বন্দুক ছুঁড়ে আমাদের ভয় দেখাও। যে লোকটাকে তুমি আঘাত করেছিলে সে এখনও ভাল করে হাঁটতে পারে না। বড় বন্দুক নেই তোমাদের সঙ্গে?' রোলেনের গলায় কৌতূহল।

'সবসময় সামনাসামনি লড়াই করতে নেই। আমরা চাইনি পুলিশরা আমাদের কথা জানুক।'

'তোমরা ডাকাত? খারাপ কাজ করে এখানে লুকিয়ে আছ?'

জয়িতা চোখ তুলল। রোলেনের দৃষ্টি সরল রাখায় এল। হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল জয়িতার। কোনরকমে সে বলতে পারল, 'আমাদের দেখে তোমাদের কি তাই মনে হয়?'

রোলেন কাঁধ নাচাল। তারপর বলল, 'কি জানি!'

পাহাড় শেষ হতেই দুটো পথ। একটা চলে গেছে তাপল্যাওের ভেতরে অন্যটা পাশের গ্রামে। পুলিশ এসেছিল এবং চলে গিয়েছে জানতে পারার পর একটা নিশ্চিন্তিবোধে আচ্ছন্ন ছিল জয়িতা। হঠাৎ রোলেন তার হাত ধরে টানতে সে চমকে সামনের দিকে তাকাল। লা-ছিরিও এবং পালদেম খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এবং ওদের মুখ গভীর। জয়িতা এগোতে যাচ্ছিল কিন্তু রোলেন বাধা দিল, 'না যাবে না। তোমার কাছে আমাদের জন্যে আনা ভগবানের জল আছে।'

'তার সঙ্গে আমার যাওয়ার কি সম্পর্ক?'

'ওরা জানতে পারলে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। আর তাই যদি হয় তোমার কাছে যে অস্ত্রই থাক আমি জীবন থাকতে ওদের নিতে দেব না!'

আচমকা রোলেনকে অত্যন্ত রাগী দেখাচ্ছিল।

পালদেমের গলা পাওয়া গেল, 'ওরা কোথায়?'

জয়িতা হাসবার চেষ্টা করল, 'ওরা এখনও ওপরে। শুনলাম পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।'

কথাটি পালদেমের পছন্দ হল না। সে চুপ করে রইল, কিন্তু লা-ছিরিও বলল, 'আমরা পুলিশদের পেছন পেছন ওয়ালংচুও পর্যন্ত গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে আর ওরা ফিরে আসবে না'

জয়িতা বলল, 'তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ !'

কিন্তু কথাটা পালদেমের কানে গেল না। সে মিরাসক্ত গলায় বলল, 'আমরা ওপরে যাচ্ছি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে রাত্রেই ফিরে আসব। তুমি কি একা একা গ্রামে ফিরতে পারবে?'

জয়িতা বলল, 'পারব।'

কথাটা শোনামাত্র পালদেম গম্ভীরমুখে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে লা-ছিরিঙকে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। জয়িতা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের কি হয়েছে?'

পালদেম জবাব দিল না। কিন্তু লা-ছিরিঙ দাঁড়াল, 'তুমি আমাদের শত্রু পক্ষের সঙ্গে হাঁটছ।'

'কিন্তু আমি তো তোমাদের বন্ধু।'

'তা ঠিক। কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার থাকাটা আমরা পছন্দ করছি না।'

'কেন? ওর সঙ্গে থাকলে কি আমি তোমাদের বন্ধু হতে পারি না? ওতো তোমাদের উপকার করেছে। পুলিশের হাত থেকে পালদেমকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।'

এবার পালদেম কথা বলল, 'তোমার ঋণ শোধ করার জন্যে! এখন ও মুক্ত। এবার নতুন করে শত্রুতা চালাতে আর কোন মনের বাধা নেই। আমরা ওদের বিশ্বাস করি না।'

রোলেন চুপচাপ গুনছিল। হঠাৎ সে কোমরে হাত রাখল। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'আর একটা কথা বললে আমি খুকরি বের করব!'

কথাটা শোনামাত্র পালদেম লাফিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল। এবং তারও হাত এবারে কোমরে। জয়িতা প্রমাদ গুণল। রোলেনের পক্ষে একা দুজন মানুষের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব কি না তা বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু একটা খুনোখুনি হবেই। ক্ষাপা ষাঁড়ের মতন দুটো মানুষ সতর্কভঙ্গীতে পরস্পরের কাছাকাছি হচ্ছে। লা-ছিরিঙও উত্তেজিত। যে কোন মুহূর্তে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

হঠাৎ দৌড়ে ওদের মাঝখানে চলে এল জয়িতা। তারপর জলের পাছটা উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা যদি লড়াই কর তাহলে আমি এটা দূরে ছুঁড়ে ফেলব।'

সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ বের হল রোলেনের গলা থেকে, 'না—!' তার মুখে ভয় এবং অসহায় ছাপ পড়ল ক্রোধ সরিয়ে। যেন আচমকা পাথর হয়ে গেল সে। জয়িতা শক্ত গলায় বলল, 'তোমরা যদি এইরকম মারামারি কর তাহলে ভগবানের জল পাওয়ার কোন অধিকার তোমার নেই।'

'ভগবানের জল?' পালদেমের গলায় বিস্ময়।

'হ্যাঁ। ওদের গ্রামের একটি মানুষ মায়ের অসুখ সারাবে বলে ওই উঁচু পাহাড়ের চুড়ো থেকে এই জল একা নিয়ে এসেছিল। বেচারী মারা গিয়েছে

‘পথে কিন্তু জল ঠিক রেখেছিল এই পাত্রে ।’

জন্মিতার কথা শেষ হওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল পালদেমের, ‘তুমি যা বলছ তা সত্যি?’

‘আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না পালদেম। তোমাদের যে মেয়েটি ওপরে আছে তাকে জিজ্ঞেস করতে পার। কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে আঘাত কর তাহলে এটা আমি ছুঁড়ে ফেলব ।’

জন্মিতার কথা শেষ হবার আগেই পালদেম আর লা-ছিড়িও হাঁটু গেড়ে বসে কিছু আওড়ে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পালদেম বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘এই জল আমরা পেতে পারি? আমাদের গ্রামে কখনও ভগবানের জল আসেনি।’ জন্মিতা দ্বিধায় পড়ল। সে কি করে বোঝায় এই জলের কোন ক্ষমতা নেই। পৃথিবীর নদনদী বা বরফের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। একটা অন্ধ বিশ্বাস প্রশ্ন দেওয়া মানে আধুনিক জীবনযাত্রার বিপরীত কাজ। তাপল্যাণ্ডের মানুষের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তারা আনতে বন্ধপরিষ্কার তার সঙ্গে এই সংস্কার মিলতে পারে না। কিন্তু একটি বিশ্বাস তা যতই অন্ধ হোক যদি দুটি বিবেদমান মানুষের প্রাণে শান্তি আনে তাহলে সে সেই সুযোগ নেবে না কেন? প্রথমে শান্তি তারপর এগিয়ে যাওয়া। সে বলল, ‘তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভগবানের নামে আর কখনো তোমরা অস্ত্রে হাত দেবে না।’

প্রস্তাবটা শোনামাত্র রোলেন এবং পালদেম পরস্পরের দিকে তাকাল।

॥ ৪৬ ॥

দরজা খুলতেই কাঁটার চাবুকের আঘাত। টলতে টলতে সামলে নিল আনন্দ। যতটা সম্ভব মুখচোখ থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেওয়া সত্ত্বেও শরীরে হিম-অনুভূতি। ঝড়টা বইছে এখনও। বরফের কুচিগুলো আর তীরের মত ছিটকে আসছে না এই যা। দরজা ভেজিয়ে আনন্দ সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখন অস্তত সকাল দশটা। অথচ অন্ধকার পাতলা হয়ে ঝুলে আছে তাপল্যাণ্ডের ওপরে। আকাশের রঙের বর্ণনা করা অসম্ভব। চরাচর দেখা যাচ্ছে কিন্তু সাদা তুষারের গায়ে যে ছায়া পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে ওরা। এখন তাপল্যাণ্ড বরফে মোড়া। ষেদিকে তাকাও শুধু বরফ আর বরফ। তিন রাত দুদিন বিজার্ড শব্দটার সঙ্গে বই-এ পরিচয় ছিল। যুরোপ আমেরিকায় তুষার ঝড়ে পথ হারানো বা মৃত্যুমুখে পড়া মানুষের গল্প অনেক পড়েছে সে। বিজার্ড শব্দটার মধ্যে একটা রোমান্টিক ভাবনা সে আরোপ করে নিয়েছিল। কিন্তু গত তিন রাতের প্রতি মুহূর্তের আতঙ্কে সেসব শিকেষ উঠেছে। মনে হয়েছে যে কোন সময় আস্তানাটা উড়ে যাবে। কাঠের দেওয়ালে অনবরত বরফের কুচি নেকড়ের নখের আওয়াজ তুলেছে। ঠাণ্ডা নেমে গেছে এতটা যে আঙন জ্বালিয়েও মনে হয়েছে ওতে হাত ডোবালে ফোঁকা পড়বে না। প্রাকৃতিক

প্রয়োজনগুলোও চাপা পড়ে গিয়েছিল। দরজা খোলার সাহস হয়নি। নিরুপায় হলে বাইরের জানলার নিচে বসতে হয়েছে। এবং এইখানে, এই সময়ে তার এবং সুদীপের সঙ্গে জয়িতা বা মেয়েটির কোন পার্থক্য ছিল না।

কাল সারারাত ঝড়ের দাপট ছিল মারাত্মক। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব বাতাস যেন একত্রিত হয়েছে। আর এভারেস্ট যেন আচমকা গলে এগিয়ে আসছে। কাল সারারাত ঘুম আসেনি কারো। এমন কি সুদীপেরও। ওর চেতনা এখন অনেক স্পষ্ট। মেয়েটি বিশ্বাস করে রোলেনদের গ্রাম থেকে চেয়ে আনা পর্বতশৃঙ্গের পবিত্র জলের কণা ওর কপালে মাখিয়ে দেওয়ায় এই পরিবর্তন। কিন্তু লা-ছিরিঙের মুখে সে শুনেছে গুহা থেকে নামিয়ে আনার সময় সুদীপ পা পিছলে অনেকটা পড়ে গিয়েছিল। নরম বরফে শরীর পড়ায় তেমন আঘাত লাগেনি। কিন্তু পড়ার পর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল। আনন্দ ছিল অনেকটা আগে। চিৎকার শুনে পিছিয়ে গিয়ে দেখেছিল সুদীপ উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তখনও ওর মুখে মুত্থ্যভঙ্গ্য সঁটে আছে। আনন্দের প্রস্নের উত্তরে মাথা নেড়েছিল সে। ওই আঘাত থেকে ওর চেতনা ফিরে এসেছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না অবশ্য। এখনও সুদীপ কথা বলে না। কিন্তু অন্যরা কথা বললে আগ্রহ নিয়ে শোনে। এটা কম স্বস্তির নয়।

দরজাটা দ্বিতীয়বার খুলল। জয়িতার গলা শোনা গেল, 'উঃ, বাবা।' আনন্দ কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার করল তার দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে। যেন ঠাণ্ডায় স্বরনালী বিকল হয়ে গেছে। জয়িতা বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর ইশারা করে দৌড়োবার চেষ্টা করল সামনে। কিন্তু হাঁটু অবধি জমে থাকা নরম বরফে দৌড়ানো যে অসম্ভব ব্যাপার তা আবিষ্কার করে অসহায় চোখে তাকাল সে। আনন্দ সাবধানী পায়ে ওর পাশে দাঁড়াল। হাওয়ার দাপটে শরীর সোজা রাখা প্রায় অসম্ভব। সে জয়িতার হাত ধরল।

কয়েক পা এগোতে ওরা একটা ঘরের ছাদকে বরফের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখল। আশেপাশে ঘর নেই। ভাঙ্গচুর হওয়া ছাদটি কোথেকে উড়ে এসেছে বোধগম্য হচ্ছিল না। গ্রামের ভেতর চোকোর পর মনে হল কেউ যেন দুরমুশ করে দিয়েছে চৌদিক। অথচ কোন মানুষের শব্দ নেই। নবনির্মিত যৌথগৃহের প্রথমটির দরজা বন্ধ। আনন্দ দরজায় শব্দ করে যখন কোন সাড়া পেল না তখন চিৎকার করতে লাগল হাওয়ার দাপট ছাড়িয়ে।

দরজাটা খুলতে সময় লাগল। যে যুবকটি দরজা খুলেছিল সে তাদের দেখে যেন হতবাক। চটপট ভেতরে ঢুকে নিজেদের সামনে নেওয়ার আগেই অনেকগুলো গলা থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারিত হল। তারপর একসঙ্গে অনেকেই কথা বলে উঠল। অন্তত জনা কুড়ি ছেলেমেয়ে বন্ধ মাচার ওপরে স্তুপের মত বসেছিল। তারা আনন্দের দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত। নিচে আওয়াজ হল। জঙ্গল থেকে কেটে এনে সঞ্চয় করে রাখা কাঠ এখন

ওদের উত্তাপ দিচ্ছে। যুবকটি ওদের আঙনের কাছে নিয়ে আসার বেশ কিছুক্ষণ পরে দেহে সাড় এল। জীবনে প্রথমবার আনন্দ অনুভব করল শরীরে রক্ত চলাচল করার অনুভূতি কি রকম। দাঁতের কাঁপুনি থামেনি কিন্তু এখন অনেক কম। আনন্দ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'পালদেমরা কোথায়?'

যুবকটি মাথা নাড়ল, 'আমরা জানি না। বরফঝড় শুরু হওয়ার পর আমরা ক'জন এখানে এসেছি।'

একজন বৃদ্ধ চিৎকার করে বলল, 'তোমরা এই ঘর বানিয়ে দিয়েছ বলে আমরা বেঁচে গেলাম। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

জয়িতা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে শরীর নিয়ে গিয়েছিল সে। সেই অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঝড় কখন থামবে?'

বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'জানি না। এবার সবই অশুভ। আমি জান হবার পর এমন মারাত্মক ঝড় দেখিনি। এত বরফ ঝড়ের সঙ্গে কখনও পড়েনি।'

আনন্দ যুবকটির দিকে তাকাল। এরা এখানে কি খাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্যমাত্র। যৌথগৃহের সব আয়োজন শেষ করার সময় পাওয়া যায়নি। ঝড়টা এসে পড়েছে আচমকা। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার গ্রামের সমস্ত মানুষ নিরাপদ কিনা। সে জয়িতাকে বলল, 'যতই ঝড় উঠুক একবার গ্রামটা ঘুরে আসা উচিত। মনে হয় কেউ কেউ বিপদে পড়তে পারে। তুই বরং এখানে থাক। ওদের ভাবতে দে আমরা ওদের সঙ্গে আছি। কোন আপত্তি আছে?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'বেঁচে গেলাম। ওই ঠাণ্ডায় আমি আবার বের হলে বেঁচে থাকতাম না।'

আনন্দ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাহন কোথায়?'

যুবক বলল, 'মন্দিরে। মন্দিরে ঝড় ঢোকে না।'

আনন্দের মনে হল শেষ তিনটে শব্দ খুব স্বাভাবিক গলায় বলা হল না। কাহনের নিরাপদ আশ্রমে থাকার ব্যাপারে এই যুবকের নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। কিন্তু এখনই সে ওকে প্রশ্ন দিল না। সে চিৎকার করে বলল, 'আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাঁরা ঝড়ের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। কিন্তু গ্রামের অন্য মানুষেরা কি অবস্থায় আছেন তা আমাদের দেখা কর্তব্য। আপনাদের মধ্যে যেসব যুবক শক্ত এবং সমর্থ তারা আমার সঙ্গে আসুন।'

গুঞ্জন উঠল। আনন্দের চোখ তিন-চারজন যুবকের ওপর ছিল। তারা ইতস্তত করছে। মাচার ওপর গুড়িসুড়ি মেরে বসেছিল, প্রস্তাবটা শোনামাত্র সামান্য নড়ল। যে বৃদ্ধ আগ বাড়িয়ে কথা বলছিল সে বলল, 'কি হল, কেউ মাচা থেকে নামছে না যে? বাইরের মানুষেরা ঘর থেকে ঝড়ে বের হতে পেরেছে আর আমাদের হাত পা কি শরীরে ঢুকে গেল! কি হল!'

আর একটি বৃদ্ধার গলা শোনা গেল 'সবাই ঠিকই আছে। নইলে এই ঝড়ে

তারাও আশ্রয়ের খোঁজে আসত।’

আনন্দ জবাব দিল ‘আপনি হয়তো ঠিক বলছেন মা কিন্তু তবু আমাদের নিজের চোখে দেখে আসা উচিত।’

সম্ভবত মা শব্দটি কানে যাওয়ায় রুদ্ধার গলার স্বর পাল্টে গেল, ‘তা ঠিক, ঠিক। এই ছেলেরা, তোরা এখানে বসে আরাম করছিস, একটুও লজ্জা করছে না? তোদের বয়সী ছেলেমেয়েগুলো বাইরে বেরিয়ে আমাদের জন্যে কষ্ট করছে আর তোরা—, নাম, নাম।’ রুদ্ধার ঝাঁঝালো গলায় কাজ হল। তিন যুবক কোনরকমে শরীর মুড়ে নেমে এল, এবং আসাটা যে নিতান্তই অনিচ্ছায় তা বোঝা যাচ্ছিল ওদের মুখের চেহারায়। আনন্দ ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না। দরজা খুলেছিল সে এখন তার পাশে, পেছনে তিনজন। সোঁ সোঁ করে হাওয়া চলছে। বাতাসে যে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার মিশছে তা কয়েক পা হাঁটতেই বোঝা গেল। শরীর সাদা হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম যে ঘরটিকে মুখ খুঁড়ে পড়ে থাকতে দেখল সেটার সামনে দাঁড়াল ওরা। সঙ্গী যুবকটি নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে। কিন্তু সেই চিৎকার বেশী দূর পৌঁছানোর কথা নয় হাওয়ার দাপটে। কাঠের স্তূপ কোনমতে সরিয়ে ভেতরে পা রাখতেই ওরা চমকে উঠল। একটি শরীর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অনড়। মুখে চমৎকার শান্তি। যুবকটি দুহাতে তাকে ধাক্কা দিয়ে হাঁটমাউ করে উঠল। মধ্যবয়স্ক মহিলাটির ভাবান্তর হওয়ার কথা নয়। আনন্দ যুবকটিকে টেনে তুলল। এই মাজাভাঙ্গা ঘরে আর কোন মানুষ নেই। বোঝাই যাচ্ছে কাঠ চাপা পড়ে প্রৌঢ়া মারা গিয়েছেন। ওর পেটের ওপর থেকে এখন স্তূপটাকে সরিয়ে নেওয়ার কোন মানে হয় না।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য তিন যুবকের মধ্যে আচমকা পরিবর্তন আনল। এই দুর্যোগ মৃত্যুর কারণ হয়েছে জানার পর যেন তাদের সঙ্কোচ দূর হল। যতটা সম্ভব চটপট পায়ে তারা পরের ঘরে আঘাত করল। ভেতর থেকে সাড়া মিলল ‘কে?’

যুবকটি বলল, ‘তোমাদের যদি এখানে থাকতে অসুবিধে হয় তাহলে নতুন ঘরে চলে যাও, সেখানে আরামে থাকতে পারবে।’

খানিক পরে এই ঝড়ের মধ্যে এক চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা হল। দলে দলে ছেলেবুড়ো ছুটছে মাথা নিচু করে যৌথগৃহের দিকে। যেক’টি যৌথগৃহ এই গ্রামে বানানো হয়েছিল তা সম্ভবত এতক্ষণে ভরে উঠেছে। হাওয়ার আগে সবাই অবাক চোখে আনন্দকে দেখছিল। পালদেমের ঘরের সামনে এসে আনন্দ চিৎকার করল। এই সময় সে আবিষ্কার করল বিপরীত আবহাওয়া প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নেবার পর সহনীয় স্তরে পৌঁছে যায়। এখনও অবশ্য ঠাণ্ডা লাগছে, ঝড়ে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সেই কাঁপুনিটা নেই। ভেতর থেকে পালদেমের গলা পাওয়া গেল, ‘কে, কে ডাকে?’

‘দরজা খোল আমি আনন্দ।’ আনন্দ এবার আঘাত করল।

দরজা খুলল পালদেমের বউ। আনন্দকে দেখে সে চমকে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে ঢুকতে দিল। ভেতরে আসামাত্র বউটি হাঁটমাউ করে কিছু বলতে লাগল। পালদেম যে নেশায় চূর হয়ে বসে আছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ঘরে আঙন নেই। বউটিও মদ খেয়েছে। বাচ্চাটা কুকড়ে একপাশে পড়ে আছে ছেঁড়া জামাকাপড় জড়িয়ে। একটা জীর্ণ কম্বল তার শরীরের ওপর চাপানো। আনন্দ এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর দুহাতে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। ওর ভারী শরীর কিন্তু ঠাণ্ডায় কাতর তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এই সময় যুবকদের একজন এসে পৌঁছতেই আনন্দ তাকে বলল, 'এর মাকে নিয়ে এস যেখান থেকে তোমরা এসেছ।' তারপর মাথা নিচু করে দৌড়াতে লাগল ঝড়ের তাগুব বাঁচিয়ে। বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর আনন্দ ছুঁতুত অবস্থায় আবিষ্কার করল, দুটো কচি হাত তাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর মানুষের শরীরের উত্তাপ আনন্দকে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত করল। এই আরামের কোন বিকল্প নেই। পথ বেশী দূরে নয় কিন্তু আনন্দের কাছে যেন ফুরাতেই চাইছিল না।

ভেতরে ঢোকামাত্র জমিতা এগিয়ে এল। আনন্দ কোন রকমে ওর হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে বলতে পারল, 'একে বাঁচা।' প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে জমিতা বাচ্চাটাকে আঙনের পাশে রাখল। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে ঠোঁট। মুখ নীরস্ত। সে উত্তাপ ছড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল পরম মমতায়। এখন রক্তারা তার আশে পাশে। তাঁরা নির্দেশ দিচ্ছিল কি করা উচিত এক্ষেত্রে। আনন্দ দম নিল। গিজ গিজ করছে। মাচা নয়, এখন মাটিতেও মানুষ। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে দুধারে। সঞ্চিত কাঠ নিয়ে আসছে কেউ কেউ। এখন বেহিসাবী খরচ করা ঠিক নয়। কিন্তু কথাটা বলার সময়ও এটা নয়। এই সময় যুবকরা বাচ্চাটির মাকে নিয়ে এল। একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে সে। এখনও তার হাবভাবে নেশার প্রতিক্রিয়া আছে। আনন্দ আবার বেরিয়ে এল। এবং আসতেই পালদেমকে দেখতে পেল। পালদেমের পা টপছে এবং সেটা যে ঝড়ের দাপটে নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। আনন্দকে দেখামাত্র পালদেম বলল, 'আমার বাচ্চা-বউকে চুরি করে নিয়ে গেছে, মার শালাকে, মার।' সঙ্গে সঙ্গে রক্ত উঠে গেল মাথায়। আনন্দ হাত তুলল। সঙ্গে সঙ্গে পালদেমের শরীরটা বরফের ওপর আছড়ে পড়ল। যে যুবকটি পালদেমের বউকে নিয়ে গিয়েছিল যৌথগৃহে সে বেগ্নিয়ে এসেছিল এই সময়। পালদেমের অভিযোগ তার কানে পৌঁছেছিল। তাই ওর পড়ে যাওয়া দেখেও হাসি সামলাতে পারল না সে। বরফের ওপর পড়ে গিয়ে এখন পালদেম টানটান হয়ে শুয়ে আছে। আনন্দ যুবকটিকে বলল, 'ওকে টেনে ভেতরে নিয়ে যাও। এখানে পরে থাকলে জমে যাবে। যুবকটি চটপটে পায়ে কাছে গিয়ে পালদেমের হাত ধরে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল। তাপল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ মানুষ যৌথগৃহে আশ্রয় নিয়েছে। যাদের ঘর মজবুত তারা সেখানেই থেকে

গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা আপাতত চার। অবশ্য ঝড় থামলে সঠিক বোঝা যাবে। শেষ হাকে আবিষ্কার করল তাকে আশা করেনি কেউ। নিজের ঘরের খুব কাছাকাছি জমে থাকা বরফে মুখ ঝুঁজে শরীরটা গড়েছিল। আবিষ্কৃত হওয়ার পর চেঁচামেচি করে সবাই ধরাধরি করে তাকে তুলে নিয়ে এল। প্রায় লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে পালার দেহ। আনন্দ দেখল, মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ামাত্র তামাম তাপল্যাণ্ড চোখের জল ফেলছে। কেউ কেউ গলা খুলে কাঁদছে। যৌথগৃহের মহিলারা সুর করে একটানা কাঁদতে আরম্ভ করল। পাল্লা এই গ্রামের প্রধান। অন্যতম বয়স্ক ব্যক্তি। জরা তাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল মানুষটাকে সবাই পালার সম্মান দিয়েছে। বোবাই যাচ্ছে ঝড় শুরু হওয়ার পর মখন তার ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে পরেছিল তখন পাল্লা আশ্রয়ের খোঁজে বাইরে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তার শরীরের ওপর তুষার জমে ওঠায় চট করে কারো নজরে পড়েনি।

যৌথগৃহের আশ্রয় এখন অত্যন্ত দুর্বল বস্তু। সবাই তার চৌদিকে ভিড় করছে। কিন্তু আনন্দ চোকামাত্র কেউ কেউ তাকে আশ্রয়ের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিল। নিজেকে কোন রকমে সেখানে নিয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে বুক ভরে বাতাস নিতে লাগল সে। মনে হচ্ছিল শরীরে এক ফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট নেই। তার নাক দিয়ে অসাড়ে জল পড়ছিল। মুখের খোলা জায়গাগুলোতে কোন সাড়া নেই। যৌথগৃহে এখন কান্না এবং শিশুদের চিৎকার সমানে চলছে। এই সময় একটা হাত আনন্দের কাঁধে উঠে এল। আনন্দ তাকাচ্ছিল না। আশ্রয়ের গনগনে তাপ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিতে উন্মুখ ছিল সে। হাতের মালিকের গলা শুনে পেল সে, 'তোমরা যা করলে তার তুলনা নেই। প্রত্যেক বছর শীত শুরু হবার ঝড়ে অন্তত জনা সাতেক বুড়োবুড়ি মারা যায়। তোমরা আমাদের বাঁচালে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

এবার আনন্দ চোখ তুলল। ভেনা। পালদেমের ভগ্নীপতি। এই ভেনাই সেদিন অসহযোগিতা করেছিল। তাপল্যাণ্ডের স্বচ্ছল মানুষের সঙ্গে এক হয়ে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু ভেনা কেন যৌথগৃহে। ধরেই নেওয়া যায় ভেনার ঘরবাড়ি অনেক মজবুত। কিন্তু আনন্দ কোন কথা বলল না। আসলে কিছু বলার মত শক্তি সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এত তীব্র ঠাণ্ডা এবং হাওয়ার ধার সে কোনদিন কল্পনাতেও আনেনি। পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে এই প্রকৃতি অচেনা। এবং যা অচেনা তাই অসম্ভব নয়। কলকাতার ঠাণ্ডায় যারা 'দারুণ শীত' বলে অভ্যস্ত তাদের কাছে এই আবহাওয়ায় মৃত্যু স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আর একধরনের সুখ চুইয়ে আসছিল আনন্দের মনে, সে অন্তত গ্রামের লোকগুলোকে আপাতত একটা নিরাপদ জায়গায় নিতে আসতে পেরেছে।

এখন দুপুর। হাওয়া কমেছে। তুষার মাথা ঠাণ্ডা বাতাস শুনশুনিয়ে ফিরছে। এই চেহারা দেখলে কে বলবে যে গত তিন রাতে কি ঘটেছিল! এখন বরফ

পড়ছে না। জয়িতা শেষ পর্যন্ত পালদেমের বাচ্চাটাকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসে সুমাতে দেখল। পালদেম আর তার বউ এখনও মড়ার মত পড়ে আছে। এই যৌথগৃহের অনেকেই মদ খেয়েছে। বসন্ত শীতের হাত থেকে বাঁচার সহজতম হাতিয়ার এদের কাছে মদ। যে বাচ্চাগুলো ঘ্যানর ঘ্যানর করছে তাদের মখে খিদে লেগেছে তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মায়েরা প্রায় নিষিকার। বৃদ্ধা পালার শোকে কেঁদে চলছে এখনও। এই কাল্পা চলে যেত ফলপালার শরীর মাটির ওপরে থাকবে। জয়িতা আনন্দকে খুঁজল। আনন্দ বসে আছে যে ভঙ্গিতে তা দেখে আপাতত ওকে না ডাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। তারপর তিন জন যুবকসঙ্গীকে নিয়ে বাইরে বের হল। চমৎকার হলুদ রোদ নেতিয়ে আছে বরফের ওপরে। আকাশে ফাঁক গলিয়ে সূর্য আপাতত এটুকুই তাপল্যাঙকে দিতে পারছে। এ এক অপরূপ দৃশ্য। সমস্ত পাহাড় আর তার গায়ের বরফগুলো হলুদে মাখামাখি এখন। আর এসব দেখার মুহূর্তে জয়িতার কল্যাণের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর একটা মোচড় উপ উপ করে জল ঝরতে লাগল গাল বেয়ে। এই কাল্পার একটুও প্রস্তুতি ছিল না। এই সময় হালকা হিম-বাতাস বেয়ে যেতেই দুটো গাল জুড়িয়ে গেল। ফ্রোটে যাওয়া চামড়ায় একটা নরম আরাম ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেটা টের পেতেই বুক নিংড়ে নিঃশ্বাস বের হল।

বাঁকি যৌথগৃহগুলোয় মানুষ উপচে পড়ছে। লা-ছিরিও একা তাদের দেখাশোনা করছে। জয়িতাকে দেখতে পেয়ে সে লাল দাঁত বের করে হাসল, 'আরও তিনটে এই রকম বাড়ি তৈরি করলে ভাল হত।'

জয়িতা বলল, 'আমাদের তো ধারণাই ছিল না। তোমার দেখা পেয়ে ভাল হয়েছে। আমরা যেসব চাল ডাল কিনে রেখেছিলাম সেগুলো বের করে রান্নার ব্যবস্থা কর। সন্ধ্যার আগেই প্রত্যেককে খাবার দিয়ে দাও।'

লা-ছিরিও মাথা নাড়ল, 'আমি এই কথাই ভাবছিলাম।'

হাওয়া বন্ধ হতে অনেকেই বেরিয়েছে যৌথগৃহ ছেড়ে। জয়িতা লক্ষ্য করল যে মানুষই তার সামনে পড়ছে সে-ই খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে তাকে প্রকৃত প্রদর্শন করছে। যারা ঘর ছেড়ে বের হয়নি এবার তাদের খোঁজ নেওয়া শুরু হল। বৃদ্ধরা বলছে আজ রাত্রে আরও ভারী বরফ পড়বে। অতএব এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু যারা ঘরে রয়ে গেছে তারা জানে আপাতত কোন বিপদ নেই। তাদের উনুনে আগুন পড়েছে। স্পষ্টত এখন গ্রামের দুটো শ্রেণীর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। এটা হতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু জোর করে এক করার চেষ্টা বোকামির নামান্তর হবে। সে প্রত্যেক দরজায় গিয়ে বলে এল যদি কোন অসুবিধে হয় তাহলে বিনা দ্বিধায় যেন যৌথগৃহে চলে যায়।

এই সময় কাছনকে দেখতে পেল সে। শিষ্যদের পেছনে নিয়ে তিনি মন্দির থেকে নেমে আসছেন। তাঁকে দেখে সবাই জড়ো হল। কাছন ঘোষণা

করলেন পালার অন্ত্যেষ্টিকাজ আগামীকাল হবে। তারপর তিনি তাকালেন জয়িতার দিকে। এক মুহূর্ত যেন চিন্তা করলেন। তাঁর শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি চাও? নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই গ্রামের মানুষের সাহায্য করছ কেন?'

জয়িতা বলল, 'এই গ্রামের মানুষরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। আশ্রয়দাতারা আমাদের বন্ধু।'

'খুব ভাল উত্তর। কিন্তু তোমাদের জন্যে পুলিশ এসেছিল এই গ্রামে। আমিও জীবনে পুলিশ এই প্রথম দেখলাম। শুনেছি তারা একবার আসলে বার বার আসে। আবার এলে কি হবে?' কাহ্নের মুখে হাসি।

এবার লা-ছিন্নিও জবাব দিল। তার গলায় যেন বাঁঝা মেশানো, 'এবার এলে আমরা সবাই লড়াই করব। আমাদের এই পাহাড়ে বাইরের পুলিশ কি করতে পারে! এরা না থাকলে আজ আমরা কোথায় যেতাম বলতে পারেন?'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাহ্ন, আপনি ঈশ্বরের সেবক। সত্যি কথা বলছি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব মানুষের সঙ্গে। এই গ্রামের মানুষরা যদি মানুষের মত বাঁচার পথ খুঁজে পায় তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব মূল্যবান হবে। আপনার ঈশ্বর কি চান না যে এরা মানুষের মত বেঁচে থাকুক?'

কাহ্ন মাথা নাড়লেন। কি যেন বিড় বিড় করে বললেন। বোঝা গেল তিনি জয়িতার কথার অর্থ ধরতে পারছেন না। যাওয়ার আগে বললেন, 'মৃতদের নিয়ে এস মন্দিরে। ওদের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে।'

শুধু চাল এবং ডালের ঘ্যাঁটি যে মানুষের কাছে উপাদেয় আগে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। জয়িতার গলা দিয়ে বস্তুটাকে নামাতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ক্ষুধা এমন জিনিস যে শরীরকে বাধ্য করে একটু রসের লালা নিঃসরণ করতে যা খাদ্যদ্রব্যটিকে পেটে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। অথচ চারপাশের মানুষ গোপ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে। সেই সন্মিলিত শব্দ শুনতে শুনতে জয়িতার মনে হল এই মানুষগুলো পৃথিবীর অনেক লোভনীয় খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। যারা বছরে এক-আধবার চালের স্বাদ পায় তাদের কাছে এই খাবার অমৃত। আসলে আরও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের মনে অসন্তোষের বীজ বোনে।

আনন্দ এখন সহজ। কিন্তু সামান্য কাশি হয়েছে ওর এর মধ্যেই। জয়িতা ওকে বলল, 'তুই আজ এখান থেকে বের হস না। আমি একবার আস্তানা থেকে তোার বিছানা আর ট্যাবলেট এনে দেব।'

'ট্যাবলেট কি হবে?' আনন্দ হাসল।

'বলা যায় না, এ যা ঠাণ্ডা কি থেকে কি হয়ে যায়।' জয়িতার কল্যাণের মুখ

মনে পড়ল। ওর পাঠানো ওষুধের বোলায় ঠাণ্ডা থেকে তৈরি জ্বর এবং কাশির ওষুধ ছিল।

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে। অনেকক্ষণ সুদীপের খবর পাইনি। ওরা কিছু খেল কিনা তাও জানি না। কাউকে পাঠালে ভাল হয়।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'দরকার নেই। আস্তানায় যা আছে তাই দিয়ে মেয়েটা খাবার বানিয়ে নিতে পারবে। এখন কি কি কাজ বাকী আছে চিন্তা কর।'

আনন্দ চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর বলল, 'লোকগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। একটাতে বাচ্চা আর মেয়েরা থাকবে। আর একটায় বুড়োবুড়ি। জোয়ানরা আলাদা। মেয়েদের একটা দল তৈরি করে তাদের ওপর রান্না আর সেবাসুশ্রূষার ভার দে। বুড়োবুড়িদের আপাতত কোন কাজ করতে হবে না। আজ আর সম্ভব হবে না কাল থেকে ছেলেদের নিয়ে কাজে বের হতে হবে আমাদের।'

লা-ছিরিও পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বাংলা বোঝে না। জয়িতারা কথা বলছিল বাংলায়। অতএব সে উদ্বিগ্ন মুখে শুনছিল সব। শেষ হতে বলল, 'তিনটে মুরগী মারা গিয়েছে। একটা ছাগল খুব চোট পেয়েছে। যে মেয়েটা তোমাদের সঙ্গে আছে তার ঘরে ওদের নিয়ে গিয়েছি। মুশকিল হল বরফ পড়ার পর ওদের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায় বল তো?'

জয়িতা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আনন্দ তাকে বাধা দিল, 'লা-ছিরিও, ওই জীবগুলো এই গ্রামের সম্পত্তি। ওদের সংখ্যা বাড়লে এই গ্রামের উপকার হবে। অতএব ওদেরও বাঁচিয়ে রাখা তোমাদের কর্তব্য। কিভাবে সেটা করবে তা তোমরাই ঠিক করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের বলব এটা ঠিক নয়।'

লা-ছিরিও হাসল, 'আজ আমি ওদের ভাতডাল সেক খেতে দিয়েছি।'

'না। তুমি অন্যায় করেছে।' আনন্দ রেগে গেল, 'তুমি অন্যায় করেছে! মানুষের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করা যেখানে কষ্টকর ব্যাপার সেই খাবার ওদের দেওয়া উচিত হয়নি। তুমি এখনই কিছু ছেলেকে পাঠিয়ে দাও জঙ্গলে। ছাগলরা যেমন পাতা খায় তা যেন সন্ধ্যার আগেই ওরা কেটে নিয়ে আসে। আর ঘরে ঘরে খোঁজ নিয়ে দ্যাখো মক্কাই এর নষ্ট হয়ে যাওয়া দানা কার কাছে কত আছে। সেগুলো মুরগীদের জন্যে রাখ।'

লা-ছিরিও মাথা নেড়ে বেরিয়ে যেতে জয়িতা বলল, 'ওর ওপর ছেড়ে দিয়েও তো নিজে না বলে পারলি না। একটু আগে কাহনের সঙ্গে কথা হল। আজ লোকটার হাবভাব ঠিক মনে হল না।'

চমকে উঠল আনন্দ, 'কেন? কি বলেছেন কাহন?'

'প্রশ্ন করছিল। কেন এসব করছি আমরা? পুলিশের দায় কে বইবে? এই সব।'

'লোকটাকে খাবার দেওয়া হয়েছে?'

‘জানি না।’

‘না দেওয়া হলে তুই নিজে দিয়ে আয়। এখনই ওকে চটানো ঠিক হবে না। এদের জন্ম মৃত্যু ওই লোকটার সঙ্গে বাঁধা হয়ে আছে। এত বড় একটা দুর্যোগের পর বোধহয় কাহন আশা করেছিল গ্রামবাসীরা ওর কাছে প্রার্থনার জন্যে যাবে। আমার ভুলও হতে পারে, কি জানি।’ শেষ দিকে অন্যমনস্ক দেখাল আনন্দকে।

জন্মিতা আর সময় নষ্ট করল না। একটা পাতলা খাবার নিয়ে সে মন্দিরের দিকে রওনা হল। ধাপে ধাপে ওপরে উঠে সে দেখতে পেল শিষ্যরা মন্দিরের চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে একই খাবার খাচ্ছে। অর্থাৎ এখানেও খাবার পৌঁছে গেছে। জন্মিতা ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতোই কাহন বেরিয়ে এলেন শূন্য পাত্র হাতে। এবং তখনই তিনি জন্মিতাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জন্মিতার মাথায় মতলবটা খেলে গেল। সে ধীর পায়ে কাহনের সামনে গিয়ে পাত্রটা এগিয়ে ধরল। এক পাত্র শেষ করার পরেও যে কাহনের তৃপ্তি আসেনি, তা বোঝা গেল তিনি যে তৎপরতায় জন্মিতার হাত থেকে পাত্রটি নিলেন তা দেখে। খেতে খেতে কাহন মাথা নাড়লেন, ‘আমাকে একথা বলতেই হবে যে তোমরা গ্রামের মানুষদের উপকার করছ। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।’

জন্মিতা বলল, ‘আজ সবাইকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। কাল ঠিক হয়েছে যারা গ্রামের মানুষের জন্যে পরিশ্রম করবে তাদের খাবার দেওয়া হবে।’

‘পরিশ্রম!’ কাহনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, ‘কেন, পরিশ্রমের কথা উঠছে কেন?’

‘যারা কাজ করবে না তাদের খাওয়ানো হবে না, তাই।’

‘কাজ বলতে কি বোঝ তোমরা?’

‘যা করলে গ্রামের মানুষের উপকার হবে, তাই।’

এবার কাহনের মুখে হাসি ফুটল, ‘তাই বল। আমি যে প্রতিনিয়ত ভগবানের কাছে গ্রামের মানুষের জন্যে প্রার্থনা করে যাচ্ছি সেটাও তো একটা কাজ। গ্রামের মানুষের উপকারের জন্যেই করা।’

জন্মিতা বলতে যাচ্ছিল যে-উপকার চোখে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না তাকে স্বীকার করা যাচ্ছে না। কিন্তু আনন্দের পরামর্শ মনে রেখে সে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। পাত্রটি শেষ করে ফিরিয়ে দিয়ে কাহন মার্গে জপতে জপতে ফিরে গেলেন ভেতরে। এঁটো হাত ধোওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

আস্তানায় ঢোকান আগেই চমকে উঠল জন্মিতা। তীব্র গন্ধটা নাকে লাগছিল। দরজা খুলে ভেতরে পা দিতেই সে হতবাক হয়ে গেল। মেয়েটি হাসছে। মাঝে মাঝে হাত তালি দিচ্ছে। সুদীপ উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই চেষ্টার সময়েই বোঝা যাচ্ছিল ও প্রকৃতিস্থ নয়। সুদীপ এমনিতেই আপাতত সুস্থ নয়। কিন্তু এই ভগ্নি সেই ছবিটা থেকে ভিন্ন। চিলের মত

ছোঁ মেরে মাটিতে পড়ে থাকা গ্লাসটা যে ক্ষিপ্ৰতায় সে ভুলে নিল তা অনেক দিন সুদীপের কাছ থেকে আশা করেনি কেউ। দু চোক গলায় নিয়ে মেয়েটার হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুদীপ। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আঃ !'

জয়িতা যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তা দুজনের কারোর লক্ষ্যে নেই। দুবার টলে সুদীপ হাঁটু মুড়ে আবার বসে পড়ল মাটিতে। তার মাথা এবার মেয়েটার পাশে এলিয়ে পড়তে সে সম্বলে তাকে ভুলে নিল কোলে। তারপর ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল লাগছে ? তোমার ভাল লাগছে ?'

'খু-উ-ব। খু-উ-ব।' চোখ বন্ধ করে শব্দ দুটো বিভিন্ন স্বরে উচ্চারণ করে মাথা নাড়ল সুদীপ। জয়িতা আরও অবাক। এখন সুদীপের কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। মেয়েটা সুদীপের কপালে হাত বোলাচ্ছে। কিন্তু এই দুর্ঘোষের মধ্যে ও মদ পেল কোথায় ? বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটি জোগাড় করে এনেছে। তীব্র মদ সুদীপের চেতনা মুছে দিয়েছিল। সেই মদই কি আবার চেতনা ফিরিয়ে আনেছে ? বিষে বিষক্ষয় ! এই সময় মেয়েটি ঝুঁকে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁট চেপে ধরল সুদীপের কপালে। হঠাৎ জয়িতা আবিষ্কার করল তার শরীরে রক্ত সচল হয়েছে। আচমকা অস্বস্তি হচ্ছে তার। সুদীপ পড়ে রয়েছে স্থির হয়ে। মেয়েটি মুখ তুলল। আলতো হাত বোলানো সুদীপের গালে। তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁট ছোঁয়াল সুদীপের বন্ধ চোখের পাতায়। প্রথমে বাম তার পরে ডান। সুদীপ নড়ছে না। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। মুখ তুলে মেয়েটি সুদীপের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর খিলখিলিয়ে হাসল। সেই হাসির ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল তারও বেশ নেশা হয়েছে।

জয়িতা নড়তে সাহস পাচ্ছিল না। এই দৃশ্যকে অশ্লীল বলা যায় না। অথচ এতকাল যা অবশ্যস্তাবী বলে সে আশংকা করেছিল তা চোখের সামনে দেখে স্থবির হয়ে পড়েছিল। সেইসঙ্গে তার মনে দ্বিতীয় একটা ইচ্ছা জন্ম নিল। সুদীপ সাড়া দিক, মেয়েটি যে কামনার আশ্রয় জ্ঞানতে চাইছে তাতে উদ্দীপ্ত হোক। এবং তা হলেই ও স্বাভাবিক সুদীপ ফিরে আসবে। মেয়েটির বোধহয় দেখা শেষ হল। তার মাথা আবার ঝুঁকে পড়ল সুদীপের ওপরে। খুব সম্বলে সে নিজের ঠোঁট দুটো ছোঁয়াল সুদীপের ঠোঁটে। প্রথমে আলতো। তারপর নিচের ঠোঁট বোলানো। ওর সাপের মত জিভ দেখতে পেল জয়িতা। এবং এই প্রতিক্রিয়ার পর সে প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরল ঠোঁট সুদীপের ঠোঁটে। যেন সুদীপের ঠোঁট কামড়ে ভুলে নিতে চায় এমন মনে হচ্ছিল তার ভঙ্গিতে। এবং তখন ঝটপট করে উঠে বসল সুদীপ। দুহাতে নিজের ঠোঁট ঢাকল। মুখ থেকে উচ্চারিত হল, 'আঃ !' শোনামাত্র মেয়েটি আবার খিলখিলিয়ে হাসল। হেসে মদের গ্লাস তুলে ধরল। সুদীপ সেদিকে একবার তাকাল। তারপর চকচক করে তরল পদার্থটি গলায় চালান করে দিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল

‘হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?’ ঠিক এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না জয়িতা। সুদীপের চেতনা ফিরছে বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু ও যে অত স্পষ্ট ইংরেজী বলতে পারবে এবং সেই একই ভঙ্গিতে তা বিশ্বাসে ছিল না। ওর এত আনন্দ হচ্ছিল যে ছুটে গিয়ে সুদীপকে জড়িয়ে ধরতে পারলে তৃপ্তি পেত। সুদীপ সুস্থ হওয়া মানে জীবনটাকে সচল দেখা।

মেয়েটা সুদীপের ইংরাজী বুঝতে পারল না। কিন্তু ওই প্রশ্ন উচ্চারণ করার ধরন হয়তো অনুমান করতে পারল। সে চোখ বন্ধ করে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দুটো ঠোঁট তুলে ধরল। সুদীপ এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে বলল, ‘শুড।’ তারপর দায়সারা গোছের একটা চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়াল, ‘দ্যাটস এনাক।’ কিন্তু দাঁড়ানো মাত্র তার শরীর টলতে লাগল। নিজের মনে সুদীপ বিভ্রিভি করল, ‘হাঃ শালা। আই অ্যাম ড্রাক। শী ওয়ান্টস টু শিলপ উইথ মি! শুড আই? কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। লুক, আই হ্যাভ নেভার শ্লেপট বিফোর। আমি যে শোব কিন্তু আমার বন্ধুরা কি বলবে? আনন্দ, কল্যাণ—!’ হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুদীপ। মাটিতে বসে পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মেয়েটি এমন হতভম্ব হয়ে গেল যে তার মুখ থেকে সমস্ত বাসনার চিত্র উধাও হয়ে গেল। দূর থেকেই সে সুদীপের পায়ের ওপর একটা হাত আলতো করে রাখল। জয়িতার মনে হল ওই হাতের যে স্পর্শ তা যে কোন মায়ের হতে পারত।

বাইরে বেরিয়ে এসে স্বস্তি পেল জয়িতা। হাক, সুদীপ এখন সুস্থ হয়েছে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে ওই মেয়েটির সঙ্গে সুদীপ কাল নয় পরশু শরীরিক সম্পর্কে আসবে। এটা ন্যায় না অন্যায় সে জানে না। মেয়েটি যে দিনের পর দিন সুদীপের সেবা করে গেছে তা সবাই দেখতে পেয়েছে। সুদীপও সেটা জানে। নইলে বলত না কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে। হঠাৎ মাথার ভেতর সব গোলমাল হয়ে গেল জয়িতার। সটান ফিরে এল আস্থানায়। শব্দ করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চিৎকার করে উঠল, ‘কি অবলার মত কাঁদছিস! তোর লজ্জা করছে না?’

মুখ তুলে তাকাল সুদীপ। তার মুখে হাসি ফুটল। তারপর অদ্ভুত গলায় বলল, ‘এই যে জোয়ান অফ আর্ক এসে গেছে! নাকি লক্ষ্মী বাঈ! আমি কাঁদছি তো কার কি! তুই কাঁদতে পারিস?’

জয়িতা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল, ‘আমি মরুভূমি!’

‘নোস?’ টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সুদীপ, ‘তাহলে দাঁড়া। দেখি তোকে।’

কোনরকমে এগিয়ে এল সুদীপ। তারপর জয়িতার মুখের দিকে ঝুঁকে সোজা হয়ে হাসল। একটা হাত তুলে আলুল দিয়ে জয়িতার চিবুক থেকে কিছু তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল, ‘এটা কিরে? ভাত! তুই এখানে এসে জংলী হয়ে গেছিস জয়। খেয়ে দেয়ে মুখ ধুতে হয় তুলে গেছিস। আমাকে তোর খুব ঘেন্না দিতে ইচ্ছে করছে, না?’

‘বাংলাটা ঠিক করে বল। মরুভূমি দেখলি?’

মাথা নাড়ল সুদীপ। তারপর বলল, ‘তোমার দুটো হাত আমার গালে রাখবি জ্যা?’

মাথা খেল জমিতা। তারপর ধীরে ধীরে সে দুটো হাতে সুদীপের মুখ ধরল। পথিক্স আঙো ফুটে উঠল সুদীপের মুখে, ‘আঃ। জন্মদিনে এত আরাম কখনও পাইনি রে!’

॥ ৪৭ ॥

শীত এখন তুঙ্গে। পায়ের তলায় বরফের শরীর কাঠ। আস্তানার ছাদে তো বটেই, মাঝে মাঝে সিঁড়ির প্রথম ধাপেও বরফ উঠে আসে। বার বা বৃষ্টির দেখা নেই অনেকদিন। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যখন বয়ে যায় তখন বরফের শরীরে আঁচর পড়ে।

কিন্তু একটা পবিত্র রোদ তাপল্যাণ্ডের ওপর মশারি টাঙ্গিয়ে রাখে। শিশুরা সেই রোদে তুষার-বল নিয়ে খেলা করে, অশক্ত মানুষেরা আর একটা বছরের আশা নিয়ে সেই রোদে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। এই সব মানুষের অঙ্গে শীতবস্ত্র বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না য়ুরোপ আমেরিকার নির্বাক কান গ্রাম্য মানুষেরও। অথচ এরা বেশ আছে, অন্তত শীতের কণ্ঠ প্রবল একথা কেউ মুখ ফুটে বোঝায় না।

আনন্দ সুদীপ এবং জমিতা এতদিনে একটা নিয়মের মধ্যে আনতে পেরেছে তাপল্যাণ্ডের মানুষকে। আরাম পেতে গেলে পরিশ্রম করতে হবে। ব্যক্তিগত সুখের জন্যে যে একক পরিশ্রম তা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না এ সত্য তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে। যৌথ গৃহের সংখ্যা এখন বেড়েছে। মেয়ে শিশু এবং বয়স্ক মানুষেরা অনেক নিরাপদ বোধ করছে এখন। এমন কি সবল পুরুষেরা অনেক বেশী সহজ। শীতের সময় যখন একটা দিন কাটাতেই আর একটা দিনের শীতল নিঃশ্বাস গায়ে কনকনানি তোলে তখন এই যৌথগৃহে পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। বরফ গললে যদি প্রাণ চায় তাহলে যে যার গৃহে ফিরে যাবে। নিজস্ব সংসারের টান যে বড় গভীরে তা বোঝা যায় এখন এই শীতের সময়েও মেয়েপুরুষেরা নিজেদের ঘর রোজ ঠিকঠাক করে আসে। নিজস্ব ঘরের এই বাঁধন ছিন্ন করতে পারলে ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডিটাকে দূর করা যেত। কিন্তু আনন্দ প্রথম থেকেই এত বড় আঘাতটা করতে চাইল না। এক শীতে অনেকটাই হল, আর এক শীত এলে এই তলানিটুকু দূর হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা ঠিক মানুসগুলো এর মধ্যে বুঝতে পেরেছে এভাবে কেউ জন্মাবধি নিশ্চিত থাকেনি। কারো বাচ্চার অসুখ হলে অন্যের মা যে স্নেহের হাত বাড়ায়, সকাল সন্ধ্যা পেট উরাবার খাবার আসে যৌথ রান্না হয়ে, প্রবল শীতেও গায়ে উত্তাপ লাগে—এ তো স্বপ্নের মতো ব্যাপার কারো কারো কাছে।

কিন্তু সম্পন্ন নয় মানুষের সঙ্গে অন্তত দশটি পরিবার মেলেনি। তারা তুষার ঝড়ের সময় থেকেই আলাদা, মজবুত ঘরের দরজা খুলে যৌথগৃহের জোয়ারে গা মেশায়নি। এদের সবাই যে খুব আরামে আছে তা নয়, কিন্তু নিজেদের আলাদা দেখাবার একটা অহঙ্কারে ভুগছে। নিজস্ব মুরগী, ছাগল এবং সংকীর্ণ শস্য নিয়ে কোনরকমে থেকে যাওয়া। এদের বিরক্ত করতে চায়নি আনন্দ। কিন্তু গ্রামের মানুষ এর মধ্যেই টের পেলে গেছে ওরা আলাদা। বহু শূণ্য একসঙ্গে থেকেও এতদিন এই বোধের শিকার হয়নি ওরা। এখন অর্থনৈতিক শ্রেণীর বৈষম্যের ফসল হিসেবে দুটো জাত চিহ্নিত হল। সংঘাত শুরু হয়নি কিন্তু কথাবার্তায় খোঁচা দেবার প্রবণতা এসেছে। রান্নাঘরের দায়িত্ব জন্মিতার। যুবতী মেয়েদের নিয়ে সকাল থেকে তার কাজ শুরু হয়ে যায়। খচ্চরওয়ালাদের কাছ থেকে কেনা খাদ্যসামগ্রী এখন শেষের দিকে। সুদীপের টাকা যা এখনও রয়েছে তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এই বরফ ডিঙিয়ে খচ্চরওয়ালারা আসবে না। আজ অবধি বরফের সময় কেউ ওয়াল্যাংচুও কিংবা চ্যাওথাপুতে কখনও যাওয়ার চেষ্টা করেনি। প্রাথমিক ইতস্তততা কাটানোর পর যে ঘর ঘরে জমানো শস্য এনে দিয়েছে যৌথরান্নাগৃহে। যুবতী মেয়েরা এখানে বসে রান্না করে আর গল্প বানায়। জন্মিতা লক্ষ্য করছিল অবিবাহিতা যুবতী মেয়ের সংখ্যা এখানে খুবই কম। বিবাহিতারা গল্প করে আর হাসে। আর সেই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের হাসি আরও বেড়ে যায়। নিমকিত নামের যুবতীটি বলল, ‘ইনামিত বলছে ওর স্বামীর চেহারাটা ঠিক কিরকম তা এখন ভুলে গেছিল ও। কাল এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ঝরনার ধারে গিয়ে সেটা আবার জেনে এসেছে। কথাটা শেষ হওয়া মাত্র সশ্মিত হাসির ঝড় উঠল। ইনামিত নামের মেয়েটি একটুও লজ্জা পেল না। তার সন্তান সব সময় পিঠেই বাঁধা থাকে। জন্মিতা তার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে দেখে সে বলল, ‘আমি বাবা মাঝে মাঝে শাই। যদি তোমরা বন্ধ করতে বল তাহলে ভাঙাঘরেই ফিরে যাব।’

জন্মিতা কোন মন্তব্য করল না। কলকাতায় থাকলে হয়তো তার জিভে প্রতিবাদ ফুটতো। পুরুষের শরীর ছাড়া নারীর আর কিছুতেই শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় এটা ভাবতেই তার মনে ঘৃণা ফণা তুলত। কিন্তু এই না সুন্দর, না সচ্ছন্দা মেয়েটির মুখে যে অহঙ্কারের আরাম সেটাকেই বা এখন অস্বীকার করে কি করে?

নিমকিত বলল, ‘তুমি বিয়ে করবে না? অমন সুন্দর দুটো পুরুষ তোমার সঙ্গে থাকে, ওদের তো মারপিটও লাগে না। ওদের মধ্যে কার সঙ্গে তোমার চলছে?’ প্রশ্নটা শেষ হওয়া মাত্র আবার হাসির ঝড় উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্তের চলাফেরা টের পেল জন্মিতা। সে কোনরকমে বলতে পারল, ‘তোমরা যা ভাবছ তা নয়। আমরা বন্ধু।’

নিমকিত বলল, ‘বন্ধু? ছেলেতে মেয়েতে বন্ধু হতে হয় কখনও শুনি নি বাবা।’

ওরা তোমার সঙ্গে স্ততে চায় না?’

জয়িতা রাগ করতে পারল না। এদের প্রশ্নের মধ্যে সারল্য স্পষ্ট। সে নিজেসে নিচে টেনে আনল যেন, ‘আমরা এই নিয়ে কখনও ভাবিনি।’

ইনামিত বলল, ‘এখন তো সব সোজা হয়ে গিয়েছে। তোমাদের যে বন্ধুর মাথা ঝাড়াপ হয়েছিল মদ খেয়ে সে তো একটা জাহান পেয়ে গেছে। তাহলে থাকল শুধু বড়াসাথী। ওর মত ভাল মানুষটাকেই তুমি মায়ালু বানিয়ে নাও। মেয়ে হয়ে জন্মেছ আর পুরুষের স্বাদ নেবে না?’

জয়িতা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, ‘তার জন্যে তো অনেক সময় পড়ে আছে। আগে আমরা সবাই একটু ভালভাবে বাঁচি তারপর।’

‘ভালভাবে বাঁচা! তা আর এ জীবনে হবে না। তোমরা এসেছিলে বলে এখন দুবেলা খেতে পাচ্ছি।’

‘কেন হবে না? সবাই মিলে কাজ করব, ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে যা যা প্রয়োজন তা যোগাড় করব। এবার বরফ গললেই এমন সব জিনিস তৈরি করতে হবে যা শহরে নিয়ে গেলে লোকে বেশী দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য হবে। সেই টাকা দিয়ে জামাকাপড় আবার ওষুধ কিনে নিয়ে আসা হবে। আমাদের সব সময় ভাবতে হবে এই গ্রামের সবাই এক পরিবারের।’

জয়িতা কথা শেষ করতেই নিমকিত বলল, ‘এসব কথা তো কেউ বলেনি। দেখা যাক, তোমরা রাস্তা দেখাচ্ছ, রাস্তাটা যদি ঠিক হয় তাহলে মন্দ কি।’

এই সময় একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উত্তেজিত গলায় খবর দিল একটা ইয়াকের বাচ্চা হয়েছে। আর বাচ্চাটা মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই ছুটতে লাগল কাহনের মন্দিরের দিকে। নিমকিত ধরে নিয়ে এল জয়িতাকে। ভিড় জমে গেছে সেখানে। এরই মধ্যে কাহনের শিষ্যরা বিশাল বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করেছে। সদ্যজাত ইয়াক শিশুটি এখনও পা সোজা করতে পারছে না। তার শরীর পরিষ্কার করছে মা চেটে চেটে। এই ভীড় যন্ত্রের আওয়াজে বিন্দু মাত্র ভীত নয় সে। বরং এই গ্রামের মানুষের জন্যে একটা শুভকাজ সে করতে পেরেছে বলে হয়তো আনন্দ করতে পেরেছে। জয়িতার অন্তত ওর ভাবভঙ্গীতে তাই মনে হল। হঠাৎ একটা গলা চিৎকার করে উঠল, ‘এই যে এতদিন পরে একটা মেয়ে ইয়াক জন্মাল, কেন জন্মাল কেউ জানো?’ জয়িতা ছেলেটাকে চিনতে পারল। তুষারঝড়ের সময় খুব পরিশ্রম করেছিল ছেলেটা। ব্যবহার বেশ ভাল। আনন্দ বলে এই রকম ছেলে কয়েকটা পেলে আর চিন্তা নেই। ওর নাম সাওদের।

সাওদেরের কথায় জবাব কেউ দিতে পারল না। সে আবার গলা তুলল, ‘ইয়াকের বংশ তো এই গ্রাম থেকে লোপ পেয়েই যাচ্ছিল। এবার আমাদের নতুন সাথীরা এসেছে বলেই উজবান মুখ তুলল।’

একসঙ্গে সবকটা দৃষ্টি পড়ল জয়িতার ওপরে। সবাই খুশিতে গুঞ্জন শুরু

করল। কাহন বললেন, ‘আমি জানতাম এবার মেয়ে বাচ্চা হবে। ভগবান আমাকে প্রায়ই স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন।’

গুঞ্জনটা থামল। বিপরীত দুটো বক্তব্যের কোনটে সত্য তা নিয়ে ফাঁপরে পড়ল যেন সবাই। জন্মিতা ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। এ সবই সংস্কার। মেয়ে ইয়াকের জন্ম হওয়া প্রাকৃতিক ব্যাপার, এ তথ্য এদের বোঝানো মুশকিল। আর তাই কাহনরা চিরকাল বহানতবিস্মতে বেঁচে থাকেন।

আনন্দ এখন গ্রামে নেই। ভোরেই ও বেরিয়ে গেছে পালদেম লা-ছিরিঙদের সঙ্গে নিয়ে। খানিকটা নিচে চমৎকার জ্বালানি কাঠ ছড়ানো আছে। সেগুলো কেটে কেটে আনা দরকার। কাঠের সঞ্চয়ে টান পড়ছে। সুদীপের ওপর দায়িত্ব ছিল মুরগী ছাগলগুলোর জন্যে বড়সড় একটা খাঁচা তৈরী করার। কয়েকটা ছেলে বরফ সরিয়ে মাটিতে খুঁটি পুঁতেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জন্মিতা জানতে পারল সুদীপ একটু আগে একজনকে সঙ্গে নিয়ে জললে ঢুকেছে। বুনো চমরির একটা ঝাঁক নাকি এসেছে এদিকে। যদি দু তিনটেকে মারতে পারে তাহলে সারা গ্রামের মানুষের পেটে মাংস পড়বে। ব্যাপারটা জন্মিতার কাছে হঠকারিতার সমান মনে হল। চেতনা স্বচ্ছ হওয়ার পর সুদীপ আরও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে। বন্যজন্তুগুলোকে না মেরে বুদ্ধি খাটিয়ে যদি ধরতে চেষ্টা করত তাহলে আখেরে বেশী কাজ দিত। জন্মিতা আস্তানায় ফিরে দরজা বন্ধ দেখল। সেই মেয়েটিও নেই। সুদীপের জাহান। আজকাল সব সময় সুদীপের সঙ্গে লেপেট থাকে ও। প্রথম দিকে যৌথ রান্নায় হাত লাগাতে গিয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু গ্রামের অন্য মেয়েরা তাকে প্রায় স্পষ্টই বলেছে ওখানে অনেক লোক, মেয়েটির সাহায্যের দরকার নেই। এখন বস্তুত গ্রামের অন্য মেয়েদের থেকে তাকে সব সময় আলাদা থাকতে হয়। এবং এজন্যে যেন ওর কোন আক্ষেপও নেই। সুদীপ যে কাজ করছে সেই কাজের সঙ্গী হচ্ছে সে আগবাড়িয়ে। সুদীপ ওকে ঠিক ভালবাসে কিনা বোঝা যায় না। যে গলায় কথা বলে তাতে আর যাই থাক ভালবাসা থাকে না। কিন্তু মেয়েটির ব্যবহারে কোন অস্পষ্টতা নেই। কাল রাত্রে সুদীপ আনন্দকে বলেছিল, ‘আশা করি তোরা আমাকে ভুল বুঝিস না। এ গ্রামের নিয়ম হল কোন নারীকে কেউ গর্ভবতী করলে তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতেই হয়। এ জিন্দগীতে শালা আমার বিয়ে করার ধান্দা নেই। অতএব ঠিক আছি। মেয়েটার একটা শেলটার দরকার, দিয়ে যাচ্ছি।’

জন্মিতা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এবং তখনই রামানন্দ রায়ের কথা মনে পড়ল ওর। বাবা কেমন আছে এখন? বাবার কি ওর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে? নাকি ওরা জেনে গেছে জন্মিতা বেঁচে নেই। তাই বা হবে কেন? কল্যাণের মৃতদেহ পাওয়ার পর পুলিশ নিশ্চয়ই খবরের কাগজে কুতিত্বের কথা বলেছে। কল্যাণের ভাইরা নিশ্চয়ই একটা লোকদেখানো শ্রদ্ধ করেছে। আর যে

পুলিসবাহিনী এখানে এসে শূণ্য হাতে ফিরে গেছে তারা তিনজনের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছে। আর তাই জেনে রামানন্দ রায়ের কষ্ট কি খুব বেড়ে গেছে। ওর হঠাৎ মনে হল মদ খাওয়া পার্টিতে যাওয়া বা অন্য রমণীতে আসক্তি প্রকাশের নামে যে ফার্টিলাইজারের স্রোতে রামানন্দ রায় গা ভাসিয়েছিলেন সেটার পাশাপাশি আর একটা ভালবাসার কাণ্ডালও বেঁচে ছিল। যেচে পরা মুখোশটা এত সেঁটে বসেছিল যে সেটা টেনে খোলা আর সম্ভব হয়নি। কি জানি হয়তো জুল, এসব ধারণাই বৈঠিক। হয়তো এর মধ্যে চলে যাওয়া সময়টা ভরিয়ে দিয়েছে মনের খাদগুলো। তবু একবার রামানন্দ রায় যখন মধ্যরাতে মাতাল হয়ে একাকী বসে থাকেন তখন সামনে আচমকা গিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর মুখখানা দেখতে বড় ইচ্ছে করে। এসব মাথার মধ্যে পাক খেতেই ওর হাসি পেল। সে একনাগাড়ে রামানন্দ রায়কে ভেবে চলেছে। অথচ সীতা রায়, তার মা? কল্যাণের একটা কথা মনে পড়ল, ‘জানিস, আজকালকার মেয়েরা না ঠিক মায়েদের মত নয়। বলতে পারিস দিদির মত। ব্যবহারে চেহারায়। মা মা অনুভূতিটা যদি না আসে তো আর কি করা যাবে?’ জয়িতা জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘কেন, তোর মা?’

‘আমার মায়ের কেসটা আলাদা। অভাবের সঙ্গে লড়তে লড়তে ভদ্রমহিলাকে প্রায়ই বাড়িতে দলবদল করতে হয়। আর সেই কারণেই সন্তানদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হন।’ কল্যাণের এই বক্তব্য কতটা সত্যি ছিল তা সে-ই জানত কিন্তু সীতা রায়কে স্মরণ করে আজ জয়িতার মনে হল এখন পাশে থাকলে সে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরী করার চেষ্টা করত। মানুষ বারংবার কেন্দ্রচ্যুত হয়, ঘরবদল করে যে আত্মিক অভাবের তাড়নায় সেটাকে বুঝতে চেষ্টা করত সে। এই কয়মাস, সময়ের হিসেবে কিছুই নয়, কিন্তু জয়িতার মনে হল অনেক দরজা তার কাছে খুলে গেছে।

জয়িতা পাশের পাহাড়ে চোখ রাখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রোলেনদের গ্রামে অনেক দিন যাওয়া হয়নি। আনন্দ অবশ্য এখনই ওখানে কোন উদ্যোগ নিতে রাজী নয়। রোলেনদের অর্থনৈতিক অবস্থা অবশ্য তাপল্যাণ্ডের মানুষের চেয়ে ভাল। একসঙ্গে দুজায়গায় পরিশ্রম করা তিনটি মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বরং সত্যি যদি তাপল্যাণ্ডের চেহারা ওরা ফেরাতে পারে তাহলে রোলেনদের গ্রামের যারা নিঃস্ব মানুষ তারা নিজে থেকেই আকর্ষণ বোধ করবে। অন্তত একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত না রাখতে পারলে ওদের কাছে এগিয়ে যাওয়া অর্থহীন। জয়িতা ভগবানের পবিত্র জল উদ্ধার করে দিয়েছিল শুধু এই কারণেই সম্পর্কটা এখন সহজ হয়েছে। কিন্তু কাজ শুরু করতে চাইলে সংঘাত হবে না তাকে বলতে পারে।

তবু জয়িতা পা বাড়াল। ওর মনে হল রোলেনদের গ্রামটায় একবার যাওয়া উচিত। এতে আর যাই হোক সম্পর্কটা ঠিক থাকবে। পানের তলার বরফ এখন শক্ত ইট। সাবধানে না হাঁটলে গিছলে পড়তে হবে। এই সময় সে

সাওদেরকে দেখতে পেল। দ্রুতগতিতে পাশে এসে সাওদের জিজ্ঞাসা করল,
'তুমি ওভাবে চলে এলে কেন?' আমি কি কিছু খারাপ কথা বলেছি?'
'একটা ইয়াকের বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে কোন মানুষের সম্পর্ক থাকতে পারে না।'
'বাঃ, তাহলে যে কাহনও বলল, ভগবান ওঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন। তার
বেলা?'

'সেই স্বপ্ন তো উনি ছাড়া কেউ দ্যাখেননি?'
'তার মানে তুমি বলছ কাহন সত্যি কথা বলেননি?'
'হয়তো তিনি যেটা বিশ্বাস করেন সেইটেই বলেছেন।'
'তুমি কোথায় যাচ্ছ এখন?'
'রোলেনদের গ্রামের দিকে যাব ভাবছি।'

সাওদের এক মুহূর্ত্ত ভাবল। তারপর বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব?'
জয়িতা সম্মতি দিল। সঙ্গে কেউ থাকলে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে সুবিধে
হয়। বলা যায় না, যেখানে বরফ জমেনি সেখানে পা ফেলতে দুর্ঘটনা ঘটা
বিচিত্র নয়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর জয়িতা বলল, 'তুমি একা ওই গ্রামে কখনও
গিয়েছ সাওদের?'

'লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামের পাশে গিয়েছি, তু কিনি। আমাদের মধ্যে মারপিট
তো লেগেই ছিল এতদিন। কিন্তু তুমি যেভাবে হাঁটছ তাতে ওখান থেকে আজ
রাত্রি ফিরে আসতে পারবে না। জোরে হাঁট, জোরে।'
সাওদের গতি বাড়তে জয়িতা চোঁট্টে উঠল, 'ওরে বাব্বা, অত জোরে আমি
পারব না।'

'কেন? এইভাবে পা ফেল।' সাওদের দেখিয়ে দিল শরীর কেমন রাখতে
হবে।

জয়িতা অনুকরণ করতে চেষ্টা করল। গতি বাড়ছে কিন্তু অনভ্যাস তার পতন
অনিবার্য করে তুলল। সে যখন হুমড়ি খেয়ে বরফের ওপর পড়ছে তখন ক্ষিপ্ত
হাতে সাওদের তাকে জড়িয়ে ধরল। বুকের ভেতর তখন হাতুড়ি পেটার শব্দ,
নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার আগেই সাওদেরের শরীরে বিদ্যুটে গন্ধ টের পেল।
এবং তার পরেই মনে হল যতটা সময় ধরে রাখা উচিত তার থেকে অনেক
বেশী সময় এবং শক্তি ব্যয় করছে সাওদের। সেই অবস্থায় মুখ তুলল জয়িতা।
সাওদেরের কিশোর কিশোর মুখে যেন হোলি গুরু হয়ে গিয়েছে। নিঃশ্বাস
ভারী। প্রবলী অশ্বস্তি নিয়ে জয়িতা বলল 'ছেড়ে দাও সাওদের।'

'নাঃ আর একটু, আর একটু থাকো।' সাওদেরের গলায় স্বর জড়ানো।
'মানে?' জয়িতার গলা থেকে শব্দটা ছিটকে এল।

এবার হাত শিথিল হল সাওদেরের, বিহ্বল দেখাল ওকে। তারপর বলল,
'তুমি কি নরম!'

হতভম্ব হয়ে গেল জয়িতা 'আমি নরম? নরম মানে?'

সাওদের সরল হাসল, 'তোমাকে বাইরে থেকে দেখলে খুব শক্ত মনে হত,

কিন্তু আজ বুঝলাম তা ঠিক নয় ।’ এখন দূরত্ব এক হাতের । মাথায় ওরা প্রায় সমান সমান । জয়িতা অবাঁক । সাওদেরের বয়স বোঝা মুশকিল । দাড়ি এদের সবার বের হয় না । তাঁঁটের ওপর হালকা গোঁফের রেখা । এক মাথা চুল আর চমৎকার চামড়ার জন্যে বয়সটাও বোঝা দুষ্কর হয় । তাছাড়া সব সময় ওর দিকে তাকালে যে ইংরেজী শব্দটা মনে পড়ে সেটা হল ‘ইনোসেন্ট ।’ যা বয়স্ক মানুষেরা কিছুতেই পেতে পারে না । কিন্তু ওর দিকে তাকালেই আচমকা কম্পন এল জয়িতার শরীরে । সে নরম । তার শরীরে এখন শীতের ভারী পোশাক । যে কথা কখনও আনন্দ বা সুদীপের মাথায় আসেনি সেই কথা কি বেমালাম উচ্চারণ করল সাওদের । অথচ নিজেকে তার মোটেই নরম ভাবতে ইচ্ছে করছিল না ।

হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল জয়িতা । আর হাসিটা যেহেতু শহরে তাই সাওদের বুঝতে পারছিল না কি করা যায় । হাসি খামিয়ে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি বুঝি গ্রামের মেয়েদের জড়িয়ে ধরে পরীক্ষা কর কে নরম আর কে শক্ত ?’

‘দূর ! গ্রামে আমার বয়সী মেয়েই নেই যে তাকে জড়িয়ে ধরবে । বড় মেয়েরা আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায় কিন্তু আমার ওদের মোটেই ভাল লাগে না ।’ সরল গলায় জানাল সাওদের ।

‘তাই নাকি ?’

‘হ্যাঁ । ওরা সব কেমন বড় বড় । অবশ্য রোলেনদের গ্রামে একটা আমার বয়সী মেয়ে আছে ।’

‘আচ্ছা ? তাই তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইছ ?’

‘না, তা ঠিক নয় । কিন্তু মেয়েটার মুখ খুব খারাপ । অত সুন্দর দেখতে অথচ এমন গলাগাল দেয় যে কি বলবে । একবার ওই ঝরনার পাশে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ।’

‘তখন ওকে জড়িয়ে ধরেছিলে ?’

‘উঃ, তুমি বুঝতে পারছ না । চেয়ে আছি দেখে মেয়েটা চিৎকার করল, মেয়ে দ্যাখোনি কোনদিন যে চোখ বড় করেছে ? ক্ষেতি আছে কতখানি । রোজ রোজ শেলফটি খাওয়াতে পারবে ? এই সব বলে চলে গেল । আমার তো ওসব কিছু নেই তাই আর ওর কথা ভাবি না ।’ সাওদেরকে মোটেই দুঃখিত দেখাচ্ছিল না । জয়িতা আবার হাঁটা শুরু করেছিল । পাশাপাশি হাঁটতে সাওদের চাপা শিস দিচ্ছিল । আর গতি বাড়াচ্ছে না সাওদের । ক্রমশ ওরা চুপচাপ ঝরনার পাশে চলে এল । এরমধ্যে কখন ঝরনা জমে বরফ হয়ে গিয়েছে । এক ফোঁটা জল নেই কোথাও । এবং তখনই নিচে গুলির শব্দ পেল জয়িতা । শব্দটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ে পাহাড়ে । সে সচকিত হল । সুদীপ । ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগল জয়িতার নিরীহ চমরী মারার জন্যে । বন্দুকের গুলি খরচ করার কোন মানে হয় না । আওয়াজটা খুব দূরের নয় । সঙ্গে সঙ্গে মত পাষ্টালো সে । সাওদের কান খড়া করেছিল । ওর মুখের রেখাগুলো এখন

অস্বাভাবিক। শব্দটা শোনার পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'আওয়াজটা কোথেকে এসেছে তা কি তুমি বুঝতে পারছ সাওদের?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সাওদের। জয়িতা বলল, 'ওখানে আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে?'

'রোলেনদের গ্রামে যাবে না?'

'না। আগে দেখে আসি কি হচ্ছে ওখানে।'

সাওদের বলল, 'এপাশ দিয়ে গেলে অনেক সময় লাগবে। এসো, আমার হাত ধরো, ঝরনা পার হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব আমরা।' সাওদেরের বাড়ানো হাত ধরল জয়িতা। স্পর্শ পাওয়ামাত্র কেঁপে উঠল জয়িতা। তার মনে হল সাওদের হয়তো আবার ভাবতে শুরু করেছে জয়িতা কি নরম। কিন্তু ওর হাতের স্পর্শে বা ব্যবহারে সেসব কিছুই দেখতে পেল না জয়িতা। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে বরফ পরীক্ষা করে করে ওকে নিয়ে ঝরনা পেরিয়ে এল সাওদের। ওপারে পৌঁছে ঢালু পথ সামান্যই হাঁটা। রোলেনদের গ্রামের ঠিক উল্টো পথ এইটে। গাছপালাগুলো বরফে ঢাকা। কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটিছিল, হঠাৎ সাওদের তার হাত চেপে ধরল। মুহূর্তেই তাকে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। নিঃশব্দে সে দূরের একটা বরফের চাঁই দেখিয়ে দিল। প্রথমে ঠাহর করতে পারেনি জয়িতা। তারপর নজরেও এল লম্বা একটা লোমশ লেজ অনেকটা আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে বরফের ওপর নেতিয়ে রয়েছে। শরীর দেখা যাচ্ছে না। সাদার ওপর কালো ছোপ ছোপ লেজ বরফের গায়ে যেন মিশে আছে! ঠোঁটে আঙুল চেপে কথা বলতে নিষেধ করে গেছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সাওদের। কিন্তু জয়িতার মনে হল জন্তটাকে না দেখে ফিরে যাওয়া বোকামি হবে। প্রায় মিনিট পাঁচেক সে সাওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল। এই সময় লেজটা একবারের জন্যেও জায়গা বদল করল না।

সময় সম্ভবত সাওদেরের সাহস ফিরিয়ে দিল। সে গোল করে অনেকটা জায়গা হেঁটে ঠিক উল্টো দিকে পৌঁছে গেল জয়িতাকে নিয়ে। এবং তখনই জন্তটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা। লম্বায় অন্তত ফুট সাতেক হবে। বরফের ওপর মুখ খুঁড়ে পড়ে আছে। এবং তার বুকের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে। শরীরে সামান্য কাঁপনি নেই। স্নো-লেপার্ড? জয়িতা চমকে উঠল। সত্যি যদি স্নো-লেপার্ড হয় তাহলে এতো প্রায় রূপকথার প্রাণী। হিমালয়ের চৌদ্দ পনের হাজার ফুট উঁচুতে এদের অবস্থান। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সাম্প্রতিক কালে এদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছেন। জয়িতা একমুঠো বরফ ছুঁড়ল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হল না। সাওদের দুহাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করল। জিম করবেটের বইতে জয়িতা জেনেছে আহত চিতার কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। সে আর এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু মৃতবৎ পড়ে থাকতে দেখে সাওদের সাহস পেয়ে গেছে এখন।

নিষেধ না শুনে এগিয়ে যাচ্ছিল পায়ের পায়ের। তারপর কাছাকাছি হয়ে চিৎকার করল, ‘মরে গেছে, মরে গেছে।’

জয়িতা এবার ছুটে গেল। সত্যি এটা স্নো-লেপার্ড। এবং বেশ বড়সড়। সারা শরীরে মেরুভানুকের মত পুরু লোম এবং খাবাতেও লোমের গদি আছে যাতে বরফের ওপর সহজে হাঁটিতে পারে। সাদাটে চামড়ার কালো ছোপ এদের লুকিয়ে থাকতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে। জয়িতা পড়েছিল পৃথিবীতে তিক এই সময় কতগুলো স্নো-লেপার্ড আছে যার হিসেব নেওয়া সম্ভব হয়নি। একটা বিশেষজ্ঞ দল রাশিয়ার বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ে চারটে শীত কাটিয়েও একটি স্নো-লেপার্ডের দর্শন পায়নি। এই জন্তু সাধারণ বাঘ কিংবা চিতা নয় তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এর মৃত্যু হয়েছে সামান্য আগে। এখন আসার পথে রক্ত ঝরিয়ে এসেছে ও। জয়িতার বুঝতে অসুবিধে হল না সুদীপকার উদ্দেশ্যে গুলি খরচ করেছে। এই বিরলজাতের প্রাণীটিকে মারা সুদীপের উচিত হয়েছে কিনা এ নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই সাওদের লেপার্ডটিকে ধরে টানতে লাগল। কিন্তু ওর একার পক্ষে ওজন অনেক বেশী। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, ‘কি করতে চাইছ ওটাকে নিয়ে?’

‘উঃ, তুমি বুঝতে পারছ না। এই এলাকাটা রোলেনদের। ওরা যদি এটাকে দ্যাখে তাহলে কিছুতেই আমাদের নিয়ে যেতে দেবে না। তুমি হাত লাগাও, তাড়াতাড়ি ঝরনার ওপারে নিয়ে যাব।’

সাওদেরকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

‘কি করবে এটাকে নিয়ে?’

‘কি আর করব? খাব। এরকম বাঘের কথা শুধু শুনেই এসেছি। তোমরা আসার পর ইয়াকের মেয়ে বাচ্চা হচ্ছে, সাদা বাঘ এসে মরে পড়ে থাকছে। ধরো ধরো।’

তিক সেই সময় অত্যন্ত সাবধানে সুদীপ নিচের জলল সরিয়ে বেরিয়ে এল রক্তচিহ্ন ধরে। জয়িতাকে লেপার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে হতভম্ব। জয়িতা চোঁচিয়ে বলল, ‘কনগ্রাচুলেশন, পৃথিবীর রেয়ার একটা প্রাণীকে তুই মারতে পেরেছিস।’

‘রেয়ার প্রাণী? ওটা তো বাঘ! মরে গেছে?’ সুদীপ দৌড়ে ওপরে উঠে এল।

‘এর নাম স্নো-লেপার্ড!’

সুদীপ কাঁধ নাচাল। ততক্ষণে মেয়েটি আর একটি ছেলে ওপরে উঠে এল। সুদীপ বলল, ‘খুব ভুগিয়েছে লেপার্ডটা। চমরী খুঁজতে বনে চুকিয়েছিলাম পেয়ে গেলাম এটাকে। গুলি খেয়ে এতটা ছুটে আসবে ভাবিনি। একেবারে হার্টে নেগেছে। শক্তি আছে বটে। কিন্তু তোরা এখানে?’

‘পৃথিবীর সমস্ত চিড়িয়াখানায় এই প্রাণীর সংখ্যা মাত্র তিনশো।’

‘তাতে আমার কিছু এসে যাচ্ছে না। আর একটু সময় পেলে ওটাই আমাকে এতক্ষণে আরাম করে খেত। ফালতু সেন্টিমেন্ট ছাড়।’ সুদীপ ওদের ইঙ্গিত করল। সাওদের তো তৈরী হয়েই ছিল। বাকী দুজন হাত লাগাতে লেপাডটাকে নড়ানো সম্ভব হল। টানতে টানতে ওরা ওকে ঝরনার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সুদীপ হাসল, ‘তোর চামচেটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?’

‘চামচে?’

সুদীপ সাওদেরকে দেখাল।

‘চামচে বলছিস কেন?’

‘তোকে দেখলে ওর মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লক্ষ্য করেছিস?’

জয়িতা দাঁড়াল না। তার মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছিল। সম্প্রতি সুদীপের কথাবার্তায় সামান্য সৌজন্য থাকছে না। সুদীপ দৌড়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে থামাল, ‘তুই এত ক্ষেপা হয়ে গেলি কেন?’

‘ছেড়ে দে আমাকে।’ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়াল জয়িতা।

‘তুই শানা খুব কাঁঠখোঁটা।’ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনিটা ফিরে এল। সুদীপ বলছে কাঁঠখোঁটা অথচ একটু আগেই সে শুনেছে, ‘তুমি কি নরম!’ কোনটা সত্যি?

হঠাৎ সুদীপ বলল, ‘শোন, মালপত্র কমে আসছে। আনন্দ বলছে চ্যাওথাপু থেকে কিনে আনা দরকার। আমি নিজে যাব বলেছি। তোর জন্যে কিছু আনতে হবে?’

‘তুই তাপল্যাঙের বাইরে যাবি?’ অজান্তে প্রশ্নটা মুখ থেকে বের হল।

‘হ্যাঁ।’ তার পরেই হো হো করে হেসে উঠল সুদীপ, ‘তুই কন্যাণের কেসটা ভাবছিস? আমি শানা কখনও মরব না। তাছাড়া চ্যাওথাপুতে পুলিশ ফাড়ি নেই।’

জয়িতা কোন কথা না বলে নীরবে হাঁটছিল। সুদীপ বলল, ‘মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সোজা কলকাতায় চলে যাই। একবার দেখে আসি সেখানকার মানুষগুলো কে কেমন আছে।’

‘কে কেমন আছে সেকথা জানতে যেতে হবে কেন? পুরুর চামড়ার নখদন্তহীন চোখের পর্দা ছেঁড়া আত্মসম্মানহীন কল্লেক লক্ষ বাঙালী গর্তে মুখ লুকিয়ে এ ওকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করেছিলাম তা অর্থহীন ওদের কাছে। আর এই যে আমরা তাপল্যাঙে যেজন্যে পড়ে আছি তা জানতে পারলে পেছনে একটা ধান্দা খুঁজবে। রগরগে মশলা না পেলে আমাদের কথা শুনেও চাইবে না। ওদের দেখার জন্যে কষ্ট করার কি দরকার!’ জয়িতা ক্লান্ত গলায় বলল।

হঠাৎ সুদীপ বলল, ‘জয়ী।’

জয়িতা তাকাল। সুদীপ হাসল, ‘তোকে অনেকদিন বাদে এই নামে ডাকলাম।’

‘কি বলছিলি?’

‘ধর, আমরা যা চাইছি সব হল। তাপল্যাণ্ডের মানুষদের নিদিষ্ট আয় হল। কো-অপারেটিভ ডেয়ারি, ফার্স এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে মানসিক সুস্থিতিও এল। তখন আমরা কোথায় যাব?’

‘কোথায় যাব মানে? এখানেই থাকব। এদের সঙ্গে।’

সুদীপ মাথা নাড়ল। কিন্তু কোন কথা বলল না। ওরা গ্রামে ফিরে আসছিল। এর মধ্যে খবর পৌঁছেছে। দলে দলে লোক ছুটেছে স্লো-লেপার্ডটাকে নিয়ে আসার জন্য। এবং তখনই জয়িতা আনন্দদের দেখতে পেল। দশবারোজন লোক কাঠের বোঝা বরফের ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। আনন্দ একটু ঝুঁকে হাঁটছে। জয়িতার মনে হল এই কয় মাসে আনন্দ যেন অনেক বয়স্ক হয়ে গিয়েছে। ওর শরীরেও ভাঙ্গন এসেছে। সে চমকে সুদীপের দিকে তাকাল। এবং মনে হল সুদীপের চেহারায় সেই জেল্লা নেই। নিজেকে অনেকদিন দ্যাখেনি জয়িতা। সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। আনন্দের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বুকের মধ্যে একটা ছটফটানি টের পেল জয়িতা।

সে ছুটে এগিয়ে এল। আনন্দ হাসল, ‘গ্রেট ডিসকভারি। কাঠ তো ছিলই এই অঞ্চলে প্রচুর বড় এলাচের গাছ আছে। বরফ গললে বড় এলাচ সাপ্লাই দেওয়া যাবে। আর নীচের দিকে বেতের বন দেখতে পেলাম। এত ওপরে বেত, ভাবা যায় না। পালদেম বলছে গ্রামের অনেকেই বেতের কাজ জানে। ব্যাপারটা অর্গানাইজ করতে হবে।’

‘তুই ভাল আছিস আনন্দ?’ জয়িতা প্রশ্নটা করে ফেলল।

‘কেন? আমাকে খারাপ দেখাচ্ছে?’ আনন্দ অবাক হল।

‘না, ঠিক আছে।’

‘তোদের মাথায় কখন কি ঢোকে কে জানে! আর হ্যাঁ, চমরীদের একটা দল এসেছে এদিকে। পায়ের ছাপ দেখলাম। জ্যাক্ত ধরব বলে ফাঁদ পেতে এলাম। রান্না হয়ে গেছে?’

‘আমি দেখছি।’ জয়িতার মনে পড়ল তার কাজটার শেষ না দেখেই বেরিয়ে পড়েছিল।

এই সময় আনন্দের নজরে পড়ল। সে চিৎকার করে সুদীপকে ডাকল, ‘কিরে, এখনও খাঁচাগুলো তৈরী করিসনি?’

সুদীপ জবাব দিল, ‘আমি একটু শিকারে গিয়েছিলাম।’

‘শিকার? তোকে কে শিকারে যেতে বলেছিল! পশু মারার চেয়ে পশু বাঁচানোই তো জরুরী। আমরা যদি নিজেদের কাজগুলো না করি—! বিরক্তিতে আনন্দ মুখ ফেরাল। জয়িতা আশংকা করছিল সুদীপ হয়তো একটা কড়া জবাব দেবে। কিন্তু সুদীপ কিছুই করল না। চুপচাপ চলে গেল খাঁচার কাছে। ব্যাপারটা অভিনব লাগল জয়িতার। আনন্দ ততক্ষণে চলে গেছে শৌখণ্দের

দিকে ।

জয়িতা খাবারের ব্যবস্থা দেখার আগে সুদীপের কাছে গিয়ে বলল, 'তুই হঠাৎ এত ভাল হয়ে গেলি কি করে রে ?'

সুদীপ বলল, 'ফোট! ন্যাভানো কথা বলিস না ।'

কথাটা খুব বিস্মী লাগল জয়িতার । হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল সুদীপ কখনও তাকে বলেনি সে ভিজে কথা বলে ! সে কি তাই বলছে । এবং তখনই সেই তিনটে শব্দ কানের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলল, 'তুমি কি নরম ।'

॥ ৪৮ ॥

দুবার বরফ গলে গেল কিন্তু সেই অদৃশ্য জন্তুর অস্তিত্ব চাক্ষুষ হল না । যাকে এরা দানো বলে, যাকে ইয়েতি বলে ওদের মনে হয়েছিল । গেল গ্রীষ্মে পাহাড়টার যতদূর যাওয়া সম্ভব বন্দুক হাতে ঘুরেছে সুদীপ । ইয়েতি তো দূরের কথা আর একটাও স্নো-লেপার্ড চোখে পড়েনি । দ্বিতীয়বার বরফ গলবার আগে যে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গিয়েছিল তা চমৎকার কাজে লাগানো গিয়েছে । দুবছরে তাপল্যাণ্ডের চেহারা ব্যাপক পালটে গিয়েছে ।

স্বষ্টি এখানে সারা বছর হয় । কোথাও জল দাঁড়ায় না । শীতের প্রকোপ এত বেশী যে সমতলের সব শস্য এখানে ফলতে পারে না । কিন্তু আনন্দ এদের নিজস্ব ফসল ছাড়াও বাড়তি কিছু জন্মে ধাপে ধাপে পাহাড় কাটিয়েছে । এই গ্রীষ্মে কিছুই লাগানো হয়নি সেখানে । কারণ অনবরত আগাছা বের হচ্ছিল নবীন মাটি থেকে । সেগুলো তুলে ফেলা, মাটিটাকে সহজ করার কাজ চলেছে এতকাল । ডুওডুও এবং গুন্ড্রুকের চাষ হয়েছে প্রচুর পরিমাণে । সেগুলো রোদে শুকিয়ে জমিয়ে রাখা হয়েছে বয়ফের সময়ের জন্যে । আর ব্যাপক ফলন হয়েছে ভুট্টার । দানাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে পিষলে চমৎকার আটা হয় । গম হবে কি হবে না এমন একটা অনিশ্চয়তা রয়েছে । আনন্দ চাইছে সামনের গ্রীষ্মে পরীক্ষা করতে ।

জমির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে । পরিশ্রম, উৎসাহ এবং পরিকল্পনা যদি জোরদার হয় তাহলে সারা বছর আর অভুক্ত থাকতে হয় না এই বিশ্বাস এসে যাওয়ার ব্যক্তিগত সীমানা নিয়ে তিনজন ছাড়া আর কেউ জেদ ধরে থাকেনি । অবস্থাপন্ন সেই তিনজন বস্তু এখন একঘরে । আনন্দরা ঠিক এইটে চায়নি । কিন্তু স্বার্থবিরোধী ভূমিকায় কাউকে দেখলেই মানুষের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই আসে । যদিও ওই তিনজন সমস্ত গ্রামের বিরোধী কোন ভূমিকা নেয়নি । যেভাবে তারা প্রতি বছর তাদের জমিতে চাষ করে এবারও তাই করেছে । সমস্ত গ্রামের মত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়নি । আমার জমি এবং তোমার পরিশ্রম মানে ফসলের আধাআধি, এই নীতি তাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব । আনন্দ গ্রামের সবাইকে অনুরোধ করেছিল যারা সঙ্গী হচ্ছে না তাদের যেন কেউ বিরক্ত না করে । কারো কারো মনে তাই দেখে যদি আলাদা হবার

প্রবণতা এসেও থাকে ফসলের পর তা দূর হয়ে গেল। দেখা গেল জমির ফলন সম্মিলিত উদ্যোগে অনেক ব্যাপক। সুদীপ কিংবা জয়িতা আশাই করতে পারেনি এত সহজে সাধারণ মানুষ একত্রিত হবে। আনন্দের উদ্যোগ, পরিশ্রম এবং এদের জন্যে নিজেকে নিয়োগ করার চেষ্টা ক্রমশ তাকে প্রায় কাহনের সহগোষ্ঠী করে ফেলেছে বলে ধারণা হচ্ছিল। আনন্দ যে কাজই করতে বলল তা করলে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে ফলে বিশ্বাস আরও বেড়ে যাচ্ছিল। কাহনের সঙ্গে পার্থক্য একটাই ওরা আনন্দকে ভয় করে না, এড়িয়ে চলে না। জয়িতা ঠাট্টা করেছিল, ক্ষমতা যেহেতু মানুষের চরিত্রবল করে সেইহেতু নিজেকে প্রায় দেবদূতের ভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার নেশা আনন্দকে পেয়ে বসেছে। এবং সেখান থেকেই আর একজন মিনি ডিক্টেটারের জন্ম নেওয়া বিচিত্র নয়। তার বক্তব্য ছিল প্রতিটি স্তরে নিজেরা এগিয়ে না গিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদেরই নেতৃত্ব নিয়ে কাজ শেষ করতে দেওয়া উচিত।

আনন্দ কোন জবাব দেয়নি, হেসেছিল। জয়িতাও ভাল করে উত্তরটা জানত। এই গ্রামের ব্যাপক মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব নেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছা একেবারেই নেই। এদের মানসিক গঠনও সেই পর্যায়েই নয়। এমনটি পালদেম, লা-ছিরিও কিংবা সাওদের পর্যন্ত চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকতা রাখে না। কয়েকজনের উৎসাহ আছে প্রচুর কিন্তু হুকুমটা অন্যের মুখ থেকে শুনে চায় এরা।

তাপল্যাও এখন গৃহপালিত পশু এবং প্রাণীর সংখ্যা বেড়েছে। মুশকিল হল আধুনিক জীবনের কোন সুবিধে এখনই এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। মুরগীর চামের জন্যে বিদ্যুতের দরকার এবং এখানে তা আকাশকুসুম চিন্তা বলেই মা মুরগীদের ওপর ডিমে তা দেওয়ার আদিকালের নিয়মটার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে উৎপাদন যতটা বাড়ি উচিত ছিল ততটা বাড়েনি। কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণ সংখ্যাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে। গত গ্রীষ্মে দশটা গরু কেনা হয়েছিল ওয়ালাওচুও থেকে। কয়েকটা চমরীর বাচ্চাকে জঙ্গল থেকে ধরে ভাল পোষ মানানো হয়েছে। সম্প্রতি তিনটে বাচ্চা হয়েছে। ফলে অত্যন্ত অসুস্থ বা দুর্বল শিশুরা কিছু দুধ পাচ্ছে। আর এই সব ব্যাপার গ্রামের তাবৎ মানুষের মনে একটা বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া এনেছে। নতুন জমি আমাদের পেটে খাবার দেবে, মুরগীর ডিম প্রত্যেকের শরীরে শক্তি দেবে এবং আমার শিশু দুধ পাচ্ছে যে কারণে সেই কারণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—এমত ধারণা প্রত্যেকের। সেই সঙ্গে এই গ্রামটা আমাদের, এই মাটি আমাদের এবং আমরা সবাই ঠিকঠাক খেয়ে আছি যেহেতু বাইরের তিনটি মানুষ আমাদের একত্রিত হতে শিখিয়েছে।

গত গ্রীষ্মে আশে পাশে যতটা দূর যাওয়া সম্ভব ততটা দূর গিয়ে বড় এলাচ সংগ্রহ করে আনিয়েছে আনন্দ। এই বস্তুটাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি তাপল্যাওর মানুষ এতকাল। প্রস্তাব শুনে ওরা খুব বিস্মিত হয়েছিল। যখন জানল বড়

এলাচ সমতলে ভাল দামে বিক্রি হয় তখনও চাড় আসেনি কারো। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে এখানে যেমন জিনিসপত্র কেনা হয় তিক তেমনি ওই জিনিস সমতলের মানুষের কাছে বিক্রি করা যায় তখন উৎসাহ বেড়ে গেল। খচ্চরওয়ালারা গত গ্রীষ্মেও এসেছে তাপল্যাণ্ডের এই পরিবর্তনে তারা আরও চমকিত। গত বছরও অর্থের বিনিময়ে জিনিসপত্র কিনেছে পালদেমরা। পরিকল্পনা কাজে লাগাতে বেশ কিছু আবশ্যকীয় জিনিস পালদেমের মারফত জানিয়ে খচ্চরওয়ালাদের দিয়ে আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এই তথ্যটি পাওয়া গিয়েছে, চ্যাওথাপু, ফালুট, সান্দাকফু ছাড়িয়ে মানোভজন পর্যন্ত খবর ছড়িয়েছে—কয়েকজন ডাকাত এই গ্রামে দেদার টাকা ছড়িয়ে লুকিয়ে রয়েছে। গতবার পুলিশের সঙ্গে এখানকার লোকজন যুদ্ধ করেছে বলে একটা শঙ্কা চালু হয়েছে যে পুলিশ তার বদলা নেবে।

মজার ব্যাপার, খবরটা পালদেমদের আদৌ বিচলিত করেনি। বরং তারা খচ্চরওয়ালাদের সঙ্গে রসিকতা করেছিল, ‘পুলিসদের বলে দিও এবার যখন আসবে তখন জানিয়ে আসে, চোরের মত আসাটা ভাল কথা নয়।’

ব্যাপারটা আনন্দের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। ইদানীং তাপল্যাণ্ডের মানুষজন এত বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে যে তাদের সম্পর্কে কোন আড়াল রাখতে চাইছে না। গত গ্রীষ্মেও ওরা তিনজন খচ্চরওয়ালাদের সামনে বের হয়নি। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে গ্রামবাসীরাও খচ্চরওয়ালাদের গ্রামটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। এখন যৌথগৃহের সংখ্যা বেড়েছে। যারা অসুস্থ তাদের জন্যে আলাদা ঘর তৈরি হয়েছে। যখন বরফ নেই, বাড়ি বৃষ্টির আশঙ্কা কম তখন যে যার নিজের ঘরে চলে যায়। সেই ঘরগুলোর চেহারাও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু খচ্চরওয়ালারা লুণ্ঠদৃষ্টিতে এদের খামার এবং মুরগীর খাঁচাগুলো দেখেছে। সেই মুহূর্তে বাধা দেওয়ার প্রস্তাবও না কিন্তু এই খবর যে পাহাড়ে পাহাড়ে বিস্তৃত হবে এ বিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল।

শরীর এবং সামর্থ্যানুযায়ী কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কাজের জন্যে নির্দিষ্ট মানুষ দায়ী থাকবে। তার কাজ ভাল হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যাপারটা তাপল্যাণ্ডের মানুষের কাছে নতুন। ফলে প্রত্যেকেই সচেষ্ট নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে। চামের মাটিতে যারা আটমাস কাজ করেছে তারা জঙ্গল থেকে কাঠ আনা ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না। বাকী সময়টা তাদের পুরো বিশ্রাম। মুরগী এবং গরুর প্রতিপালনের জন্যে দুটো দল নির্দিষ্ট হয়েছে। গ্রামের সমস্ত বাড়ি ঘর রক্ষণাবেক্ষণের এবং নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটা দলকে। গ্রামের বৃদ্ধাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অসুস্থদের দেখাশোনা করার জন্যে। নিজেকে প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের পর মানুষগুলোর উদ্যম বেড়ে যাচ্ছে। মৌখ রান্না এখনও হচ্ছে না। বরফের সময় অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া তিন চারটি পরিবার একত্রিত হয়ে খাবারের ব্যবস্থা করেছে। মেয়েদের ব্যাপারে সমস্ত কর্তৃত্ব জম্মিতার। বিনা ওষুধে

ফাস্ট এইড দেওয়া বা অসুস্থকে প্রাথমিক আরাম দেওয়ার প্রক্রিয়াগুলো সে মেয়েদের রপ্ত করতে পেরেছে। জঙ্গল থেকে বেত কেটে এনে জলে ভিজিয়ে নরম করে এখনকার মেয়েরা নিজস্ব কায়দায় যে ঝুড়ি বানাতে পারত জম্বিতা ভেবে ভেবে তার কিছুটা উন্নতি করতে পেরেছে। এক ধরনের বেঁটে মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে সমান করে তাই দিয়ে টেবিল তৈরী করার একটা কায়দা বের করতে পেরেছে সে। তাপল্যাণ্ডের মানুষ এই প্রথম টেবিল ব্যবহার করতে শিখল। বেতের জিনিস এবং এই টেবিল সমতলে পাঠাতে পারলে অর্থ আসবেই বলে তার ধারণা।

তিনটি পরিবার এবং একটি মানুষ এই ব্যাপক কর্মকাণ্ড থেকে নিষ্পূহ হয়ে রয়েছে। কাছনকে নিয়ে এদের দুশ্চিন্তা ছিল। গত গ্রীষ্মের শেষদিকে আরও তিনটি গ্রামের কাছনরা জমায়েত হয়েছিল এই মন্দিরে। দুদিন ধরে তাদের পূজো চলছিল। সুদীপের ধারণা ওটা মজ্জা সত্তা। তৃতীয় দিনে কাছনের আহবানে গ্রামের সব মানুষ জমায়েত হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। সেই সময় কাছনের এক শিষ্য এসে জানিয়েছিল ওই জমায়েতে যেহেতু এরা তিনজন বাইরের মানুষ এবং তাদের ধর্মাঙ্গন নিয়ে সন্দেহ আছে তাই ওরা যেন উপস্থিত না হয়। সুদীপ খুব ক্ষেপে গিয়েছিল কথাটা শোনামাত্র। আনন্দ তাকে বাঁধা দিয়েছিল। কাছনের নির্দেশ তারা জেনেছে কিন্তু কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। অতএব এখনই মাথা গরম করে এগিয়ে গেলে বোকামী হবে। শিষ্যটি আরও জানিয়েছিল, যদি তারা কাছনের কাছে গিয়ে দীক্ষিত হয় তাহলে ওই সভায় উপস্থিত থাকতে পারে। সুদীপ বলেছিল, 'এ শালা শ্রু ড পলিটিশিয়ান। এককাল চুপচাপ থেকেছে এখন একটা ধান্দা বের করে আমাদের টুপি পরাতে চায়।' জম্বিতা বলেছিল, 'গেলে কেমন হয়?'

সুদীপ মাথা নেড়েছিল, 'ইম্পসিবল! ধর্মেটর্মে আমার কোন বিশ্বাস নেই। জন্মেছি হিন্দুর ছেলে হয়ে, শালা আজ পর্যন্ত কোন্ ধর্মটা করলাম? এসব বুজরুকিতে আমি নেই।'

আনন্দ বলেছিল, 'কথাটা সত্যি কিন্তু মিথ্যেও। আমরা মন্দিরে যাই না, পূজোপার্বণে ফুর্তি করি, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুশকিল হল কেউ মারা গেলে শ্মশানে নিয়ে মুখাঙ্গি করি। ওখানে কেন যে হিন্দু হয়ে যাই!'

সুদীপ চকিতে মুখ ফিরিয়েছিল, 'তোমার এও মনে আছে নিশ্চয়ই আমি মায়ের শ্রাদ্ধ করিনি, মাথার চুল কামাইনি। আমি বিশ্বাস করি না। মুখাঙ্গি করেছিলাম কারণ মৃতদেহ চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা যায় না। দাহ করাটাই সবচেয়ে বেশী সায়েন্টিফিক।'

'দাহ করা আর মুখাঙ্গি করা এক নয়। থাক সে কথা। এটা ঠিক আমরা এখনকার ছেলে মেয়েরা আর বিশেষ কোন ধর্ম-বোধে বিশ্বাসী নই। অন্তত হিন্দুরা তো নয়ই। একটি ক্রিস্টান কিংবা মুসলমান ছেলেকে যে নিয়মের খাতে

শৈশব থেকে এগিয়ে যেতে হয় তা আমাদের জন্যে করা হয়নি। বোধহয় সেই কারণে রাজনীতি আমাদের সহজেই অধিকার করে।' আনন্দ বলেছিল।

জয়িতা বলেছিল, 'আমি কিন্তু এক্ষেত্রে এসব বলছি না। আমি এই গ্রামের মানুষের আস্থা, পুরোপুরি পেতে চাই। এখনও পর্যন্ত আমরা বিদেশী, এটা আমার ভালো লাগে না। ধর্ম ব্যাপারে তোদের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু এখানে আমি একটা সমঝোতা চাই।'

'কিসের সমঝোতা?' সুদীপ চোখ ছোট করেছিল।

'আমি কাহনের কাছে দীক্ষা নিচ্ছি। চমকে যাস না। ধরে নে এটা একটা ছলনা। জন্মইষ্টক যে উত্তরাধিকার সূত্রে আরোপিত ধর্মটাকেই জানল না তার কোন আগ্রহ নেই নতুন নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবার। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাদের একথাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নাথিং ইজ আনফেয়ার।' আস্তানার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল জয়িতা। তারপর প্যান্ট পাল্টে তাপল্যাণ্ডের মেয়েদের পোষাক পরে বেরিয়ে এসেছিল। এই পোষাকটা সে ইদানীং প্রায়ই সখ করে পরে। দীর্ঘকাল চুলে হাত না পড়ায়, শহরে বাতাস শরীরে না লাগায় তার চেহারায় ওই পোষাক পরলে একটা পাহাড়ি আদল এসে যায়। শিষ্যটির সঙ্গে যখন চলে গেল তখন সুদীপ আর একটা সত্য আবিষ্কার করল। সে ধর্মান্ধ নয়। কোন গোঁড়ামি নেই তার। নিজেকে হিন্দু বলে কোন গর্ব করার কারণও খুঁজে পায় না কিন্তু জয়িতার এই ধর্মবদল করতে যাওয়াটা তার খারাপ লাগছে। কেন? ব্যাপারটা ধরা পড়তেই নিজেকে গালাগাল দিয়ে সে বলে উঠেছিল, 'মানুষের আচরণ অনেক সমঝ এত ক্রেজি হয়ে যায়!'

আনন্দ কথাটা শুনে মুখ ফিরিয়েছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

এক বরফের আগে ওরা এখানে এসেছিল। তারপর টানা একটা গ্রীষ্ম এবং দ্বিতীয় বরফের সময় শেষ হল। এইরকম ধর্মসভার আয়োজন কখনও করেনি কাহন। অন্য গ্রামের কাহনদেরও দেখা যায়নি। আনন্দদেরও প্রয়োজন পড়েনি ওদের প্রার্থনা বা সভায় যাওয়ার। জয়িতা সাহস দেখাল। কিন্তু তবু আনন্দের মনে অস্বস্তি থেকে গিয়েছিল।

আর কেউ নয় শুধু জয়িতা কাহনের কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে দেখে কাহন তো বটেই গ্রামসমুদ্র সবাই অবাক হয়েছিল। এবং সেইসঙ্গে খুশী। সাওদের তো ওকে দেখামাত্র ছুটে এসেছিল, 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' গ্রামের অন্য যুবতীরা ওকে ঘিরে হইচই করে উঠেছিল। সে যখন কাহনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন কাহন বলেছিলেন, 'তুমি কি আমাদের মানুষ হতে এসেছ?'

জয়িতা হেসে বলেছিল, 'আমি, আমরা আপনাদেরই মানুষ। এতদিন একসঙ্গে আছি এবং আমাদের ব্যবহারে নিশ্চয়ই সেটা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আপনি যখন চাইছেন তখনই আমি দীক্ষা নিতে পারি।'

কাহন বললেন, 'রক্ত ধর্ম এবং মাটি এক না হলে মানুষ অনাচারী থাকে। তোমার সঙ্গীরা কি তোমার সঙ্গে একমত নয়?' মুখে জবাব না দিয়ে জয়িতা মাথা নেড়ে না বলেছিল।

কাহন তাঁর দুই সঙ্গীর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আগে কখনও দীক্ষা নিয়েছ?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমাদের ওসব কিছু করতে হয় না। আমি সেই অর্থে খ্রিস্টান, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু নই। অতএব আপনি স্বচ্ছন্দে দীক্ষিত করতে পারেন।'

'সেকি? তুমি কখনও ধর্মাচরণ করনি?' কাহন যেন খুব অবাক হলেন। জয়িতা মাথা নাড়তে আবার প্রশ্ন ছিটকে এল, 'জন্মবার পর তোমাদের কাহন তোমার কানে ঈশ্বরমন্ত্র শুনিয়ে যাননি?'

'না।'

কাহনের মুখে এবার হাসি ফুটল। কিন্তু অন্য দুইজন তাকে কিছু বলতে তিনি মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'তোমার আগ্রহ আমাদের খুশী করেছে। কিন্তু দীক্ষা নেবার মত উপযুক্ত হয়েছ কি না তা আমাদের জানা দরকার। তাছাড়া তোমার শরীর এবং আত্মা এখনও ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। আগামী গ্রীষ্ম পর্যন্ত তুমি প্রত্যহ একটি করে ফুল আমার কাছে দিয়ে যাবে। আমি তোমার নাম করে ভগবানের কাছে নিবেদন করব।'

চেষ্টা করে নিজেকে সংবরণ করল জয়িতা। সুদীপ এখানে থাকলে কেসটা জমতো। কিন্তু তার এই বিনীত ভঙ্গী দেখে কাহন লোকটার চেহারা যেন পাল্টে যাচ্ছে। ক্ষমতা মানুষকে চিরকালই অন্য চেহারা দেয়। সে সম্মতি জানাতে সমস্ত গ্রামবাসী একটা খুশীর ধ্বনি উচ্চারণ করল। কাহন হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে আদেশ দিলেন এই অবস্থায় জয়িতা এখানে থাকতে পারে। তবে তাকে আজ থেকে সবাই দ্রিমিত বলে ডাকতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র দ্রিমিত দ্রিমিত উচ্চারিত হল। মজা লাগছিল জয়িতার। অ্যাপ্রেন্টিস থাকাকালীন নামকরণ হয়ে গেল। কিন্তু সে লক্ষ্য করল চেনা মুখগুলোয় কেমন একটা নরম ছাপ এসেছে। ওরা যখন তাকে দেখছে তখন সেই দূরত্বটা যেন নেই।

পর্ব চুকলে কাহন কিছুক্ষণ তাঁর নিজস্ব ডামায় মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। শিষ্যরা বাজনা বাজাল। গ্রামের স্বাক্ষরী সাতটাগে প্রণাম করল। বেশ একটা ধর্মধর্ম ভাব ফুটে উঠল। জয়িতার মনে হল হিন্দু-বৌদ্ধ পদ্ধতির একটা শঙ্কর রূপ এই উপাসনা।

এসব চুকে যাওয়ার পর কাহন কথা শুরু করলেন, 'ভগবান আমাদের পাতিয়েছেন এই মাটিতে। তিনি আমাদের জন্যে মাটি দিয়েছেন, গাছ দিয়েছেন। আমাদের সহায়িত্তি বাড়ানোর জন্যে যেমন বরফ এবং বৃষ্টি দিয়েছেন তেমন রোদও তাঁর সৃষ্টি। যুগ যুগান্তর থেকে আমরা এইভাবে আছি তাঁর আশীর্বাদ

নিম্নে। ওই যে পাহাড় যার মাথায় প্রতিদিন ঈশ্বরের পায়ের চিহ্ন পড়ে সে আমাদের আড়াল করে থাকে কারণ ওই পাহাড়ের ওপরে রয়েছে অনন্ত বরফ এবং ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু আমরাই হলাম ভগবানের প্রথম সন্তান।' এই কথাটা বলা মাত্র পিছনে বসে থাকা দুজন অন্য গ্রামের কাহন কিছু বললেন চাপা গলায়। সেদিকে একবার তাকিয়ে তাপল্যাণ্ডের কাহন তড়িঘড়ি বললেন, এই আমরা কারা? আমরা বলতে আমি পাহাড়ের সমস্ত মানুষকেই বোঝাচ্ছি যারা বরফে কষ্ট পায়, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে যারা বেঁচে থাকে।' বলে আবার অন্য কাহনদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন দুবার।

'আমাদের উচিত আমাদের মত বেঁচে থাকা। ইয়াক যদি মুরগীর মত বাঁচতে চায় তাহলে কি সেটা তাকে মানায়? মানায় না। অনেকদিন হল আমাদের গ্রামে চারজন বিদেশী এসেছিল। এরা, তোমরা একটু আগেই শুনলে ভগবানের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এই মানুষেরা নিজেদের স্বার্থে তোমাদের সাহায্য করছে। কিন্তু এদের সাহায্য আমরা কদিন নেব? এরা কেউ ভগবানের সন্তান নয়। আমাদের ধর্ম, আমাদের রক্ত, আমাদের মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।' এই অবধি বলে কাহন চুপ করলেন। জয়িতা চমকে উঠেছিল। এতদিন চুপচাপ থেকে আজ এমন কি কারণ ঘটল যাতে কাহন প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতায় নামলেন? কিন্তু গ্রামবাসীরা চুপচাপ কেন? পানদেম, লা-ছিরিঙ, সাওদের। ঠিক এই সময় একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'দ্রিমিত!' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা চিৎকার করল, 'দ্রিমিত, দ্রিমিত, দ্রিমিত!'

'হ্যাঁ দ্রিমিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে দ্রিমিত এখনও পরীক্ষিত হয়নি। এই অবস্থায় আমার বন্ধুরা, এই দুই কাহন আমার কাছে এসেছে। আমাদের গ্রামে যেসব কাণ্ড হচ্ছে তার খবর ওঁদের গ্রামেও পৌঁছেছে। এই যে আমরা সাময়িক খেতে পাচ্ছি, বরফে গতবার কম কষ্ট পেয়েছি তা ওঁদের গ্রামের সরল মানুষের প্রলুব্ধ করছে। কিন্তু আমরা জানি হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। আর খিদের তাগিদে কিংবা নতুন একটা ঝোঁকে তাপল্যাণ্ডের মানুষেরা একসঙ্গে বিদেশীদের নির্দেশে কাজ করছে। কিন্তু আগামী কালই যে একটা পরিবারের মনে হবে না ও আমার চেয়ে বেশী পাচ্ছে, যার জমি নেই সে আমার জমি থেকে পেট ভরাচ্ছে তা কে বলতে পারে? আর তখন নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। আর তাছাড়া এই বিদেশীরা বেশীদিন আমাদের মধ্যে থাকবে না, তখন কি হবে? আমরা জানি একজন বিদেশী এর মধ্যেই মারা গিয়েছে পুলিশের গুলিতে। পুলিশ একবার এখানে এসেছিল এদের খোঁজে। আমার কাহনবন্ধুরা বলছেন পাহাড়ে পাহাড়ে বিচিন্নসব মানুষ আসাযাওয়া করছে এদের খবর নেবার জন্যে। সেবার পাশের গ্রামের মানুষ পুলিশকে নাজেহাল করে অন্যান্য করেছে। তখন ওরা তৈরী হয়ে আসেনি। কিন্তু আবার

যদি পুলিশ এই গ্রামে আসে তাহলে বিদেশীদের নিস্তার নেই। শুধু তাই নয় তারা তোমাদেরও ছেড়ে দেবে না।’

জয়িতা আর পারল না। সে এক পা এগিয়ে যেতেই কাছন তাকালেন। জয়িতা গ্রামবাসীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করল, ‘কাছন যা বলছেন সেটা তাঁর বিশ্বাসে সত্যি। কিন্তু একটা কথা জেনো, পুলিশ এখানে এলে আমরা এমন কিছু করব না যাতে তোমাদের ক্ষতি হবে। ধর্ম, রক্ত এবং মাটির কথা উনি বলছেন। কিন্তু ভালবাসার কথা তো উনি বলেননি। আমাদের যে বন্ধু পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে সে তো দিব্যি বেঁচে থাকত আমাদের মত যদি তোমাদের ভালবেসে দাঁজলিং থেকে ওষুধ না আনতে যেত। আমাকে এই গ্রামের প্রতিটি মা বোন বন্ধু বলেছে যে আমরা আসার আগে তারা ভাবতে পারত না এই ভাবে বাঁচতে পারা যায়। যে পরিশ্রম এবং কষ্ট তোমরা করেছ তাঁর মূল্য সবে পেতে শুরু করেছ। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যার লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে কয়েকটা পরিবার আনন্দ করে থাকে। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করি যে কাছন তাদের দলে পড়ে না। তাঁর বন্ধুরা বিচলিত হয়ে ছুটে এসে অনুরোধ করায় তিনি এইসব কথা বলছেন। আমরা এতদিন এখানে রয়েছে কিন্তু কখনও কাছনকে অসম্মান করিনি। আমরা এও বলিনি তাঁর ইয়াকের দুধ সবাইকে দিতে হবে। কারণ তিনি শুধু তোমাদের ধর্ম এবং ঈশ্বর নিয়েই এতকাল ছিলেন। মনে হয় অন্য দুজন কাছনের অন্য ক্ষমতা আছে। গ্রামের লোকেরা যদি তাদের বিরুদ্ধে যায় সেই ভয়ে ওঁরা ছুটে এসেছেন। তাপল্যাণ্ডের সহায়সম্মল হীন মানুষ যেমন সুস্থভাবে বাঁচবে ঠিক তেমনি সমস্ত পাহাড়ি গ্রাম, সমতলের নিঃস্বামানুষের সেই একই ভাবে বাঁচবার অধিকার আছে। বিরোধিতা করে নয়, কাছনেরা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে তাঁরাই উপকৃত হবেন। আর হ্যাঁ, আমরা আপনাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। আপনাদের গ্রামের সামাজিক আইনের মর্যাদা আমরা সবসময় মেনে চলেছি। চলব। এবং বাধ্য না হলে কেউ এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব না। কখনও না। আমরা একই সঙ্গে থাকব। একজন বাইরের লোক চিরকালই বিদেশী থাকতে পারে না।’

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার আরম্ভ হল। চিৎকার উল্লাসের। সেই সঙ্গে দ্রিমিত দ্রিমিত ডাক। উল্লসিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাপল্যাণ্ডের কাছন বসে পড়তে অন্য গ্রামের কাছন দুজন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের অত্যন্ত অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ দেখাশুদ্ধ। উত্তেজিত ভঙ্গীতে তাঁরা কিছু কথা তাপল্যাণ্ডের কাছনকে বলে সদলবলে চলে গেলেন দুভাগ হওয়া জনতার মধ্যে দিয়ে। জয়িতা দেখল এর কোন প্রতিক্রিয়া হল না সাধারণ মানুষের মধ্যে। শুধু যে তিনটে পরিবার জনতা থেকে আলাদা হয়ে কাছনের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল তারা ভীত হল। এবং উল্লাসের সুযোগে কখন যে তারা জনতার সঙ্গে মিশে গেল তা বোঝা গেল না। এই সময় সাওদের ছুটে এল জয়িতার সামনে। তার

হাতে সদ্য ছেড়া একটা ফুল। হাসি হাসি মুখে সেটি এগিয়ে ধরল সে, 'দ্বিমিত, নাও।'

ফুলটা নিয়েছিল জয়িতা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল কাহনের সামনে। সসঙ্গমে বলেছিল, 'আমার হয়ে ভগবানকে দিয়ে দেবেন কাহন।' বিশ্বস্ত মানুষটার মুখে প্রচণ্ড বিস্ময়। যেন তাঁর হিসাব মিলছিল না। তিনি কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

দুবাব বরফ গলে গেল। একটি পুরো গ্রীষ্ম যেমন এই গ্রামের অনেক পরিবর্তন এনেছে তেমনি সম্পর্কেরও। আন্তানার আয়তন বেড়েছে। একটির বদলে তিনটি ঘর তৈরী হয়েছে। কথা ছিল খাওয়াদাওয়া একসঙ্গে হবে এবং ওরা তিনজন তিনটি ঘরে থাকবে। মেয়েটির স্বভাবতই জয়িতার সঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু প্রথম রাত্রেই সে বিদ্রোহ করে বসল। সুদীপকে ছেড়ে সে কিছুতেই থাকবে না। আনন্দ এবং জয়িতার কাছে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু তৈরীকলেও তার ওসব কিছুই মনে হচ্ছে না। সে মুখের ওপর পালদেম, লা-ছিরিও এবং সাওদেরকে বলল, 'আমাকে কেউ কখনও ভালবাসেনি। আমি কাউকে ভালবাসিনি। কিন্তু এই মানুষটাকে আমি যখন ভালবেসে মুখে কথা ফিরিয়ে দিয়েছি তখন কেন ওকে ছেড়ে থাকব? ও আমার মনের মত মানুষ, ওর সঙ্গে না থাকতে দিলে আমি মরে যাব। ব্যাস।'

জয়িতার মনে হয়েছিল পাঁচ বছরের মেয়ে চকোলেট আবদারে গলায় কথা বলছে এবং এর উত্তর হল তাঁস করে নরম গালে চর কসানো। কিন্তু পালদেম অন্য কথা বলল। সে জিজ্ঞাসা করল সুদীপকে, 'এই মেয়েটার কপাল সত্যি খারাপ। ও তোমার সঙ্গে থাকতে চাইছে, তুমি কি করবে?'

সুদীপ কাঁধ নাচিয়েছিল। তারপর বাংলায় বলেছিল, 'আমি শালগ্রাম শিলা, শোওয়াবসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাসলীলা। বহু ধুর হয়ে গেছি এখন।'

জয়িতা অবাধ হয়ে গিয়েছিল। সুদীপের মত শাগিত ছেলে এসব কি বলছে। কিন্তু তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওরা একসঙ্গে থাকবে, এতে তোমাদের আপত্তি নেই?'

পালদেম বলেছিল, 'এখন তোমরা আমাদের বন্ধু। ও তো তোমাদের তিনজনের সঙ্গে এখানে এতকাল ছিলই। তবে যদি ও মা হয় তাহলে সর্বনাস হয়ে যাবে।'

'সর্বনাশ হবে কেন?' জয়িতা প্রশ্নটা করেছিল, 'ওরা বিয়ে করবে তখন।'

'আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের কোন মেয়ের বাইরের লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়নি।' পালদেমের কথাটা শুনে সুদীপ বলেছিল, 'স্টেট টুগেদার, নো বিয়ে, নো বাচ্চা। গুড। কিন্তু ব্রাদার, এতদিনেও যদি আমরা বিদেশী তাহলে আর জবাব নেই।' কথাগুলোকে বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে বলায় পালদেমরা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সুদীপের কথায় যে ঝাঁঝ ছিল তা টের পাওয়া গেল। এবং সেই থেকে মেয়েটি

সুদীপের ঘরে। জয়িতা লক্ষ্য করছিল মেয়েটি মোটা হচ্ছে। মুখচোখে একটা লালিত্য ফুটেছে। এত পরিশ্রম করে এত কম খেয়েও এইরকম উন্নতি হয় কি করে সে জানে না। এবং আলাদা করে ভাবার প্রবণতা এসেছে। অথচ সুদীপের কোন বিকার নেই। সে যেমন ছিল তেমনি আছে। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন কেউ জানে না, ওরা কোন কথা তোলে না আর।

ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না সুদীপের। এখনও ঘরে অন্ধকার পাতলা হয়ে খুলে রয়েছে। একটা বাসী গন্ধ পাক খাচ্ছে। একটু আগে মেয়েটাকে উঠে যেতে দেখেছে সে। সে যে দেখেছে তা অবশ্য বুঝতে দেয়নি। বুঝলেই কথা বলত মেয়েটা। বড্ড কথা বলে। ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন সে জোর করে সুদীপের সঙ্গে থাকছে তাহলে যে উত্তর দেবে তাতে অনায়াসে একটা রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। ও এত বিশ্বস্ত এবং সবসময় এমন আঁঠার মত লেগে থাকে যে মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে, বলেওছে কিন্তু কমলী ছাড়বার পাত্র নয়।

আরও খানিকটা সময় আলসেমির পর সুদীপ উঠল। এখন এখানে মোটামুটি একটা বাথরুম-টয়লেটের ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। বাইরের ঘোলাটে আকাশ দেখে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সারাটা দিন আজ সন্ধে সন্ধে হয়ে থাকবে। সুদীপের প্রায়ই মনে হয় একটা জেনারেটর আনলে কেমন হয়? শিলিগুড়ি থেকে বস্তুটা কিনে যদি কোনমতে এখানে আনা যেত তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু জেনারেটরের রসদ এখানে নিয়মিত পাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। কথাটা শুনলে জয়িতা ঠাট্টা করত। জয়িতার কথা মনে হতেই ও অন্যমনস্ক হল। আজকাল জয়িতা আর মোটেই প্যান্ট পরে না। বস্তুত ওদের জামাপ্যান্টগুলো দুর্দশার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। নতুন সার্ট প্যান্ট অবিলম্বে কেনা দরকার। জয়িতা এখনকার পোশাকে লা-ছিরিও আর সাওদেরদের সঙ্গেই বেশীক্ষণ সময় কাটায়। আগের মত আর সুদীপের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারে না। সুদীপ বুঝতে পারে না সে তাকে ঘৃণা করে কিনা। মেয়েটির সঙ্গে একত্রে থাকা যদি অপছন্দের ছিল তাহলে স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারত।

পরিস্কার হয়ে বাইরে পা বাড়াল ও। খানিকটা হাঁটতেই আনন্দকে দেখতে পেল। পাশে জয়িতা। সামনে অন্তত জনাদশেক ছেলেমেয়ে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে পালদেম। সুদীপের খিদে পাচ্ছিল। এখন এখানে তিনবার খাবার হয়। চা সিগারেট বা জলখাবারের অভ্যেস অনেক দিন দূর হয়ে গেছে। প্রথম দুটো ছাড়া জীবন কাটানোর কথা এক সময় কল্পনা করা যেত না অথচ স্বচ্ছন্দে সেটা মেনে নিচ্ছে সে। একেই হয়তো বলে অভ্যেসের দাসত্ব করা।

আনন্দ সুদীপকে দেখে হাসল, 'আমরা রেডি।' সুদীপ দেখল গোটা সাতেক এলাচের বোঝা তৈরী হয়েছে। মুরগী অন্তত

পঞ্চাশটা। বেতের ঝাঁকায় ডিম। এই বোঝা নিয়ে মানুষজন তৈরী। ওরা যাবে সুকিয়াপোকরি বাজারে। চ্যাঙথাপু কিংবা ওয়ালাংচুঙে এলাচ বিক্রী হবে না। সেটা ফালুটে সান্দ্রকফুতেও বিকাবে না। সুকিয়াপোকরির বাজার বেশ বড়। নানা জায়গার ব্যাপারীরা আসে সেখানে। সওদা নিয়ে যেতে হবে সেখানে। প্রতি সপ্তাহে এলাচ কেনার মত পাইকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মুরগী, ডিম কেনার লোকের অভাব কখনও হবে না। পালদেমকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে আনন্দ। গ্রামের প্রতিটি মানুষ উত্তেজিত। এই প্রথম তাপল্যাঙ থেকে কোন জিনিস বাইরে বিক্রির জন্যে যাচ্ছে। এই সব বিক্রি হলে যে টাকা আসবে তা ভেবে সবাই রোমাঞ্চিত।

হঠাৎ সুদীপ ঘোষণা করল, 'আমি পালদেমের সঙ্গে যাব।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ইম্পসিবল! তুই চ্যাঙথাপুতে পৌঁছানোমাত্র খবর চাউর হয়ে যাবে। পুলিশ তোকে ধরলে এদের ছেড়ে দেবে না। ব্যস, সারা জীবনের মত পরিকল্পনা ডকে উঠবে।'

সুদীপ স্পষ্টত বিরক্ত হল, 'দূর! এইভাবে এখানে বন্দী হয়ে থাকা যায়? পাইকাররা এদের ঠকাবে। এরা সত্য মানুষের হালচাল কিছুই জানেনা। সবাই লুটে পুটে নেবে।'

'প্রথমবার নিতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা মানুষকে অভিজ্ঞ করে। এর পরের বার ওরা যখন যাবে তখন আর ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না।' আনন্দ ঠাণ্ডা গলায় বলল।

এতক্ষণ পালদেম চুপচাপ গুনছিল। এবার সে সুদীপকে বলল, 'তুমি সঙ্গে যেতে চাইছ কেন?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'আর বলে লাভ কি হবে। যাও ঠকে এসো। ঠকে শেখো।'

পালদেম হাসল, 'ঠকলে ক্ষতি নেই যদি তা থেকে কিছু শেখা যায়। মুশকিল হল এই এলাচের দাম কত তা তো আমরা জানি না, তোমরাও না, ওরা যা বলবে তাই মানতে হবে।'

সুদীপ হকচকিয়ে গেল। জয়িতা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। পালদেমের কথাটা মিথ্যে নয়। সে সত্যি জানে না এলাচ কি দরে বিক্রি হয়। এমন কি ডিম অথবা মুরগীর বিরুদ্ধ মূল্য তার জানা নেই। কিন্তু সে এগুলো যে শহরে কায়দায় জেনে নিতে পারে তা পালদেম পারবে না। কিন্তু কথাটা বলল না সে। কারণ তাহলে বলতে হয়, পালদেম, তোমাদের চেয়ে আমরা শহরের মানুষেরা অনেক ধূর্ত।

মানপত্র মাথায় চাপানো হল। বাঁশের দুপ্রান্তে ঝুলিয়ে নেওয়া হল। এই সপ্তাহে বিক্রির টাকায় কোন জিনিস কিনবে না এরা। যেতে আসতে অন্তত দিন পাঁচেক সময় ব্যয় হবে। এবং পরের সপ্তাহের জন্যে খন্দের তৈরী

করে আসবে এরা। তখন ফেরার সময় গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কেনা হবে। পুলিশ কিংবা সাধারণ মানুষ যদি তাদের কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবে অনেক আগেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হলেও হতে পারে কারণ খচ্চরওয়ালারা পর্যন্ত ওদের দেখতে পায়নি। সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল পালদেমকে সিগারেট এবং চা পাতার জন্যে টাকা দিতে। কিন্তু কিছু কেনা এ যাত্রায় হবে না, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে চাইল না সে। তাছাড়া ওরা চা পাতা এবং সিগারেট কিনতে দোকানে গেলে সন্দেহ বাড়াবেই।

সম্মিলিত আনন্দধর্মির মধ্যে পালদেমরা যাত্রা শুরু করল। গ্রামের বাইরে দীর্ঘপথ পাড়ি দিচ্ছে এরা। এই গ্রামের ইতিহাসে কখনও হয়নি। তাপল্যাঙের মানুষেরা এখনও শঙ্কা এবং খুশীতে দুলাচ্ছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিছিল। গ্রামের শেষ প্রান্তে এই সময় কয়েকটি মানুষকে দেখা গেল। এরা একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলা শুরু করল। রোলেন এবং তার গ্রামের চারজন এই যাত্রা দেখতে এসেছে। জয়িতা এগিয়ে গেল রোলেনদের কাছে।

সুদীপ এবং আনন্দ দুটো দৃশ্য দেখছিল। পালদেমরা যাচ্ছে এবং জয়িতা রোলেনদের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হেসে হেসে কথা বলছে। সুদীপের অস্বস্তি হচ্ছিল। সেই সময় শেষ বারের মত হাত তুলে পালদেমরা পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

তাপল্যাঙের সমস্ত মানুষকে স্বনির্ভর করতে প্রথম দলটি বাগিজ্যে বের হল।

॥ ৪৯ ॥

পাঁচ দিন নয়, ওরা ফিরে এল দিন আটেক বাদে। এল উত্তেজিত হয়ে। দলের বেশীর ভাগের উত্তেজনার কারণ নতুন নতুন জনপদ দর্শন। ফালুটে পর্যন্ত ঠিক ছিল, তারপর মত ওরা নেমেছে তত বিস্মিত হয়েছে। সান্দাকফু বাংলা বাড়ি কালিয়াপোকরির বসতি দেখার পর সুকিয়াপোকরিতে গিয়ে তো একদম দিশেহারা। ডিমগুলো বিকেভঞ্জে পৌঁছানোর আগেই বিক্রী হয়ে গিয়েছিল।

একটা বিরাট দল পাহাড় দেখার জন্যে উঠছিল। তারাই কিনে নিয়েছে। সান্দাকফুতে মুরগীগুলো কিনেছিল কয়েকটা সাদা চামড়ার লোক। বুদ্ধি করে পালদেম চ্যাওথাপু থেকে ওদের সম্ভাব্য দাম জেনে গিয়েছিল। বিদেশীদের কাছে তাই যেন অত্যন্ত সম্ভা মনে হয়েছিল। সুকিয়াপোকরিতে এলাচ বিক্রী করতে অবশ্য ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। সেই জন্যে তিন দিন দেরী হয়ে গেল। পরে জেনেছে এবারে ওরা জলের দরে এলাচ বিক্রী করেছে। কিন্তু পাইকার ঠিক করে এসেছে ওরা। সুকিয়াপোকরি পর্যন্ত যেতে হবে না, কারিয়াপোকরি পর্যন্ত নামিয়ে দিলেই চলবে। ওখান থেকেই পাইকার চার

চাকার গাড়ি করে নিচে নিলে যাবে। গ্রাম ছাড়ার আগে পালদেম ভাল করে টাকা চিনে গিয়েছিল। সে কুড়ি করে করে গুনে যা ঘোষণা করল তার যোগফল চারশো আশি টাকা।

সুদীপ মন্তব্য করল, 'যে যেমন পেরেছে এদের টুপি পরিয়েছে।'

আনন্দ হাত তুলে ওকে কথা বলতে নিষেধ করতেই সুদীপ ক্ষেপে গেল। সে বলল, 'দ্যাখ আনন্দ, দিনকে দিন তোর ধরণ-ধারণ খোমেনির মত হয়ে যাচ্ছে। আমরা বন্ধু, তুই আমার ধর্মযাজক নস। আমি এতদিন কিছু বলিনি কিন্তু!'

'আমি ধর্মযাজক? আমাকে দেখে তাই মনে হয়?' আনন্দ বিস্মিত হল।

'এমন মুখ করে থাকিস যেন পৃথিবীর সব সমস্যা বুঝে গেছিস। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়ে গিয়েছে। ওয়াইন আর উওম্যান তো দূরের কথা, জাস্ট একটা খিস্তি উচ্চারণ করা মহা পাপ। তুই ছাড়া এখানে যেন কোন প্রাণ জাগতো না! এরা তোকে আর জয়িতাকে অনেক আপন ভাবে কেন তা জানি না। তোর ভান এরা না বুঝতে পারলেও আমি বোকা নই।' সুদীপ হঠাৎ উত্তেজিত হল।

'ভান? কি ভান করি আমি।'

'পৃথিবীতে তোর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল তাপল্যাণ্ডের মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। আর সেটা ভাবতে গিয়ে তুই অন্য কিছু ভুলে যাস। এমন কি আমাকেও অপমান করিস।'

জয়িতা চুপচাপ গুনছিল, 'আনন্দেরটা বুঝলাম, আমি কি ভান করি সুদীপ?'

সুদীপ জয়িতার দিকে তাকাল না, 'তুই শালা ছুপা রুস্তম! এদের মাঝে এমনভাবে মিশে গেছিস যেন তোর বাপ-মা এখানেই জন্মেছিল। তাছাড়া ওই রোজেন লোকটার সঙ্গে এত ভাব কেন তোর - 'দেয়ার ইজ এ ধান্দা বিহাইণ্ড দ্যাট। সেটা কি বুঝতে পারছি না। তোদের মনে রাখা উচিত আমরা চার জন এখানে লুকিয়ে থাকতে এসেছিলাম। এখানে থেকে যাওয়ার কোন পূর্ণ পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। গ্রামটাকে দেখার পর আমরা এদের সাহায্য করার কথা ভেবেছিলাম। এই দু'বছরে আমরা অনেক করেছি। এবার ওদের চরে খেতে দে। কিন্তু তোদের ভাবভঙ্গী দেখে মনেই হচ্ছে না কখনও এদের ছেড়ে যাবি। সেইটেই বিভ্রান্তি।'

আনন্দ বলল, 'সুদীপ, এ নিয়ে আলোচনা আমরা পরে করতে পারি। পালদেমের কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা এখনও শোনো হয়নি। হ্যাঁ, পালদেম বল। তোমাদের জিনিসগুলো বিক্রি করতে কি কি অসুবিধে হয়েছে?'

পালদেম এতক্ষণ সুদীপের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চটজলদি উচ্চারণের বাঙলা মাথায় ঢুকছিল না তার। তবে সে বুঝতে পারছিল এদের মধ্যে ঝগড়া চলছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি খুব ঠকে গেছি? আসলে এত টাকা নিজেরা কখনও রোজগার করিনি তো, এর পরের বার এ রকম হবে না।'

পালদেমের এক সহযোগী হেসে বলল, 'আমরা যে বেতের দুটো ছোট ঝুড়িতে ডিম নিয়ে গিয়েছিলাম তাও বিক্রী হয়ে গিয়েছে। সবাই জিজ্ঞাসা করছিল ও রকম ঝুড়ি আরও আছে কিনা।'

আনন্দ জয়িতার দিকে খুশী মুখে তাকাল। জয়িতা বলল, 'বাঃ, তাহলে তো আমরা প্রতি বছর ভাল ঝুড়ি সাপ্লাই দিতে পারি। আহা এই বেত শিল্পটা যদি ভাল জানা থাকত।'

'কথা শুনে লিভার ড্রাই হয়ে যায়। যেন মোটামুটি জানতিস কলকাতায় থাকাকালে।' সুদীপ মন্তব্য করল। জয়িতার চোয়াল শক্ত হল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তায় তোমাদের আর কোন অসুবিধের সামনে পড়তে হয়নি পালদেম?'

কথা হচ্ছিল যৌথগৃহে বসে। প্রতিটি মানুষ তিকতাক ফিরে এসেছে বলে গ্রামবাসীরা খুশী মুখে ভির করেছিল। পালদেম মাথা নাড়ল। চার পাশে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে। চট করে কেউ আমাদের থাকতে দেয়নি। নানান প্রশ্ন করেছে। তাগল্যাও নামটাই অনেকে শোনেনি। আমরা কেন এতদিন গ্রাম থেকে বের হয়নি, গ্রামটা কি রকম, কি কি পাওয়া যায় এই সব কথা জানতে চেয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে বারবার গেলে ওদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক হলে যাওয়ার পর ওরাও এখানে আসতে চাইবে। তখনই হবে মুশকিল।'

'ভয় হচ্ছে কেন?'

'চ্যাঙাপু কিংবা ওয়ালাংচুঙের মানুষেরা আমাদের মতন। কিন্তু নিচের মানুষদের হালচাল কেমন যেন। সবাই যেন সব সময় মতলব নিয়ে ঘোরাফেরা করে। আমাদের মদ আর মেয়েমানুষের আড্ডায় নিয়ে যেতে চাইছিল খুব। ছোকরারা প্রলোভিত হচ্ছিল কিন্তু আমি খুব সামলে রেখেছিলাম।'

পালদেমের কথা শেষ হওয়ামাত্র একটি নারীকন্ঠে প্রশ্ন করল, 'মেয়েমানুষের আড্ডা? সেটা কি?'

পালদেম বলল, 'সেখানে মেয়েরা মুখে রঙ মেখে পয়সা নিয়ে অচেনা পুরুষের সঙ্গে শোয়।'

সঙ্গে সঙ্গে সশিমলিত প্রতিক্রিয়া ছিটকে উঠল। পয়সা নিয়ে অচেনা পুরুষের সঙ্গে শোওয়ার মত জঘন্য ব্যাপার যে মেয়েরা করতে পারে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু হল। কেউ একজন চিৎকার করল, 'সত্যি বলছ তো, তোমরা তাদের কাছে যাওনি?'

'আমাদের কাছে তো পয়সাই ছিল না। আর এই বিক্রীর টাকা তো খরচ করার জন্যে নয়।'

'যা হবার হয়েছে, এর পর আর সেখানে যেতে হবে না।'

কথাটা যে বলল তাকে চিনতে পারল সুদীপ। পালদেমের বউ। সে হাসল, 'আচ্ছা আগুনে হাত দিলে পুরে ফোঁকা পড়ে তাই বলে কেউ আগুন জ্বালবে

না? কি বল তোমরা?’

সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা নাড়ল, ঠিক ঠিক। এর পরে পালদেম আসল প্রসঙ্গে এল। পথ চলতে চলতে যে গ্রামে ওরা থেমেছে, সে মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তারা যখনই জেনেছে তারা উত্তরের পাহাড় থেকে এসেছে তখনই জানতে চেয়েছে সেই ডাকাতরা এখনও ওখানে আছে নাকি যাদের পুলিশ ধরতে পারলে অনেক টাকা দেবে। সে ডাকাতরা নাকি একটা গ্রামে দু হাতে টাকা বিলিয়ে যাচ্ছে। সেই ডাকাতদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে যাকে ভোগ করতে পারলে যে কোন পুরুষ ভাগ্য মনে করবে। পালদেমরা সমানে জবাব দিয়ে গিয়েছিল, ডাকাতরা এসেছিল কিন্তু অনেক দিন আগে, যখন পুলিশ হামলা করেছিল তখনই আরও উত্তরের বরফের পাহাড়ে ওরা পালিয়ে গিয়েছে। অনেকে কথাটা বিশ্বাস করেছে, বেশীর ভাগ সন্দেহের চোখে তাকিয়েছে। কিন্তু ওরা যে হঠাৎ গ্রাম থেকে জিনিসপত্র বিক্রী করতে বের হন এতে সবাই অবাক হয়েছে। ডাকাতরা থাকলে তাদের টাকা দিয়েই খচ্চরওয়ালাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনত। তারা নেই বলেই ওরা বাইরে পা বাড়িয়েছে। কেউ কেউ রসিকতা করেছে, টাকার স্বাদ বড় মারাত্মক। একবার টের পেলে আর রক্ষে নেই! না হলে যারা কোনকালে গ্রাম ছেড়ে বের হত না তারা জিনিসপত্র বিক্রী করতে আসে। খচ্চরওয়ালাদের সঙ্গে মনেভঞ্জে দেখা হয়েছিল। তারা তো দেখে শুনে অবাক। এই গ্রীষ্মে তাদের দরকার পড়বে না তাপল্যাঙে জেনে খুব রেগে গিয়েছে। ওরাই সমস্ত জিনিসপত্র কিনে নিবে এখানে এসে, কণ্ট করে আসতে হবে না নিচে, এই রকম বলেছিল। কিন্তু তাতে নারাজ হওয়ায় ওরা খুব হতাশ হয়েছে। ফেরার পরে ওয়ালাংচুঙের লোকেরা গল্প শুনেছে তাদের কাছে। তারাও ঠিক করেছে জিনিসপত্র নিয়ে নিচে যাবে বিক্রী করতে। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটা অবশেষে বলল পালদেম। শেষ রাত্রে তাদের সবাইকে ধরে রেখেছিল ফুলিয়াপোকরির পুলিশ। না, মারধোর করেনি। কিন্তু কোথেকে আসছে, কেন আসছে, কে তাদের আসতে বলেছে এইসব প্রশ্ন করেছে। এবং পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে ওরা শেষ পর্যন্ত বলেছে ডাকাতরা ওদের যাওয়ার আগে শিথিয়ে দিয়েছে কিভাবে নতুন করে বাঁচতে হয়। এই যৌথগৃহ, যৌথরানা যৌথ রোজগার এ সবের হৃদিশ পেয়েছে ডাকাতদের কাছ থেকেই। ডাকাতদের ওরা কখনই ভয়ঙ্কর মানুষ মনে করেনি। বরং বেশ বন্ধু বলেই মনে হয়েছে। পুলিশ ওদের অনেক প্রশ্ন করলেও ওরা কেউ বলেনি এই মুহূর্তে তাপল্যাঙে ডাকাতরা রয়েছে। পুলিশ ছেড়ে দেবার আগে বলেছে যদি ওই ডাকাতরা আবার গ্রামে আসে তাহলে যে করেই হোক ধরে ফেলে যেন ওরা। তাহলে ওদেশের সরকার অনেক অনেক টাকা তাদের উপহার দেবে। সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে এই ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাপল্যাঙ অনেক দূরে তাই খবরটা পৌঁছাননি। পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল ডাকাতদের কাছে ভারী ভারী অস্ত্র আমরা দেখেছি কিনা! আমরা বলেছি সেসব কিছুই দেখিনি।

সবাই চুপচাপ শুনেছিল। পালদেম কথা শেষ করা মাত্র সুদীপ বলল, 'আমাদের নিয়ে তোমরা দেখছি দারুণ ব্যামেলায় পড়েছ। কিন্তু এখন তোমরাই ঠিক করে আমরা এই গ্রামে থাকব কিনা! তোমরা চাইলে আমরা এক্ষুনি চলে যেতে পারি।'

পালদেম বলল, 'কিন্তু কোথায় যাবে তোমরা? পাহাড়ের যে-কোন গ্রামে গেলেই লোকে তোমাদের চিনে ফেলবে।'

সুদীপ কাঁধ নাচাল, 'তাহলে সোজা ব্যাপারটা করে ফেল। আমাদের ধরিয়ে দিলে তোমরা প্রচুর টাকা পাবে।'

হঠাৎ সাওদের উঠে দাঁড়াল, 'দ্রিমিত, তোমার বন্ধুকে বলে দাও আমরা বেঈমান নই। বন্ধুর বন্ধুত্ব রাখতে জানি।'

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিল, 'সাবাস। আমি এই চেয়েছিলাম।' বলে উঠে দাঁড়াল, 'নেপালের পুলিশের কথা জানি না কিন্তু ইন্ডিয়ান পুলিশ এত সরল হবে মনে করার কোন কারণ নেই। এখন থেকে পাথর ফেলে যাদের হস্তিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা হাতের মুঠোয় গ্রামের লোকদের পেয়েও ছেড়ে দেবে এটা আমি ভাবতে পারছি না। ইম্পসিবল।'

'কিন্তু ছেড়ে যে দিয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' জয়িতা জবাব দিল।

'পাচ্ছি। আর সেইটাই সন্দেহজনক।' সুদীপ বাংলায় কথা বলছিল।

হঠাৎ আনন্দ চিৎকার করে উঠল, 'সুদীপ! সব কিছুর একটা সীমা আছে। নিজেকে ছোট করিস না।'

'কে কাকে ছোট করে! অঙ্কের হিসেবে গোঁজামিল আছে বলে দিলাম।' সুদীপ আর দাঁড়াল না।

সাওদের গুর যাওয়া দেখল। তারপর বেশ জোরেই বলল, 'ওকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝেই মনে হয় ও ঠিক তোমাদের মত নয়। এখন ও রোগে গেল কেন?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'সবার মন মেজাজ সব সময় এক রকম থাকে না। যাহোক, প্রথম যাত্রায় বেশ ভাল কাজ হয়েছে আমাদের। চারশো আশি টাকা তোমরা রোজগার করেছ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

পালদেম টাকাগুলো আনন্দের দিকে বাড়িয়ে দিল। আনন্দ দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না। এই টাকা আমার কাছে থাকবে না। দু-জন মানুষ নির্বাচন কর। তারা টাকার হিসাব রাখবে।'

পালদেম বলল, 'গ্রামের মানুষ বেশী হিসাব জানে না।'

আনন্দ লা-ছিরিঙকে ডাকল, 'লা-ছিরিঙ, তুমি দ্রিমিতের কাছে হিসেব শিখে নাও। এখন টাকাগুলো এমনভাবে রাখবে যাতে তুমি আর পালদেম দায়ী থাকো। মাটির নিচে পুঁতবে না। যাও, তোমরা এবার বিশ্রাম করো।'

সভা ভেঙ্গে যাওয়ার পর জয়িতা বলল, 'তুই তো বেশ এদের সামনে আমাকে

দ্রিমিত বলে ডাকতে শুরু করেছিল। আমরাও না সবার মুখে দ্রিমিত দ্রিমিত শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে কোনকালে কলেজে পড়িনি। তুই আর আলাদা করে জয়িতা বলে ডাকিস না।’

আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে জয়িতার মুখ দেখল। ইদানিং ওই মুখে অন্য ধরনের লাগনা এসেছে। সেই শহুরে পালিশটা নেই। মুখ ফেটেফুটে একাকার কাণ্ড ঘটেছিল এক সময়। এখন একটা বুনো পাহাড়ি ছাপ পড়ে গেছে সর্বত্র। জয়িতার চুল বড় হয়েছে। কিন্তু বেদম রক্ষা। এই চুল নিয়ে ও মরে গেলেও কলকাতার রাস্তায় পা বাড়াতো না। চেহারা তাদেরও কম পাল্টে যায়নি। পোশাক জীর্ণ গালে দাড়ি বেরিয়েছে, আরও রোগা হয়ে গেছে সে। চেহারা খারাপ হয়েছে সুদীপেরও কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে ওর মেজাজের। কোন কিছুকেই আর ভাল দ্যাখে না সুদীপ।

কথাটা বলল আনন্দ। জয়িতা বলল, ‘দেখতে দেখতে কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে ও। সেই ব্রে মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তার পর থেকেই এই অবস্থা। তুই ভাবতে পারিস ও মাঝে মাঝে পাহাড়ে ঘোরাফেরা করে কেন?’

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে মাথা নাড়ল আনন্দ। জয়িতা বলল, ‘সেই ভালুক-ছানাঘের দেখতে। ওর ধারণা ওরা ওকে দেখলেই চিনতে পারবে। পাহাড়ে ছেড়ে দেবার পর ওরা বেঁচে আছে কি-না তারই ঠিক নেই, আর বেঁচে থাকলেও যে এত বছর মনে রাখার কথা নয় এটাই উধাও হয়ে গেছে ওর মাথা থেকে। আমি বলছি আনন্দ, এজন্যে ওই মেয়েটাই দায়ী।’

‘কি রকম?’ আনন্দ হাসল, ‘তোর ওই মেয়েটাকে প্রথম থেকেই পছন্দ হয় নি।’

জয়িতা মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ হয় নি। মেয়েটা এই গ্রামেই থাকে অথচ গ্রামের মানুষের কোন কাজে হাত মেলান না। আজ সমস্ত গ্রাম একজোট হয়ে কাজ করছে, তুই কখনও দেখেছিস ওকে এগিয়ে আসতে! গ্রামের মানুষও ওকে পছন্দ করে না। শুধু সুদীপের সঙ্গে লেপেট থাকা ছাড়া অন্য কোন ধান্দা নেই ওর। শী ইজ স্পারেলিং হিম।’

‘ইম্পসিবল। সুদীপকে যতটা জানি তাতে বিশ্বাস করি, কোন মেয়ে ওকে নষ্ট করতে পারে না।’

‘তুই ওই আনন্দেই থাক। মেয়েটার কখনই বাচ্চা হবে না। এখানকার সবাই একথা জানে।’

‘তুই মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছিস জয়িতা।’

‘কল মি দ্রিমিত।’

এবার আনন্দের মুখে কৌতুক ফুটল, ‘তুই নামটাকে পছন্দ করিস?’

‘অফ কোর্স! আমি ভুলে যেতে চাই আমার নাম জয়িতা। রামানন্দ রায় সীতা রায় আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন। অতীতের একটা জিনিস শুধু মনে রাখতে চাই এবং সেটা হল শিক্ষা। এদের সঙ্গে সারা জীবন এদের মত হয়ে

থাকতে চাই আমি। সুদীপ যা করছে তা বাইরে থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবকের মত। গ্রামসামগ্রী ফুরিয়ে গেলেই চলে যাবে যেন। এখন আর আমি ওই ভূমিকায় থাকতে চাই না।’ কথা বলতে বলতে জয়িতা আনন্দের সঙ্গে হাঁটছিল।

ওরা এতরূপে আস্তানার কাছে চলে এসেছে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, ‘যে কোন রেফারেন্সে তুই সুদীপকে টানছিস, হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাইট মি?’ জয়িতা বলল, ‘তাকে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারব না। ইট ইজ ইউ হু গেভ মি ইন্সপিরেশন। এখানকার সমস্ত পরিকল্পনাই তোর মাথা থেকে বেরিয়েছে। গ্রামের মানুষ তোকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আমাকে মনের কথা খুলে বলে।’ কথাটা শুনে আনন্দ অনেকদিন বাদে হো হো করে গলা খুলে হাসল। কিন্তু জয়িতার মনে হল হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। একটানা অনেকটা উঠে আসায় ওর বুকে হাঁফ ধরল। ক’দিন থেকে এটা প্রায়ই হচ্ছে। মাথা ঘুরছে, এক ধরনের অস্বস্তি বেশ কিছুদিন সেটে থাকে শরীরে।

আনন্দ আর কথা বলল না। মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল সামনে। ওদের দেখে বলল, ‘খাবার হয়ে গিয়েছে। খাবে তো চলে এস।’ আনন্দ তাকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। কনকনে জল মুখে কপালে দিতে জয়িতা যেন আরাম পেল। সে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। শরীরটা গোলাচ্ছে। সকাল থেকে কিছু পেটে না দেওয়ায় এরকমটা হচ্ছে। লিভারটার কি অবস্থা কে জানে। আজকাল একটা ভয় তার খুব করে। ভাল এবং নিয়মিত খাবারের অভাবে তার কি প্রেসার কমে যাচ্ছে? নাহলে মাথা ঘোরে কেন? সে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল মেয়েটা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতে সে ঘরের ভেতর চলে গেল।

দুটো পা সামনে ছড়িয়ে জয়িতা বসল। সামনেই বরফচূড়া থেকে একটা হিম বাতাস নেমে এল তখনই। খুব ভালো লাগল জয়িতার। সে নিজের পোশাক দেখল। এগুলো পাষ্টানো দরকার। খুব বেশীদিন টিকবে না। সুদীপের কাছে যে অর্থ অবশিষ্ট আছে তাতে আর হাত দেওয়া হবে না বলে ঠিক হয়েছে। এখন গ্রামগত উপার্জনে প্রত্যেককে বেঁচে থাকতে হবে। গ্রামের কে-কোন মেয়ে যা পোশাক পরে সে তাই পরবে। সে মুখ তুলে গ্রামটার দিকে তাকাল। এমনভাবে চেহারা পাষ্টে যাবে তা কে ভেবেছিল। কলকাতা থেকে পালাবার সময়েও তাদের কল্পনায় ছিল না। পাথরের দেওয়ালে প্রাণশক্তি এতকাল আটকে ছিল। সব ছিন্নপথ পেয়েছে বাইরে বের হবার। এবং যে কোন তরল পদার্থের মত সেই ছিন্ন বড় করার চেপ্টান্ন ব্যস্ত সমস্ত গ্রাম। শুধু দেখতে হবে উৎসাহের অতিশয় যেন সমস্ত কাজ তুলে না করে দেয়। যে কোন সুপ্রাপ্তিই মনে আশংকা আনে। সুখের গন্ধ পাওয়ার মুহূর্তে গ্রাম-রুদ্ধরা বলতে শুরু করেছে এসব যাদের জন্য হল তারা যদি চলে যায় তাহলে কিছুদিন পরে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে গ্রামটা। মাঝখানে এই স্বাদ

বদলের স্বাদ নতুন বিপদ ডেকে আনবে। হয়তো ঠিক, কিন্তু জয়িতা ভাবে ব্যাপারটা ফুটবল টিম কোচিং-এর মত হয়ে যাচ্ছে। তারা সুত্রপাত করতে পারে মাত্র, কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষকেই। নেতৃত্ব নিতে হবে তাদেরই। নির্ভরতা এক্ষেত্রে কখনই কাম্য নয়। কিন্তু তাকে তো এই গ্রামেই থেকে যেতে হবে। একটা বাসযোগ্য পৃথিবী চেয়েছিল সে। এখন তো জয়িতা নেই, এখন সে দ্রিমিত। এই গ্রামটিকে ক্রমশ সেই জায়গায় পৌঁছে দেবে গ্রামবাসীদের কাঁধে কাধ মিলিয়ে। রোলেনদের গ্রামেও এখন তাপল্যাণ্ডের ছোঁরাচে ভাব গেছে। সেখানেও যৌথগৃহ, যৌথ খামার তৈরীর চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখানে অভাব এবং অসুখ এত প্রবল ছিল যে, বাধা আসেনি তেমন কিন্তু ওখানে সম্বল মানুষের সংখ্যা বেশী বলে প্রতিবন্ধকতা আসছে। কিন্তু গত বরফের সময় যে তাপল্যাণ্ডের মানুষ কম কষ্ট পেয়েছে এটা ওরা লক্ষ্য করেছে। সেইটেই ওদের যৌথগৃহ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সময় আনন্দ তাকে খেতে ডাকল।

সুদীপ যার নাম দিয়েছে খিচুড়ি তার স্বাদ এখন ওদের সয়ে গেছে। কিন্তু এখানে উনুনে থাকতে থাকতেই খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ওরা চার জন থাকে গোল হয়ে বসে। আনন্দ চটপট কিছু পেটে চালান করে দিয়ে বলল, 'জব্বর খিদে পেয়েছিল।'

সুদীপ ওর দিকে তাকাল। তারপর বাংলায় বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এবার আমাদের কলকাতায় ফেরা দরকার। পুলিশ সম্পর্কে আমরা হয়তো মিছিমিছি আতঙ্কিত হয়ে আছি। অ্যান্ডিনে কলকাতায় অনেক খুন হয়েছে, অনেক ডাকাতি, এখন আমাদের জন্যে কেউ নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে বসে নেই। নেটস গো ব্যাক।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ একথা তোর মনে হচ্ছে কেন?'

'কলকাতা থেকে বেরুবার আগে তুই বলেছিলি কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে আবার আমরা ফিরে আসব। কথাটা নিশ্চয়ই তোর মনে আছে?' সুদীপের গলায় সামান্য ঝাঁঝ।

'আছে। কিন্তু বল, কি উদ্দেশ্যে আমরা কলকাতায় যাব। আরও কয়েকটা মন্ত্রী অথবা চোর খুন করে কিছু লাভ হবে না। ব্যক্তিহত্যা কখনই সাধারণ মানুষের উৎসাহ আনে না। তাছাড়া মধ্যবিত্ত বঙ্গবাসী কখনই আঙুল তুলবে না। ওরা রাজনীতি করে কিছু পাওয়ার লোভে এবং ব্যতিক্রম ছাড়া বেশীর ভাগই গর্তে মুখ গুঁজে থাকা পছন্দ করে। ভারতবর্ষে যদি কখনও বিপ্লব হয় তাহলে গ্রামে আগুন জ্বলবে প্রথমে। সেই আগুনে রোস্ট হয়ে শহরের মানুষের যদি চৈতন্য জাগে। আমরা ওখানে গিয়ে কিছুই করতে পারব না। বরং এখানে তিল তিল করে এই নবজাগরণ চলছে, আমাদের উচিত এর সঙ্গী হওয়া।' আনন্দ খুব সিরিয়াস গলায় বলল।

'এই জনোই এখানে থাকা উচিত নয়, এদের উচিত আমাদের হাত ধরে নয়,

নিজেদের পায়ে নিজেরা যাতে দাঁড়াতে পারে তার চেষ্টা করা। নাহলে এরা কখনই স্বাভলস্বী হবে না। তাছাড়া, তেদের কথা আমি জানি না, বাট আই অ্যাম রিয়েলি টায়ার্ড।' সুদীপ একবার তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা মেয়েটির দিকে তাকাল। যেন ক্লাস্তিটা উভয় অর্থে তা ব্রিয়য়ে দিল।

আনন্দ প্রথমে কিছু বলল না। তারপর সবাই চুপচাপ দেখে বলল, 'নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তোর আছে। তবে কিছু করার আগে তোর উচিত ভেবে দ্যাখা।'

সুদীপ কাঁধ নাচাল। জয়িতা দুটো দলা পেটে দেবার পর আর খেতে পারছিল না। সে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু ক্রমশ তার শরীরের অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। শরীর গোলাচ্ছে, মোটেই খেতে ইচ্ছে করছে না। যে বিষয় নিয়ে সুদীপ প্রশ্ন তুলেছে সেটা তারও ভাবনায় এসেছিল কিন্তু যেভাবে সুদীপ সমাধান চাইছে তা মানতে সে নারাজ। কিন্তু এখন তার তর্ক করতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। খাবার ছেড়ে দিয়ে সে উঠে পড়তেই সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?' জয়িতা কোন জবাব না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে লাগতে সামান্য স্বস্তি হল কিন্তু পৃথিবীটা টলছে তার। হাত ধুয়ে মুখে জল দিতে দিতেই মনে হল গলার কাছে অস্বস্তি। সে বসে পড়তেই খাবার বেরিয়ে এল হড় হড় করে। শব্দ করে কয়েকবার বমি হল তার। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সে হাঁপাচ্ছিল। মুখ হাঁ এবং চোখ বন্ধ। সে ওই অবস্থায় চোখের কোলে জলের অস্তিত্ব টের পেল। প্রচণ্ড ক্লাস্ত লাগছে, একটু শুয়ে পড়লে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হল তার। সে চোখ খুলতেই মেয়েটাকে দেখতে পেল। আস্তানার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা অবাক চোখে এদিকে চেয়ে আছে। ক্রমশ তার মুখে একটা আশ্চর্য আগো ফুটে উঠল। এক ঝটকায় সে ভেতরে চলে গেল। ও রকম কেন ও করল জয়িতা ঠাণ্ড করতে পারল না। সে অবসন্ন শরীরটা টেনে তুলল তারপর জল ঢালতে লাগল বমি পরিষ্কার করতে।

মেয়েটার ছুটে আসার তদ্বী সুদীপকে অবাক করল। আনন্দ দেখল নিজের খাবারের সামনে বসে মেয়েটা হাসিমুখে খাবার পুরছে আর মাথা দুলিয়ে মজার উল্লী করছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই, তুমি অমন করছ কেন? কি হয়েছে?'

মেয়েটা সেইভাবেই জবাব দিল, 'ভাল খবর, খুব ভাল খবর!'

'ভাল খবর? বাইরে আবার কি খবর হল?' সুদীপের বিরক্তি বাড়ছিল। মেয়েটা আচমকা তার এঁটো মুখ সুদীপের কানের কাছে নিয়ে ফিসফিসিয়ে কিছু বলে খিল খিল করে হেসে উঠল। কি বলল সে আনন্দ ঠাণ্ড করতে না পারলেও লক্ষ্য করল সুদীপ অবাক হয়ে গেছে। চকিতে সুদীপ আনন্দের দিকে তাকাল। তারপর সেই অবস্থায় উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে সুদীপ দেখল জয়িতা তখনও মাথা নিচু করে

জল চানছে। এর মধ্যেই ওর চেহারা অত্যন্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁট কামড়াল। তারপর নিজের মনে উচ্চারণ করল, না। ইটস ইম্পসিবল। আমি বিশ্বাস করি না।

সেই সময় দূরে চিংকার শোনা গেল। একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরের পাহাড় থেকে নেমে আসছে। তার কথা শুনতে গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এল। লোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছিল। সুদীপ অবাক হয়ে এবার সেদিকে তাকাল। পুলিশ নয়তো! এবার লোকগুলো আস্তানার দিকে ছুটে আসছে। লা-ছিরিও এবং পালদেম ওদের সঙ্গে রয়েছে। লা-ছিরিও সুদীপকে দেখতে পেয়ে বলল, 'বহৎ মারপিট চলছে, তিন চার জন লোক ঠিক মরে যাবে।'

'কোথায়?' সুদীপের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। যাক, পুলিশ নয়।

'পাশের গ্রামে।'

এই উত্তেজনা সম্ভবত জয়িতাকে আচমকা সুস্থ করে দিল। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে লা-ছিরিও?'

লা-ছিরিও বোঝাল পাশের গ্রামে কদিন থেকেই ঝামেলা চলছিল। আজ দস্তুরমত মারামারি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে তিন চারজনের লাস পড়ে গেছে। ওই ছেলেরি গরু চরাতে পাশের গ্রামের কাছে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে ছুটে এসেছে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'লড়াইটা কাদের সঙ্গে হচ্ছে?'

এবার পালদেম জানাল, 'নিজেদের মধ্যে।'

এই সময় আনন্দ বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। খবরটা শোনামাত্র সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এমন কি কারণ ঘটতে পারে যে একটা গ্রামের মানুষ নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে। বরং গ্রামে গ্রামে রেষারেষি থাকায় এরা জেট বেঁধে থাকটাই পছন্দ করে। সুদীপ বলল, 'ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। তাপল্যাওে কিছু হলে না হয় আমরা ভাবতাম।'

হঠাৎ জয়িতা ফোঁস করে উঠল, 'কেন, তাপল্যাওের ভাল-মন্দের ইজারা নিয়েছিস নাকি তুই?'

সুদীপ হতভম্ব হল। জয়িতার সেই ক্লাস্ত অবসন্ন ভঙ্গীটা নেই। মেয়েটির কাছে যে ইঙ্গিত সে পেয়েছিল তার কোন হদিশ পাচ্ছে না এখন। বরং জয়িতা যেন তাকে এদের সবার সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। কেন? সে কোনরকমে বলতে পারল, 'কি ভ্যানতারা করছিস।'

জয়িতা ওর কথায় কান দিল না। আনন্দের সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'রোলেনদের গ্রামে নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে। ওরা আমাদের সাহায্য করেছিল এক সময় এটা ভুলে যাস না।'

সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে ফেলেছিল আনন্দ। সে ভেতরে ঢুকে রিভলবারটা তুলতে গিয়ে মাথা নাড়ল। এর কর্মক্ষমতা এখন কতটা সন্দেহ আছে। কিন্তু তবু সঙ্গে থাকলে ভরসা হয়।

রোলেনদের গ্রামের ধার বরাবর পৌঁছে দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। তাপল্যাণ্ডের অন্তত জনাবিশেক যুবক এসেছে ওদের সঙ্গে। পাহাড়ের একটা ঢালে দাঁড়িয়ে ওরা সমস্ত গ্রামটাকে দেখতে পাচ্ছিল। কয়েকটা বাড়িতে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। চারদিকে এখনও ছোট্ট ছুটি চলছে। যে যৌথগৃহ রোলেনরা তাপল্যাণ্ডের অনুসরণে বানিয়েছিল সেটি এখন মুখ খুবড়ে রয়েছে। এখনও টানা কাঁদছে কেউ কেউ। খমখমে হয়ে আছে পুরো গ্রামটা। এই মুহূর্তে অবশ্য কোনও মারামারি চোখে পড়ল না। আনন্দ অনেকটা নিজের মনেই বলল, 'ব্যাপারটা কি!'

সুদীপ বলল, 'যাই হোক না কেন, এটা ওদের সমস্যা আমি আবার বলছি।' আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। তার পর নিচু গলায় বলল, 'তুই এ রকম পাল্টে গেলি কি করে?'

'পাল্টে গেছি আমি?' সুদীপ হাসল, 'হয়তো। পরোপকার করার ঠেলাম।' আনন্দ আর কথা বাড়াল না। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা কয়েকটি যুবককে দেখল, দূরে দাঁড়িয়ে আগুন দেখছে বেশ নিলিপ্ত ভঙ্গীতে। এছাড়া তাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য সেখানে কোন মানুষের চলাফেরা নেই। জয়িতা বলল, 'আমাদের যাওয়া উচিত।'

আনন্দ বলল, 'তোরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি যাচ্ছি। কিছু হলে আমি আত্মরক্ষা করতে পারব।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমিও যাচ্ছি। ওরা আমাকে কিছু বলবে না। রোলেনকে খুঁজে বের করা দরকার।'

তাপল্যাণ্ডের যুবকদের সঙ্গে সুদীপ ওপরেই রয়ে গেল। আনন্দ আর জয়িতা সাবধানে নিচে নামতে লাগল। নিজের শরীরের অস্থিতিকে এখনও টের পাচ্ছিল জয়িতা। কিন্তু বাইরের উত্তেজনা সেটাকে অনেক দমিয়ে দিয়েছে। ওরা নিচে এসে দাঁড়াতেই যুবকরা ওদের দেখতে পেল। প্রথমে ভয় তারপর সন্দেহ ওদের চোখে ফুটে উঠল। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে দু'জন ছুটে চলে গেল আড়ালে। জয়িতা হাত তুলে চিৎকার করল, 'কি হয়েছে তোমাদের গ্রামে?'

খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটো কোন জবাব দিল না। জয়িতা আবার চিৎকার করল, 'আমরা তোমাদের বন্ধু। তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।'

এবার দু'জন নিচু গলায় কথা বলল। তারপর ওরা এগিয়ে এল খমকে দাঁড়ানো আনন্দের সামনে। প্রথম লোকটি বলল, 'এখানে আজ কেউ ঢেঁচিয়ে কথা বলছে না। তোমরাও বলো না।'

এই রকম কথা শুনে কল্পনা করেনি ওরা। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

লোকটি বলল, 'এই গ্রামের কয়েকটা পরিবার চামনি যৌথগৃহ হোক,

তাপল্যাঙের মানুষদের মত আমরা একসঙ্গে চাষ করি, বাইরে জিনিসপত্র বিক্রী করে টাকা নিয়ে আসি। ওরা বাধা দিচ্ছিল খুব। আজ সকালে ওরা আমাদের একজনকে লুকিয়ে খুন করে। সেটা জানার পরে সমস্ত গ্রামের লোক ওদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, ওদের তিন জনকে খুন করে বদলা নেওয়া হয়।’ লোকটা নিঃশ্বাস ফেলল, ‘এখন আর আমাদের সামনে কোন বাধা নেই।’

এই সময় দু’জন লোক ফিরে এল আরও কয়েকজনকে নিয়ে। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল জয়িতা। রোলেনদের সঙ্গে এ তাপল্যাঙের ডাকাতি করতে গিয়েছিল। সে জয়িতাকে বলল, ‘এই প্রথম আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলাম। তোমরা কি তাই দেখতে এসেছ?’ জয়িতা মাথা নাড়ল, ‘না। আমরা জানতাম না কি হয়েছে এখানে। তাই ছুটে এসেছিলাম।’

লোকটা বলল, ‘ও! আমাদের আর কোন ঝামেলা নেই।’ অত্যন্ত নিষ্কিপ্ত দেখাচ্ছিল লোকটাকে। আনন্দ বুঝল ওরা চাইছে না কেউ নাক গলাক। গ্রাম থেকে, সরাসরি না বললেও, চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ওর ভাল লাগল। প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য এই রক্তপাত ওদের অনেক কাজে লাগবে। বলতে গেলে একত্রিত হবার প্রথম পদক্ষেপ এরা নিজেরাই অর্জন করল। ঠিকঠাক যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে তাপল্যাঙের মানুষদের চেয়ে এরা অনেক বেশী স্বাবলম্বী এবং সংগঠিত হবে। আনন্দের মনে হল, তাপল্যাঙের যদি কিছু মানুষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত তাহলে ওদের অগ্নি পরীক্ষাটা সম্পন্ন হত।

সে জয়িতাকে বলল, ‘চল ফিরে যাই।’ তারপর যুবকদের বলল, ‘যদি কখনও কোন সাহায্যের দরকার হয় আমাদের বলো।’

যুবকরা ঘাড় নাড়ল। আনন্দ ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল জয়িতা ফিরছে না। সে শুনল জয়িতা জিজ্ঞাসা করছে, ‘রোলেন কোথায়?’

প্রমতা শোনামাত্র লোকগুলো মাথা নিচু করল। জয়িতার গলার স্বর এক পর্দা উঠল, ‘কি হল, কথা বলছ না কেন?’

লোকটি, যে এতক্ষণ কথা বলছিল গম্ভীর গলায়, দ্বিতীয়বার প্রমতা শোনামাত্র হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কান্নাটা সংক্রামিত হল তার সঙ্গীদের মধ্যে। ততক্ষণে গ্রামের আরও মানুষ ভিড় করেছে পেছনে। সম্মিলিত চাপা ক্রন্দনে ছেয়ে গেল গোটা চত্বর। জয়িতা পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। এমন অসাড় চেহারায় জয়িতাকে কখনও দ্যাখিনি আনন্দ। সে চাপা গলায় ডাকল, ‘জয়িতা!’

জয়িতা মাথা নাড়ল, ‘আমি দ্রিমিত, দ্রিমিত।’

আনন্দ মাথা নাড়ল। তারপর গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করল, ‘রোলেন কোথায়?’

লোকগুলো দুটো ভাগ হয়ে গেল। একজন সেই রাস্তা দিয়ে ওদের নিয়ে এল

গ্রামের মাঝখানে। পথ চলতে ওরা পোড়া গন্ধ পেয়েছে বারংবার। ছাই হয়ে যাওয়া বাড়ি নজরে এসেছে।

রোলেনকে চিনতে পারল আনন্দ। সুগঠিত শরীর নিয়ে সে গুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। মাথার পাশ দিয়ে রক্ত ঝরে শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। ওকে ঘিরে কয়েকজন গ্রামব্রহ্মা হাঁটু গেড়ে বসে সমানে কেঁদে যাচ্ছেন। আনন্দ মাথা নিচু করে দাঁড়াল। যে লোকটি নিয়ে গিয়েছিল পথ দেখিয়ে সে বলল, 'কাল রাত্রে ওরা রোলেনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল চুপিচুপি। আজ সকালে ওকে এই অবস্থায় পাই। রোলেন ওদের বারংবার অনুরোধ করেছে আমাদের সঙ্গে আসতে। সেই রাগে ওরা ওকে মেরেছে। ওর মৃতদেহ দেখে গ্রামের মানুষ খেপে গিয়ে—' লোকটা আর কথা শেষ করল না।

যে কোন কাজ শুরু হয় কারো উদ্যম থেকেই। সেই উদ্যম যদি সে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে পারে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় তাহলেই সে সফল। আনন্দ হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বন্ধ করল। যে কাজ তারা ভারতবর্ষের বিরাট প্রেক্ষাপটে করার কথা ভেবেছিল, যে কাজ তারা তাপল্যাণ্ডের ছোট পরিধিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রোলেন নিজেকে শহীদ করল। চকিতেই তার মনে পড়ল রোলেন তো কখনই তার এবং সুদীপের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেনি। তাকে তাপল্যাণ্ড গ্রামেও দেখা যেত না। তাহলে এই প্রেরণা সে কোথেকে পেল? আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে জমিতার দিকে তাকাল। জমিতা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রোলেনের মৃতমুখের দিকে। আনন্দ শিহরিত হল। জমিতা যে কখন রমণী হয়ে গিয়েছে তা সে আগে লক্ষ্য করেনি। ওর হেঁট এখন খর খর করে কাঁপছে। এবং এই প্রথম আনন্দ জমিতার দু চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়া দেখল।

আশ্চর্য গলায় জমিতা বলল, 'আনন্দ, তুই ফিরে যা। আমি ওর শেষ কাজ পর্যন্ত থাকব।'

আনন্দ বলল, 'আমি ফিরে যাচ্ছি সবাইকে ডেকে আনতে। তাপল্যাণ্ড আর এই গ্রামের মানুষ এক হয়ে শেষ কাজ শুরু করবে।'

॥ ৫০ ॥

লা-ছিরিও আর জমিতা কথা বলতে বলতে আসছিল। গত সপ্তাহে যারা এই গ্রাম থেকে সুখিয়্যাপোকরিতে গিয়েছিল তারা ভাল ব্যবসা করছে। ওখানে একজন পাইকার তাদের কাছ থেকে নিয়মিত এলাচ কিনবে। মুরগী এবং বেতের ঝুড়ি যদি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় অস্তুত কালিয়্যাপোকরি পর্যন্ত তাহলে লাভ বেশী থাকবে। খন্দরওয়ালারা যা যা জিনিস গ্রামে আনত তা অনেক সস্তায় ওরা কিনে এনেছে নিচু থেকে। এভাবে চললে আগামী বরফে প্রত্যেকের শরীরে গরমজামা একটা না একটা থাকবেই। আনন্দ চাইছে এ বছরের মধ্যে অস্তুত তিনটে গরু কিনে আনতে নিচে থেকে। গরুর যা দাম

তা শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা করা যাবে কিনা কে জানে। যদি জিনিসপত্র বিক্রীর টাকা উদ্ধৃত না থাকে তাহলে আনন্দই ব্যবস্থা করবে। সুদীপের টাকা এখনও রয়ে গেছে অনেকটা। আনন্দ চাইছে এখানে একটা বেশ বড় ডেয়ারি করতে। পোলট্রি এবং ডেয়ারি যদি চালু করা যায় তাহলে সামনের বছর থেকে দুধ ডিম ও মুরগী চালান দিলে অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত হবে। তবে এখন সুদীপের টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া হবে। লাভ হবার পর শোধ করার দায় থাকবে। পাশের গ্রামের সঙ্গে তাপল্যাঙের এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেহেতু ওরা আনন্দ কিংবা জয়িতার সাহায্য সরাসরি নিচ্ছে না তাই এখনও পিছিয়ে। কিন্তু তাপল্যাঙ যা করছে ওরা সেই পথে এগোচ্ছে। লা-ছিরিঙের বিশ্বাস গরু কিনলে ওদের ওপর টেকা দেওয়া যাবে। এ বছর ওরা যাই রোজগার করুক গরু কেনার মত সামর্থ্য হবে না।

ওরা যখন আশ্তানার কাছাকাছি তখন সুদীপকে দেখতে পেল জয়িতা। খানিকটা দূর থেকে দেখা বলেই জয়িতার মনে হল সুদীপ খুব রোগা হয়ে গিয়েছে। ইদানিং খুব খিটখিটে এবং সন্দেহ-পরায়ণ হয়েছে সুদীপ। বারংবার সে বোঝাবার চেষ্টা করছে, অনেক হয়েছে এবার ফেরা যাক। কিন্তু ফিরলে কি হবে তা নিয়ে মোটেই ভাবছে না। হঠাৎ লা-ছিরিঙ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি তাপল্যাঙ ছেড়ে চলে যাবে?'

জয়িতা হাসল, 'হঠাৎ একথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?'

লা-ছিরিঙ জবাব দিল, 'গ্রামের সবাই বলাবলি করছে। সবাই ভয় পাচ্ছে যে তোমরা চলে যাবে।'

'ভয় পাচ্ছে? ভয় কেন?' জয়িতা অবাক হল।

'তোমরা আসার আগে আমাদের অবস্থা কি ছিল তা তো দেখেছ। তোমরা এলে বলেই এখন গ্রামের মানুষ কোনরকমে কিছু খেতে পাচ্ছে। আমরা সবই বুঝতে পারছি এভাবে চললে আগামী তিনচার বছরে আর কোন অভাব থাকবে না। আমরা কখনও ভাবতে পারিনি যে সবাই এক হয়ে লড়তে পারব। তোমরা চলে গেলে এসব ভেঙে যাবে। আমাদের বুদ্ধি দেওয়ার কে থাকবে?' অত্যন্ত সরল গলায় বলল লা-ছিরিঙ।

জয়িতা বলল, 'আমরা না হয় এখানে আছি কিন্তু পাশের গ্রামের মানুষরা কি করে পারছে?'

লা-ছিরিঙ হাত নাড়ল, 'ওরা তো তোমরা যা করতে বলছ আমাদের তাই নকল করছে। এই গ্রামের ব্যাপার দেখার পরেই তো রোলেন ওদের বোঝাল। চোখের সামনে কারো ভাল না দেখলে ওরা এসব মানত না। শোনা কথাতে কে বিশ্বাস করে!'

জয়িতা বলল, 'এটা ঠিক নয়। আমরা চলে গেলে যদি সব ভেঙে যায় তাহলে আমাদের সব পরিশ্রম অর্থহীন। তোমাদের উচিত নিজেরাই যাতে আরও এগিয়ে যেতে পার তা ভাবা।'

হঠাৎ লা-ছিরিও প্রসঙ্গ পাল্টান, 'তোমাদের ওই বন্ধু আগে পাল্লাতে চায়, না?' সুদীপকে দেখাল সে। সুদীপ হাঁটিছিল কাহনের মন্দিরের দিকে।

'একথা কে বলল তোমাকে?'

'জানি। ওর ব্যবহার যেন কেমন কেমন। তাছাড়া ওই মেয়ের সঙ্গে বেশীদিন থাকলে ও মরে যাবে। এটা বুঝতে পেরেছে বলেই পাল্লাতে চাইছে।' মাথা নাড়ল লা-ছিরিও।

আজকাল অল্প হাঁটলেই বুকে ধরে। মাথা ঘুরে। কপালে ঘাম জমে। জয়িতা দাঁড়াল একটু। মেয়েটির সম্পর্কে যে ইঙ্গিত লা-ছিরিও দিল তাতে কথা বলার লোভ বাড়ে। সেই প্রসঙ্গে যেতে চাইল না সে। কিন্তু লা-ছিরিও যেন নিজের মনেই বলে চলল, 'ওকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল রোলেনরা। কারণ ও নাকি মা হবার পক্ষে খুব উপযুক্ত। কারো সঙ্গে বিয়ে দিলে গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা তৈরী করতে পারবে। নিয়ে গেলে হাড়ে হাড়ে টের পেত। ও একটা উকুন। যা দেখে তা শুষে নেবে। সেটা বুঝতে পেরেছে বলে তোমাদের বন্ধুটা পাল্লাতে চাইছে। আর এই পাল্লাতে চাওয়ার মতলবটা টের পেয়ে গেছে মেয়েটা। সে-ই সারা গ্রামে গাঝিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'পাল্লাতে চাইলেই পাল্লাতে দেবে কেন তোমরা? ধরে রেখ।'

'না। তা কি করে সম্ভব। তোমরা তো কোন অন্যায় করানি। অন্যায় না করলে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায়? ওই মেয়েটার যদি বাচ্চা হত তাহলে ওকে পাল্লাতে দিতাম না আমরা।' কথাটা বলে কি ভাবল লা-ছিরিও আকাশের দিকে মুখ তুলে, তারপর মাথা নাড়ল, 'তাহলে হয়তো ও পাল্লাতে চাইতো না। আঙনে জল পড়লে তা আর গনগনে থাকে না।'

গ্রামের সমস্ত সমর্থ পুরুষ এবং নারী আজ মন্দিরের চাতালে জড় হয়েছে। আনন্দ এবং কাহন ওপরে বসে। কাহনকে জোর করেই এনেছে আনন্দ। জনতার সঙ্গে যোগ দিয়ে জয়িতা দেখতে পেল সুদীপ খানিকটা দূরে একটা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর খুব ইচ্ছে করছিল সুদীপের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু দূরত্বটা ডিঙাতে গেলে অনেক মানুষকে সরাতে হয়। পালদেম উঠে এল আনন্দদের পাশে। এসে দুহাত তুলে দাঁড়াতে জনতার গুঞ্জন বন্ধ হল। পালদেম যেন নিজের কৃতিত্বে খুশী হল, তার মুখে হাসি ফুটল। জয়িতার মনে হল, সারল্যা মানুষকে কত অল্পে তৃপ্ত করে।

আনন্দ উঠল, 'তাপল্যাঙের ভাই এবং রোলেনরা। আজকের এই জমায়োতের একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। তার আগে আমি জানতে চাই এই গ্রামের সমস্ত মানুষ এখানে উপস্থিত আছে কিনা। কেউ না থাকলে তাকে ডেকে আনতে হবে।'

খানিকটা সময় গলা তুলে এ ওর নাম ধরে ডাকাডাকির পর সমস্তের জানান দেওয়া হল, 'আছে, আছে।' আনন্দ মাথা নাড়ল। তারপর প্রায় বক্তৃত্তা দেবার চওে বলল, 'তোমরা জানো এই গ্রামে কোন পাল্লা এখন নেই। যিনি

ছিলেন তিনি বরফের সময় মারা গিয়েছেন। কাহন আছেন কিন্তু তিনি তো পালানন। আসলে এখন আর আমাদের একজন পালার কোন দরকার নেই। কারণ একজন পালার যে সবসময় ঠিক কাজ করবেন তার কোন স্থিরতা নেই। পৃথিবীর যেসব দেশে সমস্ত মানুষের পরিশ্রম একসঙ্গে যোগ হয় তাদের দেশের জন্যে, যেখানে প্রতিটি মানুষ একটি পরিবারের সদস্য সেখানে কোন একজন পালার সবার মাথার ওপরে থাকে না। থাকা উচিত নয়। অথচ সব কাজ ভাল ভাবে দেখার জন্যে, সবাই যাতে ঠিকঠাক সুবিধে পায় তা খেয়াল রাখার ব্যবস্থা থাকা চাই। কেউ কোন অন্যান্য করে অথবা কেউ বা কারা যদি এমন কাজ করে যা সমস্ত গ্রামের ক্ষতি ডেকে আনবে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এই শাস্তি কারা দিবে? সবাই মিলে? না কখনও নয়। এর জন্যে দরকার দশজন মানুষের একটা দল। যাদের ওপর সমস্ত গ্রামের দায়িত্ব থাকবে। আগে আমরা গ্রামের বাইরে যেতাম না। এখন যাচ্ছি। সেখানে যাতে ভাল ভাবে ব্যবসা করা যায় তার দায়িত্ব থাকবে এই দলের ওপর। কিসে গ্রামের মানুষের আরও ভাল করা যায় তা ওরা দেখবে। এই দলে কারা থাকবে তা ঠিক করবে তোমরা। আর সেই জন্যে এই জমায়েত। দল ঠিক হওয়ার পর তারাই বুঝে নেবে কে কোন দায়িত্ব নিতে চায়। তোমরা এবার নাম বল। যে নামগুলো বেশী মানুষ বলবে তারাই দলে থাকবে।' আনন্দ কথা শেষ করা মাত্র সব চুপচাপ হয়ে গেল। যেন বুঝে নিতে সময় লাগছে সবার।

কাহন মাথা নেড়ে মুখ ফেরালেন, 'আমি কি দলে থাকব?'
 আনন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই থাকবেন। সবাই যদি দলে আপনাকে চায়।'
 কিছুক্ষণ কেটে গেল কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। আনন্দের অস্থিত্তি বাড়ছিল। কি ব্যাপার? ব্যবস্থাটা এদের মনঃপূত হচ্ছে না নাকি? এই সময় সে সুদীপকে এগিয়ে আসতে দেখল। ওপরে ওঠে এসে সুদীপ বলল, 'অভ্যেস কখনও একদিনে তৈরী হয় না। উই শ্যুড হেল্প দেম।' সে চিৎকার করল 'যারা এই দলে থাকতে চাও তারা ওপরে উঠে এস।'

এবার নড়াচড়া শুরু হল। এ ওর দিকে তাকায়। কিন্তু উঠতে যেন সঙ্কোচ বোধ করছে সবাই। এই সময় সাওদের গুটি গুটি পায়ে ওপরে ওঠে এল। তাকে দেখে লা-ছিরিও এগিয়ে এল। এবং অমনি আরও পাঁচজন বিভিন্ন বয়সী মানুষ এগিয়ে এল। আনন্দ পালদেমকে ধরে নিয়ে গুলল, আটজন। সুদীপ হাঁকল, 'আরও দুজন চাই।'

জনতার মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করল, 'তোমরা দুজন তো আছ।'
 আনন্দ কিছু বলার আগেই সুদীপ জানাল, 'না আমরা দলে থাকতে পারি না। আমরা বাইরের লোক। আমার নাম সুদীপ, ওর নাম আনন্দ, তোমাদের নামের সঙ্গেও মেলে না। এই গ্রামের মানুষের ভালমন্দ দেখা শোনা করবে গ্রামেরই মানুষ, বাইরের লোক নয়।'

এই সময় কাছন গিয়ে দাঁড়ালেন দলে। নজন হল। আর একজন চাই হঠাৎ একটি মেয়ে বলল, 'দলে সব ছেলে থাকছে কেন? একজন মেয়ে চাই।'

সুদীপ বলল, 'নিশ্চয়ই। মেয়েরা আগে আসছে না বলেই থাকছে না। দশ নম্বরের জন্যে তুমি এসো।' মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'আমি কি কিছু জানি যে দলে যাব। দ্রিমিত কোথায়? দ্রিমিত যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত নারী কন্ঠে ধ্বনিত হল, 'দ্রিমিত! দ্রিমিত! দ্রিমিত!'

দুটি মধ্য বয়সিনী গিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল জয়িতাকে। সুদীপ বাধা দিল, 'আরে ওকে আনছ কেন? ও তো আমাদের মতই বাইরের লোক।'

যে মেয়েটা কথা বলছিল সে ফুঁসে উঠল, 'কে বলেছে বাইরের লোক। ওর নাম দ্রিমিত। দ্রিমিত আমাদের নাম। ওর পোশাক আমাদের পোশাক। তুমি নিজেকে এখনও বাইরের লোক ভাবতে পার কিন্তু দ্রিমিত তা ভাবে না। ওকে আমরা আমাদের লোক মনে করি।'

কথাটার সমর্থন মিলল অনেক গলায়। সুদীপ কাঁধ নাচাল। ওরা ততক্ষণে জয়িতাকে ওপরে তুলে দিয়েছে। সুদীপ জয়িতার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'চমৎকার!' বলে নিচে নেমে পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

আনন্দ বলল, 'তাহলে এই দশজন আগামী বারোটা চাঁদ পর্যন্ত গ্রামের দায়িত্বে থাকবে। এই সময়ে যদি এরা ভাল কাজ করে তাহলে আবার দায়িত্ব পাবে। যদি কেও খারাপ কিছু করে তাহলে গ্রামের সমস্ত মানুষ এক হয়ে তাকে দল থেকে সরিয়ে দেবে। তোমরা এ ব্যাপারে রাজী?'

'ঠিক কথা, ঠিক কথা।' সবাই চেঁচিয়ে বলল।

আনন্দ এবার ঘোষণা করল, 'কে কোন্ দায়িত্ব নেবে তা এরা নিজেরা ঠিক করবে। এখন যে যার কাজে তোমরা যেতে পার।'

জমায়েত যখন ভাঙ্গব ভাঙ্গব করছে উল্লসিত হয়ে তখন একজন, এক বৃদ্ধ, চিৎকার করল, 'সবাই বলছে তোমরা নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। কথাটা ঠিক?'

কথাটা আনন্দের কানেও এসেছিল। সে মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না।'

বৃদ্ধ বলল, 'আমরা খুব খারাপ ছিলাম। তোমরা চলে গেলে আবার খারাপ থাকব। আনন্দ প্রতিবাদ করল, 'কেন খারাপ থাকবে? তোমরা তো শিখে নিয়েছ ভালভাবে থাকতে গেলে কি কি করতে হয়। তোমাদের এই শেখাটা অনেক সভ্য দেশের মানুষ শিখতে পারেনি।'

বৃদ্ধের কানে যেন কথাগুলো ঢুকল না, 'আগে কেউ গ্রামের বাইরে যেতে সাহস করত না। এখন যাচ্ছে। সেখানে অনেক ডাইনি ও পেতে বসে আছে। তারা এদের যাদু করবে। তোমরা না থাকলে এরা গ্রামের কোন নিয়মকানুন মানবে না। তাছাড়া—'

আনন্দ দেখল বৃদ্ধ উদাস হয়ে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। সে জিজ্ঞাসা করল

‘তাছাড়া !’

‘আমাদের বাপমা যারা স্বর্গে গিয়েছে তারা আমাদের কিছু শেখায়নি। আমরাও এদের কিছু শেখাতে পারিনি। এরা, যেসব বাচ্চা এখন জন্মাচ্ছে তাদের কিছু না শিখিয়ে বড় করছে। আসলে আমরা কিছুই জানি না, শেখাতে পারব কি করে! আমরা যখন মরে যাব, এরা যখন মরে যাবে তখন একই অবস্থা চলবে। তোমরা থেকে গেলে এ অবস্থা চলতে পারত না।’

আনন্দ কিছু বলার আগে পালদেম বলল, ‘তাহলে এরা কি করে আমাদের বাচ্চাদের শেখাবে?’

রুদ্ধ জবাব দিল, ‘কেউ রক্তের টানে শেখে, কেউ দেখে শেখে। ওরা চলে গেলে যারা আসবে তারা কিছুই শিখবে না। এখনও এই গ্রামের তিনটে পরিবার আলাদা রয়ে গেছে।’

আনন্দ উৎসাহিত করল, ‘তোমরা মিছিমিছি দৃশ্চিন্তা করছ। আমরা যাচ্ছি না এখনই। তবে পুলিশ যদি আমাদের ধরে নিয়ে যান্ন তাহলে অন্য কথা।’

রুদ্ধ চিৎকার করল, ‘পুলিসদের আমরা ঢুকতে দেব না।’

প্রতিধ্বনিত হল অনেক গলা পাহাড়ে পাহাড়ে, ‘দেব না, দেব না।’

জমায়েত যখন ভেঙ্গেছে, মানুষজন যখন চলে যাচ্ছে তখন আনন্দ এগিয়ে গেল জয়িতার দিকে, ‘কনগ্রাটুলেশন জয়িতা।’

জয়িতা মাথা নাড়ল, ‘উঁহ। জয়িতা নয় প্রিমিত।’

‘ও হ্যাঁ প্রিমিত।’ আনন্দ মাথা নেড়ে নিজেকে সংশোধন করল। এই সময় সেই মেয়েটা এসে দাঁড়াল সুদীপের পাশে। ও যে এতক্ষণ জমায়েতে ছিল তা কেউ লক্ষ্য করেনি। আনন্দ তখন পালদেমদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নেমে গেছে।

জয়িতা গ্রামের তিনটে মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। হঠাৎ সুদীপ এগিয়ে এল তার সামনে, ‘জয়িতা, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। এদিকে আস।’

জয়িতা ওর গলার স্বর শুনে চমকে তাকাল। অত্যন্ত রাগী দেখাচ্ছে সুদীপের মুখ। সে হাসবার চেষ্টা করল, ‘জয়িতা এখন মরে গেছে সুদীপ, আমি প্রিমিত।’

‘এইসব ন্যাকামি রাখ। আই ওয়ান্ট টু আক্স ইউ এ স্ট্রেট কোয়েশেন!’
‘বলে ফেল।’

‘তোর শরীরে বাচ্চা আছে?’

সঙ্গে সঙ্গে জয়িতা পাথর হয়ে গেল। তার রক্ত চলাচল যেন এক মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হল। তার পরেই কান মাথা বাঁ বাঁ করে উঠল। সুদীপের গলার স্বর আর এক পর্দা উঠল, ‘উত্তর দে। সরাসরি বল হ্যাঁ কি না?’

সুদীপ কথা বলছিল বাংলায়। জয়িতা দুর্বল গলায় জবাব দিল, ‘কি শুনলে খুশী হবি সুদীপ?’

‘আমার খুশী অখুশীর ওপর কিছু নির্ভর করছে না।’

‘তাহলে জিজ্ঞাসা করছিস কেন?’

‘প্রয়োজন আছে। তোকে আমরা বন্ধু বলে মনে করতাম। আই টি টেড ইউ আজ এ পার্শন। তুই একটা মেয়ে এটা আমার মাথায় কখনও আসেনি। এবং তুই, তুই সব সময় নিজেকে তাই মনে করতিস। কিন্তু এই মেয়েটা বলছে তুই প্রেগন্যান্ট। এর আগেও ও আমাকে বলেছিল যেদিন তুই বমি করেছিলি। আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ ও বলছে তোর মধ্যে নাকি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। আমি উত্তরটা চাই।’

‘আমি বুঝতে পারছি না সুদীপ, এতে তোর উদ্দিগ্ন হবার কি আছে?’

‘হু ইস দ্যাট ম্যান?’ সুদীপের চোয়াল শক্ত হল।

‘তুই তো বন্ধুর মত প্রশ্নটা করছিস না সুদীপ। তোর মুখ এখন কি হিংস্র হয়ে উঠেছে। অতএব আমি তোর কোন প্রশ্নের উত্তর দেব না।’ জয়িতা খুব শান্ত গলায় শব্দগুলো উচ্চারণ করল।

সুদীপ মুখ ফেরান নিচের দিকে। তারপর বিড় বিড় করল, ‘আই নো হিম।’

জয়িতা এবার হেসে উঠল, ‘মিছিমিছি এ ব্যাপারে তুই উদ্দিগ্ন হচ্ছিস। এটা এখন সম্পূর্ণ মেয়েলি ব্যাপার। মেয়েদের কিছু নিজস্ব ব্যাপার থাকে সেখানে তোরা একেবারেই অবাকিত।’

হঠাৎ সুদীপ চিংকার করে উঠল বিশ্রী ভঙ্গীতে, ‘বাদ দে! আমার সব জানা হয়ে গেছে!’

‘কি জেনেছিস তুই?’

চিংকারটা করেই সম্ভবত সুদীপ চেতনায় এসেছিল। এবং এখন তার মধ্যে হতাশা স্পষ্ট হল। দুহাতে মাথা চেপে ধরে সে বলল, ‘তোকে আমি এতদিন অন্য চোখে দেখে এসেছিলাম। কলকাতায় তুই কি ছিলি ভেবে দ্যাখ? মেয়েলি যে কোন ব্যাপার তুই ঘেন্না করতিস।’

‘ঘেন্না?’ জয়িতা ওর কাছে এগিয়ে এল, ‘সুদীপ তোকে আমাদের ঘেন্না করা উচিত নয়?’

‘আমাকে? হোয়াই?’ চোখ বড় হয়ে উঠল সুদীপের।

‘এতদিন তুই কি করছিস?’ একটা মেয়ের হ্যাংলামির সুযোগ নিচ্ছিস। ওকে বিয়ে করার কথা চিন্তাও করছিস না। বরং কি করে এখন থেকে চলে যাওয়া যায় তার ফন্দি ভাবছিস। কলকাতায় থাকলে তুই এই কাজটা করতে পারতিস?’

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ। তারপর হাত নেড়ে মেয়েটিকে কাছে ডাকল। এখন, নিতান্ত অনিচ্ছায় মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল। সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করল ওর ভাষায়, ‘আমার বিরুদ্ধে তোর কোন নালিশ আছে?’

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘সেটা কি এখানে বল?’

মেয়েটা এবার কেঁদে ফেলল দুহাতে মুখ ঢেকে। সুদীপ ওর কাঁধে হাত রাখল, 'ঠিক আছে, বল।'

মেয়েটা এবার কোনমতে বলতে পারল, 'ও আমার সঙ্গে একদিনও শোয়নি। আমি অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। বললেই বলে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু শোয় না। যদি কখনও আমাকে বিয়ে করে তবেই শোবে। আমাকে মেয়ে বলে যেন মনেই করে না ও।' কথাগুলোর সঙ্গে কান্না জড়ানো ছিল। সবাই অবাক হয়ে মেয়েটিকে দেখছিল।

সুদীপ এবার জয়িতার দিকে তাকাল, 'পরে কথা হবে তোর সঙ্গে।' বলে দৌড়ে নিচে নেমে গেল। তার শরীর তরতর করে নিচে নামছিল। জয়িতা স্তব্ধ হয়ে ওর যাওয়া দেখছিল। এতক্ষণ যে নাটক এখানে চলছিল তার দর্শকরা ব্যাপারটা সম্পর্কে ধন্দে ছিল যেহেতু সংলাপ ছিল বাংলা-ইংরেজীতে মেশানো। তবে ব্যাপারটা যে মারাত্মক পর্যায়ে গিয়েছে তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। বিশেষ করে শেষ হল যখন মেয়েটির জ্বানবন্দীতে তখন তো বটেই। জয়িতা ওর আগে পাশের মেয়েদের দিকে তাকাল। সহজ সরল চলচল মুখের মেয়েগুলোর নাম একই ধরনের, রোঙমিত, ইনামিত, পাশাংকিত, পরমিত। এবার যে মেয়েটির নাম ইনামিত সে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে? ও ওরকম রেগে গিয়েছিল কেন?'

জয়িতা আবার বিন্দুতে মিলিয়ে আসা সুদীপকে দেখল। সুদীপ কোথায় যাচ্ছে? এই সময় কান্না থামিয়ে সুদীপের বান্ধবী চিৎকার করে উঠল, 'দ্রিমিতের পেটে বাচ্চা এসেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের শব্দ ছিটকে উঠল মুখগুলো থেকে। মেয়েরা উৎসাহে জয়িতাকে জড়িয়ে ধরল। ওরা এমন করছে যেন খুব বড় প্রাপ্তির খবর পেয়ে গেছে। এবং এই প্রথম অন্যধরনের লজ্জায় আক্রান্ত হল জয়িতা। সেই চিৎকার শুনে কাহ্নন নেমে এলেন মন্দির থেকে। মেয়েরা ছুটে গেল তাঁর কাছে, 'দ্রিমিতের পেটে বাচ্চা এসেছে!'

লোকটির মুখ দেখে মন বোঝা দায়। কিন্তু কথাটা শোনামাত্র একটা হাত প্রসারিত হল তাঁর যেন আশীর্বাদ করছেন কথাটা শোনামাত্র। পরমিত জয়িতাকে ইঙ্গিত করল বসার জন্যে। নিতান্ত অনিচ্ছায় হাঁটু গেড়ে বসল সে। মাথার ওপর অনর্গল অবোধ্য মন্ত্র বর্মিত হতে লাগল। এরপর সবাই মিলে গুকে তুলে ধরতেই কাহ্নন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো বিবাহিত নও। অতএব তোমার ভাবী স্বামী কে? বিয়ের আয়োজন করতে হবে।'

'নাম বলাটা কি খুব জরুরী?'

'নিশ্চয়ই। কুমারী মেয়ের পেটে বাচ্চা এলে তাঁর একটা পরিচয়ের ব্যবস্থা করাই নিয়ম।'

'আমি যদি না বলি?'

'তাহলে তোমাকে এই গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। শুধু তোমার ক্ষেত্রে নয়, এই

গ্রামের যে কেউ এমন করলে একই শাস্তি দেওয়া হবে। পুরুষ হলে তা আরও ভয়ানক হত।’

‘সেই বিচার কি আপনিই করবেন কাছন?’

‘যতদিন তাপন্যাণ্ডের মানুষ আমাকে কাছন বলে স্বীকার করবে ততদিন অবশ্যই আমি করব। তবে আজ দশজনের দল তৈরী হয়েছে। তাদের কথাও শুনতে হবে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক নেই।’ কাছন নিলিপ্ত গলায় জানলেন।

জয়িতা মাথা নাড়ল। বন্দুক! এরা কেউ জানেনা সমস্ত গুলিগুলো এখন অকেজো। আর এই গ্রামের মানুষদের দিকে বন্দুকের নল তোলা মানে নিজের গলায় ঠেকানো। সে বলল, ‘আমাকে একটু সময় দিন কাছন।’

তালু পাহাড় বেয়ে দৌড়াবার সময় শরীরে ভার যেন কমে যায়। কিন্তু বুকের ভেতর ঝড় বইছিল সুদীপের। অনেকটা নেমে আসার পর সে আনন্দকে দেখতে পেল। পালদেম এবং সাওদেরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ওরা জমি দেখছে। পরিকল্পনা হয়েছে ওপরের ঝরনা থেকে জল যাতে সরাসরি জমিতে আনা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সে ব্যাপারেই আলোচনা করছিল ওরা। সুদীপকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে অবাক হল সবাই। খানিকটা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে দম নিতে নিতে সুদীপ ডাকল, ‘আনন্দ, তোর সঙ্গে কথা আছে।’

‘কি কথা?’ আনন্দ ওকে জরিপ করার চেষ্টা করল।

‘এদের সামনে বললে তোর হয়তো ভাল লাগবে না।’

আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে পালদেমকে বলল, ‘ঠিক আছে, আমরা পরে এটা নিয়ে কথা বলব। মনে হচ্ছে সুদীপের কোন সমস্যা হয়েছে—! ঠিক আছে।’

পালদেমরা চলে যাওয়ার পর আনন্দ এগিয়ে গেল, ‘কি বলবি বল।’

‘মুখোমুখি কিছুক্ষণ তাকিয়ে সুদীপের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, ‘ছিঃ।’

খুব অবাক হল আনন্দ, ‘কি ব্যাপার? তুই এভাবে আমাকে ছিঃ বলছিস কেন?’

‘তুই, তুই এমন কাজ করলি আনন্দ। তুই মুখে বলতিস যদি তাহলে কি আমি আপত্তি করতাম?’

‘আঃ। কি বলছিস স্পষ্ট করে বল।’

‘ন্যাকামি করিস না। তুই জানিস না কি করেছিস?’

‘আনন্দের কপালে ভাঁজ পড়ল, ‘ব্যাপারটা কি বলতো?’

‘তোর সঙ্গে ওর শারীরিক সম্পর্ক আছে সেটা এতকাল চেপে রেখেছিলি কেন?’

‘শারীরিক সম্পর্ক? কার সঙ্গে? ওঃ! তোর মেয়েটা এই কথা বলছে বুদ্ধি।’

‘আবার বুলি করার চেষ্টা! জয়িতা প্রেগন্যান্ট জানিস না?’

‘জয়িতা?’ প্রায় চিৎকার করে উঠল আনন্দ।

‘আকাশ থেকে পড়লি মনে হচ্ছে।’

‘কি যা তা বলছিস তুই?’

‘আনন্দ, আমি শেষবার আশা করছি তুই সত্যি কথা বলবি।’

‘মিথ্যে কথা বলার কিছু দরকার আছে সুদীপ। আমি যদি করতাম তাহলে এই পাহাড়ে কেউ আমাকে বাধা দিতে আসতো?’

‘তাহলে স্বীকার করছিস না কেন?’

‘কারণ আমি করিনি।’

‘বিশ্বাস করিনা!’

‘চমৎকার। জয়িতার খবরটা তুই কোথায় পে লি?’

‘আমাকে বেশ কিছুদিন আগে মেয়েটা বলেছিল। বমি করছিল তখন। বিশ্বাস হয়নি আমার। আজ প্রমাণ করতে ও ইনডাইরেক্টলি স্বীকার করে নিয়েছে।’

‘হায় ভগবান!’ আনন্দ চিৎকার করল এবার, ‘ও স্বীকার করেছে?’

‘হ্যাঁ। তোর আর লুকোবার পথ নেই। কিন্তু আনন্দ, ওকে তো আমরা সবাই বন্ধু বলেই জেনে এসেছিলাম এতদিন। এক ঘরে গুয়েছি কিন্তু কখনও মেয়ে বলে মনে করিনি। কল্যাণটা ওকে ভালবাসতো। আই নো দ্যাট। ওর সম্পর্কে দুর্বল ছিল। আমার মনেও যে দুর্বলতা আসেনি তা নয়। কিন্তু আমি সবসময় মনে করতাম ওকে বন্ধুর সম্মান দেব। ও মেয়ে নয়, একটা মানুষ। জীবনের সব প্রলোভন ছেড়ে আমরা যে কাজে পা বাড়িয়েছি তাতে আর যাই হোক একটি মেয়ের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় প্রধান হয়ে ওঠে না। অথচ তুই তাই করেছিস। না হলে তুই ওর শরীরের কথা ভেবে কনকাতার ওষুধের দোকান থেকে প্রটেকশান কিনতিস না। নাউ টেল মি, হোয়াটস দি ডিফারেন্স বিটুইন আস অ্যাণ্ড দ্যাট প্যারাডাইস পাটি।’

আনন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওর রোগা শরীরটা শক্ত। এলোমেলো দাড়ি এবং চুল ভর্তি মাথাটা মিচের দিকে ফেরানো। তারপর ও চোখ তুলল, ‘তোকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে সুদীপ!’

সুদীপ চমকে উঠল। এই গলায় আনন্দ কখনও তার সঙ্গে কথা বলেনি। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। সুদীপ আশংকা করছিল আনন্দ তার ওপর বাঁপিয়ে পড়বে। ওর চোখ দেখে সেই রকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু আনন্দ কথা বলল, ‘আমাকে যখন তোর সন্দেহ তখন আমিও বলতে পারি নিজে কাজটা করে তার দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিস।’

‘আমি? আমি করেছি?’

‘নিশ্চয়ই। চোরের মায়ের সবসময় বড় গলা হয়। আর তাই কদিন থেকে তুই চলে যাওয়ার কথা বলে যাচ্ছিস। তুই এমন কাজ করলি কেন সুদীপ?’

‘প্রথমটা শোনামাত্র যেন উন্মত্ত হয়ে গেল সুদীপ। দুপাশে মাথা নেড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, ‘ইটস এ লাই, মিথ্যা কথা, আমি কিছুই জানি না। জানলে আমি তোকে এসে—’

বাক্যটা শেষ করতে পারল না সে। আনন্দ বলল, ‘এটা তোর অভিনয় হতে পারে।’

‘অভিনয়?’ সুদীপের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

‘অবশ্যই। এতদিন ধরে ওই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে থেকেও তোর লোভ মেটেনি। আমি বুঝতে পারছি না জয়িতা এই ভুল কি করে করল। এক সময় মেয়েটা সম্পর্কে জেলাস ছিল। কিন্তু সব জেনেশুনে—! শোন সুদীপ! আমি কখনও তোর আর ওই মেয়েটার সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলিনি। এটা অন্যান্য কিন্তু আজ হোক কাল হোক তোকে বিয়ে করতে হবে ওকে বলেই চূপ করেছিলাম। কিন্তু এইটে আমি সহ্য করব না।’

সুদীপ হাসল অনেকক্ষণ পরে, ‘আমার সম্পর্কে চমৎকার ধারণা তোদের। একটু আগে জয়িতা একই প্রসঙ্গ করেছিল। মেয়েটা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। বাট আই নেভার গ্লিপট উইদ হার। কথাটা ও নিজের মুখে আজ সবাইকে বলেছে।’

‘তুই?’ বিস্ময় ফুটে উঠল, আনন্দের মুখে।

‘হ্যাঁ!’ সুদীপ জোরের সঙ্গে বলল।

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘সব কেমন গোলমালে হয়ে যাচ্ছে। তুই প্যারাডাইদের কথা বললি! চিরকাল যে ব্যাপারটাকে ঘূণা করে এলাম নিজে তা কিভাবে করব? হ্যাঁ, যদি জয়িতাকে ভালবেসে পেতে চাইতাম তাহলে সেটা জোর গলায় বলতাম।’

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই ওকে ভালবাসিসনি?’

‘হ্যাঁ, বেসেছিলাম। কিন্তু পেতে চাইনি।’

‘আমিও তাই।’

‘আমার মনে হয় একমাত্র কল্যাণ পেতে চেয়েছিল।’

গলার স্বর দুজনের খাদে নেমে এসেছিল। হঠাৎ সুদীপ সজাগ হল, ‘তাহলে কে?’

‘তুই যে ভাবে ছুটে এলি, ওকি কারো নাম বলেছে?’

‘না। কিন্তু তুই কিংবা আমি ছাড়া কে হতে পারে? আমরা তিনজনেই এক শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ হয়েছি। রুচি বল, মানসিকতা বল, আমরা এক। জয়িতার মত মেয়ে—!’

‘ঠিকই। হয় তুই নয় আমি।’

‘কিন্তু আমি নই।’ চিৎকার করল সুদীপ।

‘চিৎকার করার কিছু নেই! আমি নই সুদীপ। স্টিল আইদার ইউ অর মি। এবং সেটা নির্ভর করবে জয়িতার সিদ্ধান্তের ওপর।’

‘না। আমি মানি না। এটা হতে পারে না।’

‘কেন মানবি না সুদীপ?’

‘ও যদি সত্যি কথা না বলে!’

‘জয়িতা কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারে না।’

‘তুই এখনও ওকে বিশ্বাস করিস আনন্দ?’ মাটিতে বসে পড়ে অঙ্কুত চোখে তাকাল সুদীপ।

‘আমৃত্যু করব। তুই যে অস্বীকার করছিস তাও আমি বিশ্বাস করছি সুদীপ। অবশ্য আমার কথা বিশ্বাস করা না করা তোর ওপর নির্ভর করছে।’

দুই হাঁটুতে মাথা রাখল সুদীপ, ‘সারি আনন্দ।’

আনন্দ চারপাশে তাকাল। হালকা মিঠে রোদে এখন তাপল্যাও ভাসছে। ওপাশে নীল আকাশের নিচে চ্যামল্যাও, বরুণৎসে, নুপৎসে, লোৎসে, এভারেস্ট, মাকালু, ছোয়ল গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। এই তাপল্যাওকে ওরা তিনবছর আগে দ্যাখেনি। কর্মমজের সমস্ত চিহ্ন চারপাশে ছড়ানো। একটি প্রাণের পুরো চেহারা পাল্টে গেছে এর মধ্যে। মার্কস সাহেব চেয়েছিলেন মানুষের বেঁচে থাকার রাস্তাটা পরিষ্কার হোক। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষ সেই পথে যাওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে। ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টি’রাতো সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেখল কাজ আর আদর্শের মধ্যে দূস্তর প্রভেদ। গণতন্ত্র এবং ভোটার বাক্সে এমন একটা যাদু আছে যে এরা তার মোহ আজও কাটিয়ে উঠতে পারল না। কলকাতা শহরে তারাও কি বোকামি শুরু করেছিল। এখানে এসে এই অরাজনৈতিক নিঃস্ব মানুষগুলোর সঙ্গে কাজ করতে করতে প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ সেটা অনুভব করেছে। ব্যক্তিহত্যা নয়, জীবন ফিরিয়ে দেওয়াতেই একজন কম্যুনিষ্ট-এর বেঁচে থাকার স্বার্থকতা। আর সেই কাজ যখন তারা তিলে তিলে শুরু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন জয়িতা গর্ভবতী। এই খবরে এত বিচলিত হচ্ছে কেন? একটা ছোট্ট খবরে এত বড় বিশ্বাস ভেঙ্গে যেতে পারে না। আনন্দ বলল, ‘সুদীপ, জয়িতার সন্তানের পিতা কে ও নিয়ে দৃশ্চিন্তা করে আমাদের কি লাভ?’ সুদীপ মুখ তুলল। আনন্দ বলল, ‘এটা আমাদের সমস্যা নয়, তাই না?’

‘না। কিন্তু ও কি বন্ধুত্বের সম্মান রাখল? আমার লাগছে এখানেই।’

আনন্দ হাসল, ‘ও যে মেয়ে তাই আমরা ভাবতাম না। ও নিজেও কি ভাবত! তাছাড়া তুই ভুলে যাচ্ছিস আমরা যেমন ছিলাম তেমন আছি কিন্তু ও এখন আর জয়িতা নয়। ইদানিং ও আমাদের বারংবার মনে করিয়ে দেয় ওর নাম দ্রিমিত। ওঠ, আজকের কাজগুলো সেরে ফেলি?’

॥ ৫১ ॥

ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ। রাত থেকেই শব্দটা ছাড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। মন্দিরের সামনে রাখা বিশাল জয়ঢাকে ঘা পড়ছে সমান বিরতিতে। পাহাড়ে ধাক্কা

থেয়ে শব্দটা গড়িয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অথবা বুনো গাছগাছালি আর পাথরের খাঁজে খাঁজে ।

এখন ভরা বরফের সময় । ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে শান্ত রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনগুলো অল্প সময়ের জন্যে আসে । এই রোদে তাপ নেই । দুপুর হল কিনা বোঝার আগেই হিমবাতাস মেনে আসে এভারস্টের শরীর থেকে । এবারই প্রথম, বরফের প্রথম চোটিটা বুথা গিয়েছে । তাপল্যাও কিংবা পাণের গ্রামের কারো কোন ক্ষতি হয়নি । গ্রামবৃদ্ধরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন । যৌথগৃহগুলোতে মানুষ এখন নিরাপদে বসবাস করছে ।

ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ । শব্দটা বাজছে এক নাগাড়ে । আনন্দ দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল । সুদীপের জন্যে কাল রাত্রে তার বেশ ঠাণ্ডা লেগে গেছে । বেলা হয়েছে বেশ কিন্তু বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না । এখনও জ্বর জ্বর ভাবটা ছেড়ে যায়নি । শরীরে রোদ পড়ায় ওর ভাল লাগল । ক্রান্ত চোখে ও চারপাশে তাকাল । এখন সাদাম সাদাম তাপল্যাও ঝকঝক করছে । অন্তত ফিটখানেক পুরু বরফ পায়ের তলায় । বাড়ির ছাদে গাছের পাতায়, চাষের ক্ষেতে যেখানে চোখ রাখা যায় সেখানেই তুষার । রোজ জরুরী জায়গাগুলো থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওদের, ভোরেই আবার ফিরে আসছে । আনন্দ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল । বাজনাটা বেজেই চলেছে একটানা ।

পাশাপাশি দুটো ঘর । দুটোই বন্ধ । জমিতাকে ওরা নিয়ে গিয়েছে এক সপ্তাহ হল । অনেক যত্নে নতুন সুদেকেরিঘর তৈরী হয়েছে ঠিক গ্রামের মাঝখানে । তিনজন মাইলিআমার সঙ্গে সে রয়েছে সেখানে । এক ফোঁটা শীতের বাতাস চুকছে না সুদেকেরিঘরে । চব্বিশ ঘণ্টা আশুন জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে । আর মাইলিআমারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরিয়ে এসে জানিয়ে যাচ্ছে দ্রিমিত কেমন আছে ।

সুদীপের ঘরটাও বন্ধ । এবং সুদীপ নেই । কাল রাত্রেই কাণ্ডটা করল সে । মদ খেয়ে মেয়েটাকে সে বলেছিল চলে যেতে । মেয়েটাও নেশা করেছিল । ফলে চটজলদি দুজনের মধ্যে জেগে গেল । ব্যাপারটা যখন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখনই আনন্দ ওদের দরজায় পৌঁছেছিল । ইদানিং প্রায়ই দুজনের মধ্যে লাগত । আনন্দ সেগুলোকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করত ।

আনন্দকে দেখে সুদীপ চিৎকার করেছিল, 'ওকে চলে যেতে বল আমার কাছ থেকে ।'

মেয়েটা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, 'ও কি বলল তোমাকে ?'

আনন্দ শান্তগলায় জবাব দিয়েছিল 'ও তোমাকে চলে যেতে বলছে এখন থেকে ।'

'বলবেই তো । বলবে না ? পুরুষমানুষের ক্ষমতা না থাকলে গলার জোর বাড়ে ।' মেয়েটি চিৎকার করল ।

সুদীপ মুখ ফেরাল, 'ক্ষমতা আছে কি নেই তার পরীক্ষা তোর কাছে দেব না !'

‘দিতে পারলে তো ! দিনের পর দিন আমার মত মেয়ে একটা পাথরের পাশে শুয়ে থাকলে সে-ও নড়ে-চড়ে বসত। আবার গলা ফুলিয়ে বলা হয় আমি ওকে ছুঁয়েও দেখিনি। যেন কত কৃতিত্ব ! ছুঁবি কি করে ? তোর মন তো পড়ে আছে দ্রিমিতের জন্যে। মুখের সামনে থেকে খাবার হাওয়া হয়ে গিয়েছে বলে সাধু সাজছিস।’ মেয়েটা কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই টলে গেল। আর সুদীপ, ‘দূর শালা, নিকুচি করছে’ বলে ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আনন্দ বলল, ‘এসব কি হচ্ছে সুদীপ !’

সুদীপ কাঁধ ঝাঁকাল, ‘জ্ঞান দিস না।’

‘কিছুই দিচ্ছি না আমি। শুধু বলছি স্টপ ইট।’

‘এটা ওকে বল। এমন একটা মেয়েমানুষ যে সেক্স ছাড়া কিছু বোঝে না। এবং ও আমার কাছে স্বীকার করেছে যে মা হবার কোন ক্ষমতা ওর নেই। শী ডিড দ্যাট নট অনলি উইদ হার হাজব্যাপ্ত। রোলেনরা ভুল করে ওকে নিয়ে যাচ্ছিল।’ সুদীপ হাঁপাচ্ছিল।

‘কিন্তু মেয়েটা তোকে বাঁচিয়েছে। তোর সেবা ও যেভাবে করেছে তা আমরা দেখেছি।’

‘ইয়েস। আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আর কত কৃতজ্ঞতা জানাবো !’

‘ও না হতে পারলে তুই বিরক্ত হতিস না বলতে চাইছিস ?’ আনন্দ প্রশ্নটা করতেই যেন ভাবাচাকা খেয়ে গেল সুদীপ।

উদ্ভ্রান্তের মত মুখ ফেরাল দুরের সুদকেরিঘরের দিকে। তারপর দুহাতে মাথা চেপে ধরে বলল, ‘আই কান্ট স্ট্যাণ্ড ইট।’

‘বুঝলাম। কিন্তু সব কিছুর একটা শোভন ভঙ্গী আছে, এইটে ভুলে যাই না।’

‘দূর ! আমি ওই মেয়েটার কথা বলছি না। জয়ী, জয়ীটা এরকম করবে—!’ সুদীপ কথা শেষ করল না। কিন্তু আনন্দ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে কি একটু আগে মেয়েটা যে অভিযোগ করল তা সত্যি ? সুদীপ হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে উঠল, ‘ইটস ইনটলারব্লে ! ওকে যখন বুড়িগুলো আঁতুড়ঘরে নিয়ে গেল তখন ওর মুখ দেখেছিলি ? হার হাইনেস হেঁটে গেলেন কি ভঙ্গীতে ? আবার প্রত্যেকদিন মুরগীর মাথার সুপ খাওয়াচ্ছে ওরা, ওতে নাকি বাচ্চার মঙ্গল হয়। রোজ চারটে মুরগী মারার সাফল্য এই গ্রাম এখনও অর্জন করেছে ? হোয়াই দিস ভি আই পি ট্রিটমেন্ট ? কেন ?’

‘সুদীপ, তুই এইসব নজর করেছিস ? এটা ঠিক না। প্রামের লোকেরা কেন জগিতাকে কাছে টেনে নিয়েছে তা তোর অজানা নয়। ভুলে যা এসব।’ আনন্দের কথাটা শেষ হতেই দুরের সুদকেরিঘর থেকে এক বৃদ্ধার চিৎকার ভেসে এল। বাইরে বেরিয়ে বৃদ্ধটি চিৎকার করে আবার কিছু বলে ভেতরে ফিরে গেল। সেই চিৎকারের প্রতিধ্বনি বাজল মুখে মুখে। এবং তারপরেই কাছনের নির্দেশে সেই মধ্যরাত্রে জয়টাকে ঘা পড়ল, ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ।

সুদীপ চোখ বড় করে আতঙ্কিত মুখে প্রশ্ন করল, 'কি হল?' আনন্দও বুঝতে পারেনি। সুদীপ আবার ঘরের মধ্যে একটা পা বাড়াল। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে উলছে। সুদীপ তাকে প্রশ্ন করতেই মেয়েটা কেঁদে ফেলল।

সুদীপ তাঁকে ধমক দিল, 'আই! কাঁদছিস কেন তুই?'

'আমার কোনদিন হবে না। ওটা নাকি খুব কণ্ঠের আবার কি আরামের!'
'কোনটা? স্তিক করে কথা বল।'

'ব্যথা হচ্ছে পেটে দ্রিমিতের। বাচ্চাটা বেরিয়ে আসবার জন্যে নড়াচড়া শুরু করেছে।'

মেয়েটি কথা শেষ করা মাত্র সুদীপ আফসোসে মাথা নাড়ল, 'মরে যাবে, নির্মাণ মরে যাবে। ওই তো রোগা পটকা চেহারা। মেয়ে বলে মনেই হয় না। না খেয়ে খেয়ে শরীরে রক্ত নেই। জম্মী মরে গেলে—'

এবার আনন্দ উত্তেজিত হল। এক হাতে সুদীপের কাঁধ চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, 'চুপ কর।'

'তুই চুপ করতে বলছিস? ওই বুড়িগুলো ডেলিভারির কি জানে? যদি এটা সিজারিয়ান কেস হয়? একটা বাচ্চা জম্মীর শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে, ভাবতে পারিস? শী উইল নট সারভাইব! অ্যান্ড আই কান্ট স্টে হেয়ার। ওর মরা মুখ আমি দেখতে পারব না। নো।' এবং তখনই সুদীপ কাণ্ডটা করল। আচমকা আস্তানার বারান্দা থেকে নেমে সাদা বস্ত্রের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। ব্যাপারটা বুঝতে পারা মাত্র আনন্দ পা চালিয়েছিল। বরফে পা পিছলে যাওয়ায় ওকে সে শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরেছিল, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

'কলকাতায়। ছেড়ে দে আমাকে।'

'কলকাতায়?' বিস্ময়ে জমে গিয়েছিল আনন্দ।

'হ্যাঁ।' চোয়াল শক্ত করেছিল সুদীপ।

'ও। কিন্তু এত রাত্রে কেন? তাঁড়ায় তো জমে যাবি?'

'জান দিস না। স্তিক পারব।'

'ফিরে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দেওয়ার জন্যে এসেছিলি?'

'যা করতে চেয়েছি তাতে হয়েই গেছে। এই পাহাড়ি লোকগুলো এখন যথেষ্ট আশ্বনির্ভর। দে ক্যান লুক আফটার দেমসেলভ্‌স।'

'কিন্তু কলকাতায় ফিরলে তুই মরবি?'

'মরব? এখানে থেকে একটা মেয়ে ওই ভাবে মরছে দেখার পর বেঁচে থাকব?'

'জন্মিতা মরবে এটা ভাবছিস কেন?'

'এছাড়া কোন উপায় নেই। ওকে মরতেই হবে।'

'তোর নেশা হয়েছে।'

হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুদীপ। তারপর পাতলা জ্যোৎস্না গায়ে মেখে বরফের ওপর বড় বড় পা ফেলে চলে গেল ওপরের দিকে। আনন্দ মাথা নাড়ল। তার কিছু করার নেই। সুদীপকে সে ধরে বেঁধে রাখতে পারে না। অনেকদিন ধরে সুদীপ পালানি পালানি করছিল। হয়তো নিজের কাছে একটা দায় ছিল বলে যেতে পারেনি। আজ জয়িতার ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়ে দিল। স্পষ্ট চোখে আনন্দ যেন দেখতে পেল সান্দ্রাকফু পৌঁছবার আগেই সুদীপ অসুস্থ হয়ে মারা পড়ছে। অথচ তার কিছুই করার নেই। নিজেকে ভীষণ নিঃস্ব মনে হচ্ছিল তার। সে এখন কি করবে? কলকাতা থেকে চার বন্ধু যে কারণে পালিয়ে এসেছিল তার একটা সার্থক রূপ এখানে দিতে পেরেছে। এবং এই গ্রামের অনুকরণ শুরু হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। অথচ তিনজন আজ তার পাশে নেই। কল্যাণ অবশ্যই শহীদ। জয়িতা? জয়িতাকেও সে আজ বুঝতে পারল না। আর সুদীপ যেভাবে পালিয়ে যাবে তাও তো কল্পনায় ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে একা দাঁড়িয়ে আছে সে কোন সৈন্য তার সঙ্গে নেই। না। কোন অবস্থায় সে আর ফিরে যেতে পারবে না। ফেরা মানেই আত্মহত্যা। যেটা তার রক্তে আছে। এখন এই হালকা মিঠে রোদে দাঁড়িয়ে আনন্দের খুব ইচ্ছে করছিল জয়িতাকে দেখতে। কিন্তু আঁতুড়ঘর যাকে এরা সুদকেরিঘর বলে তার চৌকাঠে পা রাখা পুরুষদের নিষেধ। মজার ব্যাপার হল জয়িতা এইসব ব্যাপারের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। গত দু'মাস ধরে ওর সঙ্গে বেশী কথা বলা যায়নি। সব সময় পাশাঙ্কিত নরমিতরা ওকে সঙ্গ দিত। সেই চটপটে ঝকঝকে মেয়েটা ক্রমশ শ্লথ হয়ে গেল। শরীরের স্ফীত অংশ নিশ্চয়ই ওকে কষ্ট দিত কিন্তু এবার সে-সব কথা তার জানার উপায় ছিল না। জয়িতা যেন এখন এই গ্রামের মানুষের এবং ও সেটা খুব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। সুদীপের মত তীব্র নয়, কিন্তু আনন্দের মনে হল জয়িতা তাদের থেকে অনেক পা এগিয়ে গিয়েছে। ঈর্ষাটা বুকে দুলছে কিন্তু সেটা বাধ্য হয়েছে আছে। গত রাত্রে সুদীপের চলে যাওয়াটা পর্দা তোলার কাজ করেছে। সুদীপ বলেছে জয়িতা মারা যাবে। সুদীপ নিজেও বাঁচতে পারে না ওই পাহাড় রাত্রে ডিঙাতে গেলে। তাহলে রইল সে একা। চারজনের শেষজন। অথচ তাকে গ্রামের মানুষ ভালবাসে কিন্তু এখনও নিজের বলে মনে করে না। এরা স্তবেই রেখেছে সমস্ত হলই সে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। ফলে দূরত্ব ঘোচেনি।

ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ। জয়তাকের শব্দ হচ্ছিল একা একা, একটানা। এখন সেই শব্দের সঙ্গে আরও শব্দ মিলল। পাহাড়ে পাহাড়ে যেন শব্দের পিচকারি ছুটছে। আনন্দ আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপরই দৃশ্যটা নজরে এল। পাশের গ্রামের একদল মানুষ ঢাকজাতীয় বাদ্য বাজাতে বাজাতে পাহাড় থেকে নামছে। ওপাশেও আর একটা দল মিছিল করে নামছে এই গ্রামের উদ্দেশ্যে।

প্রত্যেকটা দলের সঙ্গে উৎসবের বাজনা বাজছে।

সুদকেরিঘরের সামনে যে বিশাল চাতালটা সেখানে কোন নরম বরফ নেই। গ্রামের মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। সুদকেরিঘরে ঢুকতে হলে দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। সেখানে গ্রামের মেয়েদের ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। আনন্দকে দেখতে পেয়ে পালদেম এগিয়ে এল, 'কাল রাতেই ব্যথা শুরু হয়েছে কিন্তু বাচ্চাটা কখন বেরিয়ে আসবে মাইলিআমারা এখনও বলতে পারছে না। খুব কষ্ট পাচ্ছে ড্রিমিত। যে বাচ্চা মাকে বেশী কষ্ট দিয়ে পৃথিবীতে আসে সে চিরদিন সুখী করে রাখে।'

আনন্দ পালদেমের দিকে তাকাল। লোকটা এমন ভঙ্গীতে কথা বলছে যেন ওর বাত্মীতেই সন্তান আসছে। পালদেম আবার বলল, 'আজ দেখছি গ্রামটা মানুষে মানুষে ভরে যাবে। যারা কখনও আমাদের এখানে আসতো না তারাও আসছে।'

'কেন?' প্রশ্নটা আচকা বেরিয়ে এল আনন্দের ঠোঁট থেকে।

'বাঃ। সবাই কাছনের চাকের শব্দ শুনতে পেয়েছে যে।'

'ওই শব্দের মানে কি?'

'মানে হল আমাদের গ্রামে ভগবানের সন্তান আসছেন। এই শব্দ সমস্ত আবহাওয়াকে পবিত্র করুক। সমস্ত দানো দূরে থাক। যে যেখান থেকে এই শব্দ শুনছে তারই ইচ্ছে হবে এখানে উপস্থিত হবার।' পালদেম হাসল।

ওর পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ বলল, 'তোমরা কেউ লক্ষ্য করছে গত দশ চাঁদের মধ্যে পাহাড়ের দানোটা আর আমাদের কান্না শোনায়নি। হেঁ হেঁ বাবা, ওটাও ভয় পেয়েছে। বুড়ি মাইলি-আমা বলছিল ড্রিমিতের শরীরে এমন সব চিহ্ন দেখেছে যা সে আগে দ্যাখেনি।'

ভিড় জমছিল ওদের ঘিরে। একজন কৌতূহলী হল, 'কি চিহ্ন বাউ?'

'নাতি থেকে সোজা একটা নীল রেখা নীচে নেমে গেছে। একটুও আঁকাবাঁকা হয়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো গলায় বিস্ময়ধ্বনি উঠল। একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে আনন্দের কাঁধ ধরল, 'সাথী, আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমরা তিন জন ছেলে ছিলে, কিন্তু তোমার মন সবচেয়ে ভাল। আমরা খেতে পেতাম না কিভাবে বাঁচতে হয় জানতাম না। তোমরা নতুন জীবন দিলে। কিন্তু প্রায়ই মনে হত তোমরা চলে গেলে কি হবে? একদিন আমি মরে যাব, পালদেম লা-ছিরিংরা থাকবে না পৃথিবীতে, তখন আমাদের রক্ত শরীরে নিয়ে যারা বাঁচবে তাদের কি হবে? আজ আর কোন চিন্তা নেই। আমাদের আর তোমাদের রক্ত শরীরে নিয়ে যে আসছে সে তো থেকে যাবে তার সন্তানদের মধ্যে। তাদের মধ্যে তোমরা থাকবে, আমরাও।'

এই সময় কাছন নেমে আসছিল মন্দির থেকে। পিছনে তাঁর শিষ্যরা। সবার নজর গেল সেদিকে। আনন্দের মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছিল। না

জেনে একি কথা বলল বুদ্ধ! আমরা এখন এই একুশ শতাব্দীর শুরুতেও যখনই কিছু চিন্তা করি সেটা আবর্তিত হয় নিজেকে কেন্দ্র করে। হয়তো বিস্তৃত হয়ে তা সমাজ এবং শেষতক দেশে গিয়ে পৌঁছায়। পরবর্তী প্রজন্মের কথা কেউ চিন্তা করি না। আগামীকালের নবজাতকের জন্যে পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে যাওয়ার শপথ নিয়েছিলেন এক তরুণ কবি, কিন্তু তাঁর আবেদন কারো কানে পৌঁছায়নি। অথচ এই পাহাড়ি গ্রামের সরল বুদ্ধ অকপটে বলতে পারল আসল সত্যিটা। যতই বিপ্লব করি না কেন পরবর্তী প্রজন্মের ভিত সুদৃঢ় না করতে পারলে সেসবই একসময় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

আনন্দ ধীরে ধীরে মন্দিরের চাতালে গিয়ে দাঁড়াল। এত মানুষ এতদিন ছিল কোথায়? ছোট ছোট দলে পাহাড় ফুঁড়ে এরা নেমে আসছে তাপল্যাঙে। গ্রামে ঢুকে এরা অবাক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে। হয়তো নিজেদের গ্রামের সঙ্গে তাপল্যাঙকে মিলিয়ে নিতে পারছে না। বাদ্যযন্ত্রের শব্দের সঙ্গে শব্দ মিশে আরও গভীর আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেছে। সবাই জড় হচ্ছে সুদকেরিঘরের সামনে। ক্রমশ আনন্দ জয়িতাকে ঈর্ষা করতে শুরু করল। এই এত মানুষ এসেছে দ্রিমিতের বাচ্চা হবে জেনে। দ্রিমিতের বাচ্চা মানে তাদের বাচ্চা। যে বড় হয়ে তাদের দেখাশোনা করবে। এত করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও ঠিক এই জায়গায় সে হেরে গেল জয়িতার কাছে। পুরুষ নতুন প্রজন্ম লালন করতে পারে, কিন্তু তাকে নির্মাণ করতে পারে না।

সেদিন এখানে, এই মন্দিরের চাতালে জয়িতা সেই সাহস দেখিয়েছিল। এমন কি সুদীপের মুখেও শব্দ ফোটেনি একটাও। সমস্ত গ্রাম জমায়েত হয়েছিল এখানে। নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে কাছনও বসেছিলেন বিচারকের আসনে। জয়িতা খানিকটা তফাতে বসেছিল স্বাভাবিক ভঙ্গীতে। পালদেম কথা শুরু করেছিল প্রথমে, 'দ্রিমিতের পেটে বাচ্চা এসেছে। দ্রিমিত বলছে তার কখনও বিয়ে হয়নি। ও নিজেকে এখন এই গ্রামের মানুষ মনে করে। তাই আমাদের ওপর একটা দায়িত্ব এসে গেছে। আমরা জানি এই গ্রামের কোন কুমারী মেয়ের পেটে বাচ্চা এলে সেই মায়ালুদের বিয়ে দিয়ে দিতে হয়। যদি যে দায়ী সে যদি বিয়ে না করতে চায় তাহলে চরম শাস্তি দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু দ্রিমিতের বেলায় আমরা জানি না তার প্রেমিক কে? সে এসেছে দুই-বরফেরও আগে আমাদের গ্রামে। অতএব তার বাচ্চা এখানে আসার পরেই পেটে এসেছে। আমি দ্রিমিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু সে কোন জবাব দেয়নি।'

শুঙ্কন উঠল। আনন্দ লক্ষ্য করল সবকটা দৃষ্টি বাস্তবতার তার এবং সুদীপের ওপর পড়ছে। কাছন উঠলেন, 'দ্রিমিত বলুক তার বাচ্চার বাবা কে? সে যেই হোক তাকে বিয়ে করতে হবে। যদি কোন বিবাহিতা পুরুষ এই কাজ করে থাকে তাহলে তার নামও বলতে হবে।'

জয়িতা কোন উত্তর দিল না। যেন তার কানে কথা পৌঁছাচ্ছিল না। কাহ্ন এবার গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'প্রিমিত।'

জয়িতা মুখ ফেরাল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

কাহ্ন বললেন, 'তোমার সঙ্গে ওই দুজন এখানে এসেছে তারা কি বাচ্চার কেউ?' জয়িতা আনন্দের দিকে তাকাল, তারপর সুদীপকে দেখল। জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। জয়িতা হাসল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, না। সঙ্গে সঙ্গে জনতা চৌঁচিয়ে উঠল, কে, কে?

কাহ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বন্ধুরা যদি না হয় তাহলে ওটা তো আকাশ থেকে তৈরী হতে পারে না। তুমি কি বলতে চাও এই গ্রামের কেউ?'

জয়িতা বিড়বিড় করল, 'এই গ্রাম?' তারপর মাথা নাড়ল, না।

উত্তেজনা এবার তুমুল হল। আনন্দের মনে হল জয়িতা অনাবশ্যক নাটক করছে। এই সময় পেছন থেকে এক রুদ্ধের গলা ভেসে এল, 'আমি জানি, আমি দেখেছি।'

জনতা অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কাহ্ন নির্দেশ দিলেন লোকটাকে সামনে আনার জন্যে। মানুষটিকে দেখে সবাই অবাক। ও এই গ্রামে থাকে না।

কাহ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বলছ দেখেছো, কি দেখেছ?'

'একদিন বরফের সময়, ওরা আদর করছিল, আমি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ওই যেখানে ঝরণাটা পাতালে ভেসে গেছে সেখানে।' লোকটা হাত বাড়িয়ে দেখাল।

কাহ্ন বলল, 'তুমি দাঁড়াও। প্রিমিত, নামটা আমরা তোমার মুখে শুনতে চাই।'

জয়িতা এবার মাথা নাড়ল, 'কি বলব ভাবছিলাম। বললে তোমরা মুখে বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। কারণ ভেবেছিলাম এখন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এই মানুষটি যখন এগিয়ে এল তখন সত্যি কথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। ওর নাম রোলেন।'

'রোলেন?' এক সঙ্গে শব্দটা জনতার মুখ থেকে ছিটকে আকাশে উঠে গেল। তারপরেই সব চুপচাপ। যেন সমস্ত তাপল্যাঙ নির্বাক হয়ে গেল। কিন্তু তখনই সুদীপের টিঙ্কার শোনা গেল, 'ইটস এ ড্যাম লাই!' সুদীপ ছিটকে এগিয়ে গেল, 'আমি বিশ্বাস করি না। মিথ্যে কথা বলছে ও। তুই আমাদের বোকা বানাতে চাইছিস জয়িতা।'

জয়িতা হাসল নিঃশব্দে। তারপর বলল, 'আমার নাম প্রিমিত।'

কাহ্ন গলা তুললেন, 'সাথী তুমি আমাদের ভাষায় কথা বল। তুমি কি বলতে চাইছ?'

সুদীপ ভাষা পাল্টে ব্যক্ত করতেই জয়িতা মাথা নাড়ল, 'তোম বিশ্বাসের পরিধিটা বড় ছোট্ট।'

সুদীপ বলল, 'রোলেন মরে গেছে। একটা মৃত মানুষের নামে দোষ চাপিয়ে

তুই কাউকে আড়ালে রাখতে চাইছিস জয়িতা !'

জয়িতা কাছনের দিকে ফিরল, 'এইজন্যেই আমি নাম বলতে চাইনি। আমি জানতাম আর কেউ না করুক আমার শিক্ষিত বন্ধুরাই প্রথমে অবিশ্বাস করবে।'

কাছন মাথা নাড়লেন। তারপর সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্ধক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি দেখেছিলে? কার সঙ্গে ওকে দেখেছিলে?'

রুদ্ধ গালে হাত দিল, 'এ নিয়ে তোমরা এত বিচলিত হচ্ছে কেন? পুরুষ এবং নারীর মন আর শরীর যদি একসঙ্গে সাড়া দেয় সেটা তো আনন্দের কথা।'

পালদেম চিৎকার করল, 'আঃ! তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাই বল।'

রুদ্ধ বলল, 'ওই তো বললাম। ওই যে বরণাটা যেখানে আড়ালে নেমে গেছে সেখানে ওরা ছিল বরফের সময়ে।'

পালদেম বলল, 'কাছন তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কি দেখেছ, কাকে দেখেছ?'

রুদ্ধ চোখ বন্ধ করে দুশাটা যেন কল্পনা করে নিল, 'আমি যাচ্ছিলাম সাদা ফুল খুঁজতে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক নিচে নেমে গেছি। এমন সময় শব্দ শুনলাম। ভয় হল হয়তো ভালু উঠে আসছে খাদ থেকে। পা টিপে টিপে এগোতেই দেখি দ্রিমিতকে চুমু খাচ্ছে রোলেন। তখন ওদের আশেপাশে কেউ নেই শুধু আকাশ আর বরফ ছাড়া।'

পালদেম জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

রুদ্ধ বলল, 'তারপর ওরা অনেক গল্প করল। অনেক আদর। তারপর, হ্যাঁ, তোমরা যা শুনতে চাইছ তাই হবে ভেবেছিলাম, হল না। ওদুটোই পাগল। নইলে ওসব করার পর দ্রিমিত রোলেনকে কি বোঝায় কিভাবে গ্রামের মানুষের উপকার করতে হবে?'

পালদেম শুধালো, 'কিন্তু রোলেনই যে বাবা তার প্রমাণ কি?'

রুদ্ধ হাসল, 'রোলেন আমাকে বলেছে। আমি যখন পরে তাকে একা ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে কি রকম পুরুষ মানুষ, গ্রামের মেয়েদের মনে ধরল না আবার বিদেশী মেয়ে পেয়ে শুধু চুমু খাওয়ার বাইরে কিছু করতে পারে না তখন সে বলেছিল, 'বাউ, একটা মেয়ের সঙ্গে শোওয়া নিশ্চয়ই আরামের কিন্তু দ্রিমিতের সঙ্গে শোওয়ার পর দেখেছি সেটাই সব নয়।'

এবার জনতার গুঞ্জন শুরু হল। জয়িতা সুদীপের দিকে তাকাল, 'সরি সুদীপ। আমি জানি না তুই কেন আঘাত পাচ্ছিস। কিন্তু আমি রোলেনকে ভালবেসেছিলাম। হি ওয়াজ এ রিয়েল ম্যান। আমি কোন অন্যায় করিনি। বরং আমি মনে করি এই পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে এতদিন আছি এদের সঙ্গে মিশে যেতে যখন পারছি তখন এদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান শক্তিশালী পুরুষটির সন্তান শরীরে নেওয়া আমার কর্তব্য ছিল।'

স্পষ্টত দুটো ভাগ হয়ে গেল তাপল্যাণ্ডের মানুষেরা। একদল বলল, যদি কেউ রাজী হয় তার সঙ্গে প্রিমিতের বিয়ে দেওয়া। নবজাতক একটি পিতৃপরিচয় পাবে। দ্বিতীয় দল বলল, এসবের কোন দরকার নেই। রোলেন মারা গিয়েছে। রোলেনের সন্তান নিশ্চয়ই তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির অধিকারী হবে। সে ক্ষেত্রে নতুন করে বিয়ে নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে তখন সভা স্থগিত হয়েছিল। আনন্দ নির্বাক ছিল। এতদিন ধরে নিরন্তর পরিশ্রমে যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা তারা তৈরি করতে চেয়েছিল সেটা মূলত ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঠামো অনুসরণ। কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যেসে তৈরি মানসিক গঠন এত সহজে পরিবর্তিত হয় না। হলে জয়িতাকে নিয়ে এত কাণ্ড ঘটত না। তাছাড়া ধর্ম এবং সামাজিক আইনকে সে স্পর্শ করতে চায়নি। সুদীপের মত কোন হঠকারী মন্তব্য করার চেয়ে সে ধৈর্য ধরতে চাইল। সমস্যার সমাধান কিভাবে হয় সেটা জানার পর বোঝা যাবে এতকাল যি শুশ্র্ণে ভাঙ্গা হয়েছে কিনা। সে লক্ষ্য করল, গ্রামের মেয়েরা কিন্তু জয়িতার সঙ্গ ত্যাগ করেনি। দু'তিনজন সবসময় ওর সঙ্গে লেগেই আছে।

দুপুরে আর একটি ঘটনা ঘটল। সেই ব্লক গ্রামে ফিরে খবর দেওয়ার পর রোলেনের ছাম খেঁকে দশজন মানুষ এখানে উপস্থিত হল। তারা বলল, যেহেতু প্রিমিতের শরীরে রোলেনের সন্তান আসছে, যা এতদিন ওরা কানাঘুষাম শুনে এসেছিল, এখন সন্তান মাঝে ব্যক্ত হওয়ায় আর কোন ধন্দ নেই তাই ওরা প্রিমিতকে সসম্মানে গ্রহণ করতে চায়। তাদের গ্রামের মানুষদের জন্যে লক্ষ দেখতে চেয়েছিল বলে রোলেন নিহত হয়েছে কিন্তু সেই স্বপ্ন যখন আজ প্রত্যেকের চোখে তখন প্রিমিতকে তাদের মধ্যে দরকার।

কথাটা শুনামাত্র তাপল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ আপত্তি জানাল। অসম্ভব। প্রিমিত তাদের। প্রতি দিনের শোওয়া-বসা অভ্যেসে প্রিমিত জড়িয়ে আছে। ওর পেটে বাচ্চা এসেছে বলেই রোলেনের গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে? শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কাছন কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও সমাধান করতে পারছিলেন না। দু'পক্ষই সিদ্ধান্ত নিল প্রিমিত যা চাইবে তাই হবে।

গ্রামের অধিকাংশ যুবকযুবতী চিৎকার করল, প্রিমিত এখানেই থাকবে। জয়িতা উঠল। তারপর খুব বিনীত গলায় বলল, 'আমার দাজু, ভাই, বাহিনী আমা এবং সাথীরা। আজ সারা দিন তোমাদের খুব কষ্ট গেল। আমাকে নিয়ে তোমরা খুব অসুবিধেয় পড়লে।' জনতা নিশ্চুপ হল। জয়িতা আবার গুরু করল, 'এই গ্রামে আসার আগে আমি একটা শহরে ছিলাম। সেখানে কেউ আমাকে বলেনি তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমার বাবা মা নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসতেন কিন্তু আমি সেটা অনুভব করতে পারলাম না। অক্ষমতা আমারই। আমার বন্ধুরা আমাকে মেনে বলে ভাবত না। তাতে সুখী হতাম। এবং এসবের জন্যে কোন কষ্ট হত না। তোমাদের এখানে থেকে থেকে আমার মন পাশ্চটে গেল, শরীর বদলে গেল, নামও। তোমরা যদি আমায় ভাল না

বাসতে তাহলে আমিও এভাবে বদলে যেতাম না। রোলেনকে আমি আমার লোকনে ভাবি। এই জন্যে আমি গর্বিত। আমাদের সাহায্য ছাড়াই রোলেন তাদের জীবন বদলাতে চেয়েছিল। তোমরা যারা ওর গ্রাম থেকে এসেছ তারা আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ তোমরা রোলেনের অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নিয়েছ। তোমরা যা করেছ নিজেদের জোরেই করেছ। আর আমার কাছে পাহাড়ের যেকোন কণ্ট পাওয়া মানুষের চেহারাই একরকম। আমরা যখন বিপদে পড়েছিলাম তখন পালদেমরা আমাদের বাঁচিয়েছিল। পুলিশ যখন খরতে এসেছিল তখন তোমরা আমাদের রক্ষা করেছ। এতদিন আমরা তোমাদের সাথী ছিলাম এখন আত্মীয়। কারণ তোমাদের একজনের সন্তান আমার শরীরে আমার কাছে দুটো গ্রামের মানুষের কোন প্রভেদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ রোলেনের সম্পত্তির ওপর আমার কোন লোভ নেই। তোমরা দুই গ্রামের মানুষ আশীর্বাদ কর যেন যে সন্তান আসছে সে যেন তোমাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়। এই তাপল্যাঙের মাটিতেই সে আসুক কারণ এখানেই আমরা আমাদের স্বপ্ন সার্থক করতে চেয়েছি।’

আনন্দ মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে জনতার দিকে তাকাল। সুদকেরিঘরের সামনে কাছন পৌঁছে গেছেন। তাঁর হাতে জপের মালা। শিষ্যরা দুপাশে। সেদিন জয়িতার বক্তৃতা শুনে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কলেজে কেউ কেউ ওকে টাঁশ বলত। কিন্তু সেদিন আনন্দের মনে হয়েছিল সে জয়িতাকে চিনতে পারেনি। বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্র দুই গ্রামের মানুষ মিলিত স্বরে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। রোঙামিত, ইনামিত, পাশংকিতরা ওরা সবসঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সভা থেকে।

আনন্দ ধীরে ধীরে নেমে এল। যে বুদ্ধ একটু আগে কথা বলেছিল সে হাসল। তারপর বলল, ‘প্রার্থনা করো যেন ভগবান বাচ্চাটাকে সুস্থভাবে পৃথিবীতে আনেন।’

আনন্দ বলল, ‘প্রার্থনা?’

বুদ্ধ মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ। আমাদের মানুষ পৃথিবীতে আসছে, প্রার্থনা করবে না? তোমার ধর্মে কি প্রার্থনা করার রীতি নেই?’

আনন্দ মাথা নাড়ল, ‘আছে?’

ডুঙ, ডুঙ, ডুঙ। জয়তাক থেমে থেমে বাজছিল। হঠাৎ সুদকেরিঘরের দরজা খুলে একজন মাইলিআমা চিৎকার করে উঠল, ‘আসল যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।’ বলেই ফিরে গেল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে কাছন দুটো হাত উপরে তুলে অদ্ভুত স্বরে মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। আর সমস্ত পাহাড়ের মানুষ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সুদকেরিঘরের সামনে। প্রত্যেকের মাথা নিচু, হেঁট নড়ছে।

বিস্মিত হয়ে আনন্দ দৃশ্যটি দেখছিল। হাজার দুয়েক মানুষ বরফ উপেক্ষা করে হাঁটু গেড়ে কি প্রার্থনা করছে? সে মুখ ফেরাল। তুষারশৃঙ্গের ওপর

সূর্যের আলো মাখামাখি। পৃথিবী তার পবিত্রতম হাসি হাসছে। সমস্ত চরাচর যেন উন্মুক্ত হয়ে আছে আগামীকালের মানুষের জন্যে। একমাত্র হিমালয়ের বাতাস ছাড়া কেউ শব্দ তুলছে না। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা প্রতিষ্কারত মানুষদের ছবির মত মনে হচ্ছিল। আনন্দ মুখ ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল। দুটো মূর্তি পাহাড় থেকে নেমে আসছে। একজন আর একজনকে অবগমন করছে। কাছাকাছি আসতে সে সুদীপকে চিনতে পারল। সুদীপ বিধ্বস্ত, খোঁড়াচ্ছে। তার সঙ্গিনী তাকে সাহায্য না করলে হাঁটা অসম্ভব হত। আনন্দ নড়ল না। ওরা সামনে আসার পর সে দেখল। সুদীপের শরীর এক রাগ্রেই বীভৎস। চোখ তুলে সুদীপ তাকে দেখল। তারপর বলল, 'পারলাম না।' ওর গলায় স্বর ভাঙা। মেয়েটা ইস্তিক করতে সুদীপ আরও একটু এগোল। তারপর বরফের ওপর বসে পড়ল। আনন্দ চুপচাপ।

সমস্ত পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়ে একটি কান্না বাজবে এই আকাঙ্ক্ষায় এখন মানুষেরা উদগ্রীব। একটি কান্না যা রক্ত এবং সংস্কৃতির ঋণ গ্রহণ করে আগামীকালকে শক্তিশালী করবে। সুদূরবিধরে যে প্রচণ্ড ব্যস্ততা তা টের পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষ উন্মুখ সেই শব্দটি শোনার জন্যে। আনন্দ বড় বড় পা ফেলে দূরত্ব ঘোচাল। তারপর শেষতম মানুষটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর, হৃদয় শান্ত হয়ে এল।

নবজাতকের সূতীন্ন চিৎকার শোনা যাবে এখনই, যেকোন মুহূর্তে।

সমাপ্ত